অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বাংলার বাউল ও বাউল গান

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥
॥ কলিকাতা - ১২ ॥

প্রথম প্রকাশ :
দীপান্বিতা, ১৩৬৪

শিল্পী :
প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
১৩০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৯
গ্রন্থারম্ভ : শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

কাগজ সরবরাহকারী :
রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩২বি ব্রাবোর্ণ রোড
কলিকাতা ১

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন প্রেস
২ করিশচার্চ লেন
কলিকাতা ৯

বাঁধাই :
খলিলুর রহমান এণ্ড কোম্পানি
১৬ পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

দাম :
পঁচিশ টাকা

সুবিখ্যাত বাউল-গুরু ফকির লালন শাহ্

৺ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত স্কেচ হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

॥*॥ নিবেদন ॥*॥

বাউলতত্ত্ব ও বাউল-গান সম্বন্ধে সহস্রাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিপুলায়তন গ্রন্থ-রচনার মূলে আমার জীবনের সুদীর্ঘকালের অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন কর্ম-সাধনা নিহিত।

যাঁহারা বাংলার পল্লীতে বাস করিয়াছেন এবং পল্লীর অন্তরের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, পল্লীর জীবন-প্রবাহে বাউল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও ফকিরদের একটা ক্ষীণ ধারা আসিয়া মিশিয়াছে। সকাল বেলায় প্রায়ই পল্লীর বাড়ী বাড়ী ইহাদের আবির্ভাব ঘটে—হাতে একতারা, কখনো বা কোমরে ডুগি বাঁধা, কখনো কাঁধে ঝুলানো 'গুবগুবি' বা কখনো কখনো বগলে সারিন্দা বা বেহালা—তারপর ভক্তিমূলক গান, দেহতত্ত্বের গান বা রাধা-কৃষ্ণ বা গৌর-লীলার গান—কখনো বা বিনা গানে কেবল ভিক্ষার জন্য আবির্ভাব,—তারপর গৃহস্থের সঙ্গে দুই-একটা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা, ভিক্ষা-গ্রহণ ও অন্তর্ধান। ইহা পল্লী-জীবনে একটা দৈনন্দিন ঘটনা। এই ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায় যেন পল্লীর বৃহৎ অঙ্গের সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গরূপে আবদ্ধ—নগণ্য ও অপ্রয়োজনীয় হইলেও অত্যাজ্য।

মধ্যবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কুষ্টিয়া-অঞ্চলে, এক সময়ে এই বাউল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও ফকিরের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিল ইহাদের বাস—পল্লী-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইহারা ছিল জড়িত। এই মধ্যবঙ্গের আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা, বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ঢাকা এক পল্লীতে কাটিয়াছে আমার শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন। প্রায় প্রতিদিনই বৈষ্ণব ভিখারী ও ফকিরদের মুখে শুনিয়াছি কতো গান—লালনের সেই বিখ্যাত পদগুলি—"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে, আমার বাড়ীর কাছে আরশী-নগর, এক পড়শী বসত করে" বা "কথা কয় রে, দেখা দেয় না" অথবা "খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়" ইত্যাদি। এই গায়কদের আবেগময় একটানা সুরে আমার কিশোর-মনে একটা যাদুর স্পর্শ দিত—একটা অনির্বচনীয় রহস্যময় ভাবলোক সৃষ্টি করিত। এইভাবে প্রথম যৌবন হইতেই বাউল-গানের প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই।

এই পর্যায়ে ছিল কেবল পল্লী-সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা। পরিণত

বয়সে জানিতে পারিলাম যে, ইহারা বিচ্ছিন্ন ভিক্ষা-ব্যবসায়ী মাত্র নয়, ইহারা একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক, ইহাদের নির্দিষ্ট ধর্ম-জীবন আছে, বিশিষ্ট আচার-আচরণ আছে, গূঢ় সাধন-প্রণালী আছে, বাংলার নানা স্থানে ইহারা ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং হিন্দু ও মুসলমান একই সম্প্রদায়ভুক্ত—উভয়ে একই প্রকারের সাধনায় নিযুক্ত আছে।

প্রথম জীবনের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ও পল্লী-সাহিত্য-প্রীতির ফলে পরবর্তী জীবনে সাধারণ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক এবং সামাজিক বোধে অসামাজিক, বাংলার এই অদ্ভুত ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাব-ধারা ও তাহার গূঢ় ধর্ম-জীবনের পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য একটা প্রবল কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা অনুভব করি। তাহারই ফলে সুরু হয় বাউল-গান-সংগ্রহ ও বাউলদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা।

খৃষ্টীয় ১৯৩৭ সাল হইতে আরম্ভ হয় গান-সংগ্রহ ও বাউলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পালা। প্রথম কুষ্টিয়া-অঞ্চল, তারপর যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার মধ্যে বিস্তৃত হয় এই কার্যের পরিধি। এই প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য ১৯৪০ সালে কবি-তীর্থ শিলাইদহ-পল্লীতে 'নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য-সম্মেলন' নামে এক সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ঐ সম্মেলনে পার্শ্ববর্তী ছয়-সাতটি জেলার বাউল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও ফকিরদের আহ্বান করিয়া আনা হয় এবং কয়েক দিন ধরিয়া চলে তাহাদের গান ও তত্ত্বালোচনা। এই সময়ে বাউল-গান ও তথ্য-সংগ্রহ একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। ক্রমে এই কার্যের পরিধি বিস্তৃত হয় পূর্ববঙ্গে—বিশেষ করিয়া বিক্রমপুরে।

তারপর হঠাৎ সংঘটিত হইল বাংলায় অঙ্গচ্ছেদ। বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতির উপর এত বড়ো আঘাত আর কোনোদিন আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। বাঙালী জাতির যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা পূর্ব ও পশ্চিম—উভয় বঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত, বাঙালীর সংস্কৃতি উভয় বঙ্গের মিলিত সংস্কৃতি—হিন্দু ও মুসলমান, 'সংখ্যাগুরু', ও 'সংখ্যালঘু', 'তফশীলী', ও অ-'তফশীলী', ছোট ও বড়—সমস্ত বাঙালীর সম্মিলনে গঠিত বঙ্গ-সংস্কৃতি। বাংলার নিতান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই যে বাউলধর্ম, ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান একত্র মিলিয়াছে—মিলিয়াছে বৌদ্ধ, হিন্দু ও সুফীধর্ম। সমগ্র বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্য ইতিহাস-বিধাতার চিরন্তন বেদীতে প্রতিষ্ঠিত, কোনো দ্বি-জাতিতত্ত্ব বা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ইহাকে পৃথক করিতে পারে না—পারিবে না।

বঙ্গ-বিভাগের পর বাংলার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম-শাখার সাহিত্য-রক্ষা ও সাধনার পরিচয়-প্রদান আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িল। পাকিস্তান ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে এই কয় বৎসর স্বাস্থ্য, অর্থ ও শরীরের ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে বাউল-গান ও বাউল-সাধনা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বেড়াইয়াছি। পূর্বের সংগৃহীত ও পরবর্তী সংগ্রহের দেড় হাজার গানের মধ্য হইতে নির্বাচিত পাঁচশতেরও অধিক গান এবং এই ধর্মের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধনার বিবরণ-সংবলিত এই বিরাট গ্রন্থখানি আজ বাঙালী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিয়া আমার দীর্ঘ বিশ বৎসরের সংকল্পিত কার্য শেষ করিলাম।

এই সংগ্রহের কতকগুলি গান অন্য কোথাও প্রকাশিত হইতে পারে, তবে ইহার অধিকাংশ গানই অপ্রকাশিত। অন্যত্র প্রকাশিত গানগুলি নানা স্থানের সংগ্রহের সঙ্গে মিলাইয়া যতদূর সম্ভব তাহার একটা শুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য রূপদানের চেষ্টা করিয়াছি। লালন, পাঞ্জ প্রভৃতি ফকিরগণের গান মূল স্থান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, অন্যান্য গানের যথাসম্ভব অকৃত্রিমতা ও বিশুদ্ধতার উপর সর্বদা নজর রাখিয়াছি। কেবল অর্থহীন শব্দ ও স্পষ্টতঃ নিতান্ত অশুদ্ধ ও বিকৃত বানানকে বিচারপূর্বক ঠিক করা হইয়াছে; তাহা ছাড়া ভাষা বা ছন্দে বিন্দুমাত্র হাত দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেক গানের সংগ্রহের মূল স্থানের উল্লেখ করিয়াছি, সম্ভব হইলে রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। তারপর প্রয়োজন-বোধে অনেক গানের ভাবার্থ-নির্দেশ ও টীকা-টিপ্পনীও যোগ করিয়াছি।

কালের প্রবাহে বাংলার ইতিহাসের নানা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ গতি-স্রোতে সমাজের নানা রূপান্তরের ফলে বাউলধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল এবং বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। আবার এই গতি-স্রোতে সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ইহার বিলোপ ঘটিতেছে। এই ধর্ম-উদ্ভবের মূলে কোন্ কোন্ শক্তি ও প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল, তাহা নির্দেশের জন্য আমি গুপ্ত-পূর্ব যুগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ও বাঙালী জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস এবং বাঙালী জাতি-গঠনের উপাদান ও তাহার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিয়াছি। এই ধর্ম নিতান্ত সাধারণ লোকের ধর্ম—গণধর্ম এবং ইহার পশ্চাতে যে একটি বিশিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা ছিল, তাহারও যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছি। আশা করি, এই ধর্মের স্বরূপ বুঝিবার ব্যাপারে এই-সব আলোচনা আলোকপাত করিবে।

বাউলধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করা যায় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির এবং সামাজিক ইতিহাসের একান্ত

উপকরণ-দৈন্যে তাহা করাও অসম্ভব। তবুও যে সময়-পর্বটি আমি অনুমান করিয়াছি, তাহার পরিধি দীর্ঘ পঞ্চাশ বর্ষ-ব্যাপী হইলেও নানা কারণে উহা সঙ্গত-অনুমানসিদ্ধ এবং অনেকাংশে ঐতিহাসিক তথ্যানুমোদিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৈষ্ণব-সহজিয়াধর্মের প্রবল বিস্তারের যুগ আরম্ভ। মূল সাধনাঙ্গ এক হওয়ায় সহজিয়া-মুসলমান ফকিরদের মিলনে ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ তক বাউলধর্মের উদ্ভব, তারপর আরো পঁচিশ বৎসরে সহজিয়া-বৈষ্ণব ও ফকিরের মিলিত সাধনার রূপের মোটামুটি ভিত্তি স্থাপিত,—হয়তো ঐ সময় দুই-চারিটি পদও রচিত হইয়াছিল,—তারপর পরবর্তী পঁচিশ বৎসরে ইহার মোটামুটি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা,—এইরূপ অনুমান করিয়াছি। তারপর আরো পঁচিশ বৎসর ধরিতে পারি সারা বাংলা-ব্যাপী ইহার নানামুখী প্রসারের জন্য। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ তক একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাধনার ধারা ও সাধক-জীবনের রূপ লইয়া সারা বাংলা-ব্যাপী ইহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতি সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-সংগ্রহে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত যে কয়খানি বৈষ্ণব-সহজিয়া পুঁথি আছে, বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে 'সহজ'-ধর্মের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছাড়া বাউলধর্মের নির্দিষ্ট সাধন-পদ্ধতির কোনো ইঙ্গিত নাই। অথচ ১৭০০ খৃষ্টাব্দের পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে লিখিত পুঁথিতে ইহার নিদর্শন বর্তমান আছে।

আমি এই গ্রন্থের মধ্যে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি যে, মুসলমান ফকিররাই বাউল-সাধনার আদি প্রবর্তক বলিয়া মনে হয় এবং বাউল-সাধনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুব সম্ভব ফকিরদের নিকট হইতে আসিয়াছে। বাউল-মহলে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের বাউল-মহলে, একটা জনশ্রুতি প্রবল যে, নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র, যাঁহাকে বাউলরা তাহাদের সম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্তক মনে করে, তিনি 'মাধব বিবি' নামে এক মুসলমান মহিলার নিকট এই ধর্মে দীক্ষিত হন। আউলচাঁদ নামে এক মুসলমান ফকির পশ্চিমবঙ্গে কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের আদিপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচারিত। তিনি স্বয়ং চৈতন্যদেব—আউলচাঁদ-রূপে নূতন ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের পুস্তকাদিতে প্রকাশ। যাহোক, ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার উদ্ভব হইয়া ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার পূর্ণরূপ-ধারণ এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দ তক একটি নির্দিষ্ট সাধন-পদ্ধতি-বিশিষ্ট হিন্দু বৈষ্ণব ও মুসলমান ফকিরের মিলিত ধর্ম হিসাবে সমগ্র বঙ্গে ইহার প্রসার সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায়।

গত প্রায় কুড়ি বৎসর, বিশেষ করিয়া দেশ-বিভাগের পর এই দশ বৎসর, পথে, মাঠে, ঘাটে বাউল / বৈষ্ণব ও ফকিরদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, পল্লীর অভ্যন্তরে পায়ে হাঁটিয়া, কখনো কখনো গরুর গাড়ীতে কতো পথ অতিক্রম করিয়াছি। কতো বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি, কতো সাদর অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হইয়াছি, কতো আখড়ায় রাত কাটাইয়াছি, আবার কতো বিরূপ, অপমানজনক প্রতিকূলতায় ব্যথিত হইয়াছি—সেই সব আনন্দ-বেদনার স্মৃতি আজ মনে ভিড় করিতেছে। আমার নিদারুণ শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, প্রেসে নানা কারণে মুদ্রণ-কার্যে আড়াই বৎসর-ব্যাপী বিলম্ব প্রভৃতিতে কতোবার মনে হইয়াছে, এ-পুস্তক আর বাহির হইবে না। আজ সে-সবই পথের স্মৃতিমাত্র মনে হইতেছে। আজ আমার দেশবাসীর হাতে এতদিনের পরিশ্রমের ফল তুলিয়া দিয়া চিন্তামুক্ত হইলাম।

কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন, বাউল-গানের সাহিত্য-সম্পদ আর কতটুকু, অনেকে বলিতে পারেন, বাউল-সাধনা শিষ্টজন-নিন্দিত ও ধর্মের নামে ইন্দ্রিয়-সেবামাত্র। তবুও এই গানগুলি উভয়বঙ্গের প্রায় আড়াই লক্ষ বাঙালীর (১৯৪২ সালের একটা মোটামুটি হিসাব অনুসারে) ধর্ম-সঙ্গীত ; এই ধর্ম মূলতঃ বাংলা দেশে পাল-শাসনের চারিশত বৎসর-ব্যাপী প্রকাশ্য ও প্রধান ধর্ম ছিল, তাহার পর সমাজের অন্তরালে শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তও ইহার ক্ষীণ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে এবং এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। ইহাকে পছন্দ না করিলেও বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্মের অংশ হিসাবে ইহার ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আমি ব্যক্তিগত মতামতের উর্ধ্বে উঠিয়া ঐতিহাসিক ও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাউলধর্ম ও বাউল-গানের যথাযথ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এই বাউলধর্ম ও বাউল-গানগুলি বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি ঐতিহাসিক দলিল।

নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই ধর্ম-সম্প্রদায় দ্রুত বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিরাট ফকির-সম্প্রদায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নিশ্চিহ্ন হইবার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বৈষ্ণব-বাউলের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং দিন দিন তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। উভয় বঙ্গে তাহাদের অবস্থা অনেক বৎসর ধরিয়া যাহা লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে আশঙ্কা হয়, আগামী পঁচিশ বৎসরে ইহাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকিবে না।

তাই সর্বধ্বংসী কালের হাত হইতে এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভাব-ধারার নিদর্শন এই গানগুলি এবং এই ধর্মের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধনা-সংক্রান্ত মোটামুটি একটা বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গেলাম ভাবীকালের বাঙালী অনুসন্ধিৎসুদের জন্য। যদি ইহার কোনো প্রয়োজন উপলব্ধ না হয়, তবে ইহাও এই সম্প্রদায়ের মতো অতীতের বিস্মৃতির তলে সমাহিত হইয়া যাইবে, কাহারো কিছু বলিবার থাকিবে না।

এই সাধনার পতাকা-তলে একদিন সমবেত হইয়াছিল হিন্দু আর মুসলমান। সমাজ ও রাষ্ট্রের গণ্ডীর উর্ধ্বে উঠিয়া তাহারা আত্ম-প্রত্যয় ও উপলব্ধিকেই জীবনের চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> "আমাদের দেশের ইতিহাস প্রয়োজনের মধ্যে নয়, মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেচে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ ক'রে এসেচে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"*

এইবার আমার ঋণ-স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের পালা। সর্বাগ্রে বাংলার নানা প্রান্তের যে-সমস্ত বাউল-সাধকগণ আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়া অকপটে তাঁহাদের সাধন-জীবনের গোপনীয় তথ্য বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার এবং অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রসঙ্গে নবদ্বীপের সেই সাধিকাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ নিবেদন করি, যিনি সাধন-জীবনের বহু গোপন তথ্য আমাকে জানাইয়াছেন এবং অনেক সংশয় নিরসন করিয়াছেন।

---

* অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেবের 'হারামণি'র ভূমিকা

তারপরেই যাঁহার কথা সর্বাগ্রে মনে হইতেছে, তিনি আমার অগ্রজতুল্য, হিতাকাঙ্ক্ষী ও একান্ত দরদী বন্ধু পরলোকগত ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত। এই যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিটি বাউল-গান ও বাউল-সাধনার তথ্য জানিবার জন্য অসীম আগ্রহান্বিত ছিলেন। প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম ও পূজার অবকাশে যখন গান ও তথ্য-সংগ্রহ-কার্যে বিভিন্ন জেলায় বাহির হইয়াছি, তখন অধীর আগ্রহে তিনি আমার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। কলিকাতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নিকট না গেলে তিনি অনুযোগ করিতেন। তারপর ভ্রমণের বিবরণ, কোথায় কাহার সহিত কি কথাবার্তা হইল, কি তথ্য সংগৃহীত হইল, কয়টি গান পাওয়া গেল ইত্যাদি সংবাদ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করিতেন। তারপর প্রত্যেকটি গান পড়া হইত এবং সে উপলক্ষ্যে নানা আলোচনা হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে এইরূপ পদ্ধতি। শেষের দিকে তিনি আর বিলম্ব না করিয়া অতি সত্বর গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। কিন্তু মানুষ তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করিলেই কি সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়? যে নিয়তির অমোঘ নিয়ন্ত্রণে বহু চেষ্টার পরেও মানুষের শত-সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইতেছে, আবার বিনা আয়াসে বা স্বল্প আয়াসে অপ্রত্যাশিত সাফল্য করতলগত হইতেছে, তাহারই অলঙ্ঘ্য বিধান ও নিঃশব্দ ইঙ্গিতে কিছুতেই এতদিন এই গ্রন্থ-প্রকাশ সম্ভবপর হয় নাই। আজ এই গ্রন্থ-প্রকাশের সময় সেই পরলোকগত শুভানুধ্যায়ীর স্মরণে অন্তর বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে।

তারপর যাঁহার নিকট হইতে নানাভাবে আমি উপকার লাভ করিয়াছি, তিনি ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত (অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী-অধ্যাপক)। তাঁহার *Obscure Religious Cults* এবং পরে *Tantric Buddhism* নামক গ্রন্থে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধনা-সম্বন্ধীয় বিবরণ পড়িয়া আমি যথেষ্ট সাহস ও উৎসাহ সঞ্চয় করিয়াছি। সেই প্রেরণায় আমি বাউলদের গুহ্য ও অস্বাভাবিক সাধন-প্রণালীর সমস্ত তথ্য স্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিতে কোনো সংকোচ বোধ করি নাই। কোনো ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ-আলোচনায় ব্যক্তিগত রুচি ও ভালো-মন্দ-বিচার বা নৈতিক-অনৈতিক বোধ বা কে কি মনে করিবে—এই চিন্তা জ্ঞান-চর্চায় পথ রুদ্ধ করে, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীকে এই সমস্ত চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠিয়া সেই ধর্মের যথাযথ স্বরূপের পরিচয় দিতে হইবে। এই আদর্শের নীরব সংকেত আমি লাভ করিয়াছি তাঁহার গ্রন্থ দুইখানি হইতে।

কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই বাউল-প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত নানা আলাপ-আলোচনায় আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি; এই গ্রন্থে উল্লিখিত একটি বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার অভিমত আমি গ্রহণ করিয়া আমার আলোচনার অঙ্গীভূত করিয়াছি। তারপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত সহজিয়া-পুঁথিগুলি দেখিবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং বাউলধর্ম লইয়া নানা আলাপ-আলোচনার ফলেও আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ।

ফকির পাঞ্জ শাহের সুযোগ্য পুত্র জনাব রফিউদ্দীন খোন্দকার সাহেব কেবল তাঁহার পিতার গানগুলি পাঠাইয়াই নহে, ফকিরী-মতবাদের তত্ত্ব-দর্শন ও সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক বিষয় পত্র দ্বারা মধ্যে মধ্যে জানাইয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমার অজস্র ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির আরবী ও ফার্সী-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীকিশোরী-মোহন মৈত্র মহাশয় সুফীধর্মের কয়েকখানি পুস্তক সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে বাউল-গানে ব্যবহৃত কতকগুলি আরবী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন; তাঁহাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি-প্রচারে বিশেষ অনুরাগী, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীমান প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমাকে প্রেরণা দান করিয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থ-প্রকাশের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি আমার কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন।

সোদরোপম স্নেহ-প্রীতিভাজন বন্ধু, লোক-সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত শ্রীযতীন্দ্র সেন নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বাউল-গান সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল। তাঁহার কৈশোর-কালেই তিনি ফকির লালন শাহের কয়েকটি গান সংগ্রহ করেন এবং এই কয়েকটি গান ও লালনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা সম্পর্কে লিখিত তাঁহার একটি প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে (চৈত্র, ১৩৩১) প্রকাশিত হয়। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে গাথা-সংগ্রহের কার্যও করেন। তিনি কেবল এই গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধন-কার্যেই আমাকে সাহায্য করেন নাই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বর্ধমানের জুবুর

পল্লীতে এক বাউল-সমাবেশে আমার সঙ্গী হইয়াছেন এবং যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই বিরাট গ্রন্থের শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামের শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত তথায় বাউল-সমাবেশের আয়োজন ও তাহার ব্যয়ভার বহন করিয়া এবং বাউলতত্ত্ব-আলোচনা ও বাউল-গান-সংগ্রহার্থ কয়েক দিবস যাবৎ আমাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শেষের দিকে বাউল-গান-সংগ্রহের অনেক সফরে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার ভট্টাচার্য আমার সঙ্গী হইয়াছে এবং নানাভাবে আমার শ্রম-লাঘব ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের চেষ্টা করিয়াছে। তাহাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

মহালয়া, ১৩৬৪
৩৩।৫।১ সি, কাঁকুলিয়া রোড,
কলিকাতা-১৯

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

উৎসর্গ

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

করকমলেষু

প্রথম খণ্ড ·

॥ বাংলার বাউল ॥

॥৯॥ সূচীপত্র ॥৯॥

প্রথম অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

বাউল শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য ১-৫০

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও রাগাত্মিকা পদে ব্যবহৃত 'বাউল' শব্দ—রাগাত্মিকা পদের রচনা-কাল-নিরূপণ—চণ্ডীদাস-সমস্যার আলোচনা—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-কাহিনীর ইতিহাস—শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে উল্লেখ—'গাথা-সপ্তশতী'—'বেণীসংহার'—বামন—'ধ্বন্যালোক'—'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' — 'সদুক্তিকর্ণামৃত' — 'গীতগোবিন্দ' — রাধাকৃষ্ণলীলার শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্য ক্রমে ধর্মের স্তরে উন্নীত—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর রাধাকৃষ্ণ-লীলার প্রভাব—বাসলী দেবীর স্বরূপ—সাধন-সঙ্গিনী রজকিনী রামী-প্রসঙ্গ—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর হঠযোগমূলক পদ—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর অভিমত—চৈতন্যচরিতামৃতের দুইটি স্থলে 'বাউল'-শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত—বাউলদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে গানে উল্লেখ—'বাউল' ও 'আউল' শব্দের তাৎপর্য

বাউল কাহারা ? ৫০-১০৩

'নেড়া' বা 'বে-শরা' ফকির- শরীয়ত, তরীকত, হকিকত ও মারফত—'রসিক' বৈষ্ণব বা বাউল বৈষ্ণব—মুসলমান ফকিরদের উপর চৈতন্য-চরিতামৃত ও সুফীধর্মের প্রভাব—অক্ষয়কুমার দত্তের বিবরণ—বাউল, আউল, নেড়া, সহজী ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বিবরণ—উইলসন সাহেব ও District Gazetteers (Nadia)—ঘোষপাড়ায় মুদ্রিত পুস্তিকাদি—ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্রচারিত বাউল-গান ও বাউল-মতবাদের বিচার

বিষয় পত্রাঙ্ক

'বাউল-গান' কথার অপপ্রয়োগ ১০৩-১০৪

বাউল-গানের রচয়িতা ১০৪-১০৯

লালন ফকির—পদ্মলোচন বা পোদো—হাউড়ে গোঁসাই—যাদুবিন্দু—পাঞ্জ শাহ্—নরসিংদির বাউল—নবদ্বীপের চণ্ডীদাস গোঁসাই—শিলাইদহের গোঁসাই গোপাল—উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন বাউল

বাউল-গানের রূপ ও সাহিত্যিক মূল্য ১০৯-১২৬

বাউলধর্মের আবির্ভাব ও বাউল-গানের রচনা-কাল ১২৬-১৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় ধর্মের ক্রমবিবর্তনে বাউলধর্মের উৎপত্তি ও স্থান ১৩৩-২৯০

ধর্মের ইতিহাসই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস—ধর্ম ভারতীয় জীবন-ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—ভারতের সমন্বয়-শক্তি—রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মিলনের প্রচেষ্টা—মধ্যযুগের ভক্তিবাদী সাধকগণ—বাংলায় হোসেন শাহের আমল—আকবর—দারা শিকো—দারার গ্রন্থাদি—'মজমা-উল-বহরেন'—'সিরী আকবর'

বেদ—আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন—বেদের রচনা-কাল—বৈদিক সাহিত্যে বাংলার উল্লেখ—জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আয়রঙ্গ-সুত্ত', রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লেখ—পাণিনির ব্যাকরণ—ঐতিহাসিক নিদর্শন—Prasioi এবং Gangaridai—মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মীলিপি

বাঙালী জাতির গঠনে বিভিন্ন উপাদান ও ধারা—বাংলা ভাষার উপাদান—ভারতীয় সভ্যতায় অনার্যজাতির দান—সিন্ধু-সভ্যতায় লিঙ্গপূজা—শিব-শক্তিবাদ—প্রাচীন যুগে ধর্মের সঙ্গে যৌন ব্যাপারের সম্পর্ক—বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মত—আর্যেতর জাতির ধর্ম-বিশ্বাসের প্রভাব—ঋগ্বেদ ও উপনিষদে নিদর্শন—ঈশ্বরের রমণ-ক্রিয়া ও পত্নী-সমন্বিত হইবার কল্পনা—বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্—ব্রাত্যসম্বন্ধে আলোচনা—বাংলায় ধর্মে অনার্য প্রভাব

বাংলায় ধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা: (১) গুপ্তপূর্ব-যুগ (১৯০—১৯৩ পৃঃ); (২) গুপ্তযুগ (১৯৩—২০৫ পৃঃ); (৩) পাল-যুগ

বিষয় পত্রাঙ্ক

—বজ্রযান—কালচক্রযান—সহজযান (২০৫—২৪৪ পৃঃ); (৪) সেন-যুগ (২৪৪—২৫০ পৃঃ); (৫) মুসলমান-যুগ (২৫০—২৯০ পৃঃ)

মুসলমান-যুগে ধর্মের অবস্থা—হিন্দু-তান্ত্রিক ধর্মের উদ্ভব ও প্রসার—সহজযান ও নাথ-পন্থ—রাধা-কৃষ্ণবাদ—শাক্তধর্ম—মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে শাক্ত-ধর্মের নিদর্শন—বাংলায় সুফীগণের প্রসার—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম—সুফীধর্ম—মুসলমান ফকির ও সহজিয়া বৈষ্ণবের মিলন—বাউলধর্মের উদ্ভব

তৃতীয় অধ্যায়

বাউলধর্মের উপাদান ২৯১-৩৬৮

(১) বেদ-বহির্ভূত ধর্ম ২৯১-৩০৩

(২) গুরুবাদ ৩০৩-৩২২

(৩) স্থূল মানব-দেহের গৌরব : ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ ৩২৩-৩৪০

(৪) মনের মানুষ ৩৪০-৩৫৬

(৫) রূপ-স্বরূপ-তত্ত্ব ৩৫৭-৩৬৮

চতুর্থ অধ্যায়

বাউলধর্মের সাধনা ৩৬৯-৪৩৭

বাউলদের সাধনার গোপনীয়তা—কেবল সমধর্মাবলম্বী বা গুরু-শিষ্যের মধ্যে আলোচনা—'অনুমান' ও 'বর্তমান'-ভজন—বাউল-গানের সাংকেতিক ও পারিভাষিক শব্দ—'মহাযোগ'—'ত্রিবেণী'—'ফুল'—'নীর ও ক্ষীর'—'রাগ'—'চন্দ্র'—'রস'—মণীন্দ্রমোহন বসুর সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের বিবরণে অসম্পূর্ণতা—লোচন দাসের 'বৃহৎ নিগম'—সাধনের বিশেষ সময়—তিনদিনের ক্রিয়া—যোগ-মিলন-ক্রিয়া—নামাশ্রয় ও মন্ত্রাশ্রয়—যোগ-মিলন-ক্রিয়ার পদ্ধতি—পঞ্চানন দাসের কড়চা—বাণ-ক্রিয়া—'ত্রিধারা মানসিক পূজা'—মূলবন্ধ—অশ্বিনীমুদ্রা—বজ্রোলীমুদ্রা—বাণ-সাধনায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদের দৃষ্টান্ত—চারিচন্দ্রভেদ—মৃত্তিকাসাধন—শুক্রচন্দ্র-সাধন—পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী সম্প্রদায়ের বর্ণনা—বীজমার্গী

বিষয় পত্রাঙ্ক

পঞ্চম অধ্যায়

তন্ত্র-সাধনা ও বাউল-সাধনা ৪৩৮-৪৮১

হিন্দুতন্ত্র-সাধনা—মূলাধার-চক্র—স্বাধিষ্ঠানচক্র—মণিপুরচক্র—অনাহতচক্র—বিশুদ্ধচক্র—আজ্ঞাচক্র—সহস্রার—নাড়ীমণ্ডলী—কুণ্ডলিনীযোগ-ক্রিয়া—হিন্দুতন্ত্রে প্রকৃতি-মিলন—বাউল-সাধনার সঙ্গে প্রভেদ ও সাদৃশ্য—বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনা—কায় ও চক্র—নাড়ী—বৌদ্ধতন্ত্রে প্রকৃতি-মিলন—ষড়ঙ্গযোগ—বাউল-সাধনার সঙ্গে সাদৃশ্য ও প্রভেদ—জনৈক সাধক-প্রদত্ত বিবরণী

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুফীধর্ম ও বাউলধর্ম ৪৮২-৫১৬

'সুফী'-শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য—সুফী-মতবাদের দুই যুগ—প্রাচীন ও নূতন—রাবীয়া—ধূ-ল্-নুন্ মিশ্‌রী—হুজিয়িরি—'কাসফ-অল-মহ্‌জুব'—ফরিদুদ্দিন আৎতার—'তাজকিরাত-অল্-আউলিয়া'—বায়াজিদ অল্ বিস্তামি—মনসুর হল্লাজ—ইবন-অল্-আরবী—'ইনসান্-উল-কামেল'-মতবাদ—গাজালী—রুমী—'মসনবী'—'ফার্সী কোরান'—শবিস্তরী—'গুলসান-ই-রাজ'—ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও স্বরূপ—ঈশ্বর ও মানব—সুফী-সাধনার লক্ষ্য—রুমীর কাব্য-সাহিত্যে সুফী-মতবাদের রূপ—সুফী-সাধনার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া—আলম-ই-হাউত—আলম-ই-লাহুত—আলম-ই-জবরুত—আলম-ই-মলকুত—আলম-ই-নাছুত—বাউল-গানে সুফী-প্রভাবের আলোচনা—সুফীধর্মে প্রেম ও বাউলধর্মে প্রেম—আলি রাজার 'জ্ঞান-সাগর'

সপ্তম অধ্যায়

উত্তরভারতের সন্তগণ ও বাংলার বাউল-সম্প্রদায় ৫১৭-৫২২

উভয় সম্প্রদায়ের প্রভেদ ও সাদৃশ্য—কবীর—ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর ও বেশভূষার অসারত্ব—ঈশ্বর মন্দির, মসজিদ ও শাস্ত্র-গ্রন্থে নাই, আছেন হৃদয়ে—ঈশ্বর সম্প্রদায়-বিশেষের নন, সকলের—'উলটবাসিয়াঁ'—বাউলের হেঁয়ালী-পূর্ণ গান

চিত্রসূচী

[দুইখানি সহজিয়া-পুঁথির কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিসহ]

সুবিখ্যাত বাউল-গুরু ফকির লালন শাহ্ (৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কেচ হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত) ।০

বীরভূম জেলার পল্লী-পরিবেশে জনৈক বাউলের সঙ্গে বাউলগান-প্রিয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ২৯১

'বৃহৎ নিগম' পুঁথির একটি পৃষ্ঠার অংশবিশেষের প্রতিলিপি ৩৮২

'বৃহৎ নিগম' পুঁথির অপর একটি পৃষ্ঠার অংশবিশেষের প্রতিলিপি ৩৮৩

পঞ্চানন দাসের কড়চার একাংশের প্রতিলিপি ৪২০

পঞ্চানন দাসের কড়চার অপর একটি অংশের প্রতিলিপি ৪২১

[অন্যান্য বিশিষ্ট বাউল-গুরু ও সাধকের চিত্রের জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের চিত্রসূচী দ্রষ্টব্য]

বাংলার বাউল ও বাউল গান

প্রথম খণ্ড

বাংলার বাউল

প্রথম অধ্যায়

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য

কোনো শব্দের প্রকৃত অর্থ সেই ভাষায় ব্যবহারদৃষ্টে প্রকৃতভাবে নির্ণয় করা যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে—বিশেষভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে এই 'বাউল' শব্দটির বহু ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ প্রথম আমরা এই শব্দটির ব্যবহার দেখি। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর যে কয়খানি পুঁথি মিলাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার সম্পাদনা করিয়াছিল, তাহার একটি পুঁথিতে যে অতিরিক্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।[১]

এই 'খ' পুঁথির লিপিকাল বাংলা ১২৪৮ সন। ইহাকে যদি আমরা লিপিকারের নিজস্ব সংযোজন বলিয়া সন্দেহও করি এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে[২] এই শব্দটির প্রচলন নাও থাকিতে পারে বলিয়া মনে করি, তবুও ইহার পরবর্তী কালে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে[৩] 'চৈতন্যচরিতমৃত'-এ সাত-

---

১। "মুকুল (ত) মাথায় চুল　　ন্যাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে যুঝে রণে।
বিকটান কাড়ি রায়　　বলে মাংস কাড়ি খায়
রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে।"

(কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্করণ, পৃঃ ৫২৯)

২। "তের শ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন।"

৩। রচনাকাল আনুমানিক ১৫৮০-৮১ খৃষ্টাব্দ। ("চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল লইয়া মতভেদ থাকিলেও গ্রন্থটি যে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১২৫)

আটবার এই শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাই।[৪] চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বৈষ্ণব সহজিয়া-তত্ত্ব ও সাধন-প্রণালী-সমন্বিত 'রাগাত্মিকা' পদের মধ্যেও 'বাউল' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।[৫]

এখন এই রাগাত্মিকা পদের চণ্ডীদাসের সময়-নিরূপণ খুব সহজ ব্যাপার নয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুঁথি-আবিষ্কারের পর হইতে চণ্ডীদাস-সমস্যা নানা অনুমান, মতবাদ ও বাগ্‌বিতণ্ডার আবর্তে ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। চণ্ডীদাস-সমস্যার সহিত প্রত্যক্ষভাবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনো সম্বন্ধ না থাকিলেও সহজিয়া-তত্ত্ব ও সাধন-প্রণালীর পদগুলির সহিত

৪। "গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল—ইহাঁ আজি হোতে
বাউল্যা বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে।"
(চৈতন্যচরিতামৃত, আদির ১২ পরিচ্ছেদ)

"প্রভু কহে, বাউলিয়া ঐছে কাঁহে কর?" (ঐ)

"কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়?"
(চৈ-চ, মধ্যের ২য় পরিচ্ছেদ)

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাউল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।"
(ঐ, মধ্যের ১৬ পরিচ্ছেদ)

"আমি ত বাউল আন্ কহিতে আন্ কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্যস্রোতে আমি যাই বহি।"
(ঐ, মধ্যের ২১ পরিচ্ছেদ)

"নীবিবন্ধ পড়ে খসি বিনামূলে হয় দাসী
বাউলী হঞা কৃষ্ণপাশে যায়।"
(ঐ, অন্ত্যের ১৭ পরিচ্ছেদ)

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ।"
(ঐ, অন্ত্যের ১৯ পরিচ্ছেদ)

"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল"।
ইত্যাদি (ঐ, অন্ত্যের ১৯ পরিচ্ছেদ)

৫। "শুন মাতা ধর্মমতি বাউল হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী?"
(মণীন্দ্রমোহন বসু-সম্পাদিত রাগাত্মিকা পদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পদ নং ৫, পৃঃ ৬১)

বিশেষ সম্বন্ধ আছে ; সুতরাং এই পদগুলির রচয়িতা চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই ধারণায় পৌঁছাইতে হইলে চণ্ডীদাস-সমস্যা অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়ে, এবং ইহাকে পরিহার করিলে আলোচনার পূর্ণতা ও ব্যাপকত্ব নষ্ট হয় বলিয়া মনে হয়।

কোনো মতবাদের স্বেচ্ছাকৃত পক্ষাবলম্বন না করিয়া চণ্ডীদাস-সমস্যার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে 'রাগাত্মিকা' পদের চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল যাহা সমীচীন মনে হয়, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর অনুপম রস-মাধুর্য বাংলা-সাহিত্যের গৌরবের বস্তু ও বাঙালী পাঠকের আদরের ধন। "সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম", "বঁধু কি আর বলিব আমি", "রাধার কি হ'ল অন্তর-ব্যথা", "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার", "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা" প্রভৃতি পদগুলি বাঙালী পাঠকের চিত্তে এক অনির্বচনীয় ভাবের তরঙ্গ তোলে। এই পদগুলির ও অন্যান্য পদের ভণিতায় চণ্ডীদাস-নামধারী একটিমাত্র বাঙালী কবির পরিচয় জানিয়া তাহাকেই আমরা শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত এই মনোভাবই আমাদের চলিয়াছে।

পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয় রাধাকৃষ্ণপদাবলীর এক প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়া ১৩২৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। এই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পদগুলিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' বা শুধু 'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতা আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে এতকাল ধরিয়া প্রচলিত পদগুলি তাহাতে নাই। প্রচলিত পদে আমরা 'বড়ু চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' বা কেবল 'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতা পাইয়াছি, কিন্তু সেই সব পদের একটি পদও আমরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর মধ্যে পাই না, দুই-একটি পদ মাত্র অনেক পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়।[৬]

তখনই প্রশ্ন জাগে—এ চণ্ডীদাস কে ? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর চণ্ডীদাস-পদাবলী ও প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর মধ্যে ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকে যে সুস্পষ্ট প্রভেদ, তাহা কাহারো দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার নয়। তবে চণ্ডীদাস কি দুইজন ? এখন হইতেই চণ্ডীদাস-সমস্যার উদ্ভব হইল।

৬। একটি পদ—

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী" (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তৃতীয় সংস্করণ পৃঃ ১৩১)

ও আরো একটি পদ পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলী-সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (পরে ডক্টর) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর মুহ্‌ম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীদাস-সমস্যা লইয়া নানা সময়ে নানা স্থানে আলোচনা করিয়াছেন।

১৩৪১ সালে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু 'দীন চণ্ডীদাস' নামে আর এক কবির রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কতকগুলি পদ 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করেন। তাহাতে আমরা জানি যে, 'দীন চণ্ডীদাস' নামে আর এক কবি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আমরা পদাবলীর মধ্যে 'বড়ু চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস' ও শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতা পাইতেছি। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে—চণ্ডীদাস কয়জন ?

ভণিতায় চণ্ডীদাসের বিশেষণে 'বড়ু', 'দ্বিজ', 'দীন' আমরা পাইয়াছি এবং বিশেষণহীন কেবল 'চণ্ডীদাস'-ভণিতাও পাইয়াছি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ৪১৫টি পদের মধ্যে ২৮৯টিতে অর্থাৎ ৭০ ভাগে 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর ভণিতা দেখা যায়। তাহার মধ্যে ৭টি পদের ভণিতায় 'আনন্ত' বা 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' আছে।[৭] সম্প্রতি কোনো কোনো পণ্ডিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর মধ্যে 'বড়ু চণ্ডীদাস' 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' ও 'চণ্ডীদাস' নামক তিনটি কবির রচনার ইঙ্গিত করিয়াছেন। ডক্টর সুকুমার সেন পাঁচটি বিভিন্ন ভণিতার ইঙ্গিত করিয়াছেন।[৮] কিন্তু ভাব, ভাষা ও ছন্দের বিচারে এই তিন বা পাঁচ ভণিতার পদের মধ্যে বিশেষ কোনো লক্ষণীয় পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, 'অনন্ত' বা 'আনন্ত' চণ্ডীদাসেরই নামের একটা অংশ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ দেখা যায়, শব্দের আদিস্থিত 'অ-কার' অনেকস্থলে 'আ-কার' হইয়াছে ; বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণ লোকের এইরূপ উচ্চারণ-প্রবণতাও ইহার কারণ হইতে পারে ; হয়তো এইভাবে 'অনন্ত'-স্থলে 'আনন্ত' হইয়াছে। ডক্টর মুহ্‌ম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ বলেন,—"কবির প্রকৃত নাম অনন্ত,

৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ২২, ২৪, ২৫, ৮৪, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪। ৭টি পদের মধ্যে 'আনন্ত' ৪ বার এবং 'অনন্ত' ৩ বার।

৮। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬২, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৫। ডাঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২।

তাঁহার কৌলিক উপাধি বড়ু এবং চণ্ডীদাস তাঁহার দীক্ষাগ্রহণান্তর গুরুদত্ত নাম।"[৯] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর সম্পাদক বলেন,—"খুব সম্ভব কবির প্রকৃত নাম অনন্ত এবং ডাক-নাম চণ্ডীদাস।"[১০]

চণ্ডীদাস যতজনই হউন, অধিকাংশ পণ্ডিতেরই মত এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কবিই আদি চণ্ডীদাস। তাঁহার উপাধি বড়ু। এই বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাব ও ভাষা যে দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাব ও ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহা কোনো পাঠকেরই দৃষ্টি এড়ায় না। আবার 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর ভণিতাযুক্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বাহিরে অনেক খণ্ড খণ্ড প্রচলিত পদ আছে, ভাব ও ভাষা বিচার করিলে সেগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পদ অপেক্ষা পরবর্তী কালের বলিয়া মনে হয়। সে পদগুলি যে ধারাবাহিক পালা-রচয়িতা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বড়ু চণ্ডীদাসের নহে, তাহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। সেগুলি হয়তো অন্য চণ্ডীদাসের অথবা এক বা একাধিক অজ্ঞাতনামা কবি বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছে।

এখন এই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কবি বড়ু চণ্ডীদাসের কাল নির্ণয় করিতে হইলে মোটামুটি চারিটি ধারায় ইহার বিচার চলিতে পারে :

(ক) লিপিকাল

(খ) ভাষা ও ব্যাকরণ

(গ) ভাব

(ঘ) আভ্যন্তরিক প্রমাণে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, যাহা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বাহিরে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদাবলীতে নাই।

(ক) ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর লিপি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, উহাতে "একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় ;—১। প্রাচীন হস্তাক্ষর, ২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি, ৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর···। কেবল যে সমস্ত পত্রে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত পত্রের অক্ষরাবলী পরীক্ষিত ও আলোচিত হইল।"[১১] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর এই প্রাচীনতম হস্তাক্ষরের কাল সম্বন্ধে তিনি

৯। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ৬০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৯

১০। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর টীকা, পৃঃ ২০৬

১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর ভূমিকা, পৃঃ ২৶০

বলিয়াছেন,—"১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।"[১২]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে-শূদ্রপদ্ধতির অক্ষরের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর অক্ষরের তুলনা করিয়াছেন, সেই শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল ১৪৪২ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৫২০ খৃষ্টাব্দ), বিক্রমাব্দ নয়। রাখালদাস বাবু শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল ১৪৪২ শকাব্দকে বিক্রমাব্দ মনে করিয়া ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর লিপিকাল স্থির করিয়া ভুল করিয়াছেন।[১৩] 'বোধিচর্যাবতার' রাখালদাস বাবুর আলোচিত গ্রন্থষটকের অন্যতম। ইহার লিপিকাল ১৪৯২ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দ। এই অনুসারে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর লিপিকাল ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে।

পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত ১৩৮৭ শকের (১৪৬৫ খৃঃ) একখানি 'হরিবংশ'-এর পুঁথি-দৃষ্টে বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, উহার অক্ষর অপেক্ষা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর অক্ষরসমূহ প্রাচীন। " 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুঁথিখানা খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে লিপীকৃত হইয়া থাকিবে বলিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না।"[১৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'বিষ্ণুপুরাণ'-এর অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পুঁথির লিপিকাল ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুঁথি ১৪৫০—১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল।[১৫] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিমত এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুঁথি "১৫৫০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। বরং পরে পূর্বে নয়।"[১৬] ডক্টর সুকুমার সেন ১৬২২ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'গীতগোবিন্দ'-এর পুঁথির সহিত তুলনা করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর লিপিকাল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী বলিয়া মনে করেন।[১৭]

এই পণ্ডিতগণের মতানুসারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর প্রাচীনতম লিপির কাল

১২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে-এর ভূমিকা পৃঃ ২।/০

১৩। সা - প—প, ১৩২৬, পৃঃ ৮২

১৪। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভূমিকা—দ্বিতীয় বারের সম্পাদকীয় বক্তব্য, পৃঃ ১৷০

১৫। সা—প—প, ১৩৪২, পৃঃ ২২

১৬। সা—প—প, ১৩৪১, পৃঃ ২৪

১৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫

১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পড়িতেছে। এখন অধিকাংশ লিপিতত্ত্ববিদের মতানুসারে এই লিপির কাল আমরা আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টাব্দ ধরিতে পারি। অনেকেই জানেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুঁথিতে নানা লিপিকর-প্রমাদ ও পাঠ-বিকৃতি আছে। সুতরাং ইহা যে কবির রচনার বহু পরবর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর যুগ্ম-সম্পাদক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর সুপরিচিত পদটি—"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী"র সহিত নীলরতন মুখোপাধ্যায়, রমণীমোহন মল্লিক প্রভৃতি সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ধৃত পাঠের সহিত তুলনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—"দুই এক স্থলে কৃ-কী-ধৃত পাঠ অপেক্ষা অন্য পাঠগুলি অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয়; ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, কৃ-কী-র পুঁথি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক নহে, ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক অন্য পুঁথি ছিল।"[১৮]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুঁথির লিপিকাল হইতে কবি বড়ু চণ্ডীদাস অন্ততঃ একশত হইতে দেড়শত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন—এইরূপ অনুমান করা যায়। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের জীবৎকাল মোটামুটি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধরিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-আবিষ্কৃত 'চণ্ডীদাস-চরিত' নামক পুঁথিতে অনেক অপ্রামাণিক কিংবদন্তী থাকায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ইহা বিশেষ নির্ভরযোগ্য না হইলেও কবিরাজের পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়ে উল্লিখিত চণ্ডীদাসের আবির্ভাব-কাল আমাদের অনুমানের সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। ঐ রাজবংশের যে পরিচয় দেওয়া আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ১২৭৫ শকে অর্থাৎ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে হামীর উত্তর ছাতনায় রাজা হন এবং ১৩২৬ শক অর্থাৎ ১৪০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই হামির উত্তরের রাজত্বকালে ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন।[১৯] এই 'চণ্ডীদাস-চরিত'-এ চণ্ডীদাস সুলতান সিকন্দর শাহ্ কর্তৃক

১৮। চণ্ডীদাস-পদাবলী, ভূমিকা, পৃঃ ৫

১৯। "বাসান্ধি বিশিখ শকে হামির উত্তর লোকে
সামন্তের কন্যা দিয়া রাজ্য দিল দান।
তাহারি সৌভাগ্যক্রমে বাসলী সামন্তভূমে
শিলামূর্তি ধরিয়া হলেন অধিষ্ঠান।

পাণ্ডুয়ার দরবারে আহূত হন বলিয়া উল্লেখ আছে। সিকন্দর শাহের রাজত্বকাল ১৩৫৭—৯৩ খৃষ্টাব্দ। হাম্বির উত্তরের রাজত্বকালও ১৩৫৩—১৪০৪ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব-কাল যে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে, ইহা আমাদের অনুমানের সঙ্গে মিলিয়া যায়। বিদ্যানিধি মহাশয় এই সব প্রমাণে চণ্ডীদাস ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[২০] ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন,—"আমরা ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম ও ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু অনুমান করিতে পারি।"[২১]

(খ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা ও ব্যাকরণে যে প্রাচীনত্বের লক্ষণ আছে, তাহা সুবিদিত। এইরূপ শব্দ ও বিভক্তিপ্রয়োগ মধ্যযুগের আর কোনো কাব্যে পাওয়া যায় না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর সম্পাদক সুপণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।[২২] ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[২৩] ও অন্যান্য পণ্ডিতও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন,—"কৃ-কী-র পুরাতন শব্দ ও বিভক্তি প্রত্যয় লক্ষ্য করিলে কবিকে (১৩৫০ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা) আরও পুরাতন মনে হয়। কিন্তু কবির দেশ স্মরণ করিলে উক্ত কাল (১৩৫০ খৃষ্টাব্দ) অসম্ভব হয় না।"[২৪]

পাষণ্ডদলন হেতু ভবাব্ধিতরণে সেতু
রচে যবে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলা।
বিদ্যাপতি তদ্ভুত্তরে গাইল মিথিলাপুরে
হরিপ্রেমরসগীতি নাহি যার তুলা।
ব্রহ্মকাল কর্ণ (কর্ম) অরি শকে সিংহাসনোপরি
বসে বীর হাম্বির সে হাম্বিরনন্দন।
সংগ্রামে যবনে তাড়ি বঙ্গরাজ্য নিল কাড়ি
অভিষেক দিল তার জনৈক ব্রাহ্মণ।"

(চণ্ডীদাস-চরিত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৩৩-২৩৪ ;
পূর্বে প্রকাশিত প্রবাসী, ১৩৪৩, আষাঢ়, পৃঃ ৩৪১)

২০। সা—প—প, ১৩৪২, পৃঃ ৩০

২১। সা—প—প, ১৩৬০, পৃঃ ৪৪

২২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ভূমিকা, পৃঃ ১।০—১।০

২৩। **The Origin and Development of the Bengali Language—Pages 127-130.**

২৪। সা—প—প, ১৩৪২, পৃঃ ৩১

(গ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে চিত্র আমরা পাই, তাহা অকর্ষিত মনের স্থূল দেহাকাঙ্ক্ষার চিত্র বলিয়া মনে হয়। ভাবাংশে এবং কাব্যাংশেও তাহা উজ্জ্বল নয়। 'দ্বিজ চণ্ডীদাস,' শুধু 'চণ্ডীদাস' বা 'বড়ু চণ্ডীদাস'-নামধারী কবির যে-সমস্ত খণ্ড খণ্ড পদ আমরা এতকাল দেখিতেছি, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, ভাবের গভীরতায়, প্রেমের তন্ময়তায় ও রসের বৈচিত্র্যে সেগুলি অনবদ্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পদ ও এগুলি যে এক গোত্রের নয়, তাহা নৈমিত্তিক পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ যে কেবল 'গীতগোবিন্দ'-এর কয়েকটি পদের অনুবাদের আভাস আছে তাহা নয়, প্রেমের গভীরত্ব ও তন্ময়ত্ব-বর্জিত কেবল দেহকেন্দ্রিক প্রেমের কাব্যবিলাসে ইহা 'গীতগোবিন্দ'-এরই সমগোত্রীয়।

(ঘ) ডক্টর মুহ্‌ম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন—যাহা চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত অন্য পদের মধ্যে পাওয়া যায় না। সেগুলি উদ্ধৃত করা হইল—"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনও স্থানে 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস বা 'দীন' চণ্ডীদাস নাই। (২) সর্বত্র 'গাএ' বা 'গাইল' আছে; কোথাও 'ভণে' 'কহে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। (৩) ভণিতা কখনও উপান্ত চরণে হয় না। (৪) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতামাতার নাম সাগর ও পদুমা বলিয়াছেন। (৫) বড়ু চণ্ডীদাস রাধার কোনও সখী বা শাশুড়ী-ননদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'বড়ায়ি' ভিন্ন কোনও সখীকে সম্বোধন করেন নাই। (৬) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী, প্রতিনায়িকা নহেন। (৭) বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখার নাম উল্লেখ করেন নাই। (৮) বড়ু চণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম অর্থে 'নেহ' বা 'নেহা' ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল চারিস্থলে 'পিরিতী' শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ। (৯) বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে 'বিনোদিনী' এবং শ্রীকৃষ্ণ-অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই। (১০) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকা গোয়ালিনীমাত্র, রাজকন্যা নহেন। (১১) অধিকন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের নিকট ব্রজবুলি অপরিচিত। এইগুলির কষ্টি-পরীক্ষায় চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।"[২৫]

এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর চণ্ডীদাস যে প্রাক্-চৈতন্য-যুগের, সে বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিতই একমত।

২৫। সা—প—প, ১৩৩০, পৃঃ ৩৩

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন,—"আমাদের অনুমান আদি চণ্ডীদাস বা বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের প্রায় দেড়শত বৎসরের পূর্ববর্তী।"[২৬]

বড়ু চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী এবং তিনি যে চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করিতেন, তাহার নিদর্শন বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়। 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-এ তিনবার ইহার উল্লেখ আছে।[২৭] জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যেও চণ্ডীদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৮] নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস'-এও চণ্ডীদাসের গানের কথা আছে।[২৯] চৈতন্যদেব যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর আদি বা বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন করিতেন, তাহার প্রমাণ চৈতন্যদেবের শিষ্য সনাতন গোস্বামীর ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী'তে পাওয়া যায়:

"কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।[৩০]

'দ্বিজ' চণ্ডীদাস বা 'দীন' চণ্ডীদাস-ভণিতাধারী কোনো কবির

২৬। চণ্ডীদাস-পদাবলীর ভূমিকা, পৃঃ ।৵৹

২৭। (ক) "বিদ্যাপতি, জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।" (আদির ১৩প)

(খ) "চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।" (মধ্যের ২ প)

(গ) "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।" (মধ্যের ১০ প)

২৮। "জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ।

"জয়ানন্দের কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫

২৯। "সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত।"

"আনুমানিক ১৬০০ খৃষ্টাব্দে রচিত"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫

৩০। বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী ১০।৩০।২৬। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'র ভূমিকা, পৃঃ ৯৫ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর ভূমিকা (তৃতীয় সংস্করণ), পৃঃ ২৲

দানখণ্ড বা নৌকাখণ্ডের পদ নাই। ইহা খুব সম্ভব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর দানখণ্ড নৌকাখণ্ড প্রভৃতি নানা খণ্ডের উল্লেখ বলিয়া মনে হয়।

'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'-তে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকারের বর্ণনামূলক পদ আছে।[৩১] চণ্ডীদাস-চরিতেও বিদ্যাপতিকে চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের অভিমত এই যে, বিদ্যাপতি ১৩৯০ হইতে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন এবং তিনি চণ্ডীদাস অপেক্ষা বয়সে আনুমানিক ২০ বৎসরের ছোট ছিলেন।[৩২] শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর সম্পাদক পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়েরও এই মত যে, বিদ্যাপতি ১৩৮০ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন এবং চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।[৩৩] শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকারের যে কয়টি পদ আছে, সে সম্বন্ধে ভারতীয় ভাষার বিশেষজ্ঞ গ্রিয়ারসন সাহেব বলেন যে, তাহার প্রথম দুইটি সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির রচিত।[৩৪]

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে এই অনুমানই খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর কবি চণ্ডীদাসই আদি চণ্ডীদাস এবং তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী। প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত যে কতকগুলি পদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই ভাব, ভাষা ও অন্যান্য বিচারে যে আদি চণ্ডীদাসের নয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ধারাবাহিক পালা-রচয়িতা আর এক কবি দীন চণ্ডীদাস। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্পাদক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বলেন,—"১৭০০ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।"[৩৫] তিনি মনে করেন যে, দীন চণ্ডীদসের পদগুলিই দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিয়াছে। এদিকে তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে দীন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক ভণিতায় 'বাসলী'র কোনো উল্লেখ নাই। অথচ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বহু পদের

৩১। ২০৮৮—৯১ সংখ্যক পদ

৩২। **Indian Historical Quarterly,** 1944, Pages 211-216—'The date of Vidyapati' নামক প্রবন্ধ।

৩৩। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ১৬৪, ১৬৬-৬৭ এবং সা—প—প, ১৩৩৭, পৃঃ ৫৫

৩৪। **Indian Antiquary,** 1885, page 193.

৩৫। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ২য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৩৸০

মধ্যে বাসলীর উল্লেখ আছে। দীন চণ্ডীদাসের যে দুইটি পদে[৩৬] বাসলী ও রজকিনীর উল্লেখ আছে, সেই দুইটি পদ সম্বন্ধে বসু মহাশয় নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতেও এই দুইটি পদ আছে।[৩৭] সেখানে দীন চণ্ডীদাসের কোনো ভণিতা নাই। নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংকলনেও দীন চণ্ডীদাসের কোনো ভণিতা নাই।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন,—"দীন চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করিয়াছেন, যেমন বড়ু চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত রচনা ভিন্ন কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার বই রচনা করেন নাই। দীন, দ্বিজ (এবং বড়ু) চণ্ডীদাসের মধ্যে এই পার্থক্য তাঁহাদের রচিত পদগুলির সম্বন্ধে একটি দিগ্‌দর্শনীর কার্য করিবে।"[৩৮] এই মন্তব্যটি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার পদ-রচয়িতাদের বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে খণ্ড খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত পদ-রচয়িতা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' এবং শুধু 'চণ্ডীদাস'। কতকগুলি পদে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে বটে, কিন্তু ইহারা একই গোত্রের বা একই প্রকারের মনে হয়। এই খণ্ড খণ্ড পদের মধ্যেই আমরা চণ্ডীদাসের কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই। সহজ-ভজনের তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতির পদগুলিও খণ্ড খণ্ড। ইহাতেও শুধু 'চণ্ডীদাস' 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' এবং কয়েকটিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর ভণিতা আছে এবং কতকগুলিতে কাব্য-সম্পদেরও অভাব নাই।

ডক্টর সুকুমার সেনের অভিমত এই যে, বড়ু চণ্ডীদাস এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস অভিন্ন এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তিনি মনে করেন,— "চণ্ডীদাস ও চৈতন্য সমসাময়িক হইতে পারেন স্বচ্ছন্দে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার শেষ জীবনে যাঁহাদের পদ শুনিতে ভালোবাসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীদাস একজন।...চণ্ডীদাসের জীবংকাল ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের এ দিকে হইবে না।"[৩৯] তিনি

৩৬। ৫৩২নং পদ "বাশুলী নিকটে চণ্ডীদাস রটে
এমন কাহার কাজ।"
৫৩৩নং পদ "ধোবিনী সঙ্গতি চণ্ডীদাস গীতি
রচিল আনন্দ বটে।"

৩৭। ৬৪৪নং ও ৬৪০নং পদ

৩৮। সা—প—প, ১৩৬০, পৃঃ ৪৯

৩৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-১৬৮

'দ্বিজ চণ্ডীদাস'-ভণিতাযুক্ত দুইটি পদে চৈতন্যদেবের উল্লেখ দেখিয়াছেন। তাহার একটি প্রসিদ্ধ পদ—"আজু কে গো মুরলী বাজায়"; দ্বিতীয় পদটি ডক্টর সেন কৃষ্ণদাসের অদ্বৈত কড়চাসূত্রের একখানি পুঁথিতে পাইয়াছেন। কিন্তু ভাব, ভাষা, ব্যাকরণ ও অন্যান্য আভ্যন্তরিক প্রমাণে বড়ু চণ্ডীদাস যে বিভিন্ন, এই ধারণাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে। ডক্টর সেন দ্বিজ চণ্ডীদাসের সহিত এক বাঙালী বিদ্যাপতির মিলনের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উহাদের ভাব ও লিখনভঙ্গীতে মনে হয় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলনের জনশ্রুতি-অবলম্বনে পরবর্তী-কালে কোনো কবি কর্তৃক রচিত।

এ বিষয়ে আমাদের অনুমান এই যে, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদগুলি চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রচিত হইয়াছিল।

প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যে প্রেমলীলা দেখিতে পাই, তাহা প্রাকৃত প্রেমলীলার উর্ধ্বে উঠিয়া এক অপার্থিব আলোকে উজ্জল হইয়া শোভা পাইতেছে। রাধার যে মূর্তি চণ্ডীদাস অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এক আধ্যাত্মিক দীপ্তিতে মহিমময়। রাধা-ভাবের এই অনবদ্য পরিণতি চৈতন্য-পরবর্তী যুগেই সম্ভব। চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনই এই রাধা-প্রেমের বাস্তব অভিব্যক্তি—রাধা-ভাবের জীবন্ত ভাষ্য। কৃষ্ণপ্রেমে রাধার যে বিহ্বলতা, যে তন্ময়তা, যে উন্মাদনা, ইন্দ্রিয়গ্রামের উর্ধ্বগত যে অলৌকিক চেতনা আমরা পদাবলীর মধ্যে দেখি, চৈতন্যদেবের দৈনন্দিন জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনী-গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৪০] চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে আমরা সাহিত্যরস-

৪০। "শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্তি হয় নিরন্তর।
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে।
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময় বাদ।
রোমকূপে রক্তোদগম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে।"
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যের ২ পরিচ্ছেদ)

"স্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ।
নানাভাবে বিবশতা, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য।

আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার অধ্যাত্ম-রস আস্বাদন করি। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার এই আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নতি চৈতন্ত-পরবর্তী সময়েই সম্ভব। স্বরূপ-গোস্বামী, রূপ-গোস্বামী, সনাতন-গোস্বামী, জীব-গোস্বামী, প্রভৃতি গোস্বামী-পাদগণের রচনার মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার একটু আলোচনা করিতে হইলে বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণাদিতে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ ও তাঁহাদের প্রেমলীলা সম্বন্ধে যে কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ, বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলির রচনার কাল সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোনো পণ্ডিতই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই এবং উহাদের মধ্যে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে বলিয়া অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৪১]

যে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, সে-টি 'ভাগবত-পুরাণ'। ইহাতে বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি নানা পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে গোপীগণের সহিত মাধুর্যলীলারও বর্ণনা আছে। মাধুর্য-লীলার চরম প্রকাশ রাসলীলায়। ভাগবতের দশম স্কন্ধে সেই রাসলীলার বর্ণনায় দেখা যায় রাধার কোনো উল্লেখ নাই। একটিমাত্র শ্লোকে ইহার অপরোক্ষ উল্লেখ

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায়।
সুবর্ণ পর্বত যেন ধরণী লোটায়।"

(ঐ, মধ্যের ১৩ পরিচ্ছেদ)

"ভাবাবেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জনীতে ভূমি লিখে অধোমুখ হইয়া।"

(ঐ, মধ্যের ১৩ পরিচ্ছেদ)

আরও দ্রষ্টব্য অন্ত্যলীলার ১৪ পরিচ্ছেদ হইতে ২০ পরিচ্ছেদ

৪১। "The *Purāṇas* have been added to from time to time and the texts have undergone such corruption that no one can be positively certain that a particular chapter was not interpolated in comparatively recent times. E.g. the *Vāyu Purāṇa* known to the *Mahābhārat* was different from our present text. The passages from the *Purāṇa* quoted in the epic do not agree with the corresponding passages of the extant work. What is true of the *Vāyu* is also true of the *Matsya, Vishnu, Bhāgavata* and *Brahma-Vaivartha Purāṇas*. . . . . the extant *Purāṇa* texts are unreliable."—**Materials for the Study of The Early History of the Vaishnava Sect,**—Dr. Hemchandra Roychowdhury, Page 178.

আছে বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলার সময় সহসা অন্তর্হিত হইলেন, তখন গোপীগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে বন-প্রদেশের একস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্নের সহিত আর একটি গোপীর পদচিহ্ন দেখিয়া সেই গোপীকে উপলক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছিল,—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ" ॥ (১০।৩০।২৪)

[ইহার দ্বারা (এই রমণীর দ্বারা) নিশ্চয়ই ভগবান ঈশ্বর হরি আরাধিত হইয়াছেন; যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীত হইয়া ইহাকে এই নিভৃতস্থানে আনিয়াছেন।]

এখন এই 'অনয়ারাধিতঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় সনাতন গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রাধার উল্লেখ আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।[৪২] ভাগবতকার কৃষ্ণ-প্রিয়তমা এক প্রধানা গোপীর উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র; মনে হয় তখনও ধর্ম্ম-সাহিত্যে রাধার নাম প্রবেশ করে নাই। 'খিল-হরিবংশ'-এ সংক্ষেপে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা বর্ণিত আছে, কিন্তু সেখানে প্রধানা গোপীর কোনো উল্লেখ নাই। 'বিষ্ণুপুরাণ'-এ ভাগবতের অনুরূপ সংক্ষিপ্ত রাস-বর্ণনা আছে; সেখানেও রাধার উল্লেখ নাই, আছে ঐরূপ কৃষ্ণ-প্রিয়তমা এক পুণ্যবতী গোপীর উল্লেখ।[৪৩] ভাগবত-

৪২। "অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন স্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দর্শিতং।"—বৈষ্ণবতোষণী টীকা

"নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ" ইত্যাদি—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াই কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত-এ বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।"

(আদির ৪ পরিচ্ছেদ)

৪৩। "কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ॥
পুষ্পাবচয়মাত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রানি পদান্যত্র মহাত্মনঃ॥
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো যয়া॥"

"আরও দেখ, কৃষ্ণের সহিত কোন পুণ্যবতী রমণী মদালসভাবে গমন করিয়াছে, তাহার এই সকল নিবিড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে।

কারের অনুকরণেই মনে হয়, 'রাধিত' বা 'আরাধিত' শব্দটির পরিবর্তে 'অভ্যর্চিত' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। 'পদ্মপুরাণ'-এ অনেকস্থলে রাধার উল্লেখ আছে। কিন্তু গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গে রাধার কোনো উল্লেখ নাই। অথচ রাধার মহিমা-কীর্তন বহুভাবে করা হইয়াছে! কৃষ্ণের আত্মা প্রকৃতি রাধিকা, রাধিকার কোটি কোটি অংশের এক অংশ দুর্গাদি ত্রিগুণাত্মিকা দেবীগণ, রাধিকার পদধূলি-স্পর্শে কোটি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন।[৪৪] তাঁহাকে শাক্ত-তন্ত্রের মহাশক্তির ধাঁচে কল্পনা করা হইয়াছে। রাধা-কৃষ্ণই প্রকৃতি-পুরুষ।[৪৫] রূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ পদ্মপুরাণ হইতে রাধার একটি মাত্র উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৪৬] ইহাতে সাধারণভাবে সকল গোপীর মধ্যে রাধাকে বিষ্ণুর 'অত্যন্তবল্লভা' বলা হইয়াছে। এই 'পদ্মপুরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ'—যাহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার অনেক জমকালো উপাখ্যান পাওয়া যায়—প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের যথেষ্ট সংশয় উদ্রেক করিয়াছে।[৪৭] 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অনেক বর্ণনা আছে, কিন্তু কোনো বৈষ্ণব গোস্বামীই ইহার নামোল্লেখ করেন নাই।

'মৎস্য-পুরাণ'-এ রাধার নামমাত্রের একটু উল্লেখ আছে। দক্ষ প্রজাপতি কোন্ কোন্ তীর্থে দেবীকে পাওয়া যাইবে, জিজ্ঞাসা করায় দেবী তাঁহার মূর্তি কোন্ কোন্ তীর্থে কিরূপে প্রতিভাত হইবে, তাহার নাম বলিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন

"সখি, এই স্থানে দামোদর উচ্চ হইয়া পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ এই সমস্ত স্থানে তাঁহার পদের অগ্রভাগই চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে।"

"পূর্বজন্মে যে ভাগ্যবতী পুষ্প দ্বারা সর্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর অভ্যর্চনা করিয়াছিল, ভগবান্ এখানে বসিয়া তাহাকে পুষ্প দ্বারা সাজাইয়াছেন, তাহার এই চিহ্ন দেখ।" (৫।১৩।৩২—৩৪, বঙ্গবাসী সং)

৪৪। "তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ।
তস্যাঃ পাদরজঃস্পর্শাৎ কোটিবিষ্ণুঃ প্রজায়তে।"
(পাতালখণ্ড, ৩৮ অধ্যায়, ১২০, বঙ্গবাসী সং)

৪৫। "পুরুষ-প্রকৃতী চাদ্যৌ রাধা-বৃন্দাবনেশ্বরৌ।"
(ঐ, ৪৪ অধ্যায়)

৪৬। "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।"
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যের ১৮ প)

৪৭। বর্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ইহার রচনা-প্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী-মনসার কথা আছে।" (কৃষ্ণচরিত্র)

তার্থে যে-সব শক্তিদেবী বিরাজ করিবেন, তাহারই দীর্ঘ তালিকার শেষে রাধার নাম আছে।[৪৮] এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কোনো লীলার বর্ণনা নাই। এইরূপ 'বরাহপুরাণ',[৪৯] 'বায়ুপুরাণ'[৫০] প্রভৃতির দুই একটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার কতটুকু প্রাচীন আর কতটুকু অর্বাচীন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ রাধার প্রাচীনত্ব-প্রমাণের জন্য উপনিষদ্ ও তন্ত্রাদি হইতে দুই-একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সময় ও অকৃত্রিমতা-নির্ণয় সম্ভব নয়। রূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি'র রাধা-প্রকরণে বলিয়াছেন,—

"গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্ গান্ধর্বীতি বিশ্রুতা।
রাধেত্যৃক্‌পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা॥"

অর্থাৎ 'গোপালোত্তরতাপনী'তে রাধা গান্ধর্বী নামে বিশ্রুতা, 'ঋক্-পরিশিষ্টে' রাধা মাধবের সহিত উদিতা।

কিন্তু এই 'গোপালোত্তরতাপনী' উপনিষদ্ Winternitz-এর বিভাগে চতুর্থ বিভাগের অন্তর্গত। বোম্বাই-এর নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত ১১২ খানা উপনিষদের ৯৯ সংখ্যক উপনিষদ 'গোপালোত্তরতাপনী'। ইহা চতুর্দশ কি পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া কোনো কোনো পণ্ডিতের মত।[৫১]

সুতরাং দেখা যায়, পুরাণ ও তন্ত্রাদি ধর্মগ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের একান্ত মাধুর্যময় যুগল-লীলার কোনো নিদর্শন নাই এবং এমন কোনো ভিত্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া চণ্ডীদাস-পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম চিরন্তন নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর এমন কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

রাধা-কৃষ্ণের এই মধুর যুগল-লীলার বহু নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য এবং অলংকার-শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

৪৮। "রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।" (১৩।১৮, বঙ্গবাসী সং)

৪৯। "তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারণম্।
স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ।
রাধাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্বপাপহরং শুভম্।" (১৬৪।৩৩—৩৪, বঙ্গবাসী সং)

৫০। "রাধা-বিলাস-রসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্।
শ্রুতবানস্মি বেদেভ্যঃ যতস্তদ্‌গোচরোঽভবৎ।
এবং ব্রহ্মণি চিন্মাত্রে নির্গুণে ভেদবর্জিতে।" (১০৪।৫২—৫৪, বঙ্গবাসী সং)

৫১। দ্রষ্টব্য A History of Indian Philosophy—Dr. S. N. Das Gupta, Vol. I, Page 28.

হালের প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রেম-কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ 'গাহা-সত্তসঈ' ('গাথা-সপ্তশতী')-তে রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের সুস্পষ্ট প্রেমলীলার একটি কবিতা সংকলিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র বা সাতবাহন-বংশীয় রাজা হাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গোদাবরী-তীরে প্রতিষ্ঠানপুরে রাজত্ব করিতেন বলিয়া কথিত আছে।[৫২] এই গাথাগুলির ভাষা বিচার করিয়া কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, এইগুলি তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে রচিত। বাণভট্ট তাঁহার 'হর্ষচরিত'-এ এই সাতবাহন রাজার গাথার উল্লেখ করিয়াছেন।[৫৩] বাণভট্ট ছিলেন হর্ষের সভাসদ্। সুতরাং তাঁহাকে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক বলা যায়। অতএব এই গাথাগুলি যে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ভট্টনারায়ণ-রচিত 'বেণীসংহার'-নাটকের নান্দী শ্লোকে রাসের সময়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা-মূলক একটি বর্ণনা আছে।[৫৪] আলংকারিক বামন তাঁহার

৫২। "মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এতাণঁ বলবীণং অন্নাণঁ বি গোরঅং হরসি॥" ১।৮৯
["মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্।
এতাসাং বল্লবীণামন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥"]

"হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের দ্বারা (ফুঁ দিয়া) রাধিকার (মুখসংলগ্ন) গোরজ (ধূলিকণা) অপনয়ন করিয়া এই বল্লবীগণের এবং অন্যান্য নারীগণের গৌরব হরণ করিতেছ।"

ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত 'গাহা সত্তসঈ' (জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স)—ভূমিকা—পৃঃ ৸৴০

৫৩। "অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

প্রথম উচ্ছ্বাস, অবতরণিকা শ্লোক, ১৩

"লোকে যেমন বিশুদ্ধজাত রত্নের দ্বারা কোষ (ধন-কোষ) নির্মাণ করে, সাতবাহন রাজাও সেইরূপ সুভাষিতের দ্বারা অবিনাশী এবং অগ্রাম্য কোষ (কোষকাব্য—বিভিন্ন কবিতারাজির সংগ্রহ-পুস্তক) নির্মাণ করিয়াছিলেন।"

৫৪। "কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গ[illegible]শ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদ্গতে—
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥"

"যমুনাপুলিনে রাসবিহারকালে প্রণয়কুপিতা রাধা বিহার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেছেন। অশ্রুতে তাঁহার অঙ্গ প্লাবিত হইতেছে। কংসারি অনুনয় করিতে করিতে অনুগমন করিতেছেন। অগ্রগামিনী রাধার পদচিহ্নের উপরে কৃষ্ণের পদ স্থাপিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চের উদগম

অলংকার-গ্রন্থে ভট্টনারায়ণের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৫৪ক] যদিও ডক্টর সুশীলকুমার দে ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বামনকে নবম শতাব্দীর লোক বলেন, কিন্তু ডক্টর কীথ বামনকে অষ্টম শতাব্দীর লোক এবং ভট্টনারায়ণকে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বের কবি বলিয়া মনে করিয়াছেন।[৫৪খ]

আনন্দবর্ধনাচার্যের 'ধ্বন্যালোক' নামক বিখ্যাত অলংকার-গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলামূলক দুইটি চমৎকার শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়।[৫৫] এই গ্রন্থ নবম শতাব্দীর রচনা। ইনি কাশ্মীররাজ অনন্তবর্মার (খৃঃ ৮৫৫-৮৮৪) সমসাময়িক। একাদশ শতাব্দীর আলংকারিক কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিত' নামক অলংকার-গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' একখানি সংস্কৃত-কবিতার সংগ্রহ-পুস্তক। ইহাতে

হইয়াছে। রাধা স্থির হইয়া কৃষ্ণের এই অবস্থাটি দেখিতেছেন। কৃষ্ণ রাধার সান্নিধ্য পাইয়া যে যকাতর ও নিরবচ্ছিন্ন অনুনয় করিতেছেন, সেই অনুনয় তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক।"

৫৪ ক। সূত্রালঙ্কারবৃত্তি (৪, ৩, ২৮)

৫৪ খ। Sanskrit Culture in Bengal—Dr. S. K. Dey (**History of Bengal**, Dacca University), Page 304.

কাব্যবিচার, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ২২

Sanskrit Drama—Dr. Keith, Page 212.

৫৫। "তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ।"

"হে ভদ্র, সেই গোপবধূগণের বিলাস-সুহৃৎ এবং রাধার গোপন সাক্ষী কালিন্দীতীরবর্তী লতাগৃহগুলির কুশল ত? স্মরশয্যা কল্পনবিধির জন্য ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।"—বৃন্দাবন প্রত্যাগত কোনো সখাকে প্রবাসী কৃষ্ণের জিজ্ঞাসা।

"যাতে দ্বারবতীং পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমাকূজিতম্।"

"মধুরিপু কৃষ্ণ দ্বারবতী চলিয়া গেলে তাঁহারই বস্ত্র দেহে জড়াইয়া এবং কালিন্দী-তটকুঞ্জের বঞ্জুল লতাগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া সোৎকণ্ঠা রাধা এমন গুরুবাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বিগলিত তারস্বরে গান গাহিয়াছিল যে, তাহাতে যমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া কূজন আরম্ভ করিয়াছিল।"

রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক কয়েকটি সুন্দর কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।[৫৬] এই গ্রন্থটি দশম শতাব্দীতে সংকলিত বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত বাক্‌পতি-লিপিতে রাধা-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব-ব্যঞ্জক একটি চমৎকার শ্লোক আছে।[৫৭] দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'ও একখানি সংগ্রহ পুস্তক। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা-সম্বন্ধে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে।[৫৮] ইহাতে পূর্ববর্তী কবিদের কবিতা এবং

৫৬। "ময়াম্বিষ্টো ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যাভিরভিসৃতঃ।
ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরে
ন কালিন্দ্যাঃ [কূলে] ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ।" (হরিব্রজ্যা, নং ৩৪)

"সখি, আমি এই সারা রাত্রি সেই ধূর্তকে অন্বেষণ করিয়াছি,—সে এইখানে থাকিতে পারে, ওখানেও থাকিতে পারে; নিশ্চয়ই সে অন্য গোপীর নিকট অভিসার করিয়াছে। মুররিপু কৃষ্ণকে আমি ভাণ্ডীর-তলে দেখি নাই, কালিন্দী-কূলে দেখি নাই, বেতসকুঞ্জেও দেখি নাই।"—রাধার প্রতি সখীর উক্তি।

"ধৌতং কেন বিলেপনং কুচযুগে কেনাঞ্জনং নেত্রয়ো
রাগঃ কেন তবাধরে প্রমথিতঃ কেশেষু কেন স্রজঃ।
তেনা [শেষজ] নৌঘকল্মষমুষা নীলাব্জভাসা সখি
কিং কৃষ্ণেন ন যামুনেন পয়সা কৃষ্ণানুরাগস্তব।" (অসতীব্রজ্যা, নং ৫১২)

"কুচযুগের বিলেপন কে মুছিয়া দিয়াছে? চোখের অঞ্জনই বা কে মুছিয়া দিল? তোমার অধরের রাগই বা কে মর্দিত করিল? কে নষ্ট করিল কেশের মালাগুলি? ইহা অশেষজনস্রোতের কল্মষনাশী নীলপদ্মভাসের দ্বারা। (হবে) ইহা কৃষ্ণের দ্বারা? 'না; সখি, যমুনার জলের দ্বারা'। 'বুঝিয়াছি), কৃষ্ণেই (কালো বস্তুতেই) তোমার অনুরাগ'।"—রাধার প্রতি সখীর বাক্য।

৫৭। "যল্লক্ষ্মীবদনেন্দুনা ন সুখিতং যন্নার্দিতং বারিধে
র্বারা যন্ন নিজেন নাভিসরসীপদ্মেন শান্তিঙ্গতম্।
যচ্ছেষাহিফণা সহস্রমধুরশ্বাসৈর্ন চাশ্বাসিতং
তদ্রাধাবিরহাতুরং মুররিপোর্বেল্লদ্বপুঃ পাতু বঃ।"

The Indian Antiquiry, 1877, Page 51.

"লক্ষ্মীর বদনেন্দু দ্বারা যাহা সুখিত হইতেছে না, বারিধির বারি দ্বারা যাহা প্রশমিত নয়, নিজের নাভিসরসীপদ্ম দ্বারাও যাহা শান্তি প্রাপ্ত হয় নাই, যাহা শেষসর্পের ফণাসহস্রের মধুর শ্বাসের দ্বারাও আশ্বাসিত হয় নাই, এমন যে মুররিপুর রাধা-বিরহাতুর কম্পিত বপু তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"

৫৮। "সংকেতী-কৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।

জয়দেব, উমাপতি ধর প্রভৃতি সমসাময়িক কবির—এমন কি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার পুত্র কেশব সেন প্রভৃতিরও রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক কবিতা স্থান লাভ করিয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ ও রাধিকাকে নায়ক-নায়িকা-রূপে অবলম্বন করিয়া কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' নামে এক স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সাহিত্যে ইহা প্রাক্-চৈতন্য-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, এই সব রচনার মূলে কোনো ধর্মের প্রেরণা ছিল না। ইহা ছিল নিতান্তই কাব্যগত প্রেরণা। শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্য-রচনাই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। বিষয়-বস্তু হিসাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে অবলম্বন করা হইয়াছে, যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণ, হর-গৌরীর প্রেম-লীলাও অনেক কবিতার বিষয়-বস্তু হইয়াছে। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলার কবিগণ যে বৈষ্ণব ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া এই সব কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা নয়। এই প্রেম-লীলার কাহিনী তাঁহাদের নিকট একটি বিষয়-বস্তু-মাত্র।[৫৯] তাঁহারা যেমন রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন, তেমন লৌকিক প্রেমেরও নানা কবিতা লিখিয়াছেন। কাব্যানুভূতিই তাঁহাদের রচনার মুখ্য উৎস, ধর্মানুভূতি যদি কিছু থাকে, তাহা গৌণ। যে 'গীতগোবিন্দ'-এ রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলার পূর্ণাঙ্গ

কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভজরতীনাদেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকেলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্বরী।" (হরিক্রীড়া, নং ৫)

"কংসদ্বিষ (কৃষ্ণ), রাধার গৃহে আসিয়া কোকিলাদির রবের অনুকরণ করিয়া রাধাকে সংকেত করার পর, (সংকেত শুনিয়া) দ্বারমোচনে উদ্যোগী রাধার চঞ্চল শঙ্খ-বলয়-শব্দ পাইয়া প্রগল্‌ভা বৃদ্ধার (জটিলা-কুটিলার) কে কে বলিয়া চীৎকার শুনিয়া, ব্যথিতহৃদয়ে রাধার গৃহপ্রাঙ্গণের কোণে অবস্থিত কেলিবিটপের ক্রোড়গত হইয়া রাত্রিযাপন করিল।"

মধ্যাহ্নদ্বিগুণার্কদীধিতিদলৎসম্ভোগবীথীপথ—
প্রস্থানব্যথিতারুণাঙ্গুলিদলং রাধাপদং মাধবঃ।
মৌলৌ স্রক্‌শবলে মুহুঃ সমুদিতস্বেদে মুহুর্বক্ষসি
ন্যস্য প্রাণয়তি প্রকম্পবিধুরৈঃ শ্বাসোর্মিবাতৈর্মুহুঃ।" (দিবাভিসারিকা, নং ৪)

"মধ্যাহ্নের দ্বিগুণ সূর্যতাপে তপ্ত সম্ভোগবীথীপথে গমনশীল অরুণবর্ণ পুষ্পদলের মতো কোমল রাধার পদ ব্যথিত হইয়াছে। রাধার সেই পদ কৃষ্ণ বারংবার মাল্যবিভূষিত মস্তকে, কখনো বা ঘর্মশীতল বক্ষে রাখিতেছেন এবং প্রকম্পবিধুর শ্বাসোর্মিবাতের দ্বারা উপশমিত করিতেছেন।

৫৯। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৩৪, ১৩৫

রূপ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অপেক্ষা কাব্যের আবহাওয়াই স্ফুটতর।[৬০] বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। অধ্যাত্ম সুর অপেক্ষা 'বিলাস-কলা'র সুরই ইহার মধ্যে বেশি বাজিতেছে, যাহাকে আমি পূর্বে 'কাব্য-বিলাস' বলিয়াছি, উভয় গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য তাহাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং দেখা যায়, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক কবিতা একান্তভাবে সাধারণ প্রেম-কবিতাকেই ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক কবিতার ভাব, রস ও প্রকাশভঙ্গী ভারতীয় সাধারণ কবিতার ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে।

রাধা-কৃষ্ণ-লীলা প্রেম-কবিতার বিষয়-বস্তু হিসাবে জন-প্রিয়তা লাভ করিবার মূলে আছে দুই কারণ,—একটি, পল্লীর মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে রাখাল-যুবক কৃষ্ণের সহিত আভীর-তরুণীদের প্রেম-লীলা রাখালিয়া-গান-রূপে আভীর জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, পরে গান-ছড়ার মাধ্যমেই এই বহু-বিচিত্র প্রেম-লীলার উপাখ্যান ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং নানাভাবে পল্লবিত হইয়া পুরাণগুলির মধ্যেও স্থান লাভ করে। লাস্যময়ী, সুন্দরী আভীর-যুবতীগণের সহিত এক রাখাল-যুবকের স্বাধীন প্রেম কাব্য-রচনার পক্ষে একটি আকর্ষণীয় বস্তু। অপরটি,—দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সেন-রাজগণের প্রভাবে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে বৈষ্ণব-ধর্ম ও রাধাকৃষ্ণ-বাদের প্রসার ঘটিতে থাকে। কবিগণ এই রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে কাব্যের বিষয়বস্তু করিয়া একাধারে দেব-লীলা-বর্ণনার আত্মপ্রসাদ ও মানবীয় প্রেমের অতি সূক্ষ্ম লীলা-বৈচিত্র্য প্রদর্শনের কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারিতেন। তাই রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-কবিতার জন-প্রিয়তা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং শেষে প্রেম-কবিতা-রচনায় 'কানু ছাড়া আর গীত নাই'—অবস্থার উদ্ভব হইল। তাই, বাংলা-সাহিত্যে প্রাচীন যুগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলার গীতি-কবিতা একাধিপত্য করিয়াছে।[৬১]

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের রাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের সৃষ্টি। রাধার এই আধ্যাত্মিক প্রসাধন ও উন্নতি চৈতন্যদেবের সমসাময়িককালে বা তাঁহার কিছু পরবর্তী কালে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। চৈতন্য-পরবর্তী সময়ে সাধারণ

৬০। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৩৬, ১৩৭

৬১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১১০, ১৩৪ ও ১৩৫

প্রেম-কবিতার ভাব, রস, ও রচনা-শৈলীকে ভিত্তি করিয়াই বৈষ্ণব গোস্বামিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। অলংকার-শাস্ত্রের নায়ক-নায়িকার বর্ণনা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানসিক অবস্থা ও প্রেম-চেতনা তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই। সেই পূর্বরাগ, সেই মুগ্ধা, ধীরা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, মধ্যা-প্রগল্‌ভা, স্বকীয়া, পরকীয়া, বামা, খণ্ডিতা, মানিনী, বিরহিণী, বাসক-সজ্জা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, অভিসারিকা প্রভৃতি নায়িকা ও ধীর, ধীরোদাত্ত, ধীরললিত প্রভৃতি নায়ক রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বর্ণনায় ব্যবহার করিয়াছেন। রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বল-নীলমণি' নামে বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের এক বৃহৎ গ্রন্থই রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন।

একান্তভাবে মানবীয় প্রেম-কবিতা কিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ রাধা-কৃষ্ণ-লীলার নামে চালাইয়া দিয়াছেন, তাহার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নিম্নোক্ত এই সংস্কৃত কবিতাটি।—

> "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
> স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
> সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
> রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

[যে আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল (অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে যাহার সহিত মিলন হইয়াছিল), সে-ই (আজ) আমার বর (বিবাহিত পতি); (আজও) সেই চৈত্র-রাত্রি, সেই বিকশিত মালতীর সুরভি, সেই কদম্ব-কাননের মন্দ মন্দ বায়ু, আমিও সে-ই আছি ; তথাপি সেই রেবা-নদীতটের বেতসী-তরু-তলে যে সমস্ত সুরত-ব্যাপার-লীলা-বিধি (প্রাক্‌-বিবাহাবস্থায়), তাহার জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।]

এইটিই 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর সেই বিখ্যাত শ্লোক, যাহা মহাপ্রভু জগন্নাথ-দর্শনে দুই বার পাঠ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেখিয়া মনে করিলেন যে, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, কিন্তু রথের অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাইতেছেন। নৃত্য-কালে উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটি আওড়াইতেছিলেন।[৩২]

৩২। "যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥...
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এ ভাব অন্তর।
এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক।" ('যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটি)

দ্বিতীয়বারও মহাপ্রভু জগন্নাথ-দর্শনে নৃত্য করিতে করিতে এই শ্লোকটি আওড়াইয়াছিলেন।৬৩ রূপ গোস্বামী তাঁহার সংকলিত সংগ্রহ-পুস্তক 'পদ্যাবলী'তে এই শ্লোকটিকে নির্জনে সখীর প্রতি রাধার বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঠিক

"এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ॥
প্রভু মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ-গোসাঞী।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া।"

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যের ১ম পরিচ্ছেদ)

৬৩। "নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর॥
('যঃ কৌমারহর' ইতি শ্লোকঃ)
এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনা কেহ অর্থ না বুঝে ইহার॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে ব্যাখ্যান॥
পূর্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পায়া আনন্দিত মন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সেই ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া ধুয়া গাওয়াইল॥
অবশেষে রাধাকৃষ্ণ কৈলা নিবেদন।
'সেই তুমি সেই আমি সেই নব-সঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাতি-ঘোড়া-রথ-ধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পবন ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
ইহাঁ রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন॥
ব্রজে আমার সঙ্গে সেই সুখ-আস্বাদন।
সে-সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ॥
আমা লইয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে'॥"

(চৈ, চ, মধ্যের ১৩ পরিচ্ছেদ)

ইহার পরেই রাধার উক্তি-স্বরূপ অনুরূপ ভাবের একটি স্বরচিত কবিতা সন্নিবেশ করিয়াছেন,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥"৩৮৭॥৬৪

[সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে (অর্থাৎ তাহার সহিত মিলন-লাভ করিলাম); আমিও সে-ই রাধা, আমাদের পরস্পর মিলন-জনিত সুখও তাদৃশ ; কিন্তু তথাপি যেখানে মধুর মুরলীর পঞ্চম-স্বরের খেলা হইত, সেই যমুনা-তীরস্থ নিকুঞ্জ-বনের জন্য আমার মন স্পৃহা করিতেছে।]

কিন্তু 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি সংগ্রহ-পুস্তকে এই কবিতাটি 'অসতীব্রজ্যা' (নং ৫০৮) ও 'অসতী' (নং ৩) পর্যায়ে অসতী-প্রেমের অন্যান্য কবিতার সহিত স্থান পাইয়াছে। ইহার রচয়িতা অজ্ঞাতনামা। কোনো কোনো সংগ্রহ-গ্রন্থে ইহার রচয়িতা হিসাবে মহিলা-কবি শীলা ভট্টারিকার নাম পাওয়া যায়। কিছু পাঠান্তরও লক্ষ্য করা যায়। রাধা-কৃষ্ণের সহিত মূলে এই কবিতার কোনো সম্বন্ধ নাই। রূপ গোস্বামী ও অন্যান্য গৌড়ীয় গোস্বামিগণ ইহাকে রাধা-কৃষ্ণ-লীলার সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে রাধার উক্তিতে উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু মূলে এইটি নিতান্ত মানবীয় প্রেমের কবিতা এবং অসতী নারীর উক্তি বলিয়া গৃহীত। 'মানিনী-ব্রজ্যা' বা 'নায়কে মানিনীবচনম্'-পর্যায়ের আর একটি কবিতা—"কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ" ইত্যাদি রূপ গোস্বামী "অথ রহস্যনুনয়ন্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যং" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনাটুকু হইতে আমরা সঙ্গতভাবে এই অনুমান

৬৪। "এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন॥—
'রাজবেশ, হাতী-ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপবেশ, কাঁহা নির্জন বৃন্দাবন।
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ'॥"
(মধ্যের—১ প)

করিতে পারি যে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার আবহাওয়া প্রধানতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের সৃষ্টি।

এখন সহজ-ভজনের পদ বা 'রাগাত্মিকা'-পদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই পদগুলিতে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', শুধু 'চণ্ডীদাস' এবং কয়েকটিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর ভণিতা আছে। তবে অন্যান্য পদের সহিত ইহাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। চণ্ডীদাস-পদাবলীর প্রচলিত সংস্করণে যে-সব পদ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণব পদের সহিত সহজিয়া-মতের সম্বন্ধযুক্ত পদের মিশ্রণ আছে। যে 'পীরিতি'র পদগুলি চণ্ডীদাস-পদাবলীর বহু-পরিচিত পদ, তাহার মধ্যে কোন্‌টি সহজিয়া-মতের পদ আর কোন্‌টি শুদ্ধ বৈষ্ণব-পদ, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন।[৬৫] আবার সহজ-ভজন-প্রণালী ও রাগাত্মিকা-পদের অন্তর্গত দুই-একটি পদকেও শুদ্ধ বৈষ্ণব-পদের অন্তর্গত করা যায়।

এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন,—একটি বাসলী দেবী, অপরটি রজকিনী রামী। বাসলী দেবীই চণ্ডীদাসকে সহজ-ভজন শিক্ষা দিয়াছেন এবং 'রজক-ঝিয়ারী' রামীকে সাধন-সঙ্গিনীভাবে গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং রামীকেও চণ্ডীদাসের সঙ্গে 'প্রবর্তিত' হইতে উপদেশ দিয়াছেন। আদি বা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ আমরা বাসলী দেবীর বহু উল্লেখ পাই।

৬৫। "পীরিতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণে মিলাইতে জানে
তবে সে পীরিতি ভাল।...
মনের সহিত করিয়া পীরিতি
থাকিব স্বরূপ-আশে।
স্বরূপ হইতে ও রূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।"

"পীরিতি পীরিতি মধুর পীরিতি
এ তিন ভুবনে কয়।
... ...
স্বরূপ প্রভাবে সে রূপ মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।"

"পীরিতি নগরে বসতি করিব"...ইত্যাদি

"পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর, এ তিন ভুবন সার"...ইত্যাদি

বাসলী দেবীর চরণ শিরে ধরিয়া বা বাসলীর বরে চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় দ্বিজ চণ্ডীদাসও বাসলী দেবীর সেবক ছিলেন; আবার 'বড়ু' বা 'দ্বিজ' বিশেষণহীন শুধু চণ্ডীদাসেরও অনেক পদে বাসলীর উল্লেখ আছে। কেবল 'দীন' চণ্ডীদাসের প্রামাণিক ভণিতাতে বাসলী দেবীর উল্লেখ নাই।[৬৬]

এখন এই বাসলী দেবী কে? বাসলী শব্দটি বিশালাক্ষীর অপভ্রংশ হইতে পারে, আবার বজ্রেশ্বরী বা বাগীশ্বরী শব্দ হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে।[৬৭] নান্নুরের (বীরভূম) বাসলী দেবী চতুর্ভুজা সরস্বতী-মূর্তি, আর ছাতনার (বাঁকুড়া) বাসলী চণ্ডী-মূর্তি। নান্নুরের বাসলী-মূর্তি—'পুস্তকাক্ষমালিকাহস্তা, বীণাহস্তা সরস্বতীর প্রস্তরময়ী প্রতিমা। পাদপীঠে উপাসক। তৎপার্শ্বে খোদিত উৎপলোপরি দেবীর দক্ষিণচরণ বিন্যস্ত।'[৬৮] ছাতনার বাসলী-মূর্তি—'দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও খর্পর—দুই-ই ধাতু-নির্মিত, প্রশান্ত হসিতবদনা, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুণ্ড-মালা, নূপুর-শোভিত চরণদ্বয়ের বামটি শয়ান এক অসুরের মস্তকোপরি স্থাপিত। দেবীর দুইপার্শ্বে দুই সহচরী।'[৬৯] বাসলী বা বিশালাক্ষী দেবী যে চণ্ডীর এক মূর্তি-বিশেষ, তাহা হিন্দুর তন্ত্রাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁহার 'তন্ত্রসার'-গ্রন্থে 'আদি-যামল' হইতে বিশালাক্ষীর মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাদি গ্রহণ করিয়া সন্নিবেশ করিয়াছেন।[৭০] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, বাস্থলী ও বিশালাক্ষী ধর্মের দুই পৃথক আবরণ-দেবতা।[৭১] বাস্থলীর ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র এইরূপ,—

৬৬। পূর্বের ৩৫।৩৬ দ্রষ্টব্য

৬৭। বজ্রেশ্বরী—বজ্জসরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী; বাগীশ্বরী—বাইসরী—বাসরী—বাসলী

৬৮। 'চণ্ডীদাস ও বাসলী দেবী',—বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন, ১৩৪০

৬৯। 'ছাতনায় চণ্ডীদাস',—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৩

৭০। ধ্যান— "ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাং।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গখেটকধারিণীম্।
নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং।...
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্।"

(তন্ত্রসার, বসুমতী সং (৩য়), পৃঃ ৩০৪)

৭১। এশিয়াটিক সোসাইটির ৫৩৮ সংখ্যক তালপাতার পুঁথি। পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। (বসন্তরঞ্জন রায়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর ভূমিকা. পৃঃ ৷৶০)

"ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্তযুক্তা পদকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং
বাশুলী পাতু সা নঃ॥ ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।
ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকা"...ইত্যাদি[১২]

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বলেন,—"এক সময়ে গৌড়-বঙ্গে বজ্রযান বৌদ্ধদের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। এই সম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামক শক্তির কল্পনা করেন। তাঁহারা প্রধান প্রধান প্রচার-কেন্দ্রগুলিতে বজ্রসত্ত্ব ও বজ্রেশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন।"[১৩]

বিশালাক্ষী হিন্দুদের শক্তি-দেবী, বজ্রেশ্বরী বৌদ্ধদের শক্তি-দেবী, এখন বাগীশ্বরীর স্বরূপ কি দেখা যাক।

অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ ধৃত 'মালিনীবিজয়' তন্ত্রে কলিতে পূর্ণফলপ্রদা মহাবিদ্যা-সকলের মধ্যে বাসলীর নাম করা হইয়াছে।[১৪] গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে প্রাচীর-গাত্রে একস্থানে চতুর্ভুজা সরস্বতীর মূর্তি আছে। ঐ মূর্তি 'বাসিরী' নামে পরিচিতা।[১৪ক] চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী বা সরস্বতী যে বৌদ্ধমূর্তি, ইহা বিশেষজ্ঞগণ বলেন। অবলোকিতেশ্বরের পরে যে দেবতা বৌদ্ধজগতে লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন, তিনি মঞ্জুশ্রী। মহাযান-মতাবলম্বীদের ধারণা, তিনি বিদ্যা, জ্ঞান ও সংস্কৃতির অধিষ্ঠাতা-দেবতা। বৌদ্ধ-শাস্ত্রানুসারে ইনিই প্রথম বোধিসত্ত্ব। মঞ্জুশ্রীর পূজা গুপ্তযুগেই বাংলায় প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ মহাস্থানগড়ে 'বলাইধাপ'-স্তূপের নিকট আবিষ্কৃত মঞ্জুশ্রীর ব্রোঞ্জ-নির্মিত মূর্তি।[১৫] মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী বা বাগীশ্বরী। তিনিও স্বামীর মতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী। ঢাকা সোনারঙে প্রাপ্ত

১২। শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ পুস্তক পৃষ্ঠা ১০২-৩

১৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর ভূমিকা, পৃঃ ৫০

১৪। "কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যা সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ।"
সরস্বতী,—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃষ্ঠা ৯৮

১৪ক। সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃষ্ঠা ৯৯

১৫। বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬ এবং **Early Sculpture of Bengal**—S. K. Saraswati. Page 20.

ও রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত ধাতু-নির্মিত বৌদ্ধ-সরস্বতী বা বাগীশ্বরী-মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য।[১৬]

চণ্ডীদাসের বাস-স্থান নান্নুরেই হোক, আর ছাতনাতেই হোক, তিনি যে শক্তি-দেবীর উপাসক ছিলেন, তাহাই মনে হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ রাধিকা বড়াইকে বলিতেছে,—

"বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবে দরশনে।"

চণ্ডীর প্রতি চণ্ডীদাসের ভক্তির একটা সূত্র-রূপে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর উপরে উদ্ধৃত লাইন কয়টিকে গণ্য করা যাইতে পারে। 'চণ্ডীদাস'-নামের মধ্যেও তাঁহার পিতামাতার চণ্ডী-ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শক্তির উপাসক হইয়া তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিলেন কেন? ইহার প্রথম কারণ, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলা কাব্যের বিশেষ উপযোগী বিষয়। ধর্ম-মত যাহার যাহাই হউক না কেন, কাব্য-রচনায় কাব্যের উপযোগী বিষয়ই কবির দৃষ্টি সর্বাগ্রে আকর্ষণ করে। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও একথা খাটে, তিনি যে বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নয়। আর একটি কারণ—শক্তির পূজা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো-না-কোনো রূপে ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া চলিয়া আসিতেছিল। শক্তিবাদ, তান্ত্রিক আচার-ব্যবহার ও যোগ-ক্রিয়া ধর্মের একটা বিশেষ অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল। এই সময়ে হিন্দু-তন্ত্র ও বৌদ্ধ-তন্ত্র উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মিশ্রণ হইয়াছিল।[১৭] বাংলার ধর্মোপাসনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শক্তিতত্ত্ব—এক অদ্বয় পরমপুরুষের পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দ্বিধা-বিভক্তি—প্রকারান্তরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে শিব-দুর্গা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, উপায়-প্রজ্ঞা, বজ্রসত্ত্ব-বজ্রেশ্বরী, কৃষ্ণ-রাধা-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ সকল দেবতারই একটি শক্তি কল্পনা করা হইয়াছে এবং উহাদের মিলনাত্মক সাধনাই কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অবশ্য বাংলার উচ্চশ্রেণীর সামান্য-সংখ্যক

১৬। বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ১৩৮

১৭। 'ছদ্মবেশে দেবদেবী'—ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, (হরপ্রসাদ-সংবর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড তৃতীয় প্রবন্ধ) এবং Introduction to **Sakti-Samgam Tantra**, Third Part, (G.O.S., No. CIV, Page 10).

লোকের মধ্যে বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম বা তন্ত্রেতর বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই তান্ত্রিক ধর্মই ছিল অধিকসংখ্যক লোকের ধর্ম—গণ-ধর্ম। সেন-রাজবংশের সময়েই রাধা-কৃষ্ণবাদ শিব-শক্তিবাদ বা প্রজ্ঞা-উপায়বাদকে পিছনে ফেলিয়া গণ-মানসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় চণ্ডীদাসের সাধন-সঙ্গিনী রজকিনী রামী। হিন্দু-তন্ত্রানুসারে সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়,[৭৮] বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মতেও সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়[৭৯] এবং বৈষ্ণব সহজিয়া-সাধনেও সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়।[৮০] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর কোথাও রামীর উল্লেখ নাই এবং সহজ-ভজনের

৭৮। "নটী কাপালিকা বেশ্যা পুক্কশী নাপিতাঙ্গনা।
রজকী রঞ্জকী চৈব সৈরিন্ধ্রী চ সুবাসিনী।...
বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতা সর্বা এব কুলাঙ্গনাঃ।"
—কুমারীতন্ত্র (তন্ত্রসারে উদ্ধৃত, বসুমতী ৩য় সং, পৃঃ ৪৫৫)

৭৯। গুরুর নিকট প্রথম দীক্ষা-গ্রহণের সময় মুদ্রা-সমভিব্যাহারে দীক্ষাগ্রহণ করিতে হয়,—
"নবযৌবনসম্পন্নাং প্রাপ্য মুদ্রাং সুলোচনাম্।
স্রকচন্দনসুবস্ত্রাদৌস্তু বয়িত্বা নিবেদয়েৎ॥
গন্ধমাল্যাদিসৎকারৈঃ ক্ষীরপূজাদিবিস্তরৈঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজ্য যত্নেন মুদ্রয়া সহ নায়কম্॥"
—প্রাজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধিঃ, অনঙ্গবজ্র, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৬-৭ শ্লোক

৮০। "পরকীয়া রতি যাহারে কহয়ে
সেই সে আরোপ সার।
তোমার আরোপ রজক-ঝিয়ারী
রামিনী নাম যাহার॥" (রাগাত্মিকা-পদ)

"যাহা কহি বাণী শুনহ রামিনী
একথা ভুবন-পার।
পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার॥
চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে নিত্যধামে যাবে
আমার বচন ধর॥" (ঐ)

পুরুষ প্রকৃতি, দোঁহে এক রীতি, সে রতি সাধিতে হয়।
পুরুষেরি যুতে, নায়িকার রীতে, যেমতে সংযোগ প্রায়॥ (ঐ)

আশ্রয় লইলে সিদ্ধ রতি মিলে কখন বিফল নয়। (ঐ)

কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। তবে একটি পদ অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ইঙ্গিত বহন করে বলিয়া মনে হয়। পদটি এই,—

"অহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই॥
মূল কমলে কয়িলে মধু পান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেয়ান॥
দূর আহুসর সুন্দরি রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী॥
ইড়া, পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী॥
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট॥[৮১]"

সহজ-সাধনের মূল ভিত্তি যোগক্রিয়া। গূঢ় যোগক্রিয়ার দ্বারা নিজের পরমানন্দময় সত্তার উপলব্ধিই ইহার প্রকৃত সাধনা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনার মধ্যে হঠযোগমূলক একটি পদ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। ইহাতে কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেন যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বড়ু চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন।[৮২] একটি মাত্র পদের উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে কোনো অভিমত দেওয়া যায় না। তবে সহজিয়া ধর্ম যে নবম-দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ধর্ম-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। পূর্বের বৌদ্ধ-সহজিয়া-মত দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বৈষ্ণব-সহজিয়া-মতে রূপান্তরিত হয়। সাধন-পদ্ধতি মূলতঃ উভয়েরই সমান। কেবল প্রজ্ঞা-উপায় স্থলে রাধা-কৃষ্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে,—'যুগনদ্ধ' স্থলে 'যুগল-মিলন' ধর্মের আদর্শের স্থান লাভ করিয়াছে। বাংলার রাজপুরুষগণও যে সহজধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি তাম্রশাসনে। পট্টিকেরক-রাজ রণবঙ্কমল্লের ময়নামতী-তাম্রশাসনে দেখা যায় যে তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশবর্ষে, ১২২০ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার প্রধানমন্ত্রী সহজধর্মী 'শ্রীধবি-এব'

৮১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—রাধাবিরহ, পৃঃ ১৪১-৪২

৮২। "ইহাতে মন পবন, মূল কমল, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, দশমী দুয়ার—পারিভাষিক শব্দগুলি হঠযোগ ও সহজযানে প্রচলিত। ইহাতে মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন।"

ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সা-প-প, ৬০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১)

কর্তৃক দেবী-দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত এক বৌদ্ধ সংঘারামের জন্য বেদ্রথণ্ড গ্রামে ভূমিদান করিতেছেন।[৮৩] পট্টিকেরা নগর বর্তমান কুমিল্লা সহরের পশ্চিমে ময়নামতী পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে অবস্থিত ছিল ঐতিহাসিকেরা ঐরূপ অনুমান করেন। এখন ঐস্থানে ঐ নামে একটা পরগণা আছে। এই বৌদ্ধ-সহজিয়া ধর্ম ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবসহজিয়াধর্মে রূপান্তরিত হইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলাদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগছী বলেন, চণ্ডীদাসই বাংলায় সহজিয়া-মতবাদ সম্বন্ধে প্রাচীন লেখক এবং তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। চণ্ডীদাসের লেখা অনেক পরিবর্তিত আকারে আমাদের নিকট আসিয়াছে, এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ সহজিয়া মতবাদের বিশেষ কিছু না পাওয়া গেলেও, বৌদ্ধ সহজযানের মূল তত্ত্বগুলি পরবর্তী চণ্ডীদাস পদাবলীর মধ্যে এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ পরম দেবতা এবং রাধা তাঁহার শক্তি, হঠযোগের ক্রিয়া বাদ দেওয়া হয় নাই এবং শেষে রজকিনী-প্রসঙ্গও যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী সহজিয়া গ্রন্থে নাড়ী, চক্র প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে, যাহা বজ্রযান ও সহজযানের অনুরূপ কথা মনে করাইয়া দেয়।[৮৪] মনে হয়, ডক্টর বাগছী 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ঐ হঠযোগমূলক পদটির উপর ডক্টর শহীদুল্লাহের মত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ডক্টর বাগছী আরও বলেন, চৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামিগণ সহজ-ধর্মের প্রসার রোধ করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সহজ-ধর্মের দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই প্রভাবান্বিত হন। অবশ্য ডক্টর বাগছী ইহার কোনো প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই। তবে মনে হয়, 'রাগমার্গে ভজন',[৮৫] 'পরকীয়া ভাব',[৮৬] 'আশ্রয় ও বিষয়',[৮৭] 'সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রূপ কৃষ্ণ'[৮৮] প্রভৃতিতে সহজিয়া ভাবের কিছু প্রভাব পড়িতেও পারে, যদিও গোস্বামিগণ নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়া এই সম্ভাবনাকে দূরবর্তী করিয়াছেন। তবে একথা সত্য যে চৈতন্যদেবের কিছু পরবর্তী সময়েই প্রকৃতি-পুরুষের গভীর যোগ-

৮৩। Mainamati Copper Plate—(**Indian Historical Quarterly, IX**, page 282).

৮৪। The Development of Religious Ideas—Dr. P. C. Bagchi (**History of Bengal,** Vol. I D.U., Chapter XIII, pages 424-425).

৮৫। "রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম-কর্ম" (চৈ, চ, আদির চতুর্থ)

৮৬। "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস" (ঐ)"

৮৭। "সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'"। (ঐ)

৮৮। "রসময়মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার" (ঐ)

মিলনের বাণী লইয়া বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বাংলার ধর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সময় অসংখ্য কড়চা, আগমগ্রন্থ ও নানা পদ রচিত হইয়াছে এবং চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সহজ-ভজনের পদও ঐ সময়ে রচিত হইয়াছে।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে,—

ক) চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলী চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রচিত।

খ) ইহা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামে কোনো কবির রচনা হইতে পারে, বা এক বা একাধিক অজ্ঞাতনামা কবি চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন এইরূপও হইতে পারে।

গ) সহজিয়া সাধনতত্ত্ব-সংবলিত ও সহজিয়া-গন্ধী পদগুলিতে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'চণ্ডীদাস' ও কতকগুলি পদে 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর ভণিতা আছে। এই পদগুলি এমনই ভাবে রচিত যে ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক বিচারে ইহাদের খুব একটা পার্থক্য পাওয়া যায় না।

ঘ) আদি বা বড়ু চণ্ডীদাসের সহজিয়া-সম্বন্ধের একটা প্রবল জনশ্রুতি থাকিতে পারে। পরবর্তীকালে সেই জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া এক বা একাধিক সহজিয়া-মতাবলম্বী কবি রামীর নাম যুক্ত করিয়া পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিতে পারেন। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় চণ্ডীদাসকে পুরাপুরি সহজিয়া বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, আবার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সহজিয়া-সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দিয়াছেন। সত্য, মনে হয়, উভয় চরম সিদ্ধান্তের মধ্যভাগে আছে।

ঙ) বাংলার গীতি-কাব্য-রাজ্যে এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যখন যে-কোনো কবি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যায়। চণ্ডীদাস-ভণিতায় অনেক বিশিষ্ট পদ 'পদকল্পতরু'তে অন্য ভণিতায় আছে।[৮৯]

চ) চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সহজিয়া-সাধনতত্ত্বের-পদগুলি চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পরে ১৬০০ খৃষ্টাব্দতক রচিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

এখন আমাদের মূল আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাক।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' হইতে চণ্ডীদাসের সহজ-তত্ত্বের পদ পর্যন্ত—অর্থাৎ মোটামুটি পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ

৮৯। মণীন্দ্রমোহন বসুর 'দীন চণ্ডীদাস পদাবলী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পর্যন্ত 'বাউল' শব্দটির ভাষায় প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—'বাহ্যজ্ঞানহীন', 'উন্মাদ', 'স্বাভাবিক চেতনাশূন্য' প্রভৃতি অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর দুইটি প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রথমটি এই,—অন্ত্যলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু স্বরূপ গোস্বামী ও রামানন্দ রায়ের নিকট তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ-দশার বর্ণনায় কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর নিজেকে 'মহাবাউল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।—

"দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিল গমন ;
মোর দেহ স্ব-সদন বিষয়ভোগ মহাধন
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন।"

মহাপ্রভুর মন শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া মহাবাউল নাম গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে।

এই উপমা-প্রয়োগে দৃশ্যতঃ ইহাই মনে হয় যে, বাউল-সম্প্রদায়ের কোনো এক বিশিষ্ট গুরু (মহাবাউল) যেমন গৃহ ছাড়িয়া শিষ্যগণ সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাপ্রভুর মন তাহার আবাস-গৃহ (অর্থাৎ নিজদেহ) ত্যাগ করিয়া বাউল-গুরুর বেশ ধারণ করিয়া দশেন্দ্রিয়-রূপ শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে যাইতেছে।

'নাম ধরি' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যবোধক। সর্বজন-পরিচিত কাহারো মতো সাজিয়া বা কাহারো অনুকরণ করিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করা এই কথাটির দ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে। কোনো বস্তুও সর্বজন-জ্ঞাত না হইলে উপমার বিষয়ীভূত হইতে পারে না বলিয়া মনে হয়। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যে-মূল সংস্কৃত শ্লোক-অবলম্বনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বাংলা ত্রিপদী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কাপালিকের কথা আছে, বাউলের কথা নাই। শ্লোকটি এইরূপ,—

"প্রাপ্ত প্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা,
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥"

["আমার মন বহুযত্নে প্রাপ্ত অচ্যুত-রত্ন পুনর্বার হারাইয়া দেহরূপ গৃহ পরিত্যাগপূর্বক কাপালিকের ব্রত অবলম্বন করতঃ ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যগণের সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে।"]

'গৃহীতকাপালিকধর্ম' এই ভাবটি সুন্দরভাবে সম্প্রসারিত করিবার জন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাপালিক ও মহাপ্রভুর চিত্তের মধ্যে উপমেয় ও উপমানের অংশগুলির অভেদ কল্পনা করিয়া একটি চমৎকার দীর্ঘ সাঙ্গ-রূপক রচনা করিয়াছেন।

কাপালিকের ধর্ম বৈদিক ধর্ম-বিরুদ্ধ (শৈব তন্ত্রানুসারে ইহাদের উপাসনা); ইহারা কর্ণে মহাশঙ্খের (চণ্ডালের কপালাস্থির) কুণ্ডল পরিধান করে; হস্তে লাউ-এর পাত্র, স্কন্ধে ঝুলি, দেহে কন্থা ও সর্বাঙ্গে চিতা-ভস্ম ধারণ করিয়া সশিষ্য সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায় ও ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করে। ইহাদের সঙ্গে থাকে নর-কপাল, তাহাতেই শিষ্যগণের দ্বারা সংগৃহীত এবং কাপালিনীর দ্বারা উচ্ছিষ্ট সুরা পান করে।

কাপালিকের এই অবস্থাগুলিকে উপমেয়ের স্বরূপ কল্পনা করিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-দশার অবস্থাগুলি বর্ণিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের সময়ে বাংলা দেশে কাপালিকগণ এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত কিনা কিংবা শ্লোক-রচয়িতা গোস্বামিপাদ সংস্কৃত সাহিত্য ও তন্ত্রাদিতে বর্ণিত কাপালিকগণের চিত্র স্মরণ করিয়াই কাপালিকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। মধ্যযুগে বাংলার সাহিত্যে বা ধর্মের ইতিহাসে এরূপ ভ্রমণশীল কাপালিকদের কোনো উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ মদ্য-মাংস দিয়া পূজার কথা আছে, লৌকিক দেব দেবী বিষহরী ও বাশুলীর পূজার কথাও আছে, কিন্তু এই প্রকার ধর্মোপাসকের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১০]

কাপালিকদের বর্ণনা আমরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পাই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত 'দশকুমারচরিতে'[১১] কাপালিকের চিত্র অঙ্কিত আছে। সেই কাপালিক রাজকন্যা কনকলেখাকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে হিউ-য়ান-সাং যখন ভারতে অবস্থান করেন, তখন ইহাদিগকে তিনি নর-কপাল-ধারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১০। "ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥......
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥"
—চৈতন্যভাগবত, আদি, ২য় অ

১১। Classical Sanskrit Literature—A. B. Keith. Page 67.

অষ্টম শতাব্দীতে রচিত[১২] ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে কাপালিকের একটা পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নগ্নদেহ, শব-ভস্মাচ্ছাদিত, ত্রিশূল-কমণ্ডলু-ধারী, মদ্য-পান-রত। ইহাদের সঙ্গে থাকে কাপালিনী। ভৈরবের কৃপায় ইহারা অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া দেব-মানব-যক্ষ-রক্ষগণের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে। নর-বলি ইহাদের সাধনার অঙ্গ। 'মালতীমাধব'-এর কাপালিক অঘোরঘণ্টা চামুণ্ডার উপাসক, কপালকুণ্ডলা তাহার শিষ্যা। নায়ক মাধব চামুণ্ডার মন্দিরে যাইয়া বলির জন্য সজ্জিতা বন্দিনী মালতীকে দেখিতে পায় এবং কাপালিককে হত্যা করিয়া নায়িকাকে উদ্ধার করে। নবম শতাব্দীতে রচিত রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'তেও এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।[১৩] কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-নামক রূপক-নাট্য একাদশ শতাব্দীতে রচিত।[১৪] ইহাতেও কাপালিকের বর্ণনা আছে। এই কাপালিক কপাল-পাত্র হইতে মদ্যপান করিতেছে। হরিহর প্রভৃতি দেবতাগণকে সে বশে আনিয়াছে এবং পার্বতীর মতো সুন্দরী কামিনীকে সে ভোগ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছে। এইরূপ বহু পূর্ব হইতেই কাপালিক সম্বন্ধে একটা ধারণা চলিয়া আসিতেছিল। এই তান্ত্রিকগণ বৈদিক আচার ও বৈদিক উপাসনা অবলম্বন করে না, ধর্ম ও নীতি-বিষয়েও ইহারা সাধারণ-সম্মত নিবৃত্তির পথ অনুসরণ করে না, ধর্ম-সাধনার চরম লক্ষ্য সম্বন্ধেও ইহাদের আদর্শ ভিন্ন। ইহারা একপ্রকার স্বাভাবিক-চেতনাহীন, উন্মাদ-স্বরূপ সম্প্রদায়। স্মৃতি-পুরাণাদিতে এই কাপালিকগণের যথেষ্ট নিন্দা আছে।[১৫] মনে হয়, পূর্বের সাহিত্যাদিতে প্রাপ্ত চিত্র হইতেই শ্লোক-রচয়িতা কাপালিকের বৈশিষ্ট্য বা আচরণ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়াছেন, তৎকালে বাংলায় এইরূপ একটি বাস্তব সম্প্রদাদের গতিবিধির উল্লেখ সমসাময়িক কোনো সাহিত্য বা ইতিহাসে দেখা যায় না।

এখন প্রশ্ন এই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আর এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকের তুলনা করিলেন কি? বাউলের ধর্মও ঐরূপ

১২। The Sanskrit Drama by Keith. Pages 186-87.

১৩। ১।২৩।২৪—'রন্তা চণ্ডা'...এবং 'মুক্তিং ভণন্তি' ইত্যাদি

১৪। The Sanskrit Drama by Keith. Page 251.

১৫। "কাপালিকা পাশুপতাঃ শৈবাশ্চ সহ কারুকৈঃ।
দৃষ্টাশ্চেদ্ রবিমীক্ষেত স্পৃষ্টাশ্চেৎ স্নানমাচরেৎ॥"—
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (আনন্দাশ্রম সং, পৃঃ ১৮)

বৈদিকাচার-বিরুদ্ধ, প্রচলিত ধর্ম ও নীতির আদর্শ হইতে ইহারা স্খলিত, আচার-ব্যবহারেও ইহারা অদ্ভুত—একরূপ উন্মাদ-সদৃশ। কাপালিক ও বাউল সে সময়ে কি অভিন্নার্থক ছিল? কৃষ্ণদাস কবিরাজের সময় বাউল-সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য আবির্ভাব হইয়াছিল কি? এই সব প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর দেওয়া কঠিন। অবশ্য বাউল-সম্প্রদায়ের অনেকে চৈতন্যচরিতামৃত-এর এই স্থানের 'মহাবাউল' ও 'নাম ধরি' শব্দ কয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং প্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের ব্যাখ্যা পক্ষপাতদুষ্ট মনে করে।

যাহোক, কোনো সাম্প্রদায়িক মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া যদি স্বাধীনভাবে একটু চিন্তা করা যায়, তবে 'মহাবাউল' ও 'নাম ধরি' কথাগুলি কোনো বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এখানে 'মহাবাউল' অর্থে 'মহা-উন্মাদ' ধরা যায়। মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহের দশ-দশা-বর্ণনায় উন্মাদ-দশার ব্যঞ্জনায় 'মহাবাউল' শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'নাম ধরি' কথাগুলি শব্দগত ব্যাখ্যা না করিয়াও সাধারণভাবে 'ঐরূপভাবে' বা 'মত'-অর্থেও ধরা যাইতে পারে।

এই উদ্ধৃত ত্রিপদী-অংশের শেষের দিকে পয়ারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥"

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে প্রবাস-বিপ্রলম্ভের দশ দশার বর্ণনা এইরূপ,—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥"

প্রোষিত-ভর্তৃকার এই দশ দশা সাঙ্গ-রূপকটির বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায়,—

'চিন্তাকন্থা'—চিন্তা; 'ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ'—জাগরণ; মনের কম্পমান ও অস্থির অবস্থাকে উদ্বেগ বলে,—দীর্ঘশ্বাস, চাপল্য, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, স্বেদাদি তাহার অভিব্যক্তি—এই খেদোক্তির সর্বত্রই উদ্বেগের চিহ্ন বর্তমান আছে; তানব অর্থে শরীরের ক্ষীণতা,—'ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর'—ইহাই তানব; 'ধূলিবিভূতিমলিনকায়'—এই স্থানে মলিনাঙ্গতা; 'প্রলাপ উত্তর'—এই স্থানে প্রলাপ; 'সন্তাপে বিহ্বল'—এখানে ব্যাধি—(অভীষ্টের অপ্রাপ্তিতে শরীরের পাণ্ডুতা ও উত্তাপকে ব্যাধি বলে); 'মহা বাউল নাম ধরি'—ইহাতে উন্মত্ততা

প্রকাশ পাইতেছে—ইহাই উন্মাদ; 'যোগাভ্যাস কৃষ্ণ ধ্যানে'—এখানে মোহ; 'শূন্য মোর শরীর আলয়'—এই স্থানে মরণোন্মুখ অবস্থ'কে মৃত্যু বলা হইয়াছে।[৯৬]

সুতরাং এই স্থানের 'মহাবাউল' শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

চৈতন্যচরিতামৃতে এই বাউল শব্দটির আর একটি প্রয়োগও লক্ষণীয়।

অদ্বৈতাচার্য জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফতে মহাপ্রভুকে যে প্রহেলিকাপূর্ণ সংবাদটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে 'বাউল' ও 'আউল' শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়,—

> "বাউলকে কহিও লোক হইল আউল,
> বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
> বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল;
> বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।"

(অন্ত্যলীলা, ১৯ পৃঃ)

এখানে অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুকে 'বাউল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং নিজেরও 'বাউল' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য-প্রেরিত এই প্রহেলিকাটিও বাউলগণ নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূল অর্থে গ্রহণ করে।

তাহারা বলে অদ্বৈতাচার্য প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক যোগ-মূলক ধর্মের অনুগামী ছিলেন। তন্ত্র-শাস্ত্রানুযায়ী এই মিলন তখন কেবল ক্রিয়া ও জ্ঞানমূলক ছিল। কিন্তু এই মিলন একান্ত প্রেমমূলক হওয়া প্রয়োজন, তাই তিনি ইহাতে প্রেমের অভাব বুঝিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে এই ধর্ম-সাধনাকে গোপনে গ্রহণ করিলেও ইহার তাৎপর্য ও প্রেমের স্বরূপ বুঝে নাই। অনেকেই শাক্তমতের ভান করিয়া পঞ্চমকারের সাধনায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আয়োজন করিতেছে। কঠোর ইন্দ্রিয়-সংযম-মূলক প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগের মূলতত্ত্ব কেহ বুঝে নাই—একই আনন্দময় পরম-তত্ত্বের দ্বিধা-বিভক্তির রহস্যও তাহারা জানে না। সুতরাং এমন একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন ছিল, যিনি প্রকাশ্যভাবে ও আদর্শগত ভাবে এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব বা রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের রহস্য প্রচার করিয়া জনগণকে প্রকৃত প্রেম-ধর্ম-পথে লইয়া যাইতে

৯৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী-অনুমোদিত ব্যাখ্যা

(ঐ সম্পাদিত সং, পৃঃ ৭৯৪)

" —শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ-অনুমোদিত ব্যাখ্যা

(ঐ সম্পাদিত সং, পৃঃ ৩৬৬)

পারেন। সেই জন্য তিনি চৈতন্যদেবকে আবাহন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের মধ্যে একাধারে যুগলতত্ত্ব রূপায়িত হইয়াছে। চৈতন্যদেব রাধা-কৃষ্ণের সম্মিলিত বিগ্রহ-রূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রকাশ্যভাবে সেই প্রেম-ধর্ম প্রচার করিলেন। অদ্বৈত ও গৌরাঙ্গ প্রকাশ্যভাবে বিশুদ্ধ অনুভূতিমূলক কৃষ্ণ-প্রেমের কারবার করিলেও অপ্রকাশ্যে ছিলেন মানবিক যুগল-ভজনের পক্ষপাতী। অদ্বৈত যখন দেখিলেন, যথেষ্ট প্রেমের আবহাওয়া রচিত হইয়াছে, আর প্রয়োজন নাই, তখন তাঁহাকে লীলা সংবরণ করিতে বলিলেন এবং স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে তাঁহারা মূলতঃ প্রকৃত প্রেমের উপর স্থাপিত প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক প্রেম-ধর্মের অনুগামী। বাউলগণ ইহার প্রমাণ-স্বরূপ 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও অন্যান্য জীবনী-গ্রন্থের কয়েকটি স্থানে অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের উল্লেখ অর্থপূর্ণ মনে করে। যথা,—

"এই অবধূত কেনে রাখ নিরন্তর।
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছু নাহি যার॥"

—চৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ)

*　*　*　*

"আগম শাস্ত্রের বিধি-বিধানেতে কুশল।"

—চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ)

"মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ।"

—চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ)

আগম-শাস্ত্র অর্থে তন্ত্র-শাস্ত্র। অধিকাংশ আগমের দার্শনিক ভিত্তি শিব-শক্তির অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একই পরমতত্ত্ব শক্তি ও শক্তিমান-রূপে, বিষয় ও আশ্রয়রূপে অবিনাবদ্ধভাবে বিরাজিত। শিব-শক্তির মিথুন-রূপই পরমার্থ।[১৭] অদ্বৈতাচার্য যোগ-মার্গাবলম্বনে শিব-শক্তির সামরস্যের উপাসক ছিলেন বলিয়া মনে হয়, না হইলে একজন ভক্তি-পথাবলম্বী পরমবৈষ্ণবকে 'মহাযোগেশ্বর' বা 'আগমশাস্ত্রের বিধি বিধানেতে কুশল' প্রভৃতি বলার কোনো অর্থ নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তিনি যোগ-ক্রিয়ার সহিত প্রেমের অবতারণা করিয়াছিলেন এবং শিব-শক্তির স্থলে রাধা-কৃষ্ণ স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭। Sakta Philosophy—Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath Kaviraj (History of Philosophy sponsored by the Ministry of Education, Vol. I. Page 402).

অদ্বৈতাচার্যকে 'চৈতন্যভাগবত'-এ 'অবধূত' বলা হইয়াছে এবং নিত্যানন্দকেও বৃন্দাবন দাস 'অবধূত' বলিয়াছেন এবং নিত্যানন্দের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।[৯৮] 'অবধূত' কথাটি কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'মহানির্বাণতন্ত্র'-এ বলা হইয়াছে,—

"অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।

*　　*　　*　　*

ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্বকর্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥"[৯৯]

এখানে দেখা যায়, পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞান-উদয়ের পর সংসারাশ্রম-ত্যাগী সন্ন্যাসীকে অবধূত বলা হইয়াছে।

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগছী বলেন,[১০০] অবধূতগণ একপ্রকার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়। তাহারা বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের নিকট হইতে যোগ-ক্রিয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ-যোগশাস্ত্রে 'অবধূতি' নাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন, এই নাড়ী সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ জ্ঞান লাভ করে বলিয়া তাহাদিগকে অবধূত বলা হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্য অদ্বয়বজ্রকে 'অবধূতিপাদ' বলা হইত।[১০১] প্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্রে দ্বাদশ ধৌতাঙ্গের কথা উল্লিখিত আছে। দ্বাদশ ধৌতাঙ্গের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি, বনে ও বৃক্ষ-তলে বাস, ছিন্নবসন-পরিধান প্রভৃতি আদিষ্ট। জৈন 'আচারাঙ্গসূত্র'-এও এই ধৌতের উল্লেখ আছে। অবধূতগণ প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন-শাস্ত্রের এই ধৌতানুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ'-এ উক্ত হইয়াছে যে, অবধূতগণ বর্ণাশ্রম, শাস্ত্র, তীর্থ-যাত্রা প্রভৃতি কিছুকেই মুক্তির কারণ বলিয়া মনে করে না। সংসারে তাহাদের কোনো আসক্তিই নাই—তাহারা উন্মাদপ্রায়।[১০২]

সম্ভবতঃ ডক্টর বাগছীর মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে অবধূতমার্গীদের সাধন-পন্থা সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনা হইতে উদ্ভূত।

৯৮। চৈতন্যভাগবত—(মধ্য—৩য়, অন্ত্য—৭ম)

৯৯। অষ্টম উল্লাস—২২১-২৮৮

১০০। Religion, Chapter XIII,—History of Bengal, Vol. I (Dacca University). Pages 394-428.

১০১। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত) পৃঃ ৭

১০২। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ—(মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত), পৃঃ ১, ১০ ইত্যাদি

যে তিনটি প্রধান নাড়ীর উপর সিদ্ধাচার্যদের যোগ-সাধনা নির্ভর করে, তাহার প্রধানটার নাম অবধূতি। অবধূত-সাধনা এই অবধূতি নাড়ীর গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।[১০৩]

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন,[১০৪]—"অবধূত চারিপ্রকার—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, বীরাবধূত ও কুলাবধূত।...অবধূত সন্ন্যাসীদের কতকগুলি শৈব ও কতকগুলি বৈষ্ণব।...বিধিপূর্বক পূর্ণাভিষিক্ত হইলে সেই সন্ন্যাসীকে শৈবাবধূত বলে...বৈষ্ণবদের মধ্যেও একশ্রেণীকে অবধূত বলা হয়...অবধূত বৈষ্ণবেরা রামানন্দের শিষ্য। এখনও বাঙলার নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব অনেক দেখা যায়। ইহাদের আচার-ব্যবহার অতিশয় কুৎসিত। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিভেদ মানে না এবং তাহাদের পান-ভোজনেরও কোনো বিচার নাই। তাহাদের মাথায় বড় বড় চুল, গলায় স্ফটিক প্রভৃতির মালা, কটিতে কৌপীন, গায়ে খিল্কা বা কাঁথা, হাতে নারিকেলের কিস্তী। ইহারা সর্বদাই অত্যন্ত অপরিষ্কারভাবে থাকে। লোকে ইহাদিগকে বাউলও বলে। বাংলার নানা স্থানে ইহাদের আখড়া আছে। এক একটি আখড়ায় দুই তিনজন অবধূত এবং তাহাদের অনেকগুলি করিয়া সেবাদাসী থাকে। ইহারা ভেক দিয়া সকল জাতিকেই আপন সম্প্রদায়ে গ্রহণ করে। ডুবকী, গুপীযন্ত্র, একতারা প্রভৃতি ইহাদের বাদ্যযন্ত্র। ভিক্ষা করিবার সময় ইহারা প্রথমে গৃহস্থদের দ্বারে গিয়া 'বীর অবধূত' এইরূপ নাম স্মরণ করে ও বাদ্য বাজাইয়া গান করিয়া থাকে।..."

দেখা যাইতেছে, কেহ বলিতেছেন, অবধূত সংসার-ত্যাগী ব্রহ্ম-জ্ঞানী, কেহ বলিতেছেন, বৌদ্ধ-যোগমার্গী, কেহ বলিতেছেন, বাউল-বৈষ্ণব। চৈতন্য-চরিতকারদের বর্ণনায় অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ অদ্ভূত-আচরণ-বিশিষ্ট, যোগ-মার্গাবলম্বী একপ্রকার বৈষ্ণব বলিয়া প্রতীয়মান হন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ দেখিতেছি, মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে প্রহেলিকাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার বা ধাঁধা-রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া অভিহিত করিতেছেন ('তরজাতে সমর্থ')। আমি পূর্বে বলিয়াছি এবং পরেও আমরা দেখিব যে, বাউল-ধর্ম-সাধনা একটি গুহ্য যোগ-ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের অনেক গানে যে ধাঁধা-রচনার

১০৩। বাঙালীর ইতিহাস (ধর্ম-কর্ম, পৃঃ ৬৪২)

১০৪। বিশ্বকোষ (অবধূত শব্দ,) পৃঃ ৫৯৬

কৌশল প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমরা চর্যাপদের কতকগুলি পদে দেখিতে পাই;[১০৫] বাউলদের গানেও ঐরূপ ধাঁধার নমুনা অনেক আছে।[১০৬] অনধিকারীদের নিকট মনের ভাব গোপন রাখিয়া সাংকেতিক ভাষায় কেবলমাত্র অধিকারীদের নিকট তাহা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ধাঁধা রচনা করা হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য 'অবধূত' বলিয়া কথিত অদ্বৈতাচার্য কি বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য-সম্মত যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন? বাউলদের সঙ্গে কি অবধূতদের সম্বন্ধ আছে? অবধূত ও বাউল কথা দুইটি কি উভয়ে উভয়ের পরিপূরক বা সমার্থবোধক? এ সব প্রশ্নের সংশয়হীন উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে বাউলরা ইহা বিশ্বাস করে যে, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন-ঘটিত ধর্মসাধনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতেই সম্প্রদায় হিসাবে প্রকাশ্যভাবে এই প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন-ঘটিত ধর্ম-সাধনা বা বাউল-ভজন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গুরু-পরম্পরার মধ্য দিয়া সারা বাংলায় ইহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপের ও বর্ধমান জেলার অনেক বাউল আমাকে বীরভদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের গুরু-বংশের তালিকা দিয়া তের কি চৌদ্দ গুরু তাহাদের গুরু—এইরূপ বলিয়াছে। বাউলদের মধ্যে মোহান্ত শ্রেণীর লোকেদের অনেকের শাখা-প্রশাখাযুক্ত গুরুবংশ-তালিকা কণ্ঠস্থ আছে।

অবশ্য প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন ঘটিত সাধনার সমর্থকেরা সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের প্রকৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছে।[১০৭]

১০৫। "দুলি দুহি পিঠা ধরণ না জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥" ইত্যাদি ২নং (চর্যাচর্যবিনিশ্চয়—শাস্ত্রী)
"টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী। ইত্যাদি ৩৩নং (ঐ)"

১০৬। গানং নং ১৭২, ৪৪৯ ইত্যাদি

১০৭। "শ্রীরূপ করিলা সাধনা মীরার সহিতে।
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা করণ বাই সাথে।
লক্ষহীরা সনে করিলা গোস্বামী সনাতন।
মহামন্ত্র প্রেমসেবা সদা আচরণ॥
গোঁসাই লোকনাথ চণ্ডালিনী কন্যা সঙ্গে।
দোঁহা ভাসে অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে॥
গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সমা।
গোঁসাই কৃষ্ণদাস সদাই আচরণা॥
শ্যামা নাপিতানির সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাই।
পরম সে ভাব কহিতে যার সীমা নাই॥
রঘুনাথ গোস্বামী প্রীতি উল্লাসে।
মীরাবাই সঙ্গে তেঁহ রাধাকুণ্ড বৈসে॥

এমনকি চৈতন্যদেবকেও তাহারা বাদ দেয় নাই।[১০৮] তবে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণ কর্তৃক 'অবধূত' শব্দ-প্রয়োগের সর্বসংশয়-

---

গৌরপ্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই।
করয়ে সাধন অন্য কিছু নয়।
রায় রামানন্দ যত্নে দেবকন্যা সঙ্গে।
আরোপেতে স্থিতি তেঁই ক্রিয়ার তরঙ্গে।"

—অকিঞ্চন দাস (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন,
২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫০)

"শ্রীরূপ গোঁসাই দেখ প্রকৃতি সঙ্গ।
মীরাবাই নামে তার প্রেমের তরঙ্গ।
রূপ গোসাই যবে মধুগিরিতে গমন।
সেই কালে মীরাবাই করিল যতন।
যতন করি সনাতন, হীরাবাইকে দিল মন,
পুষ্প অন্বেষণে যে ঘটিল।
হীরাবাই দিল ডঙ্কা, ঘুচিল মনের শঙ্কা
সনাতন প্রেমেতে ডুবিল।
শ্রীভট্ট রঘুনাথ কোনো বায়ের সাৎ,
প্রেম পিরিতি যে কেলী।
যে যার পিরিতি, করে দিবারাতি,
অনুরাগে রসরলী।
শ্রীজীবের প্রেমধা ন শ্যামা নাপীতিনী,
কতই পিরিতি পশী।
আহা মরি ভাব, ভাবেতে যে লাভ,
উদয় হইল শশী।
গোপাল ভট্ট প্রেম, তনু করে হেম,
গোরাপ্রিয়া নামে দাসী।
অতি যতন করি, প্রেমের পোশরি,
পিরীতি রসেতে খুসী।
দাস রঘুনাথ, করে আত্মসাত,
কিরাবাই নামে সতি।
আছে ভাবের লতা, রস তাহে গাঁথা,
সকলি উঠিল মাতি।
এই ছয় তত্ত্ব, পায় যে পদার্থ,
সেই জন হবে পার।
এই ছয় ধর্ম, গোস্বামীর মর্ম,
যে যাহা বুঝয়ে আর।"

—ব্রজ উপাসনা ও পৌর্ণমাসীর গুপ্তকথা
(প্রকাশিত শ্রীকাঙ্গাল প্রেমচাঁদ বাউল—পৃঃ ৬)

১০৮। পুরীর সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কন্যা ষাঠীর সহিত তিনি সহজ সাধনা করিতেন এইরূপ কোনো কোনো সহজিয়া-পন্থী বলে। মহাপ্রভুর প্রতি জামাতার অসম্মানজনক ব্যবহারে ভট্টাচার্যের স্ত্রী 'ষাঠী রাণ্ডি হউক' এইরূপ বলিয়াছিলেন। —চৈতন্যচরিতামৃত, (মধ্যখণ্ড, ১৫ পরিচ্ছেদ)

নিরসনকারী বা খুব একটা সন্তোষজনক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উভয়েই সংসারী, সন্ন্যাসী নহেন—স্ত্রী-পুত্র-সমন্বিত ব্যক্তি,—তাঁহাদের ভোগ-মোক্ষ-ধর্মানুষ্ঠানকারী বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এখন বাউলরা যদি অদ্বৈতাচার্যকে বা নিত্যানন্দকে তাহাদের দলের লোক বলিয়া দাবী করে, তবে তাহাদের দাবীকে নিতান্ত যুক্তিহীন সাম্প্রদায়িক দাবী বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি?

বাউলদের দাবীর যুক্তি-অযুক্তির প্রশ্ন না উঠাইয়া স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে অদ্বৈতাচার্যের প্রহেলিকায় ব্যবহৃত 'বাউল' শব্দের প্রয়োগকে—'উন্মত্ত—ভাবোন্মত্ত বা প্রেমোন্মত্ত' অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই প্রহেলিকার অর্থ তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায়,—

মহাভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুকে বলিও যে, জনসাধারণ তাঁহার প্রচারিত প্রেম-ধর্মে আকুল বা বিবশ হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার কৃপায় বিনা সাধনে লোকে প্রেম লাভ করিতেছে বলিয়া এখন আর কেহ প্রেম-ভক্তির সাধনানুষ্ঠান গ্রহণ করিতেছে না; সাধন-ভক্তির বৈষ্ণব সম্প্রদায় লোপ পাইতে বসিয়াছে; ভাবীকালের প্রেম-ভক্তি-লাভ-সাধানার উপদেষ্টা ও নিয়ামকরূপে কোনো সম্প্রদায় বর্তমান থাকিবে না। এখন তিনি যে সকল ভাব-বিকার প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার আর বিশেষ কোনো সুবিধা বা প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ তাহার গ্রাহক জীবলোকে সম্ভবে না। প্রেম-ধর্ম-প্রচার ও স্ব-মাধুর্য-আস্বাদন যথেষ্ট হইয়াছে, এখন ভাবী জগতের মঙ্গলার্থ তাঁহার লীলা সংবরণ করা উচিত। তাঁহার প্রচারিত প্রেম-ধর্মের মর্মজ্ঞ আর একটি ভাবোন্মাদ তাঁহাকে এই বার্তা পাঠাইতেছে।

ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের অনুমোদিত ব্যাখ্যা।[১০৯]

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত 'বাউল' শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে বুঝাইতে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে নাই।

মনে হয়, সংস্কৃত 'বাতুল' (অর্থাৎ উন্মাদ) শব্দের প্রাকৃত রূপ লইয়া 'বাউল' শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।[১১০] 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়,' 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও রাগাত্মিকা-পদে এই 'বাতুল' শব্দেরই প্রাকৃত রূপ হিসাবে 'বাউল' শব্দটি আমরা পাইয়াছি। এই মূল বাতুল অর্থাৎ উন্মাদ, কি ভাবোন্মাদ-অর্থ হইতে পরবর্তী কালে

১০৯। প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ।
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ — অন্ত্যলীলা, পৃঃ ৬৫২-৫৩

১১০। কগচজতদপয় বাং প্রায়ো লোপঃ (প্রাকৃত প্রকাশ, ২য় অধ্যায়)
লোপোহনাস্ত যবর্গাদি তৃতীয়য়ো (সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ)

একটি বিশিষ্ট ভাবের নিরন্তর আবেগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য বা ভাবোন্মাদ বা ধর্মোন্মাদ, বেশ-বাস ও আচার-ব্যবহারে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতির বন্ধনমুক্ত, লোকাচার-পরিত্যাগী, আত্মকর্ম-সমাহিত, উদাসীন ধর্ম-সাধকগণ বাউল নামে পরিচিত হইয়াছে। এখনও অনেক বাউলকে—বিশেষতঃ রাঢ়ের বাউলকে 'ক্ষেপা' (ক্ষিপ্ত) নামে অভিহিত করা হয়।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—"একটি বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের সহিত 'আছে' এই অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন; এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করিবার সাধনা করেন, তাঁহারা বাউল। কেহ বলেন, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থ জীবনধারণ এবং তাহা সংরোধ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাঁহারা, তাঁহারা বাউল। আবার কেহ বলেন, সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। যাঁহারা বাতাধিক তাঁহারা পাগল, যাঁহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে, লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে, এরূপ সাধারণ সমাজ-বহির্ভূত আচার-ব্যবহার-সম্পন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বাউল।"[১১১]

শ্বাস-প্রশ্বাস-সংক্রান্ত যোগ-সাধনা যাহাদের ধর্ম, তাহাদিগের সকলকেই যদি বাউল বলা হইত, তবে যোগ-মার্গাবলম্বী সকল সাধকই বাউল নামে অভিহিত হইত। কিন্তু হিন্দুতন্ত্রসাধক, বৌদ্ধতন্ত্রসাধক, হঠযোগী নাথপন্থীদিগকে কেহ বাউল বলে না। সুতরাং লেখকের শেষোক্ত মতটিই সমর্থনযোগ্য।

বাউলরা নানা কারণে সমাজের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের সাধনা ও আচার-ব্যবহার সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তাই তাহারা সর্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকে। সাধারণের জীবন-যাত্রার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পাগল বা ক্ষেপা বলে। ইহা হইতেই এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোককে বাউল (পাগল বা ক্যাপা) বলিয়া অভিহিত করা হয়। হিন্দীতে এই কথাটি 'বাউরা' রূপে ব্যবহৃত হয়।

বাউলরা নিরন্তর একটা ভাবের ঘোরে জীবন কাটায়। তাহাদের বহু গানে এই ভাব-জীবনে প্রবেশের কথা আছে। এই ভাবের ঘোরে সংসার ও সমাজকে উপেক্ষা করিয়া তাহারা নিজের মনের সঙ্গেই লীলা করে।

১১১। বঙ্গবীণা—পৃঃ ৪৫১

একটি গানে আছে,—

আঁটি ভাব অন্তরে রাখে,
বাইরে সে উড়ন-পেকে,
বুঁদ হয়ে বসে থাকে সে আপন স্বভাবেতে ॥
(ও সে) কভু হাসে, কভু কাঁদে,
কভু নাচে, কভু যাচে,
সদা সমান ভাব তার শুচি-অশুচিতে ॥
ভাল কি মন্দ দুয়ে
তাদেক দ্বারেতে থুয়ে
পাষাণে বেঁধে হিয়ে রহে আনন্দেতে ॥
(গান নং ৫১৩)

আর একটি গানে আছে,—

ভাবের ভাবুক, প্রেমের প্রেমিক
হয় রে যে জন,
ও তার বিপরীত রীতি-পদ্ধতি,
কে জানে কখন
সে থাকে কেমন ॥ (ভাবের মানুষ)
তার নাই আনন্দ-নিরানন্দ
লভি' নিত্য প্রেমানন্দ
আনন্দ সলিলে যেন
তার ভাসছে দুনয়ন ;
ও সে কখন আপন মনে হাসে
আবার কখন বা করে রোদন ॥

* * * *

তার চন্দনে হয় যেমন প্রীতি
পাঁক দিলেও হয় তেমনি তৃপ্তি,
চায় না সে ধন-জন-খ্যাতি
তার তুল্য পর আপন।
সে আসমানে বানায় ঘরবাড়ী
দগ্ধ হলেও এ চৌদ্দ ভুবন ॥ (গান নং ৪১৬)

এই ভাবের ঘোরেই তাহারা উন্মত্ত বা ক্ষিপ্তের মত অবস্থান করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও এমন অনেক বাউল দেখিয়াছি, যাহারা সর্বদাই অন্যমনস্কভাবে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহাদের দেখিয়া তাহাদেরই গানের একটি অংশ মনে পড়িয়াছে :

"মহাভাবের মানুষ হয় যে জনা,
তারে দেখলে যায় রে চেনা ;
(ও) তার আঁখি দুটি ছল-ছল
মৃদুহাসি বদনখানা ॥"
(গান নং ৪১৪)

শম্বুকের মতো আত্মসংকোচনশীল, আত্মগোপনশীল জীবনযাত্রার রীতি এই বাউলদের। এ সম্বন্ধে তাহারা সর্বদা সচেতন। তাহারা কিভাবে সাধনা করে, কি সেই সাধনার আনুষঙ্গিক কর্ম, কি তাহাদের মতবাদ, ঘুণাক্ষরেও তাহা তাহারা অন্যকে জানিতে দিতে চায় না। তাহাদের সাধু-গুরুর নির্দেশও তাহাই :

"আপন ভজন-কথা
না কহিবে যথা-তথা,
আপনাতে আপনি হইবে সাবধান।"

সর্বদা স্বতন্ত্র থাকিতে চেষ্টা করিলেও বাহিরে তাহারা সাধারণ রীতি-নীতি মানিবার একটা ভাব দেখায়, অন্ততঃ লোকাচার-পালনের একটা অভিনয় করে। তাহারা বলে যে, তাহাদের নির্দেশও তাহাই :

"লোকমধ্যে লোকাচার,
সদ্‌গুরুমধ্যে একাকার।"

গুরু বা গুরু-ভাইদের মধ্যে তাহাদের যথার্থ আত্মপ্রকাশ—তাহাদের আত্ম-স্বরূপ-উদ্ঘাটন।

নরসিংদির বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রচলিত কথা আছে :

"রাগের আচার শুনতে দূষয়
বেদের আচার ছাড়া।"

'রাগের আচার' অর্থাৎ বাউল-সম্প্রদায়গত ধর্মের যে ক্রিয়া-কলাপ, তাহা প্রকাশ্যভাবে বলা বাউলের পক্ষে দূষণীয়। আত্মগোপন করিয়া প্রকাশ্যভাবে 'বেদের আচার' অর্থাৎ চিরাচরিত হিন্দু-ধর্ম-কর্মের কথাই বলিতে হইবে।

তাই বাউলদের মধ্যে দুইটি জীবন—একটি বহির্জীবন ও একটি অন্তর্জীবন, একটি ব্যবহারিক জীবন, অপরটি সাধক-জীবন পাশাপাশি অবস্থান করে। অবশ্য অন্তর্জীবনই তাহাদের প্রকৃত জীবন, তবুও বাহিরের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে তাহাদের আচরণে মাঝে মাঝে যে বেশ অসামঞ্জস্য প্রকাশ পায়, তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া বাউলদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া বুঝিয়াছি। একটা ক্ষ্যাপাটে ভাব তাহাদের মধ্যে যে আছে, একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়।

বাউলের সমার্থবোধক আর একটি শব্দ 'আউল'। বর্তমানে বাউল-সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণীর মুসলমান সাধককে 'আউল' বা 'আউলিয়া' বলা হয়। ইহার মূলও মনে হয় সংস্কৃত 'আকুল' শব্দ। অদ্বৈতাচার্যের প্রহেলিকার মধ্যেও 'আউল' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা 'আকুল' শব্দেরই প্রাকৃত রূপ। 'আকুল' শব্দটি 'আবেগ-চঞ্চল', 'আলুথালু', 'বে-সামাল' 'অস্বাভাবিক মনোভাবসম্পন্ন' প্রভৃতি ভাবের দ্যোতনা করে এবং একপ্রকার 'বাতুল' (বাউল)-এরই সমার্থবোধক। এই শব্দটি বর্তমানে কেবল মুসলমান সাধকদের বেলায় প্রযোজ্য হওয়ার কারণ পরবর্তী কালের সুফী-প্রভাব। আরবী শব্দ 'ওয়ালী' (অর্থ—'নিকট', বহুবচনে—'ওয়ালীয়া') সুফী-সাহিত্যে ভগবৎ-স্বরূপ-প্রাপ্ত পূর্ণমানবকে বুঝায়।[১১২] সুফী-প্রভাব মুসলমান বাউলদের উপর বেশি পড়ায় যাঁহারা সাধন-পথে বিশেষ অগ্রসর এবং তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদেরই পরিচায়ক হিসাবে 'আউলিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বাউল' ও 'আউল'-অর্থে সামাজিক রীতিনীতির উর্ধ্বগত যে আত্মভোলা ও উন্মত্তবৎ ব্যক্তিকে বুঝায়, সুফী-সাহিত্যে সেই অর্থবোধক শব্দটি 'দেওয়ানা'—অর্থাৎ পাগল।

বাউল কাহারা ?

সারা বাংলায় এই শ্রেণীর ধর্মোপাসকদিগকে একই বাউল নামে অভিহিত করা হয় না। এই ধর্মমতের সাধকদের মধ্যে জাতিতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই আছে। পূর্ববঙ্গে (অধুনা পূর্বপাকিস্তান) ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানজাতির এই সকল সাধককে 'ফকির' বলা হয়। সাধারণ ফকিরদের সঙ্গে প্রভেদ-জ্ঞাপনের জন্য ইহাদিগকে 'নেড়ার ফকির' বলা হয়। দুই-এক স্থানে ইহাদিগকে 'বে-শরা' ফকির বা 'মারফতী' বা 'বেদাতী' ফকিরও বলে।

১১২। **Studies in Islamic Mysticism**—R. A. Nicholson. Pages—77-78.

'নেড়া' অর্থে মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তি। বৌদ্ধ-সাধকদের মস্তকমুণ্ডন ধর্মজীবনের একটি প্রধান বিধি ছিল। এখনও বৌদ্ধ শ্রমণদের মস্তক মুণ্ডিত দেখা যায়। বাংলাদেশ প্রায় চারিশত বৎসর পাল-রাজগণের শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম গোপালদেব (আনুমানিক ৭৫০ খৃঃ) প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক বাংলার রাজা নির্বাচিত হন এবং পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে মদনপালের রাজত্বের (আনুমানিক ১১৪০ খৃঃ) সঙ্গে সেই বংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়। পাল-রাজগণের সময়ে বাংলাদেশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। এই সময় বজ্রযান ও সহজযান-পন্থী বৌদ্ধগণ বাংলাদেশে বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। নিম্নশ্রেণীর অগণিত জনসাধারণ একসময়ে বৌদ্ধ-সহজিয়া মতের উপাসক ছিল। তারপর মুসলমান-আগমনের পর নানাকারণে ইহাদের অধিকাংশই মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইলেও তাহারা তাহাদের পূর্ব-সাধনার ধারাটি ত্যাগ করে নাই। মুসলমান জাতিতে রূপান্তরিত ও হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত এই জনগণ তাহাদের পূর্বাচরিত ধর্ম-সাধনাকে অতি সঙ্গোপনে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহারাই বর্তমানে 'ফকির' নামে পরিচিত। ইহারা জাতিতে মুসলমান হইলেও 'নেড়া'দের মতো অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ সাধকদের মতো ধর্মাচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে 'নেড়ার ফকির' বলা হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজিয়া-মতবাদ ও সাধনা এবং এই সব ফকিরদের—এই মুসলমান বাউলদের মতবাদ ও সাধনার মধ্যে মূলতঃ কোনো প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তারপর ইহাদের উপর সুফী ধর্মের অনেকটা প্রভাব পড়িয়াছে, চৈতন্যদেব-প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেরও যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু মূল সাধনার ধারাটি অব্যাহত থাকায় মূল পরিচয়টি নষ্ট হয় নাই।

নিম্নশ্রেণীর আর এক অংশ যাহারা মুসলমানে রূপান্তরিত হয় নাই, অথচ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের দ্বারা অবহেলিত এবং সমাজ হইতে বহিষ্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে মূলতঃ বজায় রাখিয়াই বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম হইতে যে তাহারা বৈষ্ণবধর্মে আসিয়াছে, তাহাই জ্ঞাপনের জন্য সেই সব সাধক-সাধিকাকে বলা হয় 'নেড়া-নেড়ী'। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র এই বৌদ্ধ-সহজিয়াদিগকে বৈষ্ণবধর্মের আওতায় আনিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়।

'বে-শরা' অর্থে 'শরীয়ত' বা আনুষ্ঠানিক ইসলামধর্ম-বহির্ভূত। ইহারা

জাতিতে মুসলমান হইলেও ধর্মসাধনার দিক দিয়া ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে নাই।

মুসলমানধর্মে চারিপ্রকার মতবাদের কথা উল্লিখিত আছে: 'শরীয়ত', 'তরীকত', 'হকিকত' ও 'মারফত'।

'শরীয়ত'-এর অর্থ ইসলামধর্মে বিশ্বাস ও তাহার নিয়মাবলী-পালন। হজরত মুহম্মদ আল্লার আদেশগুলি জগতে প্রচার করিয়াছেন। কোরান ও হাদিসে এই ভগবৎ-জ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে। 'শরীয়া' আল্লার সহিত মানুষের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগত সম্বন্ধ নির্ণয় করে, কিন্তু মানুষের অন্তরের উপলব্ধি বা চেতনাকে মূল্য দেয় না। 'শরীয়া'র দাবী বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের পরিপূর্তি। ইসলামের মূলতঃ পাঁচটি ভিত্তিস্তম্ভ: 'কলমা' (একেশ্বরবাদের স্বীকৃতি), 'নমাজ' (ভগবানের নিকট দৈনিক প্রার্থনা), 'রোজা' (রমজান মাসে উপবাস), 'জাকাত' (দরিদ্রকে দান করা—অন্ততঃ আয়ের শতকরা ২৷৷০ টাকা দান) ও 'হজ্জ' (মক্কায় তীর্থযাত্রা)।[১১৩] শরীয়তবাদিগণ এই অনুষ্ঠানগুলি ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পালন করে।

'তরীক' একটি আরবী শব্দ। ইহার অর্থ 'পথ'। এই পথ সাধারণ ইসলামের অনুষ্ঠান ছাড়াও এমন কতকগুলি বিশেষ নিয়মাবলীর মধ্যে আবদ্ধ যে, ইহা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক বলিয়া মনে করা হয়। প্রথম 'মুরিদ' (শিষ্য) হিসাবে 'শেখ' বা 'মুরশিদের' নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধন-ভজনে অগ্রসর হইতে হয়। শরীয়তের অনুষ্ঠান-পালনের সঙ্গে সঙ্গে যাহারা মুরশিদের নিকট ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-সাধনার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহাদিগকেও তরীক-পন্থী বলা যায়। মুসলমান দেশগুলিতে নবম ও দশম খৃষ্টাব্দে এই তরীক ব্যক্তিগত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ-নির্দেশক ছিল, একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ইহা অধ্যাত্ম-সাধনের কতকগুলি অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করে। সুফী-দর্শন ও সাহিত্যে 'তরীক' শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 'তরীক' শব্দ যে পন্থা নির্দেশ করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে সুফী-সাধন-ভজনের অনুকূল।[১১৪]

১১৩। "The Sharia regulates only the external relations of the subject to Allha and his fellow-men and entirely ignores his inner consciousness. The Sharia demands and is only concerned with the fulfilment of the outward forms."

—**The Encyclopedia of Islam,**
Vol. IV, Pages—320-23.

১১৪। **The Encyclopedia of Islam,** Vol. IV, Pages—667-672.

'হকিক'-এর অর্থ কোনো কিছুর 'প্রকৃত সত্তা'। ভগবানের প্রকৃত সত্তার অর্থ যাহারা জানে, তাহারা 'হকাইক'। একপ্রকার মরমীয়াবাদীরাই প্রকৃত 'হকাইক'। দরবেশ-পন্থীদের ইহাই চরম অবস্থা।[১১৫]

'মারফত'-এর অর্থ ভগবানের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান। বুদ্ধির ঊর্ধ্বস্তরে যে দিব্যজ্ঞান, সেই দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হৃদয়ে ভগবৎ-সত্তার অপূর্ব আনন্দময় অনুভূতিই এই 'মারফতী' পন্থার বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায় এই মরমীয়া-সাধক নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া ভগবৎ-অস্তিত্বে মিশিয়া গিয়া থাকে। ইহাকে 'তৌহীদ' বা ভগবানের সহিত একাত্ম হওয়া বলে।[১১৬] ফকিররাও আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি দ্বারা আনন্দময় সত্তার অনুভূতি লাভ করে বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে 'মারফতী ফকির' বলা হয়।

'বেদাতী' শব্দটি আরবী 'বিদ্‌-আৎ' শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ নূতনত্ব—নবসৃষ্টি। এই ফকিরগণ শরীয়তী মত হইতে নূতন মত পোষণ ও নূতন মতে সাধনা করে বলিয়া বোধ হয় এই সব নেড়ার ফকিরদিগকে 'বেদাতী ফকির' বলা হয়।[১১৭]

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুজাতির এই সব সাধককে সাধারণতঃ বাউল বলা হয়। উত্তরবঙ্গেও ইহারা ঐ নামে পরিচিত। অনেক স্থানে ইহাদিগকে 'রসিক বৈষ্ণব', 'রসিক-পন্থা', 'রাগানুগা-পন্থী' বৈষ্ণবও বলা হয় এবং ইহারাও নিজেদের ঐ নামে অভিহিত করে। সাধারণ লোকে ইহাদিগকে শুধু 'বৈষ্ণব' বলে।

'রসিক' শব্দটি একটা বিশিষ্ট অর্থে বৈষ্ণব সহজিয়া-সাহিত্যে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা-পদগুলির মধ্যে এবং নানা সহজিয়া-সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। বৈষ্ণব সহজিয়া-সাধনা পূর্ণপ্রেম ও মাধুর্য-রসের সাধনা। দুরূহ সহজিয়া-সাধনে সিদ্ধ সাধকই প্রকৃত রসিক।[১১৮] এই সাধনার মূলতত্ত্ব ও ভাব চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া রাগাত্মিকা-নামধারী

১১৫। The Way of a Mahomedan Mystic —W. H. T. Gardiner, —Pages 19 & 20.

১১৬। The Idea of Personality in Suffism
—R. A. Nicholson,—Pages 10-11.

১১৭। শূন্যপুরাণের ভূমিকা—বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মপূজা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ,—পৃঃ ৩

১১৮। "রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়।"
(রাগাত্মিকা পদ)

পদগুলির মধ্যে প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তারপর নানা ব্যক্তির রচিত নানা 'পদ'-এ ও 'আগম,' 'কড়চা' প্রভৃতি নামে অভিহিত বহু গ্রন্থে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।[১১৯] এইসব গ্রন্থের মধ্যে এই মতবাদের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অংশটি কিছু ব্যক্ত হইলেও, সাধনার পদ্ধতি বা ঐ তত্ত্ব-দর্শনের ব্যবহারিক অংশের কোনো বর্ণনা নাই ; এক রাগাত্মিকা-পদগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। বাউল-গানের মধ্যেই এই সহজ-ভজনের পদ্ধতি ও ঐ তত্ত্বাংশেরই একটা বিশিষ্টরূপে রূপায়িত ব্যবহারিক প্রয়োগ বেশি পাওয়া যায়। বাউলদের তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে লিখিত বিশেষ কোনো সন্দর্ভ নাই, সাধন-পদ্ধতিরও স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ কোনো বিবরণ নাই। গানেই তাহাদের ধর্ম-তত্ত্ব, দর্শন ও ক্রিয়া-পদ্ধতি ব্যক্ত হইয়াছে। গানই তাহাদের আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।

হিন্দুজাতির বাউল-সাধকদের মধ্যে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় ধর্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানির তাহারা তাহাদের ধর্ম-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যাখ্যা করে এবং স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে বলিয়া ধরিয়া লয়। তাহাদের মতে চরিতামৃতকার সাধারণের জন্য চৈতন্যদেবের ব্যক্ত লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের জন্য গুপ্তলীলা অর্থাৎ সহজ-লীলার কথার ইঙ্গিতমাত্র দান করিয়াছেন। বাউলরা মনে করে যে, চৈতন্যদেব এই ধর্মের মহাগুরু। তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই ধর্মের তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই তত্ত্বের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ যে চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত মূর্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে বাউলরা তাহাদের ধর্ম-তত্ত্ব ও দর্শনের মূল ব্যঞ্জনা গ্রহণ করে। অনেক সময় তাহারা প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলিত অদ্বয়-তত্ত্বকে 'গুরু-তত্ত্ব' বা 'চৈতন্য-তত্ত্ব'-আখ্যায় অভিহিত করে। চৈতন্যচরিতামৃতের 'রাগমার্গে ভজন' ও 'পরকীয়া-ভাব' প্রভৃতি বাউলরা তাহাদের ধর্মানুযায়ী করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। 'বাউলরা তাহাদের ধর্মমতকে 'রাগের ভজন' ও সাধন-পদ্ধতিকে 'রাগের করণ' বলে।

মুসলমান ফকিরদের মধ্যেও এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও চৈতন্য-তত্ত্ব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যুগল-ভজনই তাহাদের মূল ভজন। [illegible] তাহারা

১১৯ পদাবলী, 'আগমসার', 'আনন্দভৈরব', 'অমৃতরত্নাবলী', 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী', 'অমৃতরসাবলী', 'রত্নসার' প্রভৃতি বহু অপ্রকাশিত পুঁথি। (মণীন্দ্রমোহন বসু—সম্পাদিত 'সহজিয়া সাহিত্য', 'Post-Chaitanya Sahajia Cult of the Vaishnavas' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

'মহাগুরু' বলিয়া গ্রহণ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনেক কথা তাহাদের মতের অনুযায়ী করিয়া তাহাদের গানে ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

ইহাদের উপর সুফীধর্মেরও যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। আল্লা মূলতত্ত্ব। আল্লার 'নুর' বা জ্যোতি ও প্রেম নবীতে প্রকাশ। আল্লা হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি। আদিমানব আদমের মধ্যে আল্লার সত্তা বর্তমান। সকল মানবের মধ্যে আছে আল্লার অংশ—আত্মারূপে সর্বমানবে তাঁহার অবস্থিতি। মানুষকে তিনি নিজের আকৃতি, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য দিয়া গঠন করিয়াছেন। মানুষের মধ্য দিয়াই তাঁহার আত্মপ্রকাশ। সেই আল্লা মানুষের 'নিগুম শহরে' বাস করেন। আল্লার শক্তি নবী ও আদমে—প্রত্যেক মানুষে রূপায়িত। নবীর মধ্যে আল্লার শক্তির পূর্ণপ্রকাশ। তিনি 'ইনসানুল-কামেল'—পূর্ণ-মানব বা দেব-মানব—একপ্রকার অবতার-স্বরূপ। চৈতন্যদেবের মত তিনিও আমাদের 'মহাগুরু'। আবার এই আত্মা-রূপী আল্লাই 'অধর কালা', 'অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি', 'অধর মানুষ', 'সহজ মানুষ' ও 'মনের মানুষ'।[১২০] এই সব মুসলমান বাউলদের রচনায় তত্ত্ব ও দর্শনের দিক দিয়া হিন্দু ও মুসলমান-ধর্মের একটা অপূর্ব সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

কিন্তু এই আত্মা-রূপী আল্লা বা অধর কালাকে উপলব্ধি করিতে হইলে যে সাধন-পদ্ধতির প্রয়োজন, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির সাধকই এক পথাবলম্বী। প্রকৃতি-পুরুষের মিথুন-তত্ত্বের মধ্য দিয়াই তাহাদের সাধনা। সুফী-ধর্মমতে মানবাত্মাকে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইলে, ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিতে হইলে যে অবস্থাগুলি অতিক্রম করিতে হয়, সেই 'নাছুত', 'লাহুত', 'জব্‌রুত', 'মালকুত', 'হাউত' প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ তাহাদের গানে মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে এবং মানবদেহেই ভগবানের বাস, আত্মোপলব্ধির দ্বারা মানুষ ভগবৎ-সত্তায় রূপান্তরিত হইতে পারে, গুরুবাদ, ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রভৃতি বিষয়ে সুফীধর্মের সহিত সাদৃশ্যও আছে, কিন্তু সুফীদের সাধনা ও বাউলদের সাধনার মধ্যে মূল পার্থক্য বর্তমান। সুফীদের সাধনা মানুষ ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের সাধনা—প্রেমের তীব্রতায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার একপ্রকার অভেদ-জ্ঞানই তাহাদের সাধনার মূলভিত্তি। ইহা জ্ঞানমূলক ও বিশেষভাবে অনুভূতিমূলক সাধনা—অনুভূতি ও আবেগের তীব্রতায় 'ফানা'-অবস্থা-প্রাপ্তির সাধনা এবং ইহা

১২০। দ্রষ্টব্য গান নং ১৩৬ ইত্যাদি।

বিশেষ ক্রিয়ামূলক নয়। বাউলদের সাধনা নির্দিষ্ট যোগমূলক ক্রিয়া—প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়া নিজের আনন্দ-স্বরূপের উপলব্ধির সাধনা। সুতরাং সাদৃশ্য যতই থাকুক, মূলসাধন-তত্ত্বে বাউল ও সুফীদের মধ্যে প্রভেদ বর্তমান। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মুসলমান ফকির ও হিন্দু বাউল বা রসিক বৈষ্ণব—সকলেই একতত্ত্বের উপাসক, সাধনার পদ্ধতিও এক এবং সাধন-সংক্রান্ত আচার-ব্যবহারও সমান। সুতরাং সারা বাংলার এই শ্রেণীর সমস্ত সাধককেই এক 'বাউল' নামে অভিহিত করিয়াছি এবং তাহাদের ধর্মের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধন-পদ্ধতি-সংবলিত গান সংগ্রহ করিয়াছি।

বাংলা-সাহিত্যে প্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় 'বাউল' 'আউল', 'নেড়া', 'সহজী' 'কর্তাভজা', 'সাঁই' 'দরবেশ' প্রভৃতি উপাসক-সম্প্রদায়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন।[১২১] তিনি সম্ভবতঃ উইলসন সাহেবের অনুসরণে এইরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছেন।[১২২] দত্ত মহাশয়ের এই বিবরণকে প্রামাণ্য মনে করিয়া পরবর্তী কালে যাঁহারা বাউল সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই দত্তমহাশয়ের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বৈষ্ণব সহজিয়া-ধর্মের আলোচনায় সহজিয়া-সাধকদের প্রকার-ভেদ দেখাইতে গিয়া দত্ত মহাশয়ের শ্রেণী-বিভাগই গ্রহণ করিয়াছেন। দত্ত মহাশয় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিরাট ফকির-সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেন নাই। তাহাদের বিষয় তিনি সম্যক্ অবগতও ছিলেন না বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে-সব বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই লোকমুখে শোনা কথা। নিজে অনুসন্ধান করিয়া ইহাদের প্রকৃত অবস্থা দেখেন নাই, অন্যের কথার সত্যাসত্যও নির্ধারণ করেন নাই; কলিকাতায় বসিয়া লোকের নিকট শুনিয়া বা দুই একখানা মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া তাঁহার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন।

দত্ত মহাশয় বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে 'চারিচন্দ্র-ভেদ'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ প্রক্রিয়া দ্বারাই বাউল অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন—এইরূপ কথা বলিয়াছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ও "piercing of the

১২১। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম খণ্ড

১২২। **Hindu Religions or An Account of the Various Religious Sects of India** by H. H. Wilson, M.A., F.R.S., published by the Society for the Resuscitation of Indian Literature.—Reprint 1899. প্রথম সংস্করণ তাহার বহু পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

four moons"-ই বাউলদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১২৩] এবং আশ্চর্যের বিষয়, তান্ত্রিকদের 'piercing of the six lotuses এবং বাউলদের 'চারিচন্দ্র-ভেদ' "just like" বলিয়াছেন। বাউলদের 'চন্দ্রভেদ'-এর সহিত তান্ত্রিকদের 'ষটচক্রভেদ' ঠিক এক জিনিস বলায় 'চন্দ্রভেদ' কি জিনিস, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই মনে হয়। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও তাঁহার বিশেষ গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ—'Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature'-এ দত্ত মহাশয় ও মনীন্দ্রবাবুর অনুসরণে চারিচন্দ্রভেদের লক্ষণ দ্বারা বাউলকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে ফেলিয়াছেন।[১২৪]

কিন্তু এই গুপ্ত 'ভেদ'-পদ্ধতি এই মতের সমস্ত সাধকের মধ্যেই প্রচলিত। গত পনর বৎসর ধরিয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে এই সব সাধকের সঙ্গে নানাভাবে মিশিয়াছি এবং বিশেষভাবে জানিয়াছি যে, সকলেই এই গুপ্ত 'ভেদ'-পদ্ধতি অনুসরণ করে। তবে এই 'চারিচন্দ্র'-এর [১২৫] 'ভেদ' পদ্ধতিতে স্থানবিশেষে পার্থক্য দেখা যায়। সাধন-জীবনের সূত্রপাত হইতেই প্রত্যেক সাধকের এই 'ভেদ' অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম। সম্প্রদায়-ভেদে ও গুরু-ভেদে ইহার পদ্ধতির তারতম্য হয়। প্রথম দুই 'চন্দ্রের' আর একটি 'ভেদ'-পদ্ধতি আছে, তাহাকে ব্যবহারিক ভাষায় 'রস-রতির মিলন' বলা হয়। লালনশাহী ফকিরগণ একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই মিলনের অনুষ্ঠান করে; নবদ্বীপ ও রাঢ়ের বাউলগণ করে অন্য সময়ে। পদ্ধতিতেও বিভিন্নতা আছে। তবে প্রত্যেকেই এই 'রস-রতি'র মিলন-সাধন করে। ইহা তাহাদের সাধনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সাধকের সাধনার অগ্রগতি ও ফল বিবেচনা করিয়া গুরু ক্রমে উপদেশ দিয়া 'চন্দ্র-ভেদ' শিক্ষা দেন। কোন্ শ্রেণীর সাধকের পক্ষে ইহা প্রয়োজন এবং কোন্ স্তরে প্রয়োজন, তাহা গুরুর বিবেচনা ও আদেশসাপেক্ষ। বাউল-সাধকগণ বলেন, প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃতে পরিণত হইতেছে কিনা, জড়দেহ 'পক্ব' বা "সিদ্ধদেহ"-এ রূপান্তরিত হইতেছে কিনা, রূপ হইতে স্বরূপে—ভাব-দেহে সাধক কতদূর উন্নীত হইতেছে, তাহারই পরীক্ষার জন্য 'চারিচন্দ্র-ভেদ' প্রয়োজন।

১২৩। **Post-Chaitanya Sahajia Cult of the Vaishnavas** (Introduction),—Page 3.

১২৪। **"In a general way, the Sadhakas of the Vaishnav Sahajia order, and orders akin to it, with their secret practices involving the four moons, are well-known as Bauls"—Page 184.**

১২৫। শুক্র, রক্ত, বিষ্ঠা ও মূত্র

এই মতের সাধকদের পূর্ণ সাধনার পক্ষে চারিটি চন্দ্রই ভেদ করা অবশ্য কর্তব্য।

অক্ষয়কুমার দত্তের কতকগুলি মন্তব্য ও বর্ণনা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া মনে হয়। বাউল সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নরমাংস-ভোজন (মৃতদেহ) এবং শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করা প্রচলিত আছে।" দত্ত মহাশয়ের এই কথা শুনিলে বর্তমান বাউল-সম্প্রদায়ের লোকেরা নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবে। সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মাংস-ভোজন-প্রথা নাই। ইহারা অনেকে মাছ খায় বটে, কিন্তু মাংস ধর্মনির্দেশের বহির্ভূত বলিয়া খায় না। মুসলমান বাউলদের মধ্যেও এ নিয়ম সর্বত্র দেখিয়াছি। অবশ্য ব্যতিক্রম সকল ধর্মেই আছে এবং মনুষ্যজনোচিত দুর্বলতাও সর্বত্র আছে। যদি কেহ কোন দিন মাংস খায়, তবে তাহা নিতান্ত গোপনভাবে। এগুলি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। 'নর-মাংস-ভোজন' বা 'শবের বস্ত্র-পরিধান' বলা বাউলদের নামে একটা কাল্পনিক বীভৎসতা-আরোপমাত্র।

দত্ত মহাশয় বাউলদের বেশভূষার সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন, সেরূপ বেশভূষা বর্তমানে দেখা যায় না। যাহারা হিন্দুজাতীয়, তাহারা সাধারণ বৈষ্ণবের মত মালা-তিলক ধারণ, ডোর-কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করে, গায়ে দেয় হলুদ রঙের আলখাল্লা। ভিক্ষার সময় ভিক্ষার ঝুলি, লাঠি ও নারিকেলের মালা সঙ্গে থাকে। সাধারণতঃ চুল দাড়ি রাখে, কিন্তু সকলেই মাথার চুল উঁচু করিয়া 'ধম্মিল্ল' করিয়া বাঁধে না। অনেক হিন্দু বাউলকে দেখিয়াছি হলুদরঙের পরিবর্তে লালরঙের আলখাল্লা পরে এবং দাড়ি-গোঁফ কামায়। তবে মাথার চুল বাবরী করিয়া রাখে। মুসলমান বাউলরা সাধারণতঃ সাদারঙের লুঙি পরে এবং গায়ে দেয় একটা লম্বা সাদা আলখাল্লা-জাতীয় পিরান। কেহ কেহ হলুদরঙের লুঙি ও ঐ রঙের আলখাল্লা পরে। অনেকের গলায় স্ফটিক, প্রবাল, পদ্মবীজ ইত্যাদির মালা থাকে, আবার কাহারও কাহারও বা গলায় কোনো মালাই থাকে না। ইহারা প্রায়ই দাড়ি-গোঁফ কামায় না, কিন্তু কোনো কোনো স্থলে দাড়ি-গোঁফ কামান দেখা যায়। লালন-সম্প্রদায়ের সকলেই দাড়ি-গোঁফ ও লম্বা চুল রাখে; পাঞ্জু-সম্প্রদায়ের দুই-একজনকে দাড়ি-গোঁফ-কামানো অবস্থায়ও দেখিয়াছি। শ্রীহট্টের বিখ্যাত বাউল-গুরু চাওয়াল শাহ্ ফকিরকে দেখিয়াছি, তাঁহার দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কারভাবে কামানো। বারাসত ও বসীরহাট মহকুমার (২৪ পরগণা জেলা) কয়েকজন ফকিরের দাড়ি-গোঁফ কামানো দেখিয়াছি।

পূর্বে বাউলদের সকলেই ভিক্ষাজীবী ছিল, কিন্তু বর্তমানে কিছুসংখ্যক আর ভিক্ষাজীবী নয়। মুসলমান বাউলদের কাহারো কাহারো জমি-জমা আছে। সময়বিশেষে তাহারা মাঠে জমি চাষ করে এবং কখনো ভিক্ষায় বাহির হয় না। ফরিদপুর ও খুলনা জেলার কতকগুলি নমঃশূদ্র-শ্রেণীর বাউলকে জানি, তাহাদের কিছু জমি-জমা আছে এবং সময় সময় তাহারা ছুতার মিস্ত্রির কাজ করে। ঢাকা জেলার নরসিংদির বাউল-সম্প্রদায়ের অনেকে এখন নানারূপব্যবসায় ও চাকুরি করে।

আমাদের কল্পনায় বাউল-নামে এক অদ্ভুত জীব বাস করে এবং এই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই এতদিন তাহাদের বর্ণনায় বেশ খানিকটা রঙ্ চড়ানো হইয়াছে। বর্তমানে সারা বাংলায় যাহাদের দেখিতেছি, তাহাদের মধ্যে অদ্ভুতত্ব বা বীভৎসতা কিছুই নাই। অতি নিরীহ, শান্ত, সংযত, সর্বদা আত্মগোপনশীল, সাংসারিক ভোগ-বিলাসে উদাসীন, ভাবের ঘোরে আত্ম-সমাহিত ও অন্যমনস্ক এক সম্প্রদায়,—প্রবল দারিদ্র্য ও নানা সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিয়াও নীরবে এবং স্থির বিশ্বাসে আপন ধর্ম-সাধন করিতেছে। বাংলার পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন যে, প্রায় গ্রামেই বৈষ্ণবদের একটি আখড়া ছিল, সেখানে 'বোষ্টম' ও 'বোষ্টমী' বাস করিত। এখনও অনেক গ্রামে সেই সব আখড়ার অস্তিত্ব আছে এবং সেখানে এখনও 'বোষ্টম-বোষ্টমী'রা বাস করে। তাহারা একতারা বাজাইয়া গান করিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে, কখনো বা এমনিই ভিক্ষা করে। সমাজের বাহিরে থাকিয়া, নিতান্ত দরিদ্র জীবন যাপন করিয়া ইহারা নিজেদের সাধন-ভজন লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছে। মুসলমান ফকিরদের অনেকের নামমাত্র একটা আস্তানা আছে, তাহারাও গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া বা অমনিই ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা নাই, কোনো অর্থ-সম্পদ নাই, শরীয়ত-বাদীদের দ্বারা তাহারা সর্বদা নির্যাতিত, তবুও তাহাদের মত ও পথ তাহারা ত্যাগ করে নাই।

দত্ত মহাশয়ের বিবরণীতে 'নেড়া' বলিয়া যে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠা যেরূপেই হোক, বর্তমানে তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য আর নাই। তাহাদের ভজন-সাধন, বেশ-বাস উভয় বঙ্গেই বাউল সম্প্রদায়ের মতো। মুসলমান ফকিরদেরও 'নেড়ার ফকির' বলা হয়। "এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহুদেশে তাম্র অথবা লৌহের কড়া রাখে"—ইত্যাদি যাহা দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, তাহা কোথাও দেখি নাই। তবে ব্যক্তিগতভাবে যদি কেহ ধারণ করে, সেকথা স্বতন্ত্র।

'সহজী' বলিয়া কোনো স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বর্তমানে বাংলায় দেখা যায় না। সারা বাংলায় এই সম্প্রদায়ের সকলেই 'সহজিয়া'। 'সহজিয়া'-মত ইহাদের মূলতত্ত্ব ও দর্শন। স্বরূপে যে প্রত্যেক পুরুষ কৃষ্ণ এবং প্রত্যেক নারী রাধা—ইহা সকলেরই মূলতত্ত্ব। ইহাদের যুগল-মিলন-সাধনই তাহাদের পরমার্থ। "প্রত্যেক পুরুষই অনেক প্রকৃতিকে শ্রীরাধা এবং প্রত্যেক প্রকৃতিই অনেক পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে ভজনা করিয়া বৃন্দাবন-লীলার অনুকরণ করিতে পারেন।"—ইত্যাদি উক্তি বর্তমানে এইপ্রকার সাধকদের সম্বন্ধে খাটে না। ইহা তাহাদের কুৎসা-রটনার মত শোনায়। এক 'প্রকৃতি' থাকিতে অন্য 'প্রকৃতি'-গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে এক প্রকৃতিকে একেবারে ত্যাগ করিয়া অন্য প্রকৃতি গ্রহণ করা যায়। প্রকৃতি-নির্বাচন ও প্রকৃতি-পরিত্যাগ সম্পূর্ণভাবে গুরুর অনুমতি ও আদেশের অধীন। বাউল-ধর্মের একখানি প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তকে 'প্রকৃতি-সঙ্গ' সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে :

"একের সহিত ধর্ম ধর্ম বলি তারে,
দুয়ের সঙ্গে করিলে ধর্ম বেশ্যা গণ্য করে।
তিনের সঙ্গে করিলে ধর্ম রসাতলে যায়,
চারের সঙ্গে ধর্ম করিলে নরক ভুঞ্জয়।" [১২৬]

ইহাতে বুঝা যায়, এক প্রকৃতির সঙ্গে ধর্মাচরণই প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট ধর্মাচরণ।

'দরবেশ' বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বর্তমানে দেখা যায় না। বাউল-পন্থী মুসলমান ফকিরদের মধ্যে যাঁহারা সাধনমার্গে উচ্চস্থানে পৌছিয়াছেন, এবং যাঁহারা গুরুস্থানীয়, তাঁহাদিগকে দরবেশ বলা হয়। কোনো কোনো গানে 'দরবেশ লালন শা কয়' এইরূপ উক্তি দেখা যায়। [১২৬ক] লালন প্রকৃত দরবেশ-পদবাচ্য ছিলেন।

দত্ত মহাশয় 'সাঁই' বলিয়া এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : "সাঁইএরা কখন কখন নিতান্ত লোকবিরুদ্ধ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এবং সুরাপান, গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি হিন্দুমতবিরুদ্ধ অশেষবিধ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলে।" এরূপ কোনো একটি সম্প্রদায় বর্তমানে বাংলাদেশে আমার চোখে পড়ে নাই। বাউল-গানগুলির মধ্যে 'সাঁই' কথাটির বহু প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে—সংগীত-রচয়িতা ভগবানকে 'সাঁই' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুই-এক স্থলে

১২৬। 'ব্রজ উপাসনা', প্রথম খণ্ড ও 'পৌর্ণমাসীর গুপ্ত উপাসনা' দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীকাঙাল প্রেমচাঁদ বাউল (সাং পাহাড়পুর) কর্তৃক প্রকাশিত ও ১৮৮৩ সালে মুদ্রিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার-পুস্তক, নং ৫০৩।

১২৬ক। গান নং ১৮৭ দ্রষ্টব্য

'সাঁই' অর্থে গুরু বা গুরু-স্থানীয় বিশেষ সাধককেও বুঝাইয়াছে। 'সাঁই' 'স্বামী' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

দত্ত মহাশয় 'আউল' নামে যে সম্প্রদায়ের বিবরণ দিয়াছেন, সেরূপ সম্প্রদায় কোথাও আছে বলিয়া জানি না। বোধ হয় এই সম্প্রদায়ের বর্ণনায় কল্পনা তাঁহাকে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে: "ইহাদের পরমার্থসাধন কেবল দুই-একটি নিজ প্রকৃতি সহবাসে পর্যাপ্ত হয় না, কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদের সাধন সম্পাদনে নিয়োজিত থাকে।" সুনীতিজ্ঞান-সম্পন্ন ও সুরুচিশীল এই ভদ্রলোক ধর্ম-সাধনে প্রকৃতি-সঙ্গের কথা শুনিয়া এমনই বিরক্ত হইয়াছেন যে, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত ঘটনাই ইহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। সাধনায় প্রকৃতি-সঙ্গ সাধারণ ব্যাপার নয়। ইহা সুকঠিন যোগ-সাধনা। একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে গুরুর উপদেশে এবং কোনো কোনো স্থলে গুরুর সান্নিধ্যে এই যোগক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। "ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ব্যবহার" করা যায় না। ইহা ব্যভিচার নয়—অবাধ ইন্দ্রিয়ভোগ নয়। দত্ত মহাশয় বাহির হইতে যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহার সহিত নিজের মন-গড়া একটা ধারণা মিশাইয়া এই বিবরণ দিয়াছেন। তিনিই বলিতেছেন যে, "৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় শ্যামবাজারে একটি আউল ছিল" (অর্থাৎ প্রায় ১৮৫০ খৃঃ), এবং "এক্ষণে এ সম্প্রদায়ের লোক এদেশে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

বর্তমানে মুসলমান বাউলদের মধ্যে কোনো কোনো সাধককে 'আউল' বা 'আউলিয়া' বলা হয়। তাহাদের গুরুরা আউলিয়া নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন তত্ত্ব-দৃষ্টিসম্পন্ন উচ্চাঙ্গের সাধক। তাঁহাদের নিকট হইতে যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ঐসব আউলিয়াদের শিষ্য বলিয়া নিজেদেরও 'আউল' বা 'আউলিয়া' বলে। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ আউলিয়াদের কয়েকটি গুরুপীঠ আছে। এই গুরুপীঠকে 'গদি' বলে। ঐ 'গদি' বা 'ঘর'-এর শিষ্যেরা সময় সময় নিজেদের আউলিয়া নামে অভিহিত করে। ইহাদের মতবাদ বা সাধন-পদ্ধতিতে বাউলদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। আউল বা আউলিয়া বর্তমানে বাউলদেরই নামান্তর।

'কর্তাভজা'-সম্প্রদায় এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বাউল ধর্মের একটি শক্তিশালী সংঘরূপে বর্তমান ছিল। এখনও প্রতিবৎসর দোলপূর্ণিমার সময় একটি মেলার অনুষ্ঠানে পূর্বস্মৃতি রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর মহকুমার ঘোষপাড়া গ্রামে 'কর্তাবাবা' রামশরণ পালের বাড়ীতে এই মেলার

অনুষ্ঠান হয়। এই মেলায় বহু হিন্দু বাউল ও মুসলমান ফকির সমবেত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ঘোষপাড়ার মেলা ও বীরভূম জেলায় কেঁদুলীর মেলাই বাউল-সমাবেশের বিশিষ্ট স্থান। আর দুইটি ছিল রাজশাহী জেলায়—খেতুরের মেলা ও প্রেমতলীর মেলা। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত সেসব মেলার কিরূপ সৌষ্ঠব আছে জানিনা, তবে ঘোষপাড়া ও কেঁদুলী এখনও অস্তিত্ব কোনোরূপে বজায় রাখিয়াছে। তবে এই দুইস্থানেও দেখিয়াছি যে, বাউলদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ইহার প্রধান কারণ, বোধ হয় এই সম্প্রদায় এখন বিপুপ্তির পথে চলিয়াছে।

কর্তাভজা-সম্প্রদায় সহজিয়া-ধর্মের উপাসক এবং ইহাদের তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি সারা বাংলায় একই শ্রেণীর সাধন-পদ্ধতির সমগোত্রীয়।

'কর্তাভজা'-সম্প্রদায়ের কতকগুলি মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা এই মেলায় বিক্রয় করা হয়। ইহা এই সম্প্রদায়ের কোনো প্রমাণিক পুঁথি-পত্র নয়। ব্যবসায়-বুদ্ধি হইতে মেলার যাত্রীদের নিকট বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক এগুলি মুদ্রিত। ইহার মধ্যে 'কর্তাভজন ধর্মের আদি-বৃত্তান্ত বা সহজতত্ত্ব প্রকাশ' নামে একখানা বই আছে। তাহাতে জানা যায়, এই ধর্মের আদি-প্রবর্তক 'ফকির-ঠাকুর' বা 'ফকির আউলচাঁদ', 'কর্তাবাবা' বা আদিগুরু রামশরণ পাল এবং আদি-প্রচারক তাঁহার পুত্র দুলালচাঁদ। এই বইখানি রামশরণ পাল, ফকির-ঠাকুর, রামশরণের স্ত্রী সতী-মা ও দুলালচাঁদের অলৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ; সেই সঙ্গে 'কর্তা-ভজন', 'গুরু-প্রসঙ্গ', 'মানুষ-ভজন', 'দেহতত্ত্ব-কথনং', 'ষটচক্র-নিরূপণ' এমন কি, 'ডালিমতলার মাহাত্ম্য' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি অধ্যায় আছে। আলোচনাগুলি নিতান্ত ভাসা-ভাসা, উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কতকগুলি সাধারণ শাস্ত্র ও নীতিকথা পল্লবিত ভাষায় প্রকাশ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা আছে। তবে এই বইখানির মধ্য হইতে বাউল ধর্ম-প্রচারের একটা ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

বইটির প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু এইরূপ :

অদ্বৈতাচার্য প্রেরিত প্রহেলিকা পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি গোপীনাথ-মন্দিরে আত্মগোপন করিলেন। সংসারী মানুষের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। "স্বল্পায়ু, ক্ষীণবল, কলির মানবের পক্ষে কঠোর ধর্মাচরণ, ধ্যান-ধারণা সহজসাধ্য নয়, তাই মানুষকে ভজনা করিয়াই সেই মানুষের মধ্যে তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে পারে, তাহারই সহজ পন্থা নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে" তিনি অন্যভাবে দেহ ধারণ করিলেন।

অনেকে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের অর্থ বুঝিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন :

"অদ্যাবধি নিত্যলীলা করে গোরা রায়।
ভাগ্যবান যেই সেই দেখিবারে পায়॥
আদি-অন্ত বিচারিয়া বুঝ নিজ ভাবে।
চৈতন্যের নিরূপণ পাইবে স্বভাবে॥
শেষ লীলা চৈতন্যের অপ্রকট ভাব।
না পারে বুঝিতে কেহ তাঁর সে স্বভাব॥
নানা লীলা সম্বরিয়া মিশিলা মানুষে।
কেহ বলে পাষাণে মিশিলা অবশেষে॥
না পারে বুঝিতে কেহ চৈতন্য-চরিত্র।
যে বুঝে সে মতে হয় তাহাতে উন্মত্ত।
মানুষে পাষাণে কভু মিলন না হয়।
সহজে সহজ মানুষ হইলেন উদয়॥
সেই বস্তু স্থায়ী হয় ভাবুক হৃদয়ে।
যাহার যে ভাব ইহা বুঝ বিশ্বাসিয়ে॥"

চৈতন্যদেব কন্থাধারী মুসলমান ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া ত্রিবেণীর ঘাট পার হইয়া কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী ঘোষপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘোষপাড়ার সদ্গোপ-বংশীয় রামশরণ পালের সহিত ফকিরের দেখা হইল। ফকিরকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া পাল মহাশয় আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং সংসারের কাজ-কর্ম ছাড়িয়া তাঁহারই নিকটে পড়িয়া থাকিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার স্ত্রী 'সতী-মা' ফকির ঠাকুরকে বাড়িতে লইয়া আসিলেন এবং বাড়ীর এক অংশে ফকিরের জন্য একটি পৃথক কুটীর নির্মাণ করিয়া দিলেন।

পাছে লোকে জানিলে পাল মহাশয়কে সমাজে নির্যাতিত হইতে হয়, সেই জন্য বাড়ীতে মুসলমান-ফকিরের অবস্থান গোপন রাখা হইল। কিন্তু শীঘ্রই ফকিরের অলৌকিক শক্তির কথা সকলে জানিতে পারিল। বাইশজন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এই শিষ্যগণ লইয়া তিনি শুক্রবার রাত্রে এক বৈঠক করিলেন। সেই বৈঠকে রামশরণ পাল মোহান্ত নিযুক্ত হইলেন। ফকিরের আদেশ অনুসারে তিনি হইলেন' কর্তাবাবা'। "ফকির-ঠাকুরই কর্তাভজন-ধর্মের আদি প্রবর্তক এবং রামশরণ পালই আদি-গুরু বা কর্তাবাবা।"

বাইশজন শিষ্যের বিবরণ এইরূপ লেখা আছে :

"শুন সবে ভক্তিভাবে নামমালা কথা।
বাইশ ফকিরের নাম ছন্দেতে গাঁথা ॥
জগদীশপুরবাসী বেচু ঘোষ নাম।
শিশুরাম কানাই নিতাই নিধিরাম ॥
ছোট ভীম রায় বড় রমানাথ দাস।
দেদোকৃষ্ণ গোদাকৃষ্ণ মনোহর দাস ॥
খেলারাম ভোলানাড়া কিনু ব্রহ্মহরি।
আন্দিরাম নিত্যানন্দ বিশু পাঁচকড়ি ॥
হটু ঘোষ গোবিন্দ নয়ান লক্ষ্মীকান্ত।
ইহারাই ভক্তিপ্রেমে অতিশয় শান্ত ॥
পূর্বের অনুসঙ্গী এই বাইশ জন।
এরাই করিল আসি হাটের পত্তন ॥"

কর্তা-ভজনের কয়েকটি মূলসূত্র এইরূপ :

"নরনারী দুইজনে হইবে চেতন।
শক্তির মন্ত্রেতে কর শক্তির পূজন ॥"
... ...
"নারী হিজরে পুরুষ খোজা এই তো লক্ষণ।
সাবধানে কর সবে সাধন ভজন ॥"
... ...
"সুধা ফেলে বিষপানে মত্ত অতিশয়।
বিষ ত্যজি সুধা খাও ওহে মহাশয় ॥"

তারপর ফকির ঘোষপাড়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, কিন্তু শীঘ্রই রাম-শরণের পুত্র দুলালচাঁদরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে যে কর্তাভজা-সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, উইলসন সাহেবের পুস্তকে এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে পর পর সেন্সাস-বিবরণীতে এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। বাংলায় অন্য কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে এরূপ দীর্ঘ বিবরণ আর নাই।

উইলসন সাহেব তাঁহার 'Hindu Religions or An Account of

the Various Religious Sects of India' পুস্তকে কর্তাভজা-সম্প্রদায় সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :

"Kartā Bhajās . . . . are a sect of very modern origin, having been founded no longer than 30 years ago by Ram Sundar Pal, a Gawla, an inhabitant of Ghospara, a village near Sukhsagar in Bengal. The chief popularity of this sect is the doctrine of the absolute divinity of the guru, at least being the present Krishna or deity incarnate, and whom they, therefore, relinquishing every other form of worship, venerate as their Ista Devata or elected God. . . . the innovation is nothing, in fact, but an artful encroachment upon the authority of the old hereditory teachers or Gossains, and an attempt to invest a new family with spiritual power ; the attempt has been so far successful that it gave affluence and celebrity to the founder, to which, as well as his father's sanctity, the son, Ram Dulal Pal, has succeeded. It is said to have numerous disciples, the greater portion of whom are women. The distinction of caste is not acknowledged amongst the followers of the sect . . . they eat together . . . once or twice a year: the initiating Mantra is supposed to be highly efficacious in removing disease and barrenness, and hence many infirm persons and childless women are induced to join the sect."

'Bengal District Gazetteers' (Nadia)-তে হিন্দুজাতির ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিবরণে কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের বিবরণ আছে (Pages 47-49)। এই বিবরণ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচটি সেন্সাসের গৃহীত বিবরণকে ভিত্তি করিয়া লিপিবদ্ধ করা। উহাতে লিখিত আছে :

"The Kartabhaja sect was founded about the middle of the 18th century, and took its origin at the village of Ghoshpara in the Chakdah thana. The name of the founder was Ram-Saran Pal, who was by birth a sadgop and by profession a

cultivator. With him was associated a religious mendicant who was known as Fakir Thakur.

"A local legend relates how, while Ram Saran was tending his flock, Fakir Thakur suddenly appeared before him and asked for a cup of milk. While he was drinking it, a messenger came up and said that Ram Saran's wife had been taken seriously ill and was at the point of death. Fakir Thakur offered to go there and cure her, and taking some mud from the nearest tank, he anointed the body of the dying woman with it and restored her instantly to full health and strength. He then said that he must himself be born of the woman whose life he had saved, and miraculously disappearing, was in due time born as Ram Saran's son, and received the name of Ram Dulal.

"According to another account Ram Saran was born near Chakdaha ; he caused dissensions in his family owing to the fact that he gave himself up entirely to religious exercises and neglected temporal affairs ; not caring to remain with his family under such circumstances he left them and went to Ghoshpara where he found favour with one of the leading residents, and was allowed to settle there and marry the daughter of one Govinda Ghosh. Not long after his marriage he was visited by a strange Fakir, who informed him that he had just been beaten by some soldiers of the Nawab of Bengal and had to make his escape by miraculous means; he had in his hand a small vessel, and he said that he had gathered the water of the Ganges in it, in order that he might pass over dry shod. Ram Saran comforted him, and before he took his departure persuaded him to leave behind the miraculous vessel which is still preserved as a valuable relic in the family of Babu Gopal Krishna Pal. The Fakir settled in his own village

in the Bongong subdivision, and established a band of Fakirs, who performed many miracles, and propagated many tenets of the new faith over all the districts of the Presidency Division.

"Ram Saran Pal is believed to have died in the year 1783, and his place as head of the sect was taken by his son Ram Dulal or Dulal Chand. He appears to have been a man of marked personality and considerable power of proselytism. He impressed a number of leading men of his time with his teaching, and added very largely to the numbers of the sect by the time of his death which took place in 1833.

He was succeeded as Karta by his son Iswar Chandra, but since the death of the latter, there has been no generally recognised Karta; at present each of the four surviving members of the family heads a separate church, which is attended by his special adherents and admirers. Under these circumstances the popularily of the sect has greatly declined.

"The census of 1901 furnishes no reliable indication as to the number of the sect. A great majority imbued this religion as Hindu or Mahomedan as the case might be, but in the returns it was not differentiated."

উইলসন সাহেব রামশরণকে 'রামসুন্দর' করিয়াছেন।

ঘোষপাড়ার উক্ত বইখানির মুখবন্ধে আছে :

"বঙ্গাব্দ ৯৪০ সালে নীলাচলে মহাপ্রভু অন্তর্ধান করেন।... ...১৬১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১০১ সালে আমরা আউলচাঁদের আবির্ভাব দেখিতে পাই... ...এই ফকির আউলচাঁদই নদীয়ার সেই গোরাচাঁদ—রূপান্তর ধরিয়া নবধর্মের প্রবর্তন করিতে উদয় হইয়াছিলেন।... ...ঘোষপাড়ানিবাসী রামশরণ পালের সহিত মিলিত হন, এই রামশরণ আদি পুরুষ।

আউলচাঁদ ১১৭৬ সালে অন্তর্ধান করেন, ১১৮২ সালে শ্রীশ্রীদুলালচাঁদরূপে রামশরণের ঔরবে ও সতী-মার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দুলালচাঁদই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্তাভজন ধর্মের প্রচারক।"

দুলালচাঁদ ৫৭ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সুতরাং তিনি ১২৩৯ বঙ্গাব্দে মারা যান।

এই বইটি হইতে ও অন্যান্য বিবরণী হইতে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি :

(১) কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা একজন মুসলমান ফকির। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১১০১ সাল) তিনি পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলে আসেন এবং দীর্ঘদিন রামশরণ পালের বাড়ীতে বাস করিয়া ধীরে ধীরে অতি সঙ্গোপনে স্বীয় মতবাদ প্রচার করিয়া ২২জন শিষ্য করেন এবং শেষে রামশরণ পালকে মোহান্ত বা প্রধান গুরু ('কর্তাবাবা') করিয়া একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশ ত্যাগ করেন। তাহার কিছু পূর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ধর্ম-সম্প্রদায়টি এই অঞ্চলে সুপরিচিত হয়। তারপর দুলালচাঁদের সময়ে এই ধর্মমত পশ্চিমবঙ্গের একটা বৃহৎ অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত হয়।

(২) এতকাল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে গুরু হিসাবে ব্রাহ্মণ-গোস্বামিগণের প্রভাব প্রবল ছিল, কিন্তু এতদঞ্চলে এক জন সদ্গোপকে গুরুপদে বরণ করিবার ইতিহাস বোধ হয় এই প্রথম। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো জাতিভেদ ছিল না। এই সদ্গোপ মোহান্তের হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যেরা একসঙ্গে আহারাদি করিত।

ইহার ক্ষীণধারা ও আবহাওয়া এখনও বাৎসরিক মেলাটিতে বর্তমান আছে বলিয়া মনে হয়।

দোল-উপলক্ষ্যে ঘোষপাড়ার জঙ্গলাকীর্ণ জীর্ণ বাড়ী ও বিস্তৃত বাগানটি পরিষ্কার করা হয়; সাময়িকভাবে দুই-একটি নলকূপও বসান হয়। অনেক মুসলমানফকির ও হিন্দুবাউল এখানে সমবেত হইয়া থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের ফকির ও বাউলরা প্রতি বৎসর একটা প্রণামী দিয়া লিচুগাছগুলির তলায় সাময়িক আস্তানা গাড়িবার অধিকার পায়। তারপর বিভিন্ন দলে বিভক্ত বহুলোক রান্না-বাড়া করিয়া একত্র বসিয়া আহার করে। সকল যাত্রীই, এমনকি গৃহী যাত্রীরাও, এখানে আসিয়া রান্না করিয়া একত্র বসিয়া খাওয়াটা একটা বিশেষ ধর্ম বলিয়া মনে করে—সেইটাই এখানকার একমাত্র তীর্থ-কৃত্য।

মনে হয়, এই স্থান হইতে সহজ-ধর্মের প্রচারে জাতিভেদ-প্রথা লুপ্ত হইয়াছিল এবং সদ্গোপকেই গুরু করিয়া হিন্দু ও মুসলমান সাধকগণ একাকার হইয়া মিশিয়াছিল,—ইহারই স্মৃতি ও সংস্কার এখনও লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

(৩) কোনো সাধুর বা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে প্রথম প্রথম কতকগুলি

অলৌকিক কার্যই প্রচারের পক্ষে অনুকূল হয়। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধেও ব্যাধি-নিরাময় ও স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দূর হওয়ার একটা প্রসিদ্ধি প্রথমে ব্যাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয়।

মেলায় দেখিয়াছি, 'হিমসাগর' নামক এক স্বল্প-জল এঁদো পুকুর হইতে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়চোপড়ে অনেক ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী-পুরুষ 'ডালিমতলা' নামক স্থানে গড়াগড়ি দিতেছে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশি। ইহাতে মনে হয়, এই ধর্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি-আরোগ্যের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল। ফকির সাহেবও পুকুরের কাদা মাখাইয়া রামশরণ পালের স্ত্রীর ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছিলেন বলিয়া একটি বিবরণীতে উল্লিখিত আছে।

(৪) প্রথম প্রচারের সময় হইতেই এই মতবাদকে যতদূর সম্ভব চিরাচরিত হিন্দুধর্মের নৈতিক বা দার্শনিক তত্ত্বের একটা আবরণ দিবার চেষ্টা আছে। দুলাল-চাঁদ-রচিত 'ভাবের গীত'* নামক বইখানির দীর্ঘ পদগুলির মধ্যে অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতির প্রয়োগে এবং অনেকটা অবান্তর উপমার সমাবেশে অন্তর্নিহিত ভাবটিকে অস্বচ্ছ ও ইঙ্গিতাত্মক করিবার চেষ্টা আছে এবং ব্রহ্মা, কালী, শিব, রাম, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতির উল্লেখে হিন্দুধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটা আবরণ দিবার প্রয়াস আছে। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে 'গুরুবাদ', 'মানুষ-ভজন', 'রূপ-স্বরূপের বিচার', 'যোগ-ক্রিয়া', 'রসের ভজনে সাবধানতা', 'নারী হিজরে পুরুষ খোজা হইয়া নর-নারীর সাধন-ভজন', 'প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধ-নিবৃত্তি' প্রভৃতি সাধকের স্তর, "বিষ ত্যজি' সুধা খাওয়া" প্রভৃতি বহু বাউল-তত্ত্বের কথা একটু চেষ্টা কলিলেই বুঝা যায়।

অক্ষয়কুমার দত্ত বলিয়াছেন : "বোধ হয় সম্প্রদায়-প্রবর্তকের অভিপ্রায় উত্তমই ছিল, কিন্তু তাঁহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। বিশেষতঃ ব্যভিচারদোষ তাঁহাদের সকল গুণগ্রাম গ্রাস করিয়াছে।"

দত্ত মহাশয় তাঁহার বর্ণিত আউল-বাউল-নেড়া-কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, তাই পুনঃ পুনঃ তাহাদের স্কন্ধে ব্যভিচার-দোষ চাপাইয়াছেন। কিন্তু ইহা ব্যভিচার নয়—সুকঠিন যোগ-সাধনা। প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন তাহাদের ধর্ম-সঙ্গত প্রধান ক্রিয়া—'নারী হিজরে ও পুরুষ খোজা' হইয়া সাধনা। এই মিলন কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নয়—কাম দমন করিবার জন্য—কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করিবার জন্য। নানা

* লালশশী ভণিতাযুক্ত [লালশশী—(দু) লাল + চাঁদ (শশী)]

সহজিয়া-গ্রন্থে ও বাউল-গানে ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে।[১২৭] অবশ্য ধর্মের নামে ব্যভিচার হয়তো ইহাদের অনেক ব্যক্তিই করিতে পারে এবং মনুষ্যজনোচিত দুর্বলতাও স্বাভাবিক, কিন্তু এমন হিন্দু ও মুসলমান সাধক দেখিয়াছি, যাহারা নির্লিপ্ত হইয়া স্থিরচিত্তে ধর্ম-সাধনার অঙ্গ-স্বরূপেই এই যোগ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে।

একটা বিষয়ের আলোচনা এখানে প্রয়োজন মনে করি। তাহা না করিলে বাংলার বাউল-গানের ও বাউল-ধর্মমতের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল বুঝিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে।

বাংলার বাউল-গান-সংগ্রহ ও বাউল-মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিবার অনুপ্রেরণা লাভ করি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত কয়েকটি বাউল-গানের নমুনা দেখিয়া। ঐ গানের কয়েকটি 'প্রবাসী'র 'হারামণি'-শীর্ষক বিভাগে ও পরে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং

১২৭। (ক) "ব্যভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে
নরকে যাইবে তবে।"

—পদ

(খ) "অনিত্য প্রকৃতি সঙ্গে সর্বধর্ম যায়।"

—রসসার

(গ) "যদি বাহ্য সুখে সদা মজ মোর মন।
তবে তো না পাবে ভাই সে আনন্দ ধন।"

—প্রেমানন্দ লহরী

(ঘ) "স্ত্রীসঙ্গ করিলে নিজ আত্মহারা হবে।
আত্মানষ্ট হইলে জীব অধোগতি পাবে।"

—বিবর্ত বিলাস

(ঙ)
দেহরতি সম্বন্ধীয়ে পরশে প্রকৃতি।
কোন জন্মে তার নিস্তার না হয়।
ভোগ ভুঞ্জায় তারে যম মহাশয়।"

—আনন্দ ভৈরব

(চ) "রাগের সন্ধান জানে কামী কি কখন।
মদনাবিষ্টে আত্মা হারায় তখন।"

—রাগময়ী কণা

(মণীন্দ্রমোহন বসু-কৃত 'রাগাত্মিকা-পদের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত,—পৃঃ ৬০ এবং দ্রষ্টব্য বাউল গান নং—১৪৩, ১৪৬, ১৫৫, ১৫৭, ১৮২, ২৭৭, ৩২০, ৩৪৩, ৩৪৭ ইত্যাদি।)

হাউস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গবীণা' নামক বাংলা কবিতা-সংগ্রহ-পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বাউল-গানের নমুনাস্বরূপ "নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে?"—ইত্যাদি কয়েকটি গান দেখিয়া পল্লী-কবিদের এইপ্রকার রচনায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যাই। প্রথম যৌবনের এই বিস্ময় পরিণত বয়সে বাউল-গান-সংগ্রহের প্রথম পর্ব পর্যন্ত ছিল। তারপর বাউল-গান-সংগ্রহের জন্য বাংলার নানাস্থানে ঘুরিয়া যে সমস্ত বাউল-গান পাইতে লাগিলাম, তাহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও কাব্যরস ইহাদের সমকক্ষ নয়, আর ঠিক এই ধরণের ভাব ও দার্শনিকতার নিদর্শনও তাহার মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রথম প্রথম বাউল-গান পাইয়া আমি হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি: "তোমরা তো আমাকে আসল ভালো বাউল গান দিচ্ছ না?" ইহার উত্তরে যাহাদের নিকট হইতে গান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারা বলিয়াছে: "গানের আসল-নকল, ভালোমন্দ বুঝি না। এই সব গান গুরুর কাছ থেকে পেয়েছি, গুরুও তাঁর গুরুর কাছ থেকে পেয়েছেন। আমরা সকলেই এই সব গান গাই। সেই গানই আপনাকে বলছি। অন্য গান তো জানি না।"

তারপর দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলায় বাউল-গান-সংগ্রহের অভিজ্ঞতায় দেখিলাম, এই ধরণের গান বাংলার বাউলদের মধ্যে মিলে না। ক্ষিতিমোহনবাবুর গানের অনুরূপ ভাব-প্রকাশক গান দুই একটি মিলিলেও ঐরূপ প্রকাশ-ভঙ্গী দেখা যায় না। বাউলদের নির্দিষ্ট সাধন-মার্গের তত্ত্ব, বিধি ও নিষেধ, সাধন-মার্গের নানা অভিজ্ঞতা প্রভৃতিই তাহাদের গানের প্রধান বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন রচয়িতার রচনার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বাদ দিলে সমস্ত গানই প্রায় একই প্রকারের। এই দিক দিয়া অধ্যাপক মনসুরুদ্দীন সাহেব-সম্পাদিত দুই খণ্ড 'হারামণি'তে যে সমস্ত বাউল গান সংগৃহীত হইয়াছে, স্থানে স্থানে পাঠ-বিকৃতি বাদ দিয়া ধরিলে, সেইগুলিই বাংলার প্রকৃত বাউল-গান। ঐ রকমের গানই আমি নানাস্থানে পাইয়াছি। কিন্তু ক্ষিতিমোহনবাবুর সংগৃহীত কয়েকটি গানের সহিত তাহাদের ভাব, ভাষা, উপস্থাপন প্রভৃতিতে মৌলিক প্রভেদ বর্তমান।

ক্ষিতিমোহনবাবুর গানের রচয়িতা বাউলগণ কোথায় গেল? যে-সব বাউল আড়াই শত বৎসর বা তাহার অধিককাল বাংলার বুকে বাস করিয়া গুরু-শিষ্য-পরম্পরা গান-রচনা ও সেই বাউল-ধর্ম-সাধন ও যাজন করিয়া আসিতেছে, সেই বাউলদের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনবাবুর বাউলদের কি কোনো সম্বন্ধ নাই? তাহাদের সাধনার মূল প্রকৃতি কি ক্ষিতিমোহনবাবু অবগত নন? এই সব প্রশ্ন অনেকদিন

ধরিয়া আমার মনকে আন্দোলিত করিয়াছে। একবার তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। লালন ফকিরের 'আসল খাতা'[১২৮] দেখিবার জন্য যখন শান্তিনিকেতনে যাই, তখন একদিন তাঁহার বাড়ীর সামনের বারান্দায় বসিয়া সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত আলাপ করিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। কিন্তু বাউল-গান ও বাউলের সাধনা সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের কোনো প্রত্যক্ষ উত্তর না দিয়া তিনি বাউলদের সম্বন্ধে নানা গল্পে সময় অতিবাহিত করিলেন। প্রথমপরিচয়ের সংকোচে আমি আর পুনরায় কোনো কথা তুলিতে পারিলাম না। ইহার কিছু পরেই ক্ষিতিমোহন বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউল সম্বন্ধে লীলা-বক্তৃতা দিলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেই বক্তৃতা শুনিলাম এবং বিশ্বভারতী পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত দেখিলাম।[১২৯] দুঃখের বিষয়, যে ঐতিহাসিক ও বিচার-মূলক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাংলার বাউল-মতবাদের প্রকৃত স্বরূপও তাহাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, তাহার সন্ধান মিলিল না। বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতি হইতে কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির পর শেষের দিকে হিন্দুতন্ত্রানুযায়ী যোগ ও ষট্‌চক্র-ভেদের কথা বলিয়া পূর্ণানন্দের 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' হইতে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রবন্ধ শেষ করিলেন। বাউলরা কি প্রকারের যোগ সাধনা করে, হিন্দুতন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র-ভেদ ও তাহাদের যোগের মধ্যে কি সাদৃশ্য ও প্রভেদ আছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। ষট্‌চক্র-ভেদ সম্বন্ধে শ্লোক-উদ্ধৃতিরই বা অর্থ কি? তাঁহার প্রবন্ধে বাউলরা শাস্ত্রবিধি ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম মানে না, দেব-দেবীর পূজা করে না, মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে, ভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করে, এই ধরণের বাউলদের বহিরঙ্গের মামুলী কথাগুলিই খুব ঘটা করিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সাধনার প্রকৃত স্বরূপ কি, সে সাধনা কোন্ তত্ত্ব ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। সংশয় মিটিল না, সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। ভাবিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-সমাজে, বিশেষ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে গূঢ় সাধন-তত্ত্ব ও প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা অশোভন বলিয়াই তিনি এ বিষয়ে নীরব থাকিয়া গিয়াছেন। তারপর সম্প্রতি দেখিতেছি, বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'বাউল-পরিচয়' নাম দিয়া বাউল সম্বন্ধে তাহার পূর্বের কথাগুলিই বিস্তৃত করিয়া ও তাহার সহিত কিছু সামান্য

১২৮। দ্রষ্টব্য—গানের অংশ—পৃঃ ৪

১২৯। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৫৭

নূতন কথা জুড়িয়া ক্রম-প্রকাশিত এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।[১৩০] তাহার মধ্যে সেই পূর্বের কয়েকটি গান এবং কয়েকটি নূতন গানেরও কয়েক লাইন করিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মন্তব্যগুলি অতি সাধারণভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলার বাউলদের সাধন-তত্ত্ব হিসাবে যে-সব কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকভাবে বর্তমান বাংলার বাউলদের সম্বন্ধে খাটে না। এগুলি ধর্ম-তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি হিসাবে মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাধক—নানক, কবীর, দাদু, রজ্জব প্রভৃতির মধ্যে চলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বর্তমান বাংলায় বাউলরা ঠিক ঐ পদ্ধতিতে সাধনা করে না। বর্তমানে বাংলার বাউলরা যে গান করে, যে ভাবে ধর্ম-জীবন যাপন করে, ধর্ম-কর্ম করে, তাহার সহিত ক্ষিতিমোহনবাবু কর্তৃক প্রচারিত গান বা তাঁহার বর্ণিত সাধন-প্রণালীর বিশেষ কোনো মিল নাই। মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—বাংলার এ কোন্ অবাস্তব বাউলদের কথা তিনি আমাদিগকে শুনাইতেছেন? ইহারা কাহারা? কোথায় ইহাদের বাড়ী? ইহাদের কি কখনো বাংলায় আবির্ভাব ঘটিয়াছিল?

গত পনর-ষোল বৎসর ধরিয়া কী এক নেশার ঘোরে বাংলার নানাস্থানে ছুটাছুটি করিয়াছি, বিভিন্ন আখড়ায়, আস্তানায়, নিজ বাসস্থানে বহু বাউল ও বাউলানীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছি, স্থানে স্থানে উপযুক্ত লোক প্রেরণ করিয়াছি, কয়েকস্থলে তাহাদের ভিতরকার কথা জানিবার জন্য দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় পর্যন্ত করিতে হইয়াছে, যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া এবং একজন দরিদ্র শিক্ষকের সামর্থ্যের অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া বাংলার বাউল-গান-সংগ্রহ এবং বাউল-ধর্ম-তত্ত্ব ও সাধন-প্রণালী জানিবার জন্য নিরন্তর অক্লান্ত প্রয়াস করিয়াছি। কয়েক বৎসর ধরিয়া ঘোষপাড়া ও কেঁদুলীর মেলায় সমাগত বাউলদের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পর্যন্ত স্থানের মধ্যেই বর্তমান সময়ে প্রকৃত বাউলের আড্ডা এবং এই সম্প্রদায় বাংলার আদি বাউল-সম্প্রদায়ের শেষ নিদর্শন। সম্প্রতি বর্ধমানের পশ্চিম প্রান্তে বাঁকুড়া জেলার সীমানার নিকটে বেতালবন গ্রামে ঐ অঞ্চলের বাউলদের সমাবেশের একটা আয়োজন করি। বেতালবনের সঙ্গতিপন্ন অধিবাসী শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত মহাশয়ের

১৩০। বিশ্বভারতী পত্রিকা—শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫২; কার্তিক-পৌষ, ১৩৫২; মাঘ-চৈত্র, ১৩৫২; বৈশাখ-আষাঢ়; ১৩৫৩।

উৎসাহ, প্রচেষ্টা ও অর্থব্যয়ে এই সমাবেশ অত্যন্ত সাফল্য-মণ্ডিত হয়। বর্ধমান জেলার ঐ অংশের বাউলরা এবং বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী, পাত্রসায়ের ও বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী স্থান হইতে অনেক বাউল সমবেত হয়। কলিকাতা হইতে বর্ধমান, সেখান হইতে ৩০ মাইল বাসে ও সেখান হইতে ১০ মাইল গরুর গাড়ীতে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হই ও দুই দিন ব্যাপী গান-সংগ্রহ ও বাউলদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করি। এইবার সারা বাংলায় বাউলগান ও বাউলদের সাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারণায় পৌঁছিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয়। পনর-ষোল বৎসর পূর্বে যে ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল, আজ তাহা একরূপ শেষ হইল। এমন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষিতিমোহন বাবুর উল্লিখিত গান ও তাঁহার তত্ত্বালোচনা বিচার করিয়া দেখিলে মনে এই ধারণা অনিবার্যভাবে আসে যে,—

(১) ক্ষিতিমোহন বাবুর গান কয়টি সারা বাংলায় প্রাপ্ত বাউল-গান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। বাংলার বর্তমান বাউলদের ধর্ম-সাধনা ও তত্ত্বাদির কোনো ইঙ্গিত বা সংকেত, যাহা তাহাদের প্রায় প্রতিগানেই আছে, তাহা এই গান কয়টির মধ্যে নাই। ভাব, ভাষা, উপস্থাপন প্রভৃতিতে এই গান কয়টি আধুনিক যুগের কবিদের রচিত বা এগুলির উপর আধুনিক হস্তের প্রসাধন আছে বলিয়া মনে হয়।

(২) বাংলার বাউলদের যে সাধন-তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতির কথা ক্ষিতিমোহন বাবু তাঁহার দুইটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, তাহা বাংলায় বর্তমানে যে বাউলদের দেখিতেছি ও যাহাদের গান পাইতেছি, তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক খাটে না। বাংলার বাহিরের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে এইপ্রকার ধর্ম-সাধনা হয়তো প্রচলিত ছিল, কিন্তু বাংলার বাউলদের মধ্যে বর্তমানে তাহা প্রচলিত নাই—অন্ততঃ আড়াই শত-তিনশত বৎসরের মধ্যে রচিত গানের ভিতর তাহার নিদর্শন পাই না এবং প্রাচীন বাউলদের বর্তমান শিষ্যদের মধ্যেও তাহা প্রচলিত নাই। বাংলার বাউলদের সম্বন্ধে এই মতবাদগুলি তিনি কোথায় পাইলেন? যাহাকে শাস্ত্র বা দর্শন বা তত্ত্ব-বিবরণ বলা যায়, বাউলদের সে-সব কিছুই নাই; তাহাদের যাহা-কিছু আছে, তাহা কেবল গান। এই গানের মধ্যেই তাহাদের ধর্মের তত্ত্ব-দর্শন বা সাধন-পদ্ধতির সন্ধান লইতে হইবে, অন্যত্র কোথাও তাহা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তাহাদের গান বিশ্লেষণ করিলে ক্ষিতিমোহনবাবু কর্তৃক উল্লিখিত সাধন-তত্ত্ব বা পদ্ধতির কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। এইপ্রকার সাধন-রীতি তিনি বাংলার

বাউলদের উপর আরোপ করিয়াছেন মাত্র এবং বাংলায় যে-সমস্ত বাউল বাস করিতেছে, ধর্ম-সাধন করিতেছে, গান রচনা করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে তাহা আদৌ প্রযোজ্য নয়। মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাধকদের ধর্ম-সাধনা সম্বন্ধে তিনি যাহা অবগত আছেন, তাহাই বাংলার বাউলদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এইরূপ প্রয়োগ সহজসাধ্য এই জন্য যে, বাংলার বাউল ও ঐ-সব সাধকের মধ্যে ধর্ম-সংক্রান্ত অনেক মতবাদে মিল আছে, কিন্তু মূলসাধন-পদ্ধতিতে প্রভেদ রহিয়াছে।

আমি বাংলার সুধী-সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি এবং ক্ষিতিমোহন বাবুর কয়টি বাউল-গান ও তাঁহার বাউল-সাধনার বিবৃতি যে বর্তমানে বাংলায় প্রাপ্ত বাউল-গান এবং বাংলার বাউলগণের সাধনার ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এই তথ্যটি তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিতেছি। বিশেষ করিয়া বাংলা-সাহিত্যের গবেষকদিগের নিকট আমার অনুরোধ—তাঁহারা বাংলার বাউল সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যান্বেষণ করুন—এখনও এই বাউল-সম্প্রদায় বাংলা হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের গান ও তাহাদের সাধনার পরিচয় গ্রহণ করুন। বাংলার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম-মত সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য ও সত্য উদ্ধার করিতে হইবে।

ইংরেজীতে একটি উক্তি আছে: "Truth is no respecter of persons."—যাহা সত্য, তাহা চিরকাল অবিকৃত ও ব্যক্তি-প্রভাব-বর্জিত। তাহাকে আমাদের মনোমত, সুবিধামত বা প্রয়োজনমত রূপ দেওয়া যায় না। সে সত্য আমাদের ভালো লাগুক আর মন্দ লাগুক, ঘৃণা উৎপাদন করুক আর শ্রদ্ধার উদ্রেক করুক, তাহাতে সেই সত্যের কোনো রূপান্তর আমরা করিতে পারি না। প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীকে সত্যান্বেষী হইতে হইবে। এখানে ব্যক্তি বিশেষ বা তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নাই, সত্য-সন্ধানই একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রথমে তাঁহার গানগুলি বিবেচনা করা যাক্।

শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়ের যে-গানটি বাউলগানের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হিসাবে সর্বত্র সুপরিচিত, সেটি হইতেছে—"নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে?" ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য এই সংগ্রহের পরিশিষ্টের ১নং গান)। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় দেড় হাজার বাউলগান পর্যালোচনা করিতেছি, কিন্তু ইহার মত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ও অনেকটা আধুনিকা-গন্ধী গান একটিও খুঁজিয়া পাই নাই। ইহার ভণিতায় 'মদন'-এর নাম আছে। মদন-এর ভণিতায়

কতকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে আমার এই সংগ্রহে ছয়টি গান লইয়াছি (গান নং ২৯৫, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫০, ৪১৬ ও ৪২৯)। ৩৪৩ নং গানে মদনকে আনন্দমোহিনীর শিষ্য বলিয়া মনে হয় এবং ৪১৬নং গানে মদনের পূর্বে 'ক্ষ্যাপা' বিশেষণটি যুক্ত হইয়াছে। এই সব গানে বাংলার অন্যান্য বাউল-গানের মত বাউলদের সাধন-তত্ত্ব ও সাধনার ইঙ্গিত সম্বন্ধে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ক্ষিতিমোহনবাবুর 'মদন' বোধ হয় এই সব মদন হইতে পৃথক।

গানটির অন্তর্নিহিত ভাব মোটামুটি এইভাবে প্রকাশ করা যায়—সাধনার দ্বারা, প্রেম-ভক্তি-সঞ্চারের দ্বারা ধীরে ধীরে আমাদের মনকে প্রস্তুত করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন বা সাধক-জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। নিজ প্রয়োজন অনুসারে বা ইচ্ছামত মনকে প্রস্তুত করা যায় না। তাহার জন্য সময়ের প্রয়োজন—সাধনার প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভের লোভে জোর করিয়া সিদ্ধ হইতে চাহিলে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়, ভাবের ঘরে চুরি করা হয়। প্রথমে গাছে মুকুল ধরে, তারপর ফল হয়, তারপর ফল বড় হয়, শেষে ধীরে ধীরে পাকে,—ইহার জন্য সময়ের প্রয়োজন। কত ঝড়বাতাস, শিলাবৃষ্টি বাঁচাইয়া তবে একটা গাছ-পাকা ফল পাওয়া যায়। তাহা না বুঝিয়া মুকুলেই পাকা ফল চাহিলে মুকুলকে ধ্বংস করা হয়, ফল-লাভের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ভগবানেরও অভিপ্রায়,—তাঁহার সৃষ্টির কার্য-কলাপের ইহাই ক্রম। এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নিজের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়ই না, বরং ভগবানকে আঘাত করা হয়, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। ভগবান ভাবগ্রাহী, তিনিই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া যথাসময়ে কৃপা করিবেন।

এই ভাবের অনেকটা অনুরূপ গান বাংলার অন্যান্য বাউলদের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের ভাষা ও উপস্থাপন-ভঙ্গী অন্যরূপ :

"আপন জুতে না পাকিলে কি গাছ-পাকা ফল মিঠা হয়।
কিলিয়ে পাকালে কাঁঠাল, সুমিষ্ট সে কভু নয়॥
কতক গেল ঝড়ে প'ড়ে, কতক গেল রৌদ্রে পুড়ে,
কতক গেল শিলে ঝ'রে, দুই-একটা তো র'য়ে যায়॥
যে ফল গাছে থেকে পাকে,
বিপদ নাই তার কোন পাকে।
ঝড়ি-ঝটকা নাহি লাগে, গুরুকৃপা তারেই কয়॥"

(গান নং ৩০৭)

লালনের একটি গানে আছে :

"লাথিয়ে পাকালে সে ফল
হয় না মিঠে, হয় তিতো ॥"

(গান নং ৯৩)

নরসিংদির একটি বাউল-গানে আছে :

"বাউল দরবেশে বলে,—
গুরুর কৃপা না হইলে
কাঁচা কাঁঠাল কিলাইলে পাকে না ॥"

(গান নং ১৯৯)

পদ্মলোচনের একটা গানে আছে :

"মেওয়া ফলতে ফলে সবুরের গাছে।"

(গান নং ১৬৯)

ক্ষিতিমোহন বাবুর এই গানটির মধ্যে 'মানস-মুকুল' শব্দটি আধুনিক-গন্ধী। বাউলদের মধ্যে যাহারা কিছু শিক্ষিত, তাহারা ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দাশরথি রায় প্রভৃতির কবিতার সহিত পরিচিত হইতে পারে এবং রচনা-রীতিতেও অনেকখানি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে পারে, কিন্তু মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাব্যের সহিত পরিচিত না থাকাই সম্ভব, থাকিলেও তাঁহাদের রচনা-রীতি তাহারা অনুসরণ করে না। হাউড়ে গোঁসাই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার রচনায় সংস্কৃত শব্দ এবং ঈশ্বর গুপ্ত, দাশু রায় প্রভৃতির মত অনুপ্রাস ও যমক ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু সুললিত 'মানস'-কথাটির সহিত আর একটি সুললিত 'মুকুল'-শব্দের যোগে সমাস করিয়া অলংকার সৃষ্টি করিবার কৌশল আধুনিক কালের রচনা-রীতি বলিয়া মনে হয়। আর একটি শব্দ 'যুগযুগান্তে'। বাংলা ভাষায় এই শব্দটির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের এবং আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। বেদনার পরিবর্তে 'বেদন' কথাটির ব্যবহারও আধুনিক কালের বলিয়া মনে হয়। আর কয়টি পংক্তিও বিশেষ বিবেচনার যোগ্য :

"সহজধারা
আপন হারা
তাঁর বাণী শুনে।"

ইহার প্রকৃত অর্থ কি বুঝা যায় না। তবে এইরূপ অর্থ অনুমান করা যায়—

প্রকৃতির বস্তুনিচয়ের মধ্যে যে উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি-ধারা স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে চলিতেছে, প্রকৃতি গভীর তন্ময়তার সঙ্গে সেই ধারা লালন করিতেছে। ভগবানের নিঃশব্দ আদেশেই যেন প্রকৃতি এই ক্রম-পরিণতির ধারা আনন্দের সঙ্গে রক্ষা করিতেছে। এখানে এই 'সহজধারা' কথাটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বাউলদের সাধনা 'সহজ', আবার গানটির পূর্ব প্রসঙ্গ অনুসারে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মও 'সহজ'—এই উভয়ভাবের মিশ্রণে 'আপনহারা' কথাটির প্রয়োগে একটু হেঁয়ালি-সৃষ্টি হইয়াছে। 'সহজধারা' অর্থে গীত-রচয়িতা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝাইতে চাহিতেছেন? বাউলদের সাধনা যে 'সহজ', সহজিয়া-বৌদ্ধদের সাধনাও সেই 'সহজ', সহজিয়া-বৈষ্ণবদের সাধনাও সেই 'সহজ'। তাহাতে প্রকৃতির 'সহজধারার' সঙ্গে কি কোনো সম্বন্ধ আছে? 'সহজধারা' কথাটি-ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যায় না।

"তোরা কেউ পারবি না গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস, যতই করিস,
যতই তারে তুলে ধরিস।
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত করিস বোঁটাতে।" ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের এই গানটির সঙ্গে ক্ষিতিমোহনবাবুর গানটির ভাবের বেশ সাদৃশ্য আছে। আর একটি গান:

"হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা উপায় কি করি।"
—ইত্যাদি (পরিশিষ্টের গান নং ৮)।

এই গানটির মধ্যে যে দার্শনিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সহিত বাংলার বাউল-ধর্মের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। প্রায় এই ধরণের দার্শনিকতা আধুনিক কালের বাউল-গানে কদাচিৎ একটু-আধটু দেখা যায় বটে, তবে তাহার রচনা-ভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। এই গানটির রচনা-ভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক কালের বলিয়া মনে হয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের 'আমি-তুমি'-র লীলাবাদের একটা রূপভেদমাত্র। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টা অঙ্গাঙ্গিভাবে আবদ্ধ—মানবের প্রেমে ভগবান আবদ্ধ—তাহাতে মানবের সার্থকতা এবং তাঁহারও সার্থকতা। এই মানুষ আর ভগবানের—সীমা ও অসীমের লীলার কথা যে

কতবার কত ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকগণ অবগত আছেন।

"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে"

"সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর ;
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।"

প্রভৃতি কবিগুরুর বহু রচনা ইহার সাক্ষ্য বহন করে।

ক্ষিতিমোহনবাবুর আর একটি গান :

"আমি মেলুম না নয়ন,
যদি না দেখি তার প্রথম চাওনে।"
—ইত্যাদি (গান নং ৫, পরিশিষ্ট)।

ইহা আধুনিক কালের লেখকের রচনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে"—এই লাইনটি নিতান্ত অতি-আধুনিক-গন্ধী বলিয়া মনে হয়।

সেন মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত আর একটি গান :

"আমি মজেছি মনে।
না জানি মন মজল কিসে, আনন্দে কি মরণে।
… …মিলা নয়ন হৃদয় সনে।" (গান নং ৩, পরিশিষ্ট)

এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি রচনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যেন কানে বাজে।

আর একটি গান :

"আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে।"

এইরূপ বাক্-চাতুর্য ও কল্পনা আধুনিক কালের কবিদের রচনা ছাড়া বর্তমানে বাউলদের গানে মিলে না, তাহা এই পনর-ষোল বছর ধরিয়া প্রায় দেড় সহস্র বাউল গান-সংগ্রহ ও পর্যালোচনার অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে পারিয়াছি।

আর অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের সহিত যাঁহারা

পরিচিত, তাঁহারা একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই গানগুলির মধ্যে যথেষ্ট 'আধুনিক হস্তক্ষেপ' আছে এবং ইহা পল্লীর অশিক্ষিত বা সাবেকী ধরণের অর্ধশিক্ষিত বাউলদের রচনা নয়।

আর একটা বিষয় বিবেচনা করা দরকার। বাংলার বাউলদের মতবাদ ও ধর্ম-সাধন-বিষয়ে সেন মহাশয় যে মন্তব্য প্রবন্ধাদি বা বক্তৃতায় প্রকাশ করেন, তাহা কিসের উপর নির্ভর করিয়া? নিশ্চয়ই গানের উপর। কারণ গানই তাহাদের একমাত্র শাস্ত্র বা ধর্ম-সাহিত্য। কিন্তু তাঁহার সেই গানগুলির মধ্যে তাহাদের ধর্ম-তত্ত্ব বা সাধন-বিষয়ের কোনো বর্ণনা, ইঙ্গিত বা আভাস পাওয়া যায় না।

এখন তাঁহার 'বাউল-পরিচয়' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটির একটু আলোচনা করিলেই বাংলার বাউলদের ধর্ম-তত্ত্ব ও সাধন বিষয়ে তাঁহার মন্তব্যের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে। 'বাউল-পরিচয়'-প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় বলিতেছেন:

"সহজ ভাব সম্বন্ধীয় যে-কয়খানা পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাতে সাচ্চা বাউল-ভাবের পরিচয় মেলে না। আসল বাউল তো পুঁথির ধারই ধারে না। যাঁহারা আধা বৈষ্ণব আধা বাউল, কি আধা তান্ত্রিক, আধা বাউল, তাঁহারাই নিজেদের পরিচয় খানিকটা বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকভাবে, compromise-এর মত, দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু যথার্থ সে নির্ভীক শক্তি বা রচনার গভীরতা গ্রন্থী বাউলদের নাই। সহজ নামে তাঁহারা যে সস্তা ইন্দ্রিয়-উপভোগের পন্থা খুলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকপক্ষে কোনো সাধনার ভিত্তি হইতে পারে না। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থও তান্ত্রিক ভাবের গ্রন্থী বাউলের শ্রেণীর সঞ্চয়।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে তিনটি কথা আলোচনা করা যাক। প্রথম, "সস্তা ইন্দ্রিয়-উপভোগ।" দ্বিতীয়, বাংলার বাউলদের "সহজ" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের ধারণা, তৃতীয়, "সাচ্চা বাউল" কাহাকে বলে।

"সস্তা ইন্দ্রিয়-উপভোগের পন্থা কোনো সাধনার ভিত্তি হইতে পারে না"—ইহা অতি উত্তম কথা। ইহা তাঁহার অভিমত, আমারও অভিমত এবং যে-কোনো ভদ্রলোকেরও অভিমত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা সত্য, যাহা বাংলার বাউলদের মধ্যে প্রচলিত, যাহা বাস্তবে রূপায়িত, তাহাকে বাদ দিয়া, কি হওয়া উচিত ধরিয়া বিচার করিলে সেই ধর্ম-মতের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা যায় না। ব্যক্তিগত ভাবানুভূতি-বর্জিত হইয়া নির্মম ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সত্য-সন্ধান করিতে হইবে—ইহাই জ্ঞান-চর্চা।

এই জ্ঞান-চর্চায় ইচ্ছানুরূপ সত্যকে গোপন বা বিকৃত করিয়া বাউলের একটা মন-গড়া আদর্শ খাড়া করিলে জ্ঞানের পথকে চিরতরে রুদ্ধ করা হয়।

বাউলদের ভিত্তি-ভূমি হইতে এই বিষয়টি দেখিতে হইবে। তাহাদের প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন ইন্দ্রিয়-উপভোগ নয়, ইন্দ্রিয়-দমন। ইহা বিন্দু-ধারণের জন্য সুকঠিন যোগ-সাধনা, ইহার বিশেষণ 'সস্তা' হইতে পারেনা, ইহার বিশেষণরূপে 'দুর্লভ' কথাটি প্রযোজ্য। ইহা ক্ষয়ের আয়োজন নয়, সঞ্চয়ের সাধনা। পূর্বে এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, পরে সাধন-পদ্ধতি-আলোচনার সময় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

দীর্ঘদিন ধরিয়া অনেক বাউলের পরিচয় পাইয়াছি। তাহার ফলে তাহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়সেবী বলিতে পারি না। ইহা একটি সুকঠোর যোগ-সাধনা—এই যোগ-সাধনার মধ্য দিয়াই বাউলরা তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত চরম অবস্থায় উপনীত হয়। বহু গানের মধ্যে "ফণীর মাথা" হইতে "মণি-আহরণ"-এর কথা, "গরলের মধ্যে হইতে অমৃত-গ্রহণ" প্রভৃতি সুকঠিন যোগ-সাধনার কথা আছে।[১৩১]

প্রথমে যখন বাউল-ধর্মমত কি জানিবার জন্য বাউলদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করি, তখন তাহাদের প্রকৃতি-ঘটিত সাধনার কথায় মন নিতান্ত সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল। আর একটি ব্যাপারেও মনে একটা ঘৃণা ও সংকোচের ভাব উদিত হইয়াছিল—সেটি তাহাদের 'চারিচন্দ্র-ভেদ'। তখন আমার অনুসন্ধানের বিষয় ছিল—সকল বাউল কি প্রকৃতি-ঘটিত যোগ-পন্থা অবলম্বন করে? সকলেই কি 'চারিচন্দ্র-ভেদ' করে?

দীর্ঘদিন অনুসন্ধান ও বহু বাউলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার ফলে এই সব বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি ও যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা নিম্নরূপ:

(ক) হিন্দুজাতির বাউল-নামধারী বা 'রসিক'-নামধারী এই শ্রেণীর সকল সাধকই সাধারণতঃ প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সাধনা করে এবং 'ফকির'-নামধারী মুসলমান সাধকদেরও সকলেই প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সাধনা করে। বাউল-সাধকদের তিনটি স্তর আছে—'প্রবর্ত', 'সাধক' ও 'সিদ্ধ'। 'প্রবর্ত'-অবস্থায় প্রাথমিক কতকগুলি নিয়ম-পালন,—'নামাশ্রয়', 'মন্ত্রাশ্রয়' প্রভৃতি গ্রহণ; তারপর 'সাধক'-অবস্থা হইতে 'ভাবাশ্রয়' গ্রহণ করিতে হয়। 'ভাব'-এ প্রবেশ গুরুর পরীক্ষা ও উপদেশ-সাপেক্ষ। ভাবে প্রবেশ করিলে, প্রকৃতি-সাধন আরম্ভ হয়,—তখন 'রসাশ্রয়' 'প্রেমাশ্রয়' প্রভৃতি গ্রহণ। ভাবে প্রবেশ করিলে

১৩১। দ্রষ্টব্য গান নং ৮৩, ১৪৬, ১৭৪, ১৮২, ১৮৩, ৩৫৩, ৪৪৮, ইত্যাদি।

সাধকের মধ্যে একটা রূপান্তর উপস্থিত হয়। প্রকৃত প্রেমে উপনীত হইতে পারিলে 'সিদ্ধাবস্থা' উপস্থিত হয়, তখন আর প্রকৃতি-সেবার প্রয়োজন হয় না। তখন 'পরিপক্ক'দেহে সামান্য মানসিক ক্রিয়াতেই অনুক্ষণ যুগল-মিলনের আনন্দানুভূতি জাগে এবং সাধক স্বীয় নিত্যানন্দময় সত্তার উপলব্ধি করিতে পারে। সাধারণভাবে সকল সাধককেই প্রকৃতি গ্রহণ করিতে হয়। ইহা প্রাকৃত প্রেমের সাধনা হইতে অপ্রাকৃত প্রেমে ঊর্ধ্বগমন। বাউলদের অসংখ্য গানে ইহার ইঙ্গিত আছে। কোনো কোনো গানে প্রকৃতি-আশ্রয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। একটি গানে আছে :

"মধুর রসের ভিয়ান কর আত্মায় ॥

... ...

আশ্রয় ল'য়ে যে জন ভজে,
তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
এ কথা না জেনে যে অন্ধ মজে,
সে ভবকূপে খাবি খায় ॥"

(গান নং ৩৭৮)

ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, বাউলদের প্রেম প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক, প্রাকৃত দেহোৎপন্ন আকর্ষণ হইতে উদ্ভূত, দেহের ঊর্ধ্বগত এক আত্মবিস্মৃতিময় অনুভূতি। ইহা একান্ত মানবিক। দেহের বাহিরে বাউলদের কোনো সাধনা নাই। তাহারা 'অনুমান' মানে না, তাহাদের সমস্তই 'বর্তমান'। এই স্থূল মানব-দেহকে এত অমূল্য সম্পদ বলিয়া আর কেহ মনে করে নাই। দেহকে অবলম্বন করিয়াই এই প্রেম লাভ করিতে হইবে। কাম হইতেই এই প্রেমের উদ্ভব। তাহাদের বহু গানে এই কথার উল্লেখ, আভাস ও ইঙ্গিত আছে। বাংলার বাউল-সমাজে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া কথিত, বিখ্যাত বাউল-গুরু লালন ফকিরের একটি পদে আছে :

"করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেমসাধন।

... .

বলব কি সে প্রেমের কথা,
কাম হইল প্রেমের লতা,
কাম ছাড়া প্রেম যথা তথা
নাই রে আগমন ॥

পরমগুরু প্রেম-পিরিতি,
কাম-গুরু হয় নিজপতি,
কাম ছাড়া প্রেম পাই কি গতি,
তাই ভাবে লালন ॥"
(গান নং ৮০)

লালনের আর একটি পদে আছে :

"শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি
কাম-রতিকে রাখলে কোথা।
আগে উদয় কামের রতি,
রস-আগমন তা'রি সাথী,
সেই রসে হ'য়ে স্থিতি
খেলছে মানুষ দেখ গে তোরা ॥"
(গান নং ৮১)

যদি আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিতে হয়, যদি 'মনের মানুষ'কে 'ধরিতে হয়', তবে হরি, কৃষ্ণ বা আল্লা বলিয়া চীৎকার করিলে হইবে না, বা মনের মানুষের উদ্দেশ্যে হায় হায় করিয়া আকুলি-বিকুলি করিয়া বেড়াইলে চলিবে না, তাহার জন্য কর্মময় যোগ-সাধনা করিতে হইবে। সেই কৃষ্ণ, হরি বা আল্লা তো আমার মধ্যেই আছেন, নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেই তাঁহাকে জানা যাইবে। তাই লালন বলিতেছেন :

"কেবল ডাকলে মানুষ কয় না কথা।"
(গান নং ৮১)

কামের উপযুক্ত বয়স থাকিতে থাকিতে এই সাধনা প্রয়োজন :

"দেহে কাম থাকিতে সময়েতে
রস ভিয়ান কর।
তোর কাম-অনলে রস জ্বাল দিলে
তরল রস হবে গাঢ় ॥" (গান নং ২১২)

কামের মধ্য হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, রসিকগণই তাহার উপায় জানে :

"ওরে প্রেম করা কি কথার কর্ম,
আছে কামের মধ্যে প্রেমের জন্ম ॥

সেই প্রেম করা জ্যান্তে মরা,
কুমরে পোকায় যেমন ধারা ;
রসিক যারা জানে তারা,
কামকে প্রেম করে যারা,
সুজন হ'লে উজন চলে,
ঐ দেখ টলে নাই তার সে সব ধর্ম ॥"

(গান নং ৪০৭)

আর একটি গানে আছে :

"আছে কাম-প্রেমেতে মাখামাখি
প্রেমের জন্ম বুঝা ভার ॥
... ...
কাম লোহা, প্রেম কাঁচাসোনা,
গাভীর ভাণ্ডে গোরোচনা,
ননী যেমন দুগ্ধের সর ॥"

(গান নং ৪০৮)

অপর একটি গানে আছে :

"কামের মধ্যে প্রেমের জন্ম
বুঝে উঠা হ'ল ভার।
বুঝিবে রসিক জনা,
অরসিক কি বুঝিবে তার ॥"

(গান নং—৩১২)

বাউলদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রকৃতিসেবা নয়, কামের মধ্য হইতে প্রেমে উপনীত হইবার জন্যই প্রকৃতি-সেবা। বাউলদের কাছে নারী আত্মার হ্লাদিনী শক্তি, মহা-শক্তিরূপিনী, রসময়ী, প্রেমময়ী। তাই

"রজকিনীপ্রেম, নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।"

এ বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(খ) বাউল-মতের অতি অল্পসংখ্যক কয়েকজন সাধক দেখিয়াছি, যাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত অসুবিধা, মানসিক প্রবণতা এবং গুরুর নির্দিষ্ট পরামর্শে প্রকৃতি-সেবা করে না। কিন্তু তাহাদের সকলকেই বাউল-উপাসনার পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। কাম-বীজ ও কাম-গায়ত্রী জপ ও যুগলমূর্তি ধ্যান করিয়া

মদনানুভূতি উত্তেজিত করিয়া যোগ-ক্রিয়ার পদ্ধতি অনুসারে তাহারা সেই অনুভূতিকে সুষুম্না-পথে উর্ধ্বগামী করে। নিজ দেহাভ্যন্তরে যে পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি আছে, সেই উভয় শক্তির মিলনের ফলে যে আনন্দানুভূতি, তাহাই অন্য সব বাউলের মতো তাহাদেরও কাম্য। এই অনুভূতিকে 'আজ্ঞাচক্রে' 'দ্বিদল' পর্যন্ত উর্ধ্বগামী করিলে সেখানে উভয় শক্তির মিলন-জাত যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই অন্তরাত্মার স্বরূপোলব্ধি বলিয়া অনুভূত হয়। সেখানেই তাহারা 'মনের মানুষ'কে উপলব্ধি করে।

(গ) এক সম্প্রদায়ের দুই-এক জন সাধককে দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক বাউল নয়,—রাধাকৃষ্ণের যুগল-ভজনের সাধক। কিন্তু এক প্রকৃতি-সেবা ব্যতীত তাহারা পূর্বোক্ত বাউল-ভজনের পদ্ধতি অবলম্বন করে। প্রকৃতি-ভজনের দুরূহতা, ব্যভিচারের আশঙ্কা ও স্থূল ক্রিয়ায় বিতৃষ্ণা প্রভৃতি কারণে তাহারা প্রকৃতি-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা সময় সময় তাহাদিগকে 'শুদ্ধ বাউল' বা 'একক বাউল'ও বলে এবং মহাপ্রভুকেও তাহারা 'একক বাউল' বলে। ঐ সম্প্রদায়ের একজন সাধক মদনমোহন স্বামী (বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.-উপাধিধারী) তাঁহাদের মতবাদ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি আমাকে দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

(ঘ) আর একটি ব্যাপার 'চারিচন্দ্র-ভেদ'। ইহা এই শ্রেণীর সমস্ত সাধকই অনুষ্ঠান করে। সাধন-মার্গে অত্যন্ত উন্নত বা সিদ্ধ সাধকদের আর প্রকৃতি-সেবা বা চারিচন্দ্র-ভেদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাহারা প্রথমে সাধনা আরম্ভ করে অথচ প্রকৃতি-সেবা করে না, তাহাদেরও দ্বিতীয় 'চন্দ্র' 'ভেদ' করিতে হয়, এবং গুরুর উপদেশ অনুসারে উপযুক্ত প্রকৃতির 'রূপ' (বাউল-সাধকদের নিকট রজঃ-এর পারিভাষিক শব্দ) গ্রহণ করিতে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, রাধা-কৃষ্ণের যুগল-ভজনের সাধনগণকেও এই 'রূপ' সংগ্রহ করিতে হয়। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় কি জানেন না যে, পৃথিবীর আদিম কাল হইতে ধর্মের উৎপত্তি পর্যালোচনা করিলে ধর্মের সহিত যৌন ব্যাপারের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়। ভারতে লিঙ্গপূজা (গৌরীপাট সহ) কি সভ্য হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত নাই? আমাদের কালীর ধ্যানের মধ্যে "বিপরীতরতাতুরাং" শব্দ কয়টি কি তিনি লক্ষ্য করেন নাই? আমরা যতই এই-সব ব্যাপারের আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেই না কেন, মূলে এগুলি কি জিনিস? উপনিষদের মধ্যে কি

ইহার প্রভাব নাই? পরে এ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে আর অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বাংলার বাউলদের 'সহজ'-সম্বন্ধীয় ক্ষিতিমোহনবাবুর ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে।

'সহজ'-কথাটি বৌদ্ধসহজিয়া-গ্রন্থে আমরা প্রথম পাই। তারপর মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাধারে ভক্তি ও যোগবাদী সাধক কবীর প্রভৃতির রচনার মধ্যেও পাই এবং বৈষ্ণব-সহজিয়াদের গ্রন্থ ও পদে এবং বাউলদের গানের মধ্যেও পাই।

বৌদ্ধ-সহজিয়াগণের মতে 'সহজ'-অবস্থা-লাভই সাধনার চরম সিদ্ধি। ইহার নামান্তর 'নির্বাণ', 'মহাসুখ', 'সুখরাজ', 'মহামুদ্রা-সাক্ষাৎকার' ইত্যাদি। এই অবস্থায় বাচ্য-বাচক, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভোক্তৃ-ভোগ্য—এইপ্রকার ভাব থাকে না। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই ত্রিপুটিই বিকল্পজাল। ইহাকে ভেদ করিয়া নির্বিকল্প পদের উপলব্ধি 'সহজ'-অবস্থা-লাভ হয়: "জহি মন পবন ন সঞ্চরই, রবি শশি নহে পবেশ"—যেখানে মন ও প্রাণের সঞ্চার নাই এবং চন্দ্র-সূর্যেরও প্রবেশাধিকার নাই। বৌদ্ধ-সহজিয়াগণ বলে, এই নির্বাণই প্রত্যেকের 'নিজ স্বভাব' ("নিজ সহাব")—ইহাই পরমার্থ। নির্বাণ লয় নয়—এক মহানন্দময় অবস্থা। নির্বাণের যে আনন্দ, যাহাকে 'মহাসুখ' বলে, তাহা 'সহজ' বলিয়া এক, কারণহীন ও সর্বদা উদিত। এই অবস্থা লাভ করিলে জরা-মরণ-ত্যাগ হয়।

প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্যই নির্বাণ। এই 'যুগনদ্ধরূপ'—মিথুনাকার-রূপ বা যুগলরূপই পরমার্থ-রূপ, মহাসুখের আলয়। ইহার আশ্রয় ভিন্ন সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব।

ইন্দ্রিয়-নিরোধ, বিষয়-ত্যাগ বা বৈরাগ্য-সাধন করিয়া কোনো ফল নাই, তাহা দ্বারা যুগল-অবস্থা-লাভ হয় না। যুগল-প্রাপ্তির পথে যাইতে না পারিলে মিলন ও তাহার ফল—সামরস্য বা অদ্বয়তা সংঘটিত হয় না। এই জন্য সহজ-পন্থা রাগের পথ—বৈরাগ্যের পথ নহে। এই 'মহারাগ' বা 'অনন্তরাগ'ই মুক্তির সহজ-সাধন।

বজ্র-কমল-সংযোগের দ্বারা বোধি-চিত্তকে বিশুদ্ধ অবধূতি-মার্গে যাহারা অচ্যুত করিতে পারে, তাহারাই পরমযোগী এবং তাহারাই সহজধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে। বোধি-চিত্ত বা বিন্দুর স্থৈর্যই সমস্ত সিদ্ধির মূল, তাহা যদি পতিত হয়, তবে "স্কন্ধবিজ্ঞান মূর্ছিত হয়, সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না।"

ইহাই অতি সংক্ষেপে বৌদ্ধ-সহজিয়াগণের সাধনার স্বরূপ। পরে একটি অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সহজিয়াদের 'সহজ'ও এই জাগতিক প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-জনিত আনন্দ। স্বরূপে রাধা ও কৃষ্ণ-রূপী প্রকৃতি-পুরুষের যুগল-মিলনের দ্বারাই সেই আনন্দ লভ্য। এই যুগলেই মহাভাব-রূপী 'সহজ'-এর অবস্থিতি। বৌদ্ধ-সহজিয়াদের প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থলে বৈষ্ণবেরা রাধা-কৃষ্ণ স্থাপন করিয়াছে এবং প্রচুর পরিমাণে প্রেমের অবতারণা করিয়াছে। মূলতঃ উভয় সম্প্রদায়ের 'সহজ'-ই এক। প্রেমের মহামিলনই 'সহজ'-অবস্থা। চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে :

"সহজ জানিতে সাধ লাগে চিতে
সহজ বিষম বড়।
আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিত করিহ দড় ॥"

এ-বিষয়েও পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

বাউলদের 'সহজ'ও সেই একই 'সহজ'। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের দ্বারা সেই অপূর্ব আনন্দময় সহজ-অবস্থার উদ্ভব হয়। যোগের প্রক্রিয়া দ্বারা সামরস্যে অবস্থান করিতে পারিলে সেই সহজানন্দ লাভ হয়। বাংলার বাউলদের 'সহজ' কি, যাদুবিন্দুর একটি গানে তাহার ইঙ্গিত আছে :

"সহজ ভজন কঠিন করণ যে পারে এই সহজের ঘরে।
সহজ ভজন না যায় লিখন আছে বেদবিধি পরে ॥
বেদবিধি-পার, সৃষ্টিছাড়া, সহজের করণ নিহারা।
হ'তে হয় জীয়ন্তে মরা, আগুন-পারা সে ধরে ॥
অগ্নিস্পর্শ হইলে ঘৃত যদি নাহি গলে।
(তখন) রূপ-রতি-রস উজান চলে, বত্রিশ কোঠার উপরে ॥
বত্রিশ কোঠার তালা আঁটা, তার উপরে মণি-কোঠা।
রূপ-রসেতে চাবি-আঁটা, সদর-খিড়কি দুইধারে ॥
সদর-খিড়কি এই দুই দ্বারে রূপ-রতি-রস বসত করে।
দেখতে হবে নিহার ধ'রে সেথায় রসরাজ বিরাজ করে ॥
রসরাজ-রূপ রসের স্বরূপ, মহাভাবে মিলে হয় এক রূপ।
সাকার বিন্দু নিরাকার রূপ অধর-ধরা যে ধরে ॥

সহজে আসে সহজে যায়, এই কথাটি সকলে কয়।
না হইলে সহজের প্রায় যেতে হয় ধামান্তরে ॥
আরেক সহজ বিন্দু আছে, সে বিন্দু নায়কের কাছে।
পুরুষ-নারী লবে বেছে, সমর্থার গুণ যে ধরে ॥
আরেক সহজ বিন্দু মিলে অধঃ-উর্ধ্ব দু'দিক চলে।
শ্রীঅঙ্গে ভাণ্ডার হইলে বিন্দু বিন্দু দান করে ॥
অদ্বৈত সহজ উপায়, যত উপায় তত অধ্যায়।
সিন্ধু কভু নাহি শুকায়, বেঙাটুনি পান করে ॥" (গান নং ৪৩৮)

ক্ষিতিমোহন বাবু বাংলার বাউলদের সম্পর্কে যে 'সহজ'-এর বিষয় বলিয়াছেন, তাহা উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় কবীর, দাদু, রজ্জব, রবিদাস, সুন্দরদাস প্রভৃতি ভক্ত-যোগিগণের 'সহজ'। তাঁহার 'বাউল-পরিচয়' প্রবন্ধে 'সহজ'-শিরোনামায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা একেবারে কবীরের 'সহজ'। ভগবানের প্রতি প্রেমে তন্ময়তাই সহজাবস্থা—প্রেমের পথই 'সহজ'-পথ। কবীরের সেই বিখ্যাত পদ "সন্তো, সহজ-সমাধি ভলী"র[১৩২] কয়েক পংক্তি এই প্রসঙ্গে তিনি উদ্ধৃতও

১৩২। "সন্তো, সহজ সমাধি ভলী।
সাঁঈ তে মিলন ভয়ো জা দিনতেঁ, সুরত ন অন্ত চলী ॥
আঁখ ন মূঁদূঁ কান ন রূঁধূঁ কায়া ন ধারূঁ।
খুলে নৈন মৈঁ 'হঁস হঁস দেখূঁ', সুন্দর রূপ নিহারূঁ।
কহূঁ সো নাম সুনূঁ সো সুমিরন জো কছু, করূঁ সো পূজা।
গিরহ-উদ্যান এক সম দেখূঁ, ভাব মিটাউঁ দূজা ॥
জহঁ জহঁ জাউঁ সোঈ পরিকরমা, জো কুছ করূঁ সো সেবা।
জব সোউঁ তব করূঁ দণ্ডবত, পূজূঁ ঔর ন দেবা ॥
শব্দ নিরন্তর মনুআ রাতা, মলিন বচনকা ত্যাগী।
উঠত বৈঠত কবহুঁ ন বিসরৈ, ঐসী তারী লাগী ॥
কহৈঁ কবীর য়হ উন্মুনি রহনী, সো পরগট কর গাঈ।
সুখ-দুখকে ইক পরে পরম সুখ, তেহিমেঁ রহা সমাঈ ॥"

অর্থাৎ—

"ওহে সন্ত, সহজ সমাধিই ভাল। যেদিন মিলন হয়, স্বামীর সঙ্গে সেদিন অন্ত থাকে না সুরতের। চোখ বন্ধ করি না, কান ঢাকি না, দেহকে দেই না কষ্ট। চোখ মেলে আমি হাসতে হাসতে দেখি, তাঁর সুন্দর রূপ দেখি। যা বলি সে-ই নাম, যা শুনি সে-ই স্মরণ, যা কিছু করি, সে-ই পূজা। বাড়ী আর পড়ো-বাড়ী সমান দেখি; দ্বৈতভাব দেই মিটিয়ে। যেখানে যেখানে যাই, তা-ই হয় পরিক্রমা, যা কিছু করি সে-ই হয় সেবা। যখন শুই তখন সেইটেই হয় দণ্ডবৎ। অন্য দেবতায় আর পূজা করি না। অনাহত শব্দে নিরন্তর মত্ত হ'য়ে আছে আমার মন, খারাপ কথা বলা সে ছেড়ে দিয়েছে। উঠ্‌তে বসতে কখনো (তাঁকে) ভোলে না। এমনি হয়েছে প্রগাঢ় মিলন। কবীর বলছে, এমনিধারা আমার উন্মুনিভাব অর্থাৎ সমাধির অবস্থা। তাই আমি প্রকাশ ক'রে গান করলাম। সুখ-দুঃখের পরে এক পরম সুখ, তারই মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকি।"

করিয়াছেন। কিন্তু আমি পূর্বে দেখাইয়াছি যে, বর্তমান বাংলার বাউলদের 'সহজ' এই প্রকার 'সহজ' নয়। বাউলদের 'সহজ', বৌদ্ধ-সহজিয়াদের 'সহজ' এবং বৈষ্ণব-সহজিয়াদের 'সহজ,' একরূপ।

এখন তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া বাংলার বাউলদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার একটু আলোচনা করা যাইতে পারে :

"প্রেম ও অনুরাগ-পথের সাধকদের যে জীবন্ত ভাবধারা প্রবহমান, তাহাতে নিজেকে সহজে ছাড়িয়া নিজের সাধনার ধারা তাহাতে যুক্ত করাই হইল সত্য সাধনা।"

অর্থাৎ—ভগবৎ-প্রেমের পথে যে-সব সাধকগণ সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সম-সাধনাই বাউলদের সাধনা।

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের মতে বাংলার বাউলদের সাধনা ভগবৎ-প্রেমের সাধনা। কিন্তু বাংলার বাউলরা প্রেম বলিতে যাহা বুঝে, তাহা ভগবৎ-প্রেম নয়,—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

প্রেম-অর্থে নিত্যানন্দময় পরমতত্ত্বের মানবিক প্রতিনিধি—কৃষ্ণ-স্বরূপ ও রাধা-স্বরূপিণী—পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অচ্ছেদ্য আকর্ষণ। এই প্রেম যত গাঢ় হইবে, ততই 'রতি-নিষ্ঠা' সংঘটিত হইবে, সৃষ্টির মূলতত্ত্ব রজঃ-বীজের ধারা ঊর্ধ্বদিকে উল্টাইয়া যাইবে এবং চরম অবস্থায় উভয় চেতনা মিশিয়া গিয়া, আত্মস্বরূপের সামরস্য সংঘটিত হইয়া পরমানন্দ-উপলব্ধি হইবে। এই প্রেম যত গভীর হইবে, সাধক ততই "জ্যান্তে-মরা" অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত ও চেতনাহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, একান্ত দেহ-গত আকর্ষণ অর্থাৎ কাম দমিত হইবে এবং শেষে আত্ম-সাক্ষাৎকার বা 'মনের মানুষ'-এর উপলব্ধি হইবে। ইহাই বাংলার বাউলের প্রেম-সাধনা। এই প্রেম-সাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটি গানের ইঙ্গিত দেখিলেই বুঝা যাইবে :

"জেন্তে-মরা প্রেম-সাধন কি পারবি তোরা।
যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী হয়েছে হারা ॥
শোসায় শোষে না ছাড়ে বাণ,
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান,
ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
প্রেম-নদীতে জল পোরা ॥"

(গান নং ১০০)

"শুদ্ধ প্রেম-রাগে সদায় থাক রে আমার মন।
স্রোতে গা ঢালান দিও না বেয়ে যাও উজন॥
মহারস মুদিত কমলে,
প্রেম-শৃঙ্গারে লও রে খুলে,
আত্ম-সামাল সেই রণকালে
কয় ফকির লালন॥"
(গান নং ৮৩)

"প্রেম-পাথারে সাঁতার দিও খুব হুঁশিয়ারে।
নিশানসই না হ'লে
নদীর কূলে দাঁড়ালে
তোর লাভে মূলে সব যাবে স'রে॥"
(গান নং ৩৪৭)

"শুদ্ধ প্রেম সাধবি যদি কাম-রতি রাখ হৃদয়ে পুরে।"
(গান নং ৩৫৫)

"প্রেম-পাথারে চল সাতারে,
পার যেতে ভয় কি আর।
ভব-নদী পার হবি যদি
আগে দে নেহার॥"
(গান নং ৩৬০)

"প্রেম করা কি সহজ কথা, আগে স্বভাব রাখ দূরে।
তোমায় আমায় করব পিরিত এ জনমের তরে॥
চন্দ্রে সুধা, পদ্মে মধু,
বলো যুগল হয় কি ক'রে।
চন্দ্র থাকে গগন 'পরে,
পদ্ম সরোবরে॥
কাম যেথা প্রেম সেথা,
দেখ না নজর ক'রে।
দুধেতে হয় ঘি উৎপন্ন মথনের জোরে॥"
(গান নং ৪২৮)

বাংলার বাউলদের সাধনা 'অধর মানুষ'কে ধরবার সাধনা। এই 'মনের মানুষ', 'অধর মানুষ', 'অটল মানুষ', 'সহজ-মানুষ', 'রসের মানুষ', 'সোনার মানুষ', 'আলেক-মানুষ' 'ভাবের মানুষ' মানুষের হৃদয়-বিহারী পরমাত্মা। যদিও ইহা মূলতঃ প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরতম সত্তা, তবুও বাউলরা তাঁহাকে অনেক স্থলে ব্যক্তিগত ভগবান মনে করিয়াছে এবং অনেক গানে তাঁহার কাছে দৈন্য, আর্তি, শরণাগতি প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছে। 'মনের মানুষ'-এর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য কতকগুলি গানে আকুলতাও প্রকাশ করা হইয়াছে।

কিন্তু এই 'অধর মানুষ'কে উপলব্ধি করিবার বা 'ধরিবার' যে পদ্ধতি, তাহা একটি যৌগিক প্রক্রিয়া। এই 'অধর মানুষ'-এর স্থান বিশেষে আবির্ভাব ও তাহার উপলব্ধির প্রক্রিয়াই বাউল-সাধনার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেবল 'মনের মানুষ'-এর স্বরূপ ও তাহার উপলব্ধির সাধনা-সংক্রান্ত তাহাদের গানের কয়েকটি ইঙ্গিত উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টি বুঝানো যাইবে :

"ওরে আলেকের মানুষ আলোকে রয়।
শুদ্ধ প্রেম-রসিক বিনে কে তারে পায়॥
রস-রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝরে
মূল খণ্ড হয়॥

* * * *

আপনার জন্ম-লতা
জান গে তার মূলটি কোথা,
লালন কয় শেষের কথা
হবে সাঁই-পরিচয়॥"

(গান নং ৪৯)

"রূপের ঘরে অটলরূপ বিহারে,
চেয়ে দেখ না তোরা।

আছে রূপের দরজায়
শ্রীরূপ মহাশয়,
রূপের তালা-ছোড়ান
তার হাতে সদায়।
যে জন শ্রীরূপগত হবে,
তালার ছোড়ান পাবে,
অধীন লালন বলে অধর ধরবে তারা ॥"
(গান নং ১০৩)

"অধর ধর আমার মন,
তোর ভব-বন্ধন দূরে যাবে
ওরে তুই এড়াবি শমন।
মানুষ নীরে ক্ষীরে বিরাজ করতেছে,
তার স্থূল গেছে ব্রহ্মাণ্ড 'পরে, মূল পাতালে গেছে,
সেই মূলের সাধন গুরু জানে,
তা জেনে মন, কর সাধন।
সে দ্বারে উল্টা খেলা যে জন খেলতেছে
যে না নীরে-ক্ষীরে ভিয়ান ক'রে অধর ধরেছে।"
(গান নং ২৪৫)

"ও কেউ দেখবি যদি সহজ মানুষ, রূপের ঘরে যাও।
আছে নাছুত, মালকুত, জবরুত, লাহুত—চার মোকামে চাও ॥
সহজ মানুষের ধারা,
ধারা ধরতে হবে জেন্তে-মরা, পাগল-পারা,
তায় ধরতে গেলে স'রে পড়ে, নয়ন মুদে রও ॥"
(গান নং ৩০৩)

"মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে নাও তারে।
নিগমেতে আছে মানুষ, যোগেতে বারাম ফেরে ॥"
(গান নং ৩০৭)

"আগে মনের মানুষ ধর।
হবে তোমার সাধন সিদ্ধি
বৃদ্ধি হবে প্রেমাঙ্কুর ॥

*　*　*　*

বলি সাধনের রীতি,—
ল'য়ে প্রকৃতি সতী
অগ্নি-পারাতে গতি,—
উভয় রীতি থাকতে যদি পার ;
তবে সেই মানুষকে সঙ্গে ক'রে
রঙ্গে-ভঙ্গে ফের ॥"
(গান নং ৩৮২)

"মনের মানুষ এই মানুষে আছে, লও চিনে,
তারে দেখ রে মন, জ্ঞান-নয়নে।
রসিক যারা, জানবে তারা,
অরসিকে জানবে কেনে ॥
নীরে ক্ষীরে এক জায়গাতে রয়,
রসিক হংস হ'লে নীর বেছে ক্ষীর খায়,
যেমন পাকা আম শৃগালে খায় না,
দেখ, মন থাকে তার কুভোজনে ॥

*　*　*　*

ক্ষ্যাপা মদন বলে, রসিক হ'লে
যুগল-তত্ত্ব সেই সব জানে ॥"
(গান নং ৪১৬)

বাংলার বাউলের প্রেম মানবিক প্রেম এবং 'অধর মানুষ'কে ধরিবার সাধনা, প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক যোগ-সাধনা।

এখন বেশ বুঝা যায়, ক্ষিতিমোহনবাবু কাহাকে 'সাচ্চা' বাউল বলিয়াছেন। 'সাচ্চা' বাউল-অর্থে মনে হয়, তিনি বুঝিয়াছেন, যে-বাউল কোনোরূপ প্রকৃতি-ঘটিত সাধনা করিবে না, যে-বাউল ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও মানুষের মধ্যে ভগবানের লীলা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবে, যে ভগবানের প্রেমে সর্বসময়

উন্মত্তবৎ ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং তাঁহার প্রেম-স্পর্শ পাইবার জন্য লালায়িত হইবে, তাহার মনের মানুষকে পাইবার জন্য সর্বদা আকুলি-বিকুলি করিবে, কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম মানিবে না, শাস্ত্রাচার বা দেব-দেবতা মানিবে না, কেবল ভগবানের প্রেমে সর্বদা আত্মহারা, উন্মাদবৎ হইয়া থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুঃখের বিষয়, এইরূপ 'সাচ্চা' বাউল, বর্তমানে বাংলায় যাহারা বাউল বলিয়া পরিচিত, তাহাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সাধকদিগকে, বিশেষভাবে কবীরকে, অনেকাংশে এইরূপ 'বাউল' বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভগবদনুভূতি তাঁহার একান্ত নিজস্ব অনুভূতি এবং তাহা তাঁহার অন্তর হইতেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বর-চেতনা বা ধর্ম-বোধ কোনো বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক মতবাদ হইতে উদ্ভূত নয়। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের লোক হইলেও ব্রাহ্ম-সমাজের সুনির্দিষ্ট ধর্মমত, অনুশাসন, উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গ্রহণ করেন নাই।

"আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল, আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।" (জীবনস্মৃতি)

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বোধ বা ঈশ্বরানুভূতি তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে একটা বিশিষ্ট রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার পরিচয় নানা উপকরণ লইয়া তাঁহার সুবিপুল সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, উহার মূল ভিত্তি উপনিষদের মধ্যে। উপনিষদের কতকগুলি শ্লোকের যে মর্ম কবির সমুন্নত কল্পনায় ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, রস-চেতন ও সৃষ্টিকুশলী মনে রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাই তাঁহার অধ্যাত্ম-চেতনার রূপ। তাহার সহিত বৈষ্ণবধর্মের মূর্তি-নিরপেক্ষ লীলাবাদ আসিয়া মিশিয়াছে, বৈষ্ণব-প্রেম-তত্ত্বেরও প্রভাব পড়িয়াছে। মধ্যযুগের উত্তর ভারতীয় সাধকদের ভাবাধারাও এই অনুভূতিকে বিশেষ পুষ্ট করিয়াছে। সমস্ত মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্ট ভগবদনুভূতির রূপ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব এবং কোনো প্রচলিত ধর্ম-পন্থার সহিত ইহা মিলিবে না।

বাউলরা যেমন প্রচলিত শাস্ত্রাচার মানে না, কোনো দেব-দেবীর উপাসনা করে না, বা কোনো প্রচলিত ধর্মের অনুষ্ঠান করে না, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও

ইহার যথেষ্ট প্রবণতা ছিল এবং তাঁহার ধর্ম-মতে তিনি বাউলদের মতই একটা স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-চেতনা মূলতঃ ঈশ্বর-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে-প্রেম নানা রূপ লইয়া তাঁহার অনুভূতি ও কল্পনাকে বিচিত্র পথে চালিত করিয়াছে এবং একটা অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যাতায়াত ও অবস্থান-কালে সে-অঞ্চলের বাউলদের গানের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তিনিই প্রথম লালন ফকিরের কতকগুলি গান তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে প্রচার করেন। কিন্তু খুব সম্ভব তাহাদের বিশিষ্ট ধর্ম-মতের জন্য তিনি সেগুলি সংগ্রহ করেন নাই, পল্লী-সাহিত্যের উচ্চ ভাব-সমৃদ্ধ নিদর্শন হিসাবেই সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরার—

"আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যে রে।"

—এই ভগবৎ-ভক্তিমূলক গানটিও সেই সঙ্গে সংগ্রহ করেন। তারপর যখন তিনি ক্ষিতিমোহন বাবুর 'সাচ্চা' বাউলের গান কয়টি শুনিলেন বা দেখিলেন, তখন সেগুলির সহিত তাঁহার অধ্যাত্ম-দর্শন ও প্রেম-তত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং বাউলের উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। তাহার পর হইতেই এই আনুষ্ঠানিক ধর্মের বন্ধনমুক্ত, লোকাচার-বহির্ভূত, 'সহজ'-অনুভূতি-জাত ঈশ্বর-প্রেমে মত্ত বাউলেরআদর্শকে নিজের আদর্শের সঙ্গে এক করিয়া লইলেন। মানব-হৃদয়ের সহজাত ভগবৎ-প্রেমই হইল তাঁহার 'মানুষের ধর্ম'—'মানব-সত্য'। জীবনের শেষে তিনি একেবারে নিজেকে 'ব্রাত্য', 'মন্ত্রহীন', 'জাতিহারা', 'পংক্তিহারা'বলিয়া উল্লেখ করিলেন 'পত্রপুট'-এর বিখ্যাত কবিতাটিতে। ইহার মূলে এই গানগুলির প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় এবং এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-দর্শনের সঙ্গে অনেকাংশে মিলিয়া যায়। ক্ষিতিমোহনবাবুর গান কয়টির উপর রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ আকর্ষণের ইহাই রহস্য বলিয়া মনে হয়।

'পরকীয় তত্ত্ব' শিরোনামায় শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় বলিতেছেন: "এই যে সংসারে সাংসারিক নিয়মের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াও যে সংসারাতীত প্রেমময়ের জন্য ব্যাকুলতা, ইহা যেন ঘরে থাকিয়া বাহিরের জন্য ব্যাকুলতা; ইহাই পরকীয় রস বলিয়া কথিত।

"এই প্রেম-পরশ হয় ভগবানের বিশেষ কৃপায়। তাই চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

'ধর্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥' (আদি, ৪)

'চৈতন্যচরিতামৃতে' কিভাবে রাধার পরকীয়া-তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে, তাহা কি সুপণ্ডিত সেন মহাশয় জানেন না? মধুর রস বা শৃঙ্গার-রসই সকল রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 'কান্তা প্রেম সর্বসাধ্যসার'—এই কান্তা-প্রেমের চরম প্রকাশ পরকীয়া-প্রেমে এবং রাধা প্রেমের মধ্যেই পরকীয়া-প্রেমের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। পরকীয়া-তত্ত্ব প্রেমের সর্বোত্তম অবস্থা:

"অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥"

(আদির ৪র্থ পঃ)

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের উদ্ধৃত দুই লাইনে কবিরাজ গোস্বামী কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা কি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন? ইহার পূর্বপ্রসঙ্গ এইরূপ:

"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে লীলার প্রচার।
সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥
আমি না জানি, তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপে গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন ॥
ধর্ম ছাড়ি রাগে দুহেঁ করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥"

এখানে 'ধর্ম' ও 'রাগ'—এই দুইটির মধ্যে একটা পার্থক্য সূচনা করা হইয়াছে। 'ধর্ম'-অর্থে এখানে শাস্ত্র-বিধি-অনুযায়ী বিবাহ-ধর্ম এবং 'রাগ'-অর্থে বিধি-মার্গ-বহির্ভূত, লৌকিক সম্বন্ধের অতীত, অহৈতুকী প্রেম। বৈকুণ্ঠে বিবাহ-ধর্মে

আবদ্ধ স্বকীয়াগণের সহিত লীলা, আর ব্রজে বিধি-মার্গ-বহির্ভূত পরকীয়া-প্রেমের লীলা। 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে রূপ গোস্বামী উপপতির সংজ্ঞা দিয়াছেন :

"রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মং পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয় প্রেমসর্বস্বঃ বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ ॥"

যিনি পরকীয়া অবলাকে প্রার্থনাকারী, রাগ-হেতু বিবাহ-ধর্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি সেই নায়িকাদের প্রেমের বিষয় হন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই উপপতি বলেন।

শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী বিবাহিত দম্পতির আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া এই অহৈতুকী প্রেম-মার্গে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হয় ; এই মিলন নিরবচ্ছিন্ন হইলে তাহার বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব থাকে না। তাই ভাব-পুষ্টি ও রস-পুষ্টির জন্য এই নিরবচ্ছিন্ন মিলন মধ্যে মধ্যে বিরহ ও মানাদির দ্বারা ভঙ্গ করা প্রয়োজন হয়। 'চিত্রজল্প' প্রভৃতি মহাভাবের চরমোৎকর্ষ বিরহেই লক্ষ্য করা যায়। ইহাই প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ প্রভৃতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত সম্পাদকগণের অনুমোদিত ব্যাখ্যা। সুতরাং "কভু মিলে কভু না মিলে" ভাগ্যের উপর নির্ভর নয় বা ভগবানের দয়া নয়।

পরকীয়া-তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় দিয়াছেন, তাহা বাংলার বাউলদের সম্বন্ধে একেবারে অর্থহীন। তাহাদের নিজের বিবাহিতা স্ত্রী থাকিতে পারে বা অন্যের বিবাহিতা কিন্তু বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা নারী হইতে পারে, কিন্তু যখন সে প্রকৃতি বলিয়া গৃহীত হইবে, তখন সে একান্ত তাহারই সাধন-সঙ্গিনী-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার সহিত প্রেম-সাধন চলিবে। এইরূপ প্রকৃতির সহিত প্রেমকেই পরকীয়া-প্রেম বলে। পরকীয়া-অর্থে পরদার বা পরের নারীতে আসক্তি নয়।

আসল বস্তুটি হইল, তাহাদের উভয়ের প্রেম—দেহ ও মনে সম্পূর্ণ একীকরণ হইবে। সে নারী যেখান হইতেই সংগৃহীত হউক, উভয়ই উভয়ের একান্ত আপনার হইবে। স্বকীয়া হউক বা এইরূপ পরকীয়াই হউক, তাহাদের একটি প্রকৃতি প্রয়োজন। সেই রাধারাণী-স্বরূপাকে তাহারা দেহ ও সমস্ত প্রাণ দিয়া ভজনা করিয়া সাধনা করে। তাহাদের সাধনার মূলতঃ তিনটি তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব। আত্মতত্ত্বে আত্মস্বরূপের অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপের তত্ত্ব, পরতত্ত্বে প্রকৃতি-স্বরূপ বা রাধা-স্বরূপের তত্ত্ব, আর গুরুতত্ত্বে প্রেমতত্ত্ব—

উভয়ের যুগলমিলন। একটি গানে আছে :

"আত্মরূপে কৃষ্ণ তিনি, পরতত্ত্বে রাধারাণী,
গুরুতত্ত্বে প্রেম বাখানি,
হয় মহাভাবের উদয়।
কৃষ্ণ অধর বলে, মনোহর, নে যত্ন ক'রে,
দিলাম তোরে তত্ত্ব ব'লে,
সাধনের এই নির্ণয়॥" (গান নং ৩৪৯)

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের এই প্রবন্ধের 'একরস ও সমরসতত্ত্ব' বলিয়া উপ-শিরোনামাযুক্ত একটি অংশ আছে। তাহাতে তিনি বলিতেছেন: "এই সমরসতত্ত্বটি বাউলদের সহজ পথের একটি খুব বড় কথা—ভেদ-বিভেদের সব অনৈক্য এই একরস ও সমরস-সাধনের দ্বারা দূর হইয়া যায়। শিব আর শক্তি, জ্ঞান আর ভক্তি যদি ভিন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা কোনো কাজেই লাগে না—একত্র হইলে তবে নব নব সৃষ্টির মূল খুলিয়া যায়।"

সমরস-তত্ত্ব অবশ্যই বাউল-সাধনের খুব বড় কথা, তবে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় এই সামরস্য সম্বন্ধে কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা বুঝা গেল না। "ভেদ-বিভেদের সব অনৈক্য"—কথাগুলির অর্থ কি ? কিসের "ভেদ-বিভেদ ?" শিব আর শক্তি কি "জ্ঞান আর ভক্তি ?" "নব নব সৃষ্টির মূল খুলিয়া যায়"—ইহার অর্থ কি ?

তিনি প্রথমে বলিতেছেন: "দেহতত্ত্ব-সাধকেরা জ্ঞান ও প্রেম-ধারা (?), গঙ্গা ও যমুনা, ইড়া ও পিঙ্গলাকে একত্র করিয়া এই সংগমে মুক্তিস্নান করেন।"

এই বলিয়া তিনি কবীরের একটি দোঁহার চারিটি লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন :

"সুরত ঔর নিরত ধার মনমেঁ পকড় কর ;
গঙ্গ ঔর জমনকে ঘাট আনৈ।
নীর নির্মল ওহাঁ রৈন দিন ঝরত হৈ ;
জনম ঔর মরণ তব অংত পাই।"

ক্ষিতিমোহন বাবু 'সুরত' ও 'নিরত'-এর অর্থ করিয়াছেন প্রেম ও বৈরাগ্য। কিন্তু কবীর-সম্বন্ধে বর্তমান হিন্দী-জগতের অন্যতম প্রামাণিক পণ্ডিত ডক্টর হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ইহার অর্থ করিয়াছেন[১৩৩]—অন্তর্মুখী প্রবৃত্তি ও বহির্মুখী প্রবৃত্তির নিরোধ। এই অন্তর্মুখী প্রবৃত্তির ধারা গঙ্গার (ইড়ার) সঙ্গে বহির্মুখী

১৩৩। কবীর—পৃঃ ৭৮

প্রবৃত্তির (পিঙ্গলা) ধারা যমুনাকে চিত্তসংযোগ দ্বারা নিরোধ করতঃ যুক্ত করিয়া সুষুম্না-পথে ('সরস্বতী') চালিত করিয়া তিনটি ধারার সঙ্গম-স্থল 'ত্রিবেণী'তে ('প্রয়াগে', 'ঘাট' অর্থাৎ আজ্ঞচক্রে) পৌছিয়া সেই স্থানে অনুক্ষণ প্রবাহিত নির্মল জলে স্নান করিলে আর জন্ম-মরণ হইবে না। মনে হয়, ইহাই এই কয়টি লাইনের অর্থ। ইহা একান্তভাবে যোগ-ক্রিয়া।

কিন্তু ক্ষিতিমোহন বাবু অর্থ করিয়াছেন: "প্রেম ও বৈরাগ্যের ধারা একত্র যোগ করিলে যে 'প্রয়োগ' বা 'প্রয়াগ' হয়, তাহাতে স্নানই মুক্তি।"

"......রসের আনন্দে এই এক হওয়া—তারই নাম সমরস। এই সমরস বা একরসের কথা নাথপন্থ শৈব যোগীদের মধ্যে, তন্ত্রে, উত্তর-পশ্চিমে, পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের সাধকদের মধ্যে বহু বহু স্থানে আছে।"

"......এই প্রেমসাধনা হইল অন্তরের। ভগবানের বিশেষ কৃপা ছাড়া মানুষ সে রস জীবনে পায় না।"

সামরস্যের অনুষ্ঠান একটি যোগ-সাধনার উপর নির্ভর করে। ভগবৎ-প্রেমের সঙ্গে ইহার কি নিকট সম্বন্ধ আছে বুঝি না। মূলতঃ ইহা যোগের ক্রিয়া। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় নাথপন্থী, শৈব যোগী ও তান্ত্রিকগণের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাধকদের মত সামরস্য আছে বলিয়াছেন। নাথপন্থী ও তান্ত্রিকদের নিকট ইহা হঠযোগের একটি প্রক্রিয়া, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সাধকগণ, বিশেষভাবে তাঁহাদের মধ্যমণি কবীর, যোগমার্গ অবলম্বন করিলেও তাঁহাদের সাধনা ছিল একান্তভাবে ভগবৎ-প্রেম-ভক্তি-মার্গে। তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্তরের প্রেম-সাধনা দ্বারা সামরস্য-সাধনের কথা হয়তো বা উঠিতে পারে, কিন্তু নাথপন্থী ও তান্ত্রিকদের বেলায় তো তাহা মোটেই খাটে না। তিনি যোগ-পথ ও ভক্তি-পথের মধ্যে একটা গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। হয়তো সামরস্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও স্পষ্ট নয়।

কবীরের প্রভাব তাঁহার উপর থাকার দরুণ তিনি বাংলার বাউলদের সম্বন্ধে এইরূপ সামরস্যের কথা বলিয়াছেন। বাংলার কোনো বাউলই এই শিব-শক্তি-যোগকে 'সমরস' বলে না। এই কথাটি বিশেষভাবে পণ্ডিতের কথা ও বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ইহা উল্লিখিত আছে। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বাউলরা এই কথাটি ব্যবহার করে না। আমার নিকট দেড় হাজার গানের মধ্যে এই শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। এমনকি, সংস্কৃত-শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত 'হাউড়ে গোঁসাই'-এর গানেও নাই। এই কথাটির স্থলে তাহারা 'যুগল'

কথাটি ব্যবহার করে। তাহাদের গানে ও আলাপ-আলোচনায় একমাত্র এই 'যুগল' কথাটিই ব্যবহৃত হয়, আর কোনো কথা নয়।

তারপর, "সমান হয়ে সহজশূন্যে নিরালম্ব থাক।" 'শূন্য' বা 'সহজশূন্য' কথাটি বাংলার বাউলদের ত্রিসীমানার মধ্যে নাই।

'শূন্য' বৌদ্ধদের পরমপদ—নির্বাণ। শূন্য-অর্থে অভাব বা নঞাত্মক কিছু বুঝায় না। নাগার্জুন শূন্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন: "অস্তি-নাস্তি-তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্তং শূন্যরূপম্"—যাহা অস্তিও নয়, নাস্তিও নয়, অস্তি-নাস্তি তদুভয়ও নয়, অনুভয়ও নয়, অর্থাৎ অস্তি-নাস্তি নয় এমনও নয়—এই চতুর্বিধ অবস্থার অতিরিক্ত যে অবস্থা, তাহাই শূন্যরূপ। অর্থাৎ ইহা একটি অনির্বচনীয় অবস্থা। তারপর তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বলিলেন—নির্বাণে যে কেবল শূন্য থাকে তাহা নয়, মহাসুখও থাকে। বৌদ্ধ-সহজিয়ারা শূন্য বা নির্বাণ-অর্থে মহাসুখ বুঝিয়াছেন। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের কোনো গ্রন্থে শূন্যের উল্লেখ নাই। 'মহাসুখের' স্থলে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলনের দ্বারা প্রেমের পরাকাষ্ঠা হইল তাহাদের 'মহাভাব'। বাউলদেরও কোথাও শূন্য নাই। এই পরমপদ হইল মিথুনাত্মক অসীম আনন্দানুভূতির দ্বারা আত্মস্বরূপের উপলব্ধি।

নাথপন্থী যোগীরা শূন্যাবস্থার কথা বলিয়াছেন। জীবাত্মা সর্বোচ্চ চক্র শূন্যচক্রে পৌঁছিলে সকল দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া 'কেবল'-রূপে বিরাজমান হন। এই 'কেবলাবস্থা'ই শূন্যাবস্থা—যেখানে আত্মার সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদ—কোনো প্রকারের অনুভূতি থাকে না। এই সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত অবস্থাকেই কেবলাবস্থা, শূন্যাবস্থা বা শূন্যাশূন্য-অবস্থা বলা হইয়াছে। নাথ-পন্থীরা 'সহজ' ও 'শূন্য'—এই দুইটি কথা একত্রে ব্যবহার করিয়াছেন। নাথ-পন্থীদের চরম লক্ষ্য বা পরমপদ সহজাবস্থা বা শূন্যাবস্থা। সহজাবস্থা ও শূন্যাবস্থা অভিন্ন। কবীর প্রভৃতি সন্তেরাও প্রায়ই 'সহজশূন্য' কথাটি একসঙ্গে ও একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু একটি কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, যোগ-ক্রিয়ায় নাথ-পন্থীদের সঙ্গে কবীরের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও, কবীরের 'সহজ' বা 'সহজশূন্য' ভগবানের প্রতি সর্বত্যাগী প্রেম। ইহা যোগীদের সহজাবস্থা নয়, প্রেমিকদের সহজাবস্থা।

ভগবানে এই পূর্ণ আত্মসমর্পণেই 'সহজ-সমাধি'-লাভ হয়। প্রেমের পথে আত্মবিলোপী এই ভগবৎ-মিলনই 'সহজশূন্য'। মধ্যযুগের ভক্ত-যোগী সন্তদের সঙ্গে বাংলার বাউলদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ দুইটির মধ্যে উত্তর-ভারতীয় সন্তদের সম্বন্ধে যাহা খাটে, তাহাই বর্তমান বাংলার বাউলদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রবন্ধে আলোচিত আরো কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া আমরা এই আলোচনা শেষ করিব।

তাঁহার প্রবন্ধে 'ত্রিকাল যোগ' বলিয়া একটা উপ-শিরোনামা দিয়া তিনি বলিতেছেন: "সহজ-মতের আর একটি কথা হইল ত্রিকাল-যোগ। ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে বর্তমান হইল সেতু।"...

"ভক্তিহীন ভোগী বিদ্বান্ ও বিষয়সম্পন্ন শূরণকে দেখিয়া কবীর বলিয়াছিলেন, 'তোমার জীবন একটি মর্মরপ্রস্তরনির্মিত মহার্ঘ সেতু, যাহা দুই তীরের সঙ্গে অন্নের জন্য যুক্ত হয় নাই'।"

"যাঁহারা ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা ক্ষয় করিয়া বর্তমানে ঐশ্বর্যসৃষ্টি ও সুখসম্ভোগ করেন, তাঁহারা কৃপার পাত্র।"...

বাংলার বাউলদের এই 'ত্রিকাল-যোগ' কি, তাহা বুঝিলাম না। কবীর, দাদূ প্রভৃতির 'সহজ'-সাধনায় এই জিনিসটি থাকিতে পারে, কিন্তু বাংলার বাউলদের মুখে একথা শুনি নাই বা তাহাদের গানেও পাই নাই। এই 'ত্রিকাল' বা 'ত্রিকায়' কালচক্রযানের তন্ত্র-টীকা 'বিমলপ্রভা'য় উল্লিখিত আছে। সেখানে ইহার অর্থ স্বতন্ত্র।

'কায়াযোগ' বলিয়া তিনি যে প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন, সেই 'ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড'-বাদ বাউলদের সাধনার প্রধান অঙ্গ. ইহা সর্বজন-বিদিত। ইহাতে কবীর, নানক, অথর্ববেদ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত না করিয়া দুই-একটি বাউল-গানের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইহাতে এক পংক্তিও উদ্ধৃত হয় নাই। তাঁহার জগা কৈবর্ত, বিশা ভুঁইমালী, নমঃশূদ্র গঙ্গারাম প্রভৃতি কি এ সম্বন্ধে কোনো গান রচনা করে নাই? দৃঢ়ভাবে মনে হয় যে, মধ্যযুগের উত্তর-ভারতীয় সন্তদিগকে সম্মুখে রাখিয়াই তিনি বাংলার বাউল-পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

'অজপা-জপ', 'ব্রহ্ম-সংকোচ' প্রভৃতি বাংলার বাউলদের প্রসঙ্গে কিরূপে প্রযোজ্য, তাহা বুঝি না।

'ঊর্ধ্বস্রোত' বা 'ধারা-উল্টান'ই বাউলদের সাধনার মূলতত্ত্ব। কিন্তু ইহার স্বরূপটি কি, তাঁহার প্রবন্ধ হইতে তাহা বুঝা গেল না।

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় বাউলদের স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাওয়ার সাধনার নাম দিয়াছেন 'গ্রন্থি-মোচন'। অথচ তাঁহার গঙ্গারাম, জগা, বিশা, বলার কোনো

উদ্ধৃত গানেই বাংলার বাউলদের গানে বহু-ব্যবহৃত 'রূপ-স্বরূপ'-তত্ত্বটির কোনো উল্লেখ দেখি না। 'রূপ' হইতে 'স্বরূপে' ওঠাই বাংলার বাউলদের সাধনা এবং অসংখ্য গানে নানাভাবে ইহার উল্লেখ আছে।

শেষে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তিনি যেন আমাকে ভুল না বোঝেন। দীর্ঘদিন বাংলার নানাস্থানে বাউল-গান সংগ্রহ করিয়া এবং বাউল ও বাউলানীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া আমার যাহা অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাই আমি এই প্রসঙ্গে বাংলার সুধীসমাজ ও বাংলা সাহিত্যের গবেষকদিগের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছি। ইহা তাঁহার ও আমার কোনো ব্যক্তিগত জিনিস নয়। বাংলার এই একান্ত নিজস্ব, নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সাধারণের অজ্ঞাত, গূঢ় ধর্মধারার যথার্থ পরিচয়-দান কি আমাদের উভয়েরই কাম্য নয়?

এই সব আলোচনার পরেও একটি প্রশ্ন হয়তো মনে উঠিতে পারে: ক্ষিতিমোহন বাবুর এই গানগুলি যদি অকৃত্রিম হয়, তবে এইরূপ ঈশ্বর-প্রেমিক বিশুদ্ধ বা 'সাঁচ্চা' বাউল বাংলায় কোনো সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া কি আমরা মনে করিতে পারি না? কাব্য-সম্পদে উজ্জ্বল ও দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ এই গান কয়টি কি সেই-সব বাউলের রচনার নিদর্শন স্বরূপ ধরা যায় না?

আমরা দেখিয়াছি যে, 'বাউল' কথাটি প্রথমে ব্যাপকভাবে 'উন্মাদ', 'ক্ষিপ্ত', 'প্রেমোন্মাদ' বা 'ভাবোন্মাদ'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর পূর্বে কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। সুফী-সম্প্রদায় প্রেমের পথেই ভগবানের সাধনা করে। ভগবৎ-প্রেমে আত্মবিস্মৃত 'ফানা'-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা-অনুভবই তাহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকগণের উপর সুফী-প্রভাব ছিল প্রবল। বাংলার বাউলদের গানের মধ্যেও স্থানে স্থানে সুফী-ধর্মের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যদিও সাধনাংশে কোনো প্রভাব লক্ষিত হয় না। আমরা জানি যে, ভারতে সুফীগণের আগমনের পর এক শ্রেণীর ভগবৎ-প্রেমিক, সাম্প্রদায়িক ধর্ম-গণ্ডীর বহির্ভূত, আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ-মুক্ত, 'সহজ'-পথের সাধক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহারাই মধ্যযুগের উত্তর-ভারতীয় সন্ত-সাধকগণ। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, বাংলাতেও ঐরূপ মুসলমান ও হিন্দুশ্রেণীর একদল সাধকের উদ্ভব হইয়াছিল—যাহারা ছিল একান্তভাবে ভগবৎ-প্রেমিক, ভগবৎ-প্রেমে সর্বদা উন্মত্তবৎ, সাম্প্রদায়িক ধর্ম-গণ্ডীর আবেষ্টনমুক্ত—লোকাচার ও দেশাচারের বন্ধনমুক্ত 'সহজ'-পথের সাধক। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হয়তো হিন্দু ও

মুসলমান-শ্রেণীর এই সব সাধক বিশেষ শক্তিসঞ্চয় করিয়া বাংলার চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। তাহার পরই তন্ত্রের দেশ বাংলায় তন্ত্র-প্রভাবান্বিত বর্তমান বাউল-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং পূর্বোক্ত শ্রেণীর ভগবৎ-প্রেমিক বিশুদ্ধ বাউল-সম্প্রদায় ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। ঐ শ্রেণীর বাউলদিগকে বর্তমান বাউলদের একটি পূর্বতন ও বিলুপ্ত শাখাভাবে কি গণ্য করা যায় না? পূর্বের সেই সব বাউলরা ছিল ভাবুক, ভগবৎ-প্রেমিক, কবি ও দার্শনিক। তাহাদেরই দুই-চারিটি গান কালের প্রভাব এড়াইয়া আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে—এইরূপ অনুমান কি অসঙ্গত হয়? তবে বর্তমানে অবশ্য এরূপ বাউল ও এরূপ গান একটা নিছক কল্পনার জিনিস বলিয়াই মনে হয়।

'বাউল-গান' কথার অপপ্রয়োগ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে 'বাউল-গান' কথাটি ইহার প্রকৃত তাৎপর্যে ব্যবহৃত হইতেছে না,—অতি শিথিলভাবে লোকে এই কথাটি ব্যবহার করিতেছে।

বাউল একটি ধর্ম-সম্প্রদায়। বাউলদের ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন আছে, সাধন-পদ্ধতি আছে, সাধক-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাহাদের একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে,—এই সমস্তই তাহাদের গানে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সাধকগণের তত্ত্ব-দর্শন ও সাধনা-সংবলিত গানই প্রকৃত বাউল-গান।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কয়েকজন 'শখের বাউলের' উদ্ভব হয়। ইহারা বাউল-গানের ছন্দ ও সুরে সাধারণ ভগবৎ-প্রেম ও ভক্তি, পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপ, সংসারের অনিত্যতা, প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্ত হইবার নীতিকথা, বাউলদের অনুকরণে দেহতত্ত্ব প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া গান রচনা করিয়াছেন এবং ঐগুলি বাউল-গান বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। এই তথাকথিত বাউল-গানের সঙ্গে তাঁহাদের রচিত সামাজিক প্রসঙ্গ, ভারত-নারীর বৈশিষ্ট্য, ভিক্টোরিয়ার দয়া, ভারত-বন্ধু ফসেটের কথা, দেশের সমসাময়িক অবস্থা, কৃষ্ণলীলা, শ্যামা-সংগীত, ইংরেজী সভ্যতায় দেশের লোকের মতিগতি প্রভৃতি বিষয়ক এবং সমসাময়িক ঘটনা-সম্বন্ধীয় গানও আছে। এইরূপ বাউল-গান-রচয়িতাদের মধ্যে কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার ও পাবনার গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। হরিনাথ 'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ'-এর ভণিতায় এবং গোলোকচন্দ্র 'দীন বাউল'-এর ভণিতায় তাঁহাদের গানগুলি প্রচার করিয়াছেন। এই গান-

গুলিকে লোকে বাউল-গান মনে করিতেছে। কিন্তু ভগবৎ-ভক্তিমূলক বা বৈরাগ্য-সূচক বা হিন্দু-দর্শনের দুই-একটি তত্ত্বমূলক গানের ভাষা সহজ ও প্রচলিত বাউল-গানের মত এবং সুর পল্লীগানের সুরের মত হইলেই তাহা বাউল-গান হয় না। ইহা একটি নির্দিষ্ট ধর্ম-মতের সাধন-বিষয়ক গান। সেই সাধকগণের দ্বারা রচিত নিজেদের ধর্ম-তত্ত্ব, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-পূর্ণ গানই প্রকৃত বাউল-গান। এই গানই তাহাদের ভাব ও অভিজ্ঞতা-প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম—আত্মপ্রকাশের একমাত্র পথ। তাহাদের নিজস্ব বৈঠকে প্রায়ই প্রশ্ন ও উত্তরের (সওয়াল ও জবাবের) ভঙ্গীতে গান গীত হয়। সাধারণতঃ এই বৈঠকে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের বা উচ্চাঙ্গের সাধকদের রচিত গান ('মহাজন-পদ') গীত হয়,—কোনো কোনো সময় নিজেদের রচিত গানও থাকে। 'শখ' করিয়া বা ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া প্রকৃত বাউল-গান রচনা করা যায় না। বর্তমান কালের শিক্ষিত শহর-বাসী কবিদেরও অনেকে ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া বাউল-গান রচনা করিতেছেন এবং নির্বিচারে তাহাই নানাস্থানে গীত হইতেছে। কিন্তু এগুলি প্রকৃত বাউল-গান নয়। সত্যকার বাউল-গান বাউলদের দ্বারা রচিত হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া গান রচনা করিলে তাহা বাউল-গান হয় না, তাহা হয় কৃত্রিম এবং ব্যর্থ অনুকরণের সামগ্রী মাত্র। বাউলের গান সত্যকারের বাউদের দ্বারা রচিত হইবে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "জীবনে জীবন যোগ" করিতে হইবে, তাহা না হইলে "কৃত্রিম-পণ্যে ব্যর্থ হবে গানের পসরা"।

বাউল-গানের রচয়িতা

বাউলদের মধ্যে সাধারণতঃ যাহারা অভিজ্ঞ ও গুরুস্থানীয় হইবার যোগ্য এবং যাহাদের মধ্যে সহজ কবিত্ব-শক্তি আছে, তাহারাই ঐ সব গান রচনা করিয়াছে। শিক্ষিত বা পণ্ডিত বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহাদের প্রায় কেহই তাহা নহে। বিশেষতঃ মুসলমান বাউলদের মধ্যে শিক্ষা বা বিদ্যার এইরূপ মাত্রা নাই বলিলেই চলে। তবুও সাধারণ জ্ঞান, জগৎ ও জীবনের প্রতি সদা-জাগ্রত দৃষ্টি, ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রত্যয়, বিষয়বস্তুর সম্যক্ অবগতি, নিরন্তর আত্মবদ্ধ আবেগ ও ভাবাতিশয্য এবং সহজাত কবিত্ব-শক্তি থাকার দরুণ তাহারা মোটামুটি ভালভাবেই তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছে।

ইহারা অত্যন্ত গুরুবাদী সম্প্রদায়। নিজেদের ভণিতার সঙ্গে কোনো-না-কোনো উপায়ে গুরুর নাম সংযোগ করিয়া ইহারা সাধারণতঃ গান রচনা করে।

অনেক সময় নিজের ভণিতা হইতে গুরুর ভণিতা জমকালো হইয়াছে দেখা যায়। গুরুর নিকট হইতে ইহারা যে তত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ পাইয়াছে, যে-সাধনার নির্দেশ পাইয়াছে এবং তদনুসারে নিজে যে ক্রিয়া করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাই অকপটে তাহাদের গানে ব্যক্ত করিয়াছে। যদি গুরু-প্রদত্ত জ্ঞান বাস্তবিকপক্ষে ভুলও হয়, বা ঐতিহাসিক বা বাস্তবদৃষ্টিতে সত্য-প্রতিষ্ঠ না-ও হয়, তবুও তাহারা গুরু-উপদেশকে চরম সত্য বলিয়া মনে করে। সম্প্রদায়গত বিশ্বাসগুলি ইহারা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লয়। দৃষ্টিভঙ্গী বা উপস্থাপন পৃথক হইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন মতবাদের কোনো স্থান তাহাদের গানে সম্ভব নয়।

হিন্দু-বাউলদের মধ্যে দুই-একজন সংগীত-রচয়িতা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'হাউড়ে গোঁসাই' প্রধানতম। ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান। প্রথম জীবনে ইনি হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র, দর্শন ও তন্ত্রাদি পাঠ করেন এবং হিন্দু-তন্ত্রানুসারে সাধক-জীবন আরম্ভ করেন। পরে ইনি জনৈক বৈষ্ণব-গোস্বামীর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মাধুর্য-ভজনের পথ অবলম্বন করেন এবং 'রসিক বৈষ্ণব' হিসাবে 'হাউড়ে গোঁসাই' নাম ধারণ করেন। এই সংগ্রহে ইঁহার কয়েকটি গান সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। গানগুলির মধ্যে হিন্দু-তন্ত্রোক্ত সাধনার কিছু প্রভাব লক্ষিত হয়।

সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বাউল-গান-রচয়িতা হিসাবে মুসলমান বাউল লালন ফকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। মূল-তত্ত্বজ্ঞতা, সাধনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, প্রত্যয় ও দিব্যদৃষ্টি, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সুফীতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, বক্তব্য ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাময় করিয়া বলিবার কৌশল, সহজ কবিত্ব-শক্তি প্রভৃতিতে তাঁহার গানগুলি বাংলা-সাহিত্যের একটি সম্পদ। গানগুলির মধ্যে রচয়িতার সংগীত-জ্ঞানেরও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। সুরের সহিত গানগুলির ছন্দ ও মিলের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। গানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,—এক-একটি ভাব যেন ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুর-সংযোগে অভিব্যক্ত তাঁহার গানের অকৃত্রিম আবেগের মধ্যে একটা অনির্বচনীয়ত্বের বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়া আমাদের চিত্তকে অপূর্ব ভাবলোকে যেন উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

এই গানগুলি এক সময়ে এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, বাংলার প্রায় সর্বত্রই গানগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার একটি প্রমাণ এই যে, বাংলার নানা প্রান্ত হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন বাউলের গানের মধ্যে এমন অনেক গান আছে, যেগুলিতে লালনের গানের কয়েক লাইন ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত লাইন কোথাও বা মূল আকারেও পাওয়া গিয়াছে। এই গানগুলি মুসলমান ও হিন্দু—

উভয় সম্প্রদায়ের বাউলের ভণিতাতেই পাওয়া গিয়াছে। সারা বাংলার বিশিষ্ট বাউলরা লালনকে 'সিদ্ধপুরুষ' বলিয়া অভিহিত করে।

বাউল-মহলে সংগীত-রচনা-বিষয়ে রাঢ়ের বাউলদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে পদ্মলোচন, যাদুবিন্দু প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ। পদ্মলোচন আদিযুগের একজন গীত-রচয়িতা। ইনি কোন্ স্থানের লোক, সে সম্বন্ধে পূর্বে কেহই ঠিক কিছু বলিতে পারে নাই, তবে সম্প্রতি বর্ধমান জেলায় গলসী থানার অন্তর্গত বেতালবন গ্রামের বাউল-সমাবেশে সমাগত বাউলদিগের নিকট জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার শলদা-ময়নাপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি একজন প্রাচীন বাউল-সাধক ও গান-রচয়িতা। এই বাউল-সমাবেশ হইতে তাঁহার আরও চৌদ্দ-পনরটি গান বিশেষভাবে সংগৃহীত করিয়া শেষের দিকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। পদ্মলোচনের গানের ভণিতায় 'পোদো' বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে, দুই-এইটি গানে 'পদ্মলোচন' বলিয়াও ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। ইহার গুরুর নাম হরি গোঁসাই। ভাষার সার্থক প্রয়োগ, ছন্দ ও মিলের নিপুণ ব্যবহার, সাধারণ উপমাগুলির সৌন্দর্য এবং সংগীতের বিশেষ উপযোগী করিয়া কবিতাগুলির দেহ-নির্মাণে গানগুলি বাস্তবিকই সুন্দর। এই গানগুলি বাউল-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

যাদুবিন্দুও পদ্মলোচনের মতো একজন উৎকৃষ্ট সংগীত-রচয়িতা। ইহার বাড়ী বর্ধমান জেলার পাঁচলখি গ্রামে। বাউল-গান ছাড়াও ইহার রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক অনেক গান আছে। ইহার কবিত্ব-শক্তি, পল্লীর জীবন-যাত্রার উপকরণ হইতে উপমা-সংগ্রহ, ছন্দ ও ভাষার উপর দখল এবং সংগীতের উপযোগী করিয়া কবিতা-রচনা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মধ্যবঙ্গের বাউল-ফকির পাঞ্জ শাহ্ বাউল-গান-রচয়িতা হিসাবে বিশেষ সুপরিচিত। সুফী প্রভাব পাঞ্জর উপর থাকিলেও বৈষ্ণব-প্রভাবও ছিল প্রবল। পাঞ্জর জীবনীতে দেখা যায়, যৌবনে বৈষ্ণবদের সঙ্গে তিনি 'চরিতামৃত'-পাঠ ও আলোচনা করিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনেক ভাব তিনি তাঁহার মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া গানে ব্যবহার করিয়াছেন। একটি গানে আছে :

"সর্পের খোলস প্রায় খসিয়া পড়িবে কায়,
সহচরী করে ধ'রে স্বরূপের দেশে দেয়,
অধীন পাঞ্জ বলে, বৈষ্ণব-দ্বারে জানি
মোর কপালে কি আছে।"

আর একটি গানের এক লাইন এইরূপ :

"সখী-অনুগত হ'য়ে নিত্যধামে গিয়াছে।"

যখন সাধন-বলে প্রাকৃত দেহের ঊর্ধ্বগত অপ্রাকৃত দেহ-লাভ হইবে, তখন সহচরী হৃদয়-বিহারী "অধর কালা"র সহিত মিলন ঘটাইবেন। সখী বা মঞ্জরী-অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা-দর্শনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের সাধ্য বা পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বাউল-তত্ত্বে "সখী-অনুগত হওয়া"র কোনো প্রশ্নই নাই। বাউলদের গানে ব্যক্তিগত ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা, শরণাগতি প্রভৃতি আছে বটে, কিন্তু মূলধর্ম-তত্ত্বটি হইতেছে আত্মোপলব্ধি,—পরমানন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি। তাঁহার গানে 'সাধারণী', 'সমঞ্জসা', 'সমর্থা', 'রতি', 'কারুণ্যামৃত', 'লাবণ্যামৃত', 'তারুণ্যামৃত' প্রভৃতিতে 'স্নান' ইত্যাদিতে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তবে এগুলি অনেক বাউলের গানেই তাহাদের তত্ত্বানুগামী করিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

পাঞ্জর গানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সাধনের ক্রিয়া-সংক্রান্ত অংশগুলির বিস্তৃত বিবরণ আছে এবং অনেকস্থলে খোলাখুলিভাবেই তাহা বলা হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত বাউলগানগুলির মধ্যে জলধর, রসিক, পুলিন, বনমালী, ঈশান প্রভৃতির গানগুলি তত্ত্ব-সমৃদ্ধ এবং সহজ প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন।

নরসিংদির বাউল-গান কয়টির খুব একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। তত্ত্ব, ভাব ও কবিত্বের দিক দিয়া অন্যান্য উৎকৃষ্ট গানের তুলনায় এগুলি কতকটা দুর্বল ও নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়। পূর্ববঙ্গের নরসিংদি বহুদিন হইতে বাউলদের একটা বড় আড্ডা বলিয়া খ্যাত। কিন্তু একাধিকবার চেষ্টা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াও ইহা অপেক্ষা ভাল গান সংগ্রহ করা সম্ভব নাই। তবে বর্তমানে এই স্থানের বাউলরা একেবারে হিন্দু গৃহস্থে পরিণত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস-রজকিনী-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা নবদ্বীপের বিখ্যাত বাউল-মোহান্ত চণ্ডীদাস, ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় অধিকাংশ নমঃশূদ্র-জাতির বাউলের গুরু চণ্ডী গোঁসাই এবং শিলাইদহের গোঁসাই গোপালের গানগুলি তত্ত্বাংশ ও সাধন-পদ্ধতির ইঙ্গিতের দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান্।

উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে লালন-শিষ্য দুদ্দু ও পাঁচুর গান কয়টি সহজ সরল প্রকাশের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুরু-হিসাবে লালনের উল্লেখ আর কোনো গানে পাওয়া যায় নাই।

বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত গানের মধ্যে সাহিত্য-রস, তত্ত্ব ও সাধন-ইঙ্গিত-সংবলিত কতকগুলি সুন্দর গান আছে।

চব্বিশ পরগণার জয়নগর-মজিলপুরের প্রাচীন বাউল 'রেজো ক্ষেপা'র গান কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রেজো ক্ষেপা' চব্বিশ পরগণার অধিকাংশ বাউলের আদি-গুরু বলিয়া কথিত।

কেঁদুলী ও বেতালবনে সংগৃহীত গানগুলির অধিকাংশই সব দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। তাহার মধ্যে নরহরির শিষ্য অনুরাগী গোঁসাই-এর গানগুলি ভাষা, উপস্থাপন ও তত্ত্বের দিক দিয়া উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বাউল-গান-প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। বাউল-গানের বিষয়-বস্তু এক—একই তত্ত্ব-কথা, একই সাধন-পদ্ধতি, একই গুরুবাদ, একই দেহ-তত্ত্ব প্রভৃতি। এই সব প্রসঙ্গ ধরিয়া সকল রচয়িতাই গান রচনা করিয়াছেন। সেজন্য একজনের রচনার সহিত আর একজনের রচনার বিশেষ সাদৃশ্য থাকা সম্ভব। এই সব কারণেই এক বা একাধিক রচয়িতার গানের সঙ্গে অন্যের গানের রচনার মিশিয়া যাইবারও বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এই সব গানের অধিকাংশই বাউলদের মুখে মুখে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে মুখে মুখে রচিত ও গীতও হয়। পরে হয়তো কেহ সুবিধামত খাতাপত্রে লিখিয়া রাখে, তবে অধিকাংশই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়া স্মৃতি হইতে গায়। প্রথমে যিনি গান রচনা করিয়া গাহিলেন, তাঁহার নিকট হইতে যাহারা সেই গান শুনিল, তাহারা কণ্ঠস্থ করিয়া প্রথমে তাহা গাহিল; তাহাদের নিকট হইতে আবার যাহারা শুনিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গানের সবটা অবিকল স্মরণে রাখিতে না পারিয়া বা ইচ্ছা করিয়া অন্য গান হইতে অনুরূপ ভাবের কয়েকটা অংশ সেই গানের সহিত জুড়িয়া দিয়া বা সেই গানের কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়া তাহা গাহিল। আবার সে গান শুনিয়া যাহারা গাহিল, তাহারা আবার অন্য কোনো গানের কয়েকটা পদ অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাহার সহিত জুড়িয়া দিল। আবার পরবর্তী গায়ক যদি নিতান্ত অশিক্ষিত হয়, তবে কোনো কোনো কথার অর্থ বা তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া সমোচ্চারিত দুই চারিটি অবান্তর বা অর্থহীন শব্দ বসাইয়া দিয়া তাহা গাহিল। এইভাবে অনেক মূল গানের বহু বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। গানের ভণিতায়ও অনেক বদল হইয়াছে। একই গান কিছু কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে বা কোনো সময় অক্ষত অবস্থায়ও ভিন্ন ভিন্ন ভণিতায়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারে ভণিতাহীন অবস্থায়ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে

পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় যে, কোনো 'মন্দকবি' একইভাবের অনুরূপ একটি খেলো গান রচনা করিয়া কোনো বিখ্যাত রচয়িতার নাম তাহাতে জুড়িয়া দিয়া 'যশঃপ্রার্থী' হইয়াছেন। বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত প্রায় দেড় হাজার গানের মধ্যে এই রহস্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি।

বাউল-গানের রূপ ও সাহিত্যিক মূল্য

ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতি যখন নৈর্ব্যক্তিক হইয়া একটা সর্বজনীন রূপ ধারণ করে, তখন তাহার মধ্যে রস-সৃষ্টি হয়। এই রস-সিক্ত ভাব ও অনুভূতি যখন উপযুক্ত ভাষায় অলংকার ও ছন্দাদি-যুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয় এবং চিত্তে রস-সঞ্চার দ্বারা আনন্দ দান করে, তখনই তাহা প্রকৃত কাব্য-পদ-বাচ্য হয়। সমুন্নত কল্পনা, বিপুল আবেগের সংহত গভীরতা ও প্রকাশের অনবদ্য কৌশলই আমরা কাব্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিচারের মানদণ্ড-রূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। কল্পনার লীলা ও আবেগের তরঙ্গ থাকিলেও, তাহা যদি উৎকৃষ্ট কলার মাধ্যমে প্রকাশ না পায়, তবে তাহা প্রকৃত সাহিত্য হইতে পারে না। কলা-কৌশলের মাধ্যমেই কাব্য-সাহিত্য সার্থক রূপ ধারণ করে এবং রূপের উৎকর্ষই সাহিত্যিক উৎকর্ষের একটা প্রধান লক্ষণ। সুতরাং প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর কাব্য-সাহিত্য অনেকখানি নির্ভর করে। আধুনিক সাহিত্য-বিচারে কলা-কৌশলের মধ্যে আমরা উপস্থানের কৌশল, ভাষা, অলংকার, ছন্দ, ইঙ্গিত, সংকেত প্রভৃতি অনেক কিছু বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণভাবে যে মাপকাঠিতে আমরা বর্তমানে সাহিত্যিক মূল নির্ণয় করি, বাউল-গানের বিচারে সে মাপকাঠি চলিবে না।

বাউল-গানের মূল বিষয়-বস্তু একটা ধর্ম-তত্ত্ব ও সেই ধর্ম-সাধনার ক্রিয়া-কলাপ। ইহার পরিধি সংকীর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন। ব্যক্তিগত ভাবানুভূতির উৎসারণ বা কোনো বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণের সম্ভাবনা ইহার মধ্যে নাই। তবুও এই ধর্ম-তত্ত্বের বিবৃতি বা ক্রিয়া-কলাপের স্বরূপ-নির্ধারণে যেটুকু ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগের পরিপ্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে যেটুকু সাহিত্য-রস সম্ভব, তাহাই ইহার সাহিত্যিক মূল্য। সেই আবেগ ও অনুভূতিটুকু সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়া চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কি না, তাহাই বাউল-গান-সম্পর্কে বিচার্য।

বাউল-গানগুলি বর্তমান যুগের আলোকপ্রাপ্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের রচনা

নয়। যাহারা বর্তমান যুগের অনুপাতে অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত তাহারাই এই সমস্ত গানের রচয়িতা। এই সব সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ধর্ম-পথের যাত্রী পল্লীবাসীদের রচনায় ভাবের সুবিন্যাস, ভাষার মার্জনা, বা সচেতন অলংকরণের চেষ্টা নাই; তাহাদের ভাবানুভূতি স্বতঃউৎসারিতভাবে যে রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই তাহাদের রচনার শেষ রূপ। একটা সহজাত কবিত্বের অনুপ্রেরণায় ভাব যে রূপ ছন্দোবদ্ধ আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা বা প্রয়াস নাই। এই রচনায় উপমা বা রূপকের বিষয়গুলি তাহাদের চারিদিকের দৃষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে সংগৃহীত, নিতান্ত আটপৌরে ভাষায়—সময় সময় আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় তাহাদের ভাবানুভূতি রূপ-লাভ করিয়াছে। এই গানগুলি তাহাদের ভাবানুভূতির অকপট রূপায়ণ। প্রকৃতির নিজস্ব সম্পদের মতো এ-রচনা স্বাভাবিক, সহজ, সরল ও অযত্ন-বর্ধিত।

বাংলা-সাহিত্যের উদ্যান-কোণে এই জাতি-গৌরবহীন বনফুল বিনম্র সৌন্দর্যে ফুটিয়া তাহার স্নিগ্ধ সৌরভ বিলাইতেছে। সাহিত্য যদি সমাজ-জীবনের দর্পণ হয়, তবে বাঙালী-সমাজের এক কোণের একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম-বিশ্বাস, অধ্যাত্ম-চিন্তা, জগৎ ও জীবন-সম্বন্ধীয় মনোভাব, বিভিন্ন ভাবানুভূতি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে; বাঙালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর ধর্মের অন্তর্গূঢ় স্রোতোধারা, তাহার সাধনার বৈচিত্র্যময় স্বরূপের সম্যক্ পরিচয় এই পল্লী-সংগীতগুলির সঙ্গে জড়াইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে বাঙালীর একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্জীবনের রস-সিক্ত অভিব্যক্তি আছে। সে-ধর্ম-সম্প্রদায় আর্য ও অনার্য, হিন্দু, বৌদ্ধ ও সুফী ভাব-ধারার সমন্বয়ে গঠিত বাঙলার একান্ত নিজস্ব একটি ধর্ম-সম্প্রদায়। এই ধর্ম কোনো অভিজাত সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়, ইহা জনসাধারণের ধর্ম।

এই ধর্মের বিষয়-বস্তু বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত অনেকের মতানৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত জড়িত মানবিক ভাবানুভূতি, আশা-আকাজ্ঞা, আনন্দ-বেদনা-নৈরাশ্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ তো সাহিত্যের সীমানা হইতে বাদ দেওয়া যায় না। গুরুর নিকট অকপট আত্মসমর্পণ, মানবের হৃদয়-স্থিত ভগবানের নিকট দৈন্য, সাধন-ভজনে অক্ষমতার জন্য নৈরাশ্য, সাধনমার্গে ব্যক্তিগত বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রভৃতিই এই গানগুলির উপজীব্য এবং এই ভাবানুভূতির মধ্যে যে কারুণ্য, যে মাধুর্য আছে, প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে যে অকপট সারল্যের সৌন্দর্য আছে, তাহাই ইহাদের সাহিত্যাংশ। প্রাণের এমন সহজ, সরল, অকপট, অভিব্যক্তিতে একটি মনোরম সাহিত্য-রসের আস্বাদ আছে,—

ইহা একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরস। একদিক দিয়া এই গানগুলি বাংলা-সাহিত্যের একটা অনন্যসাধারণ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পদ।

গানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, ইহার গণ্ডী সীমাবদ্ধ, ইহাতে বৈচিত্র্যের অভাব। বাউল-গানের কতকগুলি প্রচলিত স্তর বা ধারা আছে। সকলেই অল্প-বিস্তর সেই স্তরের অনুক্রমে বা ধারা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

প্রথম ভগবানের নিকট দৈন্য বা আর্তিপ্রকাশ (অন্তরস্থিত আত্মাকে ইহাদের অনেকেই ব্যক্তিগত ভগবান বলিয়া ধারণা করিয়াছে—এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইয়াছে), গুরুর প্রশস্তি ও গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া করুণা-প্রার্থনা, তার পর দেহ-তত্ত্বের বর্ণনা, মনের মানুষের স্বরূপ ও লীলাখেলা-বর্ণনা, সাধনের নানা পদ্ধতির ইঙ্গিত, সাধনের কাঠিন্য ও সে বিষয়ে কঠোর সতর্কতা-অবলম্বনের কথা, নিজের সাধন-জীবনের অক্ষমতা, সাধনের পূর্ণ ফলের স্বরূপ প্রভৃতির একটি নির্দিষ্ট ধারা বা পথে প্রায় সকল সংগীত-রচয়িতাই অগ্রসর হইয়াছে। সাধারণতঃ 'প্রবর্ত' 'সাধক' ও 'সিদ্ধ'—এই তিনটি অবস্থা অনুসরণ করিয়া ইহারা গান রচনা করিয়াছে। প্রবর্ত-অবস্থায় ভগবানের নিকট দৈন্য ও গুরুর করুণা-প্রার্থনা, সাধক-অবস্থায় দেহ-তত্ত্ব, মনের মানুষ, সাধনার স্বরূপ প্রভৃতির বর্ণনা, সিদ্ধ-অবস্থায় সাধনার পরিপূর্ণতার স্বরূপ প্রভৃতি তাহাদের গানে ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য সকলেই যে ঠিক এই ধারা পর পর অনুসরণ করিয়া চলে, তাহা নয়; সিদ্ধ-অবস্থার গানের সংখ্যা খুবই কম পাওয়া যায়, সাধক-অবস্থার গানের মধ্য হইতে দুই-চারিটি সিদ্ধ-অবস্থার গান বলিয়া ধরিতে পারি। তাহা হইলেও মোটামুটি এইসব বিষয়-বস্তু তাহাদের গানের প্রধান উপজীব্য। ইহার বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে সাধারণতঃ কোনো কথা তাহাদের গানে পাওয়া যায় না। তবে সাধন-জীবনের আনুষঙ্গিকভাবে জগৎ ও জীবনের রহস্য, জন-সমাজের প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও রীতি-নীতির অন্তর্নিহিত অসারত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বাউলদের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মন্তব্য কতকগুলি গানে ব্যক্ত হইয়াছে।

বিষয়-বস্তুর এই সীমাবদ্ধতার জন্য বাউল-গানে একটি একঘেয়েমি বর্তমান আছে। একই বিষয় লইয়া সকলেই গান রচনা করিয়াছে, মূলে তত্ত্ব ও সাধনার ঐক্য থাকার জন্য বক্তব্য প্রায় একই হইয়াছে; কেবল ভাষা ও উপস্থাপনের মধ্যে যাহা প্রভেদ, তাহার দ্বারাই একের গান হইতে অন্যের গানের যাহা কিছু পার্থক্য সূচিত হয়। এখানে কবির ব্যক্তি-মানসের স্বাধীন অভিব্যক্তির স্থান

নাই। তাই দেখা যায়, গুরু-বন্দনার পদ, শরণাগতির পদ, দেহ-তত্ত্বের পদ, মনের মানুষের পদ প্রভৃতি ভাব ও তত্ত্বের দিক হইতে মূলতঃ প্রায় সবই সমান,—ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা হইলেও ভাব-কল্পনার পার্থক্য ও নূতনত্ব বা দৃষ্টি-ভঙ্গীর মৌলিকত্ব বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু বিষয়-বস্তুর সীমাবদ্ধতা, ধর্ম-তত্ত্ব ও সাধন-প্রণালী-বর্ণনার শুষ্কতা সত্ত্বেও গানগুলির মধ্যে সহজ কবিত্ব-শক্তি ও সাহিত্য-রসের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।

গুরু-প্রসঙ্গের গানগুলির কতকগুলিতে চিত্তের কাতরতার সহজ ও অকপট প্রকাশে একটি করুণমাধুর্য লক্ষ্য করা যায়। পাঞ্জ শাহের একটি গানে আছে:

"দয়াল দরদী, কাঙাল এলো তোমার দ্বারে।
অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার, কেউ যাবে না ফিরে॥
সর্বধনের দাতা তুমি ত্রিমহীমণ্ডলে,
বিনা মাঙ্গায় কত ধন দিয়াছিলে মোরে।
এখন আর কোন ধন চাই না, গুরু,
চরণ দাও আমারে॥
কুলের বাহির হ'লাম আমি চরণ পাব ব'লে,
কত মহাপাপীর দিলে চরণ, তাই এসেছি শুনে।
দাঁড়ালাম দরজায় এসে স্কন্ধে ঝুলি নিয়ে॥"
(গান নং ২২২)

পূর্ববঙ্গের বাউল জলধরের একটি গানে আছে:

"গুরু গো, সুজন নাইয়া,
ভবপারে নেও আমারে বাইয়া।
আমার জীর্ণ তরী,
নাই কাণ্ডারী,
হা রে, তরী কে নিবে আউগাইয়া॥
ভবনদী অকূলপাথার,
আমি ত জানিনা সাঁতার,
ওগো, আমারে যাইও না ডুবাইয়া।
তোমার নামেতে কলঙ্ক হবে,
গুরু গো, যদি মরি হাবুডুবু খাইয়া॥

ভব-নদীর দুরন্ত ধার,
(আমার) দাঁড়ীতে টানতে চায় না দাঁড়
যোল আনা খাইয়া।
ওগো, মন-মাঝি, বড় পাজী,
গুরু গো, ভব-পারের বন্ধু,
আমারে যাইতে চায় ফালাইয়া॥" ইত্যাদি (গান নং ২৩)

সাধকের জীবনে গুরুর প্রভাবের কথা লালনের কয়েকটি গানে আছে:

"গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার
লও গো সুপথে।
তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধব কি মতে॥
তুমি যারে হও গো সদয়,
সে তোমারে সাধনে পায়;
বিবাদী তার স্ববশে রয়
তোমার কৃপাতে॥
যন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন,
যেমন বাজায় বাজে তেমন,
তেমনি যন্ত্র আমার মন,
বোল তোমার হাতে॥"
(গান নং ৭২)

"গুরু, সু-ভাব দেও আমার মনে।
তোমায় যেন ভুলিনে॥
গুরু, তুমি নিদয় যার প্রতি,
ও তার সদায় ঘটে দুর্মতি,
তুমি মনোরথের সারথি;
যথা লও যাই সেখানে॥
গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী,
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী,
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী,
না বাজাও বাজবে কেনে॥"
(গান নং ৬৯)

"গুরু যার হয় কাণ্ডারী,
চালায় সে অচল তরী ;
তুফান ব'লে ভয় কি তারি,
নেচে গেয়ে ভব-পারে যাবে ॥

গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞান যার,
অধঃপাতে গতি হয় তার ;
লালন বলে, তাই আজ আমার
ঘটল বুঝি মনের কু-স্বভাবে ॥"
(গান নং ৭০)

নানাপ্রবৃত্তি-সঙ্কুল সাংসারিক মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন না হওয়ায় যে তাঁহার ভাব-জীবন বা প্রকৃত সাধক-জীবন আরম্ভ হইতেছে না,—এই দুঃখটি পদ্মলোচন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"এবার পরশ ছুঁয়ে সোনা হ'ব সাধ ছিল মনে।
তা তো হ'লো না, তা তো হ'লো না
কেবল তাঁবার মিশাল জন্যে ॥
স্থান-গুণে গঙ্গার জল,
আত্র-গুণে ধরে ফল ;
জেতের গুণে স্বভাব যায় জানা।
ও সে ভেক-ভ্রমরে কমল-বনে,
কমলের স্বভাব ভ্রমরে জানে।
ভ্রমর করে মধুপান
(ওরে মন আমার) ভেক থাকে অজ্ঞান,
জেনে শুনে মধু খায় না কেনে ॥

নিম্ববৃক্ষ শতভারে,
যদি দুগ্ধ দিয়ে রোপণ করে,
তবু স্বভাব ছাড়িতে নারে।

গোঁসাই হরি পোদোয় বলে,
(ওরে মন আমার) স্বভাব যায় না ম'লে,
স্বভাব না ছাড়িলে
ভাবের মুকুল হবে কেনে ॥"
(গান নং ১৬২)

'রাগের করণ' বা বাউলের ধর্ম-সাধনা গুরু-উপদেশ ব্যতীত পুঁথি-পত্র পড়িয়া বা লোকের নিকট শুনিয়া হয় না,—এ সম্বন্ধে পদ্মলোচন বলিতেছেন :

"না জেনে সে রাগের করণ
শুধু কথায় কি হয় প্রেমের আচরণ ॥

* * * *

কথার কথা সবাই তো কয়,
বোবা নয় তো জগৎ-জন।
ছেঁড়া চ্যাটায় শুয়ে থাকে,
দেখে লাখ-টাকার স্বপন ॥
গাভীতে হয় গোরোচনা,
সে জানে না তার মরম।
দেখ, সাপের মাথায় মাণিক জ্বলে
তবু করে ভেক-ভোজন ॥"
(গান নং ১৬৪)

পদ্মলোচনের আর একটি পদে 'রাগের করণ'-এর বৈশিষ্ট্য বলা হইতেছে :

"গোল ছেড়ে মাল লও বেছে।
গোলমালে মাল মিশাল আছে ॥
জান না মন, রাগের করণ,
যেমন বালির সঙ্গে চিনির মিলন,
সহস্র বর্ণে মিশেছে ;
ওরে মত্তহস্তী টের পেল না,
চেঁউটি* মরম জেনেছে ॥
* * * *

---
* পিঁপড়ে।

ওরে, পোদো হ'লো কানা বেড়াল
দই ব'লে কাপাস খাচ্ছে ॥"
(গান নং ১৬৩)

'রসের মানুষ'-এর ঘর এই দেহ ভগ্নদশা-গ্রস্ত ও অনাচার-কলুষিত হইলে তাহার মধ্যে তাঁহার বাস করা সম্ভব হয় না, এই দেহ 'পক্ক দেহ' হওয়া প্রয়োজন। ভাগ্য-দোষে পদ্মলোচনের সেই দশা ঘটিয়াছে, এখন গুরুও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এই অবস্থার বর্ণণায় পদ্মলোচন বলিতেছেন:

"ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে রসের মানুষ আর।
আমার ঘরে হ'য়েছে অনাচার ॥
দৈবমায়া ঘটে যার সনে,
নারিকেলের জল কোথা আসে যায়, কে-বা তা জানে;
যেমন গুঁটি পোকায় গুঁটি বাঁধে রে,
আপনার মরণ করে সার ॥
ছ'টি ইঁদুর কাটুর কুটুর কাটছে আমার ঘর,
(ও তার) চৌদিকে হাওয়া ঢুকে আলগা নয় দুয়ার,
তীর ধ'রে নীর ছেঁচতে গেলে
ঝরণা বেয়ে হয় পাথার ॥

গোঁসাই হরি বলে, ও পোদো নচ্ছার,
মূলে চুরি করলি রে গোঁয়ার,
ও তোর মস্তকে দংশেছে ফণী,
আমার ভাগ্য বাঁধা হ'লো সার ॥"
(গান নং ১৭০)

সর্বজন-জ্ঞাত সাধারণ বিষয়ের উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া পদ্মলোচন তাঁহার ব্যক্তিগত সাধন-জীবনের সমস্তাগুলিকে চমৎকার রূপ দিয়াছেন।

মাছ-ধরা, জমি চাষ করা, খেজুর গাছ কাটা ও গুড় তৈয়ারী করা প্রভৃতি সাধারণ পল্লীবাসীর জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারগুলিকে অনেক বাউল-কবি নিজেদের সাধন-জীবনের অবস্থা-বর্ণনায় তাঁহাদের গানের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। যাদুবিন্দুর একটি গান এই এইরূপ:

"আমার এই কাদা-মাখা সার হ'লো।
ধর্ম-মাছ ধরব ব'লে নামলাম জলে,
ভক্তি-জাল ছিঁড়ে গেল।
কেবল হিংসে-নিন্দে-গুগ্লি-ঘোঙা
পেয়েছি কতকগুলো॥
এই সত্যধর্ম-বিলে,
সুরসিক বাগদী ছুলে,
শুদ্ধভাবে জালটি ফেলে,
আনন্দে মাছ ধরছে ভালো।
আমি পড়লাম ফাঁকে, মায়া-পাঁকে,
বল-বুদ্ধি চুলোয় গেল॥
কুসঙ্গে বিল গাবালাম.
কুক্ষণে জাল নাবালাম,
ক্ষমা-খালুই হারালাম,
উপায় কি করি বল।
আমি বিল ঘুণে পাই চাঁদা, পুঁটি,
লোভ-চিলে লুটে নিল॥
পাঁচটা ভূত লাগল পিছে,
মাছ-ধরায় প্যাঁচ পড়েছে,
ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে,
আর বাদী জনা ষোল।
আমি মাকাল-পূজায় মন্ত্র ভু'লে
হয়েছি এলোমেলো॥"

(গান নং ১৭৫)

তাঁহার আর একটি গানে আছে:

"এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই,
কেন দেখিল না আপনার ভুঁই।
তোর দেহ-জমির পাকা ধানে
দেখ লেগেছে ছটা বাবুই।

বহু কষ্টে করলি কৃষাণি
এই মানব-দেহ চৌদ্দপোয়া লাল জমিখানি,
তাতে ভক্তি-ফসল জন্মেছিল,
সব খেয়ে গেল হিংসা-চড়ুই ॥
চেতন-বেড়া উপড়ে পড়েছে,
সব জায়গা আলগা পেয়ে
গরু-ছাগল পাকা ফসল খেয়ে ফেলেছে।
এখন গোঁফ ফুলিয়ে বসে আছে
দেখ তোর মাচা-ভরা বিন্-পুঁই ॥"
(গান নং ১৭৮)

আর একটি গানেও আছে :

"অনুরাগে গাছ কাটলেই কি
গাছী হওয়া যায়।
ও যে ঘোলা রসে বীজ মরে না,
গাছী রাগ ক'রে রস ঢেলে ফেলায় ॥
প্রেমের গাছী হয় যে জন,
ও সে মন-দড়া দিয়ে গাছ করে বন্ধন ;
তীক্ষ্ণ দায়ে
হৃদয় ভেদিয়ে—
ফটিক রসের বহায় প্লাবন।
ও সে মনের সুখে রস জ্বালায়ে
মিছরি বানায় ॥" (গান নং ১৭৭)

এই দীর্ঘ সাঙ্গরূপক-রচনায় যাদুবিন্দুর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচালী-কার দাশরথি রায়ের রচনার প্রভাব ইহার উপর কিছু থাকা সম্ভব।

বাউলের 'ভাব-রস' বা 'প্রেম-রস'-এর তাৎপর্য না বুঝিয়া সাধনা করিলে সেই সাধকের কি অবস্থা হয়, তাহার বর্ণনা একটি গানে আছে :

"কানা চোরে চুরি করে,
ঘর থাকতে সিঁধ দেয় পগারে,
শুধু বেগার খেটে মরে,
কানার ভাগ্যে ধন মিলে না ॥

কানা বেড়াল লোভী হ'য়ে
দধি ব'লে কাপাস খেয়ে,
গলায় বেধে ছটফটু করে
শেষে (ও) তার প্রাণ বাঁচে না॥

* * *

উল্লুকের হয় ঊর্ধ্ব-নয়ন,
সে দেখে না সূর্যের কিরণ;
দেখ, পিঁপড়ে পায় চিনির মর্ম;
রসিক হ'লে যাবে জানা॥"

(গান নং ৩২১)

স্বর, ব্যঞ্জন ও যুক্তাক্ষরের রূপকে বাউলধর্মের মূল তিনটি তত্ত্বের সুন্দর ইঙ্গিত করা হইয়াছে একটি গানে :

"আত্মতত্ত্ব বিচার কর দেখি ওরে মন-পাখী।
তুমি কি প'ড়ে পণ্ডিত হয়েছ, তোমার স্বরবর্ণ আছে বাকী॥
আত্মতত্ত্ব স্বরবর্ণ, সে তো নয় রে সামান্য,
পরতত্ত্ব ব্যঞ্জনবর্ণ ফলাতে গণ্য,
সে যে স্বর ভিন্ন নয়,
স্বর হ'তে হয় দুয়েতে মাখামাখি॥
যারে গুরু-তত্ত্ব কয়, সে যে যুক্তাক্ষর হয়;
স্বরবর্ণ-জ্ঞান বিনে যুক্ত কেহ না বুঝয়॥"

(গান নং ৩২৭)

গাঁজা-খাওয়ার পদ্ধতির সহিত নিজ ধর্মসাধনার সামঞ্জস্য করিয়া সুন্দর একটি গান রচনা করিয়াছেন এক বাউল-কবি :

"ও ভাই, এস প্রেমের গাঁজা খাবে কে।
ধরবে নেশা ঘুচবে বাসা, লহ আশ্রয়ধর্ম-কলিকে॥
রাগের থরশান দিয়ে,
মধুর রসের জল মিশায়ে,
গোলাপ-ভক্তি নীচে থুয়ে,
কাট রিপুকে প্রেম-কাটারিতে॥

কিন্তু কলকেয় দিয়ো ঠিকরে,
নইলে প'ড়ে যাবে ঠিকরে ;
ঠিক ছাড়া হো'য়ো না ভাই,
কাজের কথা বলি তোমাকে।
সাঁপিখানি করে ল'য়ে
কলকের তলাতে দিয়ে,
প্রেমের গাঁজা খাও পিয়ে
নিষ্ঠা-দম রেখে গুরুর পদে ॥"
(গান নং ৩২৮)

সাইকেল-চড়ার পদ্ধতি লইয়াও আর এক বাউল গান রচনা করিয়াছেন :

"মন যদি চড়বি রে সাইকেল,
আগে সে কোপ্‌নী এঁটে, অকপটে সাঁচ্চা কর্‌ দেল ॥
ফুটপিনে দিয়ে পা
হপিং করে এগিয়ে যা,
পিনের 'পরে উঠে দাঁড়া,
বেদ-বিধি হবি ছাড়া,
সামনে কর নজর কড়া,
আগাগোড়া
ঠিক রাখিস হ্যাণ্ডেল ॥
সীটের 'পরে ব'সে (মন)
ব্যালান্স ধরবি ক'ষে,
যাবি উর্ধ্বশ্বাসে,
কুম্ভক-ন্যাসে
চাস-না আশেপাশে,
ছয় আর দশে, মূলমন্ত্রে কর প্যাডেল ॥
কর্‌ সুপথে লক্ষ্য
ছাড়ি' কুশাগ্র কুতর্ক,
দিবি রান হ'য়ে অধ্যক্ষ,
ভিতর-বাহির ক'রে ঐক্য, হ'য়ে সুদক্ষ,
বাজাবি তুই বিবেক-বেল ॥" (গান নং ৩৫৮)

বাউল-ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না হইলেও, অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত দু'-একটি প্রসঙ্গের বিষয় বাউল-গানে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে হিন্দু-সমাজের সাধারণ লোকের জাতিগত বৈষম্যের ধারণা ও ভেদ-বুদ্ধি একটি। এইসব গতানুগতিক সংস্কার-পীড়িত ও ছুৎমার্গ-গামী লোকেদের সত্যদৃষ্টি নাই। এ সম্বন্ধে লালনের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মন্তব্য কয়েকটি গানে পাওয়া যায়:

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে॥
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারী-লোকের কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ,
বামনী চিনি কি ধ'রে॥
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে॥
গর্ত্তে গেলে কূপ-জল কয়,
গঙ্গায় গেলে গঙ্গা-জল হয়,
মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে॥"

(গান নং ১৬০)

ইহাই বাউল-সম্প্রদায়ের জাতি-ভেদ সম্বন্ধে ধারণা। অবশ্য ইহার মধ্যে লালনের একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার জড়িত আছে। লালন পূর্বে হিন্দু ছিলেন, পরে আচার-ব্যবহারের দিক দিয়া ও সামাজিকভাবে মুসলমানে পরিণত হইয়াছিলেন। হয়তো এই বিষয়ে লোকে তাঁহার জাতির প্রশ্ন তুলিত, হয়তো বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করিত। তাহার উত্তরেই সম্ভবতঃ এই গানটি রচিত হইয়াছিল। লালন যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছিলেন, এই মতবাদটি এই গানের দ্বারা অনেকখানি সমর্থিত হয়।

ভগবানের কাছে যে জাতিভেদ নাই, ভক্তির দ্বারাই যে সেখানে জাতিভেদ নিরূপিত হয়, এই কথাটিও লালনের একটি গানে আছে:

"ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন ব'লে
তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই॥

ভক্ত কবীর জেতে জোলা,
প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ালা,
ধ'রেছে সেই ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্বধন তায় ॥
রামদাস মুচি এই ভবের 'পরে
পেলো রতন ভক্তির জোরে;
তার স্বর্গে সদাই ঘণ্টা পড়ে,
সাধুর মুখে শুনতে পাই ॥
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো,
এক বীজে সব জন্ম হ'লো;
ফকির লালন কয়, মিছে কল'
কেন করিস সদাই ॥"
(গান নং ১০২)

আর একটি গানের একাংশ এইরূপ :

"ধর্ম-প্রভু জগন্নাথ,
চায় না রে সে জাত-অজাত,
ভক্তের অধীন সে।
যত জাত-বিচারী
দুরাচারী,
যায় তারা সব দূর হ'য়ে ॥
জাত না গেলে পাইনে হরি,
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে।
লালন কয়, জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে ॥"
(গান নং ১২২)

সপ্তরথী যেমন অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়াছিল, এই সংসার-রূপ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কাম-ক্রোধাদি সপ্তরথীও সেইরূপ এক সাধককে ঘিরিয়াছে। অভিমন্যু নির্গম জানে না, এখন একমাত্র অনুরাগ-স্বরূপ তাহার পিতা পার্থ তাহাকে রক্ষা করিতে

পারে। কিন্তু পার্থের আগমন সম্ভব নয়। মনের এই ভাবটি একটি গানে এক বাউল-কবি রূপকে প্রকাশ করিয়াছেন :

"এ মায়া-সংসারে ঘিরেছে আমায় সপ্তরথীতে।
আমি পড়েছি এই মায়াচক্রে চক্রব্যূহতে ॥
আমার মন কুমতি দুর্যোধন, তার সঙ্গে রথী ছয়জন।
আমায় বধিতে আইল প্রাণ অন্যায় যুদ্ধেতে ॥
কাম কর্ণ মহাবীর, তার শরে প্রাণ জরজর,
ম'লাম ক্রোধ-দুঃশাসনের দুষ্ট শাসনেতে ॥
ঘিরেছে লোভ-শকুনি, মোহ-কৃপ, মদ-অশ্বত্থামাতে,
মাৎসর্য সে দ্রোণাচার্য দুর্জয় জগতে ॥
শুনিয়াছি আগম-মন্ত্র, নাহি জানি নিগম-তন্ত্র,
এ সময়তে কোথায় পার্থ, অনুরাগ-পিতে ॥"

(গান নং ৪৫৩)

রক্ত-মাংসের দেহধারী এই মানুষ বাউলের কাছে পরমসম্পদ। এই মানুষের মধ্যেই তাহাদের 'মনের মানুষ' আছেন; এই মানুষের দেহেই ব্রহ্মাণ্ড আছে; তাহারা 'অনুমান' মানে না, এই মানুষই তাহাদের 'বর্তমান' সত্য; এই দেহের সাধনার দ্বারাই তাহারা পরমার্থ লাভ করে। এই পরমরহস্যময় মানব-দেহ ও পরম ঐশ্বর্যময় মানব-জীবন চিরদিন তাহাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। মাধুর্য-ভজনের মূল উপাদানই তো এই দেহ।

লালন বলিতেছেন :

"অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই,
দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে ॥
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে, পেয়েছ এই মানব-তরণী।
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে ॥

এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন
তাই তো মানুষ-রূপ গঠলে নিরঞ্জন

(গান নং ১)

বর্তমানে রাঢ়ের অন্যতম বিখ্যাত বাউল নিতাই ক্ষেপা মানুষের বহুতর ও বহুমুখী লীলা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন :

"আছে মানুষ মানুষেতে,
যে পাবে মানুষ দেখিতে চিনিতে।
মান-হুঁশ হ'য়ে মানুষ ল'য়ে
ফিরছেন সদাই তিনি হুঁশেতে॥

* * * *

মানুষেতে মানুষ আছে,
মানুষ নাচায়, মানুষই নাচে;
মানুষ যায় মানুষের কাছে
মানুষ হইতে॥

* * * *

নারায়ণ মানুষ-রূপ ধ'রে
নর-নারায়ণ হন দ্বাপরে,
যুগে যুগে অবতার তিনি
এই মানুষ-রূপেতে॥

মানুষ ডোবে, মানুষ ভাসে,
মানুষ কাঁদে, মানুস হাসে,
মানুষ যায়, মানুষ আসে
কেবল কর্ম প্রকাশিতে॥

* * *

(গান নং ৪৬৮)

বাউল গোপীনাথ দুঃখ করিতেছেন যে, মানুষের মধ্যে যে 'পরম মানুষ' আছেন, মূর্খ মানুষ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না :

"মানুষে মানুষ আছে,
দেখলে খুঁজে,
মানুষ হ'লে যাবে জানা।
আঁচলে থাকলে সোনা গোপন হয় না,
বাইরে কিরণ প্রকাশে ॥

বাঁশে হয় বংশলোচন,
গাভীতে হয় গোরোচনা,
হ'য়ে তুই সোনার বেনে
হচ্ছিস্ কানা,
রাং কি সোনা দেখ না ক'ষে ॥

মৃগতে মৃগমদ, জন্ম-অন্ধ
পায় না দেখতে অদ্যাবধি।
এমনি অবোধ ফণী, মাথায় মণি
থাকতে ভেক-ভোজনে আসে ॥"

(গান নং ৪৯৬)

সত্যজ্ঞান না জন্মিলে মনে হয়, এ সংসারে ধন-জন-প্রভাব-প্রতিপত্তিতে রীতিমত আসর জমকাইয়া বসা হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্বপ্নে রাজা হওয়ার মতো; প্রকৃত জ্ঞান আসিলেই বুঝা যায় যে, এই অবস্থাটা অলীক—স্বপ্নের অভিজ্ঞতার ন্যায়। এই ভাবটি এক বাউল একটি দীর্ঘ গানে চমৎকার ব্যক্ত করিয়াছেন :

"কিছু হয় নাই আর হবে নাই।
যা আছে তাই, যা আছে তাই ॥

স্বপ্নে হয়েছিলাম রাজা, জগৎ জুড়ে আমার প্রজা,
ঘুম ভাঙ্গিতে আর কিছু তার দেখতে নাহি পাই ॥

বসেছিলাম রাজ-সিংহাসনে, সিংহসম রাজ-শাসনে—
ছিলাম আনন্দ-মনে, মনের সুখে কাল কাটাই ॥

সিংহ ব'লে মানত সবে, পাশ-মোড়া দিয়ে দেখলাম ভেবে,
সিংহ না, সিংহের মামা, ভোম্বল দালের মাসতুতো ভাই ॥"

(গান নং ৪৯৮)

মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান নাই। মানুষের অন্তরতম সত্তা এক ও অভিন্ন। সেখানে ভেদাভেদ নাই, দ্বেষ-হিংসার স্থান নাই। মানুষ একপ্রকার অভিনেতামাত্র। নানা সাজে অভিনয় করিতেছে। সুতরাং ভেদাভেদ-জ্ঞান ও দ্বেষ-হিংসা বৃথা। এই ভাবটি বাঁকুড়ার বাউল গোবিন্দদাস একটি দীর্ঘ গানে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। গানের একটা অংশ এইরূপ :

"আমার ভিতর আমি কে তার
খবর রাখলি না।
শুধু 'আমি' 'আমি' করে' বেড়াও
সেই আমি বল কোন্ জনা॥
* * * *
তোদের মত স্বভাব নয় আমার,
দেখ কারেও তোরা বাসিস ভালো,
কারেও বা করিস বেজার ;
আমি সবারে আপনার দেখি
কারেও আমার নাই ঘৃণা॥
বাজিকর এক জুড়েছে বাজি,
সেই কারখানায় নাম লেখায়ে
নানা সাজে সাজি ;
সাজ খুলে ঠিকানায় গেলে,
কার বল এই ঠিকানা॥"
(গান নং ৫০২)

ইহাই সংক্ষেপে বাউল-সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আভাস।

বাউল-ধর্মের আবির্ভাব ও বাউল-গানের রচনা-কাল

বাউল-ধর্ম একটি সমন্বয়-মূলক ধর্ম। ইহার মূল সাধন-পদ্ধতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার উপর শিবশক্তিবাদ, রাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণব-সহজিয়া-তত্ত্ব, সুফী-দর্শন ও তত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব পড়িয়াছে এবং ইহার সঙ্গে কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ইহা একটি বিশেষ ধর্ম-রূপে গঠিত হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

পাল-বংশের রাজত্ব-কালে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে ব্যাপ্তি লাভ করে। বিশেষ করিয়া নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম একটা বিশিষ্ট ক্রিয়া-মূলক তান্ত্রিক ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়। হিন্দু শৈব-আগম ও প্রাচীন তন্ত্রের শিবশক্তিবাদ ও হঠযোগ-পদ্ধতির সহিত বৌদ্ধ-ধর্মের প্রজ্ঞা-উপায়বাদ মিলিত হইয়া বজ্রযান ও শেষে সহজযানের একটা পরিপূর্ণ রূপ রচিত হয়। এই ধর্মে ভোগের সহিত মোক্ষের সমন্বয় থাকায় সাধারণ লোক বিশেষভাবে ইহাকে গ্রহণ করে। বাংলায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যেই এই বৌদ্ধ-সহজ-ধর্ম অতিমাত্রায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

তার পর দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত সেন-বংশ বাংলায় রাজত্ব করে। সেন-বংশীয়েরা ছিলেন বৈষ্ণব। রাধাকৃষ্ণ-লীলাকাহিনী তাহার পূর্বে বাংলার বাহিরে প্রচারিত থাকিলেও, সেনদের আমলেই বাংলায় ইহা বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। ইহার উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ এবং ঐ যুগের কতকগুলি কবির রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক কবিতায়। হিন্দুর শিবশক্তিবাদ পাল-যুগে বৌদ্ধের প্রজ্ঞা-উপায়বাদের সহিত একপ্রকার মিশিয়া গিয়াছিল, এখন সেন-যুগে প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থলে প্রকৃতি-পুরুষ-রূপে রাধা-কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব হইতেই প্রকৃতি-মিলন ও যোগ-সাধন ধর্মের ক্রিয়াপদ্ধতির অঙ্গীভূত ছিল, বৈষ্ণব আমলেও সেই মূল ক্রিয়াটি রক্ষিত হইল। এইভাবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হইল এবং বুদ্ধ হিন্দুদের অবতারে পরিণত হইলেন। এই সময়েই বৈষ্ণব-সহজিয়া-ধর্মের উদ্ভব। সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকে স্বাভাবিকভাবেই বৌদ্ধ-সহজিয়া হইতে বৈষ্ণব-সহজিয়াতে রূপান্তরিত হইল। কারণ, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলসাধন-ক্রিয়ায় বিশেষ পার্থক্য ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যোগ-ক্রিয়া-বর্ণনাত্মক পদটি এই অনুমানকে সমর্থন করে বলিলে অযৌক্তিক হইবে না। এই বৈষ্ণব-সহজ-সাধনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর নূতন শক্তি ও বৈশিষ্ট্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বীজ পূর্বেই অঙ্কুরিত ও অনেকখানি বর্ধিত হইয়াছিল।

তার পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বাংলায় মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। নানা কারণে রাজধর্ম চিরকাল সমাজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। পাল-যুগে রাজধর্ম বৌদ্ধধর্ম এবং সেন-যুগে রাজধর্ম বৈষ্ণবধর্ম জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং নানাভাবে দুই ধর্মের একটা সমন্বয়-সাধন

করা হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের বাহিরের এই ধর্মের সহিত কোনো সমন্বয় বা আপোষ তখন অসম্ভব হইল। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এই বিজেতারা প্রথমেই বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন আরম্ভ করিল। ওদন্তপুর ও বিক্রমশীল বিহার ধ্বংস করা হইল এবং বহু শ্রমণ ও শ্রমণী নিহত হইল। তার পর রাজধর্ম ইসলামের প্রসার ও প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ জাতি ও ধর্ম-রক্ষার জন্য কূর্মের মতো আত্ম-সংকোচন করিল এবং নানা বিধি-নিষেধ ও সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় মতবাদ সৃষ্টি করিয়া কোনো মতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। এই গোঁড়া রক্ষণশীল উচ্চ বর্ণহিন্দুর দল সমাজের একটা বৃহৎ অনগ্রসর ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীকে অনাচরণীয় ও সামাজিক সংস্রবের বাহিরে রাখিয়াছিল। এই শ্রেণীর অধিকাংশই সহজিয়া-ধর্মাবলম্বী ছিল। তাহারা নানা সামাজিক সুখ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া ও উচ্চশ্রেণীর ঘৃণা ও নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান হইয়া গেল। ইহাদের অধিকাংশ শরীয়ত-নির্দিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া খাঁটি মুসলমান হইয়া গেল। অপর অংশ নামে মুসলমান হইয়া আত্মরক্ষা করিলেও ধর্ম-সাধন-বিষয়ে তাহারা পূর্বের সহজ-ধর্ম পালন করিতে লাগিল। ইহারাই বাংলার ফকির-সম্প্রদায়ের আদিরূপ।

ভারতে মুসলমান-রাজত্বের আরম্ভ হইতেই সুফী-নামক এক ধর্ম-সম্প্রদায় ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। সুফীদের মতবাদ আনুষ্ঠানিক ইসলাম হইতে পৃথক। ইহারা মরমিয়া-পন্থী,—ইহাদের ধর্ম আত্মোপলব্ধি-মূলক—অনেকটা বেদান্তের অনুরূপ। মানুষের হৃদয়-স্থিত আত্মাকে প্রেমের পথে উপলব্ধি করিয়া নিজের দিব্য সত্তার বা পরিপূর্ণ সত্তার অনুভূতিই ইহাদের ধর্ম-সাধনার লক্ষ্য। গুরুবাদ, ইসলামের আদিষ্ট আচার অনুষ্ঠান-ত্যাগ, অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি উদারদৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি ছিল ইহাদের বৈশিষ্ট্য।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতেই ইহারা বাংলায় আসিতে আরম্ভ করে এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহাদের গতি অব্যাহত থাকে[১৩৪]। ইহারা মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে কোনো প্রভেদ দেখে নাই—সর্বত্রই উদার সর্বজনীন ধর্ম প্রচার করিয়াছে। ইহারা হিন্দু ও মুসলমান—উভয় শ্রেণীরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

ইহাদের আগমনে সহজিয়া-মতের মুসলমানেরা একটা বড় আশ্রয় পাইল। সুফীদের ধর্ম-তত্ত্বের সহিত ইহাদের ধর্ম-তত্ত্বের কতকগুলি বিষয়ে মিল আছে।

১৩৪। বঙ্গে সুফীপ্রভাব—ডক্টর এনামুল হক, তৃতীয় অধ্যায়।

মানুষের দেহের মধ্যে পরমতত্ত্বের বাস, ধর্মের অনুষ্ঠান-ত্যাগ, সাধনার অন্তর্মুখীনতা প্রভৃতিতে সাদৃশ্য বর্তমান। মুসলমান-সহজিয়ারা এই সাদৃশ্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া কতকটা মুসলমান-সমাজের বাহিরে অবস্থান করিয়া কোনরূপে অস্তিত্ব বজায় রাখিল। তাহাদের উপর অনেকটা সুফী-প্রভাব পড়িল এবং সেই প্রভাবের ফলে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী মুসলমান-বাউলদের রচিত গানেও সুফী-ধর্মের অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পূর্বেকার সহজিয়া-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, যাহারা মুসলমানে রূপান্তরিত না হইয়া কোনরূপে নিজেদের সত্তা বজায় রাখিয়াছিল, তাহারা নূতন রূপে ও নূতন শক্তিতে আবির্ভূত হইল। বৈষ্ণব-গোস্বামিগণের চৈতন্যতত্ত্ব, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রচারে এবং একটা আদর্শ প্রেমের আবহাওয়া-সৃষ্টিতে সহজিয়া-বৈষ্ণবগণ একটা নূতন অনুপ্রেরণা লাভ করিল। এই সময় নানা পদ, আগম, কড়চা প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে তাহাদের ধর্ম-তত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। পূর্বের জ্ঞান-মূলক ও যোগ-ক্রিয়া-মূলক ধর্মের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রেমের অবতারণা করা হইল বৈষ্ণব-সহজিয়া-ধর্ম একটা নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগে মুসলমান-সহজিয়া-ফকির-সম্প্রদায়, যাহারা সুফী-ধর্মের এক বাহ্য বেশ ধারণ করিয়াছিল, তাহারাও বৈষ্ণব-সহজিয়াদের মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর, গোস্বামিগণের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মমত-প্রচার এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত-প্রকাশের পর আনুমানিক ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ তক আমরা বাউল-নামে ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব কল্পনা করিতে পারি,—যাহাদের ধর্মমতের তত্ত্ব ও দর্শন রাধা-কৃষ্ণের বা প্রকৃতি-পুরুষের যুগল-তত্ত্ব, উপনিষদ ও সুফী-ধর্মের পরমাত্মবাদ এবং ব্যক্তিগত ভগবানের মিশ্রণ,—সাধনাংশটি প্রধানতঃ বৌদ্ধ-সহজিয়া-মতের বা রূপান্তরিত বৈষ্ণব সহজিয়া-মতের।

যখন একটা নূতন ধর্ম-মতের আবির্ভাব হয়, তখন তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে। বাউল-ধর্মও ঐ-প্রকার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া উদ্ভূত হইয়াছিল এবং গুরু-পরম্পরা তাহাই চলিয়া আসিয়াছিল। বাংলার এই ধর্ম-সমাজে নিতান্ত সাধারণ লোক গৃহীত হইয়াছিল এবং এই [illegible] আচার-ব্যবহার বা ধর্ম-নির্দেশিত বেশভূষা সাধারণের চক্ষে অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় তাহারা সর্বদা

আত্মগোপন করিয়া সাধারণ সমাজ হইতে পৃথক হইয়া তাহাদের নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই

তাহাদের ধর্মের তত্ত্ব বা সাধন-পদ্ধতির বিবরণ প্রভৃতি তাহারা নানাকারণে কোনো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে নাই। এ সমস্ত তাহাদের গানেই তাহারা প্রকাশ করিয়াছে। গানই হইয়াছে তাহাদের ভাব, কল্পনা, সাধন-সংকেত প্রভৃতি প্রকাশের মাধ্যম।

বৌদ্ধ-সহজিয়ারাও তাহাদের ধর্ম-মত ও সাধন-পদ্ধতি নানা সংকেত ও ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার সাহায্যে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছে। 'চর্যাপদ'গুলি তাহার নিদর্শন। এই গানগুলি যে রাগ-রাগিণী-সহযোগে গীত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ ঐ গানগুলির সঙ্গে আছে।[১৩৫] চর্যাপদের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন: "এগুলি (গানগুলি) কীর্তনেরই পদ। সে কালেও সংকীর্তন ছিল এবং সংকীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বলিত।"[১৩৬]

ডাক্তার পি, কর্দিয়ে বৌদ্ধ-তন্ত্র-গ্রন্থের যে তালিকা ছাপাইয়াছেন, তাহাতে বহু বৌদ্ধ-গীতি-সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩৭]

পদ বলিতে আমরা বিচিত্র ভাব-গর্ভ, সংগীতের উপযোগী ছন্দে রচিত, নাতিদীর্ঘ কবিতা বুঝিয়া থাকি। আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ এবং বর্ণনাত্মক কবিতাও পদ-পর্যায়ে গৃহীত হয়। রস-মধুর ক্ষুদ্র কবিতা সংস্কৃত-সাহিত্যেও পদ নামে প্রচলিত হইয়াছে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর কবিতা-সমষ্টিও পদাবলী নামে পরিচিত।[১৩৮] সংগীতের উপযোগী করিয়া ইহারও অবয়ব নির্মিত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই-জাতীয় নাতিদীর্ঘ কবিতাকেও পদ বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই পদগুলি গানের জন্যই রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের

১৩৫। পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, বরাড়ী, ইত্যাদি—'চর্যাপদ' দ্রষ্টব্য।

১৩৬। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ভূমিকা—পৃঃ ১৬

১৩৭। চতুরবজ্রগীতিকা (অদ্বয়বজ্র); চর্যাদোহাকোষগীতিকা (কৃষ্ণ); দোহাকোষগীতি, দোহাকোষচর্যাগীতি, ডাকিনীবজ্রগুহ্যগীতি (সরহ); বজ্রাসনগীতি, চর্যাগীতি, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-ধর্মগীতিকা (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান); লুইপাদ-গীতিকা (লুইপাদ); বিরূপ-গীতিকা, বিরূপবজ্রগীতিকা (বিরূপ); সহজগীতি (ভুসুক); মহামুদ্রাবজ্রগীতি (শবর) ইত্যাদি।

১৩৮। "মধুরকোমলকান্তপদাবলীম্" ১।৩

পদগুলি নানা রাগ-রাগিণী-সংযোগে গান করা হইত।[১৩৯] তাহার পরবর্তী বিরাট বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের সমস্তই গানের জন্য রচিত। তাহার মধ্যে তত্ত্বের অংশও বর্তমান। সুতরাং তত্ত্ব-দর্শন-সমন্বিত ও বর্ণনাত্মক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা নবম-দশম শতাব্দী হইতেই গীত হইয়া আসিতেছে ও তাহারই অনুকরণে অনেক পরেও সংগীতের জন্য ঐ রূপ পদ রচিত হইয়াছে। অবশ্য ইহার অনুপ্রেরণা বোধ হয় বৈদিক সূক্তের মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। বেদের অনেক সূক্ত দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনামূলক, সেগুলির মধ্যে তত্ত্বের বিবরণও আছে। সূক্তগুলি প্রায়ই সুর-সংযোগে গীত হইত। সামবেদে এই সংগীতাংশই নিবদ্ধ। তাহার ক্রম-পরিণতিতে আমরা বৌদ্ধ-সহজিয়াদের গানগুলি দেখিতে পাই। পরবর্তী ধর্মসম্বন্ধীয় কবিতা যে পুরাপুরি সংগীত, তাহা আমরা বৈষ্ণব-পদাবলীতে দেখি।

সুফী-মতের ফকিরগণও নিভৃতে একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের ধর্মের তত্ত্ব ও সাধনার অভিজ্ঞতা-মূলক গান গাহিত ও নৃত্য করিত। ইহাকে 'সামা' বলে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে নাম-সংকীর্তন, বৈষ্ণব-পদাবলী-কীর্তন প্রভৃতিতে বাংলাদেশ একটা সংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিল। এইসব কারণে ধর্ম সম্বন্ধে কোনো ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে সংগী তাহার উপযুক্ত মাধ্যম—এইরূপ ধারণা জনসমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এই বাউল-সম্প্রদায়ের লোকেরা গানকে তাহাদের আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম-রূপে গ্রহণ করে।

মুসলমান-ফকির ও হিন্দু-বাউলরা তাহাদের স্ব স্ব সমাজের গণ্ডী হইতে নানা কারণে দূরে অবস্থান করিয়া নির্দিষ্ট আস্তানা বা আখড়াতে সমবেত হইয়া তাহাদের ধর্মের তত্ত্ব ও নিগূঢ় সাধন-সংকেত-মূলক গান গাহিয়া তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিত। গানই ছিল তাহাদের অন্তরঙ্গ জীবনের অঙ্গস্বরূপ—গানেই তাহাদের আত্মপ্রকাশ।

এই সময়টা আমরা বাউল-গানের উৎপত্তিকাল বলিয়া ধরিতে পারি। ইহা আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইহার সৃষ্টি ও ব্যাপ্তির কাল বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তও ইহার ধারা চলিয়াছে

১৩৯। তালশিকার পুঁথি—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিশিষ্ট—পৃঃ ১৫৮—১৬৪ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাবিষ্কৃত পুঁথি',—সা-প-প—৩৯শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা ও ৪০শ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পৌনে তিনশত বৎসর ইহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতির শেষ অবস্থা-কাল বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। গানের মধ্যে প্রাচীনত্বের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। হয়তো প্রথমে কিছু কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু মুখে মুখে চলিতে চলিতে তাহা নিঃশেষ হওয়ায় ভাষা যুগোপযোগী বেশ ধারণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে গানটি আমরা প্রাচীনতম বলিয়া মনে করি, তাহার রচনা-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর ও-ধারে নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই বাউল-গানের শেষ সূচিত হইয়াছে। ইহার পরে এই ধর্ম-সম্প্রদায় সংকুচিত হইয়া বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। কি মুসলমান, কি হিন্দু-শ্রেণীর মধ্যে কদাচিৎ কেহ এই নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে শরীয়তবাদীদের চাপে ফকির-সম্প্রদায় বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে। তবে পূর্বে যাহারা এই পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, ধর্ম-ক্রিয়ার ফলোপলব্ধিতে এই মতকে চরম বলিয়া তাহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। ইহাদের পরে এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি কল্পনার অতীত—বিলুপ্তিই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। হিন্দুদের মধ্যেও বাউলের সংখ্যা নিতান্ত কমিয়া গিয়াছে। নূতন বাউলের আর সৃষ্টি হইতেছে না। সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে ইহারা অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। বর্তমানে আর কোনো নূতন আখড়া নির্মিত হইতেছে না, পূর্বের যে আখড়াগুলি ছিল, তাহাতে পরিণত বয়সের বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বাস করিতেছে। বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলে অনেক আখড়ায় দেখিয়াছি, বৈষ্ণব নাই, এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী কোনো রকমে জীবনধারণ করিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষায় আছে। কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী, গুরু-স্থানীয়, বিশিষ্ট বাউলও বিরল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং নূতন নূতন বাউল-গান-রচনা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলার ধর্মের ক্রম-বিবর্তনে বাউল-ধর্মের উৎপত্তি ও স্থান

ধর্মের ইতিহাসের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস নিহিত। বৈদেশিক আক্রমণ, বিভিন্ন রাজ্যের উদ্ভব ও বিলয়, সম্রাট্‌দের রাজ্য-বিস্তার ও বিজয়-অভিযান প্রভৃতি এক-একটি ঘটনা প্রবল একটা বন্যা বা ঝটিকার মতো ভারতের বুকের উপর ছুটিয়া আসিয়া সাময়িক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া কিছু সময় স্থায়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই-সব বিপর্যয়ের প্রভাব ভারতের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করিয়া তাহার কোনো মূল পরিবর্তন সাধন করিতে বা তথায় স্থায়িভাবে আসন গাড়িতে পারে নাই। ধর্মের মধ্যেই ভারতের যে সর্বজনীন ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, তাহা কোনো সময়েই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই ঐক্য ও বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করিয়া ইহার বিরাট ও বহু-বিচিত্র সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই ধর্মের ইতিহাসই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন: "The most important branch of Indian history is the history of her thought." শ্রী সি, এন, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেন: "The soul of Hindu Civilisation is at once made out to be in the religious history of India. The history of religion in India has a much larger meaning than it can have in connection with the civilisation of any other country or nationality."[১৪০]

পারসীক, গ্রীক, পহ্লব, শক, কুষাণ, হুন, তুর্কী, আফগান, মোগল, ইংরেজ ক্রমান্বয়ে ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই ইহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ ভারতের সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক আদর্শ। এই আধ্যাত্মিক আদর্শ বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যই ভারতের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং বহু বিচিত্র বাহ্য রূপের মধ্যেও ঐক্যের ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছে। ভারতীয় জীবনের গতিধারা ও

১৪০। Quoted by Dr. H. C. Roychowdhury in his 'Early History of the Vaishnava Sect', (Foreword).

বিচিত্র কর্মানুষ্ঠানের মূলে এই আধ্যাত্মিক আদর্শ সতত বিদ্যমান। প্রতিদিনের জীবনের সহিত এই আধ্যাত্মিকতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জীবন হইতেই ভারতের ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে এবং নানা মতবাদের পথ ধরিয়া জীবনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছে।[১৪১]

ধর্ম ভারতে কোনো শুষ্ক মতবাদ নয়। ইহা জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া, ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিকের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বিভিন্ন ভাবধারার যুক্তিপূর্ণ সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে। ধর্ম-সম্বন্ধীয় নূতন নূতন ভাব ও মতবাদ ভারত একেবারে পরিত্যাগ করে নাই; তাহার মধ্যকার গ্রহণীয় অংশ আত্মসাৎ করিয়া নূতন বল লাভ করিয়াছে এবং নূতন ধর্মের রূপ প্রকটিত করিয়াছে। এই সমন্বয়-শক্তিই ভারতের বিশিষ্ট শক্তি। এই শক্তির বলেই নানা পার্থক্যের মধ্যে সে একটা ঐক্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

"ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, সেগুলিকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করা।..

"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।...

"পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—

১৪১। Indian Philosophy, Vol. I—Radhakrishnan.—P. 24.

তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।"[১৪২]

তাই "শক-হূনদল, পাঠান-মোগল", "আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়-চীন" ভারতের এক "দেহে লীন" হইয়াছে। সত্যই ভারতবর্ষ "মহামানবের সাগরতীর"। ইহা শুধু কবি-কল্পনা নয়—নির্ভুল ঐতিহাসিক সত্য।

এই ঐক্য-বন্ধনের প্রধান সূত্রই হইতেছে ধর্ম—ভারতীয় হিন্দু-অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন। এই ঐক্যের ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ় ও ইহার তাৎপর্য সুদূর-প্রসারী। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন: "India beyond all donbt possesses a deep fundamental unity far more profound than that produced either by geographical isolation or by political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sects."[১৪৩] জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত বহিরাগতই কম-বেশী ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ভারতের অধিবাসীরাও, যাহারা হিন্দু-ধর্ম ও দর্শনের বিরুদ্ধতা করিয়াছিল, তাহারাও এই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল হিন্দু-ধর্মের বিরোধিরূপে, কিন্তু শেষে হিন্দু-ধর্মের নিকট ইহারা স্বেচ্ছায় ইহাদের স্বাতন্ত্র্য অনেকাংশে বিসর্জন দিয়াছে। ভারতের সমন্বয়-প্রতিভার শক্তিতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-বিরোধী ধর্মের প্রবর্তক শেষে হিন্দুর দশাবতারের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। বহিরাগত গ্রীকদূত হেলিয়োডোরাস বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভগবান বাসুদেবের সম্মানার্থ বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশা) গরুড়ধ্বজ পর্যন্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন।[১৪৪] কুষাণ-রাজ কণিষ্ক বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ-গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাঁহার মুদ্রাতেও তিনি বুদ্ধের মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজধানী পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার) এক বিশাল চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের তিনি একজন বিশেষ

১৪২। ভারতবর্ষের ইতিহাস

১৪৩। **Ancient and Hindu India** —V. A. Smith (Introduction)—Page 10.

১৪৪। Luders Ins. No. 669 (**Epigraphia Indica**, Vol. X. Appendix—Page 63).

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিই চতুর্থ বৌদ্ধ-সংগীতি আহ্বান করেন। পালি-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, গ্রীক-রাজ মিনাণ্ডার নাগসেন নামক জনৈক বৌদ্ধ-ভিক্ষু কর্তৃক বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 'মিলিন্দপঞ্‌হ'-এ উল্লিখিত মিলিন্দ ও মিনাণ্ডার যে একই ব্যক্তি, ঐতিহাসিকগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এই-সব বিদেশী জাতির প্রভাবও ভারত নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত খরোষ্টি-লিপি পারশীক প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।[১৪৫] পারশীক স্থাপত্য-রীতি মৌর্য-যুগে নির্মিত বহু প্রাসাদের গঠন-শিল্পের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অশোকের শিলা-লিপিতে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ পারশীক ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে 'গান্ধার-শিল্প' একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল গ্রীক ও রোমান শিল্প-রীতির মাধ্যমে ভারতীয় ভাব-ধারাকে শিল্পে রূপায়িত করা। গ্রীক ও রোমান ছাড়া এই শিল্প-রীতির উপর পারশীক প্রভাবও লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দীর্ঘকালব্যাপী পারশীক, গ্রীক, প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। এই বৈদেশিক সংস্পর্শের প্রভাব ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পে পতিত হইয়াছিল। কুষাণ-যুগে বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্বগণের বহু প্রস্তর-মূর্তির উপর এই তিনটি বিদেশী শিল্প-ধারার প্রভাব পড়িয়াছিল।[১৪৬] এইভাবে ভারত চিরদিন 'পরকে আপন করিয়াছে।'

যে বহিরাগত মুসলমানগণ প্রধানতঃ তাহাদের ধর্মের প্রতি প্রবল অন্ধ অনুরাগ ও অমুসলমান ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ শক, হুন প্রভৃতির মতো এদেশের জন-মণ্ডলীর সহিত মিশিয়া যাইতে পারে নাই, তাহারাও ভারতবর্ষে বাস করিতে করিতে পারস্পরিক সংস্পর্শ ও আদান-প্রদানের দ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধ মনোভাব অনেকটা দূর করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক মুসলমান হিন্দুনারীকে বিবাহ করিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানবর্গ অনেকটা ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়াছে। মুসলমান

১৪৫। **Oxford History of India** (Smith) Book I, Chap. 3, P. 46.

১৪৬। **Advanced History of India** —Macmillan, Part I, Chapter XVI—Pages 234-240.

Early History of India (Smith)—Chap. IX, Pages 255-56.

সুলতান ও বাদশাহদের হারেমের হিন্দু-বেগমগণ তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া হিন্দু-বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে প্রশমিত করিয়াছেন। তারপর, ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ পূর্বপুরুষের ধর্ম-সম্বন্ধীয় আচার-ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। এই সব কারণেই ভারতের মুসলিম সংস্কৃতি অনেকটা হিন্দু ও মুসলমান-সভ্যতার সমন্বয় হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে।

এই সমন্বয়-কার্যে মধ্যযুগের সাধকগণ—রামানন্দ, কবীর, দাদু, রামদাস, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। এই-সব সাধক জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ মূর্খতার পরিচায়ক এবং ঈশ্বরে ভক্তিই সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রচারে ভারতে মধ্যযুগে এক অভিনব ভক্তিবাদের জন্ম হইয়াছে। কবীর ছিলেন জাতিতে মুসলমান জোলা। তিনি জাতি-ভেদ ও প্রতিমা-পূজা মানিতেন না, কিন্তু হিন্দু-ধর্মের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে ধর্মের সমস্ত বিচার-বিতর্ক ছাড়িয়া, সমস্ত অসত্য ও মানসিক হীনতা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তিই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ পথ। কবীর রাম ও রহিমে, কোরানে ও পুরাণে, কাবা ও কৈলাসে কোনই পার্থক্য দেখেন নাই। ইঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান-ধর্ম-সমন্বয়ের পতাকা-বাহক। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়। এই সুলতানরা বাংলাকেই তাঁহাদের বাসভূমি করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই হিন্দুদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ্‌ই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমান-ধর্মের মিলনাত্মক সত্যপীরের পূজা প্রচলিত করেন। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন এবং বিজয় গুপ্ত 'মনসামঙ্গল' রচনা করেন। হোসেন শাহ্ যে চৈতন্যদেবের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন, এ-কথা বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

হিন্দু-মুসলমান-সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে ভারতে সুফীগণের আগমনের দ্বারা। মুসলমান-আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সুফী-সাধকগণ এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন এবং ভারতের নানা প্রান্তে তাঁহারা আস্তানা গাড়িয়া তাঁহাদের উদার ধর্ম-মত প্রচার করিতে থাকেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর প্রথম জীবনে সুফী-ধর্ম ও মতবাদ দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হন। কাবুলে অবস্থান-কালে পারস্যদেশ হইতে আগত বহু সুফী-সাধকের সান্নিধ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। এই-সব সাধকের প্রভাব তাঁহার উপর পড়ায় এবং

বিশেষভাবে তাঁহার শিক্ষক আবদুল লতিফের প্রভাবের ফলে তিনি পরমত-সহিষ্ণু ও ধর্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাব-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত ফতেপুর-সিক্রীর ইবাদৎখানায় তিনি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শী, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের আহ্বান করিয়া ও নিয়মিত বিভিন্ন ধর্ম-মতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুনিয়া এই গভীর সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সকল ধর্মেরই সারবস্তু এক। এই স্থির বিশ্বাস ও উপলব্ধির পর বিভিন্ন ধর্ম-মতের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য আকবর 'দীন ইলাহী' নামে এক নূতন ধর্ম-মত-প্রচারে উদ্যোগী হন। কোরাণ, হিন্দু-ধর্ম-শাস্ত্র ও বাইবেলের বিভিন্ন মতবাদের সার সংকলন করিয়া আকবর এই নূতন ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই ধর্মে কোনো বিশিষ্ট ধর্ম-মত, সাধুপুরুষ বা দেব-দেবীর পরিকল্পনা ছিল না। বিশেষভাবে যুক্তি-বাদের উপর এই ধর্মের ভিত্তি রচিত হইয়াছিল। এই ধর্ম-মত যাহারা গ্রহণ করিত, তাহাদের পক্ষে নিরামিষ-ভোজন, দান-ধর্ম-পালন, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব-রক্ষা, সম্রাটের জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করার শপথ-গ্রহণ প্রভৃতি বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু এই ধর্ম-প্রচারের জন্য আকবর ব্যক্তিগত প্রভাব বা সাম্রাজ্যের শক্তি বা সামর্থ্য নিয়োজিত করেন নাই। তাঁহার রাজসভার রাজা বীরবল প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন ব্যক্তি এই ধর্ম-মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজসভার বাহিরে বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে এই ধর্ম বিশেষ কোনো উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। অবশ্য গোঁড়া সুন্নী-মুসলমান বদায়ুনী ও খৃষ্টান জেসুইট পাদ্রীরা আকবরের 'দীন ইলাহী' ধর্মের উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁহাদের মন্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আকবরের ধর্ম-মত-প্রচারের চেষ্টাকে "চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক", "দম্ভ ও স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির দৃষ্টান্ত" প্রভৃতি বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু স্মিথের এই মন্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়।

বদায়ুনী ও পাদরীরা নিজেদের ধর্মান্ধতার কারণেই আকবরের এই উদার প্রচেষ্টার নিন্দা করিয়াছেন এবং এই অভিযোগও করিয়াছেন যে, আকবর শেষ বয়সে ইসলামধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আকবর সর্বদাই কোরানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলিতেন এবং ইসলামের মূলনীতি হইতে কোনোদিন ভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার আদর্শ ছিল সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে এক ভারতীয় ধর্ম স্থাপন করা; নানা কারণে সে-উদ্দেশ্য সফল হয়তো হয় নাই, কিন্তু এই আদর্শে

উক্ত প্রেরণা ও সদ্‌বুদ্ধি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আকবরের একজন জার্মান ঐতিহাসিক ভন নোয়ার (Von Noer) বলেন :

"বদায়ুনীর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আকবর বল-পূর্বক তাঁহার ধর্ম-মত-প্রবর্তনের কোনো চেষ্টাই করেন নাই। এই ধর্ম সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত না হইলেও ইহার সর্বজনীনতা অস্বীকার করার উপায় নাই। এই ধর্ম-মত প্রবর্তন করিয়া আকবর যে উদারতা, দূরদৃষ্টি এবং মহত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা মানব-জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কল্যাণ-কামী-রূপে তাঁহার নাম পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"[১৪৭]

সম্রাট্‌ আকবরের পরই সম্রাট্‌ সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকো হিন্দু ও মুসলমান-ধর্মের সমন্বয়ের প্রবল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। উহাই মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ প্রচেষ্টা। অবশ্য তাহার জন্য এই বিদ্বান, বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, উদার ধর্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন রাজপুত্রকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। তবুও তাঁহার গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে এই প্রচেষ্টার আন্তরিতা ও ব্যাপকতা বুঝা যায়। ভারতের ইতিহাসের পাতায় দারার হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অশরিরিণী বাণী চিরদিনই করুণ রাগিণীতে গুঞ্জরণ করিতে থাকিবে এবং প্রবহমান কালের কষ্টিপাথরে ইহার যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হইবে।

দারা-রচিত গ্রন্থগুলি পাঠে দেখা যায় যে, অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সুফী ধর্ম-মতের অনুরাগী হন। তিনি সুফীসাধকগণের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়াছিলেন এবং বিখ্যাত সুফী-সাধকদের গ্রন্থের বহু অংশ তাঁহার লেখার মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিজের বিচারশক্তি প্রয়োগের দ্বারা কোরান ও হাদিসের মধ্যে তিনি নূতন সত্য দর্শন করিয়াছিলেন এবং নির্ভীক-ভাবে সেই স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুফী-শাস্ত্র-পাঠে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সত্য কোনো বিশেষ ধর্মের বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব জিনিস নয়—সকল কালের সকল ধর্মেই সত্য নিহিত আছে।

দারার 'সখীনাত-উল-আউলিয়া' নামক প্রথম গ্রন্থে সুফীদের কাদিরী, নাখবন্দী, চিস্তী, কুব্রাই, সারওয়ার্দি প্রভৃতি শাখার সাধুদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, হজরত মহম্মদ এবং তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণের জীবনী প্রভৃতি আছে। দারার দ্বিতীয় গ্রন্থ—'সখীনত-উল-আউলিয়া'তে তাঁহার গুরু মুল্লা শাহ্‌ ও মুল্লা শাহের গুরু মিঞা মীরের জীবনী এবং দারার জীবনের উপর ইহাদের প্রভাবের কথা বর্ণিত আছে।

১৪৭। Advanced History of India, Part II, Book II—P. 459.

দারা ছিলেন সুফীদের 'কাদিরী'-শাখাভুক্ত এবং তাঁহার গুরু মুল্লা শাহ্ ঐ শাখার একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। মুল্লা শাহের ইচ্ছা ছিল দারার হাত দিয়াই সারা ভারতে কাদিরী শাখার প্রভাব বিস্তৃত হয়। দারার এই গ্রন্থে একটি জিনিস বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে, কাদিরী শাখার সুফীগণ হিন্দুদের মত শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করিয়া যোগ-সাধনা করিতেন। দারা এই গ্রন্থে লিখিতেছেন : "একদিন তিনি (মুল্লা শাহ্) বলিলেন যে, আমাদের শাখায় যে শ্বাস-প্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণ-রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অন্য কোনো শাখায় নাই এবং ইহা অত্যন্ত কঠিন প্রক্রিয়া। তিনি আমাকে ইহার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। এই পদ্ধতি আমাদের শাখারই নিজস্ব পদ্ধতি। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম হইতেই আমি যে-সব প্রক্রিয়া করিয়া থাকি, এটি তাহার অন্যতম। ইহার ফলে এমন হইয়াছে যে, আমি দুই নিশ্বাসে রাত্রি কাটাইতে পারিতাম—সে রাত্রি দীর্ঘই হউক বা অল্পক্ষণ-স্থায়ীই হউক এবং সময় সময় আমার অবস্থা এমন হইয়াছে যে, আমার জীবন পর্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছে।"[১৪৭ক] দারার তৃতীয় গ্রন্থ 'রিসালা-ই-হক-নামা'। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কি ভাবে সুফী-সাধক বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উঠিতে পারে, তাহারই বর্ণনা আছে। ইহার মধ্যেই পাঁচটি স্তরের বা জগতের বর্ণনা আছে : নাছুত (জড়-জগৎ), মলকুত (অদৃশ্য জগৎ), জবরুত (সর্বোচ্চ স্বর্গ), লাহুত (দিব্য জগৎ), হাউত (সূক্ষ্ম ঐশ্বরিক সত্তা)। এই শব্দগুলি আমরা অনেক বাউল-গানে পাইয়াছি।[১৪৮] দারার চতুর্থ পুস্তক 'শাস্তিয়াৎ' বা 'হাসনাত-অল-আরিফিন'। ইহাতে বিখ্যাত সুফী-সাধকদের বাণী সংগৃহীত হইয়াছে। দারার পঞ্চম গ্রন্থ 'মজমা-উল-বহরেন' বা 'দুইটি মহাসমুদ্রের

১৪৭ক। Quoted by M. Mahfazul-Haq, M.A., Prof. of Arabic and Persian, Presidency College, Calcutta in his Introduction to **Majma-ul Bahrain**, a work of Dara Shikāh (Bibliotheca Indica, Works No. 246, Published by the Asiatic Society of Bengal, 1929) :—

"One day he (Mullā Shāh) said that the exercise of restraining the breath which prevails in our order is absent from all others, and is extremely difficult to perform. He taught me the method which is peculiar to this order, of the exercises in which I engaged myself in the beginning (of my spiritualistic career) and, as a result, I could pass the whole night, whether it be long or short, in two breaths and, at times, my condition became such as if my life was going to be extinct." Pages—[1, 8 & 9].

১৪৮। দ্রষ্টব্য গান নং ১৯২, ২৫৪ ইত্যাদি

মিলন' আমাদের আলোচনার দিক হইতে বিশেষ মূল্যবান। এই পুস্তকে দারা দুইটি বিভিন্নমুখী ধর্মের—হিন্দু ও মুসলমান-ধর্মের মিলন-সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে এই পুস্তক-রচনার অপরাধই তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের কারণ।[১৯৯] এই পুস্তকের বাইশটি অধ্যায়ে সুফী-মতবাদ ও হিন্দুদের উপনিষদ ও বেদান্তের বাণীকে একত্র মিলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই পুস্তকের মুখবন্ধ হইতে ইংরেজীতে অনূদিত একটা অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে; তাহা হইতেই দারার অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝা যাইবে:

" . . . Thus sayeth this unafflicted and unsorrowing *fakir*, Muhammad Dārā Shikūh, that, after knowing the truth of truths and ascertaining the secrets and subtleties of the true religion of the Ṣūfis and having been endowed with this great gift (*i.e.* Sūfistic inspiration), he thirsted to know the tenets of the religion of the Indian monotheists; and, having had repeated intercourse and continuous discussions with the doctors and perfect divines of this Indian religion who had attained the highest pitch of perfection in religious exercises, comprehension of God, intelligence and religious insight, he did not find any difference except verbal, in the way in which they sought and comprehended Truth. Consequently, having collected the views of the two parties and having brought together the points—a knowledge of which is absolutely essential and useful for the seekers of Truth—he (i.e. the author) has compiled a tract and entitled it *Majma-ul-Bahrain* or 'The Mingling of the Two oceans,' as it is collection of the truth and wisdom of two Truth-knowing groups." (Translated from the original by Prof. Mahfazul-Haq).

যে চারিটি বা পাঁচটি জগৎ বা স্তরের কথা আমরা বাউল-গানের মধ্যে পাই, সুফী-মতবাদের এই কথাগুলির সঙ্গে দারা হিন্দু-দর্শনে কথিত কয়েকটি অবস্থার সমন্বয় করিয়াছেন এই গ্রন্থে। সেই অংশটুকুর ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:

১৯৯। **Siyar-ul-Mutaakhkhirin**—Page 403.

"According to certain Sufis the worlds through which all the created beings must needs pass, are four in number, (that is) *Nāsut* (the human world), *Malakūt* (the invisible world), *Jabarūt* (the Highest World) and Lāhut (the Divine World); but, according to others, they are five in all—the world of Similitude (ālam-i-mithāl) being added to them. And those who consider the world of Similitude as identical with the invisible world, regard them (i.e. the worlds) as consisting of four only. According to the Indian divines the *Avasthātman* which term applies to these four worlds, consists of four only, namely, *Jāgrat, Svapna, Susupti* and *Turiya*. Of these (1) *Jāgrat* is identical with *Nāsut* (or the Human World); *Svapna*, which is identified with Malakūt (or the Invisible World) is the world of souls and d[illegible]s; (3) *Susupti* is identical with Jabarūt (or, the Highest World), in which the traces of both the worlds disappear and the distinction between 'I' and 'Thou' vanishes—whether you see it with your eyes open or closed. . . . . (4) *Turiya* is identical with Lāhut (or the world of Divinity) which is identical with Pure Existence, encircling, including and covering all the worlds. If a person journeys from the *Nasut* (or the Human World) to the *Malakūt* (or the Invisible World) and from *Malakut* to the Jabarut (or the Highest World) and from this last to the Lāhūt (or, the world of Divinity), this will be considered as a progress on his part."

(Translated from the original by Prof. M. Haq).

ইহা ছাড়া দারা কাশীর পণ্ডিতগণের সাহায্যে 'সির্‌রী-আকবর' নামে উপনিষদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে কোরান ও উপনিষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন নাই। এই পুস্তকের ভূমিকায় দারা লিখিয়াছিলেন :

"Any difficult problem or sublime idea that came to his mind and was not solved inspite of his best efforts, becomes clear and solved with the help of this ancient work, which is undoubtedly the first heavenly book and the fountain-head of the ocean of monotheism, and, in accordance with or rather an elucidation of the *Kuran*. ...... The graced one, who having set aside the promptings of passion, and casting off all prejudice will read and understand this translation—which is entitled Sirr-i-Akbar (or, the Great Secret) will consider it to be Divine utterance, he will have no anxiety or fear or grief and will be helped and fortified with Divine grace. . . ."

[Journal of the Asiatic Society of Bengal (New Series), Vol. XIX, No. 7,—Pages 242—244 & 250—252].

মোগল-যুগে আকবর ও দারার এই সমন্বয়-প্রচেষ্টা কেবল ধর্মের দিক দিয়াই করা হয় নাই, সংস্কৃতির দিক দিয়াও এই সমন্বয়-নীতি অনুসৃত হইয়াছে। চিত্র-শিল্প তাহার দৃষ্টান্ত। মোগল-বাদশাহদের মধ্যে এক ঔরঙ্গজেব ব্যতীত সকলেই চিত্র-কলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হুমায়ুন পারস্য হইতে একাধিক চিত্র-শিল্পীকে ভারতবর্ষে তাঁহার রাজধানীতে আনাইয়াছিলেন। ইহাঁদের প্রভাবে ভারতীয় চিত্র-শিল্প এক নবরূপ পরিগ্রহ করে। ইহাকেই বলা হয় ইন্দো-পারসীক রীতি। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইরাণী ও ভারতীয় উভয় শিল্প-রীতিই প্রভূত উন্নতি সাধন করে। আকবরের সময় প্রথম শ্রেণীর চিত্র-শিল্পীরা সকলেই ছিলেন ভারতীয় হিন্দু। জাহাঙ্গীরও বিশেষ শিল্প-রসিক ছিলেন এবং চিত্র-শিল্পের উন্নতি-কল্পে নিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কোনো কোনো ইউরোপীয় চিত্র-সমালোচক বলিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীরের সময়ের চিত্র-শিল্পের উপর পারসীক, ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। ঔরঙ্গজেব চিত্র-শিল্পের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার আদেশে আকবরের ফতেপুর-সিক্রীর প্রাসাদে অঙ্কিত বহু মূল্যবান চিত্র ধ্বংস করা হয়।

ভারতের স্থাপত্য-শিল্পেও এই সমন্বয়-নীতি কার্যকরী হইয়াছে। হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বী শের শাহের রাজত্বকালে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও মুসলমান-স্থাপত্য-শিল্পের সংমিশ্রণে নূতন ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির প্রবর্তন হয়। আকবরের রাজত্ব-কালে

যে সকল প্রাসাদ, স্মৃতি-সৌধ, বিদ্যা-মন্দির ও ভজনালয় নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলির নির্মাণ-পদ্ধতিতে হিন্দু, মুসলমান ও পারসীক স্থাপত্য-শিল্প-রীতির প্রভাব লক্ষিত হয়। সাজাহানের আমলে যে স্থাপত্য-শিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতেও এই সমন্বয়ের প্রভাব সমানভাবে রক্ষিত হইয়াছে।[১৫০]

এইভাবে ভারতে ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভিন্ন পরিবেশের তাগিদে, বিভিন্ন প্রভাবের বশবর্তী হইয়া এবং জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার প্রয়োজন বোধে বিচিত্র সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং নানা স্থান হইতে নানা সময়ের প্রভাব স্বীকার করিয়া যুগোপযোগী রূপ ধারণ করিয়াছে।

ভারতে ধর্মের এই বৈশিষ্ট্য বাংলার ধর্মের ইতিহাসেও আমরা লক্ষ্য করি। এই সমন্বয়-নীতি বাংলায় বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে। যে বাউল-ধর্মের উৎপত্তি-আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই ধর্মে আর্যেতর ধর্ম ও আর্য-হিন্দু-ধর্ম, বৌদ্ধ-তন্ত্র ও যোগসাধনা, হিন্দু-তন্ত্র ও যোগ-সাধনা, মুসলমান-সুফী-ধর্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম প্রভৃতির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এবং তাহা এক শ্রেণীর সাধকদের জন্য এক নূতন নিজস্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য লইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভারতের যে-কোনো ধর্মের ইতিহাস-আলোচনায় বেদ হইতে তাহার সূত্র ধরা প্রয়োজন। কারণ, বেদই ভারতীয় আর্য-জাতির প্রথম ধর্ম-সাহিত্য।

প্রাচীন ভারতীয়গণ কোনদিনই তাহাদের সাহিত্যিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় ইতিহাস রক্ষা করিবার চেষ্টা করে নাই। এই বৈদিক সাহিত্যও বহুদিন মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। তাই ভারতীয়েরা মনে করিত, এগুলি অপৌরষেয়—'মন্ত্রদ্রষ্টা' ঋষিদের নিকট প্রতিভাত ভগবানের বাণী। কবে হইতে যে এগুলি মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, তাহার সঠিক সময় নির্দেশ করা যায় না। তাই বৈদিক-সাহিত্যকে মনে করা হইত অনাদি।

যখন বেদ রচিত হয়, তখন খুব সম্ভব লিখিবার প্রথা আবিষ্কৃত হয় নাই, তবুও ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় অবিকৃতভাবে দুই-তিন হাজার বৎসরের মধ্য দিয়া এইগুলি আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি একই সময়ে একই ব্যক্তির দ্বারা রচিত নয়,—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষির দ্বারা রচিত। সম্ভবতঃ ইহার কতকগুলি আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। গুরু-পরম্পরায় এগুলি মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে এবং ছাত্রেরা গুরুর নিকট

১৫০। **Advanced History of India—Macmillan, Part II, Book II, Chap. VIII—Pages 578-601.**

শুনিয়া বোলাজ্যাস করিয়াছে বলিয়া বেদের এক নাম 'শ্রুতি'। বেদ বলিতে এক বা একাধিক গ্রন্থ বুঝায় না,—ইহা দুই-তিন সহস্র বৎসর-ব্যাপী একটি যুগের সাহিত্য বুঝায়।[১৫১]

ভারতে 'আস্তিক' ধর্ম ও দর্শন বলিতে যাহা বুঝায়, বৈদিক-সাহিত্য তাহার উৎপত্তি-স্থল এবং সকল আস্তিক ধর্ম ও দর্শন বৈদিক-সাহিত্যকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করে।[১৫২] ভারতে ধর্ম ও দর্শন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধর্ম দর্শনের ব্যবহারিক দিক এবং দর্শন ধর্মের উপপত্তির দিক। ভারতবর্ষে দর্শনকে 'অধ্যাত্ম-বিদ্যা' বা 'মোক্ষ-শাস্ত্র' বলা হইয়াছে।[১৫৩] ভারতীয় দর্শন ও ধর্মকে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। যাহারা বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করে, তাঁহারা 'আস্তিক' এবং যাহারা করে না, তাহারা 'নাস্তিক' নামে অভিহিত হয়। 'নাস্তিক' দর্শন ও ধর্ম প্রধানতঃ দুইটি—জৈন ও বৌদ্ধ। চার্বাক-মতবাদকেও নাস্তিক দর্শন বলা যায়। অবশ্য চার্বাক-দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা কোথাও নাই। বৌদ্ধ ও অন্যান্য সাহিত্যে এই মতবাদের দুই-চারিটি উল্লেখ দেখা যায়। 'ন্যায়মঞ্জরী' (জয়ন্ত), 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' (মাধবাচার্য), 'তর্করহস্যদীপিকা' (গুণরত্ন) প্রভৃতি গ্রন্থে এই মতবাদের কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত এবং সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক, জড়বাদী ও ইহলোক-সর্বস্ব মতবাদমাত্র, কোনো সুচিন্তিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত নয়। ধর্মের তো কোনো প্রশ্নই ইহাতে নাই।

বেদের চারিভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ দুইটিই মৌলিক। এই দুই বেদ কবিতায় রচিত। কয়েকটি কবিতা বা শ্লোক লইয়া একটি বৃহৎ কবিতা রচিত হইয়াছে। কবিতা বা শ্লোক ও তাহার

১৫১। **History of Indian Literature**—Winternitz (Introduction)—Page 36.

১৫২। **The Religion of the Veda**—Bloomfield—Page 51.

১৫৩। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পৃঃ ৪।

এবং

Glimpses of Philosophy and Religion—Swami Abhedananda.

"Of the tree of knowledge, 'philosophy' is the flower and 'religion' is the fruit, so they must go together...... Religion is nothing but the practical side of philosophy and philosophy is the theoretical side of religion......"

অংশকে 'মন্ত্র' বলা হয় এবং তাহাদের সমষ্টিকে 'সূক্ত' বলে। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের প্রত্যেকটিই কতকগুলি সূক্তের সমষ্টিমাত্র। সেইজন্য এই দুই বেদকে 'সংহিতা' (অর্থাৎ সমষ্টি) বলা হয়। ঋগ্বেদে যে সূক্তগুলি সুর-সংযোগে গান করিতে পারা যাইত, সেই সূক্তগুলিকে একত্র করিয়া 'সামবেদ' বা 'সাম-সংহিতা' গঠিত হইয়াছিল। যে মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত হইত, সেইগুলিকে একত্র করিয়া 'যজুর্বেদ' বা 'যজুঃ-সংহিতা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যজুঃ-সংহিতা' প্রধানতঃ ঋগ্বেদ হইতেই সংগৃহীত, কিন্তু ইহার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক সূক্তও আছে।

এই সংহিতা-অংশ ছাড়া আর একপ্রকার বৈদিক সাহিত্যের নাম 'ব্রাহ্মণ'। এইগুলি প্রধানতঃ গদ্যে লিখিত। কোন্ মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে কোন্ অবস্থায় ব্যবহার করা হইবে, তাহার এবং নানাবিধ যজ্ঞের নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে এগুলির মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ঐ সঙ্গে যজ্ঞ-কর্মের পৃষ্ঠপোষক রাজগণের কীর্তি-গৌরবও বর্ণিত আছে। এগুলি সংহিতার পরবর্তী যুগে রচিত। যখন আর্যদের দৃষ্টি বিশেষভাবে যজ্ঞ-কার্য ও তাহার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতার উপর নিবিষ্ট হইয়াছিল, তখনই এইগুলি রচিত হয়। বিভিন্ন সংহিতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সংশ্লিষ্ট। ঋগ্বেদ-সংহিতার সহিত 'ঐতরেয়' ও 'কৌশীতকী' ব্রাহ্মণ, যজুর্বেদ-সংহিতার সহিত 'শতপথ ব্রাহ্মণ' ও 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ', সামবেদের সঙ্গে 'তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ' বা 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ' ও 'তলবকার ব্রাহ্মণ' এবং অথর্ববেদের সঙ্গে 'গোপথ ব্রাহ্মণ' সংশ্লিষ্ট।

ব্রাহ্মণ ছাড়া বৈদিক সাহিত্যের আর একটি বিভাগ আছে। তাহাকে বলা হয় 'আরণ্যক'। ঋষিরা যখন বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন, তখন বহুব্যয়-সাধ্য যাগ-যজ্ঞ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তাঁহারা কতকগুলি কল্পনার আশ্রয় লইয়া সেই কল্পনাগুলিকে ধ্যান করিতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ না করিয়া যদি পৃথিবীকে অশ্ব মনে করা যায়, তারাগুলিকে অশ্বের অস্থি মনে করা যায় এবং সেইভাবে ধ্যান করা যায়, তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্রাহ্মণের সহিত বিভিন্ন আরণ্যক সংশ্লিষ্ট। আর্যগণ যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ ত্যাগ করিয়া ক্রমেই সূক্ষ্ম ধ্যান-ধারণার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

বেদের চতুর্থ অংশকে 'উপনিষৎ' বলা হয়। উপনিষদে পারমার্থিক সত্য, এই জগৎ ও জীবনের সহিত সেই সত্যের সম্বন্ধ—অর্থাৎ আত্মা, ব্রহ্ম,

জীবাত্মা-পরমাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ঋষিগণ আপন আপন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। উপনিষদের মধ্যে অন্যান্য দর্শনের মতো যুক্তি-বদ্ধ প্রণালীতে কোনো আলোচনা নাই। কবি যেমন কাব্যের মধ্যে আপন মত ব্যক্ত করেন, তেমনি করিয়াই ঋষিরা এই-সব সত্যের আলোচনা করিয়াছেন। এই-সব সত্য প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় ঋষিদের অন্তরে আবির্ভূত হইত। ঋষিদিগকে কবি নামও দেওয়া হইয়াছে। কবি শব্দের অর্থ 'ক্রান্তদর্শী'—অর্থাৎ যাঁহার দৃষ্টি চোখের দৃষ্টিকে অতিক্রম করে। অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন এই সমস্ত ঋষি বা কবি কোনো যুক্তি-তর্কের মধ্যে না গিয়া হৃদয়ের উপলব্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষের ন্যায় অভ্রান্ত সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন, এইরূপ বিশ্বাস ভারতীয়দের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সমস্ত আস্তিক দর্শনই উপনিষদের মতকে অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভারতের বাহিরেও উপনিষৎ Neoplatonism, Gnosticism এবং Sufismকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ভিন্ন মতাবলম্বী ভারতীয় দার্শনিকেরাও উপনিষদের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজ নিজ মত সমর্থন করিতে গিয়া উপনিষদের বাক্যের স্ব স্ব মতের অনুকূল ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে এগারটি—'ঈশ', 'কেন', 'কঠ', 'প্রশ্ন', 'মণ্ডূক', 'মাণ্ডূক্য', 'ঐতরেয়', 'তৈত্তিরীয়', 'বৃহদারণ্যক', 'ছান্দোগ্য' ও 'শ্বেতাশ্বতর' প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত।

ইহাই বৈদিক-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বেদের রচনা-কাল সম্পর্কে পণ্ডিত-মহলে গভীর মতানৈক্য বিদ্যমান। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০০ অব্দ পর্যন্ত একাধিক তারিখকে বেদের রচনা-কাল বলিয়া অনুমান-করা হইয়াছে। কোনো কোনো পণ্ডিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বেদের রচনা-কাল অন্যূন ৪০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর্যগণ ভারতে আসিবার পরে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল। আর্যগণ খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের পূর্বে বা উহার কাছাকাছি সময়ে ভারতে আসিয়াছিলেন বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন। সিন্ধু-উপত্যকায় ৩০০০ বৎসর পূর্বে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তাহা আর্য-পূর্ব সভ্যতা। এই অনুমান অভ্রান্ত হইলে খৃষ্ট-পূর্ব ৩০০০ অব্দের পর এবং ২৫০০ অব্দের পূর্বে আর্যগণ ভারতে আসিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। সুতরাং খৃষ্ট-পূর্ব ২৫০০ হইতে ২০০০ অব্দের মধ্যে বেদের রচনা-কাল নির্ধারণ করিলে ভুল করা হইবে না। পশ্চিমএশিয়ার অন্তর্গত

বোখাজ-কুই নামক স্থানে আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্দশ শতকের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অশ্বিনী প্রভৃতি দেবতাগণের নামোল্লেখ আছে। ইহাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্দশ শতকের বহু পূর্বেই আর্যগণ ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পশ্চিম-এশিয়ার এসিরিয়া-ব্যাবিলন অঞ্চলের সহিত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

সুতরাং আমরা খৃষ্ট-পূর্ব ২৫০০ বা ২০০০ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্ট-পূর্ব ৭৫০ এবং ৫০০ অব্দ পর্যন্ত সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের রচনা-কাল বলিয়া ধরিতে পারি।[১৫৪]

বৈদিক যুগ হইতে বাংলায় ধর্মান্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদ-সংহিতায় বাংলা নামের কোনো উল্লেখ নাই। বৈদিকধর্মাবলম্বীদের অধ্যুষিত অঞ্চল তৎকালে বর্তমান ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার পূর্বে আর্য-ভূমির প্রান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহিরে ছিল।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর শুনঃশেফ-উপাখ্যানে আছে, বিশ্বামিত্র তাঁহার পঞ্চাশজন বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন যে, তাহাদের সন্তান-সন্ততি পৃথিবীর শেষপ্রান্তে বসতি স্থাপন করিবে। তাহাদের এই সন্তান-সন্ততিই অন্ধ, পুণ্ড্র, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিরা। তাহারা আর্য-ভূমির প্রান্তে বাস করিত এবং দস্যু বলিয়া পরিগণিত ছিল।[১৫৫]

১৫৪। Winternitz তাঁহার **History of Indian Literature** (Eng. Translation, Vol. I) নামক গ্রন্থে Max Muller, Bühler, Jacobi, Oldenbarg, Tilak, Konow, Hillebrandt প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতামতের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন এবং এই মত বর্তমানে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মানিয়া লইয়াছেন। দ্রষ্টব্য ঐ গ্রন্থের The Age of the Veda' (Pages 290—310). নামক অধ্যায়।

History of Indian Philosophy (sponsored by the Ministry of Education, Govt. of India)—Chapter II, Vedas—Page 40.

A History of Indian Philosophy—by Dr. S. N. Das Gupta—Vol. I, Page 10.

১৫৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৭, ১৮। সায়ন 'অন্তান্' কথাটির "চণ্ডালাদিরূপান্ নীচজাতি-বিশেষান্" অর্থ করিয়াছেন। ডাঃ হেগ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন: "you shall have the lowest castes for your descendants".

এই প্রাচীন পুণ্ড্রজাতির রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগরে। এই পুণ্ড্রনগর যে উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড় নামক স্থানে অবস্থিত ছিল, খনন-কার্যের দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। পূর্বী প্রাকৃতে রচিত এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত কিঞ্চিৎ খণ্ডিত একটি অনুশাসন-লিপি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, 'পুডনগল' বা পুণ্ড্রনগর একসময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। প্লাবন, অগ্নিদাহ ও মহামারীর সময় অধিবাসীদের প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য ইহার ধনাগার 'গণ্ডক' ও 'কাকনিক' নামক মুদ্রার দ্বারা পূর্ণ থাকিত। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে মৌর্য-যুগের লিপি বলিয়া মনে করেন।[১৫৬] বাংলার এই পুণ্ড্রজাতির ঐতিহাসিক উল্লেখ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

কোনো কোনো পণ্ডিত 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এর "বয়াংসি বঙ্গাবগাধাশ্চের-পাদাঃ"[১৫৭] বাক্যাংশের মধ্যে "বঙ্গাবগাধাঃ"র শুদ্ধপাঠ 'বঙ্গমগধাঃ' অর্থাৎ বঙ্গ ও মগধের অধিবাসী হইবে বলিয়া অনুমান করিয়া আরণ্যকেও বাংলার উল্লেখ আছে ধারণা করেন এবং তাহারা "পক্ষিবিশেষাঃ" বা অনার্য ভাষা-ভাষী ছিল বলিয়া মনে করেন।

'বোধায়ন ধর্মসূত্র'-এ বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক আচার-পরায়ণতার দিক দিয়া বোধায়ন ভারতবর্ষকে তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্তী স্থান আর্যাবর্তই শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র স্থান। পরবর্তী ভূভাগের অবন্তী, অঙ্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চল-বাসীকে "সংকীর্ণযোনয়ঃ" অর্থাৎ সঙ্করজাতি এবং যজ্ঞাদি-রূপ "কল্যাণকর্মে" পরাঙ্মুখ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তৃতীয় ভূভাগের অধিবাসীরা একেবারে বৈদিক সংস্কৃতির বাহিরে এবং অনাচরণীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অধিবাসীদের মধ্যে 'পুণ্ড্র' ও 'বঙ্গ'-এর উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে অল্পসময়ের জন্য বাস করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।[১৫৮]

জৈনদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ 'আয়রঙ্গসুত্ত'-এ (আচারাঙ্গ-সূত্রে—আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে রচিত) সর্বপ্রথম রাঢ়দেশের (দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়

১৫৬। Epigraphia Indica —XXI—Pages 81-92.

১৫৭। "প্রজাতিস্রঃ অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগাধাশ্চেরপাদাঃ।"—ঐতরেয় আরণ্যক—২-১-১-৫।

১৫৮। বোধায়ন ধর্মসূত্র—১, ২, ১৪ ও পরবর্তী অংশ (শ্রীচিত্রস্বামী-সম্পাদিত—কাশী সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)।

—'বজ্জভূমি' ও 'সুব্ভভূমি') উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ প্রদেশ ছিল 'পথহীন' এবং ঐ প্রদেশের অধিবাসীরা মহাবীর ও অন্যান্য জৈন সাধুদের প্রতি যে অভদ্র দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা আছে।[১২৯] ইহাতে মনে হয়, তখনও রাঢ়-বাসীরা বৈদিক সভ্যতার বাহিরে অবস্থান করিত এবং এক বন্যপ্রকৃতির জীবন যাপন করিত।

ইহার পর রামায়ণ ও মহাভারত-মহাকাব্যের সময় হইতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশীয়গণকে আর অসভ্য, অনার্য বা আর্য-সমাজে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা-কাল লইয়া কোনো আলোচনা আমাদের বিষয়-বহির্ভূত, তবে সাধারণভাবে যাহা অধিকাংশ ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইব। যে-আকারে এই মহাকাব্যদ্বয় আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা খুব সম্ভবত, খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী এবং খৃষ্ট-পরবর্তী তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণে দেখা যায়, রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন যে, তাঁহার শাসনাধীনে যে-সমস্ত রাজ্য আছে, তাহাতে ধন-ধান্য-পশু প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, কৈকেয়ী তৎসমুদয় প্রার্থনা করিতে পারেন। এই রাজ্যগুলির মধ্যে বঙ্গ অন্যতম।[১৩০] সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের জন্য তাঁহার অনুচরকে যে-সব স্থানে যাইতে বলিতেছেন, তাহার মধ্যে পুণ্ড্রদেশের নাম আছে।[১৩১]

মহাভারতে আমরা সুস্পষ্টভাবে বাংলার বিভিন্ন অংশের উল্লেখ পাই। ভীমের দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় দেখা যায় যে, তিনি মহাবলশালী পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবকে জয় করিয়া বঙ্গরাজকে পরাজিত করিলেন, তারপর তাম্রলিপ্তের রাজাকে পরাজিত করিয়া কর্বটরাজ ও সুহ্মাধিপতিকেও পরাজিত করিলেন।[১৩২]

১২৯। Jain Sutras, Part I, —1, 8, 3 (Sacred Books of the East Series. —Harvard, XXII)—Page 84.

১৩০। "দ্রাবিড়া-সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা-দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা-মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ ॥"
(অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম সর্গ, শ্লোক—৩৭)

* * * *

১৩১। "মগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্তঙ্গাংস্তথৈব চ ॥"
(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ, শ্লোক—২৩)

১৩২। "ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলং।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥

মহাভারতে আরো দেখা যায় যে, বঙ্গরাজ দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি পর্বতপ্রমাণ হস্তীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কৌশলে হস্তী চালনা করিয়া নিক্ষিপ্ত বর্শা হইতে দুর্যোধনকে রক্ষা করিয়াছিলেন।[১৬৩]

পাণিনির ব্যাকরণে 'গৌড়পুর'-এর উল্লেখ আছে।[১৬৪] পাণিনির আবির্ভাব-কাল বর্তমানে পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী।[১৬৫] কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ গৌড়দেশ-জাত রৌপ্যের ('গৌড়িক') এবং বঙ্গদেশ ও পুণ্ড্রদেশ-জাত ক্ষৌমবস্ত্রের ('বাঙ্গক', 'পৌণ্ডক') উল্লেখ আছে।[১৬৬]

দেখা যায় যে, খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতক হইতে বাংলা দেশ আর্যসংস্কৃতির সহিত কোনো-না-কোনো ভাবে যুক্ত হইয়া সর্বভারতীয় পরিচিতি-লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে।

খৃষ্ট-পূর্ব যুগের মধ্যে প্রাচীন বাংলার উপর একটিমাত্র ঐতিহাসিক আলোর ক্ষীণ রশ্মি পতিত হইয়াছে। আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলা দেশের গঙ্গা-তীরবর্তী স্থান ব্যাপ্ত করিয়া দুইটি স্বাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ এই দুইটি রাষ্ট্রকে 'Prasioi' বা 'প্রাচ্য' এবং 'Gangaridai' বা 'গঙ্গারাষ্ট্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই গঙ্গারাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল এবং প্রাচ্য-রাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্তি সম্ভবতঃ প্রাচ্য-রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। প্রথমে

উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ ! বঙ্গরাজমুপাদ্রবাৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥"

(সভাপর্ব, ২৯ অধ্যায়, শ্লোক—২০-২৩)

১৬৩। মহাভারত, ভীষ্মপর্ব দ্রষ্টব্য।

১৬৪। অষ্টাধ্যায়ী, ৬, ২, ৯৯-১০০।

১৬৫। The Early History of the Vaishnava Sect—Dr. H. C. Roychoudhury—Pages 29-30.

১৬৬। অর্থশাস্ত্র, ২, ১৩ এবং ২, ১১।

এই দুইটি রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকিলেও আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা তৃতীয় পাদে দুইটি রাষ্ট্র এক রাজার অধীন হয় এবং একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, যদিও দুই রাষ্ট্রের সৈন্য-সামন্তের পৃথক অস্তিত্ব থাকিতে পারে। এই সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাজার নাম ঐতিহাসিক কার্টিয়াস বলিয়াছেন 'Agrammes', দিয়োদোরস বলিয়াছেন 'Xandrammes'। এই রাজা খুব সম্ভব নন্দ-বংশীয় রাজা মহাপদ্ম নন্দ। কারণ ঐ ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে 'নীচকুলোদ্ভব', 'নাপিতের পুত্র' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের 'পরিশিষ্টপর্ব' নামক জৈন-গ্রন্থে এই রাজাকে বলা হইয়াছে 'নাপিতকুমার'। যাহা হোক, গ্রীক ও রোমান লেখকগণের বর্ণনায় ইহা সুস্পষ্ট যে, গঙ্গারাষ্ট্র-বাসীরা প্রবল পরাক্রান্ত জাতি ছিল এবং প্রাচ্য-রাষ্ট্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাদের একজন বা দুইজন রাজা আলেকজাণ্ডারকে প্রবলভাবে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহার ভারত-অভিযানে যখন গঙ্গা পার হইয়া গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবেশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তখন গঙ্গারাষ্ট্র ও প্রাচ্যরাষ্ট্রের সম্মিলিত সৈন্য-সামন্ত তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ হয় নাই, রণ-ক্লান্ত গ্রীক-সম্রাট্ স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৩৭]

মহাস্থানগড়ে মৌর্য-যুগের এক ব্রাহ্মীলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রজাতি পুণ্ড্রনগর ('পুডনগল') নামে একটি সমৃদ্ধিশালী ও সুশাসিত নগর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। প্লাবন, অগ্নিদাহ, মহামারী প্রভৃতি দৈবোৎপাত-কালে জনসাধারণকে সাহায্য করিবার জন্য ইহার ধনাগার 'গণ্ডক' ও 'কাকনিক'-নামক মুদ্রার দ্বারা সর্বদা পূর্ণ থাকিত।

ইহার পর খৃষ্ট-পরবর্তী চতুর্থ শতক হইতে গুপ্ত-সম্রাটগণের শাসনাধীনে আসিয়া বাংলা এক নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এই সময়ে বাংলা আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শ পাইল এবং এখন হইতেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় যে প্রাচীন ইতিহাস, তাহার সূত্রপাত হইল।

এখন বাংলায় আর্য-সভ্যতা-বিস্তারের পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ববর্তী ২৫০০ কি

১৩৭। Early History of Bengal from 326 B.C. to 320 A.D.—Dr. Hem Chandra Roy Chowdhury. **History of Bengal** (Dacca University), Chapter III—Pages 41-44.

২০০০ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্ট-পরবর্তী ৩০০ বৎসর পর্যন্ত জাতি হিসাবে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া গেলেও, বাংলার ধর্মের কি রূপ ছিল, বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই বা কি স্বরূপ ছিল, তাহার কোনো প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, সেই ধর্ম অবৈদিক ও আর্যেতর ছিল। বাংলায় ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ধর্ম আর্য ও বৈদিক ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও, জনসাধারণ যে ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক আর্যেতর ও অবৈদিক অংশ প্রবেশ করিয়া বাংলার ধর্মকে একটা বিশিষ্ট রূপে রূপায়িত করিয়াছে।

বাঙালী যে বৈদিক আর্যগণ হইতে জাতি ও সংস্কৃতিতে পৃথক, তাহার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যের বঙ্গ-বিদ্বেষসূচক উক্তিগুলি। নৃতত্ত্ব, ভাষা ও অন্যান্য সংস্কারের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যায় যে, বাঙালী নানা জাতির সমন্বয়ে উদ্ভূত এক সংকরজাতি। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সাধারণতঃ স্বীকার করেন যে, যে-মূল-বংশ হইতে বৈদিক আর্যগণের উদ্ভব, বাঙালী সেই বংশ হইতে উদ্ভূত নয়।

বাংলার ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাংলার ব্রাহ্মণেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা তাহাদের অব্রাহ্মণ প্রতিবেশীদের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ-যুক্ত।[১০৮] অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশও কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন।[১০৯] অধ্যাপক হারানচন্দ্র চাকলাদার কলিকাতার বহুসংখ্যক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও বীরভূমের মুচিদের নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, আর্যেতর জাতি-সমূহের বৈশিষ্ট্য উভয় জাতির মধ্যে প্রায় সমানভাবে প্রকটিত।[১১০] নৃতত্ত্ববিদ্‌-গণের মতানুসরণে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেদের সঙ্গে নরতত্ত্বের দিক হইতে নমঃশূদ্রদের কোন পার্থক্য নাই একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়।"[১১১]

কোন্ কোন্ জাতির দ্বারা বাঙালী জাতির গঠনে সহায়তা করিয়াছে, সে

১০৮। **Indo-Aryan Races**—Ramaprasad Chanda—Page 162.

১০৯। **Journal of the Royal Asiatic Society,,** New Series, XXIII, —Pages 30-33.

১১০। **Proceedings of the Indian Science Congress, 1936**—(Presidential Address, Anthropological Section—Pages 359-90).

১১১। বাঙালীর ইতিহাস—পৃঃ ৩৩

সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে বাঙালী জাতির স্বরূপ ও তাহার ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যাইবে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মানুষের দেহের গঠন, চুলের বৈশিষ্ট্য, চোখ ও চামড়ার রঙ, নাক, কপাল ও বিশেষ করিয়া মাথার আকৃতি পরীক্ষা করিয়া এক এক গোষ্ঠীর লোকের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেন। অবশ্য এই নৃতত্ত্ব-বিদ্যা এখনও ভারতে পর্যাপ্ত ও বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং বিভিন্ন অনুসন্ধানকারীর মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে, তবুও অধিকাংশ পণ্ডিতের মতানুসারে ভারতের তথা বাংলার জনসঙ্ঘের মূল উপাদান যেগুলি, তাহারই একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

ভারতের জনসঙ্ঘের প্রথম স্তর রচিত হইয়াছে 'নেগ্রিটো' বা 'নিগ্রোবটু'-জাতির দ্বারা। আনুমানিক পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে যখন মানুষ প্রথম যুগের অমসৃণ প্রস্তরের অস্ত্র ব্যবহার করিত, তখন ভারতের সমুদ্র-তীরবর্তী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপে এই নেগ্রিটো-জাতির লোকের বসবাস ছিল। ইহারা ছিল ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, উর্ণাবৎ-কেশযুক্ত, দীর্ঘমুণ্ডাকৃতির দেহ-বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। ইহারা শিকার-লব্ধ মাংস, বন্য কন্দ-মূল ও মৎস্য আহার করিত, কৃষি-কার্য জানিত না এবং কোনো সভ্যতার ধার ধারিত না। এই ভারতীয় নিগ্রোবটুরা বিভিন্ন জাতি-প্রবাহের চাপে বহুদিন পূর্বেই বিলীন হইয়া গিয়াছে, তবে নৃতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা ভারতে তাহাদের ক্ষীণ অস্তিত্ব অনুমান করেন। আধুনিক কয়েকজন বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ্‌ বলেন যে, আসামের পার্বত্য-অঞ্চলে অঙ্গমি নাগাদের মধ্যে এবং দক্ষিণ-ভারতের পেরাম্বকুলম্‌ এবং আন্নামালাই-পাহাড়ের কাদার ও পুলায়নদের মধ্যে নিগ্রোবটু-রক্ত-প্রবাহ স্পষ্ট। ভারতীয় নেগ্রিটোদের আকৃতি ও দেহ-বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল, তাহা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ না করা গেলেও, বিহারের রাজমহল পাহাড়ের বাগ্‌দীদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎস্য-শিকারী শ্রেণী-বিশেষের ও ময়মনসিংহ ও নিম্নবঙ্গের কোনও কোনও স্থানের লোকদের মধ্যে, যশোহর জেলার বাঁশফোড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণাভ-ঘনশ্যাম বর্ণ, প্রায় উর্ণাবৎ কেশ, পুরু ও উল্টানো ঠোঁট, চ্যাপ্টা নাক ও মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সেই নিগ্রোবটুদের চেহারার আভাস বহন করে। উত্তরভারতে ও বাংলায় বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু আর নাই, তবে কদাচিৎ ঐ-সব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে নিগ্রোবটু-চেহারার একটু-আধটু আভাস পাওয়া যায়।

যে-জাতির লোকেরা দ্বিতীয় প্রবাহ রচনা করিয়াছে, নৃতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা

তাহাদের নাম দিয়াছেন আদি-অস্ট্রেলীয়। তাঁহারা বিবেচনা করেন, এই জাতির লোকসমূহ এক সময় মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণভারত, সিংহল হইতে একেবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জাতির লোকদের দেহ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, সিংহলের ভেড্ডাদের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। মধ্য ও দক্ষিণভারতের খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, তাম্রকেশ, প্রশস্তনাসা-বিশিষ্ট অধিবাসীরা এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর। পশ্চিমভারত ও উত্তরভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা, মধ্যভারতের কোল, ভীল, মুণ্ডা, করোয়া, খারওয়ার, ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি লোকেরা, দক্ষিণভারতের চেঞ্চু, কুরুব, য়েরুব প্রভৃতি লোকেরা সকলেই সেই আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোক। বেদে ও পুরাণাদিতে যে-নিষাদের বর্ণনা আছে, সেই কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, খর্ববাহু, রক্তচক্ষু, তাম্রকেশ, প্রশস্তনাসা-বিশিষ্ট জাতিরাও আদি অস্ট্রেলীয়দের বংশধর হইতে পারে। বর্তমান বাংলার রাঢ়দেশের সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বাঁশফোঁড়, মালপাহাড়ী প্রভৃতিদের ঐ গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে সংস্রব থাকিতে পারে। অবশ্য ইহাদের সঙ্গে কোথাও কোথাও নিগ্রোবটুদের রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতে এক দীর্ঘমুণ্ড নর-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন। দক্ষিণভারতের অধিকাংশ লোকদের মধ্যে এবং উত্তরভারতের অপেক্ষাকৃত নিম্ন-শ্রেণীর জনগণের মধ্যে যে দীর্ঘ ও উন্নত মুণ্ডাকৃতি, সংকীর্ণ কপাল, খর্ব মুখ, উন্নত গণ্ডাস্থি, লম্বা ও উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত নাসা-মুখ, পুরু ঠোঁট, বড় মুখ-গহ্বর, কালো চোখ, পাতলা হইতে ঘনবাদামী গায়ের রঙ দেখা যায়, তাহা এই দীর্ঘমুণ্ড নর-গোষ্ঠীর দান। এই নর-গোষ্ঠীই ভারতের জন-প্রবাহে দীর্ঘমুণ্ড ধারার প্রবর্তক। কিন্তু ইহারা কখন কোথা হইতে কিভাবে ভারতে আসিয়াছিল, তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। আধুনিককালের বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্‌ ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ বলেন যে, এক সময় এই দীর্ঘমুণ্ড জাতির লোকেরা উত্তরআফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পরে নব্যপ্রস্তর যুগে ইহারা মধ্য ও দক্ষিণভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। এই-সব দেশের আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে ইহাদের রক্তের কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটে।

ইহা ছাড়া নৃতাত্ত্বিকগণ ভারতীয় জন-প্রবাহে আরো দুইটি দীর্ঘমুণ্ড জাতির অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। এই দীর্ঘমুণ্ড জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর নিম্নস্তরে প্রাপ্ত কতকগুলি কঙ্কাল হইতে। এই

জাতির একটির দেহ-গঠন ছিল সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, মস্তক বড়, ভ্রূ-অস্থি স্পষ্ট, কানের পিছনের অস্থি বৃহৎ। এই সব দেহ-বৈশিষ্ট্য পাঞ্জাবের দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও যোদ্ধজাতির মধ্যে এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ইহারা পাঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আর অগ্রসর হয় নাই বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় জাতিটির দেহ-গঠন প্রথমটির মতো সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নয় এবং ইহারা দৈর্ঘ্যেও একটু খর্ব, কিন্তু মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট, নাসিকা তীক্ষ্ণ ও উন্নত, কপাল ধনুকের মতো বাঁকা। ইহাদের মধ্যে সুমেরীয়, আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় প্রভৃতি ভূমধ্য-নর-গোষ্ঠীর দেহ-সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। অনুমান করা যায় যে হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর সভ্যতার ইহারাই স্রষ্টা। উত্তরভারতের সকল শ্রেণীর—বিশেষভাবে উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে এই দেহ-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ইহার কিছু অস্তিত্ব আছে। বাংলায় এই দীর্ঘমুণ্ড নরগণের প্রভাব সামান্য কিছু লক্ষিত হওয়া অসম্ভব নয়।

এই-সব দীর্ঘমুণ্ড জাতির প্রবাহে আর একটি জাতির ধারা আসিয়া মিশিয়াছিল। ইহারা গোলমুণ্ড জাতি। এই জাতির আদিম নিদর্শন হরপ্পা ও মহেন্-জো-দড়োতে প্রাপ্ত মুণ্ড ও কঙ্কাল হইতে পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠীর লোকেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে আল্পস্ পর্বতের নিকটবর্তী স্থানে, পামীর মালভূমি, তাকলামাকান মরুভূমি ও পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিত। ইহাদের মুণ্ড গোল ও মধ্যমাকৃতি, নাসার আকৃতি তীক্ষ্ণ, উন্নত ও মধ্যম-দৈর্ঘ্যসম্পন্ন এবং দেহের উচ্চতাও মধ্যম। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সাধারণভাবে এই গোলমুণ্ড মধ্যম দৈর্ঘ্য ও নাসাকৃতিবিশিষ্ট জনসমূহকে অ্যালপাইন জাতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বাঙালী-জাতি-গঠনে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের এবং জলাচরণীয় মধ্যম বর্ণের বা সৎ-শূদ্রদের গঠনে এই গোলমুণ্ড এবং মধ্যমাকৃতি জাতির দান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাঙালী জাতি আদি-অস্ট্রেলীয় ও এই অ্যালপাইন জাতির সমন্বয়ে মুখ্যতঃ গঠিত। অন্য জাতির রক্ত-ধারাও কিছু পরিমাণে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু সর্বজনীনভাবে তাহা জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত আলোচনা করিয়া ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন: "বাংলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় সমগ্র মূল রূপায়ণই প্রধানতঃ অ্যালপাইন ও আদি-অস্ট্রেলীয় এই দুই জনের লোকদের কীর্তি। পরবর্তীকালে আগত

আর্যভাষাভাষী আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তাহার উপরের স্তরের একটা ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র এবং এই প্রবাহ বাঙালীর জীবন ও সমাজ-বিন্যাসের উচ্চস্তরেই আবদ্ধ, ইহার ধারা বাঙালীর জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই।"[১৭২]

ইহার পরে ভারতে আসে সেই প্রচণ্ড শক্তিশালী জাতি, যাহারা পূর্বতন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে নবরূপে রূপদান করিয়া একটা বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি পত্তন করে। ইহারাই বৈদিক আর্য-জাতি। ইহারাই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা। ইহাদের নৃতত্ত্ব-সম্মত নাম হইতেছে আদি-নর্ডিক (Proto-Nordic)।

কোথায় ইহাদের বাস-স্থান ছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তবে একটা প্রধান মত এই যে, পূর্ব-ইউরোপের কোনো স্থানে ইহাদের আদি পিতৃভূমি ছিল। সেখান হইতে ইহারা—হয় মাসিডন ও থ্রেশিয়া এবং কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে এশিয়া-মাইনরের উত্তর ভাগ হইয়া, না হয় কৃষ্ণসাগরের উত্তরে দক্ষিণরাশিয়া হইয়া, ককেসস্ পর্বত পার হইয়া—প্রথমে মেসোপোটামিয়ায় আসে। সেখানে বাবিল ও আসিরীয় জাতি এবং অন্যান্য সুসভ্য জাতির সংস্পর্শে আসে, তাহার পর পারস্যদেশ হইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে বসতি স্থাপন করে। উত্তর-ইউরোপের নর্ডিক জাতির সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তবে জল-বায়ুর জন্য চুল ও চামড়ার রঙের প্রভেদ হইয়াছে। ইহাদের দেহ-বৈশিষ্ট্যর বিশেষ কোনো চিহ্ন ভারতে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে তক্ষশীলার ধর্মরাজিক বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে কয়টি নর-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ইহাদের দেহ ছিল দীর্ঘ, সুগঠিত, সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, নাসিকা উন্নত, মুণ্ড দীর্ঘ হইলেও অনেকাংশে গোল, নীচের চোয়াল দৃঢ়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, হিন্দুকুশ পর্বতের কাফীর প্রভৃতি জাতিরা, পাঞ্জাব ও রাজপুতানার উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ইহাদের বংশধর। তবে তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে কিছু মিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাঙালী জাতির মধ্যে এই রক্ত-ধারার ও দেহ-গঠন-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব নিতান্ত কম।

মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব বাঙালীর জাতি-গঠনে বিশেষ পড়ে নাই। ইহারা ভারতে আসিয়া ঐতিহাসিক যুগে, যখন বাংলাদেশ অস্ট্রিক, অ্যালপাইন প্রভৃতি

১৭২। বাঙালীর ইতিহাস—পৃঃ ৪৩।

জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে এবং উত্তর-ভারতের আর্য-ভাষা ও আর্য-হিন্দু-সভ্যতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের প্রভাব আসাম, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি স্থানেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। তবে বাংলায় চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো জাতির মধ্যে ইহাদের দেহ-বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

ইহাই বাঙালী জাতির দেহ-গঠন ও রক্ত-ধারার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নৃতত্ত্ব-পণ্ডিতগণের গবেষণার সারমর্ম।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভাষার দিক দিয়া বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ও জাতি-গঠনের উপাদানসমূহ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের গবেষণায় ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আসাম, মালয়, তাইলেঙ্, খাসিয়া, কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভীল, হো, ভূমিজ এবং নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা একই ভাষা-গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। এই ভাষা-গোষ্ঠীর নাম অস্ট্রিক ভাষা। অস্ট্রিক ভাষা এক সময় মালয়, আসাম, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, নিম্নব্রহ্ম, আসাম, সাঁওতাল-ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নৃতত্ত্ববিদেরা যাহাদিগকে আদি-অস্ট্রেলীয় বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাদেরই ভাষা অস্ট্রিক, ভাষার দিক হইতে তাহারাই অস্ট্রিক জাতি। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন: "এই ভাষার প্রভাব পাঞ্জাবের ভাষায়, উত্তর-কাশ্মীরের হুন্জা-নাগিরের বরুশাস্কি Barushaski ভাষাতে, এবং নেপালের নবাগত কতকগুলি ভোট-চীনা ভাষাতেও আছে; এবং মধ্য-ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর কেরলেও ইহাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, অস্ট্রিক জাতির লোকেরা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; উত্তরভারতে গঙ্গা তীরে প্রথমতঃ এই অস্ট্রিক জাতির লোকেরাই বাস করে; সেখানে ইহারা কৃষিমূলক একটি সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে। 'গঙ্গা' এই নামটা অস্ট্রিক ভাষার শব্দ বলিয়াই অনুমিত হয়। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি।"[১১৩]

ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আর্য-ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের উপর তাহাদের পূর্ববর্তী অস্ট্রিক ভাষার যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। অনেক অস্ট্রিক ভাষার শব্দ, হয় অবিকৃতভাবে, না হয় ছদ্মবেশে, সংস্কৃত ও প্রাকৃতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ঐ-সব ভাষার ব্যাকরণ-গত পদ-রচনার

১১৩। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—পৃঃ ১৪

ধারার মধ্যেও অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। এ-সব আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বাংলাভাষার উপর অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, বাংলায় কুড়ি ধরিয়া গণনা, পণ ধরিয়া গণনা অস্ট্রিক প্রভাব-জাত। বাখারি, বাদুড়, কানি (ছেঁড়া নেকড়া), ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, কলি (চুন), পেট, ঝোপ, ঝাড়, করাত, দা, পগার, বরোজ, লাউ, লেবু, কলা প্রভৃতি শব্দ অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর ভাষার। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থে (অষ্টম শতাব্দী) উল্লিখিত আছে যে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা 'অসুর'-ভাষা-ভাষী ছিল। "অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা।" এক রাঢ়দেশ ব্যতীত প্রায় সারা বাংলার লোকই 'অসুর'-ভাষা-ভাষী ছিল। এখনও কোল-মুণ্ডা-গোষ্ঠীর প্রধান ভাষার নাম 'অসুর'-ভাষা। ঐ 'অসুর'-ভাষা যে এক সময়ে বাংলায় বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। রাঢ়দেশেও যে অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল, তাহা অনুমান করা যায় জৈনদের 'আচারাঙ্গসূত্র' হইতে। 'বজ্জভূমি' ও 'সুব্ভভূমি'তে লোকেরা 'ছুছু' ('খক্খু') বলিয়া মহাবীরকে কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীতে কুকুরের প্রতিশব্দ হইতেছে—'ছক' (খমের), 'ছো' (আনাম)। ইহাতে কোনো কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন যে বাংলায় 'চু-চু', 'তু-তু' বা 'ছো-ছো' বলিয়া যে কুকুর-ডাকার রীতি আছে, তাহা অস্ট্রিক হইতে গৃহীত।

ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ প্রাগার্যজাতিগুলির মধ্যে অস্ট্রিক-ভাষী জাতির পর দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী জাতির উল্লেখ করেন। আধুনিক নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় দ্রাবিড় বলিয়া কোনো জাতির অস্তিত্ব নাই, দ্রাবিড়ভাষার নাম, নর-গোষ্ঠীর নাম নয়।

এখন কোন্ জাতি এই দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী? কোনো কোনো পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, আদি-অস্ট্রেলীয় জাতির আগমনের পর যে তিনটি দীর্ঘমুণ্ড জাতি পর পর ভারতে প্রবেশ করে, তাহাদের প্রথম ও তৃতীয় জাতির লোকেরা যে ভাষা-ভাষী ছিল, সেই ভাষা-গোষ্ঠীকে দ্রাবিড় ভাষা বলা যায়।

ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে মধ্যম দেহাকৃতি, দীর্ঘ মুণ্ড দেখা যায়, এই প্রথম দীর্ঘমুণ্ড জাতিই তাহার স্রষ্টা বলিয়া নৃতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ লোক এবং উত্তরভারতের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। দক্ষিণ ও মধ্যভারতেই ইহারা বিস্তৃতি লাভ করে এবং সে-সব স্থানে আদি-

অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে ইহাদের কিছু রক্ত-সংমিশ্রণও হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় দলের দীর্ঘমুণ্ড জাতি পাঞ্জাবের বাহিরে আর ব্যাপ্ত হয় নাই। তৃতীয় দীর্ঘমুণ্ড দল হরপ্পা, মহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানের প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা। ইহাদের সঙ্গে সুমেরীয়, আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় প্রভৃতি ভূমধ্য-নর-গোষ্ঠির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ইহারা ক্রমে ক্রমে উত্তরভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং শেষে সংখ্যা-বহুল অস্ট্রিক-ভাষীদের চাপে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ভারতে স্থান লাভ করে। ইহারাই বর্তমানে দক্ষিণভারতের তামিল-তেলেগু-মালায়লাম-ভাষীদের পূর্বপুরুষ বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতের সর্বত্রই দ্রাবিড়-ভাষী ও অস্ট্রিক-ভাষীদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং উভয়ে উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল বলিয়া অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন। তবে দাক্ষিণাত্যে ইহারা বহুকাল ধরিয়া ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতে বেলুচিস্থানের ব্রাহুই জাতির মধ্যে দ্রাবিড়-ভাষার অস্তিত্ব বজায় আছে। কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেন যে, গোলমুণ্ড অ্যালপাইন জাতির ভাষাও এই দ্রাবিড়-গোষ্ঠির ভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অ্যালপাইন ও ভূমধ্য-নর-গোষ্ঠী দ্রাবিড়-ভাষীদের দুইটি বিভিন্ন শাখা। তবে এইসব অনুমানের ভিত্তি অতি ক্ষীণ। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃতে এবং তাহা হইতে উৎপন্ন আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলিতে দ্রাবিড়-উপাদান ও প্রভাব সুস্পষ্ট। দেশের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গ্রাম-নগরের নামকরণে এইসব প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন: "এখন হইতে আড়াই হাজার বছর আগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষী লোকেরাই বাঙ্গালা দেশে বাস করিত, সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া তাহারা ছিল; দেশে তখন আর্য-ভাষা স্থাপিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।"[১৭৪]

মঙ্গোলীয় জাতির Tibeto-Chinese বা ভোট-চীনা ভাষার প্রভাব বাংলার উপর বিশেষ কিছু পড়ে নাই। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বলেন: "সংস্কৃতির দিক হইতেও বাঙ্গালী সংস্কৃতির গঠনে ভোট-চীন জাতির দান নগণ্য বলিয়াই মনে হয়।"[১৭৫]

বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বলেন: "মৌর্যযুগ থেকে

১৭৪। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—পৃঃ ১৭

১৭৫। ঐ —পৃঃ ১৮

আরম্ভ করে হিউ-এন-থ-সাঙের সময়—খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক—এই কয় শ' বছরের মধ্যে বাঙালী বলে একটা বিশিষ্ট জাতের সৃষ্টি হয়; অনার্য কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল, আর হয়তো কোনও অজ্ঞাত-ভাষাভাষী Longhead লম্বা মাথা, Alpine গোলমাথা, আর Mongol মোঙ্গোলদের যেন এক কড়ায় ঢেলে গালিয়ে নিয়ে আর্যভাষা, আর্যসভ্যতা, আর ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ আব জৈনধর্মের ছাঁচে ঢেলে আমাদের পূর্বপুরুষ এই আদি বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়।"[১৭৬]

বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিতে হইলে তাহার জাতি-গঠন ও ভাষা-গঠনের মূল উপাদানগুলি সম্বন্ধে একটু ধারণা প্রয়োজন বলিয়া আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিলাম। এখন আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপাদান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে অগ্রসর হওয়া যাক।

এই যে নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে দেখা গেল যে, ভারতে তথা বাংলায় বৈদিক আর্য-জাতির আগমন ও বসতি-বিস্তারের পূর্বে যে বিভিন্ন প্রবল অনার্য বা আর্যেতর জাতির বসবাস ছিল, সেই-সব অনার্য বা আর্যেতর জাতির কি ধর্ম ছিল, কি সংস্কৃতি ছিল, কি সভ্যতা ছিল, সে সম্বন্ধে মনে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন উঠে। এ বিষয়ে নানা পণ্ডিত নানা সময়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং বর্তমানে ইহা একরূপ স্বীকৃতই হইয়াছে যে, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিব ধারা এবং প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসের কাহিনীর পশ্চাতে অনেকখানি আর্যেতর জাতির প্রভাব রহিয়াছে। এই আর্যেতর প্রভাবকে কৌশলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিব অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। পূর্বে ভারতের যে সমন্বয়-প্রতিভার কথা বলা হইয়াছে, তাহার অত্যাশ্চর্য নিদর্শন পাওয়া যায় এই ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন:

"It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portjon in the fabric of Indian civilization, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history, is just non-Aryan translated in terms of the Aryan speech . . . . the ideas of *Karma* and transmigration, the practice of *Yoga,* the religious and philosophical ideas centring round the conception

১৭৬। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—পৃঃ ৫০-৫৪

of the divinity as Siva and Devi and as Vishnu, the Hindu ritual of *Pūja* as opposed to the Vedic ritual of *homa*,—all these and much more in Hindu religion and thought would appear to be non-Aryan in origin ; a great deal of Purāṇic and epic myth, legend and semi-history is pre-Aryan ; much of our material culture and social and other usages, e.g. the cultivation of some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like the tamarind and the coconut, etc., the use of betel-leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (the *dhoti* and the *sari*), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and turmeric—and many other things—would appear to be legacy from our pre-Aryan ancestors."[১১১]

প্রাগার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির একান্ত নির্ভরযোগ্য কোনো নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োতে প্রাগার্য ও প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার যে-ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে আমরা এই বৈদিক-আর্যেতর জাতির ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে পারি।

এই-সব স্থানে বৃক্ষ, পশু ও অন্যান্য চিত্র-অঙ্কিত অনেক মাটির সীল ও নারী-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি অদ্ভুত ধরণের পুরুষ-মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার তিনটি মুখ, নীচু একটা পীঠে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, প্রসারিত হস্তে বলয় ও বুকে নানা অলংকার। মাথায় লম্বা শিরস্ত্রাণ—তাহার মধ্য হইতে দুইদিকে দুইটা শিং বাহির হইয়াছে। তাহার দক্ষিণ হাতের কাছে একটি হাতী ও বাঘ, বাম হাতের কাছে একটি গণ্ডার ও মহিষ এবং পায়ের তলায় দুইটি হরিণ। এই চিত্র-ফলকের মাথায় সাতটি অক্ষরের একটি খোদিত লিপি বিদ্যমান।

এই ধ্বংসাবশেষ-আবিষ্কারের অন্যতম পরিচালক স্যর্ জন মার্শাল অনুমান করেন যে, সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা মাতৃ-দেবতা শক্তি ও পুরুষ-দেবতা শিবের উপাসক ছিল। এই পুরুষ-দেবমূর্তিকে তিনি শিবের মূর্তি বলিয়া

১১১। Indo-Aryan and Hindi —Dr. S. K. Chatterjee—Pages 31-32.

নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন যে, এখানকার অধিবাসীরা লিঙ্গ-পূজা, এবং পশু এবং বৃক্ষাদিরও পূজা করিত। ইহাদের শিব-শক্তির উপাসনা সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :

"In the religion of the Indus people there is much, of course, that might be paralleled in other countries. This is true of every prehistoric and of most historic religions as well. But, taken as a whole, their religion is so characteristically Indian as hardly to be distinguished from still living Hinduism or at least from that aspect of it which is bound up with animism and the cults of Śiva and the Mother Goddess —still the two most potent forces in popular worship."[১৭৮]

প্রথমে কেহ কেহ মার্শালের নির্ণীত শিব-মূর্তি সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী অনেক গবেষক মার্শালের মতবাদ মানিয়া লইয়াছেন। মাদ্রাজের নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মার্শালের অভিমত সম্বন্ধে বলেন :

"While Marshall's explanations appear conclusive in regard to the cult of the Mother Goddess, the phallic cult and ie tree and animal cults, his speculations on the male God, 'ho, he thinks, was prototype of the historical Śiva, are rather forced . . . . . not so convincing as the rest of the chapter. It is difficult to believe on the strength of a single 'roughly carved seal' that all the specific attributes of Śiva as *maheś, mahā-yogin, paśu-pati,* and *dakṣinā-mūrti* are anticipated in the remote age to which the seal belongs."[১৭৯]

কিন্তু ফাদার হেরাস (Father Heras), জ্যাক ফিনিগান (Jack Finegan) ও অন্যান্য পণ্ডিত এই মূর্তিকে যোগী শিব বলিয়াই নির্ধারণ করিয়াছেন। ফাদার হেরাস খোদিত চিত্র-বিচিত্র লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা শিব-শক্তির উপাসক ছিল।

১৭৮। Mohenjo Daro and Indus Civilisation—Sir John Marshall (Preface)—(pages v-vii).

১৭৯। Cultural Heritage of India—Vol. II—Page 21.

এই জাতি ছিল দ্রাবিড় জাতি। 'ইরুবন' ('যাহার অস্তিত্ব আছে') কথাটি হইতে ভগবানের স্বয়ং-সত্তা বুঝা যায়। পুরুষ-দেবতা 'আন্'-এর যোগ-ধ্যানস্থ মূর্তি দেখিয়া শিবের সহিত তাহার সাদৃশ্য বেশ বুঝা যায়। স্ত্রী-দেবতা 'অম্মা' বলিয়া কথিত; ইনিই শক্তি। দ্রাবিড় ভাষায় 'অম্মা' শব্দের অর্থ 'মা'। সুপ্রাচীন সিন্ধুদেশ-বাসীর এই লিঙ্গ-পূজা-অর্থে শিব ও শক্তির—পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের প্রতীক-পূজা বুঝায়। প্রাগৈতিহাসিক মহেন্-জো-দড়োর সঙ্গে বর্তমান দ্রাবিড়দেশের একটা যোগ-সূত্র আছে অনুমান করিয়া হেরাস বলিতেছেন :

"Before ending we must refer to another link still existing from those ancient days between Mohenjo Daro and Karnāṭaka. The modern Lingāyats of the Kannada country depict a sign on the walls of their houses, the meaning of which does not seem to be known to them. The sign is X. This sign is often found in the inscriptions of Mohenjo Daro. It reads *Kudu* and means 'Union'. The sign very likely refers to the union of male and female principles which is so prominent in the religious tenets of the Vira-Śaiva sect." [১৮০]

আধুনিক আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফিনিগান বিচার করিয়া মার্শালের 'শিব-শক্তি'-অনুমানকে সম্ভাব্য অনুমান ("plausible guess") বলিয়াছেন।[১৮১] ভাষা-তত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, যোগী ও পশুপতি শিব এবং উমার দেবত্ব-কল্পনা মূলতঃ দ্রাবিড়-ভাষী জাতির দান।[১৮২] ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন যে, শিব ও উমার দেব-দেবী-কল্পনার সহিত

১৮০। The Religion of Mohenjo Daro People according to the Inscriptions—Heras— (**Journal of the University of Bombay, V. Part I —Page 3**).

The Karnatak Historical Review, July, 1937.

১৮১। **The Archaeology of World Religions**—Jack Finegan (Published by Princeton University Press, 1952)—Pages 125-622.

১৮২। **Indo-Aryan and Hindi**—Dr. S. K. Chatterjee—Page 44.

এশিয়া-মাইনরের 'তেস্থপ-হেপিট' (Tesup-Hepit) বা 'মা-অথিস' (Ma-athis) ধর্মের সাদৃশ্য আছে।[১৮৩]

মহেন্-জো-দড়োর শিব-শক্তি-পূজা ও লিঙ্গ-পূজার পশ্চাতে প্রাচীনকালের ধর্মের একটি রহস্য বর্তমান। এক আদি-দেব ও আদি-দেবী এবং তাঁহাদের পতি-পত্নীত্ব-কল্পনা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন যুগের লোকেরা পার্থিব নর-নারীর সম্বন্ধ ও আচার-ব্যবহার দেব-দম্পতির উপর আরোপ করিত। একজন ছিল জনক, অপর জনয়িত্রী,—সাধারণ নর-নারীর মতো তাহাদের মিলনের পরিকল্পনাও স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন লোকদের মনে উদিত হইয়াছে। এই মিলন-কল্পনা হইতেই আদি দেব-দেবীর উৎপাদক ইন্দ্রিয়ের—লিঙ্গ-যোনির পূজাও চলিয়া আসিয়াছে। ধর্মের সঙ্গে দেব-যুগলের যৌনমিলনের একটা কল্পনা আদিম যুগেও বর্তমান ছিল। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা বহু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হইবে:

"Two causes must have forcibly struck the minds of men in those early periods when observant of the operations of ature, one the generative power, and the other productive, he active and the passive causes. This double mode of production visible in nature must have given rise to comparisons with the mode of proceeding in a generation of animals, in which two causes concur, the one active and the other passive, the one male and the other female, the one as father and the other as mother.* These ideas were doubtless suggested independently and spontaneously in different countries, for the human mind is so constituted that the same object and the same operations of nature will suggest like ideas in the minds of men of all races, however widely apart.

১৮৩। Prototypes of Siva in Western Asia—Dr. H. C. Roychowdhury (D. R. Bhandarkar Volume, The Indian Research Institute, Calcutta, 1940—Pages 301-304).

"Nature to the early man was not brute matter, but a being invested with his own personality and endowed with the same feelings, passions, and performing the same actions. He could only conceive the course of nature from the analogy to his own actions. Generations begetting—production, bringing forth—were thus his ideas of cause and effect. The earth was looked up as the mould of nature, as the recipient of seeds, the nurse of what was produced into its bosom, the sky was the fecundating and fertilizing power. An analogy was suggested in the minds of the male and female. These comparisons are found in ancient writers. 'The sky', says Plutarch, 'appeared to men to perform the functions of a father, as the earth those of a mother. The sky was the father, for it cast seed into the bosom of the earth, which in receiving them became fruitful and brought forth, and was the mother.' . . .

"These ideas bear a prominent part in the religious creeds of several nations.

"In Egypt the Deity or Principle of generation was Khe called 'the father'—the abstract idea of father ; as the goddess Maut was that of mother. . . . . In the Śaiva Puran of the Hindoos . . . . . Purusha (the generative and male principle). . . . . Prakriti (the productive or female principle). . . . .

"Among the Assyrians, the Supreme God Bel was styled 'the procreator', and his wife, the goddess Mylitta, represented the productive principle of nature and received the title of the queen of fertility. . . . . . In Phoenician mythology Ouranos (Heaven) weds Ghe (the earth) and by her becomes father of Oceanus . . . . . and other gods. . . . . In conformity with the religious ideas of the Greeks and Romans Virgil describes the products of the earth as the result of the conjugal act between Jupiter (the sky) and Juno (the earth). . . .

"It is thus evident that the doctrine of the reciprocal principles of nature or nature active and passive, male and female, was recognised in nearly all the primitive religious systems of the old as well as the new world. . . .

"The Phallas and the Cteis, the Lingam and the Yoni—the special parts contributory to generation and production, becoming thus symbols of those active and passive causes, could not but become objects of reverence and worship.

"Evidence that this worship extensively prevailed will be found in many countries, both in ancient and modern times. It occurs in ancient Egypt, in India, in Syria, in Babylon, among the Assyrians, in Persia, Greece, Italy, Spain, Germany, Scandinavia and among the Gauls."

(The Influence of the Phallic Idea in the Religions of Antiquity—Ancient Symbol Worship—By H M. Westropp. Pages 23-29).

আর একজন পণ্ডিতও বলেন যে, প্রাচীন কালের ধর্মের সঙ্গে মানুষের কামপ্রবৃত্তির একটা অপরোক্ষ সম্বন্ধ ছিল :

"The pleasure principle associated with the sex act, therefore, looming so large in the ideology of all savage and primitive races, was naturally supposed to be equally pleasurable to the gods. Religious rites and ceremonies of all primitive races give clear indications of these connections and deductions." (Phallic Worship—George Ryley Scott—Page 46).

ইনি আরো বলেন :

"Even in its purely metaphysical aspects religion is indelibly and closely associated with sex. The connection between eroticism and the mysticism which is so intimate a feature of the higher and more esoteric forms of religious feeling is specially pronounced. . . . . The attempts to ignore the place of sex in religion on one hand, and to deny any connection

between the two on the other, are equally childish. . . . . ."
(Pages 1—11).

যৌনক্রিয়া ধর্মের অঙ্গীভূত হওয়ার কারণ এই যে, প্রাচীন কালের লোকেরা প্রজনন-ক্রিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্ময় ও ভয়-বিমিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিত। এ সম্বন্ধে একজন লেখক বলেন :

"We are here taken to the root of all religions—awe at the mysterious and unknown. That which the uncultered mind cannot understand is viewed with dread or veneration . . . . the object presenting the mysterious phenomena may itself be worshipped . . . . . there is nothing more mysterious than the phenomena of generation and nothing more important than the delight of the sexual act and the final result of the generative operation . . . . ."

(**Influence of the Phallic Idea in the Religions of Antiquity—C. Stamland Wake—Page 34**).

অন্য একজন লেখক বলেন :

"It is not at all surprising that primitive man finds something mysterious and divine in procreative power. Schopenhauer tells us that the sexual impulse manifests 'Nature's inmost being, and the strongest will to life'; while such old Greek poets and thinkers as Hesiod and Parmenides call Eros the Origin, the Creator, the Principle from which all things emerge. Many other nations deify the sexual impulse in this way—and Romans not least among them.

". . . . In antiquity, especially in Greece and Rome, the generative power was regarded quite ingenuously as the creator of new life and so as something deserving honour and worship. . . ."

Sexual Life in Ancient Rome—Otto Kiefer, Chapter III—Page 107.

আমরা দেখিলাম, পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন ধর্মেই যৌন-প্রসঙ্গের নিকট সম্বন্ধ ছিল এবং আদি-মাতৃদেবী ও আদি-পিতৃদেবের এবং তাঁহাদের প্রতি-

পত্নীদের কল্পনা পাওয়া যায়। আদি-দেব বা ভগবানের এই পত্নী-সম্মিলিত অবস্থার কথাই জনসাধারণের মনে প্রথম উদিত হইয়াছিল। তদনুসারে সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনকেও আমরা ঐ প্রাচীন পিতামাতৃদেববাদের একটা রূপ বলিতে পারি।

এই সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার স্ত্রী ও পুরুষ-দেবতার পূজা এবং লিঙ্গ-পূজা খুব সম্ভব পরবর্ত্তী কালে বৈদিক আর্য-মানসের ধ্যান-ধারণার সহিত যুক্ত হইয়া প্রায় সকল ভারতীয় ধর্ম-শাখার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পরবর্তী শিব-শক্তিবাদ, বা পুরুষ-প্রকৃতিবাদ, ধর্ম-সাধনায় স্ত্রীর প্রয়োজন ও স্ত্রী-পুরুষের মিলনের বীজ নিহিত আছে আর্য-পূর্ব যুগের গণ-মনের এই ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে।

আর্যেতর জাতির এই ধর্ম-বিশ্বাস কি ভাবে বৈদিক আর্যগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার সূত্রটি ধরিবার চেষ্টা করা যাক।

আর্য-পূর্ব ভারতের আদিম অধিবাসীদের কতকগুলি মানসিক সংস্কার, ধর্ম-বিশ্বাস ও প্রচলিত রীতি-নীতি যে আর্যগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ, বিজিত দেশের অধিবাসিগণের দ্বারা বহুদিন পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হইলে নানা কারণে তাহাদের সংস্রব এড়াইয়া যাওয়া কঠিন হয়। তখন সেই প্রভাবের আর্যীকরণের চেষ্টা চলিয়াছে। আর্যদের প্রাচীন ধর্ম-গ্রন্থ বেদে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। আর্যেরা নানা দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র-পাঠ, হোম ও ব্যাপক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও নিজেদের বিশুদ্ধ ধর্মকে আর্যেতর প্রভাব-মুক্ত রাখিতে পারে নাই।

মন্ত্রে বিশ্বাস, বশীকরণ-মন্ত্র, ভূত-প্রেত-অপদেবতার দৃষ্টি-নিবারণ, অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা সকলের উপর প্রভাব-বিস্তারের চেষ্টা প্রভৃতি প্রাথমিক ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ। বৈদিক আর্যগণ এই স্তরের মানসিকতার ঊর্ধ্বে ছিল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, আদি-ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের মধ্যেও ইহার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। দস্যুগণ কর্তৃক গৃহস্থদের ঘুম পাড়ানর মন্ত্র,[১৮৪] স্ত্রীলোকদের গর্ভপাত নিবারণ মন্ত্র,[১৮৫] রোগ-দূরীকরণ মন্ত্র,[১৮৬] সপত্নী-বিনাশ ও পতি-বশীকরণ-মন্ত্র,[১৮৭] প্রভৃতি এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এইরূপ অনেক মন্ত্র আছে। তাহাতে মনে হয়, প্রার্থনা, যজ্ঞ প্রভৃতি ছাড়াও পুরোহিতেরা মন্ত্র ও ইন্দ্রজাল

১৮৪। ঋগ্বেদ—৭, ৫৫।

১৮৫। ঋগ্বেদ—১০, ১৬২।

১৮৬। ঋগ্বেদ—১০, ১৬৩।

১৮৭। ঋগ্বেদ—১০, ১৪৫ ও ১৫৯।

প্রভৃতির ব্যবহার দ্বারা দেবতাদিগকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিত।[১৭৮] তৈত্তিরীয় সংহিতায় 'সাংগ্রহণী' নামে এক ইষ্টির বিবরণ আছে—তাহা একপ্রকার বশীকরণ-ক্রিয়ার তুল্য।[১৭৯] ইহা আদিম আর্যেতর জাতির প্রভাব বলিয়া মনে হয়। ইহার অনেক পরবর্তী যুগে এই প্রভাব নানা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে প্রবল হইয়া আর্য-জীবনের একপ্রকার অঙ্গীভূত হইয়াই অথর্ববেদে প্রকাশ পাইয়াছে। অথর্ববেদের সময়ে আর্যেতর আদিম অধিবাসীদের ধর্ম-বিশ্বাস, তন্ত্র-মন্ত্র ও যাদু-বিদ্যার উপর আস্থা প্রভৃতির সহিত আর্য-ধর্ম-বিশ্বাসের মিলন-সাধন করা হইয়াছে। এই হিসাবে অথর্ববেদের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এখানে আমরা দেখি যে, আর্যেতর জাতির পূজিত দেবতা-অপদেবতাকে গ্রহণ ও তাহাদের সংস্কার বা কুসংস্কারকে অনেকখানি মানিয়া লইয়া একটা আপোষ-রফা করা হইয়াছে। সেইজন্য বোধ হয় অথর্ববেদ অনেকদিন বেদ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

আর্যেতর জাতির যে-ধর্ম-বিশ্বাসটি আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেটি হইতেছে একটি আদিম স্বর্গীয় যুগলে বিশ্বাস—বা শিব-শক্তিবাদ। সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতায় ইহার যে বীজ নিহিত ছিল, পরবর্তী কালে তাহা আর্য-মানসের কল্পনা ও আবেগের রসে অঙ্কুরিত হইয়া, নানা বহু-বিচিত্র ধর্ম-বৃক্ষে পরিণত হইয়া ভারতের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে।

দেবী ব্যতীত দেবের পূর্ণরূপ প্রকটিত হয় না। দেবীই মূলতঃ শক্তির আধার। নারীই 'শক্তি'। এই নারী মহাবল-ধারিণী, নানা ঐশ্বর্য-প্রদর্শনকারিণী, বিশ্ব-প্রসবিনী। দেব এই শক্তি-সমন্বিত হইলেই প্রকৃত দেবপদবাচ্য হন। দেবী ব্যতীত দেব মূল্যহীন—'শক্তি' ব্যতীত শিব 'শব'। যাঁহাকে পরমতত্ত্ব বা ঈশ্বর হিসাবে এক ধরা যায়, তাঁহার মধ্যেই দুইটি সত্তা আছে—দুইটি খণ্ড আছে,—একটি দেব-সত্তা, অপরটি দেবী-সত্তা—যেন একটি পুরুষ-খণ্ড অপরটি নারী-খণ্ড। এই উভয় সত্তা বা খণ্ডের মিলনেই তাঁহার পূর্ণ রূপ। শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইলেই শিব যথার্থ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন—তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হয়। এই ধারণাটি, যাহাকে 'শিব-শক্তিবাদ' বা 'পুরুষ-প্রকৃতিবাদ' বলা যায়, পরবর্তী কালে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম, বাংলার বাউল-ধর্ম প্রভৃতির

১৭৮। An Outline of the Religious Literature of India—Farquhar—Page 21.

১৭৯। তৈত্তিরীয় সংহিতা—২।৩।৯।১

মধ্যে তাহা অনুস্যূত হইয়াছে এবং নানা তন্ত্র ও পুরাণাদির উপর তাহা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতে ধর্মের ইতিহাসে এই শিব-শক্তিবাদ বা পুরুষ-প্রকৃতিবাদ বা এক অদ্বয় সত্যের অন্তর্লীন দ্বৈতরূপ বা দ্বৈতসত্তা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং আর্য-মনের দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহিত যুক্ত হইয়া কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্মের ভিত্তি পত্তন করিয়াছে।

পুরুষ-দেবতার দেবী বা 'শক্তি'-সমন্বিত হওয়ার কল্পনা ভারতীয় মনে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ একটু লক্ষ্য করিলেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। শিবের শক্তি বা পত্নী উমা, পার্বতী বা দুর্গা, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, রামের সীতা, কৃষ্ণের রাধা—যুগলরূপের এই নিদর্শন গুলি তো আমরা ভারতের কয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের মধ্যেই পাইতেছি। হিন্দুর সকল ধর্ম-কর্মে সর্বাগ্রে পূজ্য গজানন মহাগণেশের শক্তি-আলিঙ্গিত মূর্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২০] তাহা ছাড়া পুরাণগুলিতে নানা পুরুষ দেবতার শক্তি বা পত্নী কল্পিত হইয়াছে, যেমন ইন্দ্রের শচী, চন্দ্রের রোহিণী, বায়ুর স্বস্তি, অগ্নির স্বাহা, সূর্যের সংজ্ঞা, মদনের রতি, যমের ক্ষমা, বৃহস্পতির তারা ইত্যাদি। মোট কথা, এই শিব-শক্তিবাদ ভারতীয় ধর্মে ও দার্শনিক চিন্তায় জনগণের মনে গভীরভাবে শিকড় গাড়িয়াছে।

ঋগ্বেদের মধ্যে তন্ত্র-মন্ত্রের কয়েকটি নিদর্শন ছাড়াও শক্তিবাদের একটি বীজ নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। বেদে পুরুষ-দেবতারই প্রাধান্য বেশি। দেবগণের মাতা অদিতি দেবীর একটি সম্মানের স্থান বেদে আছে বটে, কিন্তু ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, অগ্নি প্রভৃতির মতো তিনি পূজিত হন নাই। সরস্বতী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবীগণের স্থানও নগণ্য। কিন্তু দশম মণ্ডলের বাগম্ভৃণী সূক্তটিতে[১২১] দেখা যায়, অম্ভৃণ ঋষির বাক্‌-নাম্নী কন্যা আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব অনুভব করিতেছেন এবং জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া সকল কার্যের মূল-রূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া নিজের মহিমা কীর্তন করিতেছেন। মূলতঃ ইহা আত্ম-রূপী ব্রহ্মের মহিমা-কীর্তন হইলেও ইহা যে এক বিশ্বব্যাপিনী শক্তির লীলা এবং বিশেষভাবে এক নারী-শক্তির লীলা, সেইটাই যেন বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। শক্তি অবশ্য ব্রহ্মেরই অন্তর্নিহিত, কিন্তু সেই শক্তিকে

১২০। **Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems—R. G. Bhandarkar—Page 213.**

১২১। ঋগ্বেদ—১০।১২৫।

শক্তিমান্‌ হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র সত্তা-রূপে তাঁহার মহিমা কীর্তিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী কালে তন্ত্রাদির দার্শনিক প্রতিষ্ঠা-ভূমি যে শক্তিমান ও শক্তির মূলতঃ অভেদত্ব সত্বেও অভেদে ভেদ কল্পনা করিয়া শক্তির প্রাধান্য-প্রদর্শন, তাহারই একরূপ আদি-বীজ এই সূক্তটি বলিয়া মনে হয়। এই সূক্তটিকে দেবী-সূক্ত-নামেও অভিহিত করা হয় এবং ইহাই ভারতীয় শক্তিবাদের মূল উৎস বলিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত শক্তি-অংশ বা নারী-অংশের প্রাধান্য আর্যেতর প্রভাব বলিয়া বর্তমান অনেক পণ্ডিতের ধারণা।[১৯২]

পরবর্তী সময়ের অথর্ববেদে আর্যেতর প্রভাব অবশ্য অনেক বেশি—তখন আর্যগণ আর্যেতর জাতির ধর্ম-বিশ্বাস ও তাহাদের দেবতাদিগকে অনেকখানি গ্রহণ করিয়াছে। অথর্ববেদের একটি সূক্তকেও দেবীসূক্ত বলা যায়।[১৯৩] সর্বভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ইন্দ্র-জননী বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। মনে হয়, ইহাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যের প্রাচীন রূপ।

উপনিষদের যুগে আর্য-মনের দার্শনিক চিন্তা অনেক সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে, অধ্যাত্ম-উপলব্ধি অনেক গভীর হইয়াছে, একেশ্বরবাদ, পরমাত্মবাদ বা আত্মবাদ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। সুতরাং উপনিষদের মধ্যে যে চিন্তা-ধারা দেখা যায়, তাহা আর্য-মনের চিন্তা বলিয়া ধরিতে পারা যায়। ইহার মূলে অন্য প্রভাব থাকিলেই, ইহা নিঃসন্দেহে আর্যীকৃত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক। এই যে এক পরমতত্ত্বের দ্বিধা-বিভক্তি, ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত যুগলসত্তা, শক্তিমান্‌ ও শক্তির অভেদত্ব, যাহা আমরা পরবর্তী যুগে বিভিন্ন ধর্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখি, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ও নির্দিষ্ট রূপ আমরা 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে পাই :

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ..."

"স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ; স ইমমেবাত্মানাং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং।"[১৯৪]

১৯২। Pre-Vedic Elements in Indian Thought—Dr. C. K. Raja (**History of Philosophy, Eastern and Western,** Vol. I, *Education Ministry*, Govt. of India—Page 33).

১৯৩। অথর্ববেদ—৬।৩৮।

১৯৪। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—১।৪।

"প্রথমে সেই আত্মা একাকী ছিলেন···তিনি কখনো রমণ করিতে পারেন নাই, কারণ কেহই একাকী রমণ করিতে পারে না, তিনি দ্বিতীয় কাহাকেও (স্ত্রী) কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মভাব যেন স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর গভীর আলিঙ্গিত একটি মিথুনীভূত ভাব। এইরূপ ভাবাপন্ন নিজেকে তিনি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহার একভাগ পুরুষ আর একভাগ স্ত্রী—পতি ও পত্নী।" (মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত শঙ্করভাষ্য-সম্বলিত-অনুবাদ)

মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মাই ব্রহ্ম, ইহাই উপনিষদের মূলবাণী।[১৯৫] এই আত্মা বা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের যে এক অদ্বয় সত্তা, তাহা একটি মিথুনীভূত সত্তা—স্ত্রী-পুরুষের এক মিলনাত্মক সত্তা। এই মিলনাত্মক নিত্যানন্দময় সত্তাই তাঁহার স্বরূপ।

তাহা হইলে এই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মধ্যে তিনটি অবস্থা বা সত্তা নিহিত,—একটি পুরুষ-সত্তা ভোক্তারূপে, অপরটি স্ত্রী-সত্তা ভোগ্যরূপে, আর একটি উভয়ের মিলন-জাত একীভূত আনন্দময় সত্তা।

এই আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ যে আনন্দময়, তাহা উপনিষদের অনেক উক্তিতে পাওয়া যায়:

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"[১৯৬]

আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ হইতেই এই প্রাণিসমূহ জন্মগ্রহণ করে, আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে এবং আনন্দে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে।

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।"[১৯৭]

তিনিই রস-স্বরূপ। জীব এই রস-স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই সুখী হয়। যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ না থাকিতেন, তবে কে বা আপন চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণন-কার্য করিত। অর্থাৎ কেহই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিত না।

১৯৫। A History of Indian Philosophy I—Dr. S. N. Dasgupta—Page 46.

১৯৬। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—৩।৬।

১৯৭। ঐ —২।৭।

আত্মার পুরুষ-নারীভাবে দ্বি-সত্তা ও এই দুই সত্তা বা খণ্ডের একটি সম্মিলিত পরমানন্দময় সত্তা—এই ঔপনিষদিক তত্ত্ব বা কল্পনা বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য লইয়া শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ তান্ত্রিক এবং বাংলার বাউলদের সাধনার মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত ধর্মসাধনার বীজও মনে হয় এইখানেই নিহিত। উপনিষদের এই তত্ত্ব-কল্পনার মধ্যে প্রধানতঃ বজ্রযান-বৌদ্ধ-সাধনা ও বাউল-সাধনার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। সাধারণ মানুষের কল্পনা ও বিচার-বুদ্ধিতে ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত তত্ত্বাংশ—এই আদিতম স্ত্রী-পুরুষবাদ—সংসারের নরনারীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া একটা সমগ্র মানবিক তত্ত্বাংশে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যে-তত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সেই তত্ত্বই পার্থিব নর-নারীর সম্বন্ধেও কল্পিত হইয়াছে এবং তাহাদের মিলিত অদ্বয় সত্তাই সাধনার উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহারই পরিণতিতে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের 'যুগনদ্ধ' এবং বাংলার বাউলদের 'যুগল-মিলন' মানবাত্মার আনন্দময় সত্তার স্বরূপ-উপলব্ধির ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের আরো কতকগুলি অংশ আছে, যেগুলিকে আমাদের বাউল-ধর্মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মূল উৎস-রূপে ধরা যায়।

বাউলরা স্ত্রী-শক্তির প্রতীক হিসাবে 'রজঃ'কে এবং পুরুষ-শক্তির প্রতীক হিসাবে 'বীজ'কে গ্রহণ করে। দেহের অভ্যন্তরে ও দেহের বাহিরেও তাহারা এই দুই বস্তর মিলনের চেষ্টা করে। এ বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বীজকে তাহারা হৃদয়-বিহারী পরমাত্মা-রূপে গণ্য করে। ইহাই তাহাদের 'অটল মানুষ'। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদিগের যাহা 'বোধি-চিত্ত', বাউলদের তাহাই 'অটল মানুষ'।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখি বীজ 'অমৃত' বা 'অবিনাশী আত্মা' বা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"যো রেতসি তিষ্ঠন্ রৈতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো…"[১১৮]

"যিনি রেতে অর্থাৎ উৎপাদনশক্তিতে আছেন, অথচ রেতের অন্তর, রেত যাহাকে জানে না, রেত যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতের সংযমন

১১৮। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—৩।৭।

করিয়া থাকেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা।" (মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-কৃত শঙ্কর-ভাষ্য-সম্মত অনুবাদ)

ধর্ম-সাধনে যে প্রকৃতি-সেবার প্রথা হিন্দু ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের ও অন্যান্ত কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে, মনে হয়, তাহারও বীজ এই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্তমান। 'মন্থ-কর্ম' বা মৈথুন যে একপ্রকার উপাসনার অঙ্গীভূত, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :

"এষাং বৈ ভূতানি..." ইত্যাদি[১৯৯]

"পৃথিবীই এই স্থাবর-জঙ্গম ভূতবর্গের রস অর্থাৎ সারভূত ; কারণ, পৃথিবীই উহাদের দেহোপাদান ; জল আবার পৃথিবীর সার ; কারণ, জল হইতেই পৃথিবীর জন্ম ; জলের সার আবার ওষধি—তৃণ-লতাসমূহ ; ওষধির সার হইতেছে পুষ্পসমূহ ; পুষ্পের সার ধান্য-যবাদি ফলসমূহ ; ফলের সার পুরুষ ; কেন না, পুরুষের দেহ অন্নময় ; পুরুষের সার আবার শুক্র ; কারণ, উহা পুরুষের সর্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে।"

"স হ প্রজাপতিরীক্ষাঞ্চক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি, স স্ত্রিয়ং সসৃজে..." ইত্যাদি[২০০]

["অতঃপর সর্বভূতের সারভূত শুক্রের আধান-পাত্র-নির্মাণের প্রণালী কথিত হইতেছে] সেই প্রজাপতি (বিধাতা) উক্ত রেতের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন,—ভাল, ইহার (রেতের) প্রতিষ্ঠা বা আধান-পাত্র নির্মাণ করিব ; তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন ; সেই স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া নীচে রাখিয়া উপাসনা (মিথুন ব্যাপার) করিয়াছিলেন ; সেই হেতু এখনও স্ত্রীকে অধে রাখিয়াই উপাসনা করিবে। সেই প্রজাপতি নিজেরই স্পন্দমান এই পাষাণ-তুল্য পুংচিহ্নটি [স্ত্রী চিহ্নে] পূরণ করিয়াছিলেন ; তিনি সেই প্রকারেই স্ত্রীসংসর্গ করিয়াছিলেন।" (মঃ হঃ সিঃ-কৃত শঙ্করভাষ্য-সম্মত অনুবাদ)

বৃহদারণ্যকের আর একটি শ্রুতি-বচনে আছে যে, যজ্ঞ-ক্রিয়া-রূপ ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যে ফললাভ হয়, সেইরূপ মৈথুন-ক্রিয়াতেও যজ্ঞানুষ্ঠানের মত ফল-লাভ হয়।

"তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি..." ইত্যাদি[২০১]

"স্ত্রীর উপস্থটিকে (জননেন্দ্রিয়কে) বেদী [বলিয়া চিন্তা করিবে], লোমসমূহকে

১৯৯। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—৬।৪।
২০০। ঐ —৬।৪।
২০১। ঐ ঐ

কুশ বলিয়া, চর্মকে [চর্ম বলিয়া] এবং মুষ্কদ্বয়কে (উভয়পার্শ্বের স্থূল মাংসখণ্ড দুইটিকে) অধিষবণদ্বয় (সোম-পেষণের পাষাণখণ্ড দুইটি) [বলিয়া চিন্তা করিবে]। যজমান্ (যাজ্ঞিক পুরুষ) বাজপেয় যাগের দ্বারা যে-পরিমাণ লোক বা ফল প্রাপ্ত হন, যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষেরও সেইরূপ ফল-লাভ হয়। [অতএব এ বিষয়ে ঘৃণা বা কুৎসা করিতে নাই]।"

(মঃ হঃ সিঃ-কৃত শঙ্করভাষ্য-সম্মত অনুবাদ)

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, 'বামদেব্য' সামোপাসনা বলিয়া একপ্রকার উপাসনা প্রচলিত ছিল। উহাতে মৈথুন ও পরদার-গ্রহণ কর্তব্য কর্ম ছিল।

"স য এবমেতদ্বামদেব্য মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে। সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা। ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতম্।"[২০২]

"যে-কোনো ব্যক্তি মিথুন-প্রতিষ্ঠ এই বামদেব্য সামকে যথোক্তপ্রকারে অবগত হন, তিনি বিরহকাতর হন না, প্রত্যেক মিথুনেই সন্তান উৎপাদন করেন। সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করেন, উজ্জ্বল জীবন প্রাপ্ত হন, সন্তান ও পশু দ্বারা মহান্ হন, এবং কীর্তিতেও মহান্ হন; কোনও স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই তাহার ব্রত।" (মঃ হঃ সিঃ-কৃত শঙ্করভাষ্য-সম্মত অনুবাদ)

"—ন কাঞ্চন পরিহরেৎ" এই বাক্যাংশের শাঙ্কর ভাষ্য এইরূপ: "ন কাঞ্চন, কাঞ্চিদপি স্ত্রিয়ং স্বাত্মতল্পপ্রাপ্তাং ন পরিহরেৎ সমাগমার্থিনীম্। বামদেব্য-সামোপাসনাঙ্গত্বেন বিধানাৎ।"

"সঙ্গমার্থ আপনার শয্যায় সমাগত কোন স্ত্রীকেই পরিহার বা উপেক্ষা করিবে না, কারণ, ইহা বামদেব্য সামোপাসনার অঙ্গরূপে বিহিত।" (মঃ হঃ সিঃ-কৃত শঙ্করভাষ্য-সম্মত অনুবাদ)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও দেখা যায় যে মৈথুন-কর্মকে যজ্ঞকর্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

"যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্‌যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চির্য-দন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।"

স্ত্রী অগ্নি, উপস্থ সমিধ, রতিসম্ভাষণ ধূম, যোনি শিখা, সঙ্গম অঙ্গার ও আনন্দ বিস্ফুলিঙ্গ। (৫।৭।১)

২০২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ—২।১৩।

ঐতরেয় উপনিষদেও দেখা যায় রেতঃকে আত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

"পুরুষে বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি। যদেতদ্রেতস্তদেতৎ সর্বেভ্যোঽঙ্গেভ্য-স্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্তি......।"

এই আত্মা প্রথম হইতে পুরুষের শরীরে বীজরূপে থাকেন। এই যে রেতঃ, ইহা সমুদায় অঙ্গ হইতে সংগৃহীত তেজ, এই রেতঃরূপ আত্মাকে পুরুষ নিজ শরীরে ধারণ করে। (২।১)

ধর্মের সঙ্গে যৌন ব্যাপারের সম্বন্ধকে আমরা প্রাচীন আর্যেতর জাতির প্রভাব-নিদর্শন বলিয়া ধরিলেও উপনিষদের যুগে এ-প্রভাব আর্য-ধর্ম-সংস্কৃতির সহিত মিশিয়া এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছিল বলিতে হইবে। উপনিষদের সময় হইতেই এই প্রভাব কতকগুলি ভারতীয় ধর্ম-শাখার উপর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

উপনিষদের যুগে বাংলায় কি বিশিষ্ট ধর্ম-মত প্রচলিত ছিল, তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। তবে বাংলার আদিম বাসিন্দা আর্যেতর জাতির ধর্ম এখানে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি,—যদিও তাহার বিশিষ্ট রূপ সম্বন্ধে আমরা নির্দিষ্টভাবে কিছুই জানি না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অথর্ববেদকে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির মিশ্রণের একটা ঐতিহাসিক দলিল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। দেখা যায়, অথর্ববেদকে অনেক সময় বেদ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই এবং বেদ বলিতে 'ত্রয়ী' অর্থাৎ ঋক, যজু ও সামকেই বুঝানো হইয়াছে।[২০৩] কিন্তু শেষে আর্যগণ আর্যেতর ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং অথর্ববেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই অথর্ববেদের মধ্যে 'ব্রাত্য' বলিয়া একশ্রেণীর লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাদের বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, তাহারা সম্ভবতঃ বৈদিক আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহিরের কোন এক সম্প্রদায়। ইহাদের জাতি ও ধর্ম-সংস্কৃতি লইয়া অনেক বৈদেশিক ও দেশীয় পণ্ডিত আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই অনুমানের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিঃসংশয়রূপে কিছু বলিতে পারেন নাই।

ব্রাত্যদের বিষয়ে অথর্ববেদের উল্লেখ এমন রহস্যময় ও ইঙ্গিতার্থক ভাষায়

২০৩। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (১।৫।৫), ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৩।১, ৭।১), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫।৩২), শতপথব্রাহ্মণ (৪।৬।৭।১৩), বৌধায়ন ধর্মসূত্র (৪।৫।১৯)।

রচিত যে, তাহার মধ্য হইতে ব্রাত্যদের সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট বিবরণ লাভ করা দুঃসাধ্য। তবে মোটামুটি তাৎপর্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অথর্ববেদের ব্রাত্য-খণ্ডের আঠারোটি পর্যায়ে ব্রাত্যদের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে ব্রাত্যেরা একটা বিশেষ গৌরবের অধিকারী। ব্রাত্যকে ব্রহ্মের সঙ্গে এবং দেবদেব মহাদেব বা ঈশানের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; সে ইন্দ্রের ধনু দ্বারা সজ্জিত হইয়া নানা স্থানে ও নানা দিকে ভ্রমণ করিতেছে; সমস্ত দেবতা তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতেছে; তাহার আসনের দুইটি পদ বসন্ত ও গ্রীষ্ম, অপর দুইটি বর্ষা ও শরৎ, অন্যান্য ঋতু তাহাকে রক্ষা করিতেছে; ব্রাত্য সকল দিকে ধাবিত হইতেছে; ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি, রুদ্র, মহাদেব ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া সর্বদা তাহাকে রক্ষা করিতেছে; তাহার সহিত অগ্নি, জল, ওষধি, দিন, রাত্রি, দিতি, অদিতি ও অন্যান্য দেবতা সর্বদিকে ঘুরিতেছে; সে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে—তাহাতেই সমুদ্রের উদ্ভব হইয়াছে; অবশেষে সে নানা জাতির মধ্যে—জন-সমাজের মধ্যে উপস্থিত হইল, তাহার সঙ্গে গেল সমিতি ও সভা, সৈন্যদল ও সুরা; ব্রাত্য যাহার বাড়ীতে অতিথিভাবে উপস্থিত হইবে, সেই গৃহস্বামী তাহাকে সাদরে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবে এবং অগ্নিহোত্র-ক্রিয়াদিতেও তাহার অনুমতির অপেক্ষা করিবে; ব্রাত্যের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেই চন্দ্র-সূর্য, আকাশ, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি উৎপন্ন; আদিত্য তাহার দক্ষিণ চক্ষু, চন্দ্র তাহার বাম চক্ষু, তাহার দক্ষিণ কর্ণ অগ্নি, বাম কর্ণ বায়ু ইত্যাদি; প্রায় প্রত্যেক পর্যায়েই যাহারা ব্রাত্যকে শ্রদ্ধা করিবে ও তাহার মাহাত্ম্য-সম্বন্ধীয় বর্ণনা বিশ্বাস করিবে, তাহারা নানা ফল লাভ করিবে, এমন ফল-শ্রুতির কথার উল্লেখ দেখা যায়। ইহাই অথর্ববেদের ব্রাত্য-খণ্ডের বিবরণের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম।[২০৪]

অথর্ববেদের এই বিবরণ হইতে ব্রাত্যদের ধর্ম ও সংস্কৃতি যে কিরূপ ছিল বা জাতি হিসাবেই বা তাহাদের কি পরিচয় ছিল, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না।

সামবেদের 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ' বা 'তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ'-এ 'ব্রাত্যস্তোম' নামে একটি যজ্ঞের বিবরণ আছে। কাত্যায়ন ও লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্রেও এই অনুষ্ঠানের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই ব্রাত্যস্তোম অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আর্যেতর

২০৪। **Atharvaveda Samhita, Book XV, The Vrātya (Translated by W. D. Whitney), Pages 769-791.**

জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকদিগকে শুদ্ধিসাধন করিয়া বৈদিক আর্য-ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবন-যাত্রার একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে।

ব্রাত্যেরা খোলা যুদ্ধরথে চড়িয়া বেড়াইত; হাতে ধনুর্বাণ ও বর্শা বহন করিত; মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিত, তাহাদের শিরস্ত্রাণ ও পরিধেয় বস্ত্রের পাড় ছিল লাল; উহাদের প্রান্তভাগ বাতাসে উড়িত; তাহাদের মেষচর্ম-নির্মিত জুতা দুইভাগে ভাঁজ করা থাকিত, তাহাদের দলপতিরা বাদামী রঙের পোশাক ব্যবহার করিত এবং রৌপ্য-নির্মিত অলংকার গলায় পরিত; তাহারা কৃষি-কার্য করিত না, ব্যবসায়-বাণিজ্যও করিত না; তাহাদের বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, সর্বসময়েই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ছিল; তাহারা অদীক্ষিত হইয়াও দীক্ষিতদের ভাষা ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু যাহা সহজেই উচ্চারণ করা যায়, তাহাকে তাহারা কঠিন উচ্চারণ বলিয়া অভিহিত করিত।[২০৫]

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে সংস্কার-বর্জিত ব্যক্তির সন্তান ব্রাত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।[২০৬] মনুসংহিতাতে দ্বিজাতিবর্ণের সংস্কার হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে ব্রাত্য বলা হইয়াছে।[২০৭] মহাভারতে ব্রাত্যকে অতি নীচ জাতি এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।[২০৮] পরবর্তী কালে 'ব্রাত্য' শব্দটিকে 'পতিত', 'সংস্কার-বর্জিত', 'অদীক্ষিত', 'অশুদ্ধ' প্রভৃতি তাৎপর্যে গ্রহণ করা হইয়াছে দেখা যায়।

এখন এই ব্রাত্য, কোন্ জাতির লোক, কোথাকার বাসিন্দা তাহারা, তাহাদের ধর্ম কি ছিল—এই সব বিষয়ে নানা পণ্ডিত নানা মত পোষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, ব্রাত্যেরা এই দেশের আদিম অধিবাসী, আর্য-পূর্ববর্তী বা অনার্য-ভারতীয়; আবার কেহ মনে করেন, তাহারা বহিরাগত এবং আর্য-বংশ-সম্ভূত বটে, কিন্তু বৈদিক আর্য-বংশে উৎপন্ন নয়। ব্রাত্যেরা আর্য কি অনার্য—এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, তাহারা যে প্রাচ্যদেশের, বিশেষ করিয়া মগধের অধিবাসী

২০৫। The Brahmans of the Vedas—K. S. Macdonald (The Tandya-Maha-Brāhman), Page 18.

২০৬। বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১, ৮

২০৭। মনুসংহিতা ২, ৩৯ এবং ১০, ২০

২০৮। মহাভারত ৫, ৩৫, ৪৬

এবং বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির বাহিরে অবস্থান করিত—একথা অধিকাংশ পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন।

Winternitz বলেন যে, ব্রাত্যেরা প্রাচ্যদেশবাসী ভ্রমণশীল যাযাবর জাতি। তাহারা দলে দলে গাড়ীতে চড়িয়া সামরিক অভিযানের কায়দায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের নিজস্ব বিশিষ্ট ধর্ম ও বিচিত্র আচার-ব্যবহার ছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা বৈদিক আর্যেরা তাহাদিগকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আনিত। এই ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষিত ব্রাত্যকে অতবড় গৌরবজনক স্থান দেওয়া হইয়াছে অথর্ববেদের ব্রাত্যখণ্ডে।[২০৯]

ব্রাত্যদের বিশিষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানারূপ অনুমান করিয়াছেন। কীথ কার্পেণ্টারের মত উল্লেখ করিয়া আলোচনা করিয়া বলেন যে, ব্রাত্যেরা প্রাচীন রুদ্র বা শিবোপাসক সম্প্রদায়।[২১০] জার্মান পণ্ডিত হনার বলেন ব্রাত্যেরা মরমিয়া-পন্থী ক্ষত্রিয়জাতি এবং প্রাচীনতম যোগসাধক সম্প্রদায়।[২১১] ডক্টর নীহার-রঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, প্রাচ্যদেশে অর্থাৎ বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় যে ব্রতোৎসবের প্রচলন আছে, তাহা প্রাক্-বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বাহিরের ব্রাত্যরাই প্রথম ব্রত-ধর্মী ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

"ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোনো অকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তবে এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে। যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য যাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারাই হয়ত ছিলেন ব্রাত্য। এই ব্রাত্যরা যে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে জড়িত, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এবং ইহাও লক্ষণীয় যে, ব্রতধর্মের প্রসার বিহার, বাংলা, আসাম এবং উড়িষ্যাতেই সবচেয়ে বেশি। ব্রত কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ই বোধ হয় (বৃ ধাতু+ক্ত) আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা; নির্বাচন করাই ব্রতের উদ্দেশ্য; বরণ কথাটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমারেখা টানিয়া দিয়া

২০৯। A History of Indian Literature —M. Winternitz, Page 154.

২১০। Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, 155ff.

২১১। Quoted by Winternitz in his article on Vrātya—A History of Indian Literature —M. Winternitz, Page 154.

ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয় ; এই সীমারেখা টানা, স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে যাতুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে বরণ করার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত—যেমন, নূতন বরের মুখের সম্মুখে হাত ও হাতের আঙুল নানা ভঙ্গিতে ঘুরানো, কুলার উপর প্রদীপ ইত্যাদি সাজাইয়া বরের দুই বাহুতে, বুকে কপালে ঠেকানো ও সঙ্গে সঙ্গে বরণের ছড়া উচ্চারণ—তাহার ভিতরেও ম্যাজিকেরই অবশেষ আজও লুক্কায়িত। এই বরণের অর্থও অশুভ শক্তির প্রভাব হইতে পৃথক করা, আবৃত করা, নির্বাচন করা। ব্রত এবং বরণের স্ত্রী-আচারগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের সমগোত্রীয়তা ধরা পড়িয়া যায়, এবং গোড়ায় যে ইহাদের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও পরিষ্কার হইয়া যায়। ব্রত এবং বরণ উভয় অনুষ্ঠানে শুধু মেয়েদেরই যে অধিকার এ-তথ্যও লক্ষ্যণীয়। এই ম্যাজিক-বিশ্বাসী ব্রতাচারী লোকেরাই ঋগ্বেদীয় আর্যদের চোখে বোধহয় ছিলেন ব্রাত্য।"[২১২]

অবশ্য শব্দ-সাদৃশ্যের উপর কোনো সম্বন্ধ-স্থাপন নিতান্ত শিথিল-ভিত্তি, তবে অথর্ববেদে ব্রাত্যদের যে শক্তির ও গৌরবের কথা বর্ণিত আছে, তাহাতে ঐরূপ একটা গুহ্য যাতু-শক্তির অধিকারী হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

সিন্ধু-সভ্যতা হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদের যুগ পর্যন্ত ধর্মের ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া আমরা এই অনুমানে উপনীত হইতে পারি,—

(ক) স্ত্রী-দেবতা ও পুরুষ-দেবতার ইঙ্গিত বর্তমান। সম্ভবতঃ ইহাদের সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রীর মতো। সিন্দু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু মাতৃকা-মূর্তি আর্য-পূর্ব ও আর্যেতর জাতির মাতৃতন্ত্রের প্রাধান্য-সূচক দেবী-পূজার ইঙ্গিত বহন করিতে পারে। পুরুষ-মূর্তিটি পশুপতি শিবের বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট বলিয়াও মনে হয়। যোগ হয়তো সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ থাকিতে পারে। বেদের মধ্যে পুরুষ-দেবতার প্রাধান্য থাকিলেও সর্বশক্তিময়ী স্ত্রী-দেবতার আসন ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(খ) মন্ত্রের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, কোন দৈব প্রক্রিয়ার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ফললাভ, মারণ-উচাটন-বশীকরণ প্রভৃতি যে ক্রিয়া-কলাপ পরবর্তী তন্ত্রাদিতে দেখি, তাহার মূল রূপ বা বীজ আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে কয়েক স্থানে, এবং অথর্ববেদের প্রায় সর্বত্র দেখি। ইহা আদিম আর্যেতর জাতির বিশ্বাস,

২১২। বাঙালীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫৮২, পাদটীকা

কিন্তু ইহা পরবর্তী ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তান্ত্রিক ধর্ম নামে যাহা প্রচলিত, তাহার মূলে নিঃসন্দেহে আদিম আর্যেতর জাতির ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কার নিহিত।

(গ) স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলনধর্মের বা সাধনার একটা অঙ্গ ছিল বলিয়া 'বৃহদারণ্যক', 'ছান্দোগ্য' প্রভৃতি উপনিষদে আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তী তন্ত্রের সাধন-সঙ্গিনী-গ্রহণের বীজ এখানে থাকিতে পারে। বেদের মধ্যে সুরা-পান ও পশু মাংস-উৎসর্গের বহু দৃষ্টান্ত আছে।[২১৩] এসব পঞ্চ-মকারের আদিরূপও হইতে পারে।

(ঘ) সমস্ত সৃষ্টির মূল প্রজনন-শক্তিরই বিকাশ বলিয়া সাধারণ মন কৌতূহল, রহস্য ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উহার মধ্যে একটা অলৌকিকত্ব আবিষ্কার করিয়াছে এবং প্রজননের দুইটি পক্ষের উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া উহাদিগকে আদিম পিতা-মাতা বা আদিম স্বামী-স্ত্রী-রূপে রূপান্বিত করিয়াছে। এই ভাবে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতির ধর্ম-ইতিহাসের আদিম স্তরে প্রাথমিক ধর্ম-বিশ্বাস যৌনমিলনের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। উহারই ক্রম-বিবর্তনে পুরুষ ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক-পূজা—লিঙ্গ-যোনি-পূজা প্রভৃতি ভারতীয় ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে শৈব ও শাক্তধর্মে ইহার নিদর্শন পূর্ণভাবে বিদ্যমান।

(ঙ) এই প্রভাবগুলি আর্যেতর আদিম অধিবাসীদের বা বহিরাগত বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহিরের কোনো সম্প্রদায়ের প্রভাব বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী কালে আর্য-বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আর্য-মননশীলতা ও কল্পনার প্রলেপ দিয়া ইহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া এবং ইহার দৃশ্যতঃ স্থূলত্ব পরিহার করাইয়া আর্য-ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই অনুমানগুলি ভারতের সর্ব প্রদেশের ধর্ম সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আদিম

২১৩। "সুরা সিঞ্চন করা হইয়াছে, পরিসিঞ্চন করা হইয়াছে, উৎসিঞ্চন করা হইয়াছে, পরে পরিশোধিত করা হইয়াছে। অধুনা এই পিঙ্গলবর্ণ সুরা পান করিয়া প্রমত্ত অবস্থায় সুরাপায়ী 'কিম্বং' 'কিম্বং' (তুমি কি, তুমি কি) করুক। (অর্থাৎ প্রলাপ বচন বলুক।" (যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার ২৮ কণ্ডিকা)

যজুর্বেদের সৌত্রামণি যাগ-প্রকরণে (১৯।২০।২১) সুরা-পানের প্রমত্ততার বহু উল্লেখ আছে। এই শাখার অশ্বমেধ যাগ-প্রকরণেও বহু পশু-বলির বিধান ও তাহাদের পক্ব মাংস-উৎসর্গের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

বাসিন্দাদের নানা ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কার, রীতি-নীতি, মতবাদ, ধর্মের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান, দেব-দেবীর রূপ ও কল্পনা আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা জৈন-বৌদ্ধ সংস্কৃতির সহিত মিশিয়া একটা নূতন আর্য-ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু উহার মধ্যে আদিম বা আর্যেতর অংশ অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে।

বাংলার ধর্মের ইতিহাসে এই সঙ্গত অনুমানটি একটি সত্যেরই রূপ ধারণ করিয়াছে বলা যায়। বাংলার জনসমষ্টির উপাদানগুলি আমরা বিশেষভাবে দেখিয়াছি; বাঙালী জাতির মধ্যে প্রকৃত আর্যরক্ত অতি সামান্য। ভারতের এই প্রান্তবর্তী স্থানে বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবাহ যে পলি-মাটি ক্ষেপণ করিয়াছে, তাহা বাঙালী জীবনের উপর একটি স্তর নির্মাণ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মূল মৃত্তিকার কোনো পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। ঐ ধর্ম ও সংস্কৃতি সমাজের একটি শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণ সেই ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে নাই। এখনও জনসাধারণ তাহাদের ধর্ম-কর্মে এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান, প্রথা ও সংস্কার পালন করে বা এমন কতকগুলি লৌকিক দেব-দেবীর পূজা করে, যাহা আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির অনুমোদিত নয়, কিন্তু শেষে জনসাধারণের দাবী ও চাহিদায় ইহাদের সঙ্গে আপোষ করিয়া ইহাদের অনেককে এক একটি সংস্কৃত ধ্যান ও মন্ত্রাদির দ্বারা আর্য-ধর্ম-সংস্কৃতি ইহাদের অনুমোদন ও আবাহন করিয়া লইয়াছে। এইভাবে শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী, চণ্ডী, চড়কগাছ, শ্মশানকালী, ধর্মঠাকুর, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী, পঞ্চানন্দ ঠাকুর, শ্মশানেশ্বর শিব প্রভৃতির পূজা ও অনুষ্ঠান বাঙালীর ধর্ম-কর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এখন এই পটভূমিকায় আমরা ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া বাংলায় ধর্ম-বিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিব।

মুসলমান-অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের ধারাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিলে এই দীর্ঘ সময়কে আমরা এই ভাবে ভাগ করিতে পারি: (১) গুপ্ত পূর্ব-যুগ (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৫০০ হইতে খৃষ্টাব্দ ৩০০), (২) গুপ্ত-যুগ (আনুমানিক খৃষ্টাব্দ ৩০০ হইতে খৃষ্টাব্দ ৫০০), (৩) গুপ্তোত্তর যুগ (আনুমানিক খৃষ্টাব্দ ৫০০ হইতে খৃষ্টাব্দ ৬৫০), (৪) অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায় (আনুমানিক খৃষ্টাব্দ ৬৫০ হইতে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ), (৫) পালযুগ (আনুমানিক খৃষ্টাব্দ ৭৫০ হইতে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দ), (৬) সেন-যুগ

(আনুমানিক খৃষ্টাব্দ ১১৫৫ হইতে ১২৬০ খৃষ্টাব্দ—১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় স্বাধীন হিন্দু-রাজত্ব শেষ)। তাহার পর মুসলমান যুগের আরম্ভ।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক হইতে আমরা বাংলার ইতিহাসকে পাঁচটি পর্ব বা যুগে ভাগ করিতে পারি :

(১) গুপ্ত-পূর্বযুগ
(২) গুপ্ত-যুগ
(৩) পাল-যুগ
(৪) সেন-যুগ
(৫) মুসলমান-যুগ

গুপ্ত-শাসনের পূর্বে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। দুই-একটি প্রাচীন সাহিত্য ও দুই একটি শিলালিপি হইতে যে-তথ্য সংগৃহীত হয়, তাহা হইতে আমরা উহার একটা আভাস বা ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে পারি মাত্র।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীনে আসিলে বাংলা প্রথম আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ স্পর্শ পাইল। দুই শত বৎসরের অধিককাল বাংলা মগধের প্রবলপ্রতাপান্বিত গুপ্তরাজগণের শাসনাধীনে ছিল। এই সময় বাংলায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আর্য-ভাষা সংস্কৃতের একটা প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত, বিবিধ পুরাণ, নানা গল্প, কাহিনী, আর্য-ভাষা সংস্কৃতের মাধ্যমে বাংলার দ্বার-প্রান্তে উপনীত হইল। উচ্চশ্রেণী আর্য-ভাষা সংস্কৃতকে বরণ করিয়া লইল এবং বাংলা দেশ সর্বভারতীয় সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধারার সহিত যুক্ত হইল।

গুপ্ত সম্রাটগণের পর বাংলায় আমরা যে কয়টি বংশের রাজাদের পরিচয় তাম্রশাসন ও অন্যান্য বিবরণ হইতে পাই, তাঁহারা গোপচন্দ্র-ধর্মাদিত্য-সমাচারদেব, খড়্গোদ্যম-জাতখড়্গ-দেবখড়্গ-রাজরাজ ভট্ট, মহাসামন্ত শিবনাথ-শ্রীনাথ-ভবনাথ-লোকনাথ, শ্রীজীবধারণ রাত, শ্রীধারণ রাত, বলধারণ রাত এবং শশাঙ্ক—প্রায় সকলেই ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে গুপ্তসম্রাটগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল খড়্গবংশীয়েরা ছিলেন বৌদ্ধ, তাহা ছাড়া সকল বংশই গুপ্তদের মতো বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অনুগামী ছিলেন এবং বাংলায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্মসংস্কৃতির প্রভাবই ছিল প্রবল। সুতরাং গুপ্তসম্রাটগণের পরবর্তী এবং

পালরাজগণের আগমনের পূর্ববর্তী যুগকে আমরা সমগ্রভাবে গুপ্তযুগ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

তারপর খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে 'মাৎস্যন্যায়' দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক গোপালদেব রাজা নির্বাচিত হইয়া পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে মদনপালের রাজত্বের সহিত (আনুমানিক ১১৪০ খৃঃ) পালবংশের অবসান হইল। তাহার পরও গোবিন্দচন্দ্র নামে মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বরের নাম পাওয়া যায় (আনুমানিক ১১৫৫-১১৬২ খৃঃ)। তবে লিপি-প্রমাণে মনে হয়, বিহারের গয়াতেই তাঁহার রাজ্যের প্রধান স্থান ছিল; গৌড় এক সময়ে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে। যাহা হোক মদনপালের মৃত্যুর পর দ্বাদশ শতকের তৃতীয় পাদে যে পাল-শাসন বাংলা হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দীর্ঘ চারিশত বৎসর পাল-বংশীয়েরা বাংলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই পাল-যুগই বাংলার গৌরবোজ্জ্বল সুবর্ণযুগ। তীব্র জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'মাৎস্যন্যায়' দূর করিয়া বাঙালী জাতি সর্বপ্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠ হইল। রাজনীতি-ক্ষেত্রে, শৌর্য-বীর্যে, বিজয়-অভিযানে, শাসন-ব্যবস্থায়, ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রাঙ্কনে উন্নতির এক প্রবল বন্যা আসিয়াছিল। পাল-বংশীয়েরা বহিরাগত ছিলেন না, বাংলাই ছিল তাঁহাদের জন্মভূমি। তাঁহারা শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে এবং খুব সম্ভব উচ্চবর্ণের বা বংশের আভিজাত্যও তাঁহাদের ছিল না। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ-অনুযায়ী তাঁহারা বাংলার সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একটা সমন্বয় বা সমীকরণ ছিল তাঁহাদের মূল নীতি। তাঁহারা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ 'পরমসৌগত', মহাযানী বৌদ্ধসংঘ ও সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, অথচ বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মও তাঁহাদের বিশেষ আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের যাগযজ্ঞ ও পূজাদিতে পালরাজগণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সিঞ্চিত শান্তি-বারি মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, হিন্দু-রাজকন্যাকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম সম্বন্ধে উদার দৃষ্টিভঙ্গী, পরমত-সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়-সাধন ছিল তাঁহাদের মূলনীতি।

এই পাল-যুগেই বাংলার ধর্মের ব্যাপারে বিভিন্ন উপাদানের একটা অভাবনীয়

সমন্বয় সাধিত হয়। ধর্ম ও সংস্কৃতির তিনটি ধারা একত্রে একমুখী হয়। প্রথম, আর্যেতর আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা, দ্বিতীয়, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা, তৃতীয়, বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা। প্রথম ধারার অনেক আর্যেতর দেবদেবী ও অনেক ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রথা স্বীকৃতি লাভ করিল, দ্বিতীয় ধারার মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও পূর্ববর্তী বৌদ্ধ-সংস্কারের কাঠামোটি রাখা হইল, তৃতীয় ধারার ব্রাহ্মণ্য-পুরাণের দেব-দেবী, পূজা, ধ্যান-ধারণা এবং অন্যান্য সংস্কার ও সংস্কৃতিকেও গ্রহণ করা হইল। এই তিন ধারার সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত হইল বৌদ্ধধর্মের এক নূতন রূপ—তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম—মন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযান ও শেষে সহজযান বৌদ্ধধর্ম।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, আদিম আর্যেতর জাতির যাদু-শক্তিতে বিশ্বাস, ধর্মের আনুষঙ্গিক নানা গুহ্য ক্রিয়া, মন্ত্রে আস্থা, শক্তি-পূজার প্রবণতা, দেবতার পত্নী-রূপে দেবীর কল্পনা, হঠযোগ, ধর্ম-সাধনায় নর-নারীর দৈহিক ও মানসিক মিলন-কল্পনা, নানা দেব-দেবীর পূজা, প্রাক্-বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদ-উপনিষৎ প্রভৃতির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শেষে উহারা একটি উপাসনা-পদ্ধতি ও মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তন্ত্র-ধর্ম নামে একটি বিশিষ্ট ধর্মে পরিণত হইয়াছে। বৈদিক আর্য-ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এই আর্যেতর তন্ত্র-ধর্মের একটি ধারাও ভিতরে-ভিতরে প্রবাহিত ছিল বলিয়া মনে হয়। মন্ত্র, যন্ত্র, বীজ, মুদ্রা, মণ্ডল, যোগ ও নানা গুহ্য প্রক্রিয়াই ইহার মূলভিত্তি। এইসব গোপন প্রক্রিয়া কেবল বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ, সুতরাং এই সাধনার জ্ঞান কেবল গুরু-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং গুরু-পরম্পরায় তাহা এই মতবাদে দীক্ষিত শিষ্যদের মধ্যেই কেবল বিস্তৃত হইয়াছে এবং এইভাবে ইহার অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধধর্মের উপর এই তন্ত্র-প্রভাব পড়িতে আরম্ভ হয় বলিয়া মনে হয়। এই তন্ত্র-মত তো আদিম আর্যেতর জাতির ধর্ম-বিশ্বাস। ইহারা ক্রমে ক্রমে হয় ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুধর্মের আশ্রয়, না হয় বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই উভয় ধর্মের নিম্নতর স্তরগুলিতে যে অসংখ্য জনসাধারণ ধীরে ধীরে সমবেত হইয়াছে, তাহারা তো আদিম অধিবাসী। সুতরাং তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্ম-সংস্কার, ধ্যান-ধারণা, দেব-দেবী, হিন্দু ও বৌদ্ধসমাজ যে নিজ নিজ শক্তি, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের নিজস্ব ভাব-কল্পনা, ধ্যান-ধারণার সহিত যতটা সম্ভব খাপ খাওয়াইয়া গ্রহণ করিবে,

তাহাতে আর সন্দেহ কি। এই ভাবেই এই তান্ত্রিক ধারণাগুলি একপথে হিন্দুধর্মে আর একপথে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করিয়াছে এবং দুই ধর্মই সেগুলিকে কম-বেশি সংশোধিত ও রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে। এই ভাবেই তান্ত্রিকতা দুই ধর্মে স্থান লাভ করিয়াছে। তন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনাকারী জনৈক আধুনিক পণ্ডিত বলেন :

"বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের পূর্বরূপ-স্বরূপ বৌদ্ধ ধারণীগুলি যে খুব প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বহু ধারণী-সংবলিত সুরঙ্গম সূত্র পাঠ করিতেন। বীল সাহেবের মতে এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী হইতে পারে না, যেহেতু পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজকের নিকট ইহা অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। হিউ-এন-চাঙের মতে মন্ত্রযান সম্প্রদায়ের ধারণী বা বিদ্যাধর পিটক খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাসাঙ্ঘিকদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।"[২১৪]

গুপ্ত-যুগ হইতে এই তন্ত্র-ধর্ম ব্রাহ্মণ্য-পুরাণের বহু দেবতাকে আশ্রয় করিয়াছে এবং তাহাদের নানা শক্তি কল্পনা করিয়া এবং বিশেষভাবে শিব-দুর্গা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতির অবতারণা করিয়া শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়াছে। এই সময় হইতেই হিন্দুতন্ত্রের একটা বিশিষ্ট আকারে উদ্ভব অনুমান করা যায়। তন্ত্র সম্বন্ধে পরবর্তী একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে, এখানে সে সম্বন্ধে আর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পাল-যুগে রাজধর্ম এবং বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জনসাধারণের ধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম। এই যুগে ব্রাহ্মণ্য-পুরাণের অনুকরণে বৌদ্ধধর্মেও বহু দেবতাকে গ্রহণ করা হইল, হিন্দুতন্ত্রানুসারে তাহাদের দেবী বা শক্তি কল্পনা করা হইল, পূর্বেকার মহাযান বৌদ্ধধর্মের দেব-দেবীকে গ্রহণ বা নানা ইঙ্গিতকে পরিস্ফুট-করিয়া দেব-দেবীতে বিকশিত করা হইল এবং সাধনার অংশে নর-নারীর দেহ-মিলনাত্মক তন্ত্রাদর্শ গ্রহণ করা হইল। এইভাবে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হইল, তাহাই বাংলার চারিশত বৎসরের মুখ্য ধর্ম—সংখ্যাগরিষ্ঠ অগণিত অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জনসাধারণের ধর্ম-রূপে প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

২১৪। তন্ত্রকথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পৃঃ ৯।

এই পাল-যুগের শেষ অংশে আমরা দুইটি ক্ষুদ্র স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ-বংশের উল্লেখ পাই কতকগুলি লিপি হইতে। একটি বংশ চন্দ্র-বংশ—পূর্ণচন্দ্র-সুবর্ণচন্দ্র-মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র—শ্রীচন্দ্র এবং সম্ভবতঃ লহয়চন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র ইহার রাজগণ। অপরটি বর্মন-বংশ—জাতবর্মা—মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা—শ্যামল বর্মা—ভোজবর্মা—ইহার রাজগণ। চন্দ্র-বংশীয়েরা ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, বর্মন-বংশীয়েরা ছিলেন 'পরম বৈষ্ণব'। এই দুই রাজবংশ আমাদের আলোচনার দিক হইতে পাল-যুগের অন্তর্গত।

পাল-যুগের পরই সেন-যুগ আরম্ভ। সেন-বংশীয়গণ 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়', 'কর্ণাট-ক্ষত্রিয়' বলিয়া নিজেদের আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

এই বংশের প্রথম নরপতি সামন্ত সেন কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়া রাঢ়দেশে গঙ্গা-তীরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ়দেশের এক অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র বিজয় সেন ক্রমে ক্রমে রাঢ়, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কতকাংশ জয় করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র বল্লাল সেনও ঐ সমস্ত ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। তদুপরি মিথিলা ও বাগড়ীও তাঁহার শাসনাধীনে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময়েই সমগ্র বঙ্গ সেন-বংশীয়দের শাসনাধীনে আসে এবং সেন-বংশীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। এই বংশের তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ নরপতি এবং নানা দেশ জয় করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ ও কামরূপ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রদের লিপিতে পাওয়া যায় যে তিনি পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহার রাজ্যে ও রাষ্ট্রে আভ্যন্তরিক দুর্বলতা দেখা দেয় এবং ভাগ্যান্বেষী তুর্ক জাতীয় যোদ্ধা মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ার খিলজী বাংলা আক্রমণ করিয়া সেন-রাজগণের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী নদীয়া বা নবদ্বীপ অধিকার করেন। তাহার পর লক্ষ্মণ সেন নদীয়া পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান ও তথায় কিছুদিন রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন বলিয়া মনে হয় (আনুমানিক ১২০৬ খৃঃ)। লক্ষ্মণ সেনের পরে তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন আনুমানিক ১২৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের উপর রাজত্ব করেন; তাহার পরেও লক্ষ্মণ সেনের বংশ ১২৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন। সেন-যুগে পট্টিকেরা (ত্রিপুরা জেলা) রাজ্যে রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দে

নামে এক স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয়া লিপি-প্রমাণে পাওয়া যায়।

এই সেন-যুগেই পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেব-উপাধিকারী এক রাজবংশের উল্লেখ তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যায়। পুরুষোত্তম—মধুসূদন দেব—বাসুদেব—দামোদর দেব এই বংশে রাজত্ব করেন। লিপি-প্রমাণে দামোদর ১২৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দশরথ দেব নামে আর এক রাজার নাম তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব তিনি পূর্বোক্ত দেব-বংশেরই রাজা। ঢাকা জেলা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিক্রমপুরে তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ১২৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। দেব-বংশের আরো দুই একটি লিপি পাওয়া যাইতেছে। মনে হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ আক্রমণকারী মুসলমানদের নিকট হইতে কোনোরূপে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে আর বাংলায় কোনো স্বাধীন হিন্দু বা বৌদ্ধ নরপতির চিহ্নমাত্র ছিল না।

সেন-রাজবংশ দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়াছিল—এই বংশীয়েরা বাঙালী ছিলেন না। ইঁহারা ছিলেন গোঁড়া বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। দক্ষিণভারত-সুলভ আচার-সর্বস্বতা তাঁহাদের মজ্জাগত ছিল। এই যুগের পূর্ববঙ্গের দেব-বংশও ছিল ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী এবং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার ও আচারের প্রবল পক্ষপাতী। সেন-যুগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কার প্রবল রাষ্ট্র-পোষকতা লাভ করিয়াছে এবং সেন ও দেব-রাজগণ বাংলাদেশের সমগ্র ধর্মগত ও সমাজগত আচার-ব্যবহার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সমাজকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম, সংস্কৃতি ও সংস্কারের আদর্শ-অনুযায়ী নূতন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে পাল-যুগ ছিল সমন্বয়ের যুগ—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, আদিম অধিবাসীদের তন্ত্র-ধর্মের এক সাঙ্গীকরণ। রাজারা বৌদ্ধ হইলেও সকল ধর্মকেই সমান উৎসাহ দিয়াছেন, কিন্তু সেন-যুগে এই সমন্বয় আদর্শ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং রাজশক্তির উৎসাহে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম এ সময় বিলুপ্ত না হইলেও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেনরাজগণের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-বিদ্বেষ হয়তো ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে।

এখন বাংলাদেশে এই পাঁচটি যুগে ধর্মের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ক্রম-বিবর্তনের ধারাটি ধরিবার চেষ্টা করা যাক :

(১) গুপ্ত-পূর্বযুগ

গুপ্ত-শাসনের পূর্বে বাংলায় ধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে দুই একখানা প্রাচীন সাহিত্য ও দুই একটি শিলালিপি হইতে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বাংলায় প্রচলিত ছিল। এই উভয় ধর্মই বেদ-বিরুদ্ধ, বেদের যাগ-যজ্ঞ, পশু-হনন প্রভৃতির ঘোরতর প্রতিবাদী। বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপেই এই দুই ধর্মের উদ্ভব হইলেও মূলতঃ এই দুই ধর্ম আর্য ধ্যান-ধারণাশ্রয়ী এবং আর্য-মানসিক-সংস্কৃতির পন্থানুসরণকারী। বাংলার আদিম অধিবাসীদের এই দুই ধর্মের মাধ্যমেই আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

'আচারাঙ্গ সূত্র'-এ আমরা দেখিয়াছি যে, মহাবীর রাঢ়দেশ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দেশের লোকেরা তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জানায় নাই। মনে হয়, তাহাদের পূর্বাচরিত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আসক্তি-বশতই নূতন আর্য-ধর্মকে তাহারা ভালো চোখে দেখে নাই এবং নূতন ধর্মের প্রচারকগণও তাহাদের আচার-ব্যবহার, ভাষা ও জীবনযাত্রা পছন্দ করেন নাই। জৈন সূত্রাদিতে বহুবার বঙ্গের নামোল্লেখ থাকিলেও[২১৫] বাংলায় জৈনধর্ম কি প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। 'দিব্যাবদান'-এর একটি কাহিনীতে আছে যে, পুণ্ড্রবর্ধনের নিগ্রন্থেরা (জৈন সম্প্রদায় গুপ্ত-যুগ পর্যন্ত নিগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত হইত) বুদ্ধ এক নিগ্রন্থের চরণে পতিত হইয়াছেন—এইরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল বলিয়া অশোক ক্রুদ্ধ হইয়া পাটলীপুত্রের ১৮ হাজার আজীবিকদের হত্যা করিয়াছিলেন।[২১৬] আজীবিক-সম্প্রদায় প্রাচীন-কালে নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের মতো একটি বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম-নীতির মধ্যে মূলতঃ বিশেষ কোনো প্রভেদ না থাকায়

২১৫। **Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India**—Sylvan Levy (Translated into English by Dr. P. C. Bagchi), P. 73ff.

২১৬। **Divyavadana**—Edited by Cowell and Neil, Chapter XXVIII—Vitāśokāvadān, P. 427.

'দিব্যাবদান'-এ ইহাদের কোনো পার্থক্য করা হয় নাই বলিয়া মনে হয়। চীনা অনুবাদে অবশ্য 'নিগ্রন্থপুত্র'-দের কথাই আছে। এই গল্পে বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করা না গেলেও একটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় জৈন 'কল্পসূত্র' হইতে। তাহাতে মনে হয়, খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কতক স্থানে জৈনধর্মের প্রসার ছিল। 'কল্পসূত্র' ভদ্রবাহু নামক জনৈক জৈনসূরী কর্তৃক সংকলিত। তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক এবং গুরু বলিয়া কথিত। এ বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও 'কল্পসূত্র'-এ যে প্রাচীন জৈনধর্মের অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে উল্লিখিত আছে যে, ভদ্রবাহুর এক শিষ্য গোদাস 'গোদাস-গণ' নামে এক জৈন-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।[২১৭] তাহার চারিটি শাখার নাম 'তামলিত্তিয়' (তাম্রলিপ্তক), 'কোডিবর্ষীয়া' (কোটিবর্ষীয়), 'পোংডবর্ধনীয়া' (পুণ্ড্রবর্ধনীয়) এবং 'দাসীখব্বডিয়' (দাসীখর্বটিক)। স্থানের নাম হইতে প্রত্যেকটি শাখার নামকরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই স্থানগুলি—তাম্রলিপ্তি (মেদিনীপুর), কোটিবর্ষ (দিনাজপুর), পুণ্ড্রবর্ধন (বগুড়া) এবং দাসী-খর্বট (সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের কোনো স্থান)। ইহাদের প্রত্যেকটিই বঙ্গদেশে—পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। বাংলা দেশে জৈনধর্মের বিশেষ প্রসার না থাকিলে একই দেশে একটি ধর্মের চারিটি শাখার অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যকার একাধিক জৈনলিপিতে 'কল্পসূত্র'-এ বর্ণিত এই সব শাখার উল্লেখ দেখা যায়।[২১৮] মনে হয়, গোদাস-গণীয় জৈনদের চারিটি শাখা ঐ সময়ের মধ্যে বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে অনুমিত মথুরার একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, 'রারা' জনপদের অধিবাসী এক জৈনভিক্ষু মথুরায় একটি জৈনমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।[২১৯]

পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, এক ব্রাহ্মণ ও সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী গুহনন্দী নামে এক জৈন-আচার্যের শিষ্যগণের জন্য বট-গোহালীতে

২১৭। **Jain Sutras** (Translated by Jacobi), XXII, P. 288.

২১৮। **Epigraphic Jaina**—Guerinot, Pages 36ff, 71ff.

২১৯। **Palas of Bengal**—R. D. Banerjee (Memoirs of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. V), P. 72.

(পাহাড়পুর-সংলগ্ন বর্তমান গোয়ালভিটা নামক স্থানে) এক জৈন বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিহারের স্থান পাহাড়পুরে খননের দ্বারা আবিষ্কৃত বিখ্যাত মন্দির ও বিহারের সংলগ্ন স্থানে ছিল। [২২০] এই তাম্রশাসনের তারিখ গুপ্ত-যুগের আমলে পড়ে (৪৭৮-৭৯ খৃঃ)। বিহার তাহার পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন-সাং উত্তরবঙ্গে (পুণ্ড্রবর্ধন) ও পূর্ববঙ্গে (সমতট) অনেক দিগম্বর নিগ্রন্থদের দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [২২১] কিন্তু পাল ও সেন-যুগের বহু লিপিতে তাহাদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাংলার উলঙ্গ জৈনেরা শেষে অবধূত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল বলিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন।

কখন বৌদ্ধধর্ম বাংলায় প্রথম প্রচারিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। দুই-একখানা প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থ বা বৌদ্ধ অবদানগুলির কাহিনীর উপর অনুমান ও জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাক্-গুপ্ত যুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য দুইটি ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই। যাঁহারা মধ্যভারতে সাঁচী-স্তূপের বেষ্টনী ও তোরণ-নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের একজন মহিলার নামোল্লেখ আছে: "ধমতায় দানং পুঞবদনিয়ায়", অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধনের 'ধমতা' বা ধর্মদত্তার দান। [২২২] সাঁচী-স্তূপের আর একটি তোরণের ব্যয়-নির্বাহকদের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের আর একজন পুরুষের নাম আছে,—তাঁহার নাম 'ইসিনদন' বা ঋষিনন্দন। [২২৩] অবশ্য বৌদ্ধস্তূপের ব্যয়ভার বহন করিলেই যে দাতা ঐ ধর্মাবলম্বী হইবেন তাহা নয়, কারণ আমরা এক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নীকে ইতিপূর্বে জৈন-বিহার প্রতিষ্ঠা করিতে দেখিয়াছি। তবে পুণ্ড্রবর্ধন-বাসীরা যে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত ছিল এবং উহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে এবং ইহা হইতে ঐ দেশে বৌদ্ধধর্ম-প্রচলনের একটা সঙ্গত অনুমানও করিতে পারি। পণ্ডিত বুলার সাহেব এই শিলালিপিগুলির তারিখ

২২০। Epigraphia Indica, XX, P. 61ff.

২২১। On Yuan Chwang's Travels in India—T. Watters, II, Pages 184, 187.

২২২। Epigraphia Indica, II, No. 102, P. 108ff.

২২৩। Epigraphia Indica, II, No. 217, P. 380ff.

খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের শেষ হইতে খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। প্রাক্-গুপ্ত যুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের আর একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাগার্জুনীকোণ্ডার একটি শিলালেখে।[২২৪] ইহাতে ভারতবর্ষে স্থবিরবাদী বৌদ্ধদের যে-সমস্ত কেন্দ্র ছিল, তাহার তালিকায় বঙ্গের উল্লেখ আছে। এই লিপি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ বলিয়া গৃহীত। 'বঙ্গ' শব্দ এই সময় বাংলা দেশের কোন্ অংশবিশেষকে বুঝাইতেছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না, তবে মনে হয়, ইহা পূর্ববঙ্গ হইতে পারে।

বগুড়ার মহাস্থানে মৌর্য-যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 'পুদনগল' বা পুণ্ড্রনগরের নাম আছে, ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া ইহার মধ্যে 'ছবগ্গিয়' (ষড়বর্গীয়) নামে এক বিদ্রোহী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন।[২২৫] এই পাঠ যদি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়, তবে খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

প্রাক্-গুপ্ত যুগে আর্য-বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(২) গুপ্ত-যুগ

গুপ্ত-যুগ ভারতীয় বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, কাব্য, নাটক, স্থাপত্য, মূর্তিশিল্প প্রভৃতির এবং সংস্কৃত ভাষার চরম বিকাশের যুগ। পারমার্থিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ভারতীয় মনীষা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, বাংলাকে তাহা প্রথম স্পর্শ করিল। গুপ্ত-যুগেই বাংলা দেশ প্রথম সর্বভারতীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত যুক্ত হইল।

ধর্ম সম্বন্ধে উদার দৃষ্টিভঙ্গী, পরধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির একটা সমন্বয়ের চেষ্টা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে অনুরাগ ছিল গুপ্ত-সম্রাটগণের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ধর্মে উদারতা কম-বেশি প্রায় সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় নৃপতিরই ছিল। অশোক বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্মকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া গ্রহণ করিলেও নিজেকে 'দেবানাং প্রিয়' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; অন্যধর্মাবলম্বী

২২৪। Epigraphia Indica, XX, P. 22ff.

২২৫। Indian Historical Quarterly, X, P. 57ff.

আজীবিকদিগের জন্য গুহাও নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। গুপ্তসম্রাটগণ সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলার পাল-রাজগণ ধর্ম সম্বন্ধে এই উদারতা ও সমন্বয়-প্রচেষ্টার চরম উদাহরণ দেখাইয়াছিলেন। সেন-যুগে অবশ্য এই উদারতা ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল এবং মুসলমান-যুগে ইহার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল হইয়াছিল। গুপ্ত-সম্রাটগণের সময়ে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম—বৈষ্ণব, শৈব, সৌর প্রভৃতি ধর্ম প্রবলভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পাশে অবৈদিক বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মও নির্ভয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠ-ভাবেই বিরাজ করিত। গুপ্ত-সম্রাটগণ ছিলেন 'পরমভাগবত'—পরম বৈষ্ণব, কিন্তু বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা দেখা যায় নাই, বরং বৌদ্ধবিহারের জন্য তাঁহারা ভূমিদান করিয়াছেন—এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। গুপ্ত-সম্রাটগণের রাজত্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল। তাহার পরবর্তী কালে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসারের নানা প্রমাণ আমরা চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে পাই। বাংলায় গুপ্ত-যুগ বিশেষ করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিস্তারের যুগ হইলেও অবৈদিক বৌদ্ধধর্মের গতি রুদ্ধ হয় নাই।

গুপ্ত-যুগে দেখা যায়, বাংলায় বৈদিক ধর্ম প্রসার লাভ করিতেছে। ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদীয় শাখার এবং বিভিন্ন গোত্রের বহু ব্রাহ্মণ এখানে বসবাস স্থাপন করিতেছেন—ইহা এই যুগের অনেক লিপি হইতে জানা যায়। ব্রাহ্মণদের বৈদিক যজ্ঞ-কার্যের জন্য ভূমি-দান দাতা ও তাহার পিতামাতার পক্ষে পুণ্যকার্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।[২২৬] অগ্নিহোত্র, পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক ধর্ম-কার্যের জন্য ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইয়াছে।[২২৭] প্রথম কুমারগুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্ত-সম্রাটগণের এইসব তাম্রশাসনের প্রমাণ ছাড়াও পরবর্তী সময়েও যে বাংলায় বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতি প্রসার লাভ করিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাস্করবর্মার নিধনপুর-তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভূতিবর্মার রাজত্বকালেই বাংলার পূর্বপ্রান্তে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে বিভিন্ন গোত্রের এবং ঋগ্বেদের বাহ্‌বৃচ্য-শাখার, সামবেদের ছান্দোগ্য শাখার, যজুর্বেদের

২২৬। Dhanaidaha Copperplate—**Epigraphia Indica, XVII, Page 345ff** এবং Damodarpur C.P.—**E. I., XV, P. 134ff.**

২২৭। Damodarpur C.P.—**E. I., XV, No. I, No. II, Page 129ff.**

বাজসনেয়ী, চারক্য ও তৈত্তিরীয় শাখার দুইশত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া বসানো হইয়াছে।[২২৮] সপ্তম শতাব্দীতে 'সামন্ত' লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসনে দেখা যায়, বাংলার দুর্গম পূর্বপ্রান্তে চতুর্বেদে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের বসতি-স্থাপন করান হইয়াছে।[২২৯]

এই যুগে বৈদিক যাগ-যজ্ঞমূলক ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হইলেও, ধর্ম সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিবর্তন হইতেছে পৌরাণিক দেবদেবী-পূজার প্রচলন। এই যুগে বৈদিক দেবতাগণের অধিকাংশই নানা পুরাণ-বর্ণিত মূর্তিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় বিবর্তন হইয়াছে ভক্তিমূলক ভাগবতধর্মের বা বৈষ্ণবধর্মের। খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে খুব-সম্ভব অত্যধিক যজ্ঞ-ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে মথুরার বৃষ্ণি বা সাত্বত-বংশীয় কৃষ্ণ-বাসুদেবকে অবলম্বন করিয়া ভারতে ভাগবত-ধর্মের আবির্ভাব হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এই কৃষ্ণ-বাসুদেবের ভক্তগণই ভাগবত নামে খ্যাত।[২৩০] বেসনগর ও ঘোষাণ্ডী-প্রস্তর-লিপি প্রভৃতি হইতে ইতিহাস-সম্মতভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভাগবত-ধর্মের বিশেষ অস্তিত্ব ছিল। এই ভাগবতধর্মের ক্রম-বিবর্তনে গুপ্ত-যুগে যে ভাগবতধর্ম দেখা যায়, তাহার মধ্যে কৃষ্ণ-বাসুদেব, বিষ্ণু, নারায়ণ, গোপাল প্রভৃতি একত্রে মিশিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম ঋগ্বেদের দেবতা বিষ্ণু, পঞ্চরাত্র-মতের নারায়ণ, সাত্বত-বংশীয়দের কৃষ্ণ-বাসুদেব, পশুপালক আভীর জাতির গোপালের সমন্বয়ে গঠিত ভাগবতধর্মের এক নূতন রূপ। ইহার সঙ্গে পুরাণের অবতারবাদ যুক্ত হইয়া গুপ্তযুগে এক অভিনব ভাগবতধর্ম বা বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব হইয়াছে। বাংলাতেও এই পর্বে আমরা সেই বৈষ্ণব-ধর্মেরই প্রচলন দেখি।

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে কখন মূর্তি-পূজার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। মূর্তিপূজার মূলে আছে ভক্তিবাদ। কোনো দেবতাকে ভক্তির দ্বারা তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবার কামনা হইতেই মূর্তি-

২২৮। Nidhanpur C.P.—E. I., XII, Page 65ff.

২২৯। Tippera C.P.—E. I., XV, Pages 301-315.

২৩০। **The Early History of the Vaishnava Sect**—Dr. H. C. Roychowdhury, Page 23 এবং **Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems**—R. G. Bhandarkar, Pages 15-16.

পূজার উদ্ভব বলিয়া মনে হয়। বৈদিক দেবতাদের কোনো মূর্তি কল্পিত হয় নাই, তাঁহাদের পরিতুষ্টির জন্য যজ্ঞ-কর্মের অনুষ্ঠান করা হইত এবং ঘৃত ও অন্যান্য দ্রব্যাদি অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু একটি দেবতা, কিন্তু পরবর্তী সময়ের বৈষ্ণবদের উপাস্য বিষ্ণুর সহিত তাঁহার বহু পার্থক্য বর্তমান। বেদের বিষ্ণু একজন প্রধান দেবতা, কিন্তু ইন্দ্রের নীচে তাঁহার স্থান; তিনি যজ্ঞের ধারক,[২৩১] শতপথ ব্রাহ্মণে তিনিই যজ্ঞ,[২৩২] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞের রক্ষা-কর্তা।[২৩৩] বেদ বা ব্রাহ্মণের বিষ্ণুর সঙ্গে যজ্ঞের সম্বন্ধই অতি ঘনিষ্ঠ, ভক্তির সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নাই। পরবর্তী কালের বিষ্ণু ভক্তি দ্বারাই লভ্য এবং ভক্তিই তাঁহার উপাসনার একমাত্র অঙ্গ।

বৈষ্ণবধর্মের মতো শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম-শাখার দেবতাগণের মূর্তি-কল্পনা ও পূজার উদ্ভব হইয়াছে ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া পূজা-অর্চনা করিয়া উপাস্য দেব-দেবীকে তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের প্রসাদ লাভ করিবার আদর্শ হইতে। রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যে এবং নানা পুরাণাদিতে দেব-দেবীর কীর্তি-কাহিনী ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এই মহাকাব্য ও পুরাণ-বর্ণিত দেব-দেবীকে অবলম্বন করিয়া মূর্তি-কল্পনা ও মূর্তি-পূজার সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাই পৌরাণিক ধর্ম বলিয়া কথিত। তাহার পরে এই সব ধর্ম-মতের যথাসম্ভব দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচিত হইয়াছে এবং ক্রমে এই সব ধর্ম-মত এক একটি পূর্ণাবয়ব ধর্ম-মতে পরিণত হইয়াছে। গুপ্ত-যুগেই এই পৌরাণিক ধর্মের একটা স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত রূপ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিকদের মতেও এই গুপ্ত-যুগেই বা তাহার কিছু পূর্ব হইতেই প্রধান পুরাণগুলির মূল রূপ সংকলিত বা রচিত হয়।[২৩৪] এই পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাসনা বা পূজার ধারা পাল ও সেন-যুগের মধ্য দিয়া ক্রমেই বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে এবং এখনও প্রধান ধর্ম-ধারা-রূপে বাংলায় বিরাজ করিতেছে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দেখা যায়, বাংলায় বিষ্ণু-পূজা প্রচলিত হইয়াছে।

২৩১। ঋগ্বেদ—১,১৫৬,৩—"ঋতস্য গর্ভম্"

২৩২। শতপথ ব্রাহ্মণ—১, ৯, ৩, ৯

২৩৩। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩, ৩৮

২৩৪। The Early History of the Vaishnava Sect—Dr. H. C. Roychowdhury, Pages 177-79.

বাঁকুড়া শহরের বারো মাইল উত্তরে শুশুনিয়া পাহাড়ের এক গুহার প্রাচীর-গাত্রে একটি বিষ্ণু-চক্র খোদিত ও তাহার নীচে চক্র-স্বামীর সেবক বলিয়া রাজা চন্দ্রবর্মার নাম উৎকীর্ণ আছে। মনে হয়, গুহাটি চক্র-স্বামী বিষ্ণুর মন্দির-রূপেই পরিকল্পিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি-লিপিতে উল্লিখিত সিংহবর্মার পুত্র পুষ্করণরাজ চন্দ্রবর্মা ও এই চন্দ্রবর্মা যে অভিন্ন, অনেক ঐতিহাসিক ইহাই ধারণা করেন।[২৩৫] শুশুনিয়া পাহাড়ের ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বর্তমান পোকর্ণ গ্রামে প্রাচীন স্মৃতির অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে বগুড়া জেলায় হিলির নিকটবর্তী বালিগ্রামে গোবিন্দস্বামীর এক মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় বৈগ্রাম তাম্রশাসন হইতে। ঐ মন্দিরের ভগ্নাবস্থা-সংস্কারের জন্য ভূমিদান করা হইতেছে।[২৩৬] পঞ্চম শতাব্দীর শেষপাদে ৪নং এবং ৫নং দামোদরপুর-তাম্রশাসনে দেখা যায়, উত্তর বঙ্গে ও হিমালয়-শিখরে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামী নামক দুই দেবতা ও একটি 'মহালিঙ্গ'-প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্দির-নির্মাণের জন্য এবং শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দির-সংস্কার ও তাঁহার পূজায় বলি, চরু, সত্র, গো-দুগ্ধ, ফল, ধূপ-ধুনা, মধুপর্ক প্রভৃতি যোগাইবার জন্য ভূমি ক্রয় করা হইতেছে।[২৩৭] শ্বেতবরাহস্বামী বরাহ-অবতার বিষ্ণুর একটি রূপ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কোকামুখস্বামীকে কেহ বলেন বিষ্ণু, কেহ বলেন শিব। ষষ্ঠ শতকের প্রথমেই মহারাজ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, ত্রিপুরা জেলায় প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।[২৩৮] প্রদ্যুম্নেশ্বরও বিষ্ণুর এক রূপ। লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, সপ্তম শতকে বাংলার শেষপ্রান্তে বন্যজন্তু-সংকুল বন-প্রদেশে ভগবান অনন্ত-নারায়ণের মন্দির ও তন্মধ্যে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সমতটে যে রাত-বংশের সামন্ত-নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন, ত্রিপুরা জেলার কেলান গ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ঐ রাত-বংশের শ্রীধারণ ছিলেন পুরুষোত্তমের পরমভক্ত

২৩৫। **Political History of Ancient India**—Dr. H. C. Roychowdhury. 4th Ed., Page 448.

২৩৬। Baigram Copperplate—**E. I.**, XXI, P. 78ff.

২৩৭। Damodarpur C.P., Nos. IV, V—**E. I.**, XV, Page 137ff.

২৩৮। Gunaighar C.P.—**Indian Historical Quarterly**, VI, Page 40ff.

২৩৯। ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৫৩, পৃঃ ৬৬৯—৭৪

বাংলায় প্রাপ্ত এবং মূর্তি-তত্ত্ববিদ্ কর্তৃক এই গুপ্ত-পর্বের বলিয়া অনুমিত কয়েকটি বিষ্ণু-মূর্তি হইতে ধারণা করা যায় যে, এই যুগেই পূর্ণাঙ্গ বিষ্ণু-পূজা বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে মালদহ জেলায় হাঁকরাইল গ্রামে প্রাপ্ত কিরীট-কুণ্ডল-হার-অঙ্গদ-যজ্ঞোপবীতশোভিত, শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-ধারী-চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্তি, বরিশাল জেলার লক্ষ্মণকাঠির গরুড়-বাহন-মূর্তি সপরিবার বিষ্ণু-মূর্তি, রংপুর জেলায় প্রাপ্ত অনন্তশয়ান ধাতু-নির্মিত বিষ্ণু-মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

এই গুপ্ত-পর্বে পুরাণ-বর্ণিত কৃষ্ণ-লীলা যে বৈষ্ণবধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল এবং কৃষ্ণ-লীলার কাহিনী যে বাংলায় খুব জনপ্রিয় ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুর-মন্দিরের পাথর ও পোড়ামাটির ফলকগুলিতে। জোড়া অর্জুনবৃক্ষ উৎপাটন, কেশীদৈত্য-বধ, চাণূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের মল্ল-যুদ্ধ, কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণ, নবজাত কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের গোকুলে গমন, রাখাল-বালকগণের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের অবস্থান, গোপীগণের সঙ্গে লীলা প্রভৃতির দৃশ্য সেই ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই ফলকগুলির মধ্যে সর্ব-প্রাচীনগুলি ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের আর একটি শাখা শৈবধর্ম। শিব বিভিন্ন মূর্তিতে ও বিভিন্ন নামে নানা পুরাণে ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে বর্ণিত। বিভিন্ন মূর্তিতে এবং বিভিন্ন আকৃতির লিঙ্গে তাঁহার পূজা প্রচলিত। আকৃতির মধ্যে চন্দ্রশেখর, নটরাজ, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, কল্যাণসুন্দর, অঘোররুদ্র, বটুকভৈরব, বিরূপাক্ষ, ঈশান প্রভৃতি শিবের নানা মূর্তি বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে। লিঙ্গ প্রধানতঃ দুই প্রকার—বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গ। এই দুই লিঙ্গ-রূপই বাংলায় প্রচলিত দেখা যায়।

গুপ্তযু-গ হইতেই যে ভারতে শৈবধর্মের ক্রম-প্রসার আরম্ভ হয় এবং শিব-মূর্তি ও লিঙ্গ-পূজা প্রচলিত হয়, গুপ্ত-যুগের লিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা-স্তম্ভ-লিপিতে কপিলেশ্বর ও উপমিতেশ্বর নামে দুইটি শিবমূর্তি-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা লিঙ্গ-মূর্তিও হইতে পারে।[২৪০]

২৪০। E. I., XXI, Page 4ff.

বাংলায় শৈবধর্মের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ৪নং দামোদরপুর-তাম্রশাসনে উল্লিখিত শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায়। ষষ্ঠ শতকের প্রথমেই যে শৈবধর্ম পূর্ববঙ্গে রাজপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, তাহা ধারণা করা যায় গুণাইঘর-তাম্রশাসন হইতে। ঐ তাম্রশাসনে মহারাজ বৈন্যগুপ্তকে "মহাদেব-পাদানুধ্যাত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌড়-রাজ শশাঙ্ক শৈবধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শশাঙ্কের মুদ্রায় শিবের ও নন্দী-বৃষের মূর্তি অঙ্কিত।[২৪১] কামরূপ-রাজ ভাস্কর বর্মাও যে শৈব ছিলেন, তাহা তাঁহার নিধনপুর-তাম্রশাসন হইতে বুঝা যায়। ঐ তাম্রশাসনের প্রথম চন্দ্রচূড় ও পিনাকীকে প্রণাম করিয়া আরম্ভ ও শেষে মহেশ্বরের বিজয় কামনা করিয়া শেষ করা হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকের রাজা সমাচার দেবের মুদ্রাতেও ঐরূপ নন্দী-বৃষের প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখা যায়।[২৪২] মনে হয়, এই রাজপরিবারটি শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। শৈবধর্মের নিদর্শন ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পাহাড়পুরের ফলক-গুলিতে। এই মন্দিরের পীঠপ্রাচীর-গাত্রের কয়েকটি ফলকে চন্দ্রশেখর শিবের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায় এবং দুইটি ফলকে লিঙ্গাকৃতিও বর্তমান। তাহার মধ্যে একটি সাধারণ বস্তুলিঙ্গ, অপরটি মুখলিঙ্গ—চতুর্মুখ লিঙ্গ। উভয় লিঙ্গেরই ব্রহ্মসূত্রের বেষ্টন লক্ষ্য করা যায়।[২৪৩] সপ্তম শতকের ব্রোঞ্জ-নির্মিত একটি চন্দ্রশেখর শিবের মূর্তি চব্বিশপরগণা জেলার জয়নগর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।[২৪৪] গুপ্ত-যুগের এই শৈবধর্ম পাল ও সেন-যুগে আরো প্রসার লাভ করে।

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যান্য শাখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো তাম্রশাসন বা শিলালিপি এই গুপ্ত-যুগে পাওয়া না গেলেও পৌরাণিক দেব-দেবীর অনেক মূর্তি ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে বাংলায় পাওয়া গিয়াছে। শৈবধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট গণেশ-পূজা পূর্বভারতে বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকিলেও বাংলায় গাণপত্য-

২৪১। **Catalogue of the Coins in the British Museum,** London—John Allan, Pages 147-48.

২৪২। **Journal of the Asiatic Society of Bengal**—N.S. XIX, Numismatic Supplement, Page 54ff.

২৪৩। **History of Bengal** (Dacca University), I, Chapter XIII, Part II (Iconography), Pages 440-42.

২৪৪। **Journal of the Indian Society of Oriental Art,** IX, Pages 147-48.

সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে পাহাড়পুরে পাথর, পোড়ামাটি ও ধাতব পদার্থে নির্মিত উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান অনেক গণেশ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নৃত্য-রত একটি গণেশ-মূর্তিও আছে। পরবর্তী যুগে অবশ্য বাংলায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গণেশ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু গাণপত্যধর্মের প্রচার ও প্রসার কোনো দিন বাংলায় হইয়াছিল কিনা, সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। তবে সমস্ত দেব-দেবীর পূজার প্রথমে গণেশ-পূজার বিধি পৌরাণিক পূজা-পদ্ধতিতে স্বীকৃত।

কার্তিকেয় দেবতার পূজা বর্তমানে বাংলায় প্রচলিত আছে। কুশান-যুগ হইতেই এই পূজা জনপ্রিয় হয় বলিয়া মনে হয় এবং গুপ্ত-সম্রাটগণের লিপিতে কার্তিকেয় দেবতার মন্দির-নির্মাণের উল্লেখ আছে।[২৪৫] কহ্লনের 'রাজ-তরঙ্গিনী'তে পুণ্ড্রবর্ধনে অষ্টম শতাব্দীতে কার্তিকেয় দেবতার এক মন্দিরের কথা উল্লিখিত আছে।[২৪৬] মনে হয়, গুপ্ত-পর্ব হইতে বাংলায় এই পূজার প্রচলন হয়। তবে কার্তিকেয় দেবতার উপাসক হিসাবে কোনো ধর্ম-সম্প্রদায় বাংলায় কোনো সময়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

সূর্য-পূজা বা সৌরধর্মের যে নিদর্শন আমরা প্রাচীন বাংলায় পাই, তাহার সহিত বেদের সূর্যদেবতার পূজার কোনো সম্বন্ধ নাই। ইহা প্রাচীন পারস্যের অগ্নি-উপাসক পুরোহিত-সম্প্রদায় মগীদের এবং আক্রমণকারী শক-কুশান শাসকগণের দ্বারা ভারতে আনীত সূর্য-পূজা।[২৪৭] ভারত তাহার অন্তর্নিহিত সমন্বয়-প্রতিভার শক্তিতে ইহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাবে সূর্যের ধ্যান, প্রণাম প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়া ইহা এখন বাঙালী ব্রাহ্মণের নিত্যপূজা ও নানা ব্রতের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

বাংলায় সূর্য-পূজার জনপ্রিয়তার একটি কারণ এই যে, দেব-পূজার দ্বারা

২৪৫। **Corpus Inscriptionum Indicarum**—Fleet, III, No. 10—Bilsad Stone Pillar Inscription, Page 42ff.

২৪৬। **Rajtarangini**—Translated by Sir Aurel Stein, IV, Page 420ff.

২৪৭। **Vaishnavism, Saivism etc.**—R. G. Bhandarkar, Pages 218-20 এবং Representation of Surja in Brahmanical Art—J. N. Banerjee, **Indian Antiquary**, 1925, Pages 161, 171.

অভীষ্ট-সিদ্ধি হওয়া ছাড়াও সূর্যের বিশেষ রোগ-প্রশমন-ক্ষমতা আছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। রাজশাহী জেলার কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুইটি সূর্য-মূর্তি বাংলার প্রাচীন সূর্য-মূর্তির নিদর্শন বলিয়া গৃহীত। এই সূর্য-মূর্তির পরিচ্ছদে নির্দিষ্ট কুশান-প্রভাব লক্ষিত হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ধারণা করেন। কুষাণ ও শক-রাজগণের মুদ্রা ও প্রস্তর-মূর্তিতে যে-ভাবের পরিচ্ছদ দেখা যায় এই মূর্তিতেও সেইরূপ পরিচ্ছদই দেখা যায়।[২৪৮] ইহা নিঃসন্দেহে আদি গুপ্ত-যুগের। বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্য-মূর্তিও প্রায় এই ষষ্ঠ শতাব্দীর। ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন-অঞ্চলের কাশীপুর গ্রামের সূর্য-মূর্তি এবং ঢাকা চিত্রশালার ধাতু-নির্মিত ক্ষুদ্র সূর্য-মূর্তিও গুপ্ত-যুগের। প্রথম দুইটি উল্লেখযোগ্য সূর্য-মূর্তিই উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। বাংলার এই অংশ ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত এবং এখানে গুপ্তাধিপত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুদিন অব্যাহত ছিল। গুপ্ত-সম্রাটগণের আমলে সৌর-উপাসনা উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশেষ প্রসার লাভ করে বলিয়া মনে হয়। কুমারগুপ্তের মন্দসৌর-শিলালিপিতে একটি সূর্য-মন্দির-নির্মাণের উল্লেখ আছে। ঐ লিপির আরম্ভে সূর্য-দেবতার এক দীর্ঘ প্রশস্তি আছে।[২৪৯] স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর-তাম্রশাসনে 'ইন্দ্রপুর'-এ (বর্তমান ইন্দোর) এক সূর্য-মন্দিরে নিয়মিত প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য দানের উল্লেখ আছে। মনে হয়, গুপ্ত-যুগেই বাংলায় সৌরধর্ম কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং পাল ও সেন-যুগে ইহার প্রতিপত্তি ক্রমেই যে বর্ধিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দেব-মূর্তির সংখ্যা-বৃদ্ধিতে। ভারতীয় রাজগণের লিপি-দৃষ্টে একটি কথা মনে হয় যে, বিখ্যাত রাজাদের অনেকেই হয় সূর্য-পূজক না হয় সূর্য-উপাসনার উপর বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। গুপ্ত-সম্রাটগণের কথা তো বলাই হইয়াছে, হর্ষবর্ধনের তাম্রশাসনেও দেখা যায় যে, তাঁহার পিতা প্রভাকরবর্ধন, পিতামহ আদিত্যবর্ধন, প্রপিতামহ রাজ্যবর্ধন সকলেই সূর্যদেবের ভক্ত ছিলেন ("পরমাদিত্যভক্তঃ")[২৫০] ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনও নিজেদের 'পরমসৌর' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ইহা কি রাজরাজড়াদের আভিজাত্য-সূচক ধর্ম ছিল ?

২৪৮। **History of Bengal** (Dacca University), I, Chapter XIV—(Sculpture—Dr. Niharranjan Roy), Pages 521-24.

২৪৯। C. I. I.—Vol. III—Fleet, No. 18, Page 79ff.

২৫০। E. I., I, Pages 72-73.

আমাদের আলোচ্য গুপ্ত-যুগে বাংলায় জৈনধর্মের কোনো শিলালিপি, তাম্র-শাসন বা মূর্তি প্রভৃতি নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। কেবল পঞ্চম শতাব্দীর পাহাড়পুর-তাম্রশাসনে উত্তরবঙ্গে একটি জৈনবিহার-নির্মাণের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই বিহার হয়তো চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। তাহার পর সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়ান-সাং-এর বিবরণে জানা যায় যে, নিগ্রন্থরা একটি প্রভাবশালী ধর্মসম্প্রদায় ছিল এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ের পাল বা সেন-লিপিতে তাহাদের উল্লেখ নাই। মনে হয়, অষ্টম শতাব্দী হইতেই বাংলায় জৈনধর্মের প্রসার রুদ্ধ হইয়া যায় বা ঐ ধর্ম বিলুপ্ত হয়। পরবর্তী সময়ে পশ্চিম ভারত হইতে জৈনধর্মাবলম্বী লোকেরা মুসলমান-যুগে উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে আসিয়া প্রাচীন ধর্মকে নূতন জৈনধর্মরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৫১]

এই যুগে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায়, বৌদ্ধ চীনা পর্যটকদিগের ভ্রমণ-কাহিনীই তাহার মূল ভিত্তি।

বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩৯৯—৪১৪ খৃঃ) ভারতবর্ষে আসেন এবং বাংলা দেশের তাম্রলিপ্তি বন্দরে দুই বৎসর অবস্থান করিয়া 'সূত্র নকল করেন এবং মূর্তি-অঙ্কনের কৌশল শিক্ষা করেন'।[২৫২] তাঁহার সময়ে তাম্রলিপ্তি বন্দরে বাইশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল, ইহার সকলগুলিই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল এবং তথায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। দেখা যায়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমেই বাংলার একটি নগরে বহু শ্রমণ বাস করিতেন। ফা-হিয়েন গঙ্গা পার হইয়া উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গে যান নাই, সেখানে গেলে সারা বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থাটা জানা যাইত।

বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রশাসনে (৫০৬ বা ৫০৭ খৃঃ) দেখা যায় যে, রুদ্রদত্ত নামে তাঁহার এক সামন্তরাজের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই ভূমি-দানের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল,—প্রথম, মহাযান-পন্থী ভিক্ষু শান্তিদেবের জন্য রুদ্রদত্ত আর্য-অবলোকিতেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত যে 'আশ্রম-বিহার' নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সংরক্ষণ; দ্বিতীয়, শান্তিদেব-

২৫১। **History of Bengal** (Dacca University), I, Chapter XIII, Page 411.

২৫২। **Records of Buddhist Kingdoms**—James Legge, Page 100: "Writing out his sutras and drawing pictures of images."

প্রতিষ্ঠিত 'অবৈবর্তিক' মহাযানী ভিক্ষুসঙ্ঘ[২৫৩] কর্তৃক ঐ বিহারে স্থাপিত বুদ্ধমূর্তির প্রতিদিন তিনবার গন্ধ পুষ্প ও ধূপাদিসহ পূজার ব্যবস্থা; তৃতীয়, ঐ বিহারবাসী ভিক্ষুদের অশন, বসন, শয্যাসন ও ভেষজের ব্যবস্থা। ঐ তাম্রপট্টে নিকটবর্তী কোনো স্থানে 'রাজ-বিহার' নামে আর একটি বিহারের উল্লেখ আছে। ঐ রাজ-বিহার রুদ্রদত্ত-নির্মিত আশ্রম-বিহারের পূর্বেই তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজ-বিহার ছাড়াও ঐ পট্টে আর একটি বৌদ্ধ-বিহারের উল্লেখ আছে। এই 'দ্বাদশাদিত্য'-উপাধিধারী বৈন্যগুপ্ত নিজে শৈব হইয়া ঐ 'রাজ-বিহার' নিজেও নির্মাণ করিয়া দিতে পারেন। তিনি প্রদ্যুম্নেশ্বর বিষ্ণুর মন্দির-নির্মাণ এবং মহাযানী বৌদ্ধভিক্ষুদের জন্য বিহার-নির্মাণ-ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিপুরা জেলার আর একটি তাম্রশাসন—কৈলান-তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, রাজা শ্রীধারণরাত পরম বৈষ্ণব হইলেও, তাঁহার মহা-সান্ধিবিগ্রহিক জয়নাথ একটি 'রত্নত্রয়'-এর অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিহারের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন। ধর্ম-বিশ্বাসে অবাধ স্বাধীনতা-দান ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রাচীন বাংলার শাসকগণের একটি অবিস্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। যাহোক, এই তাম্রশাসন হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমেই বাংলার পূর্বপ্রান্তে ত্রিপুরা জেলায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

চৈনিক পর্যটকদের মধ্যে হিউয়ান-সাং-এর বিবরণ প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান। হিউয়ান-সাং ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের পর সম্ভবতঃ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে বাংলায় আসেন। তিনি স্বচক্ষে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের তদানীন্তন কেন্দ্রগুলি—পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি—পরিদর্শন করিয়াছিলেন।[২৫৪] পুণ্ড্রবর্ধনে কুড়িটি বিহার ছিল, তাহাতে হীনযান ও মহাযান উভয়পন্থী তিন হাজারেরও অধিক ভিক্ষু বাস করিতেন। পুণ্ড্রবর্ধন-রাজধানীর তিন মাইল পশ্চিমে পো-সি-পো নামে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিহারটি অবস্থিত ছিল। তাহাতে অতি প্রশস্ত ও উচ্চ-ছাদ-বিশিষ্ট বহু কক্ষ ছিল। এই বিহারে সাতশত মহাযানী ভিক্ষু এবং পূর্বভারতের বহু বিখ্যাত শ্রমণ বাস করিতেন। এই বিহারের অনতিদূরেই

২৫৩। **Indian Historical Quarterly,** VI, Page 572.

২৫৪। **Buddhist Records of the Western World**—S. Beal (in one volume), Book X, Pages 194-204.

On Yuan Chwang's Travels in India—T. Watters, II, Pages 182-193.

ছিল অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি-সমন্বিত এক মন্দির। সমতটে ত্রিশটিরও অধিক বৌদ্ধ-বিহার ছিল, তাহাতে দুই হাজারেরও অধিক স্থবিরবাদী ভিক্ষু বাস করিতেন। কর্ণসুবর্ণে দশটি বিহার ছিল, তাহাতে দুই হাজারেরও অধিক সম্মিতীয় ভিক্ষু বাস করিতেন এবং তাম্রলিপ্তির দশটি বিহারে এক হাজারেরও অধিক ভিক্ষু বাস করিতেন। ইঁহারা কোন্ শাখাভুক্ত ছিলেন, তাহা হিউয়ান-সাং বলেন নাই। কর্ণসুবর্ণ-রাজধানীর নিকটে হিউয়ান-সাং লো-টো-মো-চি বিহার (রক্তমৃত্তিকা) নামে একটি সুবৃহৎ ও জাঁকজমকশালী বিহার দেখিয়াছিলেন।

হিউয়ান-সাং ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করেন এবং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ই-ৎ-সিং নামক এক চৈনিক পর্যটক তাম্রলিপ্তিতে আসেন। এই মধ্যবর্তী বছর ত্রিশেক সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ই-ৎ-সিং তাঁহার বিবরণীতে ৫৬ জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই ৫৬ জনের মধ্যে তা-চেং-তেং ও সেং-চি'র নাম উল্লেখযোগ্য। তা-চেং-তেং তাম্রলিপ্তিতে বারো বৎসর বাস করিয়া সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। ই-ৎ-সিং তাম্রলিপ্তিতে আসিলে পো-লো-হো বিহারে (বরাহ) তা-চেং-তেং-এর সঙ্গে দেখা হয় এবং ঐ বিহারে কিছুদিন বাস করেন। তাম্রলিপ্তি তখনও বৌদ্ধ-ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপেই বিরাজ করিতেছিল। সেং-চি সমতটে রাজভট নামে এক পরম উৎসাহী বৌদ্ধ রাজাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ঐ রাজা প্রতিদিন মৃত্তিকা দ্বারা হাজার বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিতেন এবং 'মহাপ্রজ্ঞা-পারমিতাসূত্র'-এর লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। তিনি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া বুদ্ধের সম্মানার্থ শোভাযাত্রা করিতেন এবং ঐ উপলক্ষে বহু দান করিতেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, ঢাকার নিকট আস্রফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন দুইটিতে[২৫৫] উল্লিখিত বৌদ্ধ খড়্গবংশীয় রাজা রাজরাজভট্ট ও এই চৈনিক পারিব্রাজকের রাজভট অভিন্ন।

এ মত গ্রাহ্য না করিলেও ইহা বলা যায় যে, সপ্তম খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে সমতটে এক বৌদ্ধ-রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। হিউয়ান-সাং সমতটে কেবল দুই হাজার স্থবিরবাদী শ্রমণই দেখিয়াছিলেন, সেং-চি রাজভটের রাজধানীতে চারি-হাজার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও এই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী কোন্

২৫৫। **Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, I, No. 6, Pages 85-91.**

সম্প্রদায়ের, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি খুব সম্ভব সমতটে মহাযান-সম্প্রদায়েরই প্রভাব ছিল। ইহা বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-তাম্রশাসন দ্বারাও সমর্থিত হয়।

একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের দুইটি প্রধান বিভাগ—হীনযান ও মহাযানের মধ্যে যে প্রভেদ আমরা বর্তমানে দেখি, সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-পর্যটকদের সময়ে সে ধরণের প্রভেদের বিচার করা হইত না। সংস্কৃত-বৌদ্ধ-গ্রন্থে আমরা দেখি, হীনযান বা শ্রাবকযান নবদীক্ষিত প্রাথমিক স্তরের সাধকদের জন্য বিহিত, মহাযান উন্নত স্তরের সাধকদের জন্য বিহিত—হীনযান মহাযানের নিম্নস্তরমাত্র। চীনা ও জাপানী বৌদ্ধগণও হীনযান ও মহাযান প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের দুইটি শাখাই মনে করেন—প্রথমটি অল্প উন্নত শ্রাবক বা অর্হৎদের জন্য—দ্বিতীয়টি অধিকতর উন্নত বোধিসত্ত্বগণের জন্য।

চৈনিক পর্যটকদের বিবরণ ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে আমরা দেখি যে, মোটামুটি সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার মন্দ ছিল না। তবে হিউয়ান-সাং অনেক বিহার ও সঙ্ঘারাম পরিত্যক্ত ও জনশূন্য দেখিয়াছেন। পরবর্তী দুইশত-আড়াইশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের যে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্র ছায়াপাতও এই পর্যায়ের বৌদ্ধধর্মে হয় নাই, দেখা যায়।

(৩) পাল-যুগ

গুপ্ত-যুগ হইতেই দেখা যাইতেছে যে, বাংলা সর্বভারতীয় আর্য বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং অবৈদিক আর্য বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি উভয়ের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও সহজেই অনুমেয় যে, বাংলার আঞ্চলিক আদিম জনসাধারণের একটি বিশিষ্ট ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত এই উভয় ধারার অন্তরাল দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। পাল-যুগে এই তিনটি ধারা সমন্বিত হইয়াই বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং বাঙালী জাতির রক্ত হইতে উদ্ভূত একটা নিজস্ব মানসিক শক্তি ও প্রবণতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বাঙালী জাতির নূতন ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই চারিশত বৎসরে ধর্মে, সাহিত্যে ও শিল্পে বাঙালীর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করিয়াছে। সে বিশিষ্ট ধর্ম

হইতেছে পৌরাণিক-তান্ত্রিক ধর্ম; সাহিত্যে সে বৈশিষ্ট্য গৌড়ী রীতি এবং শিল্পে তাহা রূপ ও ভাবের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের অপূর্ব মিশ্রণ।

ধর্মের-প্রসঙ্গই আমাদের আলোচ্য বিষয় হইলেও, সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই এই বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। গৌড়ী রীতি বাণভট্ট-পরিচারিত 'অক্ষর-ডম্বর', বা দণ্ডি-ব্যাখ্যাত 'অর্থ-ডম্বর', 'অলংকার-ডম্বর' প্রভৃতি কোনো 'ডম্বর' অর্থাৎ বৃথা আড়ম্বর বা নিরর্থক কোলাহল নয়। ধ্বনি-বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ দ্বারা এবং অলংকারের সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত প্রসাধনের দ্বারা ভাবের যে সৌন্দর্যময় প্রকাশভঙ্গী, তাহাই গৌড়ী রীতির প্রকৃত স্বরূপ। ইহা কোনো নিন্দা নয়, ইহা একটি বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গী—একটি জাতির আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর সংস্কৃত-কবিগণের মধ্যে এই রীতি উদ্ভূত হইয়া পাল-রাজগণের লিপি-মালার মধ্যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর শ্লেষাত্মক 'রামচরিত' কাব্যে, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন, সারণ প্রভৃতির রচনার মধ্যে এই রীতির কিছু কিছু নিদর্শন রাখিয়া, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ধ্বনি-সমারোহময় শব্দ-প্রয়োগ দ্বারা ভাব-প্রকাশে যে অনবদ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, 'গীতগোবিন্দ'ই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তারপর যখন প্রাদেশিক ভাষা-সৃষ্টি হইয়াছে, তখন বাংলা ভাষা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের বেশি অনুগামী হইয়াছে, এই ভাষায় এখনও অর্ধেকের উপর শব্দ তৎসম। এই ভাষাতেই ধ্বনি-সমৃদ্ধ, গাঢ়-বদ্ধ রচনা-রীতির সম্ভাবনা বেশি। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের চরম রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য-রচনায়। ধ্বনি-বৈচিত্র্যময় শব্দ-যোজনা এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যময় অজস্র অলংকার-ঐশ্বর্য দ্বারা ভাবপ্রকাশে যে অনবদ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান অংশই তাহার সাক্ষ্য বহন করে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক ইহা জানেন। ইহার দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

মূর্তি-শিল্পে বাঙালীর যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা পাল-যুগের ও সেন-যুগের বহু দেব-দেবীর মূর্তিতে পরিস্ফুট। নর-নারীর দেহের সমস্ত বাস্তব রূপকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-স্তরে অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত করিয়া তাহার উপরে একটি নৈর্ব্যক্তিক ধ্যানময়তার সূক্ষ্ম আবরণ বিছাইয়া সেই দেহকে একটি চিরন্তন ভাবের প্রতীক করিবার কৌশলটি এই বাঙালী শিল্পীরই বৈশিষ্ট্য। অষ্টম

শতক হইতে দ্বাদশ শতকের অধিকাংশ দেব-দেবীর মূর্তিতেই এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকটিত।

দেব-দেবীর আলিঙ্গন-বদ্ধ যুগল-মূর্তিতে এই বৈশিষ্ট্যটি আশ্চর্য-জনকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার মন্তব্যের সুষ্ঠু প্রমাণ উত্তরবঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত এবং কলিকাতার মুর্শিদাবাদ-আজিমগঞ্জের নাহার-সংগ্রহে রক্ষিত যুগনদ্ধ হেবজ্র-মূর্তিটি। পূর্ণ দেহ-মিলনের ইন্দ্রিয়জ বিপুল পুলককে একটি নৈর্ব্যক্তিক চিরন্তন আনন্দময়তার স্তরে কী অপূর্ব শিল্পকৌশলে উন্নীত করা হইয়াছে! তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 'মহাসুখবাদ' যে কি বস্তু, এই মূর্তিটি হইতে তাহার কিছু ধারণা করা যায়। উমা-মহেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর-মূর্তিতেও বাঙালী শিল্পীর এই বৈশিষ্ট্যটি পরিস্ফুট হইতে পারে। তবে বাংলা দেশে এরূপ কোনো বিশেষ মূর্তি কালের ধ্বংসশীল হস্ত এড়াইয়া আমাদের নিকট পৌঁছাইতে পারে নাই।

পৌরাণিক-তান্ত্রিক ধর্মই বাঙালী হিন্দুর মূলধর্ম। পৌরাণিক ধর্মকে পোষণ করে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও শ্রৌত সংস্কার। বেদের ধর্মকে সাধারণের জন্য প্রচার করিবার জন্যই পুরাণের সৃষ্টি বলিয়া কথিত। রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতির সাহায্যে যে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য জানা যায়, এইরূপ উক্তি আমরা মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও পাই।[২৫৬] সেইজন্য আমরা দেখি যে, গুপ্ত-যুগ ও সেন-যুগের সমস্ত রাজশক্তিই ইহার প্রসারের দিকে মনোযোগী হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী জনসাধারণ যে ধর্ম জীবনে আচরণ করে, তাহার বাহিরের দিকটা পৌরাণিক, কিন্তু তাহার অভ্যন্তর-ভাগ তান্ত্রিক।

যে উপাসনা-পদ্ধতির উপর কোনো ধর্ম নির্ভর করে, তাহার স্বরূপটি ধরিলেই সেই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ধরা যায়। এই ধর্মের মূলে আছে: (ক) মূর্তি-কল্পনা, (খ) মূর্তি-স্থাপন, (গ) পূজা—মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, জপ, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীক বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র, যোগ-ক্রিয়া, দীক্ষা-গ্রহণ প্রভৃতি।

বাঙালী হিন্দুর ধর্মে মূর্তি-কল্পনা সাধারণতঃ পৌরাণিক,—বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের দেব-কাহিনী, শৈব আগম প্রভৃতি হইতে গৃহীত। কতকগুলি দেবী-মূর্তির কল্পনা শৈব 'আগম' ও তাহার পরবর্তী সময়ের 'যামল' গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত, কারণ শিবের শক্তিরূপে দেবীর

২৫৬। মহাভারত—১, ১, ২৬৭।

কল্পনা শৈবধর্মেরই অন্তর্গত। তাহার উপর তন্ত্র-বর্ণিত দেবী-মূর্তিরও কিছু মিশ্রণ আছে। যুগল-মূর্তিগুলি উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতির উপর তন্ত্র-ধর্মের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

পূর্বে বলিয়াছি যে, তন্ত্র-ধর্ম, মন্ত্র ও অন্যান্য তান্ত্রিক আচার, দেবী-পূজা বা দেব-দেবীর সম্মিলিত পূজা বা জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক পূজা প্রভৃতি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একটা প্রাথমিক রূপ ধারণ করে গুপ্ত-যুগে পৌরাণিক ধর্মের আশ্রয়ে শৈব আগমগুলির মধ্যে, পরে কতকগুলি শৈব যামল প্রভৃতির মধ্যে। এখানেই হিন্দুর তন্ত্র-ধর্মের প্রাথমিক রূপ রচিত হয়। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগছী বলেন যে, অষ্টাদশ শৈব আগম নিঃসন্দেহে গুপ্ত-যুগে আবির্ভূত হয় এবং খুব সম্ভব গুপ্ত-যুগের শেষ দিকে ও পাল-যুগে তান্ত্রিক শক্তি-পূজার প্রচলন হয়।[২৫৭] দেবীপুরাণকে অনেক ঐতিহাসিক সপ্তম শতাব্দীতে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহাতে 'বামাচার' অনুসারে রাঢ়, বরেন্দ্র, কামরূপ, কামাখ্যা, ভোটদেশ প্রভৃতি স্থানে দেবীর বিভিন্ন মূর্তিতে পূজার কথা উল্লিখিত আছে।[২৫৮]

অতঃপর মূর্তি-স্থাপন। প্রথমে সাধারণতঃ মাটি বা কাঠ প্রভৃতিতে মূর্তি নির্মাণ করা হইত এবং সেগুলিকে নিজ নিজ বাস-গৃহ বা গৃহ-প্রাঙ্গণেই প্রতিষ্ঠিত করা হইত এবং নির্দিষ্ট তিথি বা পার্বণে তাহাদের পূজা-অর্চনা করিয়া নিকটবর্ত্তী নদী বা পুষ্করিণীতে বিসর্জন দেওয়া হইত। দেবার্চনাকারীদের আর্থিক সামর্থ্য-বৃদ্ধি, বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের অস্থায়ী মূর্তিকে চিরস্থায়ী করিবার প্রয়াস, অস্থায়ী মূর্তির নানা অসুবিধায় শেষে পাথরের বা ধাতুর-মূর্তি নির্মাণ করিয়া একটি স্থায়ী আশ্রয়-স্থল বা মন্দির-নির্মাণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই মন্দির ও স্থায়ী মূর্তি-নির্মাণ রাজা বা রাজ-কর্মচারী বা ধনী ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্পন্ন হইত। মন্দির ও মূর্তি-স্থাপন একটা বিশেষ পুণ্যকার্য বলিয়া গণ্য করা হইত। তাহার প্রমাণ আমরা বহু তাম্রশাসন ও শিলালেখ হইতে পাই। গুপ্ত-যুগের পূর্বে বলিয়া নির্ধারিত কোনো দেব-দেবীর মূর্তি বাংলায় পাওয়া যায় নাই, গুপ্ত-যুগে নির্ধারিত হইতে পারে—এমন মূর্তির

২৫৭। **Studies in the Tantras**—Dr. P. C. Bagchi, Pages 4ff and 102.

২৫৮। **New Indian Antiquary**—Bombay, V, P. 2ff.

সংখ্যাও খুব কম। পাল-যুগ হইতেই বাংলায় নানা রকমের মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজমহল পাহাড়ের পাথরই ইহাতে বেশি ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রোঞ্জধাতু-নির্মিত দুই-একটি মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে দুই-একটি মূর্তি সোনার পাত দিয়া মোড়াও দেখা গিয়াছে। অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয়প্রকার মূর্তিতেই বাংলায় পূজা চলিয়াছে।

তারপর পূজা। পূজা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার মধ্যে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের অংশই সর্বাপেক্ষা বেশি। তন্ত্র-আলোচনাকারী জনৈক পণ্ডিত বলেন: "বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান তাহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে।"[২৫৯] আসন, মুদ্রা, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, ন্যাস প্রভৃতি পূজার প্রধান অঙ্গগুলিই তান্ত্রিক। মূর্তিবাদী হিন্দুধর্মে মূল উপাসনার অঙ্গটি তান্ত্রিক হওয়ায় ক্রমে তন্ত্রের প্রভাব বাড়িয়া চলিয়াছে; যাহা ছিল গুহ্য, গুরু-উপদেশ-সাপেক্ষ ও অদীক্ষিত ব্যক্তির নিকট প্রকাশের অযোগ্য, তাহা ক্রমে পুরাণাদির মধ্যে স্থান লাভ করিতে লাগিল এবং শেষে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তন্ত্রগ্রন্থ-আকারে সংকলিত হইল। এ সম্বন্ধে পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মনে হয়, বৌদ্ধধর্মেও এই তান্ত্রিকতা প্রথম শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছিল। এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। মহাযান-শাখার মূর্তি-কল্পনার মধ্যে এই তান্ত্রিক মতবাদ বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ পায়। হিউয়ান-সাং সপ্তম-শতাব্দীর মধ্যভাগে যে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় দেখিয়াছিলেন,—সেই স্থবিরবাদ, সম্মিতীয়বাদ, সর্বাস্তিবাদ, মহাসাঙ্ঘিকবাদ প্রভৃতি পাল-যুগে আর ছিল না। এমনকি হিউয়ান-সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের নিকট যে, যোগাচার-দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—সেই যোগাচার বা মহাযানের আর একটি শাখা বিজ্ঞানবাদ—তাহারও আর কোনো আলোচনা বোধ হয় প্রধান প্রধান বিহারে বৌদ্ধাচার্যগণ করেন নাই। পরম-সৌগত পালরাজগণের লেখমালার প্রারম্ভে যে বন্দনা-শ্লোক আছে, তাহাতে সেই যুগের বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট রূপটি বুঝা যায় না। তবে তাঁহারা যে মহাযান-পন্থী ছিলেন, এইটুকু মাত্র বুঝা যায়। কিন্তু অষ্টম শতাব্দী হইতে বাংলায় এক নূতন বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হইয়া

২৫৯। তন্ত্রকথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পৃঃ—৶০

সমস্ত পূর্ব-ভারত ও তিব্বত পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিল। ইহাই তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম—ইহাই কালচক্রযান, বজ্রযান, শেষে সহজযান নামে বাংলা-দেশে বৌদ্ধরাজগণের ছত্র-ছায়ায় চারিশত বৎসর ধরিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়া অবস্থান করিয়াছিল।

এই তন্ত্র-ধর্মের উপর প্রবণতা বাঙালী জাতির মজ্জাগত। তাহার কারণ, মনে হয়, বাঙালী জাতির মধ্যে আর্য-রক্ত খুব কম। বহুদিন পর্যন্ত বাংলা আর্য-সংস্রব ও সংস্কৃতির বাহিরে ছিল। ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই আদিম আর্যেতর জাতি। মন্ত্রের উপর বিশ্বাস, অলৌকিকত্বে আস্থা, মন্ত্র ও অনুষ্ঠানাদি এবং নানা গুহ্যসাধনার দ্বারা শক্তি লাভ প্রভৃতিতে ইহাদের সংস্কার বদ্ধমূল। ক্রমে উপরের স্তরের অল্পসংখ্যক লোক বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু অধিকাংশই এই প্রভাবের বাহিরে রহিল। তারপর এই শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ঊর্ধ্বস্তরের সম্প্রদায় ধর্মের বিবর্তন-প্রভাবে ক্রমে পৌরাণিক ধর্ম ও মূর্তি-পূজা যখন গ্রহণ করিল, তখন অগণিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের ধর্ম-বিশ্বাসকে তাহাদের ধর্মের অঙ্গীভূত করিতে হইল। ইহা একপ্রকার জনসাধারণের দাবী এবং উচ্চ সম্প্রদায়কে সে দাবী মানিতে হইয়াছিল। এইটিই পূজা-অংশের মন্ত্র, ন্যাস প্রভৃতি তান্ত্রিকতা, যাহা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত-যুগ হইতেই মূর্তি-পূজার সঙ্গে সঙ্গেই এই তান্ত্রিকতা হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয় বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধধর্মেও ঠিক এই একই কথা। নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতেই অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এবং আদিম জাতির সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কার তাহাদেরও ছিল। সেইগুলি মন্ত্র ও ধারণী আকারে বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীভূত হয় প্রথম শতাব্দী হইতে। তারপর মহাযানের সর্বকল্যাণ-উদ্দেশ্য ও মূর্তি-কল্পনার মধ্যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা প্রথম আশ্রয় লাভ করিল। নাগার্জুনের শূন্যবাদ, অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতির সূক্ষ্মদার্শনিক তত্ত্ব ও সাধন-ক্রম সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়, তাই বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব-রক্ষা, প্রসার-সম্পাদন ও জনপ্রিয়তা-রক্ষার জন্য আদিম অধিবাসীদের নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাস, মন্ত্রের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস ও নানা গুহ্যক্রিয়াদি বাধ্য হইয়া ইহাকে গ্রহণ করিতে হইল। ইহাও জনসাধারণের দাবীতে সংঘটিত হইল। হিন্দু ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা উভয়েরই মূল হইতেছে মন্ত্র-শক্তিতে বিশ্বাস—মন্ত্রই অভীষ্ট-লাভের

একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার। আদিম সমাজের মন্ত্র-মাহাত্ম্য ক্রমে বৌদ্ধাচার্যগণ স্বীকার করিলেন এবং শেষে এমনই হইল যে, মন্ত্র ও তদনুষঙ্গিক ক্রিয়া দ্বারাই বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়, ইহাই তাঁহারা প্রচার করিলেন।[২৬০]

রাজধর্মের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা চিরদিনই ধর্মকে নববল ও প্রেরণা দেয়। রাজধর্ম অন্যধর্মে হস্তক্ষেপ না করিলেও, সাধারণ লোক রাজার ধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। গুপ্ত-যুগে হিন্দু-প্রাধান্যে আদিবাসীদের ধর্ম হিন্দু-তন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পূর্ব হইতেই মন্ত্র, ধারণী, মূর্তি-পূজা-রূপে আদিবাসীদের ধর্ম প্রবেশ করিলেও নূতন শক্তিতে, নূতন রূপে প্রকাশ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। পাল-যুগে জনসাধারণেরই প্রতিনিধি পাল-রাজগণের প্রবল আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া বৌদ্ধধর্ম অনেকটা হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজেকে নূতনভাবে রূপায়িত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা হিন্দুতান্ত্রিকদের অনুসরণে বহু দেব-দেবী সৃষ্টি করিল, হিন্দুদের নিকট হইতেও কিছু গ্রহণ করিল। হিন্দুরাও বৌদ্ধ-দেব-দেবীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইল এবং তাহাদের দেব-দেবী হইতে কিছু গ্রহণ করিল। উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। এ-যুগের মূর্তিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তারপর দীর্ঘদিন চলিল এই বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রভাব। বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির মূল কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা পরবর্তী হিন্দুদের মধ্যে একটু ভিন্ন আকারে দেখা যায়, কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি উপধর্ম-শাখার মধ্যে তাহা রক্ষিত হইয়াছে। তারপর যখন পাল-যুগ শেষ হইল, তখন বৌদ্ধদেব-দেবী ও তান্ত্রিক সাধনা একেবারে হিন্দুদেব-দেবী ও তান্ত্রিক-সাধনার সঙ্গে মিশিয়া গেল এবং মুসলমান-আগমনের পর বৌদ্ধ অভিধা একেবারে বিসর্জিত হইয়া হিন্দুতন্ত্রে পরিণত হইল।

২৬০। Journal Asiatique, Tome CCXXV, No. 2, Buddhistic Researches—Rahula Sankrityana.

ধর্মের বিবর্তনের রেখাগুলি এইভাবে অঙ্কিত করা যায় :

	মূর্তি	পূজা ও সাধনা
গুপ্ত-যুগ	১। বিবিধ পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য, আগম প্রভৃতি হইতে দেব-দেবী ২। হিন্দুতন্ত্র হইতে দেব-দেবী	১। সামান্য অংশ বৈদিক এবং ২। অধিকাংশ হিন্দু-তান্ত্রিক
পাল-যুগ	১। পৌরাণিক দেব-দেবী ২। হিন্দুতন্ত্রের দেব-দেবী ৩। বৌদ্ধতন্ত্রের দেব-দেবী	১। সামান্য অংশ হিন্দুতান্ত্রিক এবং ২। অধিকাংশই বৌদ্ধতান্ত্রিক
সেনযুগ	১। পৌরাণিক দেব-দেবী ২। হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মিশ্রিত এবং হিন্দুতন্ত্রে রূপায়িত দেব-দেবী	বৌদ্ধতান্ত্রিক ও হিন্দুতান্ত্রিক মিশ্রিত কিন্তু হিন্দু-পরিচায়িত
পরবর্তী যুগ	পৌরাণিক ও হিন্দুতন্ত্রের মিশ্রিত দেব-দেবী	হিন্দু-তান্ত্রিক

দেখা যায়, এইভাবে বিবর্তিত হইয়া ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে হিন্দু বাঙালীর মূলধর্ম একাধারে পৌরাণিক-তান্ত্রিক রূপ ধারণ করিয়াছে এবং এখন পর্যন্ত সেই রূপই অপরিবর্তিত আছে।

এই যুগের ধর্মের অবস্থা আলোচনার প্রথমে একটি তথ্য লক্ষণীয়। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম পাশাপাশি সমানভাবে চলিয়াছে, অথচ উভয়ই সমান স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, বিরোধ বিশেষ লক্ষিত হয় নাই, বরং সমন্বয়ের চেষ্টা চলিয়াছে। মনে হয়, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী বাঙালী-সম্প্রদায় পৌরাণিক ধর্ম, পুরাণ-কাহিনী-গত নীতি ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে ; কিন্তু জনসাধারণ নানাকারণে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং উহাকে গ্রহণ করিয়াছে।

এই যুগের লিপিগুলিতে দেখা যায় যে, গুপ্ত-যুগের মতোই বৈদিক ধর্ম ও ক্রিয়া-কাণ্ড সগৌরবে প্রচলিত আছে, কিন্তু পৌরাণিক ধর্মই বিশেষ প্রসার লাভ

করিয়াছে। এই লিপিগুলির মধ্যে নানা পৌরাণিক ঘটনা, পুরাণ ও মহাকাব্য-বর্ণিত বীর ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য, তাহাদের নীতি ও আদর্শ উপমা, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি রূপে বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। এই লিপিগুলির রচয়িতা পণ্ডিত ও সমাজের উচ্চস্তরের লোক হওয়াই সম্ভব। বাংলার তখনকার ধর্ম ও সংস্কৃতিতে যেন মহাকাব্য ও পুরাণের আবহাওয়া ঘনীভূত।

দেবপালের মুঙ্গের-তাম্রশাসন,[২৬১] নারায়ণপালের বাদাল গরুড়-স্তম্ভলিপি,[২৬২] প্রথম মহীপালের বাণগড়-তাম্রশাসন,[২৬৩] তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছী তাম্রশাসন,[২৬৪] মদনপালের মনহলি-তাম্রশাসন[২৬৫] প্রভৃতিতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বেদে এবং বেদাঙ্গ-মীমাংসা-তর্ক-ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিভিন্ন গোত্র-প্রবরের ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করা হইতেছে। এই বাণগড়-তাম্রশাসন ও আমগাছী-তাম্রশাসনে এবং ধর্মপালের খালিমপুর-তাম্রশাসন[২৬৬], দ্বিতীয় গোপালের জাজিলপাড়া-তাম্রশাসন[২৬৭], কম্বোজ-রাজ নয়পালের ইর্দা-তাম্র-শাসন[২৬৮] প্রভৃতিতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান, বিশেষভাবে মধ্যদেশ হইতে বিভিন্ন গোত্র ও প্রবরের, বিভিন্ন বৈদিক শাখার ও বিভিন্ন বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা বাংলায় আসিয়া বাস করিতেছেন। বাদাল-প্রস্তর-লিপিতে পাল-রাজগণের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীদের যে প্রশস্তি পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, প্রায় সকল মন্ত্রীই বেদ-বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং বৈদিক যজ্ঞ-হোমাদি ক্রিয়ায় পারদর্শী ছিলেন।

তবে পৌরাণিক ধর্ম-সংস্কার ও ভাব-কল্পনা যে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর উপর,

২৬১। **Epigraphia Indica,** XVIII, Page 304ff; গৌড়লেখমালা—পৃঃ ৩৩

২৬২। E. I., II—Page 160ff, গৌড়লেখমালা—পৃঃ ৭০

২৬৩। E. I., XIV—Page 324ff; গৌড়লেখমালা—পৃঃ ১০১

২৬৪। E. I., XV—Page 293ff; গৌড়লেখমালা—পৃঃ ১২১

২৬৫। **Journal of the Asiatic Society of Bengal,** LXXIX, I—Page 68ff; গৌড়লেখমালা—পৃঃ ১৪৭

২৬৬। E. I., IV—Page 243ff.

২৬৭। ভারতবর্ষ, ১৩৫৪, ১ম খণ্ড—পৃঃ ২৬৪

২৬৮। E. I., XXII—Page 150ff; XXIV—Page 43ff.

বিশেষতঃ লিপি-রচয়িতা পণ্ডিত ও কবিদের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ লিপিগুলির মধ্যেই আছে।

"চন্দ্রের যেমন রোহিণী, অগ্নির যেমন স্বাহা, শিবের যেমন সর্বাণী, গুহ্যকপতি কুবেরের যেমন ভদ্রা, ইন্দ্রের যেমন পুলোমজা এবং বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী, সেইরূপ সেই [গোপালদেব] রাজার দেদ্দদেবী নাম্নী চিত্তবিনোদনকারিণী প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন।"[২৬৯]

"সত্যযুগে যে দানপথ বলিরাজা কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ত্রেতাযুগে যে দানপথে ভার্গব অগ্রসর হইয়াছিলেন, দ্বাপরে কর্ণ যাহার অনুসরণ করিতেন, কালক্রমে বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবে যে দানপথ কলিতাড়নে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এই রাজা কর্তৃক সেই [পুরাতন] দানপথ পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে।"[২৭০]

এই ভারতীয় মহাকাব্য-পুরাণের আবহাওয়ায় পুরাণাশ্রয়ী ধর্মগুলি যে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। ধর্মপালের খালিমপুর-তাম্রপট্ট-লিপিতে দেখা যায় যে, দেব-কূলে প্রতিষ্ঠিত 'ভগবন্নন্ন-নারায়ণদেবের পূজোপস্থাপনাদি কর্ম'-এর জন্য চারিটি গ্রাম দান করা হইয়াছে। 'নন্ন-নারায়ণ' বোধহয় নন্দ-নারায়ণ হইবেন—অর্থাৎ নন্দগোপাল-রূপী কৃষ্ণ-নারায়ণ। নন্দগোপাল কৃষ্ণের পূজা আমরা গুপ্ত-যুগ হইতেই বাংলায় প্রচলিত দেখিতেছি। এ-যুগেও তাহার ধারা চলিয়াছে। বাদাল-লিপির গরুড়-স্তম্ভ হইতে বুঝা যায় যে, নারায়ণের উদ্দেশ্যেই গরুড়স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম এ-যুগে বাংলায় যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ বাংলার নানা স্থানে নানা প্রকারের অসংখ্য বিষ্ণু-মূর্তি- আবিষ্কার হইতে পাওয়া যায়।[২৭১]

শৈবধর্মেরও লিপি-প্রমাণ পাওয়া যায়। নারায়ণপালের ভাগলপুর-তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, তিনি এক শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং শিবের পূজার জন্য এবং পাশুপত-আচার্যদের ভরণ-পোষণের জন্য ভূমি দান

২৬৯। খালিমপুর তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা—পৃঃ ১৯

২৭০। দেবপালের মুঙ্গের-তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা—পৃঃ ৪৪

২৭১। **History of Bengal** (Dacca University), I, Chapter XIII, II, Pages 433-438 (Iconography—Dr. J. N. Banerjee).

করিয়াছিলেন।[২১২] রামপালও তাঁহার রাজধানী রামাবতীতে শিবের তিনটি বৃহৎ মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি উচ্চ দেউল এবং সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির দেউল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। শিবেরও নানাপ্রকারের মূর্তি বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে।[২১৩]

শাক্ত দেবী-উপাসনার বিশেষ উল্লেখ এই পর্বে পাওয়া যায় না। ত্রিপুরা জেলায় দেউলবাদী গ্রামের বোঞ্জ-নির্মিত সর্বাণী মূর্তি বাংলায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শক্তি-মূর্তি (সপ্তম শতক) বলিয়া গৃহীত। এই পর্বে নারায়ণপালের গয়ার কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির-লিপিতে[২১৪] তান্ত্রিক দেবী মহা-নীলসরস্বতীর ('উরু-নীল-পদ্ম') প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে বলিয়া অনেক পণ্ডিত ধারণা করেন। এই পর্বে বাংলায় অনেক চতুর্ভুজা, দণ্ডায়মানা দেবী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে দেবী চণ্ডী বলিয়া অনেকে নির্ণয় করিয়াছেন। দিনাজপুরের মঙ্গলবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত দেবী-প্রতিমা, রাজশাহীর মান্দৈল গ্রামে প্রাপ্ত নবগ্রহের মূর্তি-যুক্ত একটি বৃহৎ প্রতিমা, বাঁকুড়ার দেওলী গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, খুলনার মাহেশ্বরপাসার প্রতিমা এই পালযুগের দেবী-প্রতিমার বিশিষ্ট নিদর্শন। দেবীর উপবিষ্ট মূর্তি খুব কম পাওয়া গিয়াছে, যে কয়টি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহারো চার হাত, কাহারো ছয়, কাহারো বা কুড়ি।

নওগাঁয় প্রাপ্ত (রাজশাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত) সর্বমঙ্গলা, নিয়ামৎপুরে প্রাপ্ত অপরাজিতা, যশোহরের শাঁখহাটি গ্রামের ভুবনেশ্বরী, রাজশাহীর সিমলা গ্রামের মহালক্ষ্মী এই পাল-যুগের দেবী-মূর্তির শিল্প-রীতির নিদর্শন। ইহা ছাড়া ঢাকার শাক্তগ্রামে দশভুজা মহিষমর্দিনী, দিনাজপুরের পোরষা গ্রামের নবদুর্গা-প্রতিমা, দিনাজপুরের বেতনা গ্রামের বত্রিশহস্তা চণ্ডিকা মহিষমর্দিনী-মূর্তিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছাড়াও বাংলার এই যুগের আরো কতকগুলি মাতৃকা-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মাতৃকা-মূর্তি সাতটি—ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বরাহী ও চামুণ্ডী। ইহারা কতকগুলি হিন্দুদেবতার শক্তি-রূপে

২১২। **Indian Antiquary**, XV—Page 304ff; গৌড়লেখমালা—পৃঃ ৫৫

২১৩। **History of Bengal** (Dacca University), I, Chapter XIII, II PP. 440-447 (Iconography—Dr. J. N. Banerjee).

২১৪। **Journal of the Asiatic Society of Bengal**, LXIX—Page 190ff; গৌড়লেখমালা—পৃঃ ৯১০

কল্পিতা। চামুণ্ডা বা চামুণ্ডীর মূর্তিই বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয় বলিয়া মনে হয়। এই চামুণ্ডার বিভিন্ন রূপ-কল্পনার মূর্তি রূপবিদ্যা, সিদ্ধযোগেশ্বরী, দন্তুরা, প্রভৃতি মূর্তি বাংলার নানা স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের বেতনা গ্রাম হইতে রূপবিদ্যার একটি, বর্ধমানের অট্টহাস হইতে দন্তুরার একটি, ঢাকা চিত্রশালার নৃত্যপরায়ণা সিদ্ধযোগেশ্বরীর কয়েকটি প্রতিমা উল্লেখযোগ্য।[২৭৫]

ইহা ছাড়া পাল-যুগে অনেক সূর্য-প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের বৈরহাট্টা গ্রামের একটি আসীন সূর্য-মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ আছে,—"সমস্ত-রোগানাম্ হর্তা।" সূর্যের আরোগ্যকারী শক্তিই ইহার জনপ্রিয়তার একটি কারণ বলিয়া মনে হয়। ঐ সঙ্গে সূর্য-পুত্র বলিয়া কথিত রেবন্ত-প্রতিমা ও ঐসঙ্গে অনেক নবগ্রহ-প্রতিমাও পাওয়া গিয়াছে।

এই যুগের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা হইতেছে এই যে, রাজশক্তি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ করেন নাই এবং মূলে নানা প্রভেদ থাকিলেও উভয় ধর্মই যেন একই ধর্মের দুইটি শাখা-রূপে অবস্থান করিয়াছে। পূর্বেও আমি এ-কথা উল্লেখ করিয়াছি।

পাল-রাজগণ ছিলেন 'পরমসৌগত'—মহাযানী বৌদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত তাম্রশাসনই প্রথমতঃ বুদ্ধের দীর্ঘ বন্দনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু পাল-বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ধর্মপাল বিবাহ করিয়াছিলেন রাষ্ট্রকূট-কন্যা দেদ্দদেবীকে। 'কম্বোজান্বয়' গৌড়রাজ রাজ্যপালও রাষ্ট্রকূটবংশীয়া কন্যা ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম বিগ্রহপালের পত্নী ছিলেন 'জাহ্নবীর ন্যায় হৈহয়-বংশ-ভূষণ-রূপা লজ্জা নাম্নী কন্যা'। তৃতীয় বিগ্রহপালের অন্য মহিষী ছিলেন হৈহয়-রাজ কর্ণদেবের দুহিতা যৌবনশ্রী। সব ক্ষেত্রেই স্বামী বৌদ্ধ—স্ত্রী হিন্দু-কন্যা। হরিকেল-রাজ কান্তিদেবের জননী ছিলেন শিবের উপাসিকা—'শিবপ্রিয়া'।

পাল-রাজগণ ভূমি দান করিয়াছেন 'মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ' পুণ্য-কামনায়। ধর্মপাল তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা-প্রতিষ্ঠিত 'নন্ন-নারায়ণ'-এর জন্য ভূমি দান করিয়াছেন, ইহা আমার দেখিয়াছি। নারায়ণপাল নিজে একসহস্র শিব-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন ("শ্রীনারায়ণপালদেবেন স্বয়ং কারিত-সহস্রায়তনস্ত") এবং কলসপোত নামক স্থানে যে শিব-মন্দির-নির্মাণ ও শিবের

২৭৫। **History of Bengal** (Dacca University) I, Chapter XIII, II, Pages 450-455 এবং 455-57 (Iconography—Dr. J. N. Banerjee).

পূজা ও পাশুপাত-আচার্যদের ভরণ-পোষণের জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন, ইহাও আমরা দেখিয়াছি এবং ঐ দান করিয়াছিলেন "ভগবন্তং শিবভট্টারকমুদ্দিশ্য"। প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়-তাম্রপট্টে দেখা যায় যে, বিষুব-সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া প্রথম মহীপাল কৃষ্ণাদিত্য শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। রামপাল তাঁহার রাজধানী রামাবতী নগরীতে শিবের অনেক মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, এ-কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মনহলি-লিপিতে দেখা যায়, মদনপালদেবের পট্টমহিষী চিত্রমতিকা দেবীকে বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণা-স্বরূপ মদনপাল শ্রীবটেশ্বরস্বামী শর্মাকে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-এ এই মদনপালকে "চণ্ডী-চরণ-সরোজপ্রসাদ-সম্পন্ন-বিগ্রহশ্রী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[২৭৬] 'কম্বোজান্বয়' পাল-বংশের রাজা রাজ্যপাল 'পরমসৌগত' হইলেও ভাগ্যদেবীর গর্ভোৎপন্ন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণপাল "বাসুদেবপাদাব্জ-পূজা-নিরত-মানসঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং রাজ্যপালের দ্বিতীয় পুত্র এক পুণ্যনবমী-তিথিতে স্নান করিয়া 'শঙ্কর-ভট্টারক'-এর উদ্দেশ্যে তাঁহার বৌদ্ধ পিতা-মাতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি-কামনায় ধর্মচক্র-মুদ্রা-অঙ্কিত তাম্রশাসনের দ্বারা ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছেন। এই যুগের 'পরমসৌগত' চন্দ্র-বংশীয় শ্রীচন্দ্রদেব কোটি-হোম-সম্পাদনকারী শান্তিবারিক শ্রীপীতবাস গুপ্তশর্মাকে বুদ্ধ-ভট্টারকের উদ্দেশে ধর্মচক্র-মুদ্রা-অঙ্কিত তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি আবার ঐ উদ্দেশ্যেই অদ্ভুতশান্তি-হোম-সম্পাদনকারী শান্তিবারিক ব্যাসগঙ্গা শর্মাকেও ভূমি দান করিয়াছিলেন। আর এক 'পরমসৌগত' খড়্গবংশীয় দেবখড়্গের পত্নী প্রভাবতী ছিলেন দুর্গার উপাসিকা। তিনি একটি সর্বাণী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তারপর পাল-রাজগণ যে পুরুষানুক্রমে হিন্দু ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা বাদাল-স্তম্ভলিপির প্রশস্তি ও অন্যান্য লিপি হইতে জানা যায়। 'দেবগুরু বৃহস্পতিতুল্য' গর্গ ছিলেন ধর্মপালের মন্ত্রী, 'বিদ্যা-চতুষ্টয়-মুখাম্ভরুহাগুলক্ষ্যা··· দ্বিজেশ' দর্ভপানি ছিলেন দেবপালের মন্ত্রী, দর্ভপানির পৌত্র 'চতুর্বিদ্যা-পয়োনিধি'-পানকারী অগস্ত্য-লাঞ্ছন কেদারমিশ্র দেবপাল ও বিগ্রহপাল উভয়েরই মন্ত্রী ছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী ছিলেন 'শাস্ত্রবিত্তম' যোগদেব। যোগদেবের

২৭৬। রামচরিত—৪, ২১

পুত্র 'তত্ত্ববোধভূ' বোধিদেব ছিলেন রামপালের মন্ত্রী এবং রামপালের পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব।

বৌদ্ধ রাজগণের এই সামাজিক আচার-ব্যবহার ও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মকে স্বীকার ও তাহার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব সমসাময়িক ইতিহাসের পক্ষে একটা গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। ইহাতে সাধারণ লোকের ধারণা হইয়াছিল যে, হিন্দু বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই। ইহাই সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুদের মতো বহু দেব-দেবী-পূজা-গ্রহণ করিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মহাযান পূর্ব হইতেই নানা ধ্যানী বুদ্ধের পূজার প্রবর্তন করিয়াছে, কিন্তু এইভাবে ধর্মের একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়া হিন্দুদের মতো অসংখ্য দেব-দেবী-পূজা-গ্রহণ বোধ হয় এই কারণে সম্ভব হইয়াছে। আবার হিন্দুরাও বৌদ্ধদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তাহারাও হিন্দু-পুরাণাদির বহির্ভূত বৌদ্ধদের অনেক দেবদেবীকে গ্রহণ করিয়াছে। উভয় ধর্মই যে মূলতঃ এক—এই বিশ্বাস এবং রাজশক্তির উভয় ধর্মের প্রতিই সমান ব্যবহার উভয় গোষ্ঠীর জনসাধারণকে এই আদান-প্রদানে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

পাল-যুগে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন বাংলার ধর্মের ইতিহাসে—শুধু বাংলা কেন ভারতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসেও—একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাল-রাজগণ—'কম্বোজান্বয়' পাল-রাজগণ ছিলেন—পরমসৌগত। চন্দ্রবংশীয় রাজারাও ছিলেন পরমসৌগত। পাল-বংশের রাজত্বের কিছু পূর্বে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের শাসক ছিলেন খড়্গবংশীয়েরা—তাঁহারাও ছিলেন বৌদ্ধ। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্মের একটি গৌরবময় যুগ। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এই সময় কেবল বাংলা ও বিহারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের অন্যান্য স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও এই সব রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচারণায় বৌদ্ধধর্ম মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

এই যুগের বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এবং ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে পরে নানপ্রসঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে। এখানে ইহার ধর্ম-তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া কেবল ইহার স্বরূপ ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করিব।

মন্ত্র—অর্থাৎ একটি বর্ণ বা একটি শব্দ বা একাধিক শব্দের গূঢ় শক্তিতে

বিশ্বাস, মুদ্রা—অর্থাৎ হস্ত ও অঙ্গুলীর বিভিন্ন ভঙ্গী ও তাহাদের স্পর্শ, শ্বাস-প্রাণায়াম—অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণ বা যোগ-ক্রিয়া, যন্ত্র—অর্থাৎ দেব-দেবীর স্বরূপের চিত্র-বিচিত্র সাংকেতিক চিহ্ন, ধর্ম-সাধনায় বা দেব-দেবীর পূজায় স্ত্রী-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তার ধারণা, বিভিন্ন গুহ্য ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন করান বা ইন্দ্রজাল-সৃষ্টির উপর আস্থা, ইন্দ্রিয়জ ভোগের মধ্য দিয়া ধর্মাচরণ প্রভৃতিকে আমরা সাধারণভাবে তান্ত্রিক ধর্মের আখ্যা দিয়া থাকি। আমি পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি যে, এই সব ধর্ম-বিশ্বাস ভারতের আদিম- আর্যেতর অসভ্য বা অর্ধসভ্য অধিবাসীদের। তাহারা ছিল সংখ্যায় অগণিত। মুষ্টিমেয়, সুসভ্য, জ্ঞান-বিদ্যা-সম্পন্ন আর্যগণ নানা বিরোধ ও মিলনের মধ্য দিয়া দীর্ঘ দিন ধরিয়া ইহাদের অধিকাংশকেই নিজ গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তির সময় আদিবাসীদের কিছু কিছু সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং ঐ সমস্তের উপর আর্য-ধর্ম ও সংস্কারের একটা প্রলেপ দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বেদের মধ্যে ও পরবর্তী উপনিষদের মধ্যেও ইহার নিদর্শন বর্তমান, ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মকে একবর্ণাত্মক মন্ত্র 'ওং' বা 'প্রণব'-রূপে ধ্যান করিবারও বিধান আছে।

এই তান্ত্রিক ধর্মের একটি ধারা বহুদিন পূর্ব হইতে বৈদিক আর্য-ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত ইহা প্রচলিত হিন্দুধর্মের দেব-দেবীকে আশ্রয় করে এবং তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে শৈব আগমগুলির মধ্যে একটা প্রাথমিক রূপ ধারণ করে এবং পরে যামল প্রভৃতি গ্রন্থে এবং আরো পরে তন্ত্রাদিতে পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়। হিন্দু দেব-দেবী-পূজা ও হিন্দু-দর্শনকে আশ্রয় করিয়া এই ধর্ম হিন্দু-তন্ত্রধর্ম নামে অভিহিত হয়। ঠিক এইভাবেই এই ধর্ম-ধারা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে। বৌদ্ধধর্মে যখন মহাযান-বিভাগ সৃষ্ট হইয়া 'বোধিসত্ত্ব'-বাদ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং 'মহাকরুণা'-প্রণোদিত হইয়া বোধিসত্ত্বগণ দুঃখ-পীড়িত জনগণের উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাণ গ্রহণ করিবেন না—এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন জনসাধারণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং বৌদ্ধ প্রচারকগণও তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই জনসাধারণের অধিকাংশই আদিম অধিবাসী। তাহারা তাহাদের নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি লইয়াই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে আসিল। তাহারা বোধিসত্ত্বের কৃপা-প্রার্থনাকেই সমস্ত দুঃখ-

কষ্ট-লাঘবের একমাত্র উপায় মনে করিল। কৃপা-প্রার্থনার মনোবৃত্তি হইতেই পূজার উদ্ভব। মহাযান-বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধকে দেবত্বে উন্নীত করিল, বহু বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হইল এবং বুদ্ধের দেবত্ব-জ্ঞাপনের জন্য তাঁহার মস্তকের চারিপাশে জ্যোতির্মণ্ডলী রচিত হইল। ক্রমে ভাবীবুদ্ধ মৈত্রেয়ের পূজা আরম্ভ হইল। মৈত্রেয় ছাড়া মঞ্জুশ্রী বা বাগীশ্বর, পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর ও বজ্রপাণি—এই গুণাত্মক ও ধ্যানাত্মক তিন কাল্পনিক বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হইল। এই পঞ্চদেবতার পূজা ব্যতীত জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলের আধার-স্বরূপ ত্রিরত্নেরও পূজা প্রবর্তিত হইল। পরবর্তী সময়ে আবার পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের সৃষ্টি হইল। এ-কথা পরে বলা যাইবে। বর্তমান জগতে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অধিকার যাইতেছে; তিনিই বর্তমান জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি অপার করুণাময় ও সকলের বরেণ্য। সুতরাং তাঁহার পূজাই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত হইল। এই পূজাতে মন্ত্রের প্রয়োজন, অন্যান্য পূজার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াদিও প্রয়োজন। তখন অগণিত জনসাধারণের দাবীতে বৌদ্ধধর্মে মন্ত্র, মুদ্রা প্রভৃতির প্রবর্তন হইল এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিয়াদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইল। বৌদ্ধাচার্যগণও মহাযানকে জনপ্রিয় করিবার জন্য ইহাদের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করিলেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিল।

বৌদ্ধধর্মেও এই তান্ত্রিকতা প্রথম কি দ্বিতীয় শতকে প্রবেশ করে। মন্ত্র-শক্তিতে বিশ্বাসই তান্ত্রিকতার ভিত্তি-প্রস্তর। বৌদ্ধধর্মেও মন্ত্রের প্রচলন হয়। 'ধারণী'গুলিই তাহার প্রথম রূপ, এ-কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন: "খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলির আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধ ক্ষান্তি পারমিতা, দান পারমিতা প্রভৃতি এবং অন্যান্য নানা বৌদ্ধতত্ত্ব দেবদেবীরূপে কল্পিত হইয়া নানারূপ পূজা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। নানারূপ বীজ মন্ত্রেরও কল্পনা করা হয়। এই সব বীজমন্ত্রগুলিকে ধারণী বলা হইত।" ২৭৭

ধারণী কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'যাহা দ্বারা কোনো কিছুকে ধরিয়া রাখা হয়' (ধারয়তে অনয়া ইতি)। যে গূঢ়-শক্তিসম্পন্ন শব্দ মানুষের ধর্ম-জীবনকে ধারণ করে, তাহাই ধারণী। সাধারণ লোক বৌদ্ধধর্মের দীর্ঘ সূত্রগুলি মনে রাখিতে

২৭৭। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পৃঃ ১৬১

পারিত না, সেইজন্য সেগুলিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া ধারণী-আকারে পর্যবসিত করা হইত। সেই ধারণীগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া নিয়মিত আবৃত্তি করিলে বোধিসত্ত্বের কৃপা লাভ করা যাইবে বলিয়া বৌদ্ধাচার্যগণ সাধারণ ধর্মাবলম্বীকে উপদেশ দিতেন। এই ধারণী হইতে বীজ-মন্ত্রের উদ্ভব। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য একটি বীজ-মন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাস দিয়াছেন। ৮ হাজার শ্লোক-বিশিষ্ট 'অষ্টসাহস্রিক-প্রজ্ঞা-পারমিতা' মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। একজন সাধারণ বৌদ্ধের পক্ষে এত বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই এই ৮০০০ শ্লোককে সংক্ষিপ্ত করিয়া কয়েকটি শ্লোকে পর্যবসিত করা হইল। তাহারই নাম হইল—'প্রজ্ঞা-পারমিতা-হৃদয়-সূত্র'; ইহাকেও সংক্ষিপ্ত করিয়া যাহা করা হইল, তাহার নাম হইল—'প্রজ্ঞা-পারমিতা-ধারণী'। ইহাকেও সংক্ষিপ্ত করিয়া করা হইল—'প্রজ্ঞা-পারমিতা-মন্ত্র'। ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া এক বর্ণাত্মক বীজমন্ত্র রচিত হইল—'প্রং'। এই 'প্রং'-মন্ত্র-জপের দ্বারা শূন্যতা প্রজ্ঞা-পারমিতা-দেবী-রূপে দেখা দিবেন। এইভাবে বিরাট প্রজ্ঞা-পারমিতা-ধর্ম-শাস্ত্রকে একটি বীজ-মন্ত্রে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। [২৭৮]

অবশ্য এই বীজ-মন্ত্র হিন্দুর পূজায় একটি অপরিহার্য অঙ্গ। হিন্দুধর্মে এই তান্ত্রিক অংশ অন্যান্য তান্ত্রিক অংশের সহিত সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া বর্তমান আছে। বর্তমান হিন্দুধর্ম পৌরাণিক-তান্ত্রিক ধর্ম, এ-কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের দেব-দেবী পৌরাণিক—পূজা তান্ত্রিক। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম-শাখার পূজাতেই বীজ-মন্ত্র প্রয়োজন। বিভিন্ন দেব-দেবীর বিভিন্ন বীজ-মন্ত্র আছে।

বৌদ্ধধর্মে মন্ত্র যখন একবার বিধি-সঙ্গতভাবেই প্রবেশ করিল, তখন বৌদ্ধাচার্যগণ মনে করিলেন, মন্ত্রই আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রেষ্ঠ সহায়। এই মন্ত্রযান হইতেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিল। মন্ত্রযানই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রথম স্তর।

প্রথম-দ্বিতীয় শতক হইতে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ জনসাধারণ ও বৌদ্ধাচার্যগণের চিন্তাধারা ও ধর্মাদর্শকে

২৭৮। **An Introduction to Buddhist Esoterism—Dr. B. Bhattacharya —Page 56.**

প্রভাবান্বিত করিতেছিল—এইরূপ মনে হয়, যদিও ইহার বাহ্য অভিব্যক্তির বিশেষ কোনো নিদর্শন বর্তমান নাই।

ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেন যে, বুদ্ধের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্মে এই তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়াছিল এবং বুদ্ধদেব সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের জন্য এই মন্ত্র, মুদ্রা প্রভৃতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন।[২৭৯] কিন্তু এই মতে কেহ বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন না। যোগাচার-দর্শনের ব্যাখ্যাতা অসঙ্গকে কেহ কেহ তান্ত্রিকতার প্রবর্তক বলিয়া মনে করেন। সপ্তম শতকে হিউয়ান-সাং ও ই-ৎ-সিং প্রভৃতি পর্যটকগণের বিবরণীতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। গুপ্ত-যুগ হইতে প্রবল ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিযোগিতায় এবং রাজশক্তির উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার অভাবে বৌদ্ধধর্ম অনেকটা নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল।

হিউয়ান-সাংয়ের বিবরণী হইতে বুঝা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতেই বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। ফা-হিয়ান যে সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম-কেন্দ্র ও বৌদ্ধ-বিহার উত্তমরূপে পরিচালিত দেখেন, হিউয়ান-সাং সেইগুলিকে পরিত্যক্ত ও ভগ্নদশা-গ্রস্ত দেখিয়াছেন; ইহা ছাড়াও বহু সংঘারাম ও বৌদ্ধমন্দির তিনি একবারে পরিত্যক্ত দেখিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি স্থান সৎ-ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থিকদের কবলে পড়িতেছে। এমন কি, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, কপিলাবাস্তু, কুশিনারা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলিরও তখন এই দশা। কেবল কান্যকুব্জে হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের উন্নতি লক্ষিত

এই বৌদ্ধধর্ম পাল-রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণায় নব কলেবর ধারণ করিয়া, নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া, তিন-চারি শতাব্দী সবলে বাঁচিয়া রহিল। এ-যুগের বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিকতায় পরিবর্তনের কারণ মনে হয় প্রধানতঃ দুইটি। একটি কারণ, প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। হিন্দুধর্মে বহু দেব-দেবী, পূজার নানা অনুষ্ঠান ও নানা গুহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া বর্তমান। সাধারণ লোক ধর্ম-অর্থে এই সব পূজা ও অনুষ্ঠানই বুঝিয়া থাকে। বৌদ্ধদর্শনের নানা

২৭৯। **An Introduction to Buddhist Esoterism**—Dr. B. Bhattacharya Page 48 এবং Introduction to Sādhanmāla, Vol. II, Pages XVI—XVII.

সূক্ষ্ম বিচার ও কঠোর নীতি তাহাদের নিকট কোনো আবেদন বহন করে না। তাই বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ লোককে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডীর মধ্যে টানিবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধাচার্যগণ বহু দেবদেবী আমদানী করিলেন, নানা তান্ত্রিক ক্রিয়ারও প্রচলন করিলেন এবং জনসাধারণের পক্ষে গ্রহণীয় করিবার জন্য উভয় ধর্মের মধ্যে যতটা সম্ভব সাদৃশ্য আনিবার চেষ্টা করিলেন। অপর কারণটি এই যে, বৌদ্ধধর্ম একটি উচ্চনীতিমূলক ধর্ম এবং শ্রমণ-শ্রমণীদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-নিরোধ ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ-যুগের বৌদ্ধাচার্যগণ নির্বাণ-অর্থে মহাসুখ স্থাপন করিলেন এবং সাধনায় নর-নারী-মিলনের এবং ভোগ-মোক্ষের পথও রচিত হইল। হিন্দু তান্ত্রিক সাধনায় নর-নারীর মিলনের ব্যবস্থা ছিল, বৌদ্ধধর্মেও সেই সুযোগ-দানে দুই ধর্মের মধ্যে সাধারণ লোকদের পক্ষে আর বিশেষ কোনো প্রভেদ রহিল না। এইভাবে পারিপার্শ্বিকের চাপে, ইতিহাসের ঘটনা-স্রোতের ধারায় ও দেশ-কালের অনিবার্য প্রভাবে পাল-যুগে বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক রূপান্তর সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাধারণতঃ তিনটি শাখা: বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। বজ্রযানই মূল শাখা, কালচক্রযান তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট; সহজযান ইহাদের কিছু পরবর্তী সময়ে বজ্রযানের ও কালচক্রযানের দেব-দেবী-পূজা, মন্ত্র, ও বিবিধ অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপেই উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। সহজযানীরা পূজা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কেবল মূল সাধন-ক্রিয়াটির উপরই বেশি জোর দিয়াছে।

(১) বজ্রযান:

'নির্বাণ' বৌদ্ধ-সাধনার চরম লক্ষ্য। বুদ্ধদেব সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, সমস্ত কামনা-বাসনা ও সংস্কার ত্যাগ করিয়া, জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করাকেই 'নির্বাণ' মনে করিয়াছিলেন। এই নির্বাণ—"নিব্বাণং পরমং সুখং"[২৮০] "শান্তি-মাগ্গম্ এব"[২৮১] ইহাই বৌদ্ধধর্মের প্রথম যুগের ধারণা। 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' গ্রন্থে গ্রীক-রাজ মিলিন্দের প্রশ্নের উত্তরে আচার্য নাগসেন বলিয়াছিলেন: "যেমন

২৮০। Dhammapada, 203, 204.

২৮১। Dhammapada, 285.

ভীষণ অগ্নিতাপদগ্ধ কোনো লোক নিজের চেষ্টায় অগ্নি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া একটি অগ্নিহীন শীতল স্থানে প্রবেশ করিয়া পরমানন্দ লাভ করে, সেইরূপ লোক সাংসারিক বস্তুনিচয়ের যথার্থস্বরূপ চিন্তা করিয়া 'রাগ-দ্বেষ-মোহ' রূপ ত্রি-অগ্নি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া 'পরমসুখ'-স্বরূপ নির্বাণ লাভ করে।"[২৮২] নির্বাণ বলিতে আসক্তি ও বাসনা ত্যাগের দ্বারা পরম শান্তিময়, আনন্দময় অবস্থাকেই বুদ্ধদেবের জন্মের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত লোকে বুঝিয়াছিল।

তারপর আরম্ভ হইল বৌদ্ধধর্মের নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব। বৈভাষিকগণ নির্বাণ যে সম্পূর্ণ আনন্দময় অবস্থা—এই প্রাচীন বৌদ্ধমতই অনেকটা অনুসরণ করিলেন, কিন্তু সৌত্রান্তিকেরা নির্বাণকে অবাস্তব ও নঞাত্মক বলিয়া প্রচার করিলেন। তারপর মহাযানের উদ্ভবে নাগার্জুন সূক্ষ্ম বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, নির্বাণ প্রকৃতপক্ষে শূন্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দুঃখ, সংসার, কর্ম, কর্ম-ফল সবই আছে, কিন্তু সত্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে এ-সবই শূন্য। সংসারের স্বভাব-শূন্যতাই হইতেছে নির্বাণ। এই সূক্ষ্ম তার্কিক দার্শনিকের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে শূন্যবাদ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বসুবন্ধুর যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ প্রচার করিল যে, নির্বাণ আত্ম ও বহির্বস্তুর শূন্য-সত্তারই উপলব্ধি, কিন্তু এই শূন্য-অর্থে বস্তু-সত্তার অলীকতা নয়। ইহা গ্রাহ্য-গ্রাহকের অস্তিত্বহীনতা। 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা' বা 'চিত্তমাত্রতা'ই একমাত্র চরম সত্য। জগৎ প্রতীতীমাত্র। সমস্ত প্রীতীতীই স্বপ্নের ন্যায় কেবল ভ্রম—জগৎ কল্পনায় নির্মিত। এই জগৎ-ভ্রমের অন্তরালে তাহার অধিষ্ঠানস্বরূপ কোনো সত্তা নাই। নির্বাণ হইতেছে এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় অবস্থিতি। সমস্তই যখন কল্পনামাত্র, তখন ইহাই একপ্রকার শূন্যবাদ।[২৮৩]

মহাযান-মতবাদের এই শূন্যতাকে বজ্রযানীররা 'বজ্র'-আখ্যায় অভিহিত করিয়াছে। এই শূন্যতা 'অচ্ছেদ্য', 'অভেদ্য', ('অচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্') 'অদাহী', 'অবিনাশী', 'ক্ষয়হীন' এবং 'বজ্র' বলিয়া কথিত।[২৮৪] সমস্ত বিশ্বের সার-রূপ বা সত্য-তত্ত্বকে বজ্রযানী বৌদ্ধেরা 'বজ্রসত্ত্ব'-রূপে কল্পনা করিয়াছে। এই বজ্রসত্ত্ব পরম দেবতা—তিনিই আদি বুদ্ধ।

২৮২। **Milinda-Panho**—Edited by Trenckner—Pages 323—24.

২৮৩। দ্রষ্টব্য 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য,—ডাঃ প্রবোধ বাগচী—পৃষ্ঠা ২০-৪৩ এবং 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা'— ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পৃষ্ঠা ১২৬-১৫৮

২৮৪। 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' (বরোদা সংস্করণ)—পৃঃ ৩৭

বৌদ্ধ বজ্রযান-তন্ত্রগুলির মধ্যে 'বজ্রসত্ত্ব'-এর দুইরূপে প্রকাশ দেখা যায় :

(ক) পরম দেবতা বা পরমেশ্বর বা ভগবান-রূপে ও

(খ) মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা বা আত্মা-রূপে।

মহাযান-বৌদ্ধধর্মের উপর বিশেষ করিয়া অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদের উপর উপনিষদের বেশ প্রভাব লক্ষিত হয়। উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত-বেদান্ত বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এবং উপনিষদ্-ভিত্তিক আস্তিক হিন্দু দার্শনিক এবং অসঙ্গ বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিক উভয়েই উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন—পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন :

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক হইতে এই মহাযান-মতের সহিত আস্তিক মতের দার্শনিকদের প্রবল বিরোধ উপস্থিত হয়। উপনিষদ্‌বাদীরা বলিতেন যে, আত্মা অবিনাশী এবং ইহা আনন্দস্বরূপ। বৌদ্ধেরা বলিতেন, আত্মা নাই এবং জগৎ দুঃখময় ও ক্ষণিক। মূলে দার্শনিক মতের এই পার্থক্য অবলম্বন করিয়া উভয়দলের দার্শনিকদের মধ্যে অন্যান্য নানা বিষয়ে অনেক মতভেদ ঘটে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক হইতে খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত আস্তিক মতের দার্শনিকদের তর্কগ্রন্থে সর্বদা বৌদ্ধদের সহিত প্রবল দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, উভয় দলের দার্শনিকেরাই পরস্পরের মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। উপনিষদের মতে প্রভাবিত হইয়া বসুবন্ধু সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধেরা তাহা স্বীকার করেন নাই, আবার শঙ্করাচার্য যখন একমাত্র ব্রহ্মকে সত্য মানিয়া আর সমস্তকেই মায়ার বিকার বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, যখন পরমার্থ সত্য, ব্যবহারিক সত্য ও প্রতিভাসিক সত্য বলিয়া সত্যের নানা বিভাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই তাঁহার মতে বৌদ্ধদের প্রভাব দেখা যায়।"[২৮৫]

উপনিষদ্ ও বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি তত্ত্বের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলেন : "Buddhism is only a later phase of the general movement of thought of which the Upanishads were the earlier." এই প্রসঙ্গে তিনি মাক্সমুলারের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন : "Many of the doctrines of the Upanishads are no

২৮৫। 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা'—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,—পৃঃ ১৫৭-১৫৮

doubt pure Buddhism, or rather Buddhism is on many points the consistent carrying out of the principle laid down in the Upanishads."[২৮৬]

বজ্রযানীরা উপনিষদের ধারা অনুসরণ করিয়াই বজ্রসত্ত্বের স্বরূপ কল্পনা করিয়াছে। বজ্রসত্ত্ব ভগবান-স্বরূপ, নানা ঐশ্বর্য-সমন্বিত, সর্বশক্তিমান, প্রণিপাত-গ্রহণের যোগ্য। তাই সমস্ত বজ্রজ্ঞানী বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্রসত্ত্বের অসংখ্য নমস্কার করা হইয়াছে। আবার মানুষের অন্তর-স্থিত সত্তারূপেও বজ্রসত্ত্বকে কল্পনা করা হইয়াছে। সাধক নিজেকে বজ্রসত্ত্ব-রূপে উপলব্ধি করিলেই সে বজ্রসত্ত্বত্ব লাভ করিবে। এই সত্তা আমাদের অন্তর্নিহিত বোধি-চিত্ত—আমাদের অন্তর-স্থিত বুদ্ধ। সুতরাং এই বজ্রসত্ত্ব সগুণও বটে, নির্গুণও বটে—ঈশ্বর ও আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মা উভয়েই।

(ক) বজ্রযানের অনেক প্রামাণিক তন্ত্রে বজ্রসত্ত্বকে হিন্দুদের ভগবানের মতো বন্দনা করা হইয়াছে। গুরুর সহিত অভিন্নমূর্তি বজ্রসত্ত্ব শূন্যসত্ত্ব, সমস্ত কল্পনাতীত, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানের আধার, জ্ঞান-মূর্তি-স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।[২৮৭]

বজ্রসত্ত্ব মহাযানের রত্নত্রয়স্বরূপ, তাঁহা হইতেই স্থাবর-জঙ্গমের উদ্ভব হইয়াছে। জগতের ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য তিনি গুরুর মধ্যে চিন্তামণি-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।[২৮৮] সকল গুণের নিধি বজ্রসত্ত্বকে নমস্কার।[২৮৯]

তিনি জন্ম-মৃত্যুহীন, সর্বগুণশালী, মহান্, সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত, সকলের আত্মা-স্বরূপ, তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন।[২৯০]

২৮৬। Indian Philosophy—Dr. Radhakrishnan, Vol. I, P. 470.

২৮৭। "নমস্তে শূন্যতাগর্ভ সর্বসংকল্পবর্জিত।
সর্বজ্ঞ জ্ঞানসন্দোহ জ্ঞানমূর্তে নমোঽস্তু তে॥"

২৮৮। "রত্নত্রয়ং মহাযানং ত্বত্তঃ স্থাবরজঙ্গমম্।
... ...
চিন্তামণিবিরাজিত জগদিষ্টার্থসিদ্ধয়ে" ইত্যাদি
'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি'—অনঙ্গবজ্র, ৩য় পঃ, শ্লোক—৯, ১২, ১৩

২৮৯। "ধ্যায়েৎ শ্রীবজ্রসত্ত্বং সকলগুণনিধিং" ইত্যাদি—ঐ ৫ম পঃ, শ্লোক—৪৫

২৯০। "অনাদিনিধনঃ সত্ত্বো বজ্রসত্ত্বো মহারতঃ।
সমন্তভদ্রঃ সর্বাত্মা বোধিবুদ্ধঃ ত্রিধাতুকে॥"
—'জ্ঞানসিদ্ধি'—ইন্দ্রভূতি ১৫পঃ, শ্লোক—৪৩

শুদ্ধজ্ঞান তাঁহার চক্ষু-স্বরূপ, তিনি জ্ঞানের আকর-স্বরূপ, পবিত্র, সর্বব্যাপী, সৃষ্টির সূক্ষ্মবীজ-স্বরূপ এবং চিরন্তন।[২৯১]

ইন্দ্রভূতির 'জ্ঞানসিদ্ধি'-তন্ত্রের প্রথমে বজ্রসত্ত্বকে যে ভাবে প্রণাম করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে উপনিষদের ব্রহ্ম বা হিন্দুর কোনো শ্রেষ্ঠ দেবতার মতো মনে হয়ঃ

"নমো বজ্রসত্ত্বায়
প্রণিপত্য জগন্নাথং সর্বজিনবরার্চিতম।
সর্ববুদ্ধময়ং সিদ্ধিব্যাপিনং গগনোপমম্ ॥
সর্বদং সর্বসত্ত্বেভ্যঃ সর্বজ্ঞং বরবজ্রিণম্।
ভক্ত্যাহং সর্বভাবেন বক্ষে তৎসাধনং পরম ॥"

মহাযানের 'ত্রিকায়'-বাদের (ধর্মকায়, সম্ভোগকায়, নির্মাণকায়) ধর্মকায় বজ্রযানীদের 'বজ্রকায়'-এ পরিণত হইল। অনেক স্থলে এই 'বজ্রকায়' চতুর্থকায় বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। পরে সহজযানে এই 'বজ্রকায়' 'সহজকায়'-এ পরিণত হইয়াছে। মহাযানের 'কায়'-বাদের মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মের প্রভাব বেশ লক্ষিত হয়। এই 'ধর্মকায়' বা 'বজ্রকায়' বজ্রসত্ত্বের স্বরূপ। ইহা সমস্ত ধর্মের মূলনীতি—নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—অনন্ত জ্ঞান ও করুণাসম্পন্ন একটি সত্তা—ইনিই ভগবান বুদ্ধ।[২৯২]

বজ্রযানের বজ্রসত্ত্বকে পরম দেবতা-রূপে কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মে বহু দেব-দেবীর আমদানি করা হইল। বজ্রসত্ত্বই আদিদেবতা—আদিবুদ্ধ। এই আদিদেবতা পাঁচটি গুণ বা শক্তির অধিকারী। এই পাঁচটি গুণ বা শক্তি হইতে পাঁচপ্রকার ধ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই ধ্যান হইতে পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ জন্মলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা 'পঞ্চস্কন্ধ'—'রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান'-এর অধিপতি। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের আবার 'শক্তি' বা দেবী সংযুক্ত হওয়ার কল্পনাও করা হইয়াছে। তাঁহাদের 'শক্তি' এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে; বৈরোচন—

২৯১। ঐ গ্রন্থে ও ঐ অধ্যায়ে 'মায়াজাল তন্ত্র' হইতে উদ্ধৃত—

"জ্ঞানৈকচক্ষুরমলো জ্ঞানমূর্তিস্তথাগতঃ।
নিষ্কলঃ সর্বগো ব্যাপী সূক্ষ্মবীজমনাশ্রবঃ ॥"—শ্লোক—৩৫

২৯২। An Introduction to Tantric Buddhism—Dr. S. B. Das Gupta —Pages 89-90.

বজ্রধাত্বেশ্বরী বা তারা, রত্নসম্ভব—মামকী, অমিতাভ—পাণ্ডরা, অমোঘসিদ্ধি—আর্যতারা বা তারা, অক্ষোভ্য—লোচনা। এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধকে পঞ্চতথাগত বলা হয়। ইহাদের মধ্যে 'বিজ্ঞান'-এর অধিষ্ঠাতা অক্ষোভ্য-এর স্থান সর্বোচ্চে। অন্য চারিটি ধ্যানী বুদ্ধ অক্ষোভ্য-এর চিহ্ন ধারণ করেন এবং অক্ষোভ্য আবার আদিদেবতা বজ্রসত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন ধারণ করেন। এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের আবার পাঁচজন বোধিসত্ত্ব আছেন, যথা,—বৈরোচনের সমন্তভদ্র বা চক্রপাণি, রত্নসম্ভবের রত্নপাণি, অমিতাভের পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর, অমোঘসিদ্ধির বিশ্বপাণি এবং অক্ষোভ্যের বজ্রপাণি। ইহাদেরও নানা শক্তি কল্পনা করা হইয়াছে। এইভাবে বজ্রযানে নানা দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে।[২৯৩]

পাল-যুগে বজ্রযানের বহু দেব-দেবীর মূর্তি বাংলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। পদ্মপাণি-বোধিসত্ত্বের একটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে চট্টগ্রামে। পাহাড়পুর-ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পদ্মপাণির একটি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তি এবং মূল মন্দিরের পূর্বদিকে মৃত্তিকা-ফলকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট তাঁহার একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজশাহী চিত্রশালায় পদ্মপাণির চারিটি স্থানক বা দণ্ডায়মান মূর্তি আছে।[২৯৪]

নবম-একাদশ শতাব্দীর নানা তারা-মূর্তি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও তারার নানাপ্রকার ভেদ আছে—আর্যতারা বা শ্যামাতারা, পীততারা, শ্বেততারা ইত্যাদি।

শ্যামাতারার আর এক নাম খদিরবনী তারা। ইনি অমোঘসিদ্ধির শক্তিরূপে উদ্ভূতা। বামহস্তে স-নাল পদ্মধারিণী, নানা অলংকার-ভূষিতা, লীলাসনে উপবিষ্টা শ্যামাতারার নবম শতাব্দীর একটি সুন্দর মূর্তি চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২৯৫] ঢাকা চিত্রশালাতেও কয়েকটি তারার মূর্তি আছে। বগুড়ার গুণীতে আবিষ্কৃত নবম-দশম শতাব্দীর প্রস্তর নির্মিত একটি খদিরবনী তারা-মূর্তি রাজশাহী চিত্র-শালায় রক্ষিত আছে।[২৯৬]

২৯৩। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য— **An Introduction to Tantric Buddhism** —By Dr. S. B. Dasgupta—Pp. 86-98.

২৯৪। 'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম'—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত—পৃঃ ১২৯

২৯৫। **Archaeological Survey of India Ann. Rep.** —1921-22, P. 8 No. 4.

২৯৬। **A Note on the Additions to the Varendra Research Society Museum**, 1925-26.

তারার এক অনুচারিণী পর্ণশবরীর মূর্তিও বাংলার কয়েক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ত্রি-শির ও ষড়ভূজ-বিশিষ্ট পর্ণশবরীর দুইটি প্রস্তরমূর্তি ঢাকা-বিক্রমপুরের নয়নন্দ ও বজ্রযোগিনী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে—যেন দুইটি যমজ মূর্তি। এই মূর্তি পালযুগের মূর্তি-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূর্তিদ্বয় ঢাকা চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহারা ব্যাধি ও মহামারীকে পদতলে পিষ্ট করিতেছেন। ইনিও অমোঘসিদ্ধি হইতে শক্তি-রূপে উদ্ভূতা।[২৯৭]

ইহা ছাড়া এই যুগের মারীচি, হারিতী প্রভৃতি দেবীর মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। মারীচি বৈরোচনের শক্তি বলিয়া কথিতা। ঢাকা চিত্র-শালায় পাঁচটি ও রাজশাহী চিত্র-শালায় চারিটি মারীচি-মূর্তি আছে।

এইভাবে পাল-যুগে বজ্রযান-শাখার নানা দেব-দেবীর উদ্ভব ও তাঁহাদের পূজা প্রচলিত হইয়াছে এবং মূর্তি ও পূজার দিক দিয়া বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের প্রায় এক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এই সময় হিন্দুর দেব-দেবীর সঙ্গে বৌদ্ধ দেব-দেবীর যে একটা মিশ্রণ হইয়াছে বা উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এ-কথার আভাস আমি পূর্বে দিয়াছি। এই যুগের মূর্তি লক্ষ্য করিলে এ-রহস্য অনেকটা পরিস্ফুট হয়।

বরিশাল জেলার কেশবপুর গ্রামে আবিষ্কৃত এবং বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত দশম শতাব্দীর একটি দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ শিব-মূর্তির মস্তকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ধ্যানী বুদ্ধ উপবিষ্ট আছেন। ইহার নামকরণ করা হইয়াছে 'শিব-লোকেশ্বর'।

বাখরগঞ্জ-লক্ষ্মণকাটি হইতে প্রাপ্ত অষ্টম-নবম শতাব্দীর গরুড়ের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট একটি বিষ্ণু-মূর্তি ঢাকা চিত্র-শালায় রক্ষিত আছে। তাহার মাথায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানমুদ্রাঙ্কিত একটি চতুর্ভুজ ক্ষুদ্র পুরুষ-মূর্তি আছে। ইহাকে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন। জাভায় (যবদ্বীপে) নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে শিব-বুদ্ধ-কল্পনা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।[২৯৮] পাল-যুগে ধর্মপাল ও দেবপালের সঙ্গে যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেই ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে যাভায় শিব-বুদ্ধ বা বিষ্ণু-বুদ্ধ-কল্পনার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়।

২৯৭। **Buddhist Iconography**—Dr. B. Bhattacharya—Page 109-110.

২৯৮। **Hinduism and Buddhism** —Eliot, Vol. III—Pp. 113-14 and 181.

সুন্দরবনের কাকদ্বীপে প্রাপ্ত রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত আজানুলম্বিত বনমালা-শোভিত একটি দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্তির পশ্চাৎ-পটে সপ্তফণা-ধর একটি নাগমূর্তি আছে। বিষ্ণুর কোনো বাহন বা গদা-পদ্ম কিছুই নাই। সপ্তফণা-বিশিষ্ট নাগের আবরণ একান্তভাবে বৌদ্ধচিহ্ন। তাহাকে বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। ঐ চিত্র-শালায় আর একটি বিষ্ণু-মূর্তি আছে, তাহাতে সর্প-ফণাচ্ছাদনের পরিবর্তে প্রস্তরখণ্ডের মাথায় একটি উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি খোদিত আছে।[২৯৯]

এইরূপ বহু মূর্তিতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পারস্পরিক প্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকা চিত্র-শালায় রক্ষিত কচ্ছপের পিঠের খোলায় একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ দেখা যায়:

"নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নমো বুদ্ধায়·····
সুজিনো জনানাং (বৌদ্ধদিগের শ্রেয়ের জন্য)······
নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"[৩০০]

ইহাতে ধর্মের মিশ্রণের একটা অনুকূল মনোভাব সূচিত হয়।

বজ্রযানে আদিদেবতা-রূপে বজ্রসত্ত্বের কল্পনা হইতে কিভাবে বৌদ্ধধর্মে দেবদেবী ও পূজা প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিলাম।

তারপর উভয় ধর্মেই অপর ধর্মের কিছু কিছু দেব-দেবীকে গ্রহণ করা হইয়াছে, একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায়। যেমন হিন্দুর সরস্বতী মঞ্জুশ্রীর শক্তি-রূপে বৌদ্ধ দেব-দেবী-মণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছেন। হিন্দুর যম বৌদ্ধদের ধর্মপাল হইয়াছেন, কুবের জম্ভল হইয়াছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রহণ হইয়াছে তারা দেবী সম্বন্ধে। তারা বৌদ্ধদের অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালিনী দেবী। নানা রূপে তিনি কল্পিতা এবং শ্যামাতারা, পীততারা, উগ্রতারা, একজটা প্রভৃতি নানা নামে তিনি অভিহিতা। তিনি হিন্দুদের দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বিদ্যা-রূপে পরিগণিতা হইয়াছেন। বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী হিন্দুতন্ত্রে মঞ্জুঘোষ ভৈরব নামে স্থান লাভ করিয়াছেন।

বৌদ্ধতন্ত্রে এই পরমদেবতা বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধরের শক্তি কল্পনা করা হইয়াছে।

২৯৯। **Varendra Research Society's Monographs**, No. 4, Page 13 and Pages 18-23.

৩০০। **Annual Report of Dacca Museum** for 1939-40—Page 8.

এই শক্তির নাম বজ্রধাত্বীশ্বরী, বজ্রসত্বাত্মিকা, বজ্র-বারাহী, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদি এবং তাঁহার বীজমন্ত্র "হুং"। তিনি হেরুক বা হেবজ্র প্রভৃতি নামেও তন্ত্রে অভিহিত হইয়াছেন।

(খ) বজ্রসত্ত্ব আবার আত্ম-তত্ত্ব হিসাবে বোধিচিত্ত—মানুষের হৃদয়-বিহারী সত্তা। মানুষ আত্মোপলব্ধি ও সাধনার দ্বারা এই বজ্রসত্ত্বে—বুদ্ধত্বের এই স্বরূপে রূপান্তরিত হইতে পারে।

বোধিচিত্ত শব্দটির প্রকৃত অর্থ হইতেছে তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুভূতি বা উপলব্ধি। বৌদ্ধধর্মে তত্ত্ব-জ্ঞান-অর্থে জগতের শূন্যতা-জ্ঞান। মহাযান শূন্যতার সঙ্গে করুণা যোগ করিয়াছে। মহাযানে বোধিচিত্ত-অর্থে চিত্তের এমন একটা অবস্থা, যেখানে শূন্যতা ও করুণা মিশ্রিত হইয়া একটা অলৌকিক চেতনার সঞ্চার হইয়াছে।

বৌদ্ধতন্ত্রে বোধিচিত্ত শূন্যতা ও করুণায় মিলিত অদ্বয় অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৩০১] এই শূন্যতা ও করুণা আবার প্রজ্ঞা ও উপায়-রূপে অভিহিত হইয়াছে। প্রজ্ঞা-অর্থে প্রকৃত জ্ঞান—সংসারের 'ততথা' জ্ঞান। ইহা চিরস্থির, সংহত ও অপরিবর্তনীয়, আর উপায় সকলকে দুঃখ হইতে সতত উন্নীত করিবার প্রয়াসশীল ও গতিশীল শক্তি। একটি স্থির জ্ঞানাত্মক, অপরটি চঞ্চল ক্রিয়াত্মক। সমস্ত বৌদ্ধতন্ত্রেই এই প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই উভয়শক্তির মিলনই বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য। ইহাই প্রজ্ঞোপায়ের মিলন। ইহাকে দুধ ও জলের মিলনের মতো অদ্বয় মিলন বলা হইয়াছে।[৩০২]

চরমতত্ত্বের এই দ্বিধা-বিভক্তি এবং ইহাদের মিলন হিন্দু, শৈব ও শাক্ত তন্ত্রেরও মূল তত্ত্ব-বস্তু। হিন্দুতন্ত্রে কিন্তু প্রজ্ঞা বা প্রকৃতিকেই ক্রিয়াশীল, চঞ্চল ও সৃষ্টিকারিণী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং পুরুষ বা উপায় নিষ্ক্রিয়, অপরিবর্তনীয় বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রের উপর সাংখ্য-দর্শনের এবং বেদান্ত-দর্শনের প্রভাব থাকায় বোধ হয় প্রকৃতি-পুরুষ এইভাবে কল্পিত হইয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি ক্রিয়াময়ী, সৃষ্টিশীলা ও গুণশালিনী, কিন্তু পুরুষ

৩০১। "শূন্যতা-করুণা-ভিন্নং বোধিচিত্তং ইতি স্মৃতম্।"

—গুহ্য সমাজতন্ত্র (বরোদা সং),—১৮ অধ্যায়।

৩০২। "উভয়োর্মেলনং যত্র সলিলক্ষীরয়োরিব।
অদ্বয়াকারযোগেন প্রজ্ঞোপায় স উচ্যতে।"

—প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি, ১ম পরিচ্ছেদ।

নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্যসিদ্ধ এবং মুক্ত। বেদান্তের পুরুষ-রূপী ব্রহ্মও ঐরূপ নির্গুণ ও ক্রিয়াহীন, কিন্তু প্রকৃতিরূপিণী মায়া এই জগৎ-ব্যাপারের সৃষ্টিকারিণী, 'অঘটনঘটন-পটীয়সী।'

বৌদ্ধতন্ত্রেও দেখা যায় যে, প্রজ্ঞা ও উপায়কে শক্তি ও শিবের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে এবং উহাদের মিলনেই মহাসুখের উদয় হয় বলা হইয়াছে।[৩০৩] শিব-শক্তির অদ্বয় মিলনের চরম আনন্দই পরম সত্য, তখন শিব-শক্তির কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।[৩০৪]

বৌদ্ধতন্ত্র যে প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থলে হিন্দুতন্ত্রের শক্তি-শিবকে ব্যবহার করিয়াছে, তাহার কারণ নামে পৃথক হইলেই দুই তন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এক।

এই প্রজ্ঞা ও উপায়—মূল তত্ত্বের দুইটি ধারা সংসারের স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে প্রকাশিত। প্রত্যেক নারীর অন্তর্নিহিত স্বরূপ প্রজ্ঞা এবং প্রত্যেক পুরুষের স্বরূপ উপায়। বহু বৌদ্ধতন্ত্রে নারীকে প্রজ্ঞা এবং পুরুষকে উপায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[৩০৫] নারীকে 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র রূপ-ধারিণী,[৩০৬] 'মুদ্রা', 'মহামুদ্রা', 'ভগবতী' 'বজ্রকায়া' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

বৌদ্ধতন্ত্রে এই প্রজ্ঞা-রূপিণী নারীকে 'কমল' এবং উপায়-রূপী পুরুষকে 'বজ্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ হিন্দু-তন্ত্রের যোনি-লিঙ্গের মতো স্ত্রী ও পুরুষ-জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক-রূপে বৌদ্ধতন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে।[৩০৭] 'বজ্র-কমল-সংযোগ'-এর কথা বৌদ্ধতন্ত্রের বহু স্থানে আমরা পাই।

৩০৩। —"শিবশক্তিসমাযোগাৎ জায়তে চাদ্ভুতং সুখম্।"

'নির্ণাদতন্ত্র'—'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ'-এ (বরোদা সং) উদ্ধৃত—পৃঃ ২৮

৩০৪। "শিবশক্তিসমাযোগাৎ সৎ-সুখং পরমাদ্বয়ম্।
ন শিব নাপি শক্তিশ্চ রত্নান্তর্গত-সংস্থিতম্।"

—'উচ্ছুষ্মতন্ত্র'—'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ'-এ উদ্ধৃত

৩০৫। "যোষিৎ তাবৎ ভবেৎ প্রজ্ঞা উপায়ঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।"

'হেবজ্রতন্ত্র'—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি নং ১১৩১৭—পৃঃ ২১ (ক)

৩০৬। 'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি', ৫ম পরিচ্ছেদ (শ্লোক নং ২২ ও ২৩)

৩০৭। "স্ত্রীন্দ্রিয়ং চ যথা পদ্মং বজ্রং পুংসেন্দ্রিয়ং তথা।"

—জ্ঞানসিদ্ধি, ২য় পরিচ্ছেদ (শ্লোক নং ১১)

সমস্ত বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার মূল ভিত্তি এই স্ত্রী ও পুরুষের মিলন—উভয় তত্ত্বের সামরস্য। ইহাই 'যুগনদ্ধ'। এই যুগনদ্ধই 'অদ্বয়'—ইহাই 'বোধিচিত্ত'।[৩০৮] বাংলায় বৌদ্ধ দেব-দেবীর গভীরভাবে আলিঙ্গিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রধান দেবতা বজ্রসত্ত্ব, হেবজ্র বা হেরুকের তাঁহার শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরী, বজ্রবারাহী, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাপারমিতা বা নৈরাত্মার সঙ্গে আলিঙ্গিত অবস্থার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। একটি বিশেষ মূর্তির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এই যুগনদ্ধের স্বরূপ কি? ইহার স্বরূপ 'মহাসুখ'। যুগনদ্ধ-সঞ্জাত মহাসুখই নির্বাণ। নির্বাণের পূর্বের আদর্শের কথা বলিয়াছি। মহাযানের বিজ্ঞানবাদ প্রকৃতপক্ষে শূন্যতার উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা নির্বাণ-অর্থে মহাসুখ স্থাপন করিয়াছেন। এই যুগনদ্ধ-ক্রিয়ায় উৎপন্ন মহাসুখ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দানুভূতিময় ('সতত সুখময়') এবং ভোগ ও মোক্ষের আবাসস্থল। ইহার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। ইহা সমস্ত বস্তুর মূল, সিদ্ধ ব্যক্তিগণের পরমপদ এবং বুদ্ধগণের পরম স্থান।[৩০৯]

এই প্রজ্ঞা-উপায়-মিলন-সঞ্জাত মহাসুখ-রূপী বোধিচিত্তই মূলতত্ত্ব। এই বোধিচিত্ত বজ্রযানে এবং বিশেষ করিয়া সহজযানে দেহাভ্যন্তরস্থ শুক্রধাতু বলিয়া গৃহীত। শুক্র অবিচলিত ও স্থির অবস্থায় 'বজ্রত্ব' প্রাপ্ত হয়। তখনই তাহা মহাসুখে পরিণত হয়। প্রজ্ঞা ও উপায় বা প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়া যোগ-ক্রিয়ার সাহায্যে এই বোধিচিত্তকে উর্ধ্বগামী করিয়া স্থির করিলে যে অনির্বচনীয় মহাসুখের উপলব্ধি হয়, সেই মহাসুখই নির্বাণের স্বরূপ। এই মহাসুখময়তা প্রাপ্ত হইলে আমাদের অন্তরতম সত্তার স্বরূপকে উপলব্ধি করা হয়। এই 'বীজ-রূপী' বোধিচিত্ত বা বজ্রসত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লেখ আছে। 'হেবজ্র-তন্ত্র'-এ ভগবান হেবজ্র বলিতেছেন—"আমি উৎকৃষ্ট বজ্রনারীর যোনিতে বাস করি…("বিহরেঽহং সুখাবত্যাং

৩০৮। "এতদ্ অদ্বয়ং ইতি উক্তং বোধিচিত্তং ইদম্ পরম্।"

—সাধনমালা, ২য় খণ্ড—পৃঃ ১৭

৩০৯। "ভক্তি-মুক্তি-পদং দিব্যং নির্বাণাখ্যং পরং পদম্।"
"ক্ষয়ব্যয়বিনির্মুক্তং শ্রীমহাসুখসংগীতম্"
"তদ-বীজং সর্ববস্তুনাং সিদ্ধানাং চ পরং পদম।
বুদ্ধানাং তৎ পরমং স্থানং সুখাবত্যভিধানকম্"।—'গুহ্যসিদ্ধি'
(An Introduction to Tantric Buddhism-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ১৪৯)

সৎ-বজ্রযোষিতো ভগে"। ...আমি শুক্ররূপে ঐ সুখাবতীতে বাস করি ...("যোষিৎভগে সুখবত্যাং শুক্রনাম্না ব্যবস্থিতঃ")...এই শুক্র বিনা মহাসুখ সম্ভব নয়...("বিনা তেন ন সৌখ্যং...")... এই শুক্ররূপী বুদ্ধ সমস্ত ভাব ও রূপের অতীত এবং হস্ত ও মুখ-সংযুক্ত হইলেও আকারহীন মহাসুখ-স্বরূপ। ("অস্মাৎ বুদ্ধো ন ভাবঃ স্যাৎ অভাব-রূপোঽপি নৈব সঃ। ভুজমুখাকাররূপী চ অরূপী পরমসৌখ্যতঃ॥")"[৩১০]

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার বাউলধর্মেও ঠিক বজ্রসত্ত্ব-রূপী বোধিচিত্তকে ব্যক্তিগত ভগবান বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার নিকট দৈন্য, আর্তি প্রভৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে, আবার অন্তরতম তত্ত্ব হিসাবেও তাঁহাকে মহাসুখ-স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সাধনা করা হইয়াছে। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

(২) কালচক্রযান

ইহা বজ্রযানের মতই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা। তত্ত্ব ও সাধন-বিষয়ে বজ্রযান হইতে ইহার বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। কালচক্রযানে কালচক্রই বজ্রসত্ত্ব। তিনি প্রজ্ঞা ও উপায়ের সম্মিলিত সত্তা। কালচক্রই বোধিচিত্ত, তিনিই মহাসুখের চরমবিকাশ-স্বরূপ। 'বিমলপ্রভা' ('লঘুকালচক্র-তন্ত্ররাজটীকা'র অন্য নাম) নামে কালচক্রযানের একখানি পুঁথি নেপাল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বরোদা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই 'বিমলপ্রভা'র আরম্ভেই কালচক্রের যে নমস্কার-শ্লোক কয়টি আছে, তাহাতে মোটামুটি এই সম্প্রদায়ের মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

কালচক্র শূন্যতা ও করুণার সম্মিলিত সত্তা। তাঁহার মধ্যে ত্রিজগতের উৎপত্তি ও ক্ষয় নাই। জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়েই তাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে। এই কালচক্র সাকার ও নিরাকার উভয় ভাব-সম্পন্ন ভগবতী প্রজ্ঞা দ্বারা আলিঙ্গিত। তিনি উৎপত্তি ও ক্ষয়হীন চিরন্তন সৌখ্য ও হাস্যাদির দ্বারা সংযুক্ত। তিনি সমস্ত বুদ্ধের জনক-স্বরূপ এবং ত্রিকাল ও ত্রিকায় তাঁহার মধ্যে নিহিত। তিনি সর্বজ্ঞ ও পরম আদিবুদ্ধ। সেই অদ্বয় ভগবান কালচক্রকে নমস্কার করি।[৩১১]

৩১০। 'হেবজ্রতন্ত্র' (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি নং—১১৩১৭)—পৃঃ ৩৬ (ক ও খ)

৩১১। "নমঃ শ্রীকালচক্রায় শূন্যতাকরুণাত্মনে।
ত্রিভবোৎপত্তিক্ষয়াভাব-জ্ঞানজ্ঞেয়ৈকমূর্তয়ে।

এই কালচক্র শূন্যতা ও করুণা অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়ের সম্মিলিত সত্তা। এই কালচক্রই বোধিচিত্ত, তিনি 'অচিন্ত্য মহাসুখ-স্বরূপ'। তিনি আদিবুদ্ধ। প্রজ্ঞা তাঁহার শক্তি। তিনি লোকহিত-কল্পে অসংখ্য সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় বুদ্ধ সৃষ্টি করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যায়, তত্ত্বাংশে কালচক্রযান ও বজ্রযান এক, সাধনাংশেও এক।

সাধন সম্বন্ধে কালচক্রযানীরা দিন, তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির বিচার করিতেন বলিয়া মনে হয়। কালচক্রযানের একজন প্রচারক ছিলেন অভয়াকরগুপ্ত। এই অভয়াকরগুপ্ত খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের লোক, খুব-সম্ভব বাঙালী এবং পালবংশীয় রাজা রামপালের সমসাময়িক। তিনি 'কালচক্রাবতার' নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে 'বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-ক্ষেত্রি-সংক্রান্তি' প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেন। এ-কথা সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে, কালচক্র-পন্থী সাধকেরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতি অনুসারে তাঁহাদের সাধন-জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন।[৩১২]

কালচক্রযান যোগ-সাধনার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে। যোগ-সাধনার উদ্দেশ্যই হইল কালকে জয় করা। বৌদ্ধ সাধক ও সিদ্ধাচার্যগণ সর্বধ্বংসী কালকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন এবং নিজেদের কালচক্রের আবর্তনের উর্ধ্বে রাখিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তিথি, বার, নক্ষত্র প্রভৃতি কাল-বিভাগ আমাদের প্রাণ-ক্রিয়ার পরিচায়ক। কার্যের দ্বারাই কালের পরিচয়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যেমন নিরন্তর কার্য চলিতেছে, আমাদের দেহের মধ্যেও সেইরূপ নানা ক্রিয়া চলিতেছে—প্রাণ-শক্তির নানা অভিব্যক্তি হইতেছে। যোগ-সাধনার দ্বারা—শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর কার্যসমীকরণ, ও ইচ্ছানুরূপ বশীভূত বা রুদ্ধ করিতে পারিলে কালকে জয় করিবার পথ সুগম হয়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনেকটা এইরূপ কথাই বলিয়াছেন :

"What is Kāla-chakra-yāna? The word Kāla means time,—death and destruction. Kāla-chakra is the wheel of destruc-

সাকারা চ নিরাকৃতির্ভগবতী প্রজ্ঞাতয়ালিঙ্গিতঃ।
উৎপাদব্যয়বর্জিতোঽক্ষরসুখো হাস্যাদিসৌখ্যোজ্‌ঝিতঃ।
বুদ্ধানাং জনকস্ত্রিকায়সহিতঃ ত্রৈকাল্যসংবেদকঃ।
সর্বজ্ঞঃ পরমাদিবুদ্ধঃ ভগবান্ বন্দেতমেবাদ্বয়ম্‌।"

—বিমলপ্রভা (বরোদা সং)

৩১২। 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য'—বাগচী, পৃঃ ৪৬

tion, and Kāla-chakra-yāna means the vehicle for protection against the wheel of destruction.' [৩১৩]

তবে বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে এই মন্তব্যের বিশেষ সমর্থন মেলে না।

এই কালচক্রযান সম্বন্ধে Waddel সাহেব এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :

"In the tenth century A.D., the Tantrik phase developed in Northern India, Kashmir, and Nepal into the monstrous and poly-demonist doctrine, the Kāla-Cakra, with its demoniacal Buddhas, which incorporated the Mantra-yāna practices and called itself the Vajra-yāna or the 'Thunderbolt-Vehicle', and its followers were named Vajrācārya or the 'followers of the Thunderbolt'."

"The extreme development of the Tāntrika phase was reached with the Kāla-Cakra, which, although unworthy of being considered as a philosophy, must be referred to here as doctrinal basis. It is merely a coarse Tāntrik development of the Ādi-Buddha theory combined with the puerile mysticism of the Mantra-yāna, and it attempts to explain creation and the Secret powers of nature, by the union of the terrible Kālī, not only with the Dhyāni-Buddhas, but even with Ādi-Buddha himself. In this way Ādi-Buddha, by meditation evolves a procreative energy by which the awful Sambharā and other dreadful Dākinī fiendesses, all of the Kālī-type, obtain spouces as fearful as themselves, yet spouses who are regarded as reflexes of Ādi-Buddha and the Dhyāni Buddhas. And these demoniacal 'Buddhas', under the name of Kāla-Cakra. Heruka, Achala, Vajrabhairava, etc., are credited with powers not inferior to those of the celestial Buddhas themselves, and withal ferocious and blood thirsty ; and only to

৩১৩। Introduction to **Modern Buddhism and its Followers in Orissa** —N. Basu—Pages 8.

be conciliated by constant worship of themselves and their female energies with offerings and sacrifices, magic circles and mantra-charms." ৩১৪

কিন্তু কালচক্রযানের এইরূপ ভীষণ স্বরূপ সম্বন্ধে মূল তন্ত্রাদিতে কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং এই মতের উপর আমরা বিশেষ কোনো আস্থা স্থাপন করিতে পারিনা।

অন্য একজন ইউরোপীয় লেখক তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, কালচক্র-মতবাদ ভারতের বাহির হইতে প্রথমে ভারতে আমদানী করা হয়, তারপর ভারত হইতে ইহা তিব্বতে প্রবেশ করে। তিনি বলেন:

"Mysticism appears for the first time as a specific system in the 10th century of our era ; it is called in the sacred books Dus Kyi Khorlo, in Sanskrit Kalchakra "the circle of time." It is reported to be originated in the fabulous country Sambhala (Tib. Dejun) "source or origin of happiness." Csoma, from careful investigations places this country beyond Sir Derian (Yaxartes) between 45° and 50° north latitude. It was first known in India in the year 965 A.D., and it was introduced, they go on to say, into Tibet from India, via Kashmir in the year 1025 A.D. I cannot believe it accidental that the beginning of the Tibetan era of counting time coincides with the introduction of this system."

—Buddhism in Tibet—
E. Schlagintweit
Pages 47-48.

(৩) **সহজযান**

সহজযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের শেষস্তর। মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযানের দেব-দেবীপূজা, নানা মন্ত্র, মুদ্রা ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এই সহজযানের উদ্ভব হইয়াছিল মনে হয়। সহজযানে দেব-দেবী, পূজা, মন্ত্র, অনুষ্ঠান

৩১৪। **The Buddism in Tibet or Lamaism**—A. Waddel, Pp. 15 and 131.

প্রভৃতির কোনো স্থান নাই। সহজযান বজ্রযানের দেব-দেবী, মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতি মানে নাই বটে, কিন্তু তাহার সাধন-পদ্ধতিটি পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বরং মহাসুখবাদের চরম স্তরে উপনীত হইয়াছে। বজ্রযানের তন্ত্রগুলির সাধনাংশ সহজযানের প্রামাণিক ধর্মশাস্ত্র। এইসব তন্ত্র হইতে বৌদ্ধ-সহজিয়াদের পদ ও দোঁহার সংস্কৃতে লিখিত টীকাগুলির মধ্যে বহু উদ্ধৃতি দেখা যায়। কাহ্নুপাদ, সরহপাদ প্রভৃতির দোঁহা-কোষের টীকার প্রথমে 'ওঁ নমো বজ্রধরায়' বা 'নমঃ শ্রীবজ্রসত্ত্বায়' বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে।

সহজযানের নির্দিষ্ট মতবাদের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কোনো তন্ত্র আমাদের হাতে আসে নাই। ডক্টর প্রবোধ বাগচী বলেন যে, সহজযানের প্রাচীন শাস্ত্র বেশির ভাগ তিব্বতী অনুবাদে রক্ষিত আছে।[৩১৫] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আর্যদেব, কাহ্নুপাদ, সরহপাদ, ভুসুকু, তিল্লোপাদ, লুইপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণের প্রাদেশিক ভাষা ও অপভ্রংশে লিখিত পদ, দোঁহা প্রভৃতি নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সব হইতে আমরা বৌদ্ধ সহজযান সম্বন্ধে একটা ধারণা পাই। এই সব আচার্যগণ তিব্বতী সাহিত্যে সিদ্ধাচার্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই সিদ্ধাচার্যগণের হাতেই সহজযান গড়িয়া উঠিয়াছিল মনে হয়।

'চর্যাপদ'গুলি খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় রচিত। দোহা-কোষগুলির ভাষা অপভ্রংশ বা দশম-একাদশ শতাব্দীর প্রচলিত প্রাকৃত। এ পর্যন্ত তিল্লোপাদ, সরহপাদ ও কাহ্নুপাদের দোহা-কোষ পাওয়া গিয়াছে। ইহারা সকলেই ছিলেন সহজ-সাধনার আচার্য। এই চর্যা ও দোঁহাগুলি বর্তমানে বৌদ্ধ সহজযানের শাস্ত্র-গ্রন্থ।

পুঁথির পাণ্ডিত্য, নানা ধর্মের ভেকধারীদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রভৃতি বিষয়ে সহজযানীরা নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন। আচার্য কাহ্নুপাদ একটি দোঁহায় বলিতেছেন :

> "আগমবেঅপুরাণে পংড়িত্ত মান বহংতি।
> পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভূময়ন্তি ॥"[৩১৬]

আগম, বেদ, পুরাণাদি পড়িয়া লোকে গর্ব করিয়া থাকে, কিন্তু যেমন মধুমক্ষিকা পাকা বেলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারাও সেইরূপ

৩১৫। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য—বাগচী—পৃঃ ৪৯

৩১৬। 'কৃষ্ণাচার্যপাদের দোহাকোষ'—দোহা নং ২ (টীকাসমেত), 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'—শাস্ত্রী—পৃঃ ১২৩

ঐ-সব শাস্ত্রের বাহিরের দিকটাই দেখে, ভিতরের গভীর তত্ত্বামৃত-রস পান করিতে পারে না বা সে-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে না।

আচার্য সরহপাদ বলেন :

"আইরিএঁহিঁ উদ্দূলিঅ চ্ছারেঁ।
সীসস্থ বাহিঅ এ জড়ভারেঁ॥
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোণেহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী॥
অক্খি নিবেসী আসন বন্ধী।
কণ্ণেহিঁ খুসখুসাই জণ ধন্ধী॥"৩১৭

মিথ্যাচারী গায়ে ভস্মলেপন করিয়া এবং মাথায় জটাভার বহন করিয়া শিষ্যকে বিপথে চালনা করে। ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া এবং ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা নাড়িয়া মিথ্যা পূজার ভান করিয়া লোককে প্রতারণা করে। চক্ষু স্থির করিয়া এবং আসনবন্ধী হইয়া বসিয়া ধন্ধ জনের কানে খুসখুস্ করিয়া মন্ত্র দেয়।

তাহা হইলে সহজযানীদের মতে পরমপদ বা পারমার্থিক সত্য কি? পরমমহাসুখ-রূপ সহজের উপলব্ধি। এই সহজই একমাত্র সত্য—ইহাই জগতের স্বরূপ। প্রকৃতি-পুরুষের মিলন দ্বারা সামরস্যে উপনীত হইতে পারিলে এই মহাসুখ-স্বরূপ সহজের উপলব্ধি হয়। এই মহাসুখে কোনো আত্ম-পর-ভেদ নাই। এই অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি বিলুপ্ত হয়, আত্মজ্ঞানের স্থিতি নষ্ট হয় এবং সহজকায় স্ফূর্তিলাভ করে। এই পরমমহাসুখই নির্বাণপদ।

আমরা বাউলদের সাধনা প্রসঙ্গে সহজ-পন্থার আরো আলোচনা করিব।

পাল-যুগের বাংলার ধর্মের ইতিহাসে এই তিন-যান-সমন্বিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া অবস্থান করিয়াছে। এই ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট ধর্ম-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল এবং ইহার রচয়িতাদের মধ্যে অনেক বৌদ্ধাচার্য ছিলেন বাঙালী। পাল-রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গ-মগধের নানা বিহারে বসিয়া তাঁহারা এগুলির অধিকাংশ রচনা করিয়াছিলেন। এই সব রচনার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিছু অংশ তিব্বতীয়গণের রুচি অনুসারে

৩১৭। **Dohakosa of Saraha-pada** —Dr. P. C. Bagchi edition এবং শাস্ত্রী-সংস্করণের ব্যাখ্যা—'সহজাম্নায়পঞ্জিকা', বৌদ্ধগান ও দোহা—পৃঃ ৮৪-৮৫

প্রধানতঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে, কাশ্মীর, নেপাল, মগধ ও বাংলার নানা বিহারে ও তিব্বতে অনূদিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিব্বতীয় লামা বু-তোন 'তেঙ্গুর'-এ এই সকল অনূদিত গ্রন্থের অধিকাংশ রক্ষা করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত-ভাষায় রচিত কিছু পুস্তক নেপালে ও অন্যত্রও পাওয়া গিয়াছে।

এই তান্ত্রিক সাহিত্যের সঙ্গে পাল-যুগের বঙ্গ-মগধের বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-ধারণার কেন্দ্র-স্বরূপ বিহারগুলির স্মৃতি জড়িত। এই বিহারে বসিয়াই বৌদ্ধাচার্যগণ এই সব সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন।

রাজশাহীর পাহাড়পুরের স্তূপ-খননের ফলে সোমপুরী-মহাবিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দিরটি পূর্বে একটি হিন্দু দেবালয় ছিল, পরে বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হয়। সেখানে প্রাপ্ত একটি মাটির 'সীল'-এ লিখিত আছে—'শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহারে'।[৩১৮] এই বিহারে 'মহাপণ্ডিত' উপাধিধারী 'মহামতি' ভিক্ষু বোধিভদ্র বাস করিতেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।[৩১৯] আচার্য অতীশ দীপঙ্করও কিছুকাল এই বিহারে বাস করিয়াছিলেন এবং ভাববিবেকের 'মধ্যমক-রত্নপ্রদীপ' নামক গ্রন্থখানি অপর কয়েকজনের সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ (১৬০৮ খৃঃ) এবং 'পগ্ সম্ জোন্ জ্যঙ্'-এর রচয়িতা স্থম্প খন্-পো-যেশে-পল্-জোর (১৭৪৭ খৃঃ) উভয়েই বলেন যে, এই বিহারটি ধর্মপালের পুত্র দেবপালের নির্মিত। বোধ হয় ধর্মপাল বিহারটি আরম্ভ করিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন, দেবপাল তাহা সমাপ্ত করেন। ইহাদের ইতিহাসের ভিত্তি জনশ্রুতি। জনশ্রুতিতে নির্মাণ-শেষকর্তা দেবপালের নাম থাকিতে পারে।

মগধের বিক্রমশীল মহাবিহারও পাল-রাজগণের কীর্তি। তিব্বতী ঐতিহ্যে ইহা ধর্মপালের কীর্তি। মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরে পাহাড়ের উপর সীমা-প্রাচীর-বেষ্টিত এই বিহারে ১১৪জন নানা জ্ঞান ও বিদ্যায় সুপণ্ডিত আচার্য ছিলেন, ১০৮টি মন্দির ছিল, মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড মন্দির ছিল এবং ৬টি কলেজ

৩১৮। **Excavations at Paharpur—K. N. Dikshit (A. S. M., No. 55) —Pages 20, 90.**

৩১৯। তেঙ্গুর-তালিকা—বৌদ্ধ গান ও দোহা—শাস্ত্রী, পৃঃ পরিশিষ্ট—৫০/০

ছিল।[৩২০] তিব্বত হইতে অগণিত বৌদ্ধ জ্ঞানপিপাসুগণ আসিতেন এই মহাবিহারে। এখানে বহু সংস্কৃত-গ্রন্থ যে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, তাহা তেঙ্গুর-তালিকায় দেখা যায়। কবি অভিনন্দের 'রামচরিত'-এ দেখা যায়, ধর্মপালের একটি নাম ছিল 'বিক্রমশীল দেব'। এই নাম হইতে যে বিহারটির নাম হইয়াছিল, 'শ্রীমদ্ বিক্রমশীলদেব-মহাবিহার', তাহা দ্বিতীয় গোপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পুষ্পিকা হইতে জানা যায়। তিব্বতী-জনশ্রুতিতে ওদন্তপুরী বিহারও ধর্মপালের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যদিও তারনাথ বলেন যে, উহা দেবপাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

পাল-রাজগণের শাসনাধীনে, বিশেষতঃ মহীপাল ও জয়পালের সময়ে বাংলায় সোমপুর মহাবিহার এবং মগধে বিক্রমশীল মহাবিহার সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়াছিল। কাশ্মীর, তিব্বত ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধ শ্রমণ ও বৌদ্ধ শাস্ত্র-জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিরা এই দুই মহাবিহারে বসিয়া বহু গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও অনুলিপি করিয়াছিলেন। তারনাথ বলেন যে, ধর্মপাল ৫০টি ধর্ম-বিদ্যায়ন প্রতিষ্ঠা করেন।[৩২১]

এই পাল-যুগে তিব্বতীয় ঐতিহাসিকদিগের বিবরণে অনেক বিহারের বর্ণনা পাওয়া যায়,—যথা—ত্রৈকূটক-বিহার, দেবীকোট-বিহার, পণ্ডিত-বিহার, সন্নগর-বিহার, ফুল্লহরি-বিহার, পট্টিকেরক-বিহার, বিক্রমপুরী-বিহার, জগদ্দল-বিহার প্রভৃতি।

ত্রৈকূটক-বিহার বোধ হয় রাঢ়দেশের ত্রৈকূটক-দেবালয়ের নিকটে অবস্থিত ছিল। এই ত্রৈকূটক-বিহারেই হরিভদ্র ধর্মপালের অনুপ্রেরণায় 'অভিসময়ালঙ্কার'-গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। দেবীকোট-বিহার ছিল উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার বানগড়ের নিকটে। এখানে বিখ্যাত তান্ত্রিকাচার্য অদ্বয়বজ্র ও উধিলিপা, মেখলা প্রভৃতি ভিক্ষুণীরা বাস করিতেন। পণ্ডিত-বিহার ছিল চট্টগ্রামে।

৩২০। **Pag Sam Jon Zang**—Sumpa Mkhan Po, Edited by Sarat Chandra Das—Pp. lviii, lxxi, lxxv, lxxxvi. (এখন হইতে 'পগ, সম' বলিয়া উল্লিখিত হইবে)

৩২১। **History of Buddhism in India** ("Geschichte des Buddhismus in Indien"—Translated by Anton Schiefner)—Tāranath—Page 217. (এখন হইতে 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—তারনাথ' বলিয়া উল্লিখিত হইবে)

বৌদ্ধতন্ত্র ও বৌদ্ধসংস্কৃতির একটা প্রধান পীঠ-স্থান ছিল এই পণ্ডিত-বিহার। নাড়পাদের গুরু প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তৈলপাদ এই বিহারেই বাস করিতেন। বিক্রমপুরী-বিহার বিক্রমপুরেই অবস্থিত ছিল। এখানে 'অবধূতাচার্য' কুমারচন্দ্র একখানি তান্ত্রিক টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য লীলাবজ্র ও তিব্বতী শ্রমণ পুণ্যধ্বজ ঐ টীকা তিব্বতীতে অনুবাদ করেন। দেবীকোট-বিহার বাংলা কি বিহারে ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। এই বিহারে অনেক বৌদ্ধ আচার্য বাস করিতেন এবং তিব্বতী পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বহু সংস্কৃত-গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করিয়াছিলেন।[৩২২] পট্টিকেরক-বিহার যে কুমিল্লার ময়নামতী পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল, তাহা ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। রাজা রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের তাম্রলিপিতে দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত যে বিহারেব উল্লেখ আছে, তাহার অবস্থান ছিল পট্টিকেরক-নগরীতে। সোমপুরীব পরেই বাংলার জগদ্দল-বিহারের নাম উল্লেখযোগ্য। একাদশ শতাব্দীর শেষে কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে রামপাল গঙ্গা ও করোতোয়ার সঙ্গম-স্থলে রামাবতী নামে যে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, জগদ্দল-মহাবিহারটি ছিল তাহারই একাংশ এবং তাহার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল অবলোকিতেশ্বর ও মহত্তারার বিগ্রহ। জগদ্দলের যশ বিশেষ বিস্তৃত ছিল এবং ইহা তৎকালীন বাংলায় বৌদ্ধ-সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ পীঠ হইয়া উঠিয়াছিল।[৩২৩]

এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আচার্যগণ বৌদ্ধ-ঐতিহ্যে সিদ্ধাচার্য বলিয়া কথিত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বাঙালী ছিলেন এবং বঙ্গ-মগধের বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্র-চর্চার কেন্দ্র বিহারগুলিতে বসিয়া যে এই সব শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও সাধনাদি করিতেন ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হয় না। তারনাথ তাঁহার ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পালদের রাজত্ব-কালে বহু মন্ত্রাচার্য ও বজ্রাচার্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাঁহারা নানা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করাইতে পারিতেন।[৩২৪] মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এ সিদ্ধাচার্যগণের যে সমস্ত পদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে বাংলা শব্দ অনেক বেশি ও ইহার কাঠামোটি বাংলার। তিনি লুইপাদ, ভুসুকু, কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদ, ধামপাদ

৩২২। পগ সম্—দাস—lxvi, lxii, lxviii.
৩২৩। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম—নলিনী নাথ দত্ত—পৃঃ ২২৬
৩২৪। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—তারনাথ—পৃঃ ২৫২

গুণ্ডরীপাদ, ঢেণ্ঢন, শবর বা শবরেশ্বরবজ্র, কম্বলাম্বরপাদ, কঙ্কণ, বিরূপ, শান্তি, মহীধরপাদ, চাটিল, আর্যদেব, দারিক, তাড়কপাদ, ডোম্বী, ভাদেপাদ, বীণাপাদ, কুক্কুরিপাদ প্রভৃতির পদগুলির মধ্যে বাংলা-শব্দের সংখ্যা ও ভাষা-রীতি দেখিয়া ইহারা বাঙালী ছিলেন বলিয়া নিঃসন্দেহে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়াও, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে এবং বিখ্যাত তান্ত্রিকাচার্য অদ্বয়বজ্রকে শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালী বলিয়াছেন।

এই বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে বর্তমানে অনেক আলোচনা হইতেছে। এই বিষয়ে তিনটি সূত্রের উপর নির্ভর করা হয়। একটি কর্দিয়ে সাহেব কৃত বৌদ্ধতন্ত্রের তালিকা বা 'তেঙ্গুর'-তালিকা, অপরটি তিব্বতী তারনাথের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস', আর একটি সুম্‌পের্‌ 'পগ্‌ সম্‌ জোন্‌ ঝাং'। কিন্তু এই দুই ব্যক্তির বিবরণের ভিত্তি সাত-আট শত বৎসর পূর্বেকার ঘটনার জনশ্রুতি। পরবর্তী ঐতিহাসিক প্রমাণে যদি ইহাদের উক্তি সমর্থিত হয়, তবেই তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, না হইলে এই বিবরণে কোনো আস্থা স্থাপন করা যায় না।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের, বিশেষ করিয়া বজ্রযানের উদ্ভব সম্বন্ধে কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, উহার উদ্ভব হইয়াছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, পরে সরহ প্রভৃতি আচার্যগণের উদ্যমে উহা উত্তরভারতে প্রচারিত হয়।[৩২৫] আবার অন্যপক্ষের প্রবল একটা ধারণা যে, বজ্রযানের উদ্ভব হইয়াছিল 'উড্ডিয়ান'-এ।[৩২৬] আমরা তেঙ্গুর-তালিকায় 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত', শব্দটি পাই এবং 'পগ্‌ সম্‌'-এও এই শব্দটি পাই। এখন এই উড্ডীয়ান কোথায়? ইহার অবস্থান সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মত পোষণ করিয়া থাকেন। তবে ইহা যে বাংলারই কোনো স্থান বিশেষ, ইহাই আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

'পগ্‌ সম্‌'-এ লুইপাদ 'উড্ডীয়ান-বিনির্গত', 'তেঙ্গুর'-তালিকায় লুইপাদ বাঙালী। 'তেঙ্গুর'-এ সরহপাদ 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত', 'পগ্‌ সম্‌'-এ সরহ আবার বাঙলার অধিবাসী। 'তেঙ্গুর'-এর একস্থানে অবধূতপাদ-অদ্বয়বজ্র 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত', আবার 'তেঙ্গুর'-এর অন্যস্থানে অদ্বয়বজ্র 'বাঙালী'। 'তেঙ্গুর'-এর

৩২৫। Journal Asiatique,—Tome, CCXXV, No. 2, Buddhist Researches,—Rahula Sankrityana.

৩২৬। Indian Historical Quarterly—March, 1935—Pages 142-44.

একস্থানে তৈলিকপাদ উড্ডিয়ানের অধিবাসী, আবার 'পগ্ সম্'-এ তিনি চট্টগ্রামের এক ব্রাহ্মণ। সুতরাং উড্ডিয়ান ও বাংলা সমার্থবোধক ছিল বলিয়া মনে হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেন, উড্ডিয়ান উত্তরবঙ্গে গৌড়ের নিকটবর্তী কোনো স্থান ছিল।

এইরূপ আর একটি স্থানের নাম 'সাহোর'। এই স্থানের অধিবাসী বলিয়া অনেক বৌদ্ধাচার্য অভিহিত হইয়াছেন। 'পগ সম্'-এ দেখা যায় শান্তরক্ষিত একস্থানে বাঙালী, অপর স্থানে সাহোরের রাজবংশোদ্ভূত। এই 'সাহোর'ও বাংলার কোনো স্থানে অবস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা।

সুতরাং ইন্দ্রভূতি, লুইপাদ, অনঙ্গবজ্র, থগণ, তৈলিকপাদ, সবহ, অবধূতপাদ, নাগবোধি, জ্ঞানবজ্র, বুদ্ধ-জ্ঞানপাদ, অমোঘনাথ, ধর্মশ্রীমিত্র প্রভৃতি 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত' তান্ত্রিক-বৌদ্ধপণ্ডিতগণ সকলেই বাঙালী এবং সাহোর-বাসী শান্তিদেব, শান্তরক্ষিত, কর্মপাদ প্রভৃতি সকলেই বাঙালী ছিলেন, ইহা সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায়।[৩২৭]

(৪) সেন-যুগ

পালযুগের তুলনায় সেন যুগের বাংলাদেশের ধর্মের অবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য-গোচর হয়। পাল-যুগে রাজশক্তির আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সমানভাবে পাশাপাশি প্রসার লাভ করিয়াছে, কিন্তু এই যুগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির অত্যধিক প্রসার ও প্রচারে বৌদ্ধধর্ম ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী এবং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির একান্ত অনুরক্ত গোঁড়া সেন রাজগণ ও সেন-রাজগণের অব্যবহিত পূর্বে পূর্ববঙ্গের পরম বৈষ্ণব বর্মণ-রাজগণ এবং সেন-রাজগণের সমসাময়িক বা পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তের ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী দেব-রাজগণ প্রভৃতির উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সারা বাংলার ধর্মের আকাশ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বেদ-পুরাণ-শ্রুতি-স্মৃতি-জ্যোতিষের সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। পাল-যুগের পরে দেড়শত বৎসর বা তদূর্ধ্বকাল বাংলার ধর্মের ইতিহাস মুখ্যতঃ বেদ-পুরাণ-স্মৃতি-আশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাস।

বৌদ্ধধর্মের স্রোত তখন নিতান্ত ক্ষীণ অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। বজ্রযান,

৩২৭। দ্রষ্টব্য: 'বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম'—নলিনী নাথ দাশগুপ্ত, পৃ—[illegible]

কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি কোন যানেরই অস্তিত্ব সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রমাণসূত্রে বিশেষ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তিও বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ-বিহারের দুই-একটি খবর পাওয়া গেলেও তাহাদের পূর্ব গৌরব ও ঔজ্জ্বল্য আর ছিল না। আর একটি বিশেষ ঘটনা এই যে, পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে সদ্ভাব ছিল এবং উভয়েই উভয় ধর্মকে যে প্রায় একই ধর্মের দুইটি শাখা বলিয়া মনে করিত, সেই সম্প্রীতির ভাব দূর হইয়া গিয়াছিল দেখা যায়। এমন কি, রাজশক্তির প্রতিনিধি শাসকগণ এবং পদস্থ পণ্ডিত ব্যক্তিগণও যে প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধ-বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ আছে।

এই 'দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র', 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়' সেন-রাজগণ পাল-রাজগণের মত এই বাংলাদেশের সন্তান নন। তাঁহারা বহিরাগত এবং পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণোচিত আচার-সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ করেন। এক সময়ে তাঁহারা যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মানুষ্ঠান করিতেন, তাঁহাদের লিপিগুলি হইতে এইরূপ আভাসও পাওয়া যায়। তাঁহাদের অব্যবহিত পূর্বের রাজশক্তি বর্মণ-বংশ ছিল 'পরম বৈষ্ণব'। ভোজবর্মার বেলাব-তাম্রশাসনে[৩২৮] দেখা যায় যে, ব্রহ্মা হইতে অত্রি, তারপর চন্দ্র, বুধ, পুরুরবা, নহুষ, যযাতির পর যদু-বংশের হরি বা কৃষ্ণ, সেই হরির জ্ঞাতিগণ হইতেছেন বর্মণ-বংশীয়েরা। তিন বেদকে রক্ষা করাই তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য। এই বর্মণ-রাজের অন্যতম সান্ধি-বিগ্রহিক মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর-লিপিতে[৩২৯] দেখা যায় যে, তিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত, ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, হোরা-শাস্ত্র-গ্রন্থের লেখক, কুমারিল ভট্টের মীমাংসা-দর্শনের টীকাকার, আগম-শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ও অস্ত্র বেদে সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ তিনি সমগ্র বৈদিক সংহিতায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত। বিজয় সেন ও বল্লাল সেন উভয়েই 'পরমমাহেশ্বর', লক্ষ্মণ সেন 'পরমবৈষ্ণব', 'পরম নারসিংহ', তাঁহার দুই পুত্র নারায়ণ ও সূর্যভক্ত। বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর ইঁহাদের অসাধারণ প্রীতি ও শ্রদ্ধা। তাঁহাদের তাম্রলিপিগুলিতে দেখা যায়, নানা বেদে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে ইঁহারা বহু ভূমিদান করিয়াছেন। নিজেরা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও করিয়াছেন। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব ও তিথি উপলক্ষ্যে তাঁহারা 'কনকতুলাপুরুষ', 'ঐন্দ্রীমহাশান্তি', 'হেমাশ্বরথদান'

৩২৮। **Inscriptions of Bengal, III**—N. G. Majumdar—Page 14ff.

৩২৯। **Inscriptions of Bengal, III**—N. G. Majumdar—Page 25ff.
Epigraphia Indica, VI—Pages 203-207.

প্রভৃতি দান করিয়াছেন,—গঙ্গাস্নান, তর্পণ, পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়াছেন। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'-গ্রন্থ-প্রণেতা হলায়ুধ, ভট্টভবদেব, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধভট্ট, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণের আবির্ভাব এই পর্বে। রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রভাবে গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হিন্দু বাঙালীর জীবনের সমস্ত সামাজিক ও ধর্মগত অনুষ্ঠান এই পর্বে স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হইতে লাগিল। রাজশক্তির সক্রিয় সহায়তা ও সহযোগিতায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বাংলার ধর্ম-জীবনকে শ্রৌত ও স্মৃতি-সংস্কারের কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন।

বৈদিক ধর্মপ্রচারের জন্য এই যুগের রাজশক্তি যে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তাহা তাঁহাদের লিপি-প্রমাণেই পাওয়া যায়। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী রামদেবশর্মা ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। বিজয় সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তি-লিপিতে উল্লিখিত আছে যে, তাঁহার অনুগ্রহে বেদ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ এত বিত্তশালী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পত্নীগণকে শহর-বাসী ব্যক্তিগণের পত্নীদিগের নিকট নানা মণি-মাণিক্য-রত্নাদি-গণনা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল।[৩৩০] বিজয় সেন নিজে বৈদিক যাগ-যজ্ঞে অক্লান্তকর্মা ছিলেন। বিজয় সেনের বারাকপুর-তাম্রশাসনের গ্রহীতাও বাৎস্য-গোত্রীয়, আমদগ্ন্য-প্রবর, ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন-শাখাধ্যায়ী উদয়কর দেবশর্মা। এই দান মহারাণী বিলাসদেবীর চন্দ্র-গ্রহণের সময় তুলাপুরুষ-মহাদান উপলক্ষ্যে হোম-ক্রিয়ার দক্ষিণা-স্বরূপ। বল্লাল-সেনের-নৈহাটি তাম্রশাসনের[৩৩১] গ্রহীতাও সামবেদের কৌথুমশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। ইনি রাজমাতা মহারাণী বিলাসদেবীর সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে হেমাশ্বমহাদান-যজ্ঞের আচার্যের কার্য করিয়া একটি গ্রামই লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া-তাম্রশাসন,[৩৩২] ও গোবিন্দপুর তাম্রশাসনের[৩৩৩] গ্রহীতা সকলেই বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। তাঁহার তর্পণদিঘি-তাম্রশাসনে[৩৩৪] দেখা যায় যে, তাঁহার 'হেমাশ্ব-মহাদান'-এ আচার্যের কার্যের জন্য তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছেন। দেব-বংশীয় রাজা

৩৩০। Inscriptions of Bengal, III—N. G. Majumdar—Page 42ff. (২৩ শ্লোক)

৩৩১। Inscriptions of Bengal, III—P. 68ff.

৩৩২। I. B. —P. 81ff.

৩৩৩। I. B. —P. 92ff.

৩৩৪। I. B. —P. 99ff.

দামোদর দেবের চট্টগ্রাম-তাম্রশাসনের[৩৩৫] গ্রহীতাও যজুর্বেদ-বিদ্ ব্রাহ্মণ। ঐ বংশের দশরথ দেবের আদাবাড়ী-তাম্রশাসনে[৩৩৬] দেখা যায়, তিনি ৩জন বিভিন্ন গোত্রীয় বৈদিক রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিয়াছেন। ভট্টভবদেবের প্রশস্তি-লিপিতে সাবর্ণ-গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস-সমন্বিত একশত গ্রামের উল্লেখ আছে। কেশব সেনের ইদিলপুর-তাম্রশাসনে[৩৩৭] দেখা যায় যে, লক্ষ্মণ সেন তাঁহার বিজিত স্থানে—উড়িষ্যা, কাশী ও প্রয়াগে "যজ্ঞযূপ" প্রোথিত করিয়াছিলেন।

এই যুগের পৌরাণিক ধর্মের বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই যুগের সমস্ত শাসক-গোষ্ঠীই 'পরমবৈষ্ণব', কেহ বা 'পরমমাহেশ্বর' কেহ বা সূর্যভক্ত। এ-যুগের সমস্ত লিপি 'ওঁ নমো বাসুদেবায়', 'ওঁ নমঃ শিবায়' বা 'ওঁ নমো নারায়ণায়' প্রভৃতি পাঠ দিয়া আরম্ভ। দেওপাড়া-লিপিতে "হরিহর"-এর বন্দনা-শ্লোকও আছে। লিপিগুলির মধ্যে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও অবতারের উল্লেখ। বিজয় সেনের দেওপাড়া-লিপিতে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মূর্তি ও মন্দির-নির্মাণের উল্লেখ আছে। শৈবধর্মও সেনদের নিকট সমান আদর লাভ করিয়াছে। শম্ভু, ধূর্জটী, অর্ধনারীশ্বর, সদাশিব প্রভৃতি নামে সেনরাজগণের লিপিতে শিব অভিনন্দিত হইয়াছেন। পূর্ববাঙলায় ও উত্তরবাঙলায় লক্ষ্মী-নারায়ণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুগল-প্রতিমা এই যুগে পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল-রূপের কল্পনা দাক্ষিণাত্য হইতে সেনরাজগণের দ্বারা বাংলাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই যুগে শিবের কয়েকটি উমা-মহেশ্বর-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত এবং কলিকাতা চিত্র-শালায় রক্ষিত দ্বাদশ শতাব্দীর ঐরূপ একটি মূর্তি ভাস্কর্য-শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। শাক্ত-দেবদেবীর বিশেষ উল্লেখ এ যুগের কোনো লিপিতে নাই। তবে ভট্টভবদেবকে তন্ত্র ও আগমে ব্যুৎপন্ন বলা হইয়াছে। পাল-পর্বেও এই আগমের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহা পূর্বের শৈব আগমের ধারা, কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর এদিকে প্রকৃত তন্ত্র-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিতা এক চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দেবী-মূর্তি উৎকীর্ণ লিপিতে চণ্ডী বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন।

বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশিষ্ট ধারার প্রসার হয় এই যুগে। সেটি রাধা-কৃষ্ণের ধ্যান-কল্পনা বা রাধাকৃষ্ণবাদ। এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা

৩৩৫। I. B. —P. 158ff.

৩৩৬। I. B. —P. 181ff.

৩৩৭। I. B. —P. 118ff.

করিয়াছি। কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত লীলা পৌরাণিক কাহিনী; তাহা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে কৃষ্ণের শত গোপীর সহিত লীলার উল্লেখ আছে। ('গোপীশতকেলিকার') রাধার, উল্লেখও ইহার পূর্বে আমরা পাইয়াছি। কিন্তু তাহা বিশেষভাবে সাহিত্যকে আশ্রয় করিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যে দেব-দেবীর লীলা-বর্ণনা অপেক্ষা শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্য-রচনার বেশি অনুপ্রেরণাই লক্ষ্যগোচর হয়। তবু এই যুগে রাধা-কৃষ্ণলীলা-কাহিনী অনেকটা সাহিত্যাশ্রয়ী হইলেও ধর্মাশ্রয়ীভাবে ইহার প্রবাহ-লাভ ঘটিতে থাকে। ইহার অব্যবহৃতি পর হইতেই রাধা-কৃষ্ণের লীলাবাদ প্রজ্ঞা-উপায় বা শিব-শক্তি বা প্রকৃতি-পুরুষের যুগল-লীলা-তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার পূর্ণ ধর্ম-রূপ প্রকাশিত হয় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে।

এই সেন-যুগের ধর্ম-বিষয়ে একটি মূলকথা স্মরণীয় যে, বাঙালীর বর্তমান যে 'বার মাসে তের পার্বণ' ও ও নানা ধর্ম বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখি, তাহার মূলভিত্তি স্থাপিত হয় এই যুগে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে গঙ্গা-স্নান, দান, পূজা, পুরাণাদি পাঠ, নানা ব্রত, পাষাণ-চতুর্দশী, কোজাগর-পূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশ-প্রদীপ, দ্বীপান্বিতা, জন্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, হোলী-উৎসব, মাঘী সপ্তমীর স্নান ও দান, অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত প্রভৃতির উল্লেখ এই যুগের লিপি, 'কালবিবেক', 'দায়ভাগ' প্রভৃতি স্মৃতি-গ্রন্থে এবং সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্যে দেখি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি কঠোর আনুগত্যই এই যুগে শিষ্টজন-অভিনন্দিত। এখন এই আবহাওয়ায় বৌদ্ধধর্মের পরিণতির ধারাটি দেখা যাক।

এই যুগের রাজশক্তি এবং রাজদ্বারে ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা বেদ-বিরোধী বৌদ্ধধর্মের উপর প্রকাশ্যভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ম-বংশের রাজাধিরাজ ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে "পুংসামাবরণং 'ত্রয়ী' ন চ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি" এই বাক্যাংশে বৌদ্ধদিগের প্রতি যে একটি শ্লেষাত্মক কটাক্ষ রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। তিন বেদের বিদ্যাই পুরুষের প্রকৃত পরিচ্ছদ, তাহার অভাবে পুরুষেরা নগ্ন। 'নগ্ন' অর্থে বেদ-বিরুদ্ধ জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে বুঝাইতেছে। এখানে যে বৌদ্ধদিগকে ইঙ্গিত করা হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার পরেই আছে যে, বর্ম-রাজগণ এই ত্রি-বেদ রক্ষায় উৎসাহে বর্ম-পরিহিত। ইহার দ্বারা বেদ-বিরুদ্ধ সম্প্রদায়কে সামরিক শক্তি প্রয়োগে উচ্ছেদ করিবার ইঙ্গিতও কেহ ধরিতে পারে। তারপর হরিবর্মার মন্ত্রী ভট্টভবদেবের প্রশস্তি-লিপিতে ভট্টভবদেব "বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভবমুনিঃ" "পাষণ্ডবৈতণ্ডিক-

প্রমাথওন-পণ্ডিতঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ-সমুদ্রের অগস্ত্যস্বরূপ এবং বৌদ্ধ তার্কিকদের যুক্তি খণ্ডনে পারদর্শী। বৌদ্ধদিগকে 'পাষণ্ড', 'নাস্তিক' প্রভৃতি বলিবার রীতিও, মনে হয়, এই যুগ হইতেই বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ-বিদ্বেষ বল্লাল সেনের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাঁহার রচিত বা তাঁহার নামে প্রচারিত 'দানসাগর'-গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তিনি বলিতেছেন যে, 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'শিবপুরাণ' 'পাষণ্ড' কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত-দোষে দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে উপেক্ষিত হইয়াছে। আর একটি শ্লোকেও (২৯ নং) বলিতেছেন, "পাষণ্ডশাস্ত্রানুমতং নিরূপ্য দেবীপুরাণং ন নিবদ্ধমত্র", অর্থাৎ 'দেবীপুরাণ'ও ঐ দোষের জন্য দানসাগরে নিবদ্ধ হয় নাই। দানসাগরের শেষে একটি শ্লোক আছে।

"ধর্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ।
শ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ॥"

অর্থাৎ ধর্মের অভ্যুদয় এবং নাস্তিকদিগের (বৌদ্ধদিগের) পদোচ্ছেদের জন্য লক্ষ্মীপতি সরস্বতীপরিবৃত অর্থাৎ পণ্ডিতগণ-পরিবৃত হইয়া বল্লাল-সেন নামে প্রত্যক্ষ-নারায়ণ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লক্ষণ সেনের তর্পণদীঘি-তাম্রশাসনে দেখা যায়, প্রদত্তভূমির পূর্বসীমা—"বুদ্ধবিহারীদেবতানিকরদেয়াম্বণ ভূম্যাটাবাপ পূর্বালী"। এই উল্লেখ কি কেবল শুধুমাত্র সীমানা-জ্ঞাপক, না বৌদ্ধ-বিদ্বেষের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত-সূচক, তাহা বলা যায় না। যাহাই হোক, এই যুগের রাজশক্তি ও উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই যুগে বৌদ্ধদেবদেবীর মূর্তি-প্রমাণ একরকম নাই বলা চলে।

পূর্বযুগের পাল ও চন্দ্রবংশীয়দের শাসনে উভয় ধর্মের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা চলিয়াছিল। দুইটি ভিন্ন আদর্শের ধর্মে বিরোধ অবশ্য ছিলই, কিন্তু সে বিরোধ আবদ্ধ ছিল উভয় ধর্মের উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত ও দার্শনিকদিগের মধ্যে। বৈদিক ধর্ম ও ক্রিয়া-কাণ্ডের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সেই তর্ক-বিতর্কের ধারা চলিয়াছে। সময় সময় তীব্র ভাষাও ব্যবহৃত হইয়াছে। সহজযানী বৌদ্ধ সরহপাদ তীব্র ভাষায় বেদ, যজ্ঞ, বর্ণাশ্রম, জৈনধর্ম, এমন কি মহাযানী বৌদ্ধ-শ্রমণদেরও নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাহার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নাই, যে যাহার ইচ্ছামত ধর্ম পালন করিয়াছে। তারপর নানা কারণে উভয় ধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টা চলিয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বহু দেব-

দেবী-গ্রহণ, দেব-দেবীর ধ্যান ও রূপ-কল্পনায় সমন্বয়, একই দেব-দেবীর একটু ভিন্ন মূর্তিতে উভয় ধর্মে প্রবেশ প্রভৃতি ঘটিয়াছে। এ-কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই পর্বে রাজকীয় শক্তির তাচ্ছিল্য বা বিদ্বেষ এবং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-অনুপ্রাণিত শিক্ষিত, উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী লোকেদের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী, সাধারণ লোকের চক্ষে হিন্দু-দেব-দেবী ও বৌদ্ধ-দেবীর মধ্যে পার্থক্যের অনুভূতি-বিলোপ প্রভৃতি নানা কারণে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়া বিলুপ্তির পথে চলিল। তান্ত্রিক তত্ত্ব, দর্শন, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ প্রায় এক হওয়ায় ক্রমে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম হিন্দু তান্ত্রিক ধর্মের আশ্রয়ে চলিয়া আসিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পট্টিকেরক-রাজ রণবঙ্কমল্লের তাম্রশাসনে 'সহজধর্মাবলম্বী' মন্ত্রীর উল্লেখ পাই। এইটুকুই এই সময়ে সহজযানের ঐতিহাসিক নজীর। তারপর বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদের ঊর্ধ্বেও রাজত্ব করিতে পারেন। মিন্‌হাজ-এর 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সেনের বংশধর সেন-রাজারা ১২৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৩৩৮] 'পঞ্চরক্ষা'-গ্রন্থের একখানা পুঁথির পুষ্পিকায় "পরমেশ্বর পরমসৌগত পরম রাজাধিরাজ শ্রীমৎ গৌড়েশ্বর মধু সেন"-এর উল্লেখ দেখা যায়।[৩৩৯] লিপি-কাল ১২১১ শকাব্দ অর্থাৎ ১২৮৯ খৃষ্টাব্দ। এই মধু সেন বাংলার কোন্ অংশে এই সময় রাজত্ব করিতেন, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকগণ নানা জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। তবে মনে হয়, ইনি পূর্ববঙ্গের কোনো অংশে রাজত্ব করিতেন। এই বৌদ্ধ মধু সেনই বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা বলিয়া মনে হয়। ত্রয়োদশ শতকের পর আর বাংলায় কোনো স্বাধীন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজার অস্তিত্ব ছিল না।

(৫) মুসলমান-যুগ

মুসলমান-শাসন আরম্ভ হইলে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির যে কি প্রকৃত অবস্থা দাঁড়াইল, বা পরে কি পরিণতি হইল, বা পূর্বের ধর্ম কি রূপান্তর লাভ করিল, তাহার ইতিহাস-সম্মত বিশেষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৩৩৮। History of Bengal (D. U.), I—Page 227.

৩৩৯। Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. (Asiatic Society of Bengal)—Shastri, Vol. I, P. 117.

মুসলমান-যুগের যে আরবী ও ফারসী লিপি পাওয়া যায়, সেগুলিতে কোনো মসজিদ-নির্মাতার বা কোনো সমাধি-স্তম্ভ-নির্মাতার বা কোনো সমাহিত ব্যক্তির নাম ও তারিখ পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর কিছু আলোক-নিক্ষেপ হইতে পারে, কিন্তু দেশবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই সব লিপির কোনো মূল্য নাই। আর একটি সূত্র মুদ্রা। শাসকদের নামাঙ্কিত ও সন-তারিখ-যুক্ত মুদ্রা রাজনৈতিক ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা দেশের ধর্মের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় না।

আর একটি উপাদান মুসলমান ঐতিহাসিকগণ-রচিত ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসের অধিকাংশই এক-একটি খণ্ড সময়ের ইতিহাস। প্রথম বঙ্গ-বিজয়ের বিবরণ যাহা হইতে আমরা পাই সেই মিন্‌হাজ-রচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' ১২৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছে। তাহার গুণ-গ্রাহী সুলতান নাসিরুদ্দিনের রাজত্ব পর্যন্তই এই বিবরণের শেষ। 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে কেবল ফিরোজ শাহের রাজত্বের ইতিহাস আছে। ঐরূপ 'তারিখ-ই-শেরশাহী,' 'তারিখ-ই-দাউদী' ইত্যাদি পাঠান-যুগের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস আছে। মোগল-যুগেও ঐরূপ 'তবকাৎ-ই-আকবরী' 'আকবর-নামা,' 'আইন্‌-ই-আকবরী' 'আলমগীর-নামা' প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড ইতিহাস। কিন্তু তাহাতে কোনো ক্ষতি হইত না—যদি উহাদের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম বা সংস্কৃতির কোনো বিবরণ থাকিত। দিল্লীকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত ঘটনা লিখিত। এই সব বিবরণ যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ, জয়-পরাজয় প্রভৃতি একান্তভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্তর্গত। বাংলা দিল্লীর সম্রাটগণের অধীনে দূরবর্তী রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি বিশেষ কারণে তাহার নামোল্লেখের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সামগ্রিকভাবে দেখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বাংলাদেশ মুসলমান ঐতিহাসিকদের চক্ষে কোনো সংবাদ-মূল্য বহন করিত না।

কেবল একখানি মাত্র ইতিহাস 'রিয়াজ-উস-সলাতিন'-এ বাংলার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐ ইতিহাস ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রচিত; তখন মুসলমান রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি এই ইতিহাস-রচয়িতা গোলাম হোসেনের বর্ণনায় অনেক স্থলে ভুল আছে বলিয়া মনে

করেন। তবুও ইহাই বাংলার একমাত্র ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস। স্টুয়ার্ট সাহেবের বাংলার ইতিহাস এই গ্রন্থেরই একপ্রকার অনুবাদ। ... ইতিহাসের পণ্ডিতদ্বয়ও তাঁহাদের সংকলিত বাংলার ... মূলতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এই ইতিহাস একান্তভাবে রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ। ইহাতে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কেবল বাংলার সম্বন্ধে লিখিত 'বহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' নামে একখানি মূল্যবান ইতিহাস যদুনাথ সরকার মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন ও তাহা ইংরেজীতে অনূদিতও হইয়াছে। তাহাতে মোগল-যুগে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা এবং শাসন-সংক্রান্ত অনেক বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিবরণ নাই।

মুসলমান-যুগের বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে ইব্ন-বতুতা বাংলা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলায় তিনি দ্রব্যাদির সুলভতার যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা সর্বজনজ্ঞাত। পৃথিবীর কোনো দেশে এরূপ সস্তা জিনিষপত্র পাওয়া যায় না, ইহাই তাঁহার অভিমত। তাঁহার বর্ণনায় পাঠান-যুগে হিন্দু অধিবাসীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়।

"The Hindus are mulcted of half of their crops and have to pay taxes over and above that."[৩৪০]

ইব্ন বতুতার ভ্রমণের অনুবাদ ও বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকা-সংবলিত একটি আধুনিক গ্রন্থে এই স্থানটির এইরূপ অনুবাদ আছে।

"The inhabtanits are infidels under protection (dhimma) from whom half of the crops which they produce is taken besides they have to perform certain duties."[৩৪১]

ইবন-বতুতা ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সপ্তগ্রামে আসেন এবং পরে লক্ষ্ণাবতী ও সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। সুতরাং চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বিধর্মী হিন্দুগণকে যে জিজিয়া কর দিতে হইত, তাহা এই মুসলমান-

৩৪০। History of Bengal (D. U.), II—Page 102.

৩৪১। The Rehala of Ibn Battta—Dr. Mahdi Husain (Oriental Institute, Baroda)—P. 234.

ভ্রমণকারীর বিবরণে আমরা পাই। তিনি নিজেও বহু হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং এক স্বর্ণ মুদ্রায় আস্থরা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে ক্রীতদাসী-রূপে ক্রয় করিয়াছিলেন। এই বিবরণে বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক যদুনাথ সরকার মহাশয় বাংলার মুসলমান-যুগের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক মাল-মশলার একান্ত অভাব বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন।[৩৪২] তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো বিবরণ দেন নাই। বলিয়াছেন, তৃতীয় খণ্ডে এই সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সেই তৃতীয় খণ্ড যে অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে না, ইহাও বলিয়াছেন। মনে হয়, নির্ভরযোগ্য মাল-মশলার একান্ত অভাব বলিয়া কাহারো পক্ষে শীঘ্র অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

এই যুগে ধর্মের বিবর্তন-আলোচনায় আমাদিগকে সঙ্গত অনুমানের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। সমসাময়িক ইতিহাসের ইঙ্গিত, কয়েকখানা বাংলা-কাব্যের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি আমাদের এই যাত্রা-পথের সহায়। আর একটি সহায়—পারিপার্শ্বিকের অনিবার্য ফল-স্বরূপ স্বাভাবিক সমাজ-বিবর্তনের সূত্রটির সংকেত।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমেই মুসলমানগণ পশ্চিমবঙ্গের একটা অংশ অধিকার করিয়াছিল। তাহার অব্যবহিত পূর্বে তুর্কী আক্রমণকারী মগধের ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল বিহার ধ্বংস করিয়াছে, পুঁথিপত্র ভস্মসাৎ করিয়াছে, বহু শ্রমণকে হত্যা করিয়াছে। নদীয়া-বিজয়ের পরে বৌদ্ধদের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার আমরা স্বভাবতঃই অনুমান করিতে পারি। বাংলার সোমপুরী, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারেই বা কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া অনেক ভিক্ষু নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্ম, আরাকান, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে পলাইয়া যাইতে পারে। বিহারে বসিয়া যে-বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণ শাস্ত্রালোচনা করিতেন, গ্রন্থ লিখিতেন, তাঁহারা কেহ কেহ স্থান ত্যাগ করিলেন, কেহ বা সশঙ্কচিত্তে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। একে পূর্ব হইতে রাজশক্তির বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যে বৌদ্ধেরা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর ভিন্নধর্মী বিদেশীর অত্যাচারের ভীতিতে ত্রয়োদশ

৩৪২। দ্রষ্টব্য ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট—Bibliography—পৃঃ ৫০১-২।

শতকের প্রথম ভাগ হইতেই বৌদ্ধধর্মের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। যাহা রহিল, তাহা একটি খাতের মধ্যে বদ্ধজলের মতো। ক্রমে ক্রমে নানা দিক হইতে মাটি পড়িয়া তাহা ঢাকিয়া দিতে লাগিল এবং শেষে অয়োদশ শতকের শেষ তক বাহিরের দিক হইতে দেখিলে চারিপাশের মাটি হইতে তাহার আর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কিছু রহিল না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে লক্ষ্মণাবতীকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথমে বক্তিয়ারের স্থলাভিষিক্তগণই রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। দিল্লীর অনুমোদন-প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির উপর তাঁহাদের ভাগ্য নির্ভর করিত। তখন শাসকগণ নিজেদের অধিকার-রক্ষার জন্যই সর্বদা ব্যস্ত। সেই উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, হত্যা প্রভৃতি চলিয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ শাসন-কর্তার পরিবর্তন হইয়াছে। তারপর তোগ্রল বিদ্রোহী হইয়া নিহত হইলে বলবনের বংশধরগণের হাতে শাসনভার চলিয়া গেল।

বলবনের বংশধরগণের রাজত্ব-কালেই (১২৮৬—১৩২৮ খৃঃ) বাংলায় মুসলমান-রাজত্ব স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং রাজ্যের বিস্তৃতিও ঘটিল। পূর্বে লক্ষ্মণাবতী এবং সম্ভবতঃ গঙ্গার পূর্ব তীরে বরেন্দ্রীর কিছু অংশ লইয়া মুসলিম-রাজ্য গঠিত ছিল, ক্রমে সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণবঙ্গে এবং সুবর্ণগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ববঙ্গে মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ তক সমগ্রবঙ্গে মুসলমান-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

বলবনের বংশধরগণ কেবল রাজ্য-বিস্তারেই নয়, রাজশক্তি ও শাসনকে দেশবাসীদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে লাগিয়া গেলেন। এই সময় বাহির হইতে ইসলামের নানা প্রচারক বাংলায় প্রচার-কার্য চালাইতে লাগিল। এইবার বাঙালী জনসাধারণ মুসলিম-ধর্মপ্রচারকদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিল।

ইহার পূর্ববর্তী প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি কাল যুদ্ধ-বিগ্রহ, অত্যাচার, মন্দির ধ্বংস, ধনরত্ন-লুণ্ঠন প্রভৃতি চলিয়াছে। এই সময় ধর্ম-বিস্তারের দ্বারা শাসন চিরস্থায়ী করার আয়োজন করা হইল। এই সময় অনেক মুসলমান পীর, গাজী সাধুগণ বাংলায় আসিয়া একেবারে পল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। নিজেদের অনেক অলৌকিক শক্তির নানা কাহিনী প্রচার করিয়া সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হিন্দু সাধু ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের অলৌকিক শক্তির কথা লোকে অনেক শুনিয়াছিল, মুসলমান সাধুগণের অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া তাহারা তাঁহাদের প্রতি

বিশেষ আকৃষ্ট হইল। এই প্রচারকগণ বিধ্বস্ত হিন্দু-মন্দির বা বৌদ্ধ-বিহারের মধ্যে দরগা, খানকা, মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করিতে লাগিলেন। নবদীক্ষিত মুসলমানেরা সহজেই পূর্বকথা ভুলিয়া গিয়া এইসব স্থানকে মুসলমান ধর্মানুসারে পবিত্র মনে করিতে লাগিল এবং পীর ও গাজীদিগকে যথেষ্ট ভক্তি করিতে লাগিল।

সেন-যুগে বিশেষতঃ বল্লাল-সেনের অনুপ্রেরণায় সমাজে উচ্চ-নীচ-ভেদ এবং বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছিল; তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সামাজিক নির্যাতনও সহ্য করিতেছিল। তাহারা মুসলমান সাধুদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিয়া প্রবল বিজেতা শাসকগণের ধর্ম-গ্রহণ করিয়া মুসলমান-সমাজে তাহাদের স্থান করিয়া লইল। এইভাবে ধর্মান্তরিত-করণ চলিল।[৩৩৩]

এইবার হিন্দু ও বৌদ্ধসমাজ একটা বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন হইল। এ পর্যন্ত দুই ধর্মে বিরোধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য ছিল। উচ্চ নৈতিক আদর্শ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতিতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মিল আছে, সেইজন্য ইহাদের মধ্যে বিরোধও যেমন হইয়াছে, মিলনও তেমনই হইয়াছে। কিন্তু এই নূতন ধর্মাবলম্বী বিজেতারা ইসলামে বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম-বিশ্বাসে সত্য আছে বলিয়া মনে করে না এবং অন্য ধর্মাবলম্বীকে মোটেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। তারপর আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালীতে হিন্দু-বৌদ্ধ-সংস্কারের সঙ্গে নূতন ধর্মের মোটেই খাপ খায় না। মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মে আপোষও সম্ভব নয়, কারণ কোরাণ-হাদিসের নির্দেশ ও তাহাদের নিজের ব্যাখ্যার একচুলও বাহিরে যাইবার তাহাদের শক্তি নাই। তারপর অত্যাচারী এবং লুণ্ঠনকারী বিজেতাদের প্রতি বিজিতদের একটা বিদ্বেষ ও আক্রোশ এবং অপরিচিতের প্রতি ভয়, সংশয় ও বিরক্তি উভয় পক্ষের আপোষের একটা প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইসব কারণে হিন্দুসমাজ প্রথম দেড়শত বৎসরেরও বেশি সময় সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আত্মসংকোচন করিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা-নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

এই সময়ে বৌদ্ধদের একটি বড় অংশ হিন্দুদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। পাল-যুগের বাঙালী জনসাধারণ ছিল বজ্রযানী বৌদ্ধ। সাধারণ লোকে ধর্ম বলিতে মূর্তিপূজা বুঝিয়া থাকে। তত্ত্ব বা দর্শন যাহাই হোক, কোনো মূর্তির নিকট বা কোনো প্রতীকের নিকট তাহারা প্রাণের আবেগময় শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন

৩৩৩। History of Bengal (D. U.), II—Pages 69-70.

করিতে বেশি আকাঙ্ক্ষা করে। মূর্তি-তৃষ্ণা বা প্রতীক-তৃষ্ণা সাধারণ লোকের সহজাত প্রবৃত্তি। যে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্ত মহাযানের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সর্বসাধারণের নিকট মহাযানকে প্রিয় ও গ্রহণীয় করিবার জন্ত মূর্তি-পূজার প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল। বিভিন্ন বোধিসত্ত্বের মূর্তি এবং বিশেষ করিয়া অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি ও মহাযানের অন্যান্য দেবদেবী-মূর্তির পূজা পাল-যুগের বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। বজ্রযানীরা নানা ধ্যান-কল্পনায় অসংখ্য মূর্তি সৃষ্টি করিল এবং হিন্দুদের মূর্তি-পূজার সঙ্গে ইহাদের বিশেষ প্রভেদ রহিল না। সেন-যুগে হিন্দুধর্মের বিশেষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় বজ্রযানী বৌদ্ধেরা হিন্দু-তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। শৈব আগম, যামল, ও দুই-একখানি প্রাচীন তন্ত্রের মধ্যে যে শিব-শক্তিবাদ বা প্রকৃতি-পুরুষবাদ ও শক্তি-তত্ত্ব ছিল, তাহাকে ভিত্তি করিয়া, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার পরিস্ফুট দেবতা ও দেবী এবং প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতি-পুরুষবাদ মিলাইয়া এবং উভয় গোষ্ঠীর সমস্ত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান, পূজা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া নূতন হিন্দু-তান্ত্রিকধর্ম জন্মগ্রহণ করিল। প্রজ্ঞা-উপায় শিব-শক্তিতে আসিয়া মিশিল। এই তান্ত্রিক ধর্মের মঞ্চে উভয় ধর্মের মিলন সংঘটিত হইয়া একটি শক্তিশালী হিন্দু-তান্ত্রিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। মিলন সহজেই হইল, কারণ, মন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস, জপ প্রভৃতি উভয়েরই সমান। তারপর যে গুহ্যযোগ সাধনা ও যৌন-মিলন বৌদ্ধ সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল, তাহা হিন্দু-তান্ত্রিকতার 'পঞ্চ-মকার'-এ পর্যবসিত হইল। এইভাবে বর্তমান হিন্দু-তান্ত্রিক ধর্মের দৃঢ় ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইল।

হিন্দু-তান্ত্রিক ধর্ম যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত হইয়াছে এবং অনেক হিন্দু-তান্ত্রিক দেব-দেবী যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেব-দেবীর একটু রূপান্তর মাত্র, তাহা মূর্তিতত্ত্বের আলোচনা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিতও আলোচনা করিয়াছেন, পূর্বে একাধিকবার তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমান হিন্দু-তান্ত্রিক ধর্মের অধিকাংশ নির্মাণই যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের দ্বারা সংঘটিত, ইহা ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিশেষ প্রতীয়মান হয়। এই মিলন দ্বাদশ শতাব্দী বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে শেষ হইয়াছে।

এই সময় হইতে তন্ত্র-সাধনা কেবল বাংলায় নয়, বাংলার বাহিরে কাশ্মীর, নেপাল, মহারাষ্ট্র, তাঞ্জোর প্রভৃতি নানা স্থানে প্রসার লাভ করে এবং ঐসব দেশেও নানা তন্ত্রের গ্রন্থ রচিত হয়। অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে এবং পূর্বেও উহার উল্লেখ করিয়াছি যে, এই তন্ত্র-বাদ বহু প্রাচীন এবং আর্যেতর জাতির

ধর্মবিশ্বাস-রূপে বেদ-উপনিষদের মধ্যেও ছায়াপাত করিয়াছে। পরে নানা-ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তাহার গোপন সত্তা রক্ষা করিয়াছে এবং শেষে শৈব আগম ও সংহিতার মধ্যে একটা রূপ লইয়াছে এবং পরে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে একটা বিশিষ্ট তত্ত্ব ও ক্রিয়া-সমন্বিত রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তারপর, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এই তন্ত্রবাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ-রূপ মিলিত হইয়া হিন্দু-তন্ত্রধর্মের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সময় হইতেই হিন্দু-তন্ত্রের বিশিষ্ট গ্রন্থগুলি লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বৌদ্ধদের একটা বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশিয়া গেল বটে, কিন্তু অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ, যাহারা সহজযানের আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিল না। সহজযানীরা দেবতা মানে না, পূজা-জপ-তপ প্রভৃতি মানে না, ব্রাহ্মণ, দণ্ডী, সন্ন্যাসী, ক্ষপণক, রসায়ন-পন্থীদের উপহাস করে। ইহা আমরা সহজযানী সিদ্ধাচার্য সরহপাদ, কাহ্নুপাদ প্রভৃতির রচনায় দেখিয়াছি। তাহাদের সাধনা মূলতঃ দুইটি, একটি দেহ-সাধনা বা 'কায়সাধন', অর্থাৎ হঠযোগের প্রক্রিয়া, অপরটি প্রকৃতি-পুরুষ উভয়শক্তির মিলন-জাত 'মহাসুখ'-উপলব্ধি। ইহাতে মূর্তি-পূজা নাই, ধর্মের আনুষ্ঠানিক কোনো ক্রিয়া নাই, সুতরাং সাধারণ লোকের মূর্তি-পিপাসা ও অনুষ্ঠান-প্রীতি এই ধর্মের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না, তাই অধিকাংশ ইহার দিকে অগ্রসর হইল না। অতি অল্পসংখ্যক লোক, যাহারা দেহ-সাধনা বা যোগ-সাধনা এবং মিথুনাত্মক ধর্ম-সাধনাকে ছাড়িতে পারিল না, তাহারাই একটি ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়-রূপে হিন্দু-সমাজের একপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল।

সহজযানের পরিণতি হিসাবে যে ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল, তাহার মধ্যে একটি একান্তভাবে যোগ-সাধনা—'কায়সিদ্ধি' বা 'কায়সাধন'কে তাহাদের ধর্ম-সাধনার কেন্দ্র করিল। অপরটি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবাদকে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিল। প্রথমটির পরিণতি নাথধর্ম, অপরটি সহজিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

সহজযান হইতে নাথধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত-মণ্ডলে মতদ্বৈধ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,[৩৪৪] ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগছী,[৩৪৫] ডক্টর মহম্মদ

৩৪৪। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র ভূমিকা—পৃঃ ১৬

৩৪৫। **Religion**—Dr. P. C. Bagchi (**History of Bengal** (D. U.), I, Chap. XIII—Page 423.

শহীদুল্লাহ্,[৩৩৬] ডক্টর সুশীলকুমার দে[৩৩৭] প্রভৃতির অভিমত এই যে সহজিয়া বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণের মতবাদ ও ধর্ম-সাধনা হইতে নাথধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত[৩৩৮] বলেন যে, ইহা একটা সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা। ডক্টর কল্যাণী মল্লিক, যিনি 'নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী' নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি নাথদিগকে শৈব বলেন, তবে তাহাদের ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ-সহজিয়াধর্মের যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তাহাও বলেন। তিনি বলেন: "নাথমার্গে হিন্দুর তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদের অপূর্ব মিশ্রণ আছে। নাথ-হঠযোগ ও বৌদ্ধসহজিয়া-সাধনার সাধর্ম্য আছে।······হিন্দু ও বৌদ্ধ-তন্ত্রের শিব ও শক্তি, প্রজ্ঞা ও উপায় সম্বন্ধে একই ধারণা দেখা যায়। বৌদ্ধসহজিয়া-মতে 'মহামুদ্রা'-সাক্ষাৎ হইলেই সিদ্ধিলাভ হয়, এই মহামুদ্রা শূন্যতার ও করুণার অভেদত্ব-বোধ। হিন্দুতন্ত্রে যাহা শিব ও শক্তি, বজ্রযান ও সহজযানের তাহাই শূন্যতা ও করুণা। ইহাদের মিলনে 'মহাসুখ' অনুভূত হয়, ইহাই 'এবম্'কার রূপে বর্ণিত হয়। ইহাই চন্দ্র-সূর্যের যোগ, বিন্দু উভয়ের মধ্যস্থল।······হিন্দুতন্ত্রে এই মিলনই সামরস্য।

"সহজ-মতে বিন্দু অনাহত·········ইহার বহির্দেশে যে কালচক্র আবর্তিত হইতেছে, জীব তাহা আশ্রয় করিয়া সংসারে ভ্রমণ করে। কালচক্র সমাপ্তিতে বিন্দুস্থান অধিকার করিয়া জীবের মহামুদ্রা-সাক্ষাৎকার হয় ও নির্বাণলাভ হয়। নাথমতেও বিন্দু হইতে নাদ, নাদ হইতে কলার উৎপত্তি, দ্বিবিন্দু ক্রমশঃ এক মহাবিন্দুতে পরিণত হইয়া যে অদ্বৈতভাবের উৎপত্তি হয়, তাহাই নিত্য অবস্থা······

"নাদ ও বিন্দুর মিলনই বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন। বৌদ্ধ-সাধনায় চন্দ্র-সূর্যের উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়·········চন্দ্র-সূর্যের মিলন অর্থে 'আনন্দানুভূতি'। তন্ত্র-মতে সৃষ্টির মূল উপাদান চন্দ্র, চন্দ্র যেখানে বিন্দু-রূপে স্থিত, সেখানে কম্পন বা সৃষ্টি নাই, ইহাই চন্দ্রের নিত্যকলা। ইহা হইতে সুধা-ক্ষরণ হইলে সৃষ্টির আবির্ভাব হয়। এই বিন্দু ও নাদই উপায় ও প্রজ্ঞা বা গ্রাহক ও গ্রাহ্য, ইহাদের মিলনে 'নির্বাণানন্দ'-প্রাপ্তি হয়।···

৩৩৬। 'শূন্য পুরাণ'-এর ভূমিকা—পৃ: ৩—৭

৩৩৭। **Sanskrit Literature**—Dr. S. K. Dey (**History of Bengal** (D. U.), I, Chap. XI—Pages 338-39 and also **Foot-note 6.**

৩৩৮। **Obscure Religious Cults**—Dr. S. B. Dasgupta—Pages 227-228.

"সহজিয়া-মতে মধ্যপথ বা 'ডোম্বী'র (বা সুষুম্নার) শোধন করিতে হইলে ললনা ও রসনার (বা ইড়া পিঙ্গলার) সংযোগ কর্তব্য, তন্ত্রেও ইড়া-পিঙ্গলার সংযোগ দ্বারা সুষুম্না-পথ উন্মুক্ত হইবার কথা আছে। চর্যাপদ ও হঠযোগ-প্রদীপিকাতে 'বারুণী'র কথা আছে, ইহার অর্থ চঞ্চল বিন্দু।......বজ্রদেহ, যোগদেহ, রসময়ী তনু ও সিদ্ধদেহ মূলতঃ একই, যোগসূত্রেও 'বজ্রসংহননরূপ-কায়সম্পৎ'-এর উল্লেখ আছে। সিদ্ধদেহ ব্যতীত নাথদের 'মহাজ্ঞান'-ধারণ অসম্ভব।...

"বৌদ্ধ-সহজিয়াদের মতের সহিত নাথমতের কোন কোন বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও নাথপন্থা মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত যুক্ত মার্গ বিশেষ......হিন্দুর তন্ত্র ও শৈবাগম নাথদর্শনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে..."।[৩৪৯]

পণ্ডিতগণের বিভিন্ন মতবাদ ও বিতর্কের আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত বলিয়া তাহা নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, দুইটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি, বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণ যে হঠযোগ-অবলম্বনে 'কায়সিদ্ধি' বা 'কায়সাধন' করিতেন এবং নিজেদের দেহকে 'পক্ক' বা যোগসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা ঠিক এবং নাথযোগিগণও হঠযোগ-অবলম্বনে 'সিদ্ধদেহ' লাভ করিবার জন্য সাধনা করিতেন। এই হঠযোগের প্রক্রিয়াতে উভয়ের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য আছে। অপরটি, বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণ ও নাথ-সম্প্রদায়-প্রবর্তক মৎস্যেন্দ্রের আবির্ভাব-কাল অনেকটা সমসাময়িক। যদিও মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষের আবির্ভাব-কাল লইয়া নানা আলোচনা হইয়াছে এবং কোনো পণ্ডিতই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তবুও ঐতিহাসিক দৃষ্টি-কোণ হইতে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে মৎস্যেন্দ্রের আবির্ভাব-কাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী এবং গোরক্ষের আবির্ভাব-কাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ।[৩৫০] সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে একটা দৃঢ় যোগ-সূত্র ছিল বলিয়া মনে হয়।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম' নামে এক

৩৪৯। 'নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী'—পৃঃ ১৮৮—১৯১ এবং 'অবতারণা' —পৃঃ ১৩—১৮

৩৫০। Kaulajnannirnaya—Dr. P. C. Bagchi, Intro.—Page 26 এবং 'নাথ, সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী'—ডাঃ মল্লিক—পৃঃ ৪৬

বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধে 'সহজযান ও সিদ্ধমার্গ'-এর সাদৃশ্য ও সিদ্ধমার্গের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।[৩৫১] তিনি ঐ প্রবন্ধের একস্থলে বলেন :

"বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সহজ ও বজ্রমার্গে অনুভূতিসম্পন্ন আচার্যগণকে "সিদ্ধাচার্য" নামে অভিহিত করা হইত। মৎস্যেন্দ্রনাথের নামের সহিত যে ধর্মমত সংসৃষ্ট রহিয়াছে এবং যাহাকে আমরা সিদ্ধমার্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি তাহাতেও আচার্যকে সাধারণতঃ 'সিদ্ধ' বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। নাথগণের প্রচারিত সিদ্ধমার্গে পরমপদকে 'সহজাবস্থা', কেবলমাত্র 'সহজ' অথবা 'স্বভাব' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বলা বাহুল্য, এই 'সহজ'-শব্দটি সহজপন্থী অথবা বজ্রপন্থীদিগের একটি পারিভাষিক শব্দ বিশেষ। উভয় মার্গেই এই যোগের প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে, যুগনদ্ধরূপে গুরুর আত্যন্তিক আবশ্যকতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে এবং দেহসিদ্ধির গৌরব মুক্তকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। এইরূপ বহুসংখ্যক বিষয়েই উভয়মতে সাম্য লক্ষিত হয়। যে সকল সিদ্ধগণকে বৌদ্ধ সহজিয়া অথবা বজ্রযানী সাধক ভক্তির সহিত উপাস্যরূপে উল্লেখ করেন, তাঁহারা সকলেই—সকলে না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই হঠযোগী অথবা নাথপন্থিগণেরও নমস্য।"[৩৫২]

বাউল-মার্গের সাধনা-প্রসঙ্গে হঠযোগ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। আমরা দেখিব যে, নিশ্বাস প্রশ্বাস বা প্রাণ-অপান-নিয়ন্ত্রণ ও কুম্ভকে অবস্থিতিই বাউল-সাধনার মূলভিত্তি। এখানে সংক্ষেপে হঠযোগের মূল স্বরূপটির একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

হঠযোগের মূল কথা হইতেছে 'হ'-কার ও 'ঠ'-কারের যোগ। তন্ত্রের সাংকেতিক ভাষায় 'হ'-কার চন্দ্রকে এবং 'ঠ'-কার সূর্যকে বুঝায়। এই চন্দ্র ও সূর্যকে মিলিত করিয়া সমভাবাপন্ন করাই হঠযোগের মূল ক্রিয়া। ইহাই পরিভাষা-ভেদে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর বা প্রাণ ও অপান-বায়ুর সমীকরণ নামে কথিত হয়।

হঠযোগিগণের মতে বৈষম্যেই জগৎ বা সৃষ্টির উৎপত্তি। যাহা হইতে জগতের আবির্ভাব হয়, তাহা যতক্ষণ সাম্যাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ জগতের থাকে না। ইহা অদ্বৈত বা প্রলয়-অবস্থা। সাম্য-ভঙ্গ হইলেই

৩৫১। উত্তরা (মাসিক পত্র), কার্তিক, ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় শ্রাবণ, ১৩৩৫.

৩৫২। উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, ৩য় বর্ষ, নবম সংখ্যা—পৃ; ৬৪৬—৪৭

বৈষম্য—ইহাই সৃষ্টি-বীজ। দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি পরস্পরকে অভিভূত করিয়া স্থিতি-রূপে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে। এই দুইটি শক্তি যখন সমত্ব ত্যাগ করে এবং তাহাদের মধ্যে গুণ-প্রধান ভাব জাগিয়া উঠে, তখন সৃষ্টি বা সংহার সংঘটিত হয়। এই দুইটি শক্তিকে নানা শাস্ত্রে নানা নামে অভিহিত করা হয় —যথা শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি ইত্যাদি। মানব-দেহে প্রাণ ও অপান-রূপে এই দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির লীলা দেখা যায়। ইহারা উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু মিলিত হইতে পারে না। প্রাণ ও অপানকে যদি উদ্বুদ্ধ করিয়া উভয়ের মিলন-সাধন করা যায়, তবেই উভয়ের সাম্য ঘটিতে পারে। ইহারাই স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস—পূরক ও রেচক এবং উভয়ের সমীকরণ হইল কুম্ভক। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে, ততক্ষণ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী ক্রিয়াশীল থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতা হইলে অর্থাৎ কুম্ভকের দ্বারা সুষুম্না-পথ খুলিয়া যায়। সুষুম্না-পথই মধ্যপথ—শূন্যপদবী বা ব্রহ্মনাড়ী। চন্দ্র ও সূর্যকে যদি প্রকৃতি ও পুরুষ মনে করা যায়, তবে চন্দ্র-সূর্যের মিলন বলিতে প্রকৃতি-পুরুষের আলিঙ্গনই বুঝিতে হইবে। এই আলিঙ্গন ভিন্ন শূন্যপথ খোলে না। বিশুদ্ধ শূন্যই নির্বাণ-পদ। বাম ও দক্ষিণ ত্যক্ত হইয়া মধ্যাবস্থার পূর্ববিকাশই নির্বাণ। হঠাচার্যগণ সহস্রারস্থ মহাবিন্দুতে এই মহামিলন অনুভব করেন এবং এই মিলনোদ্ভূত রস-ধারায় নিজেকে প্লাবিত মনে করেন। ইহার দ্বারা জরা-মৃত্যুহীন 'সিদ্ধদেহ' বা 'যোগদেহ' লাভ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণ যৌনমিলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও, নাথ-সিদ্ধাচার্যগণের মতোই বিন্দু-স্থৈর্য-সাধনই তাঁহাদের ধর্মের প্রধান ক্রিয়া। বিন্দু-স্থৈর্য না ঘটিলে অদ্বয়-অবস্থা লাভ করা যায় না। যতক্ষণ বিন্দু চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ নির্বিকল্প অবস্থা বা সহজানন্দের বিকাশ হয় না। চঞ্চল ও ক্ষরণশীল বিন্দুকে সহজিয়াগণ 'সংবৃতিবোধিচিত্ত' বলিয়াছেন। ললনা ও রসনা যখন পরিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ অবধূতী-মার্গে ইহা সঞ্চালিত হয়, তখন প্রাণের স্থৈর্য সম্পাদিত হয়। পরিশোধিত মধ্যনাড়ীর মুখ পরমানন্দ-স্বরূপ। উহাকে স্পর্শ করিলেই ঐ আনন্দ বিরমানন্দ-রূপে প্রকাশিত হয়। উষ্ণীষ-কমলে মধুপানই সহজানন্দের আস্বাদন। ইহার স্বরূপ মহাসুখ বা পরমার্থ-বোধিচিত্ত। বিন্দু-সিদ্ধি না হইলে পঞ্চস্কন্দের দৃঢ়তা অর্থাৎ দেহ-সিদ্ধি সংঘটিত হয় না। বোধিচিত্ত বা বিন্দুই যাবতীয় সিদ্ধির মূল—'তাহা যদি পতিত হয়, তবে স্কন্ধবিজ্ঞান মূর্ছিত হয়, সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না।' যিনি

'কুলিশারবিন্দ-সংযোগ'-এ বোধিচিত্তকে বজ্রপথে করিয়াছেন এবং ব্রহ্মনাড়ীতে বিন্দুকে চালিত করিয়া স্থির ও দৃঢ় করিতে পারিয়াছেন—তিনিই 'বজ্রধর'-পদবাচ্য সিদ্ধগুরু, তাঁহারাই পরমযোগী—তাঁহারাই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু নাথ-সিদ্ধাচার্যগণ স্ত্রী-সঙ্গকে সযত্নে ও সভয়ে পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা ইড়া ও পিঙ্গলার সমীকরণ দ্বারা দেহাভ্যান্তর-স্থিত শক্তিকেই জাগ্রত করিয়া সহস্রার-স্থিত শিবের সঙ্গে মিলন করাইয়া তজ্জাত আনন্দ-ধারায় স্নাত হইয়া সিদ্ধদেহ লাভ করেন। বিন্দুসিদ্ধি ছাড়া যোগের কোনো উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। বিন্দুসিদ্ধি উভয়েরই লক্ষ্য—কিন্তু পথ বিভিন্ন। এক সম্প্রদায় চঞ্চলতার কারণকে বর্তমান রাখিয়াই তাহার মধ্য হইতে অচঞ্চল অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে—অপর সম্প্রদায় সেই কারণের সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-কাহিনী বহু পূর্ব হইতেই বাংলায় প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া গৃহীত পাহাড়পুর-ফলকচিত্র হইতে ইহা আমরা বুঝিতে পারি। সেখানের একটি যুগল-মূর্তি কৃষ্ণ-রুক্মিণী বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ভাগবতে রাধার উল্লেখ না থাকিলেও আমরা অষ্টম শতাব্দী হইতে রচিত কাব্য-সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। ঐ সঙ্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের লীলা-বর্ণনাও পাওয়া যায়। সেন-যুগে কাব্য-সাহিত্যের মারফতে রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কাহিনী বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', 'লীলা-শুক', বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও নানা কবির রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক কবিতা রাধাকৃষ্ণবাদকে সর্বজন-পরিচিত করে। লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবত্ব পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, রাধা-কৃষ্ণ ক্রমে লক্ষ্মী-নারায়ণের স্থান অধিকার করিলেন। সেন-যুগেই রাধাকৃষ্ণবাদ একটা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ইহার পরিপূর্ণ দার্শনিক ও তাত্ত্বিক রূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গোস্বামিগণের হস্তে রচিত হয়।

পূর্বে উল্লিখিত বৌদ্ধ-সহজিয়াদের সেই সম্প্রদায়টি এই রাধাকৃষ্ণবাদকে গ্রহণ করিল। এই গ্রহণ রাধাকৃষ্ণকে দেব-দেবী জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ নয়। এই রাধাকৃষ্ণবাদ নর-নারীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ববিশেষ। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, বুদ্ধত্ব, বজ্রসত্ত্ব বা বোধিচিত্ত আমাদের অন্তর্নিহিত একটি দিব্যসত্তা বিশেষ—ইংরেজী দর্শনের ভাষায় যেটাকে Metaphysical existence বলে। এই সত্তা দুইটি তত্ত্বের বা সত্তার মিলনে গঠিত। একটি

শূন্যতা ও অপরটি করুণা—একটি প্রজ্ঞা, অপরটি উপায়। এই দুইটি তত্ত্ব বা দিব্যসত্তা যথাক্রমে নারী ও পুরুষের অন্তর্নিহিত সত্তা। এই উভয়ের মিথুনাত্মক মিলন-সঞ্জাত মহাসুখই বুদ্ধত্ব, বজ্রসত্ত্ব বা বোধিচিত্তের স্বরূপ। এই মহাসুখ-উপলব্ধিই সেই স্বরূপ-লাভের উপায়। ইহাই নির্বাণলাভ। বৈষ্ণব-সহজিয়ারাও ঠিক এইভাবে রাধাকৃষ্ণবাদকে প্রকৃতি-পুরুষবাদ-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। ইহা নারী ও পুরুষের অন্তর্নিহিত সত্তা। উভয়ের যুগল-মিলনই সাধনার লক্ষ্য। শৈবতন্ত্রের শিব-শক্তির যে তত্ত্ব ছিল, তাহা প্রজ্ঞা-উপায়-রূপে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের কাছে রূপায়িত হয়, সেই প্রজ্ঞা-উপায় আবার রাধা-কৃষ্ণরূপে বৈষ্ণব-সহজিয়া-গণের দ্বারা গৃহীত হইল। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের সাধনাংশ সম্পূর্ণরূপে তাহাদের দ্বারা গৃহীত হইল। কেবল প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বহিসাবেই রাধাকৃষ্ণবাদকে তাহারা গ্রহণ করিল। সেন-যুগের কাব্য-সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনায় একটা আবেগ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির স্থান ছিল। তাহারই সংক্রমণে সহজিয়া-বৈষ্ণবদের রাধা-কৃষ্ণরূপী প্রকৃতি-পুরুষের যুগল-সাধনার মধ্যে প্রথম হইতেই কিছু প্রেমের আবেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই প্রেমের আবেগ ও অনুভূতি চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বৃহত্তর, ব্যাপকতর, স্ফুটতর রূপে প্রকাশিত হইয়া সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের একটি বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিক হইতেই রূপান্তরিত বৌদ্ধসংখ্যা-পুষ্ট হিন্দুসমাজ বিজেতা মুসলমানদের ধর্মের সম্মুখীন হইল। বাস্তবিকই ইহা দুইটি বিভিন্নমুখী ধর্মের সংঘাত—দুইটি বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির সংঘর্ষ। প্রথমে চলিল আত্মরক্ষা—এই আত্মরক্ষায় হিন্দু-সমাজ একেবারে শম্বুক-বৃত্তি গ্রহণ করিল।

এই সমাজের কর্তা ছিল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তথা-কথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু। হিন্দু-সমাজে বর্ণ-ভেদ পূর্ব হইতেই ছিল, পাল-যুগে বৌদ্ধ-প্রভাবে তাহা অনেকখানি প্রশমিত হইয়াছিল, কিন্তু সেন-যুগে তাহা প্রবল হইয়া উঠিল এবং সামাজিক ভেদ-বিভেদ-সৃষ্টির ফলে সর্বশ্রেণীর সম্মিলিত সামাজিক সংহতি নষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণী চিরকাল রাজানুগ্রহ পাইয়াছে, রাজানুগ্রহেই তাহারা সমাজের শাসক ও নির্দেশক হইয়াছিল এবং দীর্ঘদিন সমাজে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতাহীন হইয়া তাহারা সামাজিক কর্তৃত্বকে আরো বেশি আঁকড়িয়া ধরিল। সমাজের চক্ষেও রাজশক্তির অভাবে সমাজ-রক্ষার ভার ও দায়িত্ব তাহাদেরই উপর পড়িল এবং তাহারাই ধর্ম-রক্ষার জন্য সমাজ-শাসনের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করিল।

এই ধর্ম ও সংস্কৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে রক্ষণশীল নীতি গৃহীত হইল, নানা বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হইল এবং নানা সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। যাহাদের 'ম্লেচ্ছ' বা 'যবন'-সংস্পর্শ ঘটিল, সমাজ তাহাদিগকে নির্মমভাবে বর্জন করিতে লাগিল। আচার-নিষ্ঠা হইল প্রবল, সমস্ত 'অনাচার' বাঁচাইবার জন্য সমাজ কূর্মের মতো আত্মসংকোচ-নীতি গ্রহণ করিল।

কিন্তু এই উচ্চশ্রেণীর বাহিরে যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অগণিত জনসাধারণ ছিল, যাহারা দরিদ্র, অশিক্ষিত, যাহারা সর্বদা কোনোরূপে জীবন-ধারণের প্রচেষ্টায় রত, তাহাদের জন্য কোনো সুষ্ঠু ও সঙ্গত ব্যবস্থা সমাজ করিতে পারিল না। কারণ রাজশক্তির সাহায্যহীন সমাজের কোনো বৈষয়িক ব্যবস্থা করিবার শক্তি তাহার হাতে ছিল না। সমাজের কাজ তখন হইল কেবল শুদ্ধিরক্ষা ও বহিষ্করণ।

এই শ্রেণীর লোকেরা প্রাণ-ধারণের অনিবার্য তাগিদে, নানা সুযোগ-সুবিধা-প্রাপ্তির আশায়, উচ্চ শ্রেণীর ভ্রূকুটি ও শাসন এবং স্থানবিশেষে শাস্তি এড়াইবার জন্য দলে দলে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ধর্মান্তরের পরেই বিজেতা মুসলমানগণের বৈষম্যমূলক ব্যবহার, জিজিয়া কর প্রভৃতি হইতে রেহাই পাইয়া সমাজে তাহারা নিঃসংকোচে মেলা-মেশা ও স্থানবিশেষে পদ-মর্যাদাও লাভ করিল। এইভাবে চতুর্দশ শতক ধরিয়া একদিকে জাতি-চ্যুতি করণ ও অন্যদিকে ধর্মান্তর-গ্রহণ চলিল।

ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিক হইতে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বাঙালীর মূলধর্ম ছিল তান্ত্রিক-শাক্তধর্ম। পূর্বে বলিয়াছি যে, তান্ত্রিকতার রঙ্গমঞ্চে হিন্দু ও বৌদ্ধের মিলন হইয়াছিল। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া ত্রয়োদশ শতকে এই মিলন শেষ হইয়াছে। বর্তমানে হিন্দু-তান্ত্রিকধর্ম বৌদ্ধ-তান্ত্রিকধর্মের একটা নবরূপ মাত্র। বৌদ্ধদের দেব-দেবী, ভাব-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা সমস্তই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শক্তি-পূজায় মনসা, শীতলা, নানা প্রকারের চণ্ডী, বনদুর্গা প্রভৃতি যে সমস্ত লৌকিক দেবীর পূজা বাংলায় প্রচলিত, তাহা বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন। ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

বাঙালী হিন্দুর ধর্ম-জীবন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সে পুরাণ-বর্ণিত কতকগুলি দেব-দেবী এবং আগম ও তন্ত্রাদিতে বর্ণিত শক্তি-দেবীর পূজা করে, কিন্তু পূজার অংশটি অর্থাৎ অঙ্গন্যাস, করন্যাস, বিবিধ মুদ্রা, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, জপ, প্রভৃতি সমস্ত অংশটিই তান্ত্রিক। হোম একটি বৈদিক ক্রিয়া, কিন্তু হোমও 'তান্ত্রিক হোম' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। বাঙালীর ধর্ম-জীবনের

আর একটি বিশেষ অঙ্গ দীক্ষা-গ্রহণ। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের গুরু তো আছেনই, জলাচরণীয় এবং অনাচরণীয় সকল হিন্দুরই গুরু আছেন। তাঁহারা কুলগুরু, বংশ-পরম্পরায় সেই বংশের বংশধরদিগের নিকটই মন্ত্র লওয়া হয়। ইহাকে দীক্ষা-গ্রহণ বলে। গুরু-দত্ত মন্ত্র জপ, পুরশ্চরণ প্রভৃতি দ্বারা ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনা পূর্ণাঙ্গ হয়। মন্ত্র-দাতা গুরুকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে করা হয়। গুরুকে এইরূপ দেবতা জ্ঞান করা ও ধর্ম-সাধনায় গুরু-মন্ত্র-গ্রহণের অপরিহার্যতা—এই অংশটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম হইতে হিন্দুধর্মে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

"The present day Tantric leaven in Bengal Hinduism largely came to it via the Buddhistic *Kālachakrayāna,* the *Vajrayāna* and the *Sahajayāna* schools of *Tantrayāna.* One matter in which there has been a subtle influence from Tantric Buddhism upon Bengal Brahmanism would seem to be this: the rather exaggerated importance of the *Guru* from whom Tantric initiation is received. The Brahmana has his proper Vedic initiation when he is invested with the sacred thread by the *upanayana* rite . . . theoretically he does not require any other initiation. But, in practice, all good Hindus in Bengal should have a *Guru* who will give him the mantra . . . and Guru becomes almost as a god to him after his initiation. This mentality has become so throughly ingrained in the Bengali mind. . . . Now, the *Guru* has always had an honoured place in Brahman Society; but he was never an object of divine honours in Vedism. Whereas, as we see in Nepal where the Tantric Buddhism as in Bengal of the 10th-13th centuries still survives among the Newars, although strong Saiva or Sakta cult of the Gurkhas has been profoundly modifying it, a Buddhist is known as a *Gu-bhaju* or a 'Guru-worshipper,' and a Brahmanical Hindu as a *De-bhaju* or a 'Deva-worshipper'." ৩৫৩

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালীর মূলধর্মই ছিল শাক্তধর্ম। তাহার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে

৩৫৩। **Buddhist Survivals in Bengal**—Dr. S. K. Chatterjee (*B. C. Law Vol. I*—Page 75ff.)

ইলিয়াস-শাহী বংশ যখন বাংলায় স্বাধীন নবাব হিসাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন কয়েক বৎসরের জন্য রাজা গণেশ নামে এক হিন্দুরাজা বাংলায় রাজত্ব করেন। কিন্তু রাজা গণেশের নামে ঐ সময়ে কোনো মুদ্রা পাওয়া যায় নাই, পাওয়া গিয়াছে দনুজ-মর্দন নামে এক হিন্দু রাজার। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাজা গণেশ ও দনুজমর্দন দেব অভিন্ন। রাজা গণেশই দনুজমর্দন-উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ থাকিলেও ডক্টর ভট্টশালীর এই মত সাধারণভাবে প্রায় সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। ঐতিহাসিক-গণের বিতর্কের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। বর্তমানে মুসলমান-যুগের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত যদুনাথ সরকার মহাশয়ও এই মত মানিয়া লইয়াছেন।[৩৫৪] এই দনুজমর্দন দেবের মুদ্রার একদিকে বঙ্গাক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার নাম ও অপরদিকে লিখিত আছে "চণ্ডীচরণ-পরায়ণস্য"। দনুজমর্দন দেবের মুদ্রাগুলি ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত।[৩৫৫] সুতরাং দেখা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সম্রান্ত হিন্দুগণের মধ্যে শক্তি-পূজা প্রচলিত ছিল এবং তাঁহারা শক্তিপূজার বিশেষ উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরবর্তী যুগের সাহিত্যের প্রমাণেও দেখা যায়, বাংলায় শাক্তধর্মের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল এই সময়।

বাঙালী হিন্দুর পক্ষে ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিক হইতে চতুর্দশ শতকের শেষের দিক পর্যন্ত—এই এক শতাব্দী-কালকে আমরা ধর্ম ও সংস্কৃতির 'সংরক্ষণ-যুগ' বলিতে পারি, তাহার পর হইতে চলিয়াছে 'সংগঠন-যুগ'। ধর্ম হিসাবে শক্তি-ধর্মই ছিল প্রবল। শক্তি-দেবীর মধ্যে মনসা, চণ্ডী, প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিলেন। হিন্দু-সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃত ভাষার চর্চা বিশেষভাবে চলিতে লাগিল এবং বাংলার হিন্দুপ্রধান কেন্দ্রে কেন্দ্রে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে নানা হিন্দুশাস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা চলিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ যেমন সমাজের কর্ণধার হইয়া

৩৫৪। **History of Bengal** (D. U.), II—Page 121.

"To Dr. Nalini Kanta Bhattasali belongs the credit of first proving that Danuja-mardan Dev was the highly significant title which Ganesh assumed when he openly ascended the throne after crushing the Islamic party in the State. This view has been accepted by practically all scholars now."

৩৫৫। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য়—পৃঃ ১৭৯-৮০

অনেককে সমাজ হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহারাই এই ক্ষীয়মান সমাজের সংস্কৃতি-রক্ষার জন্যও অগ্রসর হইলেন। পঞ্চদশ শতকের প্রথম হইতেই নানা হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা চলিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"এই পঞ্চদশ শতকে রাঢ়ীশ্রেণীর মহিন্তা গাঁই বৃহস্পতি নামে একজন বড় পণ্ডিত গৌড়ের সুলতান রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারিগণের নিকট 'রায় মুকুট' এই উপাধি পাইয়াছিলেন এবং একখানি স্মৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়া বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ উপকার করিয়া যান। তাঁহার অমরকোষের টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ-পনরখানি বৌদ্ধ-পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অমরকোষের টীকার তারিখ ইংরাজী ১৪৩১ সাল।"[৩৫৬]

এই পণ্ডিত সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন লিখিয়াছেন :

"মহিন্তাপনীয় কবিচক্রবর্তী-রাজপণ্ডিত-পণ্ডিত-সার্বভৌম-কবিপণ্ডিত-চূড়ামণি-মহাচার্য-রায়-মুকুটমণি" বৃহস্পতি মিশ্রের মনীষা সুলতান জালালুদ্দিনের কাছে বিশেষ সম্মাননা লাভ করেছিল। 'স্মৃতিরত্নহার' ছাড়া ইনি 'ব্যাখ্যাবৃহস্পতি' নামে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের টীকা এবং 'নির্ণয়বৃহস্পতি' নামে শিশুপালবধের টীকা ও 'পদচন্দ্রিকা' নামে অমরকোষের টীকা রচনা করেন। ইহার রচনাকাল ১৩৫৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ···বৃহস্পতি ছিলেন পরম বৈষ্ণব—তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে বিষ্ণুবন্দনা ও বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্যোপাখ্যান আছে।"[৩৫৭]

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আবার বাঙালী ব্রাহ্মণ স্মৃতিশাস্ত্রের পুঁথি লিখিতে বসিলেন। সেন-যুগের ভট্ট-ভবদেব, হলায়ুধ, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাপক স্মার্তগণের ধারা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দনের মধ্যে একটি পূর্ণরূপ ধারণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রাজনৈতিক পরিবর্তন হইলেও ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণী বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি হারায় নাই। রাজস্ব-আদায়ের কাজে পাঠানরাজেরা সম্পূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ করেন

৩৫৬। 'নারায়ণ'-পত্রিকা, ২য় বর্ষ—পৃঃ ১৬৭

৩৫৭। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী—ডাঃ সুকুমার সেন—পৃঃ ১০

নাই। পাঠান-অধিকার-কালে বহু হিন্দু ভূস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বরেন্দ্রভূমিতে অনেক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন। তাহেরপুরের জমিদার বংশ ঐরূপ প্রাচীন জমিদার বংশ। গৌড়ের সুবুদ্ধি রায়ের কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যের বর্ণনায় পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যবঙ্গে সপ্তগ্রামের জমিদার বারলক্ষের অধিপতি হিরণ্য ও গোবর্ধন নামে কায়স্থ-ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ আছে। ভুরসুটের ভূস্বামী ও সমুদ্রগড়ের ব্রাহ্মণরাজা একরূপ অর্ধ-স্বাধীন ছিলেন। বিচারেরও কিছু অংশ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। মোগল-যুগে এই ভূস্বামীরা 'ভুঁইয়া' নামে পরিচিত হন।[৩৫৮]

বাংলার হিন্দুসমাজে এইসব উচ্চবর্ণের ভূস্বামী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামাজিক শৃঙ্খলা-রক্ষা ও 'অনাচার' প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেমন তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের অনুপ্রেরণা দিলেন, তেমনি হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির মেরুদণ্ড সংস্কৃত-বিদ্যার চর্চাকে প্রসারিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুর পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য প্রচারের জন্য বাংলা ভাষার চর্চাকেও বিশেষ উৎসাহ দিলেন।

বাঙালী হিন্দুদের জাতি হিসাবে অস্তিত্ব-রক্ষা ও তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনর্গঠন ও বাংলা ভাষা-প্রসারের প্রয়াসের মূলে একটি রাজনৈতিক কারণও বর্তমান ছিল। ইলিয়াস-শাহী বংশের শাসকগণ ছিলেন দিল্লীর অধিকার-বিমুক্ত স্বাধীন সুলতান। তাঁহারা বাংলাকেই তাঁহাদের বাসস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে, তাঁহারা বাঙালী স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তুরস্ক-পারস্য যেখান হইতেই তাঁহারা আসুন না কেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের শরীরে বাঙালী-রক্ত ঢুকিতে লাগিল এবং পুরুষ-পরম্পরায় বাঙালী-রক্তের প্রাধান্যই হইল বেশি। অবশ্য তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি হইতে তাঁহারা বিচলিত হইলেন না এবং আরবী ও ফারসী ভাষার চর্চাও তাঁহারা সমানভাবে করিতে লাগিলেন, তবুও তাঁহারা বাঙালীর ভাষা বাংলার প্রতি আর বিরূপ হইতে পারিলেন না। কারণ, সাধারণ মুসলমান যাহারা এই দেশে বিবাহ করিয়াছে তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানরা বাংলায় কথা বলে, তারপর ধর্মান্তরিত মুসলমানের বিরাট অংশেরও ভাষা বাংলা। সুতরাং এই দেশের আদিম অধিবাসীদের ভাষা বাংলার প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ চলিয়া গেল, বরং প্রকারান্তরে তাঁহারা উৎসাহই দিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল একত্র বাস করার ফলে ক্রমেই হিন্দুদের প্রতি

৩৫৮। মধ্যযুগের বাঙ্গালা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১৯০

বিদ্বেষভাবও অনেকটা প্রশমিত হইল এবং তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি জানিবার জন্যও শাসকগণ আগ্রহান্বিত হইলেন। হিন্দুরাও অনেকটা সন্ত্রস্ত মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা এবং বাংলা ভাষার চর্চা করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে হিন্দু-সংস্কৃতির যে সংগঠন চলিতেছিল, তাহা অনেকটা স্থিররূপ ধারণ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ইহার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি হয় আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩—১৫১৯ খৃঃ)।

প্রথমে হিন্দু-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক পুরাণ ও মহাকাব্যদ্বয়কে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রচার করা এই সংগঠনের প্রধান কার্য হয়। সেই সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর উপাস্য দেবী মনসা ও চণ্ডীর মাহাত্ম্য-কাহিনীও প্রচার করা হয়। সেই সঙ্গে সংস্কৃতের চর্চাও চলিতে থাকে। বাংলার নানা কেন্দ্রে এই সময়ই টোল স্থাপিত হয় এবং সেগুলিতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

হোসেন শাহকে বাংলার আকবর-আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে সমান চক্ষে দেখিতেন। বহুদিনের অত্যাচার, বৈষম্যমূলক ব্যবহার, জাতিগত ও ধর্মগত নানা বিরোধ ও বিদ্বেষের পর তিনিই বাংলায় শান্তি, ন্যায়বিচার ও সুশাসন আনিয়াছিলেন। বাংলা দেশ যে কেবল বিজিত রাজ্য নয় এবং শাসকগণের যথেচ্ছ বিহার ক্ষেত্র নয়, ইহা যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাসভূমি, তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় গৌরবের দিক দিয়াও গৌড়-বঙ্গের ইহা গৌরবের যুগ। উত্তরে কামরূপ ও কামতাপুর, দক্ষিণ-পূর্বে ত্রিপুরা ও পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশের পূর্বসীমা পর্যন্ত গৌড়রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন।[৩৫৯]

হোসেন শাহ্ উপযুক্ত হিন্দুদিগকে রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বসু-বংশীয় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ গোপীনাথ বসু 'পুরন্দর খাঁ' উপাধি লাভ করিয়া হোসেন শাহের উজীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতন-ভ্রাতৃদ্বয়কে হোসেন শাহ্ উচ্চপদ দিয়াছিলেন। সনাতনকে তিনি 'দবীর খাস'-পদে (প্রাইভেট সেক্রেটারী) নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং রূপকে তিনি 'সাকর মল্লিক' উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, তাঁহার দেহরক্ষী-দলের দলপতি কেশব ছত্রী, টাকশালের অধ্যক্ষ অনূপ সকলেই হিন্দু ছিলেন।

৩৫৯। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ২৮৭

হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলা ভাষায় মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারক 'কাব্যগ্রন্থ' রচিত হয়। মহাভারতের অনুবাদ ও ভাগবতের কতকাংশের অনুবাদ করা হয়। মুসলমান শাসনকর্তারা এবং হিন্দু ভূস্বামীরা সকলেই বাংলা ভাষায় ধর্মগ্রন্থ-প্রচারে বিশেষ উৎসাহ দেন। ফতেয়াবাদ 'মুলুক'-এর (সরকার) অন্তর্গত ফুল্লশ্রী-গ্রামবাসী বিজয়গুপ্ত 'মনসামঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। অর্জুন নামে এক সামন্তরাজের উপর বোধ হয় তখন ওই পরগণার শাসনভার অর্পিত ছিল। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-কাব্যগ্রন্থ রচিত হয় ১৪১৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাহাতে এইভাবে হোসেনশাহের উল্লেখ আছে:

"ছায়াশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি-তিলক॥
উত্তরে অর্জুনরাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম॥"৩৬০

১৪১৭ শকে অর্থাৎ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্রদাস নামে এক ব্রাহ্মণ 'মনসামঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকায় হোসেন শাহের এইরূপ উল্লেখ আছে:

"মুকুন্দ পণ্ডিত যুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাতুড়্যা বটগ্রাম॥
যুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
সিঅরে বসিয়া পদ্মা কহিলা উপদেশে॥
কবিগুরু খিরজনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গিত সাস্ত্র অনুসার॥
সিন্ধু ইন্দুবেদ মহি সক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সা গৌড়ে সুলক্ষণ॥"৩৬০ক

বিপ্রদাসের উপাধি ছিল 'পিপলাই' এবং তাঁহার কাব্যের প্রকৃত নাম 'মনসাবিজয়'।

৩৬০। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ৭৪ (অষ্টম সংস্করণ)

ডাঃ সুকুমার সেন বলেন যে, বিজয়গুপ্তের ভণিতাযুক্ত কোনো প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই তারিখটি সংকলয়িতার সংযোজন হইতে পারে। 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম, পৃঃ ১৫০

৩৬০ক। **Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal** New Series, Vol. V—Page 253. এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম, পৃঃ ১১৮-১৯ ইত্যাদি

হোসেন শাহের এক সেনাপতি, চট্টগ্রামের এক অঞ্চলের শাসক পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক একব্যক্তি মহাভারতের আদিপর্ব হইতে স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত বাংলা কাব্যে অনুবাদ করেন। তাহাতে হোসেন শাহের প্রশস্তি দেখা যায়:

"নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার॥"৩৬১

কুলীন-গ্রামবাসী মালাধর বসু ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাংলা কাব্যে অনুবাদ শেষ করেন। কথিত আছে, হোসেন শাহ্ তাঁহার সাহিত্য-চর্চার জন্য তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দান করেন।

হোসেন শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নসরৎ শাহও পিতার ঐতিহ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। নসরৎ শাহের উৎসাহে যে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে।

" ....নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥"৩৬২

হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। মনে হয়, নসরৎ শাহের রাজত্ব-কালের প্রথমেই এই অনুবাদ আরম্ভ হয়।

বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনর্গঠন বা পুনরুজ্জীবন চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ হইতে আরম্ভ হইয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত চলিয়া অনেকটা স্থিররূপ ধারণ করিয়াছিল। এই সময় বাঙালীর মূলধর্ম তান্ত্রিক-শাক্তধর্ম বাংলায় উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হয়। নানা শক্তি-দেবীর পূজা ও তৎসঙ্গে পঞ্চমকারাদির সাধনাও বিশেষ ব্যাপ্ত হয়। আর সংস্কৃতির দিক হইতে অন্যান্য শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।

এই সময়ে ধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা আভাস পাই ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থগুলি হইতে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত',

৩৬১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—পৃঃ ৯৪
৩৬২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—পৃঃ ৯৬

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি হইতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে একটু-আধটু বর্ণনা যাহা পাই, তাহারই মধ্য হইতে একটা সঙ্গত অনুমান করিতে পারি।

এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাস-বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থখানির অনেক অংশের বর্ণনা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে।

চৈতন্যদেবের জন্মের সময় নবদ্বীপের অবস্থার বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে, নবদ্বীপে বহু পাণ্ডিত্যাভিমানী অধ্যাপকের বাস ছিল, নবদ্বীপ ছিল একটি বৃহৎ বিদ্যা-কেন্দ্র, নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইত, এখানে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে তাহাদের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়াছে মনে করিত না। নবদ্বীপ ছিল বৃহৎ নগর, ইহার প্রতি ঘাটে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিত। ধর্মের অবস্থার দিক দিয়া তিনি বলিতেছেন যে, লোকে বিষহরি (বিষধারিকা) বা মনসাদেবীর পূজা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠান করিত, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া মঙ্গল-চণ্ডীর গীত শুনিত, মদ্য-মাংস দিয়া যক্ষপূজা বা বাসুলী দেবীর পূজা করিত।[৩৬৩]

ব্রাহ্মণ-সমাজে যে তান্ত্রিক চক্রে পঞ্চমকারাদির উপাসনা চলিত, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ তিনি করিয়াছেন :

"রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে ॥
ভক্ষ্য. ভোজ্য গন্ধ-মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥"

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদ্বয় জগাই-মাধাই-সম্বন্ধীয় জীবনচরিতগুলি হইতে জানা যায় যে, তাহারা সর্বদা মদ্য-মাংসে কাল কাটাইত এবং তাহারা মুসলমান কাজীকে বশ করিয়া নবদ্বীপে যথেচ্ছাচার করিত।

বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন :

"দেয়ানে নাহিক বেলা বোলায় কোটাল।
মদ্যমাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥

৩৬৩। 'চৈতন্য ভাগবত'—আদির প্রথম ও দ্রষ্টব্য এই পুস্তকের পূর্বের উদ্ধৃতি—পৃ: ৩৭

ছাড়িল গোষ্ঠীরে বড় দুর্জন দেখিয়া।
মণ্ডপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥"

জয়ানন্দ তাহাদের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :

"অন্নযোনি বিচার নাহিক দুই ভাই।
স্নানসন্ধ্যাবিবর্জিত জগাই মাধাই।
*　　　*　　　*
গলে যজ্ঞসূত্র বান্ধা জেন সিংহনাদ।
*　　　*　　　*
উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি মদিরা ভক্ষণে।
ঘূর্ণিতলোচন চারু পূর্ণ শক্রাসনে॥"[৩৬৪]

লোচনদাসের বর্ণনাও প্রায় ঐরূপ :

"ব্রাহ্মণী যবনী গুবাঙ্গনা নাহি এড়ে।
সুরাপান পাইলে সকল কর্ম ছাড়ে॥"[৩৬৫]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন যে, চৈতন্যদেবের কীর্তন শুনিয়া হিন্দুরা আসিয়া বলিল :

"… …হিন্দুর ধর্ম নাশিল নিমাই।
যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য-গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ॥"
(আদির ১৭ পঃ)

ইহার মধ্য হইতে আমরা এই ইঙ্গিত পাই যে, পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে শাক্তধর্ম ও তাহার আনুষঙ্গিক পঞ্চমকারের ক্রিয়া বাংলা দেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। মনসা, চণ্ডী ও বাসলী দেবীর পূজায় লোকে মদ্য-মাংসাদি ব্যবহার করিত। চণ্ডী-পূজার প্রচলন বাংলায় সেন-যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব'-এ নিত্যকৃত্যের মধ্যে বৈদিক মন্ত্রে চণ্ডী-পূজার উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গা পূজারও যে ঐরূপ প্রচলন বহু পূর্ব হইতেই ছিল, তাহা আমরা

৩৬৪। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' (নদীয়াখণ্ড) পরিষদ-গ্রন্থাবলী,—পৃঃ ৫৭
৩৬৫। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', মধ্যখণ্ড,—পৃঃ ১১২

ত্রয়োদশ শতকে মণবকমজের লিপিতে পাই। বাঙালীর দুর্গোৎসব চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই বাঙালীর প্রধান সামাজিক উৎসবে পরিণত হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন :

"মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ বাজে সব ঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥"

এই তান্ত্রিক মতে চণ্ডী, বাসলী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি গ্রাম্য দেব-দেবীর, এমন কি, শাখোটবাসিনী বনদুর্গারও পূজা হইত। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি-কাহিনীর মঙ্গলচণ্ডী এইরূপ বনদুর্গা। কালকেতু-কাহিনীর দেবী পৌরাণিক গোধিকা-বাহনা চণ্ডীদেবী। অষ্টম-নবম শতাব্দীর খোদাই-করা গোধিকা-বাহনা চণ্ডীদেবীর প্রস্তর-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর গান বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। লোকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দূর দেশ হইতে ভালো ভালো গায়েন আনিত। শ্রীবাসের গৃহে চৈতন্যদেবের কীর্তন শুনিয়া দূর হইতে জগাই-মাধাই বলিয়াছিল :

"…… নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ॥
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাও।
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাও ॥"৩৩৬

মধ্যযুগে বাংলায় এই তান্ত্রিক-প্রাধান্যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও তাহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিক বলেন :

"ধর্মভাব বাঙালীর মজ্জাগত, কামকলার উত্তেজনাও দেশের প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে অধিকতর, সুতরাং উভয়ে মিলিত হইতে অধিক সময় লাগে না। তাই আর্বাচীন বৌদ্ধের সহজসাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং শাক্ত তান্ত্রিকের পঞ্চতত্ত্বে যোগিনী-সাধন ইত্যাদি ব্যাপার বাঙলার নরম মাটিতে সত্বর পুষ্পে ফলে শোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে তান্ত্রিক সাধনার অপব্যবহারে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বাঙালী শক্তিসাধক ইন্দ্রিয়-সেবাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বাসলী প্রভৃতির পূজা ও তামসিক উৎসবে যখন সাধারণ লোকের সহজ ধর্মকর্ম বিকৃত হইতেছিল, তখন তাহারই প্রতিক্রিয়া-রূপে চৈতন্যের ভাগবত-মতের নব আবির্ভাব হইল।"৩৩৭

৩৩৬। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী—ডাঃ সুকুমার সেন—পৃঃ [illegible]

৩৩৭। মধ্যযুগের বাঙলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ [illegible]

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার পর্যন্ত অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্ম ও তাহার আনুষঙ্গিক যৌন অনাচার ও মদ্য-পান প্রভৃতি প্রবলভাবেই বিরাজ করিতেছিল।

সংস্কৃতির দিক দিয়া এই সময় বাংলায় ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা খুব প্রবল হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে নব্যন্যায় বা তর্কশাস্ত্র বাঙালী-মনস্বিতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ-স্বরূপ আবির্ভূত হয়। এই নব্যন্যায়-চর্চার কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ এবং এখান হইতেই বাংলার নানাদিকে ইহা প্রসারিত হয়। এই নব্যন্যায় কোনো ধর্মের বা দর্শনের তত্ত্ব-নিরূপণ নয়, বা কোনো নূতন ধর্মীয় বা দার্শনিক মতবাদ-সৃষ্টি নয়, ইহা কোন বস্তু বা বিষয়ের ধারণার যুক্তি-সিদ্ধ যাথার্থ্য-নির্ধারণের উপায়। অবশ্য বাংলার নব্যন্যায়ের প্রথম পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি 'ঈশ্বরানুমান', 'পদার্থতত্ত্বনিরূপণ' প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্মীয় বা দার্শনিক তত্ত্বালোচনার কতকটা অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ কেবল তর্ক-বিদ্যারই চর্চা করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় এই ন্যায়-চর্চা প্রবলভাবে চলিয়াছে এবং বহু বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিতের উদ্ভব হইয়াছে। এই নব্যন্যায় বা তর্কশাস্ত্র একপ্রকার বাংলারই সামগ্রী।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় এই নব্যন্যায় সৃষ্টি করেন। গঙ্গেশ ন্যায়-দর্শনের প্রতিপাদ্য মূলসত্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন নাই। মূলসত্যে পৌঁছাইতে হইলে যে চারিটি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—পূর্বের ন্যায়াচার্যগণ নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহারই সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁহার অনুমান-অংশের আলোচনা নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁহার গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি'র অনুমান-অংশের উপর নানা টীকা এবং টীকার টীকা লিখিত হয় এবং 'অনুমান' ও শব্দ-অংশের উপর স্বতন্ত্রভাবেও বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ নানা গ্রন্থ রচনা করেন। রঘুনাথ শিরোমণি (১৫০০ খৃঃ), মথুরা ভট্টাচার্য (১৫৮০ খৃঃ), জগদীশ ভট্টাচার্য (১৫৯০ খৃঃ) ও গদাধর ভট্টাচার্যের (১৬৫০ খৃঃ) টীকা এবং রঘুনাথ শিরোমণির 'তত্ত্বচিন্তামণি'র উপর টীকার টীকা প্রভৃতি বাংলায় বিশেষভাবে পঠিত ও আলোচিত হইতে লাগিল। নবদ্বীপ-বিদ্যাকেন্দ্রে এই 'নব্যন্যায়'ই বিশেষভাবে পঠিত হইতে লাগিল এবং অন্যান্য বাঙালী পণ্ডিতগণও এই নব্যন্যায়ের উপর বহু গ্রন্থ, টীকা-টীপ্পনী লিখিলেন। নবদ্বীপ হইতে এই নব্যন্যায়-বিদ্যা বাংলার নানা প্রান্তে ব্যাপ্ত হয় এবং বাংলার টোলে টোলে

ই 'মাথুরী-আগমী-গাদাধরী' পঠিত ও আলোচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত-বিদ্যাকেন্দ্রে এই তর্কবিদ্যার চর্চা বাঙালীর বুদ্ধিকে শাণিত করিয়াছে।

পূর্বের সহজিয়া-বৌদ্ধগণ যে সহজিয়া-বৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছিল, সেই ধারার পরিণতি এখন দেখা যাক।

প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থলে রাধা-কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্মের আবরণ দিয়া সহজিয়া-বৈষ্ণব নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যাহারা হিন্দুধর্মে প্রবেশ করে নাই এবং বৈষ্ণব-সহজিয়াতেও রূপান্তরিত হয় নাই, এমন বৌদ্ধ-সহজিয়ার কিছু অংশ চতুর্দশ শতাব্দীর ধর্মান্তর-করণের প্রবল বাত্যায় ইসলাম গ্রহণ করিল। সেন-যুগ হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতেছিল, তারপর বিদেশী ধর্মের প্রচণ্ড আঘাতে আত্মরক্ষা ও সংরক্ষণের সময় সমাজ হিন্দুধর্মের বাহিরের লোকদিগের দিকে একবারও চাহিল না। ইহারা কোনো বৌদ্ধসমাজের আশ্রয় না পাইয়া, হিন্দুসমাজের তাচ্ছিল্য ও সংরক্ষণ-নীতির ভীষণ কঠোরতা এবং অর্থনৈতিক ও নানা পারিপার্শ্বিকের চাপে মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইল।

ইসলাম গ্রহণ করিলেও এতদিনের আচরিত ধর্ম ইহারা ত্যাগ করিল না। উপলব্ধির দ্বারাই হোক বা এতদিনের সংস্কারবশেই হোক, পূর্বতন সাধন-পদ্ধতিই ইহাদের নিকট সত্যকার ধর্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ইহারা মুসলমান-জাতিতে রূপান্তরিত হইলেও ধর্মে সহজিয়াই রহিয়া গেল। ইহারাই বাংলার 'নেড়া' বা 'বে-শরা' ফকিরদের আদিরূপ।

খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমেই বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' রচিত হয়। এই সময় বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির সংগঠন বা পুনরুজ্জীবন চলিতেছিল। সেন-যুগের বহু পূর্ব হইতেই রাধা-কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে নানা কবিতা রচিত হইতেছিল। কিন্তু সেন-যুগে এই বিষয়বস্তু-অবলম্বনে কাব্য-রচনার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' তো যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়াছিল। তারপর উমাপতি ধর ও নানা কবি, এমন কি মহারাজ লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন, ইহা আমরা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে দেখি। এই সময় বাংলায় রাধা-কৃষ্ণলীলা-কাহিনী বিশেষভাবে প্রচারিত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনর্গঠন বা পুনরুজ্জীবন-সময়ে বাংলার অতিপ্রিয় বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনা খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। 'কৃষ্ণকীর্তন' রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা বা পদের সমষ্টি-সমন্বিত একখানি কাব্য। ইহা অনেকটা গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতিনাট্য-জাতীয় গীতিকাব্য। এগুলি যে গান করা হইত, তাহা জানা গিয়াছে। পূর্বে মনসা বা চণ্ডীর কাব্যও কতকটা বর্তমানের কথকতা ও পাঁচালীর আকারে গীত বা পঠিত হইত এবং লোকে রাত্রি জাগিয়া তাহা শুনিত ("মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণ")। বাহিরের দিক দিয়া 'কৃষ্ণকীর্তন' জনপ্রিয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত কাব্য। জয়দেবের প্রভাব ইহার উপর সুস্পষ্ট। জয়দেবের মতই এই শৃঙ্গার-রসাত্মক কাব্যে প্রত্যক্ষতা ও স্থূলতা বিদ্যমান। কাব্য-প্রেরণাই ইহার মধ্যে মুখ্য এবং ধর্ম-প্রেরণা গৌণ।

কিন্তু কয়েকটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম, বৌদ্ধ-সহজিয়াদের যোগ-সাধনা-মূলক একটি পদ। লীলা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই পদটি অস্বাভাবিক মনে হয়। তাহাতে মনে হয়, বৌদ্ধ-সহজিয়াদের প্রকৃতি-পুরুষ-রূপে রাধা-কৃষ্ণের লীলা চলিতেছে—যাহাতে যোগের ক্রিয়া একটি প্রধান অংশ। দ্বিতীয়, বৌদ্ধ-সহজিয়াদের মহাসুখবাদ পরবর্তী সময়ে অনেকটা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকীর্তনে'র দেহ-মিলন-বর্ণনার স্থূলতা ইহা নির্দেশ করে। বৌদ্ধ-সহজিয়াদের যৌন-যোগ-সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্যটির আভাস মিলন-বর্ণনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। তৃতীয়, চণ্ডীদাসের বাসলী-সেবকত্ব। বাসলী পরবর্তী সময়ে হিন্দু শক্তি-দেবীতে রূপান্তরিত হইলেও, মনে হয়, ইনি মূলতঃ বৌদ্ধদেবী। কোনো শক্তি-দেবীর সেবক হওয়া ও তাঁহার উপর শ্রদ্ধা নিবেদন চণ্ডীদাসের পক্ষে অসম্ভব নয়।

যদিও এ-সমস্তই অনুমানের পর্যায়ভুক্ত, তবুও ইহা বিশেষভাবে মনে হয় যে, বড়ু চণ্ডীদাসের সহজিয়া-সাধনার সহিত একটা সম্পর্ক ছিল। মনে হয়, চণ্ডীদাসের সহজিয়া সম্বন্ধ, তাঁহার সাধন-সঙ্গিনী রামীর কথা, বাসলী দেবীর কৃপা প্রভৃতি প্রবলজনশ্রুতি-রূপেই দীর্ঘদিন বর্তমান ছিল। প্রায় দুইশত বৎসর পরে সেই জনশ্রুতি অনুসারে এক বা একাধিক কবি বৈষ্ণব-সহজিয়া-ধর্মের তত্ত্ব ও সাধনা-সংবলিত পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন।

ইহার পরই চৈতন্য-যুগের আরম্ভ। বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চৈতন্য-যুগের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, চব্বিশ

বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস, তারপর তাঁহার জীবনের অলৌকিক ঘটনাসমূহ ও মতবাদ লোকসমাজে প্রচারিত হইতে অন্ততঃ কুড়ি বৎসর গত হওয়া প্রয়োজন ; সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ অর্থাৎ ১৫৩০ হইতে আমরা চৈতন্য-যুগের আরম্ভ ধরিতে পারি।

এখানে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন যে, যাহারা হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে আসে নাই, বা মুসলমানও হয় নাই, বা সহজিয়া-বৈষ্ণবেও রূপান্তরিত হয় নাই, এমন একটি অতি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ-সম্প্রদায় উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য এবং সম্ভবতঃ বাংলায়ও যে বর্তমান ছিল, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি জীবনী-গ্রন্থে ('চৈতন্যভাগবত', আদি, ৬ ; 'চৈতন্যচরিতামৃত', মধ্য, ৯)।

চৈতন্য-যুগের অব্যবহিত পূর্বে বাঙালীর ধর্ম ও সামাজিক জীবনের অবস্থাটির উপর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক :

(১) হিন্দু-জনসাধারণের ধর্ম ছিল পৌরাণিক-তান্ত্রিক ধর্ম। সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী শক্তি-পূজা ও শাক্ত-তান্ত্রিক মতবাদ অনুসরণ করিত। নানা শক্তি-দেবীর পূজার অত্যধিক প্রচলন ছিল বাংলায়। তান্ত্রিকদের পঞ্চমকারাদি নানা ক্রিয়া ও নানা তান্ত্রিক গুহ্যসাধনার অনুষ্ঠানে বাংলার ধর্মাকাশ আচ্ছন্ন ছিল। তান্ত্রিক ক্রিয়াদির আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়পরায়ণতারও বিশেষভাবে প্রসার হইয়াছিল।

(২) সমাজের উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম-শাসিত সমাজে ব্রাহ্মণ, অচরণীয় বা সৎ-শূদ্র ও অনাচরণীয় প্রভৃতির মধ্যে যে পার্থক্য সেন-যুগের সামাজিক কাঠামোতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা এই যুগেও বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। আচরণীয়-অনাচরণীয়-সমস্যা বা ছুৎমার্গ, মুসলমান-সংস্পর্শে জাতিচ্যুতি, সমাজে 'একঘরে' করা এবং ঐরূপ নানা কঠোর সামাজিক শাসন প্রবলভাবে চলিতেছিল। ইহার ফলে বহু জাতিচ্যুত হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ধারা ইংরেজ-আগমনের পূর্ব পর্যন্তও ছিল। 'পীরালি', 'শাবাশী' প্রভৃতি নানা অপবাদযুক্ত হিন্দুকে জাতিচ্যুত করা হইয়াছিল। ইহাদের অনেকে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ছিল অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং সাধারণ ধর্মকর্মে ইহাদের অধিকার বা অংশ ছিল না।

(৩) বহু পূর্ব হইতেই যাহারা বৈষ্ণবধর্মের আবরণে সহজিয়া-বৈষ্ণবে পরিবর্তিত হয় নাই বা হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, এইরূপ একটি ক্ষুদ্র [illegible] অস্তিত্ব আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় দেখিতে পাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহারা বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহারাই নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত 'নেড়া-নেড়ী'-সম্প্রদায়।

চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বিষয়বস্তু-আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, কেবল আমরা ইতিহাসের ধারানুসরণে বাংলায় ধর্মের ক্রমপরিণতিতে ইহার স্থান নির্দেশ করিব। ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, মধ্যযুগের অন্যান্য বৈষ্ণব-ধর্মশাখার মতো চৈতন্যদেবের মূলধর্ম শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীধরস্বামী শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্তের সঙ্গে আবেগময় ভক্তিবাদের মিশ্রণ করেন। ইহাতে এই-প্রকার বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। তবে বাংলায় ষড়-গোস্বামিগণ যেভাবে চৈতন্যধর্মকে রূপ দিয়াছেন, তাহাতে তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব ইহার উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল হইয়াছে।[৩৬৮] চতুর্দশ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারা বাংলাদেশে ভাগবতের প্রসার ও আদর হয়। গৌড়-দরবারের কর্মচারীদের মধ্যেই প্রথমে ভাগবতের আদর হয়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শ্রীমদ্‌ভাগবত-অবলম্বনে রচিত।[৩৬৯]

সমসাময়িক ধর্মগত বিদ্বেষ ও বিভেদ, সামাজিক বৈষম্য ও অধিকারের তারতম্য, ধর্মের নামে নানা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপেই চৈতন্য-ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল মনে হয়। বাংলার বাহিরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে ভক্তি-ধর্মের আন্দোলন চলিতেছিল, চৈতন্য-ধর্মও তাহার একটি অংশবিশেষ। অবশ্য উহারও উদ্ভবের কারণ একই। দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাত বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র ভারতেরই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাতে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণায় একটি অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং হিন্দু-সমাজের নিম্নশ্রেণী একেবারে দলিত ও পিষ্ট হইতেছিল।

চৈতন্যদেব ধর্ম-বিষয়ে এক সর্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রেমই ইহার মূল ভিত্তি। ভগবানের প্রতি ভক্তি-প্রেম সকল ধর্মেরই মূলকথা। ঈশ্বরের—কৃষ্ণ বা হরির নিকট কোনো জাতি-ভেদ নাই, হিন্দু ও মুসলমানে প্রভেদ নাই, উচ্চ ও নীচশ্রেণীতে প্রভেদ নাই। তিনি ভক্তি-সম্পন্ন তথাকথিত নীচজাতিকে ভক্তিহীন উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে

৩৬৮। **Introduction to 'পদ্যাবলী'**—Dr. S. K. Dey—Page VIII.

৩৬৯। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী—ডাঃ সুকুমার সেন—পৃঃ ১৮

করিলেন: 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'। ভগবানকে স্মরণ বা হরিনাম-কীর্তনই ধর্ম-পথের মূলক্রিয়া।

চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ, ভগবদ্প্রেমে তন্ময়তা, সর্বভূতে দয়া ও সমদৃষ্টি, সর্বজাতির সর্ববর্ণের লোকদের এক ধর্মের ছত্র-ছায়ায় সমান আসন-দান প্রভৃতিতে বহু লোক তাঁহার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল। হিন্দু-সমাজের অনেক উপেক্ষিত ও নির্যাতিত ব্যক্তি তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিল। শাক্ত-তান্ত্রিকতার নানা অনুষ্ঠানাচ্ছন্ন সমাজের আবহাওয়ার মধ্যে একটা সহজ, সরল ক্রিয়াহীন 'হরের্নামৈব কেবলম্'-ধ্বনি উত্থিত হইল। চৈতন্যদেবের একান্ত ভক্তিমূলক ধর্ম হইল সর্বসাধারণের ধর্ম। বাঙালী হিন্দুর ধর্মের আনুষ্ঠানিক একমুখীনতা অনেকখানি নষ্ট হইল। সহজ, সরল, স্বাভাবিক ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্মও বাঙালীর তান্ত্রিক ধর্মের একপার্শ্বে স্থান লাভ করিল।

সামাজিক দিক দিয়াও বৈষ্ণবধর্ম অনেকখানি উপকার-সাধন করিল। যাহারা নানা কারণে গত্যন্তর না দেখিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিত, তাহারা চৈতন্যদেবের ধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্তই রহিয়া গেল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ধর্মের দিক দিয়া, সমাজের দিক দিয়া, বাঙালী জাতির প্রভূত উপকার করিয়াছে। ধর্ম ও সমাজকে তিনি অনেকখানি উদারনৈতিক ও গণ-প্রভাবাশ্রয়ী করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণের পর তাঁহার জীবনীকারগণ স্থান ও কালে অবস্থিত মানুষ চৈতন্যদেবকে একেবারে স্বয়ং ভগবান করিয়া ফেলিলেন। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' খুঁজিলে কোথাও কোথাও মানুষ-চৈতন্যদেবের সামান্য একটু-আধটু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি তাঁহাকে একেবারে পুরাপুরি দেবতা করিয়া তুলিলেন। চৈতন্যদেব একেবারে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ হইলেন। রাধার প্রেম কিরূপ এবং স্বীয় মাধুর্যই বা কিরূপ, আর তাঁহাকে অনুভব করিয়া রাধার যে সুখানুভূতি হয়, সেই সুখই বা কিরূপ—এই তিন বিষয় জানিবার লোভ-হেতু শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদেব-রূপে নবদ্বীপে শচী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।[৩৭০] এই অবতারে পূর্বের সহচরগণও সব অবতীর্ণ হইলেন। তারপর গোস্বামিগণ নানা পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনে এক সুপরিকল্পিত তত্ত্ব-দর্শন যুক্ত করিয়া চৈতন্য-ধর্মকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

৩৭০। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো" ইত্যাদি চৈতন্যচরিতামৃত, আদির ১ম

ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে দায়ুদের পরাজয় ও মৃত্যুর পর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের অধীনে বাংলা মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার ধর্ম ও সমাজে অনেকটা রূপান্তর সাধিত হয়। এই সময়টা সম্রাট আকবর হইতে শাহ্‌জাহানের রাজত্ব-কাল।

মোগল-অধিকারে বাংলার ধর্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইল। এই সময় দিল্লী হইতে বিদ্বান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সুবাদার, সেনাপতি, রাজকর্মচারী পর পর পাঠানো হইতে লাগিল। বাংলার মুসলমানধর্মও একটা নূতন প্রেরণা লাভ করিল। এই রাজকর্মচারীদের ব্যবহার পূর্বের শাসকগণের অপেক্ষা অনেক ভালো ছিল। এখন শাসিতদের ধর্মের উপর আঘাত বা অসম্মান এবং বলপূর্বক বা ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা ধর্মান্তর-করণ প্রভৃতি অনেকটা দূর হইয়াছে। এই সময় বাংলার ধর্মেও তান্ত্রিকতা অনেকখানি প্রশমিত হইয়াছে এবং বহুলোকে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। নিম্ন-শ্রেণীদের সামাজিক অবস্থাও অনেকখানি উন্নত হইয়াছে।

এই সময় জল-পথে বাণিজ্য-ব্যপদেশে বাংলার সহিত পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের সংস্পর্শ ঘটে। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ পারশ্যদেশীয় পণ্ডিতগণ, সিয়া-সম্প্রদায়, চিকিৎসক, সওদাগর প্রভৃতি বাংলায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ভ্রমণশীল সাধু ও ধর্ম-প্রচারকগণ মোগল-বিজয়ের বহু পূর্ব হইতেই বাংলায় আসা-যাওয়া করিতেন, কিন্তু মোগল-যুগে স্রোতোধারার মতো সুফী দার্শনিক ও ধর্ম-প্রচারকগণ, দরবেশ ও আউলিয়া-নামধারী সাধুগণ বাংলায় আসিতে লাগিলেন। চৈতন্য-ধর্ম যেমন বাঙালী হিন্দুকে অনেকখানি সহনশীল ও উদার করিয়াছে, মোগল-যুগের এই-সব দরবেশ ও আউলিয়াগণও বাঙালী মুসলমানকে তাহাদের ধর্মের একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দান করিয়াছে। বাংলা এই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে পূর্ব হইতেই হিন্দু-মুসলমানধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন-মূলক যে প্রচেষ্টা চলিতেছিল, তাহার সহিত যুক্ত হয়।[৩৭১]

৩৭১। "...... highly cultured subedars, generals, learned chancellors, secretaries were deputed to Bengal in regular official succession...... breathed a higher culture....... The great increase of oceanic communication between Bengal and the western lands due to the vast expanse of sea-borne trade in the middle of 17th century

মুসলমান-জাতিতে রূপান্তরিত কিন্তু বৌদ্ধ-সহজিয়া-সাধন-প্রণালী অনুসরণকারী যে ফকিরদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহারা তাহাদের ধর্ম-সাধনাকে অনেকটা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। সুফীদের আগমনে তাহারা সুফীদের সঙ্গে বেশি মিশিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য পাঠান-যুগের প্রথম হইতেই সুফীরা বাংলায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু মোগল-যুগে তাহারা অধিক সংখ্যায় বাংলায় প্রবেশ করিল এবং বাংলার নানা প্রান্তে বিস্তৃত হইল। তাহাদের আগমনে বাংলার সাম্প্রদায়িক আকাশ অনেকখানি নির্মল হইয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট আকবর ছিলেন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি-বর্জিত সুফী-ভাবাপন্ন সম্রাট। সুতরাং তাঁহার রাজত্ব-কালে বাংলাতেও ধর্মের অজুহাতে পীড়নের ব্যাপার অনেকটা দূর হইয়াছিল। এই সময় এই সহজিয়া-ফকিররা নিজস্ব সাধনার প্রসঙ্গকে চাপিয়া রাখিয়া প্রকাশ্যভাবে এই সুফীদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করে। সুফীধর্ম কোরানকে অস্বীকার করে না, কেবল কোরানের বাণীর ভিন্নরূপ অর্থ করে, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য গ্রহণ করে। ভগবানের অনেক বাণীকে তাহারা তাহাদের তত্ত্বানুসারে গ্রহণ করে। অনেকে নিজেদের সুফী-পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বোধহয় সে সময় প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাতে সমাজে একটা মর্যাদাও তাহারা পাইয়াছিল। বর্তমান যুগেও দেখিয়াছি, অনেক বাউল-পন্থী ফকির, যাহারা যোগ-মিলনাত্মক সাধনা করে, তাহারাও নিজেদের সুফী-মতাবলম্বী বলে। এই নামে পূর্বের আত্মগোপনের স্মৃতি এখন পর্যন্তও চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। হয়তো তখন কেহ কেহ তাহাদের বহুদিনের সাধনাকে ত্যাগ করিয়া সুফীদের একান্ত প্রেম-মার্গকেই অনুসরণ করিয়াছে। তবে এই ফকিরেরা নানাভাবে যে সুফীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক।

tempted cultured Shias of Persia, scholars, physicians, traders—to come and settle in Bengal..... Wandering saints and preachers had been used to visiting Bengal long before the Mughal conquest but the stream became ample in volume after the annexation of the province to the Mughal Emperor of Delhi........came religious preachers, Sufi philosophers, religious mendicants calling themselves *darveshs* and *auliyas*........"

Transformation of Bengal under Mughal Rule—
Written by Sir Jadunath Sarkar.
[**History of Bengal** (D. U.), II—Pages 224-225].

আল্লাই একমাত্র সত্য, তিনি কেবল সত্য নন, সৌন্দর্য ও প্রেমের আকর। প্রেমই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। সূর্য যেমন নানা দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বহু দেখায়, তিনিও এই সৃষ্টিতে বহুরূপে প্রতিভাত। বাহিরের এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি-লোক অন্তর্নিহিত সত্যের বহিঃপ্রকাশ। সৃষ্টির পূর্বে আল্লা ছাড়া কেহ ছিলেন না, এখনও তিনি ছাড়া কেহ নাই। সেই অনন্ত প্রেমময় প্রেমের দ্বারাই নিজের স্বরূপের একটি বহিঃপ্রকাশ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেরই একটি প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রতিচ্ছবি আদম বা আদিমানব। আদম অর্থাৎ মানুষই ভগবানের প্রতিচ্ছবি। মানুষের মধ্যেই তাঁহার স্বরূপ রূপায়িত। মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ, যাহার মধ্যে ভগবানের সমস্ত গুণ ও অবস্থা নিহিত। মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবান তাঁহার অস্তিত্বের সম্যক পরিচয় পান—নিজেকে উপলব্ধি করেন। 'ইনসান-উল-কামেল' বা পূর্ণ-মানবের মধ্যে ভগবানের সমস্ত স্বরূপ বিকশিত। মানুষ যখন তাহার সাধারণ লৌকিক অংশ ('নাছুত') ধ্বংস করিয়া, তাহার ঐশ্বরিক অংশে ('লাহুত') অবস্থিত হইতে পারে, তখন সে ভগবানের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে। সৃষ্টির ব্যক্তরূপ হইতে ঊর্ধ্বগমন করিয়া অব্যক্তরূপে মিশিয়া যাওয়া নির্ভর করে মানবাত্মার গভীর আনন্দময় উপলব্ধির উপর। এই উপলব্ধি দ্বারা পূর্ণমানবত্ব-লাভ হয় এবং মানুষ ভগবৎ-সত্তায় রূপান্তরিত হয়। ইহাই অতিসংক্ষেপে সুফীধর্মের মূল তত্ত্ব।[৩৭২] পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিব। এখানে আর উল্লেখ অনাবশ্যক।

সুফীধর্ম ও ফকিরী-ধর্মে দেহের মধ্যে পরমতত্ত্বের বাস, আত্মোপলব্ধিমূলক সাধনা, ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপাদি-ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এ-কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

আমার বিশেষভাবে মনে হয়, সুফী-প্রভাবান্বিত এই মুসলমান 'নেড়'া বা 'বে-শরা' ফকিররাই বাংলায় বাউলধর্ম-সাধনার আদিপ্রবর্তক। ইহাদের প্রভাব পরবর্তী যুগের বাউলধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে।

বজ্রযানী বৌদ্ধেরা বজ্রসত্ত্বকে দেহ-স্থিত তত্ত্ব বা বোধি-চিত্তরূপে জ্ঞান করিলেও তাঁহাকে হিন্দুদের ব্যক্তিগত ভগবানরূপেই কল্পনা করিয়াছে। ইহা আমরা

৩৭২। **Mystics of Islam, Studies in Islamic Mysticism**—R. A. Nicholson. **The Literary History of Persia**—E. G. Browne, I (Pages 418-421) প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পূর্বে দেখিয়াছি। কিন্তু সহজযানীরা কোনো দেবতা মানে নাই, কেবল দেহস্থিত তত্ত্ব ও যোগপ্রক্রিয়াকেই গ্রহণ করিয়াছে। সহজযানীদের একটা অংশ রাধা-কৃষ্ণকে প্রকৃতি-পুরুষ করিয়া সহজিয়া-বৈষ্ণব আকারে ছিল। আর একটি ক্ষুদ্র অংশ মুসলমান হইয়াও সহজিয়া-সাধনাকে বজায় রাখিয়াছিল। ইহারাই যে 'নেড়া' বা 'বে-শরা' ফকির নামে অভিহিত, ইহা আমরা দেখিয়াছি।

কিন্তু ইহারা দেহ-স্থিত তত্ত্বকে ব্যক্তিগত ভগবান-রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট দৈন্য, আর্তি প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য মুসলমান ও হিন্দু-রচিত সমস্ত বাউল-গানেই বর্তমান। আমরা যদি হিন্দু-বাউল বা 'রসিক' বৈষ্ণবদের চৈতন্য-পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের বিরাট প্রসারের সময় উদ্ভূত বলিয়া ধরি, তবুও এই প্রশ্নের সমাধান হয় না। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের যে-সমস্ত পদ ও বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাদি ছিল, তাহার সংখ্যা কম নহে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া তাঁহাদের নিকট দৈন্য-আর্তি প্রকাশ করা বা করুণা প্রার্থনা করা ইত্যাদি বিশেষভাবে কোথাও দেখি না। যে-সব প্রার্থনা দেখি, তাহা কেবল গুরুর নিকট,—গুরুরূপে দীক্ষা-শিক্ষা-মন্ত্রদাতা, গুরু-রূপে কৃষ্ণ, গুরুরূপে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ও গুরুরূপে বৈষ্ণব প্রভৃতির নিকট। তাহাদের কাছে রাধা-কৃষ্ণ নারী-নরের অন্তর্নিহিত তত্ত্বমাত্র। অথচ বাংলায় বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হিন্দু ও মুসলমান বাউল-রচিত বহু গানে এই অংশটি বিদ্যমান দেখিতে পাই। বাউলধর্মে যোগ-মূলক ক্রিয়ার সহিত এই হৃদয়াবেগ-মূলক অংশটি বর্তমানে আছে।

ইহার কারণ সুফী-প্রভাব। একেবারে 'সোঽহংবাদী' সুফী মনসুর হল্লাজও ব্যক্তিগত ভগবানের নিকট 'দোয়া' অর্থাৎ করুণা-প্রার্থনা এবং 'মোনাজাৎ' অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়াছেন।[৩৭৩] ফকিরদের উপরের এই সুফী-প্রভাব হিন্দু বাউলদের উপর সক্রামিত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব বা পরমাত্মা একেবারে করুণাময় ভগবান হইয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত (আনুমানিক ১৫৮০—১৬১০ খৃঃ) এই ফকির-সম্প্রদায় এই সহজিয়া-ভাবধারা ও সাধন-প্রণালীকে প্রচলিত রাখে।

ইহার পরই বৈষ্ণব-সহজিয়া-সম্প্রদায় নূতন শক্তি ও প্রেরণা লইয়া বাংলার

৩৭৩। **The Idea of Personality in Sufism**--Nicholson, Page 36.

ধর্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। পূর্বের সহজিয়া-বৈষ্ণবদের একটি ক্ষীণধারা চলিতে-ছিল। প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থলে রাধা-কৃষ্ণকে প্রকৃতি-পুরুষরূপে তাহারা পূর্ব হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল, হিন্দু তান্ত্রিকদের শিব-শক্তি-তত্ত্বের সঙ্গে মূর্তি-নিরপেক্ষভাবে তাহাদের মিলও ছিল। বৈষ্ণব হিসাবে হিন্দু-সমাজের এককোণে তাহাদের একটু স্থানও ছিল অনুমান করা যায়। কিন্তু এই ক্ষীণধারা স্ফীতকায়া নদীতে পরিণত হইবার কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব।

চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত ধর্মের মূলরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ও রামানুজ, মাধব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সমন্বয়ে নির্মিত, তবুও একটি বিষয়ে চৈতন্য-ধর্মের একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি কৃষ্ণের শক্তি-রূপে রাধার প্রতিষ্ঠা এবং রাধার মহাগৌরবময় স্থান-অধিকার। কৃষ্ণই মূলপরমতত্ত্ব, রাধা তাঁহার অন্তরঙ্গ শক্তি ; শক্তি ও শক্তিমান-রূপে, অগ্নি ও দাহন-গুণ-রূপে তাঁহারা অচ্ছেদ্য :

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে সদা করায় বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥"

(আদির ৪ পঃ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে রাধার এই পরম প্রাধান্য দুইটি প্রভাব হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। একটি পূর্ববর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণবদের প্রভাব, অপরটি হিন্দু-শক্তিবাদের প্রভাব। চৈতন্য-পূর্ববর্তী সময়ের বৈষ্ণব-সহজিয়া-মতের কোনো গ্রন্থ আবিষ্কৃত

হয় নাই। এক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আমরা সহজিয়া-বৈষ্ণবদের অপরিণত ও অপরিস্ফুট ধর্মতত্ত্বের একটা ইঙ্গিত পাই। সমস্ত কৃষ্ণকীর্তনখানি আগাগোড়া পড়িলে এই ধারণাই মনে জাগে যে ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার স্থূল দেহসম্ভোগ-মূলক বা শৃঙ্গার-রসাত্মকএকটা লীলার বর্ণনা চলিয়াছে। যদিও কৃষ্ণের নানা পূর্ব অবতারের কথা উল্লিখিত আছে এবং রাধাকে লক্ষ্মীর অবতার বলা হইয়াছে, তবুও গ্রন্থ-মধ্যে এই দেব-ভাবের কোনো ছায়াপাত হয় নাই। ক্রমাগত নানাভাবে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-লীলার অনুষ্ঠান চলিয়াছে। কৃষ্ণও এই সম্ভোগের জন্য ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন :

"কাহ্নাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে॥
আল রাধা পৃথিবীতে কর অবতার।
থির হউ সকল সংসার" ॥ (কৃ-কী, জন্মখণ্ড, পৃঃ ৩)

"পৃথিবীতে আহ্মে অবতার কৈল
তার সুরতির আশে।" (কৃ-কী, দানখণ্ড, পৃঃ ২৯)

তারপর যোগক্রিয়া-মূলক পদটিও বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ইহাতে মনে হয়, রাধা-কৃষ্ণ-রূপী প্রকৃতি-পুরুষের একটা সম্ভোগ-লীলা-বর্ণনাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য, দেব-লীলা নিতান্ত গৌণ। মনে হয়, রাধাকৃষ্ণের একান্ত শক্তি-রূপে একটা ধারণা একাদশ-দ্বাদশ শতক হইতে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাংলাকাব্য কৃষ্ণকীর্তনে একটা রূপ ধারণ করে। ইহাই পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণব-সাহিত্যের আদিরূপ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে রাধার এতখানি প্রাধান্যের আর একটি কারণ হিন্দুতন্ত্রের শক্তিবাদের প্রভাব। পূর্বের আগম ও তন্ত্রাদিতে এবং পরবর্তী অনেক তন্ত্রে শিব ও শক্তির, শক্তিমানের ও শক্তির মিলনাত্মক অদ্বয়ত্ব কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী কোনো কোনো তন্ত্রে ও পুরাণাদিতে শক্তির প্রাধান্যই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইরাছে।[৩৭৪] শক্তিই যেন মূলতত্ত্ব—শিব তাঁহার আধার মাত্র। বিশ্বব্যাপিনী পরাশক্তির মধ্যেই পরমপুরুষ নিহিত—তিনিই পরমপুরুষকে—ব্রহ্মকে—সমস্ত দেবতাকে ধারণ করিয়া আছেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে

৩৭৪। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের 'তন্ত্রতত্ত্ব'-এ (১ম খণ্ড) উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য—পৃঃ ১২০—২৮৯ (মুদ্রিত ১৮১৫ শকাব্দ)

এইরূপ শক্তিবাদই বাংলায় প্রচলিত ছিল মনে হয়। তাহার প্রভাবও চৈতন্য-ধর্মের উপর পড়িয়া রাধাকে অতখানি উন্নত করিয়াছে বলিলে অযৌক্তিক হয় না।

পূর্বের সহজিয়া-বৈষ্ণবগণের আর একটি প্রভাব চৈতন্য-ধর্মের উপর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেটি পরকীয়াবাদ। সহজিয়া-বৈষ্ণবেরা পরকীয়া নায়িকাকেই উপযুক্ত সাধন-সঙ্গিনী বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এই নায়িকাই তাঁহাদের রাধা-স্বরূপিণী। তাহার উপর পূর্ববর্তী নানা সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে রাধাকে একান্ত পরকীয়াভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগ হইতে রাধার পরকীয়াত্বের একটা বিশেষ সংস্কার চলিয়া আসিতেছিল। চৈতন্য-ধর্মে রাধার পরকীয়াত্ব এইভাবে গৃহীত হইয়াছে।

অবশ্য বৈষ্ণব-গোস্বামিগণের মধ্যে রাধার পরকীয়াত্ব লইয়া একটু মতভেদ আছে, তবে সে মতভেদ পরবর্তী বৈষ্ণবধর্মে বা পরবর্তী পদাবলী-সাহিত্যে বা সাধারণের মনে রাধার পরকীয়াত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের উদ্রেক করে নাই।

রূপগোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে 'কৃষ্ণবল্লভা'-অধ্যায়ে কৃষ্ণ-বল্লভাগণকে 'স্বকীয়া' ও 'পরকীয়া'-ভাবে ভাগ করিয়াছেন। তাহাতে ব্রজ-গোপীগণকে তিনি পরকীয়া বল্লভা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 'ললিতমাধব'-নাটকে (দশম অঙ্ক) তিনি রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ সংঘটন করাইয়াছেন। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকেও (১ম অঙ্ক) তিনি আয়ানঘোষের বা অভিমন্যুগোপের সঙ্গে যে রাধিকার সত্য বিবাহ হয় নাই এবং অভিমন্যুগোপকে প্রতারণা করিবার জন্যই যোগমায়া এই বিবাহ-রূপ ব্যাপার সংঘটন করাইয়াছিলেন এইরূপ উপস্থাপন করিয়াছেন। জীবগোস্বামীও রাধার পরকীয়া-তত্ত্ব সমর্থন করেন নাই। তাঁহার 'গোপালচম্পূ'-কাব্যের উত্তরচম্পূতে তিনি রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ সংঘটিত করাইয়াছেন। কিন্তু চৈতন্য-ধর্মের মূল উৎস যে শ্রীমদ্ভাগবত, তাহাতে কিন্তু গোপীগণের পরকীয়াত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। রাস-লীলায় পরোঢ়া গোপীরা উপপতি-ভাবেই কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিল—তাহারা ছিল পরদার। রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "কেন ধর্মসেতুসমূহের বক্তা, কর্তা এবং অভিরক্ষিতা সেই কৃষ্ণ এই পরদারাভিমর্শন-রূপ প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন?"[৩৭৫]

৩৭৫। "স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।।" ('শ্রীমদ্ভাগবত'—১০।৩৩।২৭-২৮)

ইহার উত্তরে শুকদেব বলিয়াছেন: "সর্বভুক বহ্নির মতো তেজস্বিগণের পক্ষে কিছুই দোষের নয়।" চৈতন্যদেব নিজেই এই পরকীয়া-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পরকীয়া রাধা-রূপেই তিনি "যঃ কৌমারহরঃ" প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছেন—চৈতন্যচরিতামৃতে এ-কথা আমরা পাই। চৈতন্যচরিতামৃতেও পরকীয়াতেই রসের অধিক উল্লাস বলা হইয়াছে। যাহোক, পূর্ববর্তী কাব্য-সাহিত্যাদিতে, পরবর্তী অনেক বৈষ্ণবগণ কর্তৃক এবং পদাবলী-সাহিত্যে রাধার পরকীয়া-তত্ত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থপ্রকাশের পর পূর্বের বৈষ্ণব সহজিয়াগণ একটা প্রবল অনুপ্রেরণা লাভ করিল। অনুপ্রেরণার কারণ হইল তাহাদের আচরিত ধর্মের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনেকটা সাদৃশ্য। গোস্বামিগণ 'কামক্রীড়াসাম্য' বলিলেও সাধারণ লোকে রাধা-কৃষ্ণের লীলার মধ্যে প্রাকৃত প্রেমের বৈচিত্র্য ও মাধুর্যই লক্ষ্য করিয়াছে। চৈতন্য-ধর্মের রাধা-কৃষ্ণবাদ অনেকটা তাহাদের প্রকৃতি-পুরুষবাদের মতো, পরকীয়াবাদ-গ্রহণ, কৃষ্ণ প্রেমের 'বিষয়', রাধিকা 'আশ্রয়', 'কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার', 'নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত' প্রভৃতি বর্ণনা তাহাদের মতের বিশেষ অনুকূল। তাহারা মনে করিল, বৈষ্ণব-গোস্বামীরাও সহজ-সাধনা করিতেন এবং চৈতন্যদেবও ইহা হইতে মুক্ত ছিলেন না। তারপর চৈতন্যদেবের জীবন, জনসাধারণের মধ্যে প্রেমধর্ম-প্রচার, চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের প্রচার ও গোস্বামিগণের নানা প্রচারণায় বাংলার ধর্মাকাশে একপ্রকার প্রেমের ঝড় উঠিল। সহজিয়া-বৈষ্ণবগণ এই প্রেমকে তাহাদের ধর্ম-সাধনার সঙ্গে যুক্ত করিল। সহজ-সাধনায় প্রেমের একটি প্রধান ভূমিকা নির্দিষ্ট হইল।

সহজিয়া-বৈষ্ণবদের পরমসত্য এক অদ্বয় মহানন্দ-স্বরূপ। এই অদ্বয়-তত্ত্বের দুইটি ধারা: একটি কৃষ্ণ, অপরটি রাধা—একটি পুরুষ, অপরটি প্রকৃতি। এই উভয় ধারার উভয়ের প্রেম-মিলন বা যুগল-মিলনই পরমতত্ত্ব। এই যুগল-মিলনেই 'মহাভাব'-রূপ 'সহজ'-এর বসতি। জগতের নর-নারীর মধ্যে এই কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব রূপায়িত। স্বরূপে তাহারা কৃষ্ণ ও রাধা। এই উভয়ের মিলনে যে অসীম আনন্দানুভূতি, তাহাই সাধনার চরম লক্ষ্য। বৌদ্ধ-সহজিয়াগণের যাহা প্রজ্ঞা-উপায়-মিলনজনিত মহাসুখ, হিন্দুতন্ত্রে শিব-শক্তির সামরস্য-জনিত যে কেবলানন্দ-উপলব্ধি, বৈষ্ণবগণের রাধাকৃষ্ণ-মিলন-জনিত সেই মহাভাবের

পূর্বের মুসলমান ফকিররা, যাহারা সুফীধর্মের দ্বারা বাহ্যতঃ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহারা সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রকৃতভাবে প্রভাবান্বিত হইল। সুফীধর্মের সঙ্গে তাহাদের সাধনার মিল ছিল না, কিন্তু সহজিয়া-বৈষ্ণবদের সাধনা ও তাহাদের সাধনা এক। তারপর সহজিয়া-বৈষ্ণবদের প্রেমধর্ম এবং চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব তাহাদের উপর খুব বেশি পড়িয়াছিল। তাহাদের রচিত গানগুলির মধ্যে তাহার প্রমাণ বর্তমান।

ক্রমে একই মতবাদের এবং একই সাধন-পদ্ধতির হিন্দু ও মুসলমান-জাতির সাধকেরা তাহাদের সাধনায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিল। তাহাদের বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত উভয় জাতির মিলিত সাধনাই বাউল-সাধনা।

এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি সাধন-সঙ্গিনী প্রকৃতির শারীরিক ও মানসিক এক বিশেষ অবস্থায় যোগ-সাধনা এবং তাহাকে 'মহাযোগ' বলিয়া গ্রহণ। অপরটি 'চারিচন্দ্রভেদ'। এই 'চারিচন্দ্রভেদ' নিঃসন্দেহে 'কায়সাধন' বা 'সহজসিদ্ধি'র সাধনার ধারা হইতে বাউলধর্মে গৃহীত হইয়াছে। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, মুসলমান-ফকিররাই বৌদ্ধ-সহজ-সাধনার ধারাটি বহুদিন সঙ্গোপনে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল এবং আমার মনে হয়, বাউলধর্মের এই বৈশিষ্ট্য মুসলমান ফকিরদের নিকট হইতে গৃহীত। এই উভয় বৈশিষ্ট্য-সংক্রান্ত আলোচনা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে সাধনা-প্রসঙ্গে করা হইবে।

আনুমানিক ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলায় বাউলধর্ম এক পূর্ণরূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।

এই ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শনের কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। মোটামুটি-ভাবে বৈষ্ণব-সহজিয়াদের নানা গ্রন্থের তত্ত্ব ও দর্শনই বাউলধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন। মুদ্রিত এবং প্রচলিত সহজিয়া-সাহিত্যের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত সহজিয়া বা রাগাত্মিকা পদগুলি এবং অকিঞ্চনদাসের 'বিবর্তবিলাস' হইতে আমরা বিশেষভাবে এই ধর্মের কতকটা তত্ত্ব ও সাধন-সংক্রান্ত তথ্য পাইতে পারি। ইহা ছাড়া বিশেষভাবে বাউলধর্ম ও সাধনা-বিষয়ক কোনো মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ আমি পাই নাই। 'ব্রজ-উপাসনা' নামে কয়েক পাতার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একখানি পুস্তিকা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পূর্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

আমি বাংলার নানা স্থানের আখড়ায় এবং বিভিন্ন জেলার বাউলদের নিকট বিশেষভাবে বাউলধর্ম সম্বন্ধে লিখিত পুঁথির অনুসন্ধান করিয়াছি। যে-সমস্ত পুঁথি

পাইয়াছি, তাহার মধ্যে লোচন দাসের 'বৃহৎ নিগম' এবং পঞ্চানন দাসের একখানা সংগ্রহ-পুঁথি বাউল ধর্ম ও সাধনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। লোচন দাসের 'বৃহৎ নিগম' গ্রন্থকে বাউলরা তাহাদের ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া শ্রদ্ধা করে এবং কেহ কেহ ইহার অনেক অংশ ধর্মালোচনা-কালে মৌখিক উদ্ধৃত করে। 'সাধনা'-অধ্যায়ে এই দুই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক বৈষ্ণব-সহজিয়া-সাহিত্যের পুঁথির মধ্যে নির্দিষ্ট বাউল-সাধনার ইঙ্গিত আছে। বাউল-সাধনা চৈতন্যোত্তর সহজিয়া-ধর্মের ব্যবহারিক দিক বা ক্রিয়া-রূপ।

বাউল-গানগুলির মধ্যেই বিশেষভাবে এই ধর্মের তত্ত্ব-দর্শন ও সাধনপদ্ধতির বিষয় জানা যায়। গানগুলির মধ্যে সাধন-পদ্ধতির কথাই বেশি পাওয়া যায়। তবে উহার আনুষঙ্গিক তত্ত্ব সম্বন্ধেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

এখন বাংলায় ধর্মের ক্রমপরিণতিতে বাউলধর্মের স্থান এইভাবে নির্দেশ করা যায়:
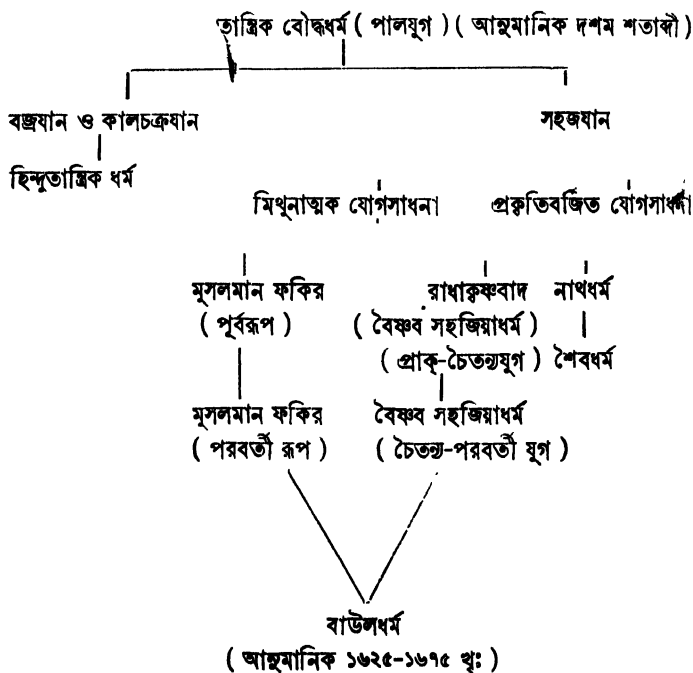
ন্ত্রিক. বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল-সাধনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র বীরভূম জেলার
টেলনগরের পল্লী-পরিবেশে বাউলের সঙ্গে বাউলগানপ্রিয় ডাঃ বিধানচন্দ্র

তৃতীয় অধ্যায়

বাউলধর্মের উপাদান

বাউল-গানগুলি বিশ্লেষণ করিলে বাউলধর্মের নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) **বেদ-বহির্ভূত ধর্ম**
(২) **গুরুবাদ**
(৩) **স্থূল মানব-দেহের গৌরব—ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ**
(৪) **মনের মানুষ**
(৫) **রূপ-স্বরূপতত্ত্ব**

(১) বেদ-বহির্ভূত ধর্ম ॥

বাউলধর্ম যে বেদ-বহির্ভূত ধর্ম এবং এই ধর্ম-সাধনায় যে বেদ-বিধি ত্যাগ করিতে হইবে—এইরূপ ভাব অনেক গানে ব্যক্ত হইয়াছে। বেদ-বিধি-অর্থে বাউলরা অনেক স্থলে চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম বুঝিয়াছে। তাহাদের আচার 'রাগের আচার', 'বেদের আচার' নয়। আনুষ্ঠানিক ধর্ম প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না, মানব-জীবনের মূলতত্ত্বও নির্ণয় করিতে পারে না। লালনের একটি গানে আছে :

"কার বা আমি কে বা আমার,
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার,
উদয় হয় না দিনমণি ॥" (গান নং ১১)

বেদানুমোদিত নানা আনুষ্ঠানিক ধর্মের অর্থহীন অনুষ্ঠানে প্রকৃত সত্য লাভ করা যায় না। এই মূল্যহীন গতানুগতিক ধর্মের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতায় চারিদিক যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, প্রকৃত জ্ঞানের সূর্য উদিত হয় না এবং প্রকৃত ধর্মের সন্ধানও কেহ করিতেছে না। মুসলমান-ফকিরগণ বেদ-বিধি বলিতে তাহাদের আনুষ্ঠানিক শরীয়ত-ধর্মকে বুঝাইয়াছে।

একটি গূঢ় সাধনতত্ত্ব-বিষয়ক গানে লালন বলিতেছেন :

"পঞ্চবাণের ছিলে কেটে
প্রেম যজ স্বরূপের হাটে,
সিরাজসাঁই বলে, রে লালন,
বৈদিক বাণে করিস নে রণ,
বাণ হারা'য়ে পড়বি তখন
রণ-খোলাতে হুবড়ি খেয়ে ॥" (গান নং ৮৪)

মদনের পঞ্চবাণ—মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন ও সম্মোহন। এই পঞ্চবাণের শক্তিতে সংসারে কাম-ঘটিত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। সংসারের সাধারণ ভোগ-মূলক কামের ক্ষেত্রেই মদনের পূর্ণ প্রভাব প্রকটিত। কিন্তু লালন-গুরু সিরাজসাঁই-এর নির্দেশ এই যে, মদনের বাণ-নিক্ষেপকারী ধনুকের ছিলাটাই কাটিয়া দিতে হইবে—অর্থাৎ মদনের শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। কেবল ভোগ-মূলক কামের কারবার না করিয়া দেহের উর্ধ্বগত স্বরূপ-তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের সাধনা করিতে হইবে। কাম-রিপুকে জয় করিয়াই এই স্বরূপতত্ত্বে—এই সূক্ষ্ম, অপ্রাকৃত, দেহোত্তীর্ণ প্রেমের ক্ষেত্রে উঠিতে হইবে। বাউলদের সাধনাই কামের মধ্য হইতে প্রেমকে নিষ্কাশন করা, কামের বিষ নাশ করিয়া প্রেমের অমৃত লাভ করা। তাই দেহ-ভোগের ক্ষেত্রে কামের সঙ্গে একটা গুরুতর যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সাধন-সমরে সাধকের বাণ বা যুদ্ধাস্ত্র অতি শক্তিশালী ও অব্যর্থ হওয়া প্রয়োজন; না হইলে অতো বড় ভীষণ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু বৈদিক বাণ লইয়া যুদ্ধ করিলে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে।

এই বৈদিক 'বাণ-এর তাৎপর্য কি? দেহ-মিলনে কামই কামের চরম পরিণাম, ইহাই চিরাচরিত সাধারণ মত ও ব্যবস্থা। রিপুর উত্তেজনা হইতে নর-নারীর দেহ-মিলন ও তাহা দ্বারাই তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি ও সন্তান-সৃষ্টি। কেবল এই কাম-প্রবর্তিত দেহ-মিলন ও তদ্দ্বারা সন্তান-লাভ-রীতিই বৈদিক বাণ। সিরাজসাঁই বলিতেছেন, এই রীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিলে কাম-রিপুর হাতে নিশ্চিতরূপে পরাজিত হইতে হইবে। বাউল যে-বাণ লইয়া যুদ্ধ করিবে, সেই বাণ-প্রয়োগ-কৌশল তো রস-রতির বিসর্জনে নয়—অটল প্রতিষ্ঠায়, নিম্নগামী করায় নয়—উর্ধ্বগামী করায়, সুতরাং তাহা সাধারণ রীতি নয়। প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া

নিবৃত্তিই বাউলদের লক্ষ্য—কামের মধ্য হইতে প্রেমের আহরণই তাহাদের উদ্দেশ্য। এইভাবেই তাহারা দেহোত্তীর্ণ হইয়া স্বরূপ-তত্ত্বে উপনীত হইবে।

ধর্ম-সাধনা বা মোক্ষের জন্য প্রকৃতি-সঙ্গ পরিহার করিতে হইবে, প্রকৃতি-সৃষ্টি হইয়াছে কেবল কাম-উপভোগের জন্য এবং সন্তান-জননের জন্য—এই যে প্রচলিত ধারণা, ইহাকেই লালন 'বেদ-সম্মত' মত বলিতেছেন। বাউলদের মত হইতেছে, প্রকৃতি-সঙ্গ কাম-দমনের জন্য—পরমতত্ত্বানুভূতির জন্য—পুরুষ ও প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ-উপলব্ধির জন্য। লালনের আর একটি গানেও অনুরূপ ভাব আছে:

"পঞ্চবাণের ছিলে
প্রেমের অস্ত্রে কাটিলে
    ফকির লালন বলে, কাম যায় মারা॥" (নং ৮৬)

লালন আর একটি গানে বলিতেছেন:

"বেদে কি তার মর্ম জানে।
যেরূপ সাঁইর লীলা-খেলা
    আছে এই দেহ-ভুবনে॥
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষ-তত্ত্ব ভজনের সার,
    বেদ ছাড়া বৈ রাগের মানে॥" (নং ৮৫)

এই দেহ-রূপ ভুবনে সাঁই-এর (পরমাত্মা বা ভগবানের) অবস্থিতি এবং তথায় তাঁহার বিচিত্র লীলার রহস্য বেদ অবগত নয়। বেদ বা ঐরূপ চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের পণ্ডিতগণ নানা তত্ত্বের বর্ণনা করেন।* তাঁহারা জানেন না যে, মানুষ-ভজন বা দেহকেই আশ্রয় করিয়া সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই 'রাগের ভজন'-এর সঙ্গে বেদ-মূলক ধর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই।

লালন আর একটি গানে বলিতেছেন যে, বৈদিক ধর্মে পাপ-পুণ্যের কথা আছে। পুণ্যের ফলে লোকে স্বর্গে যায়, কিন্তু পুণ্যের ফল ফুরাইলে আবার

---

* পঞ্চতত্ত্ব অর্থে লালন দুইরূপ বুঝিয়াছেন, প্রথম—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ মত। ইহারা বেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার ধারণা: "ভেবে তারে পঞ্চমতে, ঘুরে বেড়াই পঞ্চপথে" (নং ১৫৮)। দ্বিতীয়—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চতত্ত্ব। "যে জন পঞ্চতত্ত্ব যজে, লীলারূপে মজে" (নং ১০৩)।

তাহাকে মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। সুতরাং জন্ম-মৃত্যুর হাত এড়াইবার কোনো কথা ইহাতে নাই। এক অদ্বৈত-মতে হয়তো নির্বাণ-মুক্তি আছে, কিন্তু এই আদর্শ কোনো সাধকের কাম্য হইতে পারে না :

"এবার কি সাধনে শমন-জ্বালা যায়।
ধর্মাধর্ম বেদের মর্ম শমনের বিকার তায়॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ ক'রে
পুণ্যের ফল সে পেতে পারে,
সে ফল ফুরালে তারে
ঘুরিতে ফিরিতে হয়॥
নির্বাণ-মুক্তি সেধে সে তো
লয় হবে পশুর মতো,
সাধন ক'রে এমন প্রাপ্ত
কি সুখে সাধক চায়॥" (নং ১৪৪)

লালন আর একটি গানে 'বৈদিক ভোলে' না ভুলিয়া 'রাগের ঘরে' থাকিয়া 'মানুষের করণ' অর্থাৎ মনের মানুষের সন্ধান জানিতে বলিতেছেন :

"জান গে মানুষের করণ কিসে হয়।
ভুলো না মন বৈদিক ভোলে
রাগের ঘরে রও।" (নং ১৪৮)

পূর্ববঙ্গের বাউল রসিক বলিতেছেন :

"রাগী ঊর্ধ্বরতি কাম-বিরোধী
বেদের বিধান মানে না॥" (নং ২৮৭)

পূর্ববঙ্গের আর এক বাউল দীন গোপাল বলিতেছেন যে, 'আপন-ভোলা' 'প্রেম-পাগলা' 'রসরাজ রসিক'—

"বিনা অনুরাগের ধর্ম
জানে না সে কোনো কর্ম,
বেদ-বিধি, বিষয়-কর্ম
সব ছাড়্যাছে।
তাহার বৈধী-জ্বালা সব গিয়াছে।" (নং ২৯০)

আর এক বাউল বলিতেছেন যে, কিঞ্চিৎ 'প্রেমের অঙ্কুর' হইলেই 'বৈদিক রাগে' তাহা জ্বলিয়া যায় :

"সহজ শুদ্ধ রাগের মানুষ কই মেলে।
ও তার কিঞ্চিৎ প্রেমের অঙ্কুর হ'লে
বৈদিক রাগে যায় জ্বলে॥
যদি হয় প্রেমের অঙ্কুর,
সে দেখে আপনাকে ঠাকুর,
লঘু-গুরু মানে না সে, বৈদিক রাগে চুর।" (নং ৩৯১)

রাঢ়ের বাউল হরি বলিতেছেন :

"অনুরাগ ধরে যে জনে,
সে বেদ-বিধি না মানে॥" (নং ৪৮৬)

রাঢ়ের আর এক বাউল চাকুরে বলিতেছেন :

"যার হৃদয়ে নাই ভাব-নিধি,
ঘেঁটে মরে বেদ-বিধি,
মিছে তর্ক ক'রে ব'কে মরে রে,
যেমন স্থূল তুষে অবঘাত হয়।" (নং ৪৮৮)

বাউলের 'মনের মানুষ'ও বেদ-ছাড়া :

"বেদ-ছাড়া এক মানুষ আছে
ব্রহ্মাণ্ডের উপরে।
স্বরূপ-শক্তি যুক্ত হ'য়ে
আছে এক নেহারে॥" (নং ৫০৪)

পদ্মলোচন বলিতেছেন যে, মানুষের হৃদয়-বিহারী 'গোঁসাই' স্বয়ং বেদ-পুরাণের বাহিরের এই নূতন পথের খবর মানুষকে দিয়াছেন :

"ও সে বেদের করণ উলট-পালট ক'রে
নতুন পথের খবর দিয়েছেন মোদেরে।
জীবে লাগিয়ে ধান্দা
করিল বান্দা
বস্তা-বন্দী বেদ-পুরাণেরে॥" (নং ১৬১)

যাদুবিন্দুর একটি পদে আছে যে, 'সহজ-ভজন' বেদ-বিধি বহির্ভূত :

"সহজ ভজন না যায় লিখন আছে বেদবিধি পরে ॥"

"বেদ-বিধি-পার, সৃষ্টিছাড়া সহজের করণ নিহারা।"

এইরূপ অনেক গানে বাউলধর্ম যে বেদ-পুরাণের ধর্ম বা শ্রুতি-স্মৃতি-মূলক ধর্ম বা প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ইহার সাধন-প্রণালীও যে স্বতন্ত্র, এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৈদিক ধর্মের প্রতি বাউলদের শ্রদ্ধাহীনতা ও বিরুদ্ধ মনোভাবের একটা মূলগত কারণ বর্তমান। তন্ত্রধর্ম মাত্রেই বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম-বিরোধী। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বীরা তন্ত্র-মার্গকে ভালো চোখে দেখে নাই এবং পুরাণাদিতে তন্ত্রশাস্ত্রকে অবৈদিক ও বেদ-বাহ্য বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। আবার হিন্দু-তন্ত্রগ্রন্থেও বেদের নিন্দা আছে, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজিয়ারা বেদ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়াছে, সুফীধর্মেও আনুষ্ঠানিক মুসলমানধর্ম শরীয়তকে মূল্যহীন এবং মারফত-পন্থাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে; গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও বেদানুগত ব্রাহ্মণ্যধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকে অর্থহীন বলিয়া ঈশ্বর-ভক্তিকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছে— বর্ণাশ্রম মানে নাই— জাতি-কুলের ভেদ-বিচার করে নাই। যে-সব ধর্মমতের সমন্বয়ে বাউলধর্মের উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির কোনোটিই বৈদিক ধর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়। সুতরাং বাউলরা যে বৈদিক বা আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

আমি পূর্বে আভাস দিয়াছি যে, বেদ-বহির্ভূত আর্যেতর একটা ধর্ম হয়তো পূর্বেই ভারতে বর্তমান ছিল এবং বেদের সময় হইতেই বৈদিক আর্যধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিতেছিল। বৈদিক ধর্মের উপর এই ধর্মের প্রভাবের কিছু কিছু নিদর্শন আমরা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও পাই, এ-কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উহাই তন্ত্রধর্মের আদিরূপ। পরবর্তী কালে উহাই তত্ত্ব-দর্শন সমন্বিত এবং ক্রিয়া-পদ্ধতিযুক্ত হইয়া পূর্ণাবয়ব তন্ত্রধর্মে পরিণত হইয়াছে।

বৈদিক উপাসনা হইতে ভিন্ন হইলেও তান্ত্রিক উপাসনা বহু পূর্ব হইতেই স্বীকৃতি লাভ করিয়া আসিতেছে। ভিন্ন মত-বিশিষ্ট হইলেও তন্ত্রের মধ্যে যে সত্য আছে, এ-কথা মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞ, তপ, বেদ, তন্ত্র, মন্ত্র ও সরস্বতী—এ-সকলই সত্য।[৩৭৬] সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র (বৈষ্ণব-তন্ত্র),

৩৭৬। "সত্যং যজ্ঞস্তপো বেদাস্তন্ত্রা মন্ত্রাঃ সরস্বতী"। (শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম, ১৯৯ অধ্যায়)

বদ ও পাশুপত (শৈবতন্ত্র) বিভিন্ন মত-বিশিষ্ট হইলেও এগুলি জ্ঞানের আকর।[৩৭৭] মহাভারতে আরো দেখা যায় যে, আগম-শাস্ত্র বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।[৩৭৮] শ্রীমদ্ভাগবতেও বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র—এই তিন মতের কথা উল্লিখিত আছে।[৩৭৯] মনুসংহিতার প্রথমেই 'ধর্ম' কি, তাহার ব্যাখায় কুল্লুক ভট্ট মহর্ষি হারীতের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রুতি দুইপ্রকার— বৈদিকী ও তান্ত্রিকা।[৩৮০] 'মেদিনীকোষ' অভিধানে শ্রুতিকে ব্রহ্মশ্রুতি (বেদ) ও শিবশ্রুতি (তন্ত্র)-ভেদে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সাধারণ ধারণা এই যে বৈদিক শ্রুতির ব্যাখ্যা-স্বরূপ যেমন পুরাণগুলি রচিত হইয়াছে, তান্ত্রিক শ্রুতিসমূহের সেইরূপ ব্যাখ্যা চৌষট্টিটি তন্ত্র। বহু পূর্ব হইতেই বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা ভিন্ন হইলেও, উভয়ে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

পরবর্তী যুগের রাঘব ভট্ট, ভাস্কর রায় ও অন্যান্য তান্ত্রিকাচার্য তন্ত্রের উপর বেদের কৌলীন্য-প্রলেপ মাখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেদ হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি এবং তান্ত্রিক বীজ-মন্ত্রাদি বেদের মন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। নেপাল-দরবার লাইব্রেরির 'কালীকুলার্ণবতন্ত্র'-নামক গ্রন্থের প্রথমেই আছে—"অথাত আথর্বণসংহিতায়াং দেব্যুবাচ।" 'রুদ্রযামল'-এর সপ্তদশ পটলে মহাদেবী 'অথর্ববেদশাখিনী' বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন। 'কুলার্ণবতন্ত্র'-এ কৌলাচারের বৈদিকত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ইহার ভিত্তি-স্বরূপ কয়েকটি শ্রুতি-প্রমাণও উদ্ধৃত করা হইয়াছে।[৩৮১] তন্ত্রের প্রামাণিকতা-স্থাপনের জন্য আচার্যগণ ইহার বৈদিকত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব-প্রতিপাদনের বহু চেষ্টা করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যে অনেক গ্রন্থও রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যমুনাচার্যের 'তন্ত্রপ্রামাণ্য', বেদোত্তমের 'পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্য', ভট্টোজি দীক্ষিতের

৩৭৭। "সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।"
(শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম, ৩৪৯ অধ্যায়)

৩৭৮। "যানীহাগমশাস্ত্রাণি যাশ্চ কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ।
তানি বেদং পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তানি যথাক্রমম্।" (অনুশাসন পর্ব, ১২২ অধ্যায়)

৩৭৯। "বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।" (ভাগবত—১১।২৭।৭)

৩৮০। "অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্মঃ। শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ। ইতি হারীতঃ" (মনু ২।১, কুল্লুকভট্ট-টীকা)

৩৮১। কুলার্ণবতন্ত্র—২।১০ এবং ২।১৪০—১৪১ (Āgamānusandhān Samiti, **Arthur Avalon Tantrik Texts,** Vol. V, ed. by Taranath Vidyāratna).

'তন্ত্রাধিকারি-নির্ণয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বেদ ও তন্ত্রের প্রকৃত মিলন হয় নাই এবং উভয়সাধনার ধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে মিশ্রণ হইয়াছে মাত্র।

অধিকাংশ পুরাণেই তন্ত্রশাস্ত্রকে অবৈদিক ও বেদ-বাহ্য বলা হইয়াছে এবং বৈদিকোপাসনা ও তন্ত্রোপাসনা ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অনেক পুরাণে তন্ত্র-শাস্ত্রের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। 'কূর্মপুরাণ'-এ উক্ত হইয়াছে যে, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য শৈব, শাক্ত, পঞ্চরাত্র এবং এই প্রকারের অন্যান্য তন্ত্র রচিত হইয়াছিল এবং আরও বলা হইয়াছে যে, পাষণ্ডীদের অর্থাৎ বৌদ্ধগণ, বামাচারী, পাঞ্চরাত্র এবং পাশুপতদিগের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও অন্যায়।[৩৮২] স্মৃতি-শাস্ত্র প্রভৃতিতেও তন্ত্রের নিন্দা আছে। কুমারিল ভট্ট তাঁহার 'তন্ত্রবার্তিক' গ্রন্থে বলিয়াছেন, যাহা বেদ-বিরুদ্ধ তাহাই অপ্রমাণ। সাংখ্য. যোগ, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, বৌদ্ধ, জৈন বশীকরণ-উচ্চাটন-উন্মাদন-মন্ত্রৌষধি দ্বারা সিদ্ধি-প্রদর্শনকারী সম্প্রদায় কেবল খ্যাতি ও লাভের জন্য লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে।[৩৮৩] 'যাজ্ঞবল্কসংহিতা'য় এইরূপ উল্লেখ আছে যে, তন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে বৈদিক শ্রাদ্ধ-কার্য করা অতীব গর্হিত।[৩৮৪]

আবার তন্ত্র-গ্রন্থের মধ্যেও বেদ-পুরাণ-স্মৃতির যথেষ্ট নিন্দা আছে। 'কুলার্ণবতন্ত্র'-এ কথিত হইয়াছে যে, বেদ-স্মৃতি-পুরাণ সামান্য গণিকার ন্যায় এবং এই গোপনীয়া তন্ত্রবিদ্যা কুলবধুর ন্যায়।[৩৮৫] নেপাল-দরবার লাইব্রেরির

৩৮২। "কাপালং পাঞ্চরাত্রং চ যামলং বামমার্হতম্।
এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু॥"

—কূর্মপুরাণ, পূর্ব, ১২।২৫৯

"পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বামাচারাংস্তথৈব চ।
পাঞ্চরাত্রান্ পাশুপতান্ বাঙ্‌মাত্রেনাপি নার্চয়েৎ॥"

—ঐ, উপরিভাগ, ১৬শ অধ্যায়, (এশিয়াটিক সোসাইটি সং, পৃঃ ১৩৭ ও ৫৫৫)

৩৮৩। তন্ত্রবার্তিক—পৃঃ ১১৪

৩৮৪। "দীক্ষিতস্য চ বেদোক্তং শ্রাদ্ধকর্মাতিগর্হিতম্।"

(যাজ্ঞবল্কসংহিতা, টীকায় উদ্ধৃত, আনন্দাশ্রম সং, পৃঃ ১১)

৩৮৫। "বেদস্মৃতিপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গোপ্যা কুলবধূরিব॥"

—কুলার্ণবতন্ত্র ১১।৮৫

'কাকচণ্ডেশ্বরীমত'-নামক তন্ত্রগ্রন্থে অতি-প্রাচীন বেদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হয় না বলিয়া উক্ত হইয়াছে: "বেদানাঞ্চ বয়োঽর্থেন ন সিদ্ধিস্তেন জায়তে।"

বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজিয়ারা বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিয়াছে। তাহাদের গান ও দোঁহা এবং উহাদের বিস্তৃত সংস্কৃত টীকার মধ্যে ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

সরহপাদ তাঁহার দোঁহায় ব্রাহ্মণ ও বেদকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন:

ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদ করে আর বলে যে, চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তমবর্ণ, যেহেতু তাহারা ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মিয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে যখন জন্মিয়াছিল, তখন জন্মিয়াছিল এখন তো প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখি যে, তাহারা অন্য সকলের ন্যায় যোনি-সম্ভব। অতএব তাহাদের কথা মিথ্যা—ধূর্তের বচন। আর যদি বলা হয়, সংস্কারের দ্বারায় ব্রাহ্মণ হয়, তবে অন্ত্যজ জাতি সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না কেন? যদি বলা হয়, বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তবে অন্ত্যজরাও তাহা পড়িতে পারে, কারণ শব্দ বুঝিলে সকলেই তাহা পড়িতে পারে আর ব্যাকরণের মধ্যে অনেক বেদের শব্দ সাধিত হইয়াছে, উহা তো সকলেই পড়িয়া থাকে। শব্দ লোকের কথা মাত্র, তাহার মধ্যে কোনো পরমার্থ-লক্ষণ নাই। শব্দ কখনো নিত্য হইতে পারে না। তবে বেদকে কেন নিত্য বলা হয়? অগ্নিহোত্র বা যাজ্ঞিক ঘৃতাদি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া হোম করিলে কোন ফলই লাভ করিতে পারে না, আর যদি তাহাতে মুক্তি হয় বলা হয়, তবে অন্ত্যজ জাতিরাও ঐরূপ হোম করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না কেন? ঐরূপ যজ্ঞে মুক্তি তো হয়ই না, অধিকন্তু কটু ধূমে চক্ষুর প্রদাহ ও চক্ষু-পীড়া হয়। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিষয় বলে। তাহাদের তিন বেদের পাঠ সিদ্ধ নয়—উহাদের বাক্য সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন—মিথ্যাবাক্য। অথর্ববেদের তো কোনো অস্তিত্বই নাই। সুতরাং বেদের কোনো প্রামাণিকতা নাই। বেদের ব্রহ্ম-জ্ঞান অসিদ্ধ ও মিথ্যা। বেদ পরমার্থ নয়। ব্রাহ্মণেরা উপবীত ধারণ করিয়া একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডী প্রভৃতি হয়, কিন্তু সত্যজ্ঞান না জন্মিলে কিছুই হয় না। তাহারা পরমহংস-বেশ ধারণ করিলেও বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না। মিথ্যার দ্বারা সমস্ত জগৎ কুমার্গে পরিচালিত হইতেছে। কেহই সর্বোচ্চ সত্য জানে না—যেখানে ধর্ম এবং অধর্ম একই হইয়া গিয়াছে।[৩৮৩]

৩৮৩। 'দোহাকোষ' (বাগচী সং ও শাস্ত্রী-টীকা)

বৌদ্ধ-সহজিয়াদের এই ভাবধারা বৈষ্ণব-সহজিয়াদিগকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তাহাদের রচিত সাহিত্যেও ইহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব-সহজিয়ারা তাহাদের সাধনাকে 'রাগের ভজন' বলে। এই রাগের ভজন কোনো প্রচলিত শাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী বা ক্রিয়াকাণ্ড-সমন্বিত ভজন নয়। ইহা একান্ত প্রেম-পীরিতি-মার্গের ভজন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে 'বৈধী' ও ও 'রাগানুগ' বলিয়া ভক্তির দুইটি ভেদ করা হইয়াছে:

"এইত সাধনভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥"

(চৈ, চ. মধ্যের ২২ পঃ)

"ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন।
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
... ...
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥"

(ঐ, ২২ পঃ)

বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই 'রাগানুগা' বা 'রাগাত্মিকা' ভক্তিকে তাহাদের ভজনের অনুকূল করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময় গাঢ়তৃষ্ণারূপ রাগানুগা-ভক্তিকে তাহারা কৃষ্ণ-স্বরূপ ও রাধা-স্বরূপিনী মানবিক পুরুষ-প্রকৃতির তীব্র-গভীর প্রেমে রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রেমের সাধনাই তাহাদের 'রাগের ভজন'। এই প্রেমের মিলনই তাহাদের 'যুগল-মিলন' বা 'যুগল-ভজন'। জাগতিক প্রকৃতি-পুরুষের মধ্যে রূপায়িত পরমপুরুষ ব্রজেন্দ্রনন্দনের দুইটি সত্তা—'পূর্ণ শক্তি' ও 'পূর্ণ শক্তিমান্'। ভোগ্যা ও ভোক্তা —'আশ্রয় ও বিষয়', তরঙ্গায়িত 'হ্লাদিনীশক্তি' ও নিস্তরঙ্গ 'স্বরূপশক্তি'র একীকরণে যে মহোল্লাসময় 'মহাভাব', তাহাতেই 'সহজ মানুষ'-এর অবস্থিতি। উহাই 'সহজ মানুষ'-এর স্বরূপ। যুগল-মিলনের দ্বারাই সহজ মানুষের স্বরূপত্ব উপলব্ধি করা যায়। এই মহাভাবে উপনীত হইয়া সহজ মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি

করাই তাহাদের সাধনার লক্ষ্য। এই 'রাগের ভজন'-এর দ্বারাই মানুষ-উপলব্ধি বা 'মানুষ-ভজন' সম্ভব হয়। মূলতঃ ইহাই বাউলের সাধন-তত্ত্ব ও দর্শন। বাউলরা এই সাধন-ক্রিয়াকে 'রাগের করণ' বলে।

এই 'যুগল-ভজন' বা 'রাগের-ভজন' যে বেদ-বিধির বহির্ভূত, তাহা বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বার বার বলিয়াছেন :

"রাগের ভজন যাজন কঠিন
আচার বিষম হয়।
বেদবিধি ছাড়ে কুল পরিহরে
তবে হয় প্রেমোদয়॥" (পদ নং ৩৮)

"যুগল ভজন তাহার যাজন
বেদ-বিধি অগোচর" (পদ নং ৬০)

"বেদের বিধানে কহে জগজ্জনে
তাহাতে নাইক পাই।
অতি বিপরীত হয় রাগ-পথ
শুনহ সাধক ভাই॥" (পদ নং ৬৯)

"প্রেম শতধারে বেদবিধি-পার
কে করিবে অনুমানে।" (পদ নং ৭৭)[৮৭]

সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্ম-ক্রিয়াদি অতিক্রম না করিলে যে অপূর্ব রসময় ভজন-পদ্ধতিতে উপনীত হওয়া যায় না, এই ভাবটি সুন্দর একটি উপমা সাহায্যে একটি সহজিয়া-বৈষ্ণব-পদে প্রকাশিত হইয়াছে :

"নগর ভিতরে আছে এক রসের মন্দির।
বৈধিভক্তি-আচরণ গড়ের প্রাচীর॥
জ্ঞান-যোগ-কর্ম-কাণ্ড গড়ন বিভিতে।
তাহা না লঙ্ঘিলে পুরী নারি প্রবেশিতে॥"

(পদ নং ৮৫, 'সহজিয়া সাহিত্য')

৮৭। 'সহজিয়া সাহিত্য'—বসু, পৃঃ যথাক্রমে ৩৪, ৫৫, ৬৬, ৭৩

সহজিয়া বৈষ্ণবদের অনেক গ্রন্থেও এই ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"বেদে নাহি জানে তত্ত্ব এ সব কারণ।"
"বেদেহ না জানে কৃষ্ণলীলার প্রকাশ।"[৩৮৮]

'সহজপুর' বা 'গুপ্তচন্দ্রপুর' সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সহজিয়ারা বলে:

"সেই স্থান অক্ষয় যুগে যুগে রয়
প্রলয়ে নাহিক যান॥
সূর্য নাহি চলে বেদে নাহি বলে
পবনের নাহি গতি।
না চলে চন্দ্র নাশয়ে ধন্দ
কিবা সে স্থানের জ্যোতি॥"[৩৮৯]

এই 'মানুষতত্ত্ব' এবং 'সহজ মানুষ' যে বেদ-বিধির বাহিরে, এই ভাব তাহাদের অনেক পদে পাওয়া যায়:

"মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে
মানুষ নিগূঢ় কথা
... ...
বেদ-বিধি পার বেভার আচার
বেদ বিষ্ণু নাহি জানে।"
মানুষের তত্ত্ব অতি অদভুত
কেবা কহে, কেবা জানে॥ (পদ নং ২৪, সঃ সাঃ)

"একটি মানুষ সেই সদারসে বিলসই
বেদ-বিধি না জানে মহিমা। (পদ নং ৩৩, সঃ সাঃ)

মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের কবীর, দাদূ প্রভৃতি ভক্ত-যোগীরাও বেদ-পন্থা বা আনুষ্ঠানিক ধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন।

বৌদ্ধ-সহজ-সাধনা ও বৈষ্ণব-সহজ-সাধনা বেদাচারমূলক ধর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্মকে নিন্দা করিয়াছে। সুফীধর্মেও বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে নিতান্ত মূল্যহীন মনে

৩৮৮। 'আগমসার'—সহজিয়া সাহিত্য—পৃঃ ১০৪ ও ১১২
৩৮৯। 'অমৃতরসাবলী'—ঐ—পৃঃ ১৮৭

করা হইয়াছে। বাউলগণ ইহাদের ভাবধারার উত্তরাধিকারী হইয়া বেদবিধি বা আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি এইরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছে।

(২) **গুরুবাদ** ॥

ভারতে কোনো ধর্মই কেবল শুষ্ক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয় নাই বা শুধু দার্শনিক মত বা সূক্ষ্মভাবরূপে পরিবেশিত হয় নাই। প্রত্যেক আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে জীবনে উপলব্ধি করা হইয়াছে, সেই উপলব্ধ সত্যই ধর্মতত্ত্বরূপে আত্ম-প্রকাশ লাভ করিয়াছে। জীবনের মধ্যে অনুষ্ঠিত, কর্মের দ্বারা পরীক্ষিত এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোনো তত্ত্ব বা মত চরম আধ্যাত্মিক সত্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে নাই। সুতরাং ভারতে প্রত্যেক ধর্মেরই জ্ঞান-দর্শন-মনন-অংশ ছাড়াও একটা ব্যবহারিক বা ক্রিয়ামূলক সাধনাংশ আছে। এই ক্রিয়া বা সাধনা দ্বারাই সেই ধর্মের সত্য উপলব্ধি করা যায়। যাঁহারা ক্রিয়া বা সাধনা করিয়া নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ, মর্মজ্ঞ ও ক্রিয়া-বিশারদ। ইঁহারাই গুরু, ইঁহারাই অন্যান্যকে দের ধর্মের মতে ও পথে চালিত করিতে পারেন। তাই ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় গুরুর এত প্রয়োজন, গুরুর এত মাহাত্ম্য। গুরু ব্যতীত ধর্মের মূল-ত্তের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। বৈদিক যুগ হইতে ভারতের ধর্ম গুরু-শিষ্য-রম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

যে-সব ধর্মে তত্ত্ব-দর্শন বা জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের প্রাধান্য বেশি, সে-সব ধর্মে র প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। তান্ত্রিক ধর্মের ভিত্তিই ক্রিয়া,—সাধনাংশই হার মূলরূপ। এই সাধনাংশে যে-সমস্ত গূঢ় পদ্ধতি, যোগ-সাধনা প্রভৃতি আছে, াহাতে গুরুর উপদেশ ও সাহচর্য অপরিহার্য। তন্ত্রধর্মে গুরু ব্যতীত এক পদও গ্রসর হইবার উপায় নাই। হিন্দু-তান্ত্রিক ধর্ম, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্ম, সহজিয়া-বৈষ্ণব-র্ম বা বাউলধর্ম, যাহা গূঢ় সাধনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে গুরুর সর্বোচ্চে, তাঁহার সম্মান ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। সুফীধর্মেও ধ্যান-ও ধারণা যোগ-মূলক ক্রিয়া আছে, সে-ধর্মেও গুরুর আসন অতি উচ্চে। একান্ত যোগ-নাথ-ধর্মেও গুরুর সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধ গুরুগণ বা র্ষগণই এই নাথ-মার্গের প্রতিষ্ঠাতা।

বাংলার বাউলরাও গুরুকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। গুরুকে তাহারা দুইরূপে

দেখে—মানব-গুরু-রূপে আর পরমতত্ত্ব বা ভগবান-রূপে। তাহাদের গানে দুই রূপেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। মানব-গুরুর প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা না হইলে সর্বোচ্চ গুরু ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ হয় না। মানব-গুরু সেই পরমগুরুরই প্রতিনিধি। অন্যান্য ধর্মের গুরু-ভক্তি বা গুরু-বশ্যতার কথা আমরা অধিকাংশই গ্রন্থাদিতে পড়িয়াছি; কুল-গুরু সম্বন্ধে আমাদের কাহারো কাহারো কিছু-কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু বাউলদের গুরুভক্তি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, এই সম্প্রদায়ের মত গুরুবাদী সম্প্রদায় অন্য আর একটি আছে কিনা সন্দেহ—অন্ততঃ বাংলায় যে নাই, ইহা ঠিক। অনেক সময় ইহাদের গুরুভক্তি বা গুরুনিষ্ঠা বিন্দুমাত্র বিচার-বিবর্জিত, অন্ধ, হাস্যকর ও চরম মূর্খতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের গুরু-শিষ্যের মধ্যে এমন একটা দৃঢ় বন্ধন দেখিয়াছি, যাহা অন্যত্র সুলভ নয়। গুরু ইহাদের কেবল পারমার্থিক বিষয়েই পরিচালিত করেন না, লৌকিক বা ব্যবহারিক বিষয়েও পরামর্শ দেন। শিষ্যদের মধ্যে কোনো মতদ্বৈধ থাকিলে গুরুকেই তাহা মীমাংসা করিতে দেখিয়াছি। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোনো কোনো বিশিষ্ট গুরু প্রকৃতি-পুরুষ-ঘটিত যোগ-সাধনার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, কখন কিরূপে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া করিতে হইবে, কখন কোন্ মুদ্রা বা বন্ধ অবলম্বন করিতে হইবে, বিভিন্ন অনুভূতিতে কি কি করনীয়, প্রভৃতি অতি-গূহ্য বিষয়ের উপদেশ দেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সাধক-সাধিকা বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। তাহাদের অন্তর্জীবন এবং বহির্জীবন গুরুর নিকট সদা উন্মুক্ত।

গুরু বা মুরশিদ যে এ জগতে পরম সম্পদ এবং ভগবান যে গুরুর রূপে শিষ্যকে সাধন-পথে পরিচালিত করিতেছেন, ইহাই বাউলদের বিশ্বাস। লালন তাঁহার একটি গানে বলিতেছেন:

"মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।

মুরশিদের চরণ-সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা;
কোরো না দেলে দ্বিধা
যেহি মুরশিদ সেহি খোদা।
বোঝ 'অলিয়ম মরশেদা'
আয়েত লেখা কোরানেতে॥

আপনি খোদা আপনি নবী,
আপনি সেই আদম ছবি,
অনন্তরূপ করে ধারণ ;
কে বোঝে তার নিরাকরণ,
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুরশিদ-রূপে ভজন-পথে ॥" (নং ৬৭)

কোরানে আছে যে, ভগবানই 'আমাদের বন্ধু ও পথ-প্রদর্শক।' সেই 'নিরঞ্জন নিরাকার হাকিম খোদা' মুরশিদ-রূপে সাধন-পথে আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন। ভগবান নানারূপে বিরাজ করেন। তাঁহার সমস্ত জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির প্রকাশ মুহম্মদে। সেই সমস্ত শক্তিই আদমে রূপায়িত। মানবের অন্তর্নিহিত সত্তা বা আত্মা ('রুহ্')-রূপে সর্বমানবে তাঁহার অবস্থিতি। সুতরাং আল্লা, নবী, আদম—অর্থাৎ সকল মানব মূলে এক—কেবল রূপ ভিন্ন। সকল মানুষের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব নিহিত থাকিলেও যাঁহারা ধ্যান-ধারণা ও ভগবৎ-প্রেম-সাধনায় তাঁহাদের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির পূর্ণবিকাশ-সাধন করিতে পারেন, তাঁহারাই 'অল্-ইনসান-উল্-কামেল' বা পূর্ণমানব বা সাধু-গুরু। এইপ্রকার পূর্ণমানবই প্রকৃত-পক্ষে সদ্‌গুরু—তাঁহাদের সাহায্যে ও উপদেশে ভগবৎ-জ্ঞান ও ভগবৎপ্রেম-লাভ হয়।[৩১০] প্রকৃতপক্ষে ভগবানই গুরু-রূপে মানুষকে সাধন-পথে পরিচালিত করেন। ইহাই অনেকটা সুফীধর্মে গুরুর স্থান।

আর একটি গানে লালন বলিতেছেন :

"আগমে নিগমে কয়
গুরু-রূপে দীন-দয়াময়,
অসময়ে সকাশে হয়
যে তারে ভজিবে ॥
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যার
অধঃপাতে গতি হয় তার।" (নং ৭০)

৩১০। **The Idea of Personality in Sufism**
-R. A. Nicholson—Page 70.

আবার লালন ভগবানকেই শ্রেষ্ঠ গুরু মনে করিয়া তাঁহারই নিকট কাতর আবেদন জানাইতেছেন :

"গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী,
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী,
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী,
না বাজাও বাজবে কেনে ॥
আমার জন্ম-অন্ধ মন-নয়ন
গুরু, তুমি নিত্য সচেতন,
চরণ দেখব আশায় কয় লালন,
জ্ঞান-অঞ্জন দেও নয়নে ॥" (নং ৬৯)

"গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার
লও গো সুপথে।
তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধব কি মতে ॥

যন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন
যেমন বাজায় বাজে তেমন,
তেমনি যন্ত্র আমার মন
বোল তোমার হাতে।" (নং ৭২)

"গুরু-রূপের ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে,
ও তার কিসের আবার ভজন-সাধন লোক-জানিত ক'রে।" (নং ৭৪)

উত্তরবঙ্গের বাউল গোবিন্দ বলিতেছেন যে, রিপুর প্রবল তাড়নে তিনি প্রকৃত সাধন-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার 'শ্রীগুরুর চরণ' পাওয়া কঠিন। সাধনেই যখন তিনি বিফলমনোরথ, তখন 'সাঁই' আর কি গুণে ধরা দিবেন :

"আমার যায় না দুখের দিন, হয় না সুদিন,
আমি কিরূপে পাব শ্রীগুরুর চরণ ॥
হারায়ে গুরু-বস্তু-ধন
(আমার) দিনে দিনে দেহ-তরী
পাপেতে হতেছে ভারী,
ভবপারে যাইতে নারি,
কি করি এখন ॥

হ'ল না রে মোর সাধন করা,
কি গুণে সাঁই দিবে ধরা,
হারাইয়াছি গুরুর বস্তু-ধন।" (নং ১৯১)

'গুরু-বস্তু', 'গুরু-ধন', 'মহাজনের মাল' 'পুঁজি' কথাগুলি গানের মধ্যে অনেক স্থলে পাওয়া যায় এবং বাউলদের মুখেও শোনা যায়। দেহের সারবস্তুকে তাহারা 'গুরু-ধন', 'গুরু-বস্তু', 'মহাজনের মাল', 'পুঁজি' প্রভৃতি বলে। দেহের সারবস্তু বিন্দু, ইহাই মানুষের পরমসম্পদ। ইহা 'শ্রীগুরু' বা ভগবানের স্বরূপ। এই বিন্দু বা গুরুধনকে সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। 'মহাজন' এই 'মাল' বা 'পুঁজি' দিয়া সংসারের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন, এই 'পুঁজি'কে রক্ষা করিতে না পারিলে ব্যবসায়ের মূলই ধ্বংস হইয়া যাইবে। নানা রিপুর উত্তেজনায় এই গুরু-বস্তু নষ্ট হয়, বা হারাইয়া যায়, তাহাতেই সাধন-ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মানব-গুরুরাও এই বিন্দু-রক্ষার জন্য উপদেশ দেন। ইহাই তাঁহাদের সাধন-নির্দেশ। লৌকিক দিক দিয়াও ইহাই বাউলদের 'গুরু-বস্তু' 'গুরু-ধন'। এই বিন্দু-রক্ষাই বাউল-সাধনার মূলভিত্তি।

গোবিন্দ আরো বলিতেছেন যে, এই 'শ্রীগুরু' ও মন্ত্রদাতা গুরু একই :

"যে হরি সেই গুরু, ভক্তের কল্পতরু,
কর্ণধার গুরু,
করিলে বীজরোপণ॥"

ফরিদপুরের বাউল-গুরু চণ্ডী গোঁসাই বলিতেছেন :

"গুরুর মুখপদ্ম-বাক্য
যার হয়েছে হৃদে ঐক্য,
তার কাছে নাই বিচার-বিতর্ক
গুরুর বাক্য সার।
(ও) তার ধ্যানে গুরু, জ্ঞানে গুরু,
অন্তরে বাহিরে গুরু,
রূপ-নেহারে গুরু,
গুরুর রূপে রূপ মিশায়॥" (নং ২০৬)

আর একটি গানে আছে :

"গুরু গীতা-তন্ত্র, গুরু যজ্ঞ-মন্ত্র, গুরু যে পরমগতি,
গুরু বিনে ভাই-বন্ধু কেহ নাই, গুরু বন্ধু, পিতা, পতি,

জ্যোতির্ম্ময়দেহ মানুষ-বিগ্রহ চিন্ত হৃদানন্দকাননে,
নহে গুরুতুল্য রতন অমূল্য, রাখিও হৃদয়ে যতনে ॥" (নং ২১৬)

পূর্ববঙ্গের একটি বাউল বলিতেছেন :

"গুরু, তোমার চরণ পাব বইল্যে
বড় আশা ছিল।
আশা-নদীর কূলে বইস্যে
আমার আশায় আশায় জনম গেল,
আশা না পূরিল ॥
চাতক রইল মেঘের আশে,
মেঘ বইয়া যায় অন্য দেশে,
চাতক বাঁচে কিসে।
জল বিনে চাতক মইল—
আমার তেমনি দশা হইল,
আমার আশা না পূরিল ॥" (নং ২৯৩)

নরহরি-শিষ্য তত্ত্বজ্ঞ অনুরাগী মোহান্ত বলিতেছেন :

"গুরুবাক্যে যে ঐক্য করেছে, তারই লক্ষ্যভেদ হয়েছে।
বাক্ ধরে যে বাঘ ধরে সে, পুথি-পত্রে প্রমাণ আছে ॥
কবীর হয় যবনের ছেলে, গোঁসাই গুরুর বাক্ ধরিলে।
রামানন্দের কৃপা পেলে, রামরূপ হৃদে ছাপ পড়েছে ॥
একলব্যের ঐক্য-ধারা কেবল মাটির মূর্তি গড়া,
হৃদে ধ্যান-মূর্তি ভরা, যুদ্ধে বিশারদ হয়েছে ॥" (নং ৪৪২)

উত্তরবঙ্গের আর একজন বাউল বলিতেছেন :

"বস, রে মন, গুরুর কাছে।
গুরু বিনে ভবে কি ধন আছে ॥
গুরু-বস্তু-ধন চিনলি নারে, মন,
অযতনে সে ধন মারা গেছে।
ও সে আলেক-রূপে সাঁই ভ্রমিছে সদাই,
সহজ মানুষ সহজ পথে যায়,
ও সে গয়া-গঙ্গা-কাশী তীর্থ বারাণসী,
সকল তীর্থ গুরুর শ্রীচরণে আছে ॥

যে জন সাধন করেছে, গুরু ধরেছে,

অধর মানুষ ধ'রে ব'সে আছে।" (নং ১৯৫)

উত্তরবঙ্গের অন্য একজন বাউল মূল মুরশিদ-ভগবানের নিকট কাতর নিবেদন জানাইতেছেন :

"আর আমার কেউ নাই, আর আমার কেউ নাই,

মুরশিদ তোমা বিনে।

একবার দয়া ক'রে চাও, গো মুরশিদ,

দীন-হীনের পানে ॥

মুরশিদ তোমার করুণা-গুণে শোলা ডোবে, শিলা ভাসে,

ভক্তের বাঞ্ছা পুরাও না কেনে ॥

যদি হয়ে থাকি অপরাধী, তুমি তো জগতের পতি,

তোমার দীনবন্ধু নাম, জানি হে সন্ধান,

চেয়ে আছি তোমার চরণ-পানে ॥

... ...

আমি অপরাধী, তুমি হে জগৎপতি,

গতি নাই তোমার চরণ বিনে ॥" (নং ১৯৬)

মধ্যবঙ্গের বিখ্যাত ফকির পাঞ্জু শাহ্ পরম-দয়াল মুরশিদের নিকট আবেদন জানাইতেছেন :

"তুমি আমারে ফেলো না মুরশিদ, দয়াল হ'য়ে।

আমি চাতকিনীর মত আছি তোমার চরণ-পানে চেয়ে ॥

তোমার অধম-তারণ নাম শুনেছি, শুনে কুল ছেড়ে বেহাল হয়েছি।

... ...

এই ভব মাঝে পতিত হ'য়ে ফিরতেছি কলঙ্কের ডালি বয়ে ॥

গুরু, শুনে তোমার নামের ধ্বনি, আমি ডাকিতেছি এই রাত্রিদিনি।

অধীন পাঞ্জু বলে, গুণমণি, আমায় দয়া কর শ্রীচরণ দিয়ে ॥" (নং ২২১)

আবার মানব-গুরু সম্বন্ধে পাঞ্জু শাহ্ বলিতেছেন :

"যার হয়েছে নিষ্ঠা-রতি,

তার গুরু-প্রতি সদায় মতি,

গুরু ভিন্ন নাই গতি

যেমন ইন্দ্রবারি নিষ্ঠা ক'রে রয়েছে চাতক জাতি ॥" (নং ২২৪)

তিনি অন্য একটি গানে বলিতেছেন যে, নানারূপে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন :

"গুরু-রূপে নয়ন দে রে মন,
গুরু বিনে কেউ নাই তোর আপন।
গুরু-রূপে অধর মানুষ দিবে তোরে দরশন ॥
পিতার ভাণ্ডে কিরূপ ছিলি
মায়ের গর্ভে কিরূপ হলি, মন,
পূর্ব-পরে নিরন্তরে গুরুরূপে নিরঞ্জন ॥" (নং ২৫৬)

"গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া ভুবনে।
অনন্ত অপার লীলা তোমার,
মহিমা কে জানে ॥
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ,
মন্ত্রদাতা তুমি ইষ্ট,
মন্ত্র জানতে সঁপে দিলে
সাধু-বৈষ্ণব-চরণে ॥" (নং ২৬৩)

বাউলরা মানব-গুরুকে পরমতত্ত্বের বা শ্রেষ্ঠ পরমগুরু ভগবানের একটা রূপ বলিয়া ধারণা করিয়াছে, কিন্তু আসল গুরু বা মুরশিদ বলিতে পরমতত্ত্বকেই বুঝাইয়াছে। সেই গুরুই মূলগুরু—তাঁহার কৃপাই সকল সাধনার মূল।

নবদ্বীপের চণ্ডীদাস গোঁসাই বলিতেছেন,—

"দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, ইহার পরে আছে গুরু,
সেই গুরু কল্পতরু, রাগেরি আশ্রয়।
আর যত আছে গুরু পথের পরিচয়।
তিমির-অন্ধ বিনাশিলে নিজ গুরু যায় তা চিনা ॥" (নং ৩০৫)

আর একটি গানে আছে :

"বল, কোন্ গুরুর কর অন্বেষণ।
গুরু দেহদাতা মাতা-পিতা এই দুইজন
তারে কর অন্বেষণ ॥

শিক্ষা-দীক্ষা-গুরু দুইজন,
কর্ণে করায় মন্ত্র গ্রহণ,
মনের গুরু কল্পতরু,
মূলগুরু আছেন গোপন ॥
কর সেই গুরুর সন্ধান
দিয়ে ভক্তি অনুপান,
সিদ্ধ হবে ধ্যান,
তোর ভজন-পূজন ॥" (নং ৩৫৬)

দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষা-গুরু বা ভক্ত বৈষ্ণব পরমগুরুরই প্রতিনিধি। এইসব মানব-গুরুকে শেষে পরমগুরুতে পর্যবসিত করিয়া সাধনা করিতে হইবে।

একটি গানে আছে :

"গুরু এক রূপেতে তিন রূপ হয়,
আচার্যরূপে মন্ত্রদাতা,
তিনি হলেন পারের কর্তা,
তা না হ'লে তোর ভজন বৃথা—
যেমন ভেকে কল্লোল ক'রে মরে ॥
এই তিনরূপ ভেঙে একরূপ ক'রে
অন্তরে যে ধারণ করে,
ডঙ্কা মেরে যায় সে ব্রজপুরে,......"
(নং ৩৬৮)

বাউলদের সাধনার বস্তু 'গুরুতত্ত্ব'। 'গুরুতত্ত্ব' কি? এই যে আসল গুরু বা পরমতত্ত্ব বা ভগবান বা অন্তরাত্মার কথা বলা হইল, তাঁহার স্বরূপই গুরুতত্ত্ব। এই স্বরূপ কিরূপ? এই স্বরূপের তিনটি অংশ আছে,—একটি ভোক্তা, শক্তিমান বা পুরুষারূপে, আর একটি শক্তি, ভোগ্যা বা প্রকৃতি-রূপে, অপরটি উভয়ের মিলিত একটি মহানন্দ-শিহরিত অনির্বচনীয় সম্মিলিত অদ্বয় অবস্থারূপে। দুইটি সত্তার মিলনের দ্বারা এই অনির্বচনীয় তৃতীয় অবস্থা-লাভই তাহাদের মূল সাধনা।

এক বাউল-গুরু তাঁহার শিষ্যকে সাধনের মূল তত্ত্ব বলিয়া দিতেছেন :

"আত্মরূপে কৃষ্ণ তিনি, পরতত্ত্বে রাধারাণী,
গুরুতত্ত্বে প্রেম বাখানি,
হয় মহাভাবের উদয় ॥

কৃষ্ণ অধরে বলে, মনোহর, নে যত্ন ক'রে,
দিলাম তোরে তত্ত্ব বলে,
সাধনের এই নির্ণয় ॥"
(নং ৩৪৯)

গুরুতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্বের মিলিত রূপ। কৃষ্ণ পুরুষতত্ত্ব, রাধা প্রকৃতিতত্ত্ব এবং উভয়ের গভীর প্রেম-মিলনই গুরুতত্ত্ব। এই গভীর ও সর্বাঙ্গীণ প্রেম-মিলনের দ্বারা যে অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি হয়, তাহাই মহাভাব। ইহাই প্রেমের চরম ও পরম অবস্থা। এই অপূর্ব আনন্দময় সত্তাই মানবাত্মা বা প্রকৃত গুরুর স্বরূপ। বাউলদের সাধনাও মানবাত্মার এই স্বরূপ-উপলব্ধির সাধনা। সেই জন্যই তাহাদের ধর্মে কৃষ্ণ-স্বরূপ ও রাধা-স্বরূপিণী পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের ব্যবস্থা এবং ইহার দ্বারাই এক অদ্বয় নিত্যানন্দ স্বরূপের উপলব্ধিই তাহাদের সাধনার লক্ষ্য।

এই ভাবটি আর একটি গানে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে :

"আত্মতত্ত্ব স্বরবর্ণ, সে তো নয় রে সামান্য,
পরতত্ত্ব ব্যঞ্জনবর্ণ ফলাতে গণ্য,
সে যে স্বর ভিন্ন নয়,
স্বর হ'তে হয় দু'য়েতে মাখামাখি ॥
যারে গুরুতত্ত্ব কয়, সে যে যুক্তাক্ষর হয়।
স্বরবর্ণ-জ্ঞান বিনে যুক্ত কেহ না বুঝায় ॥" (নং ৩২৭)

এই গুরুতত্ত্বকে বাউলরা অনেক সময় 'চৈতন্যতত্ত্ব' বলে। পূর্বে ইহার আভাস দিয়াছি। চৈতন্যদেবকে বৈষ্ণব গোস্বামিগণ কৃষ্ণ ও রাধার সম্মিলিত মূর্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা বাউলদের নিকট গভীর তাৎপর্য-বোধক। কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-প্রকাশের পর বাংলার বাউলধর্ম নিঃসন্দেহে নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিল।

অনুরাগী গোঁসাই বলিতেছেন যে, এই গুরুতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য গুরু গোলোক ত্যাগ করিয়া ব্রজপুরে উপস্থিত হইয়া দ্বাপরে নন্দনন্দন-রূপে রাধার সহিত গুরুবস্তু যাজন করিলেন। কিন্তু তবুও এই সম্মিলিত স্বরূপের রস-নির্যাস আস্বাদন করিতে পারিলেন না। তখন কলিযুগে গৌর ভগবান-রূপে এই গুরুতত্ত্বকে নিত্যবস্তু-রূপে মানবদেহেই প্রকটিত করিলেন :

"গুরু বিনে আর ভজি না কারে
গুরুময় এ ত্রিসংসারে !
গুরুতত্ত্ব লাগি' গোলোক-ত্যাগী
সাধলেন গুরু ব্রজপুরে ॥
দ্বাপরেতে শ্রীনন্দনন্দন
রাধাসহ গুরুবস্তু করিল যাজন,
না হয় রস-নির্যাস-আস্বাদন,
তাই এলেন নদেপুরে ॥
গুরু কৃষ্ণ নিত্যভগবান,
আব্রহ্ম স্তম্ব গুরু নিত্যস্থান,
গুরু ব্রহ্ম, গুরু শিব,
গুরুরূপে সর্বে বিহরে ॥
কলিযুগে গৌর ভগবান
গুরুতত্ত্ব নিত্যজ্ঞানে করে বর্তমান।" (নং ৪৪৪)

ভারতের সমস্ত ধর্মেই গুরুর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইয়াছে। সাধনার দ্বারা পরীক্ষিত না হইলে ভারতে কোনো ধর্মই ধর্মের মর্যাদা পায় নাই। ধর্মের এই ব্যবহারিক অংশে বা সাধনায় যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ এবং মূল নীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত, ধর্ম-সাধনায় প্রতিপদে তাঁহাদের সাহায্য ও উপদেশ প্রয়োজন। ইঁহারাই গুরু বা তত্ত্বদর্শী আচার্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ভারতের অধ্যাত্ম-বিদ্যায় ইঁহাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতিতে গুরুর একান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধে বহু উক্তি আছে।

সাধনা যতই গূঢ়, সূক্ষ্ম ও জটিল-ক্রিয়াত্মক, ততই গুরুর উপর নির্ভরতা বেশি। সেজন্য তন্ত্রধর্ম-সাধন গুরু ছাড়া অসম্ভব। হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রে গুরুর অবিসংবাদী প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। তন্ত্রের গ্রন্থ খুলিলেই প্রথমে গুরুর আবশ্যকতা, গুরুতত্ত্ব, গুরু-লক্ষণ, গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা দেখা যায়। কোনো কোনো তন্ত্রে এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বিবৃতি ও নির্দেশ আছে। 'কুলার্ণব-তন্ত্র' তন্ত্রসাহিত্যের একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত ও আদৃত। ইহার দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ 'উল্লাস'-এ গুরুর মাহাত্ম্য, গুরুর স্বরূপ, গুরুর লক্ষণ, শিষ্যের কর্তব্য ও লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রায় তিনশত শ্লোক আছে।

এত দীর্ঘ আলোচনা অন্য কোনো তন্ত্রে দেখা যায় না। একান্ত যোগ-মূলক সাধনাতেও গুরুর সর্বোচ্চ মাহাত্ম্য কীর্তিত এবং গুরু ব্যতীত সিদ্ধি-লাভ অসম্ভব বলিয়া নির্ধারিত। নাথধর্মে গুরুই সমস্ত আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। তাহাদের ধর্ম-গ্রন্থাদিতে গুরুর স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের কবীর, দাদূ প্রভৃতি 'সন্ত'দের ধর্মমতেও গুরু ব্যতীত সাধন সম্ভবপর নয় বলিয়া নির্ধারিত। ভারতীয় ধর্ম বিশেষভাবে সাধনাত্মক বলিয়া ইহাতে গুরুর স্থান সর্বোচ্চে।

বেদের ধর্ম ও সেই শাস্ত্র গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। গুরুই শিষ্যকে বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করাইয়াছেন। উপনিষদের যুগে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যা সাধনার চরম লক্ষ্য হইলেও গুরুর মাহাত্ম্য সমানভাবে বর্তমান রহিয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম বলিতেছেন :

"আচার্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি—"

আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে বিদ্যা শিখিলে সেই বিদ্যা সর্বাপেক্ষা উপকারী হয়।[৩৯১]

মুণ্ডকোপনিষদে আছে :

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

আত্মাকে জানিবার জন্য সমিধহস্তে বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুর নিকট যাইতে হইবে।[৩৯২]

কঠোপনিষদে যমও নচিকেতাকে বলিতেছেন :

"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-
নীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।"

হীন লোক দ্বারা উপদিষ্ট হইলে এই আত্মা সুবিজ্ঞেয় হন না, যে হেতু অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রকারে চিন্তা করে। হীন আচার্য হইতে অন্য দ্বারা অর্থাৎ

৩৯১। ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৪।৮।৩
৩৯২। মুণ্ডকোপনিষৎ—১।২।১২

শ্রেষ্ঠ আচার্য দ্বারা কথিত না হইলে আত্মার বিষয় জানিবার উপায় নাই, কারণ ইনি অণু-পরিমাণ হইতেও সূক্ষ্ম এবং তর্ক দ্বারা অপ্রাপ্য। এই আত্মজ্ঞান তর্ক দ্বারা প্রাপ্য নয়, হে প্রিয়তম, অন্য কর্তৃক অর্থাৎ অভিজ্ঞ আচার্য কর্তৃক কথিত হইলে তাহা সুবিজ্ঞেয় হয়।[৩৯৩]

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে প্রণামপূর্বক প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা আত্মজ্ঞান শিক্ষা কর। জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন।[৩৯৪]

হিন্দুতন্ত্রে সাধনার মূলই গুরু এবং গুরু ও ইষ্টদেবতা বা ঈশ্বরে কোনো প্রভেদ নাই। ঈশ্বরই গুরু-রূপে সাধককে পরিচালিত করেন—এ-কথা বহুভাবে তন্ত্রে বলা হইয়াছে।

'কুলার্ণব-তন্ত্র'-এ আছে :

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিশ্চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

মনুষ্যচর্মণাবদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ম্।
সচ্ছিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্যটতি ক্ষিতৌ॥

গুরুঃ সদাশিবঃ সাক্ষাৎ সত্যমেব ন সংশয়ঃ।
শিব এব গুরুর্নোচেদ্ভুক্তিং মুক্তিং দদাতি কঃ॥

পাশবদ্ধঃ পশুর্জ্ঞেয়ঃ পাশমুক্তো মহেশ্বরঃ।
তস্মাৎ পাপহরো যস্তু স গুরুঃ পরমো মতঃ॥"[৩৯৫]

৩৯৩। কঠোপনিষৎ—১।২।৮-৯

৩৯৪। গীতা, ৪।৩৪

৩৯৫। কুলার্ণবতন্ত্র, ১২।১৩ ; ঐ, ১২।৪৫ ; ঐ, ১৩।৫৪ ; ঐ, ১৩।৬০ ; ঐ, ১৩।৯১ (Āgamānusandhān Samiti, **Arthur Avalon Tantrik Texts** –Vol. V).

'শক্তিসঙ্গমতন্ত্র'-এ আছে যে, গুরু দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে জপ, হোম পূজাদি বৃথা :

"ন জপো ন তথা হোমো ন পূজা পূর্ণতা কচিৎ।
গুরুং বিনাপি দেবেশি নাভিষেকেতু যং জপেৎ ॥"[৩৯৬]

লক্ষণ দেশিকেন্দ্রের বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থ 'শারদাতিলক'-এর প্রথমেই গুরু-বন্দনায় গুরুকে 'শিবস্বরূপ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে :

"সংসারসিন্ধোস্তরণৈকহেতুন্।
দধে গুরুন্ মূর্ধ্নি শিবস্বরূপান্ ॥
রজাংসি যেষাং পদপঙ্কজানাং।
তীর্থাভিষেকশ্রিয়মাবহন্তি ॥"[৩৯৭]

সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার হেতু শিব-স্বরূপ গুরুর চরণ মস্তকে ধারণ করি। তাঁহার পদ-পঙ্কজের ধূলিসমূহে তীর্থাভিষেকের ফল-লাভ হয়। ঐ শ্লোকের টীকায় রাঘব ভট্ট একটি তন্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, গুরুকে যে মানুষ মনে করে, তাহার জপ-পূজা সব বৃথা হয় :

"গুরুং ন মর্ত্যং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য তু।
কদাপি ন ভবেৎ সিদ্ধির্ন মন্ত্রৈর্দেবপূজনৈঃ ॥"

'যোগিনীতন্ত্র'-এ আছে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের মূলই গুরু এবং গুরু পরব্রহ্ম :

"গুরুমূলমিদং শাস্ত্রং গুরুমূলমিদং জগৎ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব শিবঃ স্বয়ম্ ॥"[৩৯৮]

'বিশ্বসারতন্ত্র'-এর অন্তর্ভুক্ত 'গুরুগীতা'য় আছে যে, গুরুই ব্রহ্ম এবং গুরুতত্ত্বে আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো সত্যবস্তু নাই।

"গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুবের ন সংশয়ঃ ॥"

'গু' শব্দে অন্ধকার এবং 'রু' শব্দে তেজ বুঝায়, অতএব অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-নাশক ব্রহ্মই গুরু, ইহাতে সন্দেহ নাই।

৩৯৬। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, ২য় খণ্ড (তারাখণ্ড)—২।৮ (বরোদা সং)

৩৯৭। শারদাতিলক—১।২৩ (Āgamanusandhān Samiti, **Arthur Avalon Tantrik Texts** —Vols. XVI, XVII).

৩৯৮। যোগিনীতন্ত্র—১।২৩ (শ্রীকালীমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও শ্রীবিপিনবিহারী বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত)

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং গুরুই পরব্রহ্ম।

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা সর্বাভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

যিনি আমার নাথ, তিনিই জগতের নাথ; যিনি আমার গুরু, তিনিই জগতের গুরু এবং যিনি আমার আত্মা, তিনিই সর্বভূতের আত্মা, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

"যজ্ঞব্রততপোদানং জপতীর্থানুসেবনং।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ।
গুরুবুদ্ধ্যাত্মনো নান্যৎ সত্যংসত্যংন সংশয়ঃ॥"

গুরুতত্ত্ব না বুঝিয়া যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, দান, জপ ও তীর্থসেবা যাহা করা যায়, সে সমস্তই নিষ্ফল হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। গুরুবুদ্ধিতে আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো সত্য বস্তু নাই, এই সত্য বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।[৩৯৯]

হিন্দুতন্ত্রে চারিপ্রকার গুরুর উল্লেখ আছে—গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্টিগুরু ও পরাৎপরগুরু। ইহারা সকলেই শিবের অংশ-স্বরূপ। ষট্‌চক্রের সর্বোচ্চ স্থানে অধোমুখ সহস্রদল-কমলের কর্ণিকা-মধ্যে মৃণাল-রূপিণী চিত্রিনী নাড়ী দ্বারা ভূষিত গুরুমন্ত্রাত্মক দ্বাদশবর্ণ-রূপী দ্বাদশদল পদ্মে 'অকথাদি' ত্রিরেখা ও কোণ দ্বারা মণ্ডিত কামকলা-ত্রিকোণে নাদবিন্দু-রূপী মণিপীঠ বা হংসপীঠের উপর শিব-স্বরূপ শ্রীগুরুর স্থিতি।[৪০০] বহুতন্ত্রে পরমতত্ত্ব বা পরমশিবকে গুরু বলা হইয়াছে। সহস্রদল কর্ণিকার মধ্যে এই শিব-রূপী গুরুর স্থান। 'নির্বাণতন্ত্র'-এ আছে:

"শিবঃপদ্মে মহাদেবস্তথৈব পরমোগুরুঃ।"

'কঙ্কালমালিনী'-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে:

"তৎকর্ণিকায়াং দেবেশি অন্তরাত্মা ততো গুরুঃ।"

৩৯৯। গুরুগীতা—শ্লোক নং ২১, ৩০, ৪২, ১১ (গোপালানন্দ ব্রহ্মচারী-সম্পাদিত, কাশী)

৪০০। পাদুকাপঞ্চকম্—১-৪ শ্লোক ও টীকা (Āgamānusandhān Samiti, **Arthur Avalon Tantrik Texts**—Vol. II).

'অন্নদাকল্পতন্ত্র'-এ আছে :

"শিরঃপদ্মে শুক্লে দশশতদলে কেশরগতে
পতত্রীণাং তল্পে পরমশিবরূপং নিজগুরুম্।"[৪০১]

সন্ত-মতেও কয়েকপ্রকার গুরুর কথা উল্লিখিত আছে। কূটস্থ ব্রহ্মের প্রকাশিত রূপই গুরুপদ। যিনি চক্রভেদ করিয়া সহস্রারে অনাহতনাদ শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি গুরুপদ বা যোগেশ্বর, তদূর্ধ্বে দ্বিতীয় মণ্ডলে বা ত্রিকূটিতে যিনি মৃদঙ্গের ন্যায় ওঁকার-নাদ শুনিয়াছেন, তিনি সাধগুরু, যিনি তৃতীয় শূন্যমণ্ডলে পৌঁছিয়াছেন, তিনি সন্তগুরু, তাহার পর যিনি চতুর্থ মণ্ডলে বা সত্যলোকে পৌঁছেয়াছেন, তিনি পরমসন্তগুরু লাভ করিয়াছেন।[৪০২]

বৌদ্ধতন্ত্রেও গুরুর এইরূপ প্রাধান্য দেখা যায়। গুরুই এই গূঢ় যোগ-মূলক কঠোর সাধনার সমস্ত তত্ত্ব ও কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনিই এই সাধনায় সিদ্ধ। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত পুঁথিপত্র-পাঠে বা অন্য প্রকারে জ্ঞানার্জন দ্বারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। ধর্ম-সাধনায় প্রধান অবলম্বনই গুরু।

'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি'তে আছে :

"অতএব সদাসক্ত্যা যুক্তং সদ্গুরুসেবনম্।
ন চ তেন বিনা তত্ত্বং প্রাপ্যতে কল্পকোটিভিঃ ॥
অপ্রাপ্যে তত্ত্বরত্নে তু সিদ্ধির্নৈব কদাচন।
সুবিশুদ্ধোঽপি সংক্ষেত্রে বীজাভাবাদ্ যথাঙ্কুরঃ ॥"[৪০৩]

গুরুর নিকট হইতেই তত্ত্বরত্ন লাভ করিতে হইবে। ভূমি উর্বর সুকর্ষিত হইলেও তাহাতে বীজ না পড়িলে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ শিষ্য উপযুক্ত হইলেও গুরু হইতে তত্ত্ব-বীজ লাভ না করিলে সে সাধনে ফললাভ করিতে পারে না।

ঐ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আর একটি সুন্দর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে :

"ধ্বস্তসান্দ্রান্ধকারস্য সন্নিধানাদ্ বিবস্বতঃ।
ধগিতি প্রজ্বলত্যুচ্চৈঃ সূর্যকান্তিমণির্যথা ॥"

৪০১। ষট্চক্রনিরূপণ-টীকায় উদ্ধৃত, পৃঃ ৫৩ (ঐ ৪০০নং পাদটীকায় উল্লিখিত সং)

৪০২। **The Nirguna School of Hindi Poetry**—Dr. Barthwal. Pages 156-159.

৪০৩। প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি, ২য় পরিচ্ছেদ—৬-৭ (বরোদা সং)

সন্নিধানাদ্ জগদ্দৃষ্টৈস্তত্ত্বযোগখরার্চিষঃ।
জ্বলত্যস্তমলধ্বান্তশিষ্যচেতোমণিস্তথা ॥"[৪০৪]

যেমন সূর্যকান্ত মণি সূর্যের কিরণ-সংস্পর্শে প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ শিষ্যের চিত্ত-রূপ সূর্যকান্তমণিও তত্ত্ব-জ্ঞানী গুরু-রূপ সূর্যের প্রখর কিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

'জ্ঞানসিদ্ধি'তে গুরুকে 'ত্রিরত্ন' ও সাক্ষাৎ 'বজ্রসত্ত্ব'-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে:

"গুরুর্বুদ্ধো ভবেৎ ধর্মঃ সঙ্ঘশ্চাপি স এব হি।
প্রসাদাদ্ জায়তে তস্য যস্য রত্নত্রয়ং বরম্ ॥"

"তৎসমো বিদ্যতে লোকে মান্যো ন ত্রিভবে জনঃ।
বজ্রসত্ত্বঃ স্বয়ং লোকে সর্বসম্পত্তয়ে স্থিতঃ ॥"[৪০৫]

এইরূপে সমস্ত বৌদ্ধতন্ত্রেই গুরুর প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-সহজিয়াদের নানা চর্যাপদেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সব গূঢ় ধর্মতত্ত্ব গুরুর নিকটেই জানিতে পারা যায়:

"বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি।" (চর্যাপদ—৮)

"সদ্‌গুরু-বোঁহেঁ জিতেল ভববল।" (চর্যাপদ—১২)

"সদ্‌গুরু-পাঅপসাএঁ জাইব পুণু জিণউরা।" (চর্যাপদ—১৪)

"গুরুবাক্ পুচি্ছআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।" (চর্যাপদ—২৮)

"জই তুম্হে লোঅহে হোইব পারগামী।
পুচ্ছ তু চাটিল অনুত্তর-স্বামী ॥" (চর্যাপদ—৫)

তোমাদের মধ্যে যাহারা ভব-নদীর পারগামী হইতে চাও, তাহারা অনুত্তর-স্বামী অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিদ্ যোগী বা সিদ্ধাচার্য ('অন্যযোগিনস্তথাবিধং ন জানন্তি পুস্তকদৃষ্টগর্বত্বাৎ'—টীকা) চাটিলকে জিজ্ঞাসা করিয়া তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ কর।

সহজিয়া-বৈষ্ণব-সাহিত্যেও এই গুরুবাদের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

৪০৪। প্রাজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি, ২য় পরিচ্ছেদ—৩০-৩১। (বরোদা সং)

৪০৫। জ্ঞানসিদ্ধি, ১ পরিচ্ছেদ—২৪,২৯ (বরোদা সং)

প্রত্যেক গ্রন্থের প্রথমেই গুরু-বন্দনা, চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভৃতির বন্দনা ইত্যাদি দেখা যায়। পদের মধ্যেও গুরুবন্দনা আছে :

"গুরু অন্ত গুরু তন্ত্র গুরু সে পূজার মন্ত্র
গুরুর মহিমা কেবা জানে ॥"

"গুরুরূপে কৃষ্ণ আপনি ভগবান।
এই কথা শুন সাধু পুরাণ প্রমাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ আপনে হন স্বয়ং শ্রীগুরু
... ...
"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে করহ সাধন।
এ তিনের কৃপা হইলে বাঞ্ছিত পূরণ ॥"

"গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে জগজ্জনে।
অতএব নরবপু করয়ে সাধনে ॥"

গুরু বিষ্ণু গুরু ব্রহ্ম গুরু যজ্ঞ দান ধর্ম
গুরু হন দেব মহেশ্বর।
গুরুকে অধিক আর কি আছে সংসার-মাঝ
গুরু দেব সর্ব-পরাৎপর ॥
... .
গোকুলের নাথ কৃষ্ণ বন্দ জোড় করি হস্ত
চন্দ-যিনি সুন্দর বদন ॥"[৪০৬]

সিদ্ধ-মার্গে বা নাথধর্মে গুরুই সমস্ত সাধনার মূল। গুরুই আদর্শ, গুরুই উপদেষ্টা, গুরুই পদ-প্রদর্শক। নাথ-মতে সদ্‌গুরুই প্রকৃত গুরু। এই সদ্‌গুরু 'অবধূত', তাঁহার বর্ণ, আশ্রম, পাপ, পুণ্য, ত্যাগ, ভোগ কিছুই নাই। তিনি সকলের অতীত। একমাত্র তিনিই শিষ্যকে পরমতত্ত্ব অধিগম করাইতে সক্ষম। পরমপদের ঠিক নিম্নেই এই গুরুর স্থান।

ইনিই 'যোগদেহ'-ধারী, জীবন্মুক্ত, সিদ্ধাচার্য। এই জন্য এইরূপ গুরু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

"ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ।"[৪০৭]

৪০৬। সহজিয়া সাহিত্য (বসু)—পদ নং ১, ২, ৫, ৯ ইত্যাদি

৪০৭। গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ (মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত, সরস্বতীভবন প্রকাশন)—পৃঃ ৩২

এইরূপ সিদ্ধগুরুর কৃপা ভিন্ন সাধনার চরমফল-লাভ বা সিদ্ধাবস্থা-লাভ সম্ভব হয় না।

"দুর্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা ॥"[৪০৮]

এইরূপ গুরু ও শিব অভিন্ন। ইনি 'নাদবিন্দুকলাত্মক'। যিনি এই শিব হইতে অভিন্ন গুরুতে নিষ্ঠা-সম্পন্ন, তিনিই নিরঞ্জনপদ অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন।

"নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুকলাত্মনে।
নিরঞ্জনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ ॥"[৪০৯]

এইরূপ গুরুকেই নাথপন্থীরা বলিয়াছে—

"... ...দেবভাবেন পরিচিন্তয়েৎ।"[৪১০]

ভারতীয় সকল ধর্মেই বিশেষতঃ তন্ত্রধর্ম ও যোগধর্মে গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মাহাত্ম্য, সদ্‌গুরুর লক্ষণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত গুরু বলিতে ভারতের সকল ধর্মই পরমতত্ত্ব, ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর বা ঈশ্বর-স্বরূপ শিব বা কৃষ্ণকে বুঝাইয়াছে। তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। তবে তাঁহার অনুগৃহীত, তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান-বিশিষ্ট, তৎসাধর্ম্যাপন্ন ও জীবন্মুক্ত পুরুষও ঐরূপ সদ্‌গুরু হইতে পারেন। তাঁহার অপেক্ষা ভগবদুপলব্ধিতে কম অগ্রসর, অথচ তত্ত্ববিদ্যা-সমন্বিত গুরুই সাধারণ গুরুপদ-বাচ্য। ইহার নিম্নের গুরু সাধারণ লৌকিক গুরু বা নিকৃষ্ট গুরু, তিনি গুরুপদবাচ্য নন। তাহা হইলে গুরু বলিতে তিনপ্রকার গুরু বুঝায়। স্বয়ং পরমেশ্বর বা সাধনার দ্বারা তাঁহার গুণ-সম্পন্ন ও তৎকৃপা-প্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষ—ইহারাই সদ্‌গুরু। আর ক্রিয়াবান, সাধক ও জ্ঞানীও গুরুপদ-বাচ্য হইতে পারেন। তাহা হইলে গুরুপদের অধিকারী দেবতা, সিদ্ধ ও মনুষ্য তিনই হইতে পারেন।[৪১১]

৪০৮। হঠযোগ-প্রদীপিকা (বসুমতী সং) ৪।৫—পৃঃ ১২০

৪০৯। ঐ ৪।১—পৃঃ ১১৭

৪১০। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ (সরস্বতীভবন প্রকাশন)—৫।৮

৪১১। গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য—মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ, ।, বৈশাখ, ১৩৫০ —পৃঃ ৩১১,৩১২

মূলে গুরু কোনো মানবদেহধারী গুরু নন, ইনি স্বয়ং আত্মা। সাধনের প্রথম অবস্থায় বা তাহার পরবর্তী অবস্থায় গুরুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং সিদ্ধসাধক শিষ্যকে সাধনপথে অনেকখানি অগ্রসর করাইতে পারেন মাত্র, কিন্তু আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি নিজের দ্বারাই সম্ভব। বাউলধর্মও গুরু বলিতে বিশেষভাবে পরমতত্ত্ব বা আত্মাকে বুঝাইয়াছে। এই আত্মোপলব্ধির পথে যিনি পথপ্রদর্শক, আত্মার প্রতিনিধি-স্বরূপ সেই মানব-গুরুকে ভক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মূল-আর্তি বা শরণাগতি আত্মা বা ভগবানের নিকটই প্রকাশ করা হইয়াছে। লালন সেই 'অচিন জন'কেই 'পীরের পীর' বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেও সকল গুরুকৃপার মূলই কৃষ্ণ-কৃপা বলা হইয়াছে:

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥ (চৈ, চ, মধ্যের ২২পঃ)

বৌদ্ধ সহজিয়াদেরও দেখা যায় যে তাহারা সাধন-মার্গে সিদ্ধাচার্যদের এবং বজ্রগুরুদের একমাত্র কাণ্ডারী মনে করিলেও সেই চরম 'সহজ' অবস্থা একমাত্র সাধকের উপলব্ধিগম্য, গুরু তাহা জানাইতে পারেন না—এই ধারণা পোষণ করিত।

"আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কহিব কীস॥
জে তেঁই বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল॥" (চর্যাপদ ৪০ নং)

গুরু বৃথাই শিষ্যকে উপদেশ দেন, কারণ 'সহজ' অবস্থা কথার দ্বারা বুঝান যায় না ('কথাবেদ্য ন ভবতি')। তবুও যদি কেহ এই 'সহজ' ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহা অপব্যাখ্যাই হইবে। ইহা বুঝাইবার ভাষা নাই বলিয়া গুরু বোবা, আর গুরুর নিকট হইতে শুনিয়া ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না বলিয়া শিষ্য কালা। 'সহজ' আত্ম-স্বরূপ বা আত্ম-তত্ত্ব। ইহা নিজস্ব উপলব্ধি দ্বারাই অধিগম্য। তিল্লোপাদের একটি দোঁহায় আছে,—

"হাঁউ জগু হাঁউ বুদ্ধ হাঁউ নিরঞ্জন।"[৪১২]
আমিই বিশ্ব—আমিই বুদ্ধ—আমিই নিরঞ্জন।

৪১২। তিল্লোপাদের 'দোহাকোষ' (বাগচী সং—নং ১৬)

মূল মানবদেহের গৌরব : ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ ॥

এই মানব-জীবন ও মানব-দেহকে বাউলরা পরম সম্পদ বলিয়া মনে করিয়াছে। র সাধনার মূল আশ্রয়ই দেহ। বাউলরা দেব-দেবীর অস্তিত্ব 'অনুমান' মাত্র করে; মানুষ দেবতার পূজা, ধ্যান-জপাদির দ্বারা অর্জিত পুণ্যে স্বর্গবাস বা পরকালে উত্তম গতি লাভ করিবে, ইহা তাহাদের নিকট অবিশ্বাস্য। ই মানব-দেহের মধ্যেই মূলতত্ত্ব আত্মা বা ভগবানের বাস। এই মানব-দেহকে করিয়া সাধন-ভজন করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করাই তাহাদের চরম লক্ষ্য। মানব-দেহাশ্রিত সাধনাই তাহাদের 'বর্তমান'।

মানব-জীবন তাহাদের কাছে অত্যুচ্চ মূল্য বহন করে। কারণ, এই মানব-জীবনে যে দেহলাভ করা গিয়াছে, তাহাই তাহাদের আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র। দেহের মধ্যে তাহারা ব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করিয়াছে,—ইহার মধ্যে আকাশ, দ্র, পর্বত, অরণ্য, নদী প্রভৃতি সবই বর্তমান। এই দেহের মধ্যেই পরম-বা তাহাদের 'মনের মানুষ' অবস্থান করিতেছেন। এই দেহই তাহাদের উপলব্ধির সোপান। নর-নারীর গভীর প্রেম-মিলনের মধ্য দিয়াই তাহারা রম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে উপনীত হয়। তাহাদের আদি-গুরু চণ্ডীদাসের "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—তাহারা ধ্রুবতারার তা অনুসরণ করিয়াছে এবং ইহাকে সার্থকভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছে।

এই মানব-জীবনের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে লালন বলিতেছেন :

"দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে ॥
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছে এই মানব-তরণী।
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে ॥
এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন
তাইতো মানুষরূপ গঠলে নিরঞ্জন।" (নং ১)

মানবজন্ম-লাভ বহু সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। মাধুর্য-ভজন বা প্রেম-মূলক উপাসনার মূল আশ্রয়ই এই নরদেহ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে :

"যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং ॥"[৪১৩]

"ভগবান স্বীয় চিচ্ছক্তির সামর্থ্য দেখাইবার জন্য যাহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহারও চমৎকৃতিকর, যাহা সৌন্দর্যরাশির পরাপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আকরস্বরূপ, এবং স্ব-স্বরূপভূত কৌস্তুভমকরকুণ্ডলাদিরও পরম শোভাসম্পাদক, সেই নরাকৃতি শ্রীমূর্তি বিচিত্র নরলীলার অতীব যোগ্য।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহারই সংকেত লইয়া বলিয়াছেন :

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ!"[৪১৪]

বাউলদের কাছে ভগবান মানুষের হৃদয়-বিহারী আত্মা বা কৃষ্ণ-রূপে মানব-দেহে রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। একা একা মাধুর্যরস-আস্বাদন হয় না, তাই নিজেকে নর এবং নারীরূপে বা পুরুষ-প্রকৃতিরূপে বিভক্ত করিয়াছেন :

"পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে জোড়া।
দুইতনু এক আত্মা কভু নহে ছাড়া ॥"[৪১৫]

মাধুর্যময় যুগল-ভজনের মূলই এই নরদেহ, সুতরাং বাউল ইহাকে পরম শ্রদ্ধা ও পরম বিস্ময়ের চোখে দেখিয়াছে এবং নর-জন্মকে সার্থক মনে করিয়াছে।

লালন আর একটি গানে বলিতেছেন যে, দেহের অস্থি-চর্ম স্বর্ণময়, ইহার মধ্য দিয়াই মহারস বা আনন্দামৃত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহার একবিন্দুর মধ্যে সিন্ধু লুক্কায়িত। এই রসের সাধনের দ্বারাই দ্বিদলে 'রূপের ঝলক' দেখা যায়। কিন্তু এই রস-সাধনায় পূজা-উপাসনা প্রভৃতি অন্য ভজন-পদ্ধতি নাই। কেবল দেহের সাধনই একমাত্র পথ। তীর্থ-ধর্ম, বার-ব্রত, পূজা-জপ-তপ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নাই। সমস্তই এই দেহেতে মিলে—এই দেহের সাধনই সর্বসাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা।

৪১৩। শ্রীমদ্ভাগবত—৩।২।১২ ৪১৪। চৈ-চ—মধ্য—২১

৪১৫। নগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী (রাগাত্মিকা পদের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত)—বসু

"উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্ব-সার
তীর্থ-ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে ॥" (নং ১৩১)

নানা দেশ অতিক্রম করিয়া লোকে তীর্থ বা হজ্জ করিতে যায় মক্কায়, কিন্তু তাহাদের পরিশ্রম বৃথা, কারণ মক্কা তো মানব-দেহের মধ্যেই আছে। এই হৃ-মক্কায়, 'কাবা'-গৃহের আদি ইমাম তো সেই মহামহিমান্বিত 'মিঞা-সাহেব'—অর্থাৎ স্বয়ং খোদা :

"আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখ না রে মন ভেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপায়ে ॥
দশ-দুয়ারী 'মানুষ'-মক্কা,
গুরুপদে ডুবে দেখ গা
ধাক্কা সামলায়ে ॥
ফকির লালন বলে, সে যে গুপ্ত মক্কা,
আদি ইমাম সেই মিঞে ॥" (নং ৪৩)

রাধাশ্যাম বলিতেছেন যে, দেহতত্ত্ব না জানিলে ভজন-সাধন সার্থক হইতে পারে না। এই দেহের মধ্যে সপ্তলোক, সপ্তপাতাল, সপ্তসাগর, সপ্তদ্বীপ প্রভৃতি আছে। তাহার অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আর বিশেষভাবে দেহের কোথায় পরম গুরু বা পরমাত্মা বিরাজ করেন, তাহাও জানা দরকার। বাউলধর্মের মূল সাধনাটি যোগক্রিয়া-মূলক, সুতরাং দেহতত্ত্বের জ্ঞান অত্যাবশ্যক :

"আগে দেহের খবর জান গে রে মন,
তত্ত্ব না জেনে কি হয় সাধন।
দেহে সপ্ত সর্গ, সপ্ত পাতাল
চৌদ্দ ভুবন কর ভ্রমণ ॥
দেখ না খুঁজে, কোথায় বিরাজে
তোর পরমগুরু আত্মারাম ॥ (নং ২১৩)

পাঞ্জশাহ্‌ বলিতেছেন যে, এই নর-দেহের মধ্যেই আল্লা বাস করিতেছেন।

এই আদম-মঞ্জিল ছাড়া আল্লা স্বর্গে আছেন বা অন্য কোথাও আছেন যাহারা বলে, তাহারা শয়তানের কৌশলে মুগ্ধ। এই দেহের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া এই দেহের মধ্যেই সাঁইকে পাইবার চেষ্টা করিলে সাধন সার্থক হইবে এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন এড়াইতে পারা যাইবে :

"আদমেতে আল্লা আছে মিলে।
মোকাম-মঞ্জিল এই দেহেতে দিয়াছে সাঁই, হায় গো,
দেহ ছাড়া আল্লা জানে শয়তানি ভোলে ॥
যে ভাবেতে আল্লা সাঁই, আদমেতে আছে ভাই, হায় গো,
না জেনে কিনার নাই, বন্দেগী করিলে ॥"
দেহ চিনে সাঁই ধর, পার পাবা পারাপার, হায় গো,"...
(নং ২৫১)

অনন্ত গোঁসাই বলিতেছেন যে, এই চোদ্দ-পোয়া বা সাড়ে তিনহাত মানব-দেহ ইহার নির্মাতার অপূর্ব কৌশলের নিদর্শন, ইহার মধ্যে চৌদ্দ ভুবন রহিয়াছে :

"কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিগর,
ঘরের মাপ চৌদ্দ পোয়া,
চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর ॥" (নং ৩১৬)

বর্ধমানের বাউল নবদ্বীপ দাস বলিতেছেন যে, আত্ম-চৈতন্যের মূলই এই দেহ, এই দেহ-ধারী নিজেকে জানিতে পারিলেই সর্বকার্য সিদ্ধ হইবে। এই দেহ-ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের বহু বস্তু বর্তমান এবং এই সাড়ে তিনহাত দেহের ভিতর জীবন্ত শক্তি বিরাজ করিতেছে :

"সচেতনের আপনি মূলাধার,
আমি কে, তা জানতে পারলে
পাবি রে নিস্তার।
এই ভাণ্ডের ভিতর কত ব্রহ্মাণ্ড,
খুঁজছিস অনাহুত জীবন ভর ॥
এই চৌদ্দপোয়া দেহেরি ভিতর
স্থূল-সূক্ষ্ম জীব বহুতর,
ঘরের ভিতর কয়ে আছে ঘর ;" (নং ৫০৮)

জমির সঙ্গে এই মানব-দেহের তুলনা বাউল-গানের বহু-প্রচলিত প্রথা। বাউ

কালাচাঁদ পাগল বলিতেছেন যে, এই দেহ-জমি কল্পভূমি-স্বরূপ। ইহাতে উপযুক্ত সময়ে চাষ করিতে পারিলে আকাঙ্খিত বস্তু লাভ করা যায়। গুরু-বীজ রোপণ করিলে যথাসময়ে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং শেষে ফল জন্মে :

"মানবদেহ কল্প-ভূমি
যত্ন করলে রত্ন ফলে।
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে
শুভযোগে চাষ করিলে ॥
… … …
এই জমি তোর চৌদ্দ-পোয়া,
ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া,
মন্ত্র-বীজে নে স্বজে,
গাছ হলে বীজ জন্মে মূলে ॥" (নং ৩৮৫)

এই দেহের মধ্যেই পরমতত্ত্ব বা পরমগুরু বা ভগবানের বাস—ইহা বাউল-ধর্মের মূলতত্ত্ব। সুতরাং তাঁহাকে পাইবার জন্য দেহকেই অবলম্বন ধরিতে হইবে—দেহের মধ্যেই তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে। দেহের বাহিরে মন্দিরে বা মসজিদে বা ধর্ম-শাস্ত্রাদিতে বা অন্য কোনো মূর্তিতে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না।

এই মানব-মূর্তিই ভগবানের প্রকৃত মূর্তি। সুফীদের বাণী—'ভগবান মানুষকে নিজের আকৃতি অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন' এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'নরবপু তাহার স্বরূপ' প্রভৃতি লালনের উপর যুগপৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে :

"ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়।
আপন ঘর না বুঝে
বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধাঁয় ॥
আমি সত্য না হইলে
গুরু সত্য হয় কোন্ কালে।
আমি যে রূপ
দেখ না সে রূপ
দীন দয়াময় ॥" (নং ৫৫)

যাদুবিন্দু বলিতেছেন যে, জগৎ-পিতাকে দেহ-মন্দিরে খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে তিনি বাণীহীন মধুর ইঙ্গিতাত্মক ভাষায় তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিতেছেন :

"মেলে তায় খুঁজলে আপনার দেহ-মন্দিরে।
ও সেই জগৎপিতা কচ্ছে কথা
অতি মিষ্ট মধুর স্বরে ॥" (নং ১৮৪)

নিজেকেই নিজে চিনিতে হইবে—'আত্মানং বিদ্ধি'—ইহাই সাধনার মূল কথা। নিজের দেহ না খুঁজিয়া তীর্থস্থানে ভগবানকে খোঁজাখুজি বৃথা। মক্কায় খলিলুল্লা-নির্মিত কাবা-গৃহে না গিয়া দেহ-কাবাই আগে অন্বেষণ করা উচিত। উত্তরবঙ্গের লালন-শিষ্য দুদ্দু বলিতেছেন :

"আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে।
... ...
কাবার কি নিরিখ নিরূপণ—
নিজের কাবাই নাই অন্বেষণ,
খলিলুল্লার কাবায় কি কখন
খোদাকে কেউ পায় দেখিতে।
খলিলুল্লার কাবা রে ভাই,
সে কাবা পিছেতে হয়,
আদম-কাবাই দেখ না, রে মন, আগে চেয়ে,"—(নং ১৮৮)

লালন বলিতেছেন, পরমেশ্বর দেহেই আছেন, কিন্তু লালন তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না :

"আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
তারে জনম-ভর একবার দেখলাম না রে ॥
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে,
দেখতে পাইনে এ নয়নে,
হাতের কাছে যার
ভবের হাট-বাজার
ধরতে গেলে পাইনে তারে ॥" (নং ৩৭)

"কথা কয়রে
দেখা দেয়না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম-ভর মেলে না।

খুঁজি তারে আসমান-জমি,
আমারে চিনিনে আমি
একি বিষম ভুলে ভ্রমি—
আমি কোন্‌জন, সে কোন্ জনা ॥" (নং ৩১)

আমি একদিও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশী-নগর,
এক পড়শী বসত করে।
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে ॥ (নং ৪০)

যে-সব ধর্মে অল্প-বিস্তর যোগের ক্রিয়া আছে, তাহাদের সাধনা দেহ-কেন্দ্রিক। হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রে দেহকে অবলম্বন করিয়া সাধনার ব্যবস্থা আছে, সিদ্ধমার্গ বা নাথ-পন্থে একান্তভাবে দেহকে সাধনার কেন্দ্র করা হইয়াছে। দেহের মধ্যে পরমতত্ত্ব বা শিব বা পরমাত্মার বাস, দেহের মধ্যে মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, সপ্ত অধঃলোক বা পাতাল এবং সপ্ত উর্ধ্বলোক, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর, সপ্তপর্বত প্রভৃতি কল্পিত ও নির্ধারিত হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এই দেহেই আছে—"যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাই আছে এই দেহ-ভাণ্ডে।" এই 'ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ' বা 'পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ' বা দেহ-তত্ত্বই যোগ-মার্গী সাধক-সম্প্রদায়ের মূল জ্ঞানের বিষয়।

হিন্দুতন্ত্রে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া পর পর ছয়টি চক্র ও তৎসন্নিহিত পদ্ম, এবং ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি বহুনাড়ীর কল্পনা করা হইয়াছে। সর্বনিম্ন-চক্র বা মূলাধার-চক্রে সৃষ্টি-রূপা কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুপ্তা আছেন। এই কুণ্ডলিনীকে প্রাণ-অপান-বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা জাগ্রত করিয়া সুষুম্নার মধ্য দিয়া ক্রমাগত উর্ধ্বে লইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত করাইলে এবং ষট্-চক্রের উর্ধ্বে সহস্রারে পরমশিবের সহিত তাহার মিলন ঘটাইতে পারিলে স্থূল জীবশক্তি ত্রিগুণাতীত পরম অবস্থা বা 'ব্রাহ্মীস্থিতি' লাভ করিতে পারে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও চারিটি চক্রের কল্পনা করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইবে।

এই দেহের মধ্যেই যে পরমতত্ত্বের বাস এবং দেহকে অবলম্বন করিয়াই যে সাধনা করিতে হইবে, ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, নাথ-যোগী, সহজিয়া-বৈষ্ণব,

সুফী-সম্প্রদায়, বাউল প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করিয়াছে এবং দেহকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের সাধনার ধারা অগ্রসর হইয়াছে।

'শিবসংহিতা'য় বলা হইয়াছে :

"বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া ॥"

বিন্দু হইতেছেন শিবস্বরূপ এবং রজঃ শক্তিস্বরূপ; উভয়ের মিলন হইলে স্বয়ং আত্মা জড়-রূপিণী নিজশক্তি দ্বারা বহুরূপে প্রকাশমান হন।

আরো বলা হইয়াছে যে, 'পঞ্চভূতবিনির্মিত' এই দেহকেই ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়।[৪১৬]

এই দেহ-রূপ ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত দ্রব্যই বর্তমান রহিয়াছে :

"দেহেঽস্মিন্ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তন্তে পীঠদেবতাঃ ॥
সৃষ্টিসংহারকর্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে ॥" [৪১৭]

এই মনুষ্য-শরীরে সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরু-পর্বত, নদ-নদীসমূহ, সমুদ্রসকল, পর্বতসমূহ, ক্ষেত্রসমূহ, ক্ষেত্রপালগণ, ঋষি-মুনিবর্গ, গ্রহ-নক্ষত্রকুল, পুণ্যতীর্থসকল, পীঠ-স্থানসমূহ ও পীঠ-দেবতাগণ অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই শরীরে সৃষ্টি-সংহারকারী রবি-শশী সর্বদা ভ্রমণ করিতেছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী —এই সকলও এই শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। মোট কথা, ত্রিলোকের মধ্যে যে সকল দ্রব্য যে ভাবে আছে, দেহের মধ্যেও সেই সব দ্রব্য মেরু অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিয়া স্ব স্ব কর্ম নির্বাহ করিতেছে।

পরমহংস ব্রহ্মানন্দ-গিরির 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী' গ্রন্থে মনুষ্য-শরীরে বিবিধ বস্তুর সংস্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে :

৪১৬। শিবসংহিতা, ১।৯৮।৯৭ (বসুমতী সং)
৪১৭। শিবসংহিতা, ২।১—৪ (বসুমতী সং)

"ক্ষিতিশ্চ বারি তেজশ্চ বায়ুরাকাশমেব চ।
স্থৈর্যং গতা ইমে পঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরে এব চ॥"

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি ভূত বাহিরে ও দেহাভ্যন্তরে স্থির হইয়া আছে।

বাহিরের এই পাঁচটি ভূত দেহের মধ্যে কি কি রূপে অবস্থান করিতেছে, অর্থাৎ ইহাদের কি কি গুণ দেহের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার বর্ণনা এইরূপ :

"অস্থি চর্ম তথা নাড়ী লোম মাংসস্তথৈব চ।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা পৃথিব্যাঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ॥
মলমূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোণিতমেব চ॥
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা আপস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা প্রমোহঃ ক্ষান্তিরেব চ।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তাস্তেজস্তত্র ব্যবস্থিতম্॥
বিরোধাক্ষেপণাকুঞ্চধারণং তর্পণং তথা।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা মারুতে চ ব্যবস্থিতাঃ॥
রাগো দ্বেষশ্চ মোহশ্চ ভয়ং লজ্জা তথৈব চ।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা আকাশে চ ব্যবস্থিতাঃ॥"

অস্থি, চর্ম, নাড়ী, লোম ও মাংস এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ (অর্থাৎ অবস্থা বা বিকার) বলিয়া খ্যাত এবং পৃথিবীতে অবস্থিত আছে। মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা ও শোণিত—এই পাঁচটি জলের গুণ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মোহ ও ক্ষান্তি—এই পাঁচটি তেজের গুণ; বিরোধ, আক্ষেপণ, আকুঞ্চন, ধারণ ও তৃপ্তি—এই পাঁচটি বায়ুর গুণ; রাগ, দ্বেষ, মোহ, ভয় ও লজ্জা—এই পাঁচটি আকাশের গুণ।

অন্যান্য তন্ত্রেও প্রায় এইরূপ বর্ণনাই আছে, তবে একটু-আধটু পরিবর্তন দেখা যায় মাত্র।

শরীরস্থ বায়ুর অবস্থান এইরূপ :

"প্রাণাপান-সমানাশ্চোদান-ব্যানৌ চ বায়বঃ।
নাগঃ কূর্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥
এতে দশগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্বে প্রাণসমাত্মকাঃ।
হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে॥

সমানো নাভিদেশে চ উদানঃ কণ্ঠদেশতঃ।
ব্যানঃ সর্বশরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ ॥
নাগঃ কূর্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
এতে নাড়ীসহস্রেষু বর্তন্তে জীবরূপিণঃ ॥"

প্রাণ, অপান. সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই দশটি বায়ুর গুণ বলিয়া কথিত। ইহারা সকলেই প্রাণের তুল্যরূপ অর্থাৎ প্রাণবায়ুর অবস্থা বিশেষ। প্রাণ বায়ু সর্বদা হৃদয়ে অবস্থিত, গুহ্যদেশে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্ব-শরীরে ব্যান বায়ু বর্তমান। এই পঞ্চ বায়ুই প্রধান। নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—জীব বা চৈতন্যস্বরূপ এই পাঁচটি বায়ু সহস্র নাড়ীর মধ্যে পাঁচটি নাড়ীতে অবস্থান করে।[৪১৮]

'শারদাতিলক'-এ বলা হইয়াছে যে, ললাট, উরঃ, স্কন্ধ, হৃদয়, নাভি, ত্বক ও অস্থিতে নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অবস্থিতি।[৪১৯]

শরীরের সপ্ত পাতালের বর্ণনা এইরূপ :

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
... ...
পাদাধস্ত্বতলং বিদ্যাৎ তদূর্ধ্বং বিতলং তথা।
জানুনোঃ সুতলঞ্চৈব তলং চ সন্ধিরন্ধ্রকে ॥
তলাতলং গুদ (লফ) মধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলম্।
পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্ বুধঃ ॥"

ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত পদার্থ বর্তমান আছে, সে সমস্ত দেহের মধ্যেও আছে। পণ্ডিতগণ পাদের অধোভাগকে অতল বলিয়া জানেন, উহার ঊর্ধ্বভাগ বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, সন্ধি-রন্ধ্রে তল, গুদমধ্যে তলাতল, লিঙ্গ-মূলে রসাতল, পাদের অগ্রভাগ ও কটির সন্ধি-স্থলে পাতাল দর্শন করেন।

শরীরের সপ্তলোক এইরূপ :

"ভূর্লোকো নাভিদেশেতু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি।
স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি ॥

৪১৮। শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী, ১।৭, ৮, ৯ (আর্থার এভেলনের আগমানুসন্ধান সমিতি সং—পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত)

৪১৯। শারদাতিলক—রাঘব ভট্ট কৃত টীকা (আর্থার এভেলন প্রকাশিত)—পৃঃ ৪১

জনলোকস্তদূর্ধ্বঞ্চ তপোলোকো ললাটকে।
সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দশ ॥"

নাভিদেশে ভূর্লোক, হৃদয়ে ভুবর্লোক, কণ্ঠদেশে স্বর্লোক, চক্ষুদ্বয়ে মহর্লোক, তাহার ঊর্ধ্বভাগে অর্থাৎ ভ্রূ-দ্বয়ে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহাযোনিতে অর্থাৎ মস্তকস্থ সহস্রারে সত্যলোক—এই সপ্তপাতাল ও সপ্তলোক মিলিয়া দেহ-মধ্যে চতুর্দশ ভুবন বিরাজমান রহিয়াছে।

দেহের সপ্তপর্বত এইরূপ :

"ত্রিকোণে চ স্থিতো মেরুরূর্ধ্বকোণে চ মন্দরঃ।
কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে হিমালয়ঃ।
বিন্ধ্যো বিষ্ণুস্তদূর্ধ্বে চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ ॥

দেহের ত্রিকোণে মেরু পর্বত, ঊর্ধ্বকোণে মন্দর, দক্ষিণকোণে কৈলাস, বামকোণে হিমালয়, ঊর্ধ্বভাগে বিন্ধ্য ও বিষ্ণু পর্বত—এই সাতটি কুল-পর্বত বর্তমান।

'ত্রিকোণ' বলিতে মূলাধার-চক্রের মধ্য-স্থলে যে ত্রিকোণ, তাহাই বিবক্ষিত বলিয়া মনে হয়। কারণ তন্ত্রান্তরে মূলাধার-চক্রের বর্ণনায় বলা হইয়াছে :

"ত্রিকোণমধ্যে তদ্বাহ্যে পশ্চাৎপূর্বং বরাননে।
স্থাবরং পর্বতং পশু কীটং পশুমনুত্তমম্ ॥"

'শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী'র বিবৃতিতে কিন্তু কুলপর্বতের সংখ্যা সাতটি পূর্ণ হয় নাই, একটি কম আছে। সপ্তকুলাচলের নাম ও স্থিতির অন্যরূপ বর্ণনাও কোনো কোনো তন্ত্রে পাওয়া যায় :

"ত্রিকোণবাহ্যে গিরিজে পর্বতং বহুরূপকম্
নীলাচলং মন্দরাখ্যং পর্বতং চন্দ্রশেখরম্।
হিমালয়ং সুবেলঞ্চ মলয়ং ভস্মপর্বতম্
চতুষ্কোণে বসেদ্ দেবি! এতৎ সপ্তকুলাচলম্ ॥"

('প্রাণতোষণী' ধৃত বচন, ঐ ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

পুরাণেও এই নামের একটু পরিবর্তন আছে। মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের মতে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পরিয়াত্র—এই সাতটি কুলপর্বত। মতান্তরে হিমালয়কে লইয়া আটটি।

দেহের সপ্তদ্বীপ এইরূপ :

"অস্থিস্থানে মহেশানি! জম্বুদ্বীপো ব্যবস্থিতঃ।
মাংসেষু চ কুশদ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শিরাসু চ ॥

শাকদ্বীপঃ স্থিতো রক্তে প্রাণিনাং সর্বসন্ধিষু।
তদূর্ধ্বং শাল্মলিদ্বীপঃ প্লক্ষশ্চ লোমসঞ্চয়ে।
নাভৌ চ পুষ্করদ্বীপঃ সাগরাস্তদনন্তরম্॥"

জীবগণের অস্থি স্থানে জম্বুদ্বীপ, মাংসে কুশদ্বীপ, শিরাসমূহে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, রক্তে শাকদ্বীপ, উহার ঊর্ধ্বভাগে প্রাণিগণের সমস্ত সন্ধিদেশে শাল্মলী দ্বীপ, লোমপূর্ণ স্থানে প্লক্ষদ্বীপ এবং নাভিতে পুষ্কর দ্বীপ বর্তমান।

দেহের সপ্তসাগরের বর্ণনা এইরূপ:

"লবণোদস্তথা মূত্রে শুক্রে ক্ষীরোদসাগরঃ।
মজ্জা দধিসমুদ্রশ্চ তদূর্ধ্বং ঘৃতসাগরঃ॥
বসাপঃ সাগরঃ প্রোক্ত ইক্ষুঃ স্যাৎ কটিশোণিতম্।
শোণিতেষু সুরাসিন্ধুঃ কথিতাঃ সপ্তসাগরাঃ॥"

মূত্রে লবণসমুদ্র, শুক্রে ক্ষীরোদসাগর, মজ্জা দধিসাগর, তাহার ঊর্ধ্বভাগ অর্থাৎ চর্ম ঘৃতসাগর, বসা জলসাগর, কটিরক্তে ইক্ষুসাগর এবং শোণিতে সুরাসাগর অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দেহে নবগ্রহের অবস্থান এইরূপ:

"নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্যো বিন্দুচক্রে চ চন্দ্রমাঃ॥
লোচনে মঙ্গলঃ প্রোক্তো হৃদি সোমসুতস্তথা।
উদরে চ গুরুশ্চৈব শুক্রে শুক্রস্তথৈব চ॥
নাভিচক্রে স্থিতো মন্দো মুখে রাহুঃ স্থিতঃ সদা।
পাদে নাভৌ চ কেতুশ্চ শরীরে গ্রহমণ্ডলম্॥"

নাদচক্রে সূর্য অবস্থিত, বিন্দুচক্রে চন্দ্র, চক্ষুতে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, উদরে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিচক্রে শনি, মুখে রাহু এবং পদ ও নাভিতে কেতু—শরীরে নবগ্রহ এই ভাবে অবস্থিত।[৪২০]

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেও দেহের মধ্যেই যে পরমতত্ত্বের অবস্থিতি এবং এই দেহেই যে নানা তীর্থ, নদ-নদী প্রভৃতি সমস্ত জাগতিক বস্তু বিদ্যমান, তাহা তাহাদের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। দেহই তাহাদের সাধনার একমাত্র আশ্রয়-স্থল।

'হেবজ্রতন্ত্র'-এ উক্ত হইয়াছে যে, দেহ ব্যতীত সাধনার চরম লক্ষ্য যে

৪২০। শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী, ১।১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৬ (অর্থাৎ এভেলনের আগমানুসন্ধান সমিতি সং)

হাসুখোপলব্ধি, তাহা লাভ করা যাইবে না।[৪২১] 'শ্রীকালচক্রতন্ত্র'-এ কথিত ইয়াছে যে, দেহ ব্যতীত সিদ্ধি সম্ভব নয় এবং এ-জন্মে পরমসুখ-লাভও সম্ভব -।[৪২২] সরহপাদ বলিয়াছেন যে, পরমতত্ত্ব বা সত্য দেহের মধ্যেই অবস্থিত :

"ঘরেঁ অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেকখই পড়িবেসী পুচ্ছই ॥
সরহ ভণই বঢ় জাণউ অপ্পা।
ণউ সো ধেঅ ণ ধারণা জপ্পা ॥"[৪২৩]

রমতত্ত্ব ঘরেই আছে, কিন্তু তুমি কেবল বাহিরে তাহার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ। তামার প্রিয় বা স্বামীকে ভিতরেই দেখিতেছ, অথচ সে কোথায় আছে বলিয়া তামার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। সরহ বলিতেছেন, ওরে মূর্খ, আত্ম-ত্ত্বকে জান, সত্য, ধ্যান-ধারণার দ্বারা, বা ধারণীরূপে দেহে ধারণ করিলে, বা াপের দ্বারা, পাওয়া যাইবে না।

"পণ্ডিঅ অঅল সথ বক্‌খাণই।
দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ন জানই ॥"[৪২৪]

ণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহারা জানেনা যে, দেহেই বুদ্ধ করে।

"অসরীর কোই সরীরহি লুকো।
জো তহি জাণই সো তহি মুক্কো ॥"[৪২৫]

শরীরী কেহ শরীরে লুক্কায়িত আছে, যে তাহা জানে, সে-ই মুক্তি লাভ করে।

"এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গা-সাঅরু।
এথু সে পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু ॥

৪২১। "দেহাভাবে কুতঃ সৌখ্যম্‌......"ইত্যাদি
হেবজ্রতন্ত্র (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি পাণ্ডুলিপি নং ১১৩১৭)—পৃঃ ৩৬(ক)

৪২২। "কায়াভাবে ন সিদ্ধির্ন চ পরমসুখং প্রাপ্যতে জন্মনীহ।"
(শ্রীকালচক্রতন্ত্র, পাণ্ডুলিপি, Obscure Religious cuts গ্রন্থে উদ্ধৃত—পৃঃ ১০৪)

৪২৩। 'দোহাকোষ' (বাগচী সং ও শাস্ত্রীর টীকা)

৪২৪। —ঐ—

৪২৫। —ঐ—

খেত্ত পীঠ উপপীঠ এথু মই ভমই পরিট্ঠিও।
দেহাসরিসঅ তিথ মই সুহ অন্ন ণ দীটিঠও॥"৪২৬

এখানে অর্থাৎ এই দেহের মধ্যে গঙ্গা ও যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর, এইখানেই প্রয়াগ ও বারাণসী, এইখানেই চন্দ্র ও সূর্য, এখানেই নানা তীর্থক্ষেত্র এবং পীঠ ও উপপীঠ ; দেহ-সদৃশ তীর্থ ও সুখভূমি আমি আর কোথাও দেখি নাই।

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআলীলে পার করেই॥"৪২৭

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে এক নৌকা বাহিত হয়, তাহাতে নিমজ্জিতা প্রমত্তা হস্তিনী অনায়াসে যোগীকে পার করে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে চারিটি চক্র ও পদ্ম এবং চারিটি 'কায়'-এর কথা বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর স্থলে তাহাদের ললনা, রসনা ও অবধূতী নাড়ীর উল্লেখ আছে। হিন্দুতন্ত্রে এক-একটি চক্রে যেমন শক্তিদেবীদের অধিষ্ঠান বর্ণিত আছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও সেইরূপ শক্তিদেবীর বর্ণনা আছে। এ-বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

বৈষ্ণব-সহজিয়া-সাহিত্যেও দেহের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে এবং দেহের মধ্যে নানা পদ্ম এবং বিশেষ করিয়া সরোবর কল্পিত হইয়াছে। ইহাদের সাধনাও দেহকে আশ্রয় করিয়া এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক ও বৈষ্ণব-সহজিয়াদের মূল সাধনাংশে কোনো প্রভেদ নাই। 'রত্নসার' গ্রন্থে আছে :

"ভাণ্ডকে জানিলে জানি ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব।

ভাণ্ড বিচারিলে জানি আপন মাহাত্ম্য।
আপনা জানিলে জানি বৃন্দাবনতত্ত্ব॥
ভাণ্ড হইতে জানি জত কৃষ্ণের মহিমা।
ভাণ্ড হইতে জানি রাধা-প্রেমতত্ত্ব-সীমা॥"৪২৮

'অমৃতরসাবলী'-গ্রন্থে আছে :

"ভজনের মূল এই নরবপুদেহ।"৪২৯

৪২৬। দোহাকোষ (বাগচী সং ও শাস্ত্রীর টীকা)
৪২৭। চর্যাপদ, ১৪
৪২৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ১১১১, তৃতীয় অধ্যায়
৪২৯। অমৃতরসাবলী—সহজিয়া সাহিত্য (বসু)—পৃঃ ১৫৮

'আনন্দভৈরব'-গ্রন্থে আছে :

"নখচন্দ্র মুখচন্দ্র কপালচন্দ্র আর।
গণ্ডস্থল দুই চন্দ্র অর্ধচন্দ্র সার॥
চন্দ্র উদয় হইলে সুধামৃত ক্ষরে।
পিতে না পাইয়া চকোর পিপাসাতে মরে॥
পাদপদ্ম নাভিপদ্ম উরুপদ্ম আর।
মুখপদ্ম আঁখিপদ্ম আছে চারি আর॥"

*   *   *

"পরিসর বক্ষের উপরে দুই গিরি।
চন্দনের গাছ আছে তাহার উপরি॥"

*   *   *

"সহস্রদল হয় মস্তক ভিতরে।
অক্ষয় নামেতে তথা আছে সরোবরে॥
উদর ভিতরে আছে মান সরোবরে।
তথা হইতে ফুল গেল সহস্রদল উপরে॥
উর্ধ্বমুখে অধোমুখে হইয়া নাসার।
সর্বকাল মূল বস্তু আছে তার ভিতর॥"

*   *   *

"মান সরোবরের উপর ক্ষীরোদ সরোবর।
তথা হৈতে উপজিল পদ্ম শতদল।
মূল বস্তুর স্বরূপ সেই পদ্মে রয়।
তার নাম সরোবর পৃথু নাম হয়॥"[৪৩০]

অন্যান্য সহজিয়া-গ্রন্থেও এই-সব সরোবরের উল্লেখ আছে। 'অমৃতরত্নাবলী' গ্রন্থে আছে :

"মস্তকেতে পরমাত্মা সহস্র দলেতে।
অক্ষয় সরোবর বলি কহিলা তাহাতে॥
পরমাত্মার ক্ষয় নাই তাহাতে অক্ষয়।"

৪৩০। আনন্দভৈরব—সহজিয়া সাহিত্য—পৃঃ ১৩২-৩৩

"মস্তক দক্ষিণভাগে অক্ষয় সরোবর।
বাম দিকে হয় তার মান সরোবর ॥
দক্ষিণে পুরুষ দেহ বামেতে প্রকৃতি।
দুই সরোবর ইথে কহিল নিশ্চিতি ॥"[৪৩১]

'আত্মনিরূপণ' গ্রন্থে দেহের সাধনই 'সর্বসাধনসার' বলা হইয়াছে এবং দেহের মধ্যে চৌদ্দভুবন, চন্দ্র-সূর্য এবং নানা পদ্মের অবস্থান বর্ণিত আছে :

"শতদল পদ্ম আছে হৃদয় মন্দিরে
সহস্র হইতে আসি তাহা লিলা করে ॥
নাভিতলে আছে পদ্ম শতদল।
রূপ রতি রস তার করে ঝলমল ॥"[৪৩২]

নাথ-পন্থের সাধনা একমাত্র দেহকে অবলম্বন করিয়া—কারণ, যোগ-সাধনাই তাহাদের মুখ্য সাধনা। তাহারা দেহে বা 'পিণ্ডে' 'ব্রহ্মাণ্ড' কল্পনা করিয়া তাহারই সাধনা করিয়াছে। পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে মূলগত ঐক্য বর্তমান—ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে যে-প্রকার ভেদ, পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, পিণ্ডেও সূক্ষ্মভাবে তাহার সবই আছে। যিনি পিণ্ড-তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। 'সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ'-এ উক্ত হইয়াছে :

"ব্রহ্মাণ্ডবর্তি যৎ কিঞ্চিৎ তৎ পিণ্ডেঽপ্যস্তি সর্বথা।
ইতি নিশ্চয় এবাত্র পিণ্ডসংবিত্তিরুচ্যতে ॥"[৪৩৩]

ঐ গ্রন্থে সপ্তপাতাল, সপ্তলোক, সেই সপ্তলোকের অধিদেবতা, শিবের নানা মূর্তির অধিষ্ঠান এবং নানা বস্তু কল্পিত হইয়াছে।[৪৩৪] 'গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ', 'গোরক্ষসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থেও দেহ-মধ্যে ঐরূপ সাগর, পর্বত, নদী প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে। যে-তিনটি নাড়ী যোগ-শাস্ত্রে প্রধান ও বিশেষ মূল্যবান, সেই তিনটি নাড়ী ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'গোরক্ষসংহিতা'য় কথিত হইয়াছে :

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বহত্যেষা সরস্বতী।
তাসান্তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাংগতিম্ ॥

৪৩১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ৫৯৫
৪৩২। —ঐ—নং ১১৪০
৪৩৩। সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ ৩।২, (কবিরাজ সং)
৪৩৪। —ঐ— ৪।৩—৭-২১ (ঐ)

ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোঽতিদুর্লভঃ ॥"[৪৩৫]

এই নাড়ী, চক্র ও পদ্মের কল্পনা ও সাধনা হঠযোগ, রাজযোগ এবং লয়যোগের মূল বিষয়-বস্তু। ইহাই নাথ-পন্থের মূল সাধন-পদ্ধতি। এই পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের উপলব্ধি ও উহাদের যোগ-সাধনই যোগীর চরম লক্ষ্য।

সুফী-মতে এই মানব-জীবন ও মানব-দেহ অমূল্য। মানুষই পরমতত্ত্বের প্রতিনিধি এবং তাহার মধ্যেই বিশ্ব প্রতিবিম্বিত। মানবই ঈশ্বরের পূর্ণ পরিণতি এবং মানবের মধ্যেই তিনি স্বীয় পরিপূর্ণস্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। যিনি 'পূর্ণমানব' বা সিদ্ধপুরুষ, তিনি ভগবানের নির্মল, পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ দর্পণস্বরূপ,—তাঁহার মধ্যেই ভগবানের সমগ্রস্বরূপ ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিব্যক্তি। ঈশ্বর পূর্ণমানবত্বের দ্বারাই নিজেকে জানিতে পারেন। এই 'অল্‌-ইনসান-উল-কামেল' বা পূর্ণমানবই ক্ষুদ্র জগৎ। ইহার মধ্যে সৃষ্টির প্রাকৃতিক শক্তি এবং ঐশ্বরিক শক্তির পূর্ণ প্রতিবিম্বন হইয়াছে। মানবদেহেই ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান।[৪৩৬]

সুফীধর্মের সাধন-মার্গে কতকগুলি স্তর ও অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। এগুলিকে 'মকাম' (plane বা stations) এবং 'হাল' (states বা conditions বলে। হিন্দুতন্ত্রের 'চক্র'-তত্ত্ব, বৌদ্ধতন্ত্রের 'কায়'-তত্ত্ব প্রভৃতির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। সুফীদের কোনো কোনো সম্প্রদায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বা যোগ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানও আছে।

একটি সাধারণ কথা এই যে, যে-সব ধর্ম-মতে দেহের মধ্যে পরমাত্মার বাস কল্পিত হইয়াছে, তাহাদের সাধনাই আত্মোপলব্ধির সাধনা। ইহাতে দেহকে অবলম্বন করিয়াই স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অগ্রসর হইয়া অবশেষে আত্মার স্বরূপতত্ত্ব-

৪৩৫। গোরক্ষসংহিতা—৪।১৮৩-৮৪ (প্রসন্নকুমার কবিরত্ন সং)

৪৩৬। "Insānu'l-Kamil or the Perfect Man "as a microcosm of a higher order reflects not only the powers of nature but also the divine powers as in a mirror".

(Abdul Karim Jili in his book entitled 'Al-Insānu'l-Kamil etc.')".

"A man is created in the image of God, so the universe is created in the image of man who is its spirit and life."—**Studies in Islamic Mysticism**—R. A. Nicholson—Pages 77-89.

লাভের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। এই স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হইতেছে সৃষ্টি-ধারার বিপরীত গতিতে বা প্রতিলোম-গতিতে অগ্রসর হওয়া। এই 'উল্টা' সাধন দ্বারা মানবের 'স্বভাব' বা অন্তর্নিহিত 'সহজ ও স্বাভাবিক' অবস্থা লাভ করা যায়। এই অবস্থাতেই মানুষ ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব লাভ করে। তাই তন্ত্রের চক্র-ভেদ, পাতঞ্জল-মতের অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস,[৪৩৭] বেদান্তের পঞ্চকোষ-বিবেক,[৪৩৮] তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের 'কায়'-বাদ, সহজিয়া-বৈষ্ণব ও বাউলের 'রূপ-স্বরূপতত্ত্ব', বাউলের 'উজানে বাওয়া' বা 'উল্টা কল' প্রয়োগ করা প্রভৃতি মূলতঃ একই পথের প্রকার-ভেদ মাত্র।

(৪) মনের মানুষ ॥

মানব-দেহ-স্থিত পরমতত্ত্ব বা আত্মাকে বাউল 'মনের মানুষ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আত্মাকে 'মানুষ' বলার তাৎপর্য মনে হয় এই যে, আত্মা মানব-দেহকে অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন ও মানব-দেহের সাধনার দ্বারাই তিনি লভ্য এবং এই মানবাকৃতি তাঁহারই রূপ মনে করিয়া বাউল তাঁহাকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই মানুষ অলক্ষ্য অবস্থায় হৃদয়ে বা মনে অবস্থান করিতেছেন, বোধ হয় এই কল্পনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে 'মনের মানুষ' বলিয়াছে। এই আত্মাকে তাহারা 'মানুষ', 'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'অধর মানুষ', 'রসের মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'আলেখ মানুষ', 'সোনার মানুষ' 'সাঁই' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছে।

এই 'মনের মানুষ' বা আত্মা কেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও অবস্থায় মানব-দেহে বিদ্যমান, তাহার বিচিত্র জ্ঞান ও উপলব্ধি বাউলরা তাহাদের গানে প্রকাশ করিয়াছে। সেগুলি লক্ষ্য করিলে মনের মানুষের স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

বাউল-গুরু লালন বলিতেছেন :

"এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চারযুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥

৪৩৭। "যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।" —পাতঞ্জল-যোগ-দর্শন, ২।২৯ (হরিহরানন্দ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।)

৪৩৮। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদায়
আলেকে বসে ॥" (গান নং ৫০)

"এই মানুষে আছে, রে মন,
যারে বলে মানুষ রতন,
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না রে চিনিতে ॥" (গান নং ৭৮)

লালন বলিতেছেন, নিজেকে চিনিলেই সেই অচেনাকে চেনা যায়, সুতরাং নিজের খবর আগে লইতে হইবে। সাঁই নিজের মধ্যেই আছেন, তাঁহার জন্য ঢাকা-দিল্লী খুঁজিলে চলিবে না। মনে নিষ্ঠা হইলে তাঁহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে। ইনি স্বয়ং-প্রমাণ, ইঁহার প্রমাণের জন্য বেদ-বেদান্ত পড়িলে কেবল কষ্ট-কল্পিত অর্থেরই আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে :

"আমার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা ॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়,
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখ না।
আমি ঢাকা-দিল্লী হাতড়ে ফিরি,
আমার কোলের ঘোর তো যায় না ॥
আত্মরূপে কর্তা হরি,
মনে নিষ্ঠা হ'লে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত-পড়বে যত বাড়বে তত
লক্ষণা ॥" (গান নং ৮২)

লালন সাঁইএর অপূর্ব লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনি ইচ্ছামতো নানা দেহ-ঘর নির্মাণ করিতেছেন, আবার নিজেই সেই-সব দেহ-ঘরে বাস করিতেছেন। তিনি পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রীরূপে বিচিত্র রস আস্বাদন করিতেছেন।

তিনি ভগবান-রূপে বা শাসক-রূপে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন এবং সকলকে শাস্তি দিতেছেন, আবার যে-মানুষের মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়াই শাস্তি গ্রহণ করিতেছেন। শাস্তি-দাতা এবং শাস্তি-গ্রহণকারী উভয়েই তিনি।

"সে লীলা বুঝবি, ক্ষেপা, কেমন ক'রে।
লীলার যার নাই রে সীমা,
কোন্ খানে কোন্ রূপ ধরে॥
আপনি ঘর, সে আপনি ঘরী
আপনি করে রসের চুরি
ঘরে ঘরে,
ও সে আপনি করে ম্যাজিস্টারি,
আবার আপনি বেড়ায় বেড়ি প'রে॥" (গান নং ১২৪)

সুফী-কবি জালালুদ্দিন রুমীর একটি বিশিষ্ট কবিতায় অনুরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। পাঞ্জ শাহ্ও সাঁই-এর এইরূপ লীলা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন :

"আজব কারখানা বোঝা সাধ্য কার,
সাঁই করে লীলা ভবের 'পর।
এই মানুষে রঙ্গ-রসে বিরাজ করে সাঁই আমার॥
একটি ছিলেন দুইটি হ'লেন, নীরে ক্ষীরে যুগল তাঁর।
সাঁই পুরুষ-প্রকৃতি-ঘটে হরেক রঙে দেন বাহার॥
পাপীর ঘটে রঙ্গ দেখে, হাকিম-ঘটে দেন বিচার।
দরিদ্রের ঘটে ব'সে ফিরতেছেন দ্বার-বেদ্বার॥
পাঞ্জ বলে, মানব-লীলা করছেন সাঁই চমৎকার।
মানুষ ভ'জে মানুষ ধর, মন, যাবি তুই ভব-পার॥"
(গান নং ২৩৩)

লালন বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় চিদানন্দরূপ পূর্ণব্রহ্ম এবং বেদ-আগমে তাঁহাকে বলা হয় বিষ্ণু। যে-লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কথা আমরা শাস্ত্রাদিতে জানি, যাঁহার গোষ্ঠলীলা ও অন্যান্য বৃন্দাবন-লীলা বর্ণিত আছে, তিনি পরমাত্মা-রূপী 'সোহহং—নন্দলালা' নন। 'অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি' ব্রহ্ম-রূপে দেহে

অটল অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন এবং যে-কৃষ্ণ লীলা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার 'অংশ কলা' মাত্র। সেই 'অটল' বিন্দুরূপী ব্রহ্ম বা আত্মাই পূর্ণ কৃষ্ণনিধি :

"অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি,
তার কি আছে কভু গোষ্ঠখেলা।
ব্রহ্ম-রূপে সে অটলে বসে,
লীলাকারী তার অংশ-কলা ॥
পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ রসিক-শেখর
শক্তির উদয় শরীরে যার,
শক্তিতে শিরে মহাসংকর্ষণ,
বেদ-আগমে যারে বিষ্ণু বলা ॥
সত্য সত্য শরণ বেদ-আগমে গায়—
চিদানন্দরূপ পূর্ণব্রহ্ম হয়,
জন্ম-মৃত্যু যার নাহি ভবের 'পর
তবু তো নয় সোঽহং নন্দলাল্যা ॥" (গান নং ১৩৬)

রাধাশ্যাম বলিতেছেন যে, মনের মানুষ এই মানুষেই আছেন। যাহার জ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে, সে-ই তাঁহাকে দেখিতে পারে। কিন্তু তিনি পলকে আসেন, পলকে যান। স্বচৈতন্য মানুষ 'হাওয়া ধরিয়া' ও 'রূপে নয়ন' দিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারে :

"মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে।
তোর নাই জ্ঞান-নয়ন,
ওরে অবোধ মন,
সে মানুষ-রতন
তুই চিনবি কিসে ॥
আলেকের মানুষ থাকে আলোকেতে,
মোহ-অন্ধ জনে না পারে চিনিতে,
করে স্থান-স্থিতি এই মানুষেতে,
পলকেতে যায়, পলকেতে আসে ॥" (গান নং ২১১)

পাঞ্জ শাহ্ বলিতেছেন যে, সেই 'মানুষ' এই ঘরের মধ্যে অর্থাৎ দেহের মধ্যে ঘর বাঁধিয়া 'কাজল-কোঠা' বা সর্বোচ্চ নিভৃত ঘরে বাস করিতেছেন। সেই

মানুষ নীরে-ক্ষীরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার স্থূল সত্তা ব্রহ্মাণ্ডের উপরে আছে এবং মূল পাতালে গিয়াছে। ('সাধনা'-আলোচনায় ইহার তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)

"এই মানুষে সেই মানুষ আছে,
সে ঘরের মধ্যে ঘর বাঁধিয়ে কাজল-কোঠায় রয়েছে;
এবার গুরু দয়া করবে যারে,
ও সে পাবে সে রূপ দরশন ॥
মানুষ নীরে ক্ষীরে বিরাজ করতেছে,
তার স্থূল গেছে ব্রহ্মাণ্ড 'পরে, মূল পাতালে গেছে,
সেই মূলের সাধন গুরু জানে,
তা জেনে, মন, কর সাধন ॥" (গান নং ২৪৫)

চণ্ডীদাস গোঁসাই 'মনের মানুষ'-এর স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, সেই 'মানুষ' অগম্য স্থানে 'অটলের ঘরে' আছেন, কিন্তু যোগের সময় তিনি আবির্ভূত হন। শুদ্ধ, শান্ত রসিক সেই সময় স্থির দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারে।

"মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে নাও তারে।
নিগমেতে আছে মানুষ, যোগেতে বারাম ফেরে ॥"
(গান নং ৩০৭)

ফকির এরফান শাহ্ বলিতেছেন যে, দ্বিদলে (আজ্ঞাচক্রে) 'মানুষ'-এর অবস্থিতির স্থান, কিন্তু চতুর্দলে (মূলাধারে) তাঁহার লীলার স্থান:

"মানুষের বারাম দ্বিদলে,
আকর্ষণে হেলে-দুলে নিঃশব্দে চলে,
আছে চতুর্দলে লীলাখেলা, গুরুমুখে লও ॥"

* * * *

"দ্বিদলে হয় বারামখানা
চতুর্দলে সাঁই বিরাজ করে, মৃণালে হয় সদর থানা ॥"

(গান নং ৩০৩, ৩০১)

পদ্মলোচন বলিতেছেন যে, 'সহজ মানুষ' দ্বিদলে বিরাজ করেন, দশম দল (মণিপুরচক্র) ও ষোড়শদল (বিশুদ্ধচক্র) তাঁহার চলাচলের স্থান। তারপর তিনি

নর্মদার কূলে যোগেশ্বরী শক্তির সঙ্গে যুগল-রূপে দোলায় আন্দোলিত হন এবং শুভযোগের সময় চতুর্দল-পদ্মে আবির্ভূত হন : ('সাধনা'-অংশে আলোচনা দ্রষ্টব্য)

"মনের মানুষ হয় রে যে জনা,
(ও সে) দ্বিদলে বিরাজ করে এই মানুষে,
তুমি সহজ মানুষ চিনলে না ॥
যোড়শ দল আর দশম দলে,
তার পিছে মানুষ দোলে নর্মদার কূলে,
বামে কুলকুণ্ডলিনী, যোগেশ্বরী যোগরূপিণী,
নিত্য লীলাকারিণী, ব্রজলীলা যার ঘটনা ॥
শুভাশুভ যোগকালে, সুগঠন গতি মিলে,
স্থিতি হয় সেই কমলে, চতুর্দলে বারামখানা ॥"

(গান নং ৪৫৪)

গোপাল বলিতেছেন যে, 'মানুষ' বাঁকা-নলে—অর্থাৎ বক্রাকার অনুমিত সুষুম্না নাড়ীতে গমনাগমন করিয়া নানা লীলা প্রদর্শন করেন। কেবল যোগ-ক্রিয়া দ্বারাই তাঁহার লীলা উপলব্ধি করা যায়। (ইড়া ও পিঙ্গলা পরস্পর 'বেণীবন্ধনবৎ' জড়িত হইয়া সুষুম্না নাড়ীকে বেষ্টন করিয়া 'ধনুকাকারে' থাকিয়া অন্যান্য চক্রের পদ্মদল স্পর্শ করিয়া আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলে মিলিত হইয়াছে। ধনুকাকার সুষুম্না নাড়ীই যেন মূলাধার হইতে 'ত্রিবেণী' বা তিনটি বেণীরূপে মিলিত হইয়া বক্রগতিতে উর্ধ্বদিকে উঠিয়াছে—বাউলরা এইরূপ কল্পনা করিয়াছে। 'বাঁকানল' নাথ-পন্থের 'বঙ্কনাল' বা 'দশমীদ্বার' নয়। 'সাধনা' প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

"খেলছে মানুষ বাঁকানলে।
পঞ্চভূত বড়ই মজবুত, ঘিরে আছে দশম দলে ॥

যোগশক্তি তাহার ভূষণ, মূলাধারেতে আসন,
যখন করে আকর্ষণ উর্ধ্বে সদা চলে।
আলো করে সপ্ততালা, প্রভু গুপ্ত ঘরে হন উজলা,
সে কমল বোঁটা-খোলা,
রসভরে আপনি দোলে ॥" (গান নং ৩৩৮)

দ্বিদলপদ্মে গোলোকের পতি বিলাস করেন। উহাই 'রূপনগর' ও 'বৃন্দাবনধাম'। কিন্তু সেখানে উঠিতে হইলে সুষুম্না বাহিয়াই উঠিতে হইবে। তাই গোপাল বলিতেছেন :

"মন রে, চল রূপনগরে।

*　　*　　*

গোলোকের পতি, তার মূলে স্থিতি,
সে রূপ সতত বিরাজ করে।
ও তার দ্বিদল পদ্ম নাম, বৃন্দাবন ধাম,
তাহে গোলোকপতি বিলাস করে ॥
সুষুম্না ধরিয়ে, মৃণাল বাহিয়ে, উঠ সেই পদ্ম 'পরে।"

(গান নং ৩৪০)

পদ্মলোচন বলিতেছেন যে, এই মানুষেই সেই 'মানুষ' আছে, ক্রিয়া দ্বারা সেই 'অটল' মানুষকে ধরিতে হইবে। 'বাঁকানল'-এ এই 'মানুষ' ক্রীড়া করিতেছেন :

"এই মানুষে মানুষ আছে,
করণ ধ'রে নাও গো বেছে ;
অটল মানুষ যে ধরেছে,
তার কি আছে তুলনা ॥

খেলছে মানুষ বাঁকানলে,
দুলছে মানুষ হৃদ্‌কমলে,
অটল মানুষ উজান চলে,
দ্বিদলে তার যায় গো জানা ॥" (গান নং ৪৭৩)

"মানুষে গোঁসাই বিরাজ করে।
তারে চিনলি নে, মন, সামান্য জ্ঞানে রে ॥

*　　*　　*

নিত্যযোগে সাঁই বিহারে,
বিহারে হৃদ্‌বদ্ধ ঘরে,
ওরে হৃদ্‌বদ্ধ ঘরে রাগের জোরে
রসিক যারা রূপ নেহারে ॥" (গান নং ১৬১)

বাউল গোপীনাথ বলিতেছেন যে, এই মানুষে সেই 'মানুষ' বাস করেন। তিনি বেদের পারে প্রেম-নগরে বসতি করেন এবং দেহ-ঘরে বসিয়াই নানা মধুর লীলা করিতেছেন। মূর্খ মানুষ তাঁহাকে চিনিতে পারে না :

"আগেতে মনে বুঝে
দেখ না খুঁজে,
মানুষ আছে এই মানুষে ॥
মানুষকে কে চিনতে পারে,
ও সে বেদের পারে
প্রেম-নগরে বসত করে ;

কত মধুর লীলা,
রসের মেলা
করছে ঘরের ভিতরে ব'সে ॥
মানুষে মানুষ আছে,
দেখলে খুঁজে,
মানুষ হ'লে যাবে জানা।
আঁচলে থাকলে সোনা
গোপন হয় না,
বাইরে কিরণ প্রকাশে ॥" (গান নং ৪৯৬)

আর এক বাউল পরমাত্মারূপী এই 'মানুষ'কে একটি বাতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই 'কলের বাতি' 'বিনা তেলে' দিবারাত্রি জ্বলিতেছে। যাহারা শারীরিক দিক দিয়া অন্ধ, অর্থাৎ যাহাদের বাহিরের চক্ষু দৃষ্টিহীন, তাহারাও সাধন-বলে অন্তরের দৃষ্টিতে এই আলো দেখিতে পায় :

"মরি কি কলের বাতি
দিবারাত্রি জ্বলছে এ শহরে।
লণ্ঠনের মধ্যে পোরা,
দেখ না গো তোরা
ঝড়-বাতাসে নেভে না রে ॥
টিপ দিলে বাতির কলে,
বাতি জ্বলে বিনা তেলে ;

সে ধরম জানে যারা, জ্বালায় তারা,
অন্যে কি জ্বালাতে পারে ॥
এ আলোর এমনি ধারা;
অন্ধকারে তারাও হেরে অন্ধ যারা ;
এ রঙ-বেরঙের আলো জ্বলছে ভালো,
অখণ্ড মণ্ডলাকারে ॥" (গান নং ৩৯৬)

গোপাল বলিতেছেন যে, 'মানুষ'-এর স্থিতি সহস্রদলপদ্মে হইলেও, দ্বিদলেই তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রকাশ ঘটে। দশম দলে অর্থাৎ মণিপুরচক্রে বিদ্যুৎ-আকারে তাঁহার আবির্ভাব এবং ষড়দলপদ্মে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানচক্রে জ্যোতির্ময় প্রকাশ হয় :

"সহস্রদলেতে স্থিতি হয় যাহার,
দ্বিদল-মধ্যে বারাম দিচ্ছে নিরন্তর,
শুন ওরে মন, তাহার বিবরণ,
দশম দলে বিজলী খেলে ॥
ষড়দল পদ্মেতে ব্রহ্মা করেন বাস,
তাহার মধ্যে আছে জ্যোতির্ময় প্রকাশ,
তারে কর সাধনা,
পূরিবে বাসনা
মনে প্রাণে এই দু'য়ে এক হইলে ॥" (গান নং ৫০৫)

এই দেহের মধ্যেই যে পরমাত্মা বা 'মনের মানুষ'-এর বাস—বাউলদের এই ধারণার উপর প্রধানভাবে তিনটি প্রভাব পড়িয়াছে। প্রথম উপনিষদের প্রভাব, দ্বিতীয় হিন্দুতন্ত্রের ও বিশেষভাবে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব, তৃতীয় সুফী-দর্শনের প্রভাব।

উপনিষদে দেহ-স্থিত এই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম 'পুরুষ'রূপে বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং এই দেহকে 'পুর' বা নগর বলা হইয়াছে।

ঈশোপনিষদে আছে :

"...যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।"[৪৩৯]

ঐ সূর্যমণ্ডল-স্থিত পুরুষ, তিনি আমি।

৪৩৯। ঈশোপনিষৎ, ১৬

ইহার শাঙ্কর ভাষ্যে আছে—"পুরে শয়নাদ্বা পুরুষঃ।" এই পুরে অর্থাৎ দেহ-রূপ নগরে বাস করেন বলিয়া আত্মা পুরুষ বলিয়া অভিহিত। কঠোপনিষদে আছে :

"পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।"[৪৪০]

জন্মরহিত ও অপরিবর্তনশীল আত্মার এই একাদশদ্বারবিশিষ্ট পুর ;—অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম এই একাদশদ্বারবিশিষ্ট (চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয় নাসিকাদ্বয়, মুখ, নাভি, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার এবং ব্রহ্মরন্ধ্র—এই একাদশ দ্বার) দেহ-রূপ নগরে বাস করেন। উপনিষদে এই দেহকে 'ব্রহ্মপুর' বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে :

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম
দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং..."[৪৪১]

এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ মানব-শরীরে যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার হৃদয়-রূপ গৃহ আছে, সেই হৃৎ-পঙ্কজ-গৃহের অভ্যন্তরস্থ আকাশ অন্বেষণ করিলেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে পুরুষ-রূপে উল্লেখ এবং হৃদয়-পদ্মে তাঁহার অবস্থান প্রভৃতি বর্ণনা হইতে বোধহয় বাউলরা তাঁহাকে 'মানুষ' বা 'মনের মানুষ' বলার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে।

হিন্দু-তন্ত্রে মস্তকে সহস্রদলপদ্মে পরমতত্ত্ব বা পরম শিবের স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। আজ্ঞাচক্রে বা দ্বিদলপদ্মেও শিবের স্থান বলিয়া তন্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। এই উভয় স্থানে পরম শিবের অবস্থিতির অবশ্য প্রকার-ভেদ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাউল তাহার 'মনের মানুষ'-এর পূর্ণলীলা এই দ্বিদলপদ্মেই প্রকটিত বলিয়া কল্পনা করিয়াছে এবং ইহার উর্ধ্বে সে উঠিতে চায় নাই। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'সাধনা'-অংশে করা হইয়াছে।

দ্বিদলপদ্মে বা আজ্ঞাচক্রে পরম শিবের অবস্থিতি পূর্ণানন্দ স্বামীর 'ষট্‌চক্র-নিরূপণ' গ্রন্থে এই ভাবে উল্লিখিত আছে :

"[আজ্ঞাচক্রে পরমশিবস্থিতিবর্ণনম্]
জলদ্-দীপাকারং তদনু চ নবীনার্কবহুল-
প্রকাশং জ্যোতির্বা গগনধরণীমধ্যমিলিতম

৪৪০। কঠোপনিষৎ, ২।২।১
৪৪১। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১।১

ইহ স্থানে সাক্ষাদ্ ভবতি ভগবান্ পূর্ণবিভবো-
হব্যয়ঃ সাক্ষী বহ্নেঃ শশিমিহিরয়োর্মণ্ডল ইব ॥"৪৪২

আজ্ঞাচক্র দেদীপ্যমান দীপশিখার ন্যায় এবং প্রভাতকালীন সূর্যতুল্য জ্যোতিঃসম্পন্ন। ইহা আকাশ ও ধরণীমধ্য-বিলসিত—অর্থাৎ এই জ্যোতি মস্তিষ্ক হইতে মূলাধার-কমলের ধরাচক্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ স্থানেই বহ্নি, চন্দ্র ও সূর্য-মণ্ডলের মতো দীপ্তিমান, জগতের স্বাক্ষিস্বরূপ, পূর্ণৈশ্বর্য, অব্যয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আজ্ঞাচক্রে পরম শিবের অবস্থিতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 'নির্বাণতন্ত্রে' আছে:

"এবং হংসো মণিদ্বীপে তস্য ক্রোড়ে পরঃ শিবঃ।
বামভাগে সিদ্ধকালী সদানন্দস্বরূপিণী ॥"৪৪৩

পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত অত্যুজ্জ্বল অংশে যে হংসবীজ অবস্থিত, তাহার ক্রোড়ে আছেন পরম শিব। এই পরম শিবের বামভাগে আছেন নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী সিদ্ধকালী।

'শিবসংহিতা'তেও আজ্ঞাচক্রে অক্ষর-বীজাত্মক দীপ্তিশালী 'পরমপুরুষ'-এর অবস্থানের কথা উল্লিখিত আছে:

"শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতম্।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যদ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি ॥"৪৪৪

আবার 'সহস্রদলকর্ণিকাস্থ-পরমশিবস্থিতি' সম্বন্ধে তন্ত্রে আছে:

"ইহ স্থানে দেবঃ পরমশিবসমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ।
স্বরূপী সর্বাত্মা রসবিরসমিতোঽজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ ॥"৪৪৫

সহস্রদল-কর্ণিকার মধ্যে পরম শিব নামে খ্যাত, ব্রহ্ম-স্বরূপ, নিখিল বিশ্বের আত্মা, শিবশক্তি-যোগজন্য-সামরস্যানন্দ-রূপ, অজ্ঞান-মোহান্ধকার-নাশী, সূর্য-স্বরূপ দেবতা অবস্থান করেন।

৪৪২। 'ষট্চক্রনিরূপণ', ৩৭ শ্লোঃ—পৃঃ ৪১ (আগমানুসন্ধান সমিতি—Tantrik Texts—Arthur Avalon সং)

৪৪৩। 'ষট্চক্রনিরূপণ' গ্রন্থের টীকায় উদ্ধৃত—পৃঃ ৪২

৪৪৪। শিবসংহিতা, ৪।১৩২ (বসুমতী সং)

৪৪৫। 'ষট্চক্রনিরূপণ', শ্লোঃ নং ৪২ (আগমানুসন্ধান সং)

'ষট্‌চক্রনিরূপণ'-এ সহস্রারপদ্ম-মধ্যেই যে সকল সম্প্রদায় স্ব স্ব উপাস্য দেবতার স্থান নির্দেশ করেন, তাহা একটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :

> "শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা,
> লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
> পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলাম্ভোজরসিকা
> মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষস্থানমমলম্॥"[৪৪৬]

শৈবগণ এই স্থানকে শিব-স্থান বলেন, বৈষ্ণবগণ ইহাকে পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্থান বলেন, যাঁহারা শিব ও বিষ্ণু উভয়কেই ভজনা করেন, তাঁহারা উহাকে হরি-হর-স্থান বলেন; দেবীর চরণ-কমলের ভক্তেরা উহাকে শক্তি-স্থান, অন্যান্য মুনি উহাকে প্রকৃতি-পুরুষের স্থান বলেন।

বৌদ্ধতন্ত্রেও হিন্দুতন্ত্রের সহস্রারের মতো 'উষ্ণীষকমল'-এ পরমতত্ত্ব বা 'মহাসুখ'-এর স্থিতি বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এই উষ্ণীষ-কমলকে 'মহাসুখচক্র' বা 'মহাসুখকমল' বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে।

গদ্য-পদ্যে লিখিত 'হেরুক-তন্ত্র'-এ আছে :

> "শিরসি মহাসুখচক্রে চতুর্দলপদ্মং...
> সর্বস্যাধাররূপত্বাৎ বোধিমণ্ডলস্বভাবং বীজভূতম্। বাহ্যে
> দ্বাত্রিংশদ্দলপদ্মং তন্মধ্যে হকারোঽধোমুখঃ ভবতি বোধিচিত্তাত্মকং
> চেন্দুকলাপঞ্চদশাত্মকম্। মহাসুখং বহেন নিত্যং যোগিনী
> ষোড়শী কলা॥ ললনা-রসনাদ্বয়োঃ পার্শ্বে আলি-কালি-স্বরূপিণী
> সহজানন্দস্বভাবঞ্চ অদ্বয়ং পরমেশ্বরী॥"[৪৪৭]

মস্তকে মহাসুখ-চক্রে চতুর্দলপদ্ম আছে...ইহা বোধি-মণ্ডল-স্বভাব-প্রাপ্ত এবং সর্বভূতের বীজ ও আধার-স্বরূপ। ইহার বাহিরে বত্রিশদল-বিশিষ্ট একটি পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে অধোমুখে 'হ'কার অক্ষরটি বিরাজমান, ইহা বোধি-চিত্ত-স্বভাব-প্রাপ্ত এবং চন্দ্রের পঞ্চদশকলাময়। 'হ'কারের মধ্যে চন্দ্রের ষোড়শী কলাময়ী এবং মহাসুখ-স্বরূপিণী যোগিনী অবস্থিত। দুই পার্শ্বে আলি-কালি-স্বরূপিণী ললনা ও রসনা এবং পরমেশ্বরী অদ্বয় সহজানন্দময়ী।

৪৪৬। 'ষট্‌চক্রনিরূপণ', শ্লোঃ নং ৪৪ (ঐ)

৪৪৭। হেরুক-তন্ত্র (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপি নং ১১২৭৭)—পৃঃ ৭৩ (খ)—৭৪ (ক)

এই মহাসুখই পরমতত্ত্ব—ইহাই বজ্রসত্ত্ব—প্রজ্ঞা ও উপায়ের যুগনদ্ধ-রূপ—সমস্ত বস্তুর মূলতত্ত্ব।[৪৪৮] ইনি 'শ্রীমহাসুখনাথ'। এই মহাসুখ বা মহাসৌখ্য বারাহীদেবী-আলিঙ্গিত।[৪৪৯] এই মহাসুখ বোধি-চিত্ত-স্বরূপ—ইহাই ভগবান বুদ্ধ।

বাউলদের 'মানুষ' বা 'মনের মানুষ' বা 'সহজ মানুষ'-এর ধারণার সঙ্গে বজ্রযানী বৌদ্ধদের 'বজ্রসত্ত্ব'-এর ধারণার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মূলতঃ 'মনের মানুষ' বজ্রসত্ত্বের পরবর্তী একটা রূপ-ভেদ মাত্র। অন্যত্র এ-বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। উভয় ধর্মেই একটি তত্ত্ব বা ভাব-সত্তাকে মানুষের অন্তর্নিহিত আত্ম-তত্ত্ব-রূপে উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টা আছে, আবার উহাকে ভগবান বা ঈশ্বর মনে করিয়া প্রণিপাত, ভক্তি নিবেদন বা করুণা প্রার্থনা করা হইয়াছে। বজ্রযান-বৌদ্ধধর্মের অধিকাংশ গ্রন্থেই "ওঁ নমঃ শ্রীবজ্রসত্ত্বায়" বা "ওঁ নমঃ শ্রীহেবজ্রায়" বা "ওঁ নমঃ শ্রীহেরুকবজ্রায়" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে "জগন্নাথ", "সর্ববুদ্ধময়", ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়া স্তুতি পাঠ করা হইয়াছে।[৪৫০] বাউলরাও 'মনের মানুষ'কে দুই ভাবেই কল্পনা করিয়াছে, তাহাদের গানগুলির মধ্যে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। উভয় ধর্মই যোগ-ক্রিয়া-ভিত্তিক এবং আত্মোপলব্ধি-মূলক হইলেও আত্মতত্ত্বকে ভগবান-পদে উন্নীত করা হইয়াছে।

সুফীধর্মেও ঠিক এইরূপ অবস্থা। বায়াজিদ্-অল্ বিস্তামী, মনসুর হল্লাজ, ইব্‌ন আরবী, জালালুদ্দীন রুমী, ইব্রাহিম-আল্-জীলী প্রভৃতি বিখ্যাত সুফীগণের মত এই যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, ঈশ্বর মানব-রূপে স্বীয় সত্তা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর-সত্তার সঙ্গে পুনর্মিলনই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। ইহাদের সমস্ত উক্তি—যথা 'আমিই সত্য' ('আনল্ হক্'), 'আমিই তিনি' ('অন হিয়া'), বায়াজিদের 'আমিই ঈশ্বর, আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই', রুমীর 'স্বয়ং তুমিই তিনি' প্রভৃতি উক্তি হইতে মনে হয়, ঈশ্বর ও মানব স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অভিন্ন এবং এইপ্রকার উপলব্ধিই চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। কিন্তু ইহাদের রচিত গ্রন্থাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহারা ঈশ্বর ও মানবের একত্ব সজোরে প্রকাশ করিলেও, ঈশ্বর ও মানব যে

৪৪৮। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ—পৃঃ ৫০ (বরোদা সং)

৪৪৯। "বারাহী-আলিঙ্গিত-মহাসৌখ্যম্।" সাধনমালা—২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯১ (বরোদা সং)

৪৫০। দ্রষ্টব্য 'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি,' 'জ্ঞানসিদ্ধি,' 'হেবজ্রতন্ত্র' হেরুকতন্ত্র' প্রভৃতি।

স্বরূপতঃ ভিন্ন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত মানবের স্বতন্ত্র স্বরূপ বিনষ্ট হয় না এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের নিগূঢ় ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বর্তমান ইত্যাদি মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই-সব 'বিশ্বাত্মবাদী' বা 'একাত্মবাদী' ও বিজ্ঞানবাদী সুফীগণ ব্যক্তিগত ভগবানকে লুপ্ত করিতে পারেন নাই। জীলী বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরোপাসনা মানবের চিরন্তন অবশ্যকর্তব্য। অনেক সময় সুফী-কবি ঈশ্বর ও মানবের মিলনকে প্রেমোন্মত্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুফীধর্মের দ্বারা অনেকটা প্রভাবান্বিত হওয়ায় বাউলরা 'মনের মানুষ'কে একাধারে পরমতত্ত্ব ও ব্যক্তিগত ভগবান—উভয় রূপেই উপলব্ধি করিয়াছে।

বজ্রযান-বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী কালে রাধা-কৃষ্ণবাদ প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব-রূপে প্রজ্ঞা-উপায়বাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর রাধা-কৃষ্ণ-বাদের অত্যধিক প্রচারের ফলে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব হিসাবে 'মানুষ', 'সহজ মানুষ' বা 'মনের মানুষ'-এ রূপান্তরিত হইয়াছেন। বজ্রসত্ত্বের স্বরূপ যেমন প্রজ্ঞোপায়ের মিলন দ্বারা গঠিত, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপও তেমনি রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত রূপ লইয়া রচিত—একটি সত্তার মধ্যে শক্তিমান্ ও শক্তি-রূপে—বিষয় ও আশ্রয়-রূপে—পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপে দুইটি সত্তার মিলন হইয়াছে,—অর্থাৎ অভেদে ভেদ কল্পিত হইয়াছে। সহজিয়া-বৈষ্ণবেরা 'মানুষ' বা 'সহজ মানুষ' বলিতে মানুষের অন্তরতম সত্তা হিসাবে বুঝিয়াছে এবং সেই সত্তাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও কল্পনা করিয়াছে। তাহাদের রচিত অনেক পদে 'মানুষ'-এর নানা বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে :

"সহজ মানুষ কোথাও নাই।
খুঁজিলে তাহারে নিকটে পাই ॥
যোনিতে জনম তাহার নয়।
তাহার জনম রাগেতে হয় ॥"

"মানুষ ভাবের পার।"

"জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ যারে বলি।
প্রেম-পীরিতি-রসে সে মানুষ করে কেলি ॥
মানুষের প্রেমলীলা গুপ্ত সব কাজে।
মানুষের ধর্ম নহে লোকের সমাজে ॥

তিন লোক চা'য়া আছে ইসব খেয়ানে।
ঈশ্বর মানুষ সব কেহ নাই জানে ॥"

"মানুষ ভাবেতে মানুষ ভজন
যে জনা মানুষ হয়।
মানুষে মানুষ আচ্ছাদন করে
সেই সে মানুষময় ॥
মানুষ বলিয়া জানে যবে হিয়া
আর না ভাবিহ মনে।
মানুষ ভজন করে গোপীগণ
দেহ দিয়ে তার সনে ॥"

"একটি মানুষ সেই সদা রসে বিলসই
বেদ-বিধি না জানে মহিমা।
আপনার সম করে রূপেতে জগৎ হরে
আনন্দেতে নাহিক উপমা ॥"

"ভকত জনার তরে নিজরসে ক্রীড়া করে
সেই ত মানুষ সৃজন।"

* * *

মনমথে মন মথে লীলা করে নিজ রসে
গুপ্তধাম নামে বৃন্দাবন।"

"ভরত মুখেতে শুনি ভগবান
সহজ মানুষ কথা।
মানুষ আকৃতি মানুষ প্রকৃতি
ভরত মুখেতে গাথা ॥
গোলোকনাথ যেই সে মানুষ মনে
আরোপণ করে সদা।
আরোপ জানিয়া মহা সঙ্কর্ষণ
ব্রজে প্রকাশিল রাধা ॥

সব পরিজন লয়ে সঙ্কর্ষণ
সহজ মানুষ হইলা।
সহজ রূপেতে সহজ মানুষ
আস্বাদে মানুষ-লীলা॥"[৪৫১]

বৈষ্ণব-সহজিয়ারা আবার মানুষের তিনপ্রকার প্রভেদ করিয়াছে—সংস্কার, অযোনি ও সহজ। সংস্কার-মানুষ সংসারের সাধারণ জন্ম-মৃত্যুর অধীন মানুষ, অযোনি-মানুষ গোলোক-বিহারী বৈকুণ্ঠ-পতি, আর সহজ-মানুষ গোলোকের উপরে নিত্যবৃন্দাবনে বাস করেন। তিনি আর বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা একত্রে আনন্দমগ্ন অবস্থায় নিত্যবৃন্দাবনে সহজানন্দ-রসে বিলাস করেন:

"মানুষ মানুষ ত্রিবিধ প্রকার
মানুষ বাছিয়া লেহ।
সহজ মানুষ অযোনি মানুষ
সংস্কারা মানুষ-দেহ॥
সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই
সামান্য মানুষ নাম।
জীবনে মরণে করে গতায়াত
ক্ষীরোদ-সায়রে ধাম॥
গোলোক ভিতরে অযোনি মানুষ
ভিন্ন স্থানে সদা রয়।
তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি
লীলাকারী যেবা হয়॥
গোলোক উপরে নিত্য বৃন্দাবন
সহজ মানুষ জন।
আনন্দে মগন রহে দুই জন
চণ্ডীদাস ইহা কন॥"[৪৫২]

মূলতঃ ইহাই বাউলদের 'মনের মানুষ'-এর কল্পনা। তাহারাও 'মনের মানুষ'কে 'সহজ মানুষ', 'ভাবের মানুষ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছে।

চৈতন্য-পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্ম বাউলধর্মের প্রাথমিক স্তর। তান্ত্রিক

৪৫১। 'সহজিয়া সাহিত্য' (বসু), 'মানুষের পদ'—পৃঃ ১৭-৩৬
৪৫২। —ঐ— —ঐ—

বৌদ্ধধর্ম বা পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব-দর্শনই বাউলধর্ম ও সাধনার ভিত্তি। সাধনা-অংশে বাউলধর্মের যে বৈশিষ্ট্য বা নূতনত্ব দেখা যায়, তাহার বীজ চণ্ডীদাসের বা চণ্ডীদাস-নামধারী এক বা একাধিক কবির রচিত বা নরোত্তম-দাস, লোচন দাস, বিদ্যাপতি, চৈতন্য দাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির ভণিতা-যুক্ত সহজিয়া-পদে এবং নানা সহজিয়া-গ্রন্থে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ বীজ হইতে উদ্ভূত তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিচয় বাউল-গানগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা বা সহজিয়া-পদগুলির ব্যবহারিক দিকের বা সাধনাঙ্গের ব্যাখ্যা এই সম্প্রদায়ের লেখকেরা করিয়াছেন কিনা জানি না, এই-রকম কোনো পুস্তকও আমরা পাই নাই। এক 'বিবর্তবিলাস'-গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিয়া স্থানে স্থানে সাধনাঙ্গের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। বাংলার নানা স্থানের নানা আখড়ায় অনুসন্ধানের ফলে যে-কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার মধ্যে পঞ্চানন দাস-রচিত একখানি পুঁথিতে চণ্ডীদাসের কয়েকটি সহজিয়া-পদের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার ছলে সাধনাঙ্গের কথা কিছু কিছু পাওয়া যায়। আর নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্রের গুরু বলিয়া কথিত 'মাধব বিবি'র 'কড়চা' নামে একখানা গ্রন্থের কয়েক স্থানে সাধনের কিছু ইঙ্গিত আছে। অনেক আখড়ায় দেখিয়াছি, চণ্ডীদাসের সহজিয়া-পদগুলি একটি খাতায় সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহার প্রথমেই লেখা আছে—"সাধনের পদ।" ইহাতে মনে হয়, চণ্ডীদাসের এবং অন্যান্য রচয়িতার এই বৈষ্ণব-সহজিয়া-পদগুলিতে বাউল-সাধনার বীজ নিহিত আছে। অবশ্য নানা কারণে এই গূঢ় সাধনাঙ্গের কথা কোনো সহজিয়া-গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নাই। তবুও স্থানে স্থানে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা বুঝা যায়। বাউল-গানগুলির মধ্যে এই সাধনাঙ্গের কথাই বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রসঙ্গক্রমে তত্ত্ব বা দর্শনেরও কিছু উল্লেখ আছে। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বাংলার ধর্ম-জগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের রাধা-কৃষ্ণবাদের এবং প্রেম-ধর্মের অনুপ্রেরণায় বৈষ্ণব-সহজিয়াধর্মের একটা প্লাবন আসিয়াছিল। ফলে পূর্বের বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ফকির সম্প্রদায়ও রাধা-কৃষ্ণবাদ, চৈতন্য-তত্ত্ব ও রাধা-কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক ভাব-কল্পনায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। লালন, পাঞ্জু প্রভৃতির গানে ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব-সহজিয়া-সাধনাঙ্গকে অবলম্বন করিয়াই মূলতঃ বাউলধর্মের উদ্ভব ও বিস্তৃতি। অবশ্য তাহার উপর অন্যান্য প্রভাবও কিছু কিছু পড়িয়াছিল।

(৫) **রূপ-স্বরূপতত্ত্ব ॥**

'রূপ' বলিতে বাহিরের একটা আকার বুঝায়, আর এই রূপকে আশ্রয় করিয়া এই রূপের অভ্যন্তরে উহার যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাহাকে 'স্বরূপ' বলা যায়।

বহু বাউলগানে আমরা এই রূপ-স্বরূপের উল্লেখ দেখি। মূলতঃ তাহাদের সাধনা হইতেছে রূপ হইতে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া—প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃতে পরিণত করিয়া দেহের মধ্যেই পরমতত্ত্বের উপলব্ধি করা। দেহকে কেন্দ্র করিয়া যে-সাধনা তাহার রহস্যই এই রূপ হইতে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে নিহিত। ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে ইহাই ভারতীয় তান্ত্রিকসাধনা। হিন্দু-তন্ত্র-সাধনা, বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনা, বৌদ্ধ-সহজিয়া-সাধনা, বৈষ্ণব-সহজিয়াসাধনা, বাউল-সাধনা, নাথসিদ্ধদের সাধনা প্রভৃতির ইহাই ভিত্তি-প্রস্তর।

পূর্বে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, চরমতত্ত্ব এক অদ্বয় পরমানন্দ-স্বরূপ। নানা উপনিষদে ইহা উক্ত হইয়াছে। এই আনন্দের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছে যে, ইহা স্ত্রী-পুরুষের আলিঙ্গিত অবস্থা বা মিথুনানন্দের তুল্য পরবর্তী ভারতীয় তন্ত্র ইহাই পারমার্থিক সত্যের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাদের ধর্ম-তত্ত্ব ও সাধন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তন্ত্র-মতে এই পরমানন্দময় অদ্বয় সত্যের দুইটি অংশ, খণ্ড বা রূপ আছে। এই দুইটি অংশের মিলনেই এক পরমানন্দময় অদ্বয় সত্তা। এই দুইটি অংশের একটি শিব ও অপরটি শক্তি। এই শিব-শক্তির মিলন-জনিত কেবলানন্দই সাধকের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য।

মানব-দেহেই সমস্ত সত্য বা তত্ত্বের অবস্থিতি—ভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড। এই দেহের মধ্যেই একাধারে শিব-তত্ত্ব ও শক্তি-তত্ত্বের বাস কল্পিত হইয়াছে। শিব-তত্ত্ব সহস্রারে অবস্থিত আর শক্তি-তত্ত্ব কুণ্ডলিনী-রূপে মূলাধারে নিদ্রিতা। সাধক এই শক্তি-তত্ত্বকে জাগ্রত করিয়া এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ঊর্ধ্বে উঠাইয়া সহস্রারের শিব-তত্ত্বের সঙ্গে মিলিত করিলে উভয় অংশের মিলন-জাত যে সামরস্য-সুখ বা কেবলানন্দ, তাহাই উপলব্ধি করিতে পারেন। আবার তন্ত্র-সাধনার আর একটি ধারা বা পদ্ধতি আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যে, পরমতত্ত্ব যখন একা ছিলেন, তখন রমণ করিতে পারেন নাই; রমণেচ্ছায় তিনি নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া পুরুষ ও রমণী-রূপে বা পতি ও পত্নীভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তন্ত্র তাই জগতের প্রাকৃত পুরুষকে বিশেষভাবে শিব-তত্ত্বের প্রতীক এবং নারীকে বিশেষভাবে শক্তি-তত্ত্বের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছে। পুরুষ-নারীর মিলিত সাধনা এইভাবে তন্ত্রে একটি বিশিষ্ট সাধনা-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। নর-নারীর মিলিত সাধনার বীজ মনে হয় উপনিষদের মধ্যেই নিহিত। পূর্বে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

সাধনায় প্রত্যেক পুরুষ নিজের শিব-তত্ত্বকে জাগ্রত করিয়া নিজেকে শিব-রূপে অনুভব করিবে, আবার প্রত্যেক নারীও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি-তত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নিজেকে পূর্ণশক্তি-রূপে উপলব্ধি করিবে। উভয়তত্ত্বের—পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের দ্বারা পূর্ণ সামরস্য-ঘটিত যে অসীম আনন্দানুভূতি, তাহাই সাধক-সাধিকার চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। এই সামরস্য-জনিত যে আনন্দানুভূতি, তাহাই হিন্দু-তান্ত্রিকগণের কেবলানন্দ, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের মহাসুখ, বৈষ্ণব-সহজিয়াগণের মহাভাব-রূপ সহজাবস্থা।

পূর্বে এ-কথা উল্লিখিত হইয়াছে যে, হিন্দুতন্ত্র-সাধনা, বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনা বা বৌদ্ধ-সহজিয়া-সাধনায় নর-নারী-মিলন ছিল বিশেষভাবে যোগমূলক ও জ্ঞানমূলক, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রাধা-কৃষ্ণ-লীলাবাদের ও প্রেম-ধর্মের বিপুল প্রচার ও প্রসারের ফলে সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মে যোগ-ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে প্রেমের অবতারণা করা হইয়াছিল। হিন্দু-তন্ত্রে যেমন শিব-শক্তিতত্ত্ব, বৌদ্ধদের যেমন প্রজ্ঞা-উপায়তত্ত্ব, বা প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, সহজিয়া-বৈষ্ণবদেরও তেমনি রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব। রাধা-কৃষ্ণই তাহাদের প্রকৃতি-পুরুষ।[৪৫৩] রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলনই হইল বৈষ্ণব-সহজিয়াদের পরমতত্ত্ব। এই মিলনের ভিত্তি হইল একান্ত গভীর প্রেম। এই

৪৫৩। "পরমাত্মার দুই নাম ধরে দুই রূপ।
এই মতে এক হয়্যা ধরয়ে স্বরূপ॥
তাহে দুই ভেদ হয় পুরুষ প্রকৃতি।
সকলের মূল হয় সেই রস-মূরতি।
* * * *
পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি দুই রূপ।
সহস্রার দলে করে রসের স্বরূপ।"
—'রত্নসার' (বিশ্ববিদ্যালয়, পুঁথি নং ১১১১)

"রস আস্বাদন লাগি হইলা দুই মূর্তি।
সেই হেতু কৃষ্ণ হয় পুরুষ প্রকৃতি॥
প্রকৃতি না হইলে কৃষ্ণ সেবা জন্য নয়।
সেই হেতু প্রকৃতি ভাব করয়ে আশ্রয়॥"
—'দীপকোজ্জ্বল' (বিশ্ববিদ্যালয়, পুঁথি নং ৫৬৪)

প্রেম-মিলনের চরম আনন্দানুভূতিই 'মহাভাব'রূপ 'সহজ'। এই 'সহজ'ই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। বৈষ্ণব-সহজিয়ারা কল্পনা করিয়াছে যে, 'নিত্যবৃন্দাবন'-এ রাধা-কৃষ্ণের এই সহজ-লীলা অনুক্ষণ চলিতেছে। তাহারাও পুরুষকে কৃষ্ণ-তত্ত্বের বিগ্রহ এবং নারীকে রাধা-তত্ত্বের বিগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কৃষ্ণ-তত্ত্বকে তাহারা 'রস' বা 'কাম' ও রাধা-তত্ত্বকে তাহারা 'রতি' বা 'মদন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। মূলতঃ এক তত্ত্ব কৃষ্ণ দুইরূপ ধারণ করিয়া প্রকৃতি-পুরুষ-রূপে প্রাকৃতভাবে এবং অপ্রাকৃতভাবে বিহার করিতেছেন।[৫৫৪]

অপ্রাকৃত নিত্যবৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের সহজ-প্রেম-লীলার যে ধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, প্রাকৃত জগতের নর-নারীর প্রেমের মধ্যেও সেই ধারা চলিতেছে। জগতের পুরুষ কৃষ্ণের প্রতীক, নারী রাধার প্রতীক। রাধা-কৃষ্ণই নারী-পুরুষ-রূপে বিহার করিতেছেন।[৫৫৫] নর-নারীর প্রাকৃত প্রেম সেই অপ্রাকৃত সহজ-প্রেমের প্রতিচ্ছবি।

"সেই রূপেতে করে কুঞ্জেতে বিহার।
সেই কৃষ্ণ সেই রাধা একুই আকার॥
রাধা হইতে নিরাকার রসের স্বরূপ॥
অতএব দুই রূপ হয় এক রূপ॥"
—'রাধারসকারিকা' (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ৩য় খণ্ড—পৃঃ ১৬৭১)

৫৫৪। "জয় জয় সর্বাদি বস্তু রসরাজ কাম।
জয় জয় সর্বশ্রেষ্ঠ রস নিত্য ধাম॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহা অপ্রাকৃতে।
বিহার করিছ তুমি নিজ স্বেচ্ছামতে॥
স্বয়ং কাম নিত্যবস্তু রস-রতিময়।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আদি তুমি মহাশ্রয়॥
এক বস্তু পুরুষ প্রকৃতি রূপ হইয়া।
বিলাসহ বহুরূপ ধরি দুই কায়া॥
—সহজ-উপাসনা-তত্ত্ব, তরুণীরমণ,' (সা-প-প, ১৩৩৫, ৪র্থ সংখ্যা)

৫৫৫। "এই যে সহজবস্তু সহজ তার গতি।
* * * *
নারী পুরুষ রূপে সতত বিহরে॥"
—'প্রেমবিলাস' (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড— পৃঃ ১৬৬২)

এখন রূপ ও স্বরূপ—এই দুইটি কথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। জগতের পুরুষ ও নারীর যে 'রূপ', তাহা তাহাদের বাহিরের 'রূপ'। এই 'রূপ' বা বিশিষ্ট আকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যে উহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব, তাহাই 'স্বরূপ'। এই দৃশ্যমান, স্থূল, প্রাকৃত 'রূপ'-এর অন্তরালে উহার 'স্বরূপ' অবস্থিত। জগতের প্রত্যেক পুরুষ 'রূপ'-এ পুরুষ, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ কৃষ্ণ, আবার প্রত্যেক নারী 'রূপ'-এ নারী, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ রাধা। নর-নারী যখন রূপের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিবে, তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নর-নারীর মিলন হইবে রাধা-কৃষ্ণের নিত্য প্রেম-লীলা; মর্ত্যের প্রাকৃত প্রেম-মিলন হইবে নিত্য বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সহজ-লীলা। ইহাই সংক্ষেপে রূপ-স্বরূপ-তত্ত্ব।

এই রূপ হইতে স্বরূপে উর্ধ্বগমন কি করিয়া সম্ভব হয়? তাহার জন্য সহজিয়ারা 'আরোপ'-সাধনের নির্দেশ দিয়াছে। 'আরোপ' কথাটির সাধারণ অর্থ এক বস্তুতে অপর বস্তুর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য স্থাপন বা কল্পনা। প্রাকৃত প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পর পরস্পরকে কৃষ্ণ-রাধা জ্ঞান করিয়া সাধনা করিবে। স্বরূপে যে তাহারা কৃষ্ণ-রাধা—এই উপলব্ধির পূর্ণতায় তাহারা কৃষ্ণ-রাধাত্ব প্রাপ্ত হইবে। 'রূপ'-এর মধ্য দিয়া তাহারা 'স্বরূপ'-এ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন রূপ ও স্বরূপ এক হইয়া যাইবে এবং প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণ-রাধারূপে নিত্য-লীলা-রস আস্বাদন করিবে। এই স্থূল দেহ বা রূপকে অপ্রাকৃত স্বরূপে উন্নীত করিবার সাধনাই 'আরোপ'-সাধনা। এই সাধনার দ্বারা প্রাকৃত সত্তা বিলীন হইয়া গিয়া অপ্রাকৃত সত্তার উদয় হয়। রূপ তখন স্বরূপে রূপান্তরিত হয়—"শ্রীরূপ স্বরূপ হয়, স্বরূপ শ্রীরূপ"। তখন 'এ-দেশ' 'সে-দেশে'র মিলন হইয়া যায়।[৪৫৬] এই অপ্রাকৃত স্বরূপ-সত্তাই 'সিদ্ধদেহ'। এই আরোপ-পদ্ধতি তাই সহজিয়া সাধনের ভিত্তি। চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদে আছে:

"মনুষ্য স্বরূপে করে কৌতুক বিহার।"

—'চম্পক-কলিকা' (স-প-প, ১৩০৭, ১ম সংখ্যা)

"সত্যরূপে জগৎ মধ্যে করয়ে বিহার"।

—বিবর্তবিলাস

৪৫৬। সে দেশে এদেশে অনেক অন্তর
জানয়ে সকল লোকে।

"ছাড়ি জপ তপ সাধহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।"

"স্বরূপে আরোপ যার রসিক নাগর তার
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।"

এই 'আরোপ'-সাধনই প্রকৃতপক্ষে 'স্বরূপ'-সাধন। 'রূপ'কে আশ্রয় করিয়া 'স্বরূপ'-এর সাধনাই সহজিয়া-বৈষ্ণব ও বাউলের সাধনা। ইহাই বাউলদের 'স্বভাব' ছাড়িয়া 'ভাব'-এ প্রবেশ করা বলিয়া অনেক গানে ব্যক্ত হইয়াছে।

'স্বরূপ'-ভজনের বৈশিষ্ট্য নানারূপে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত, রাগাত্মিকা বলিয়া কথিত নানা সহজিয়া-পদে এবং নরোত্তম, নরহরি, লোচন, বিদ্যাপতি প্রভৃতির ভণিতাযুক্ত সহজিয়া পদে বিবৃত হইয়াছে।

স্বরূপে আরোপই শ্রেষ্ঠ সাধনা :

"স্বরূপে আরোপ এই রসকূপ
সকল সাধন পর।
স্বরূপ বুঝিয়া সাধন করিলে
সাধক হইবে পার।"

কিন্তু এই সাধনায় রূপকে পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপকেই একান্ত করিয়া দেখিলে হইবে না, রূপের সঙ্গে স্বরূপ মিশাইয়া সাধনা করিতে হইবে :

"স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া
মিশাল করিয়া থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে শ্রীমতী পাবে॥"

এই রূপের মধ্য দিয়া স্বরূপের সাধনা অত্যন্ত কঠিন। রূপের সহিত স্বরূপ যে অঙ্গাঙ্গিভাবে, অচ্ছেদ্যভাবে, অণুতে পরমাণুতে জড়িত—এই উপলব্ধির মধ্যেই স্বরূপ-সাধনার সাফল্য :

সে দেশে এদেশে মিশামিশি আছে
এ কথা কয়ো না কাকে।

—চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদ

"স্বরূপ স্বরূপ অনেকে কয়।
জীবলোক কভু স্বরূপ নয়॥
স্বরূপ রসেতে মাধুর্য হয়।
তাহা বিনু মন কিছুই নয়॥

পদ্ম-গন্ধ হয় তাহার গতি।
তাহারে জিনিতে কার শকতি॥

*   *   *   *

স্বরূপ ভজিলে মানুষ পাবে।
আরোপ ছাড়িলে নরকে যাবে॥"[৪৫৭]

এই রূপ-স্বরূপ-তত্ত্ব বাউলরা কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে, দেখা যাক:

"কি সাধনে আমি পাই গো তারে।
ও সে ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানে পায় না যারে॥"—

লালন নিজের নিকটই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন।

দেহ-রূপ পর্বতের স্বর্ণ-মণ্ডিত চূড়ার নির্জন গহ্বরে তাহার বাস। সে উজ্জ্বল 'চন্দ্র-জ্যোতি-স্বরূপ'। সে-জ্যোতির্ময় রূপ তো ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়। কি ভাবে সে-রূপের দর্শন সম্ভব হয়? লালন নিজেই তাহার উত্তর দিতেছেন (অবশ্য গুরুর উপদেশ অনুসারে)

"তিন রসের সাধন করো,
রূপ-স্বরূপের তত্ত্ব ধরো,
লালন কয়, তবে যদি পারো
প্রাণ জুড়াতে সে রূপ হেরে॥" (গান নং ৬৫)

রূপ-স্বরূপের তত্ত্ব ধরিয়া তিন রসের সাধন করিলে সে রূপ-দর্শনের হয়তো সুযোগ ঘটিতে পারে। এই তিন রসের সাধনই বাউলধর্মের বিশিষ্ট সাধন। এই সাধনের মূলে কিন্তু ঐ রূপ-স্বরূপ-তত্ত্বটিই বিরাজ করিতেছে। (পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৪৫৭। সহজিয়া পদ, 'সহজিয়া সাহিত্য'—(বসু)—পৃঃ ৫৩, ৩৮, ৬৫

আর একটি গানে লালন এই তত্ত্বের কথা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন :

রূপের ঘরে অটলরূপ বিহারে
চেয়ে দেখ না তোরা।

* * * *

যে জন অনুরাগী হয়,
রাগের দেশে যায় ;
রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখতে পায়।
আছে রূপের দরজায়
শ্রীরূপ মহাশয়,
রূপের তালা-ছোড়ান তার হাতে সদায়।
যে জন শ্রীরূপগত হবে,
তালার ছোড়ান পাবে,
অধীন লালন বলে অধর ধরবে তারা॥”

(গান নং ১০৩)

এই মানব-দেহ-গৃহে অটল-রূপ বিহার করিতেছেন। এই অটল-রূপের নিকট পৌছিতে হইলে যে-দ্বার অতিক্রম করিতে হয়, তাহা শ্রীরূপের অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের অধীন। সে-ই সে-দ্বারের কর্তা। সে-দ্বারে রাগ অর্থাৎ প্রেমের তালা লাগান আছে, কিন্তু সে-তালার চাবি ঐ-শ্রীরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের হাতে রহিয়াছে। শ্রীরূপ-গত না হইলে সেই দ্বার খোলা পাওয়া যাইবে না—সে-গৃহে প্রবেশ করা যাইবে না। অর্থাৎ শ্রীরূপের সাধন ব্যতীত অটল-রূপ অর্থাৎ স্ব-রূপের দর্শন মিলিবে না। ‘এ-দেশ’-এর সঙ্গে ‘সে-দেশ’, ‘রূপ’-এর সঙ্গে ‘স্বরূপ’-এর মিশ্রণ না হইলে অটল-রূপের দর্শন মিলিবে না।

আর একটি গানে আছে :

“আমার মন, সাজ প্রকৃতি।
প্রকৃতির স্বভাব ধর, সাধন কর, উর্ধ্ব হবে দেহের রতি॥
যে আছে ষড়দলে,
তারে লও উল্টা কলে,
যদি সে যায় দ্বিদলে
উঠবে জ্বলে বাতি ;

তখন অনর্থ নিবৃত্তি হবে, নিষ্ঠা হবে রতি।
কাম-ব্রহ্ম সাকার হবে, উদয় হবে গুরুর মূর্তি ॥

*　　*　　*　　*

রূপচাঁদ বলছে স্বরূপ, আগে তুই ধরগে সে-রূপ,
স্বরূপ-রূপে রূপ দেখতে পাবি
কোটি সূর্যের জ্যোতি ॥"

(গান নং ৩১৩)

প্রকৃতির স্বভাব ধরিয়া সাধন করিতে হইবে। তাহাতে বিন্দু চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া স্থির ভাব ধারণ করিবে এবং উর্ধ্বগামী হইবে। বাউলের বহু গানে এবং বৈষ্ণব-সহজিয়াদের নানা পদে ও গ্রন্থে দেখা যায় যে, প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে। দেহ-ভোগাকাঙ্ক্ষাবর্জিত যে-মিলন, তাহা কাম-মিলন নয়—তাহাই প্রকৃত প্রেম-মিলন। ইহাকে বাউলরা 'জ্যান্তে-মরা' বলিয়াছে—ইহার উল্লেখ বাউলদের অনেক গানে পাওয়া যাইবে। পুরুষ-প্রকৃতি স্থূল দেহ-ভোগ-চেতনা বা কাম-চেতনা পরিহার করিয়া 'মৃত'বৎ আচরণ করিবে এবং ইহা দ্বারা প্রকৃত স্বরূপ-সাধনায় সাফল্য-লাভ হইবে। অনেক সহজিয়া-পদে ও গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে :

"প্রেমের পীরিতি　　অতি বিপরীত
দেহরতি নাহি রয়।

*　　*　　*　　*

প্রকৃতি হইয়া　　পুরুষ আচার
করিবে নারীর সঙ্গ।"

—চণ্ডীদাসের সহজিয়া-পদ

"আপনি পুরুষ　　প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।"

—রসসার গ্রন্থ

"স্বভাব প্রকৃতি হইলে তবে রাগরতি।"

—অমৃতরত্নাবলী

"প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃত সেবন।"

—নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী[৪৫৮]

৪৫৮। 'রাগাত্মিকা' পদের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত (বসু)—পৃঃ ২, ২৭ (২য় খণ্ড)

ষড়দল অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানচক্র জননেন্দ্রিয়ের মূলে অবস্থিত। ইহা ষড়দল-বিশিষ্ট, সিন্দুরের মতো ঘোর-লোহিতবর্ণ পদ্ম। মূলাধার (চতুর্দল) ও স্বাধিষ্ঠান (ষড়দল) স্থূল তত্ত্বের স্থান—পৃথিবী-তত্ত্ব ও তাহার দ্রব-আকার জলতত্ত্ব। তাহার পরই অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া জল-তত্ত্ব সূক্ষ্মত্ব ধারণ করে। যোগশিখোপনিষদে চতুষ্পীঠের মধ্যে স্বাধিষ্ঠানচক্রকে 'কামরূপপীঠ' বলা হইয়াছে।[৪৫৯] এই স্থানকে ও মূলাধারকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাভির নিম্নে মণিপুরচক্র পর্যন্ত স্থানকে, বাউলরা স্থূল কামের স্থান বলিয়া বুঝিয়াছে।

মূলাধারের চতুর্দল ও স্বাধিষ্ঠানের ষড়দল এই উভয়ের মিলিত দশমদলে কুলকুণ্ডলিনী বিরাজমান—বৈষ্ণব-সহজিয়ারা এইরূপ ধারণা করিয়াছে। হিন্দুতন্ত্রের চক্র ও পদ্মের সঙ্গে তাহাদের কিছু কিছু প্রভেদ আছে। তাহারা নাভির নিম্নদেশে প্রেম-সরোবর ও তাহার মধ্যে অষ্টদলপদ্মের কল্পনা করিয়াছে।[৪৬০] আবার কোনো গ্রন্থে নাভিতলে শতদল পদ্মেরও কল্পনা রহিয়াছে।

মোটামুটি নাভির নিম্নদেশে মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানকে বাউলরা স্থূল 'দেহরতি' বা কামের স্থল বলিয়া ধরে। এখানে প্রকৃতি-দেহে 'ফুল' প্রস্ফুটিত হয়, সেই 'ফুলের সাধন'ই প্রকৃত বাউল-সাধন। এইস্থানেই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের মিলন হয় এবং সেই সম্মিলিত 'মহারাগ'-শক্তিকে যোগ-ক্রিয়া দ্বারা উর্দ্ধগামী করিয়া দ্বিদলে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত করাইলে জ্যোতির্মণ্ডল-মধ্যবর্তী সাক্ষাৎ শৃঙ্গার-রসমূর্তি 'কামব্রহ্ম' কৃষ্ণের-দর্শনলাভ হইবে, ইহাই এই গান-রচয়িতা বলিতেছেন। সেই 'রসবতী যুবতী'ই ধন্য, তাহার কৃপাতেই কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু 'রূপ'কে অর্থাৎ প্রকৃতি-দেহকে আগে অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকৃতি-পুরুষের 'রূপ'-মিলন দ্বারা 'স্বরূপ-রূপ' অর্থাৎ কোটিসূর্য-জ্যোতির্ময় রাধাকৃষ্ণ-সম্মিলিত রূপ-দর্শনলাভ হইবে।

৪৫৯। যোগশিখোপনিষৎ, ১।১৭১ ও ৫।৬

৪৬০। "কুলকুণ্ডলিনী দশদল হয় নাভিমূলে"।

—চণ্ডীদাসের সহজিয়া-পদ

"নাভির নিম্নভাগে প্রেমসরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর।"

—চণ্ডীদাসের সহজিয়া-পদ

চব্বিশপরগণার অন্যতম আদি বাউল-গুরু রেজো ক্ষ্যাপার একটি গানে আছে :

"ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন,
তবে করগে যা স্বরূপ-সাধন ॥
স্বরূপের রূপ রূপের স্বরূপ,
স্বরূপ দেহে হয় মিলন ॥
রূপের দেহে স্বরূপের স্থিতি,
স্বরূপেতে রসের মানুষ করেন বসতি,
রসের মানুষ ধরবি যদি
রাগের পথে কর গমন ॥" (গান নং ৪২৪)

যদি দেহ-স্থিত ব্রজধামে ব্রজেশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হয়, তবে স্বরূপ-সাধন করিতে হইবে। স্বরূপ-দেহেই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। বাহ্য যে রূপ তাহা অভ্যন্তরীণ স্বরূপেরই বহিঃপ্রকাশ। রূপের অভ্যন্তরে স্বরূপ, আবার স্বরূপের প্রকাশ রূপের মধ্য দিয়া। সুতরাং রূপ ও স্বরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাহিরের রূপের মধ্যেই স্বরূপের অবস্থিতি,—স্বরূপেই 'রসের মানুষ' বা রসময় পরমতত্ত্ব বা কৃষ্ণের বাস। রাগের পথে বা প্রেম-মিলনের পথেই তাঁহার অনুসন্ধানে যাইতে হইবে।

পদ্মলোচন বলিতেছেন :

"ব্রজের শ্যামসুন্দরকে ধরবি যদি স্বরূপ সাধন করো।
নইলে হবার নয়, ও সে পাবার নয়,
তিন জন্ম যদি মাথা খোঁড়ো।" (গান নং ৪৩৩)

পাঞ্জ শাহ্ বলিতেছেন যে, সেই 'অধরা', 'গোপী-মন-চোরা', চৈতন্য-রূপী কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য লীলাসাঙ্গ করিয়া মানুষের স্বরূপেতে মিশিয়া আছেন। সেই স্বরূপের ভাব ও সাধন না জানিলে সেই 'অধর কালা' আল্লাকে পাওয়া যাইবে না। অন্য প্রকারের সাধনা, জপ, তপ, পূজা প্রভৃতি বৃথা :

"খুঁজে কি আর পাবি রে সে অধরা, সে নয়নতারা।
এই মানুষে মিশে আছে গোপী-মন-চোরা ॥
লীলা সাঙ্গ ক'রে গোরা
স্বরূপেতে মিশে আছে মায়া-পাসরা।
স্বরূপ-রূপ-রসে মিশে রসে হ'য়ে ভোরা" ॥ (গান নং ২৫২)

পাঞ্জ শাহের আর একটি গান এইরূপ :

"শুধু কি আল্লা ব'লে ডাকলে তারে
পাবি ওরে মন-পাগেলা।
যে ভাবে আল্লাতালা বিষমলীলা
ত্রিজগতে করছে খেলা ॥
কত জন জপে মালা তুলসী-তলা,
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,
আর কতজন হরি বলি মারে তালি
নেচে গেয়ে হয় মাতেলা ॥

কতজন হয় উদাসী, তীর্থবাসী,
মক্কাতে দিয়াছে মেলা।
কেউ মস্‌জিদে বসে তার উদ্দেশ্যে
সদায় করে আল্লা আল্লা ॥
স্বরূপে মানুষ মিশে, স্বরূপ-দেশে
বোবায় কালায় নিত্যলীলা।
স্বরূপের ভাব না জেনে চামর কিনে
হচ্ছে কত গাজীর চেলা ॥" (গান নং ২২৮)

যেমন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বুদ্ধ পরমতত্ত্ব বা দিব্যসত্তা-রূপে মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দেহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাউলদের নিকটেও চৈতন্যদেব সেইরূপ দেহ-প্রবিষ্ট পরমতত্ত্ব বা দিব্যসত্তারূপে পরিগণিত হইয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যদেবকে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত সত্তারূপে প্রচার করিয়াছিল। বহুলপ্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত বাউল-সম্প্রদায়ও তাঁহাকে প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত-রূপ হিসাবে, দেহ-মধ্যস্থিত পরমতত্ত্ব বা দিব্যসত্তারূপে গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য তাহাদের পরমতত্ত্ব বা দিব্যসত্তা কখনো কৃষ্ণ, কখনো আল্লা, কখনো চৈতন্য, কখনো সাঁই বা মুরশিদ, কখনো 'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'অটল মানুষ' প্রভৃতি।

এই স্বরূপ-সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রামের চেতনা দ্বারা আধিগম্য নয়, ইহা কেবল অনুভব বা উপলব্ধির জিনিস। ইহা বোবার সঙ্গে কালার কথাবার্তা বলার মতো,—

আভাসে ইঙ্গিতে অনুভব বা উপলব্ধি-গম্য বা অন্ধের দেখার মতো কেবলমাত্র অনুভূতির মারফতে দর্শন বা দিব্যদর্শন। এ-কথা অনেক গানে উল্লিখিত আছে। একটি গান এইরূপ :

"স্বরূপের বাজারে থাকি।
শোন রে ক্ষ্যাপা, বেড়াস একা,
চিনতে নারলে ধরবি কি ॥
কালার সঙ্গে বোবা কথা কয়,
কালা গিয়ে শরণ মাগে, কে পাবে নির্ণয় ;
আবার অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে
তার মর্মকথা বলব কি ॥" (গান নং ৩৮৯)

এই রূপ-স্বরূপ তত্ত্বই বাউল-সাধনার মূলকথা। বাউলরা জগতের নর-নারীর মধ্যে পরমতত্ত্বের দ্বিধা-বিভক্তরূপে আত্মপ্রকাশ কল্পনা করিয়াছে এবং উভয়ের মিলন দ্বারা নিত্যানন্দময় আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধির সাধনা করিয়াছে। হিন্দুজাতির প্রায় সকল বাউল এবং মুসলমান জাতিরও অনেক বাউল এই পরমতত্ত্ব বা পরমাত্মা বা 'মনের মানুষ'কে শ্রীকৃষ্ণ এবং পুরুষ-প্রকৃতিকে কৃষ্ণ-রাধা বা 'রস-রতি'-রূপে বর্ণনা করিয়াছে এবং সহজিয়া-বৈষ্ণবদের নানা ভাব-কল্পনাও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। বাউলদের উপর সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের প্রবল প্রভাব তাহার কারণ। মূলতঃ সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের সাধন-ক্রিয়া-সমন্বিত একটা বিশিষ্ট নবরূপই বাউলধর্ম।

চতুর্থ অধ্যায়

বাউলধর্মের সাধনা

এই অধ্যায়ের প্রথমেই একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাউলরা তাহাদের সাধনার ক্রিয়াগুলি সযত্নে গোপন করে। তাহাদের স্থূল ক্রিয়াগুলি সাধারণ লোকে জানিলে হয়তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা ঘৃণা-নিন্দা করিবে ভাবিয়া তাহারা এই গোপনতা ধর্মাদেশের মতোই রক্ষা করিয়াছে। "আপন ভজন-কথা না কহিবে যথা-তথা, আপনাতে আপনি হইবে সাবধান"—এই কথাগুলি প্রায়ই তাহাদের মুখে শুনা যায়। রাঢ়ের বাউলদের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি: "যে জানে না উপাসনা, সে যেন পদ্মলোচনের পদ শুনে না।" যাহারা এই পথের সাধক, তাহারা ব্যতীত সাধনার কথা শুনিবার যোগ্য আর কেহ নয়। তাহারা ব্যতীত এই সব ক্রিয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কেহ বুঝিবে না। এই সাধনার ক্রিয়া-পদ্ধতি 'মহাজন'-পদে অর্থাৎ গুরুস্থানীয়, সাধন-বিষয়ে লব্ধজ্ঞান বাউলদের গানে এই ধর্ম-পথের পথিক ও অধিকারীদের জন্য সাংকেতিক ও ইঙ্গিতাত্মক ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই পদ বা গান ব্যতীত এই সাধন-তত্ত্ব জানিবার আর একটি উপায় হইতেছে বাউলদের মৌখিক আলোচনা। এই আলোচনা হয় সাধারণতঃ সমধর্মাবলম্বী বাউল-সাধকদের মধ্যে, গুরু-শিষ্যের মধ্যে বা তত্ত্বান্বেষী অধিকারীদের মধ্যে। প্রায়ই তাহারা একস্থানে সমবেত হইয়া গান করে ও তত্ত্বালোচনা করে। এই সব বৈঠক বা চক্রে, গানে প্রকাশিত তত্ত্ব বা সাধন-বিষয় অবলম্বনে মূলতঃ আলোচনা হইলেও গানের বাহিরে সাধন-সংক্রান্ত অনেক বিষয় আলোচিত হয়। যেরূপভাবেই হোক, বাংলার নানা প্রান্তে এই ধরণের বহু বৈঠক বা চক্রে আমি উপস্থিত থাকিবার এবং আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। গানের বাহিরেও সাধন-সংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটি বিষয় আমার জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। সাধনা-বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় গানের বাহিরের সেই-সব ক্রিয়া বা পদ্ধতির কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করিব। তাহাতে বাংলার বাউলদের সাধন-পদ্ধতির একটা স্পষ্ট রূপ পাওয়া যাইবে।

আর একটি জিনিস এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাউলরা তাহাদের সাধন-ক্রিয়া বা তত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনার সময় প্রতি পদে নজীর বা প্রমাণ (authority) উদ্ধৃত করে। এই প্রমাণ সাধারণতঃ গানের অংশবিশেষ, কখনো বা চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের সহজিয়া-পদের দুই-চারি লাইন, কখনো বা 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর কয়েক লাইন (অবশ্য তাহাদের মতানুসারে ব্যাখ্যাত), কখনো বা 'বিবর্তবিলাস' ও অন্যান্য সহজিয়া-গ্রন্থের দুই-একটি অংশ প্রভৃতি। তাহারা এইগুলিকে নজীর-স্বরূপ ব্যবহার করে। তাহাদের ভাবটা যেন এইরূপ—"নামূলং কথ্যতে কিঞ্চিৎ"। তাহাদের মুখে এমন অনেক লাইন শুনিয়াছি, যাহা কোনো গানে বা কোনো প্রকাশিত গ্রন্থে নাই। কোন্ গ্রন্থে আছে—জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কোনো অপরিচিতনামা গ্রন্থ বা 'কড়চা' বা কোনো মহাজনের দুষ্প্রাপ্য পদের নাম করিয়াছে, অনেক সময় 'গুরুমুখে প্রাপ্ত'-এইরূপও বলিয়াছে। এই টিপ্পনী-জাতীয় পংক্তিগুলি দেখিয়াছি, অনেকস্থলে কোনো ভাবকে গান অপেক্ষাও বেশি প্রকাশ করে। একবার এক বাউল-বৈঠকে এক ফকির রহস্য-ছলে বলিয়াছিল যে, এই চুটকিগুলি তাহাদের হদিস। মুসলমানধর্মাবলম্বীরা দুই মত বা নির্দেশ মানিয়া চলে,—এক কোরান শরীফের আর এক হদিস শরীফের। কোরান ঈশ্বরের বাণী, আর হদিস মহম্মদের বাণী। মহাজনদের পদ তাহাদের কোরাণ স্বরূপ, আর এই গুরু-দরবেশদের কথা তাহাদের হদিস-স্বরূপ। এই দুই মতই তাহাদের ধর্মসাধনার ভিত্তি। আমি এই পদ্য ও গদ্যময় মৌখিক উক্তির অনেক নোট রাখিয়াছিলাম। আমাদের আলোচনায় এই টিপ্পনীগুলির দুই-চারিটি প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করা যাইবে।

বাউলদের মূলসাধনা সারা বাংলায় একপ্রকার, তবে ক্রিয়ার খুঁটিনাটিতে স্থানভেদে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহাদিগকে মোটামুটি তিনটি সম্প্রদায়ে ভাগ করা যায়। মুসলমান বাউল বা ফকির সম্প্রদায়,—উভয় বঙ্গেই ইহাদের পদ্ধতি প্রায় সমান। নবদ্বীপ-সম্প্রদায়,—ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলে হিন্দুজাতির বাউল। 'রসিক বৈষ্ণব' নামেও ইহারা অভিহিত হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং বর্ধমানের কতকাংশের বাউলদের আমি এই কেন্দ্রীয় প্রভাবের অন্তর্গত মনে করি। ইহাদের সাধন-পদ্ধতিও একই প্রকারের। পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার বাউলদের আমি রাঢ়-সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করি। ইহাদের সাধন-পদ্ধতিতে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সামান্য একটু প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছি।

আবার গুরু-ভেদেও সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু প্রভেদ দেখা যায়। তবে সেগুলি সামান্য বিষয়ে—মূলক্রিয়া সবই সমান। যথাস্থানে ভেদগুলির উল্লেখ করিব।

পূর্বে নানা প্রসঙ্গে বাউলধর্মের তত্ত্ব বা দর্শনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বৌদ্ধ-সহজিয়া ও বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব-সহজিয়া-মতবাদের যে তত্ত্ব বা দর্শন, তাহাই বাউলধর্মের দার্শনিক ভিত্তি-ভূমি। ইহা আমরা পুর্বে দেখিয়াছি। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সাধনাংশের একটা বিশিষ্টরূপ বাউল-ধর্ম।

দেহকে কেন্দ্র করিয়াই বাউলদের সাধনা :

"নরদেহ নৈলে কোন তত্ত্ব নাহি জানে।
সাধনের মূল এই নরদেহ গণে॥"[৪৬১]

দেহের বাহিরে উহাদের কোনো তত্ত্ববস্তু বা সাধনা নাই। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" দেহের বাহিরে বৈকুণ্ঠাদি-কল্পনাকে তাহারা 'অনুমান' বলিয়াছে, 'বর্তমান' নিজের দেহভাণ্ড। 'অনুমান' তাহারা মানে না, 'বর্তমান' ছাড়া তাহাদের সাধনা নাই :

"বৈকুণ্ঠ আদি সপ্ত সগ্য অপ্রকিত হয়।
তার সঙ্গে নিত্ত জিব অনুমানে কয়॥
অনিত্য সংসার অনুমানে সপ্তভূমি।
প্রকিতি জিবের স্থিতি ব্রহ্মাণ্ড বাখানি॥
স্থাবর জংঙ্গম তাহে অনিত্য সকল।
*　　*　　*
বত্তমানে দেহভাণ্ড দেখ বিচারিআ।
ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড দেখ সাবধান হআ
ব্রহ্মাণ্ডেতে জাহা হয় ভাণ্ডে তাহা আছে।
বত্তমানে দেখ ভাই আপনার কাছে॥"[৪৬২]

এই দেহেই পরমতত্ত্ব বা পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণ বা 'সাঁই' বা 'আলেখ-নূর' বাস করেন। পরমাত্মা প্রথমে একা ছিলেন। তখন তিনি রস আস্বাদন করিতে পারেন নাই। তাই তিনি নিজেকে প্রকৃতি-রূপে দ্বিধা-বিভক্ত করিলেন এবং এইরূপে

৪৬১। 'বৃহৎ দেহনির্ণয়' পুঁথি, মৎসংগৃহীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ৫১৩

৪৬২। 'বৃহৎ নিগম গ্রন্থ', মৎসংগৃহীত। ইহার বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

তাঁহা হইতেই প্রকৃতির উদ্ভব হইল। এই যে প্রকৃতির সৃষ্টি, ইহা উপনিষদের ভাষায় 'রমণ'-এর জন্য। রসের মধ্যে মধুর বা শৃঙ্গার-রসই শ্রেষ্ঠ। এই শৃঙ্গার-রস-আস্বাদনের জন্যই পরম-একের প্রকৃতি-রূপে দ্বিধা-বিভক্তি। প্রকৃতি মধুর রসের আধার—মাধুর্যেই প্রকৃতির মূলসত্তা নিহিত। মাধুর্যের স্থূল প্রকাশ প্রকৃতির রজে। রজঃই তাহার প্রকৃতিত্বের মূলপরিচয়-জ্ঞাপক। ইহা একাধারে আনন্দ-লীলা বা রতি-বিলাস এবং সৃষ্টির মূলভিত্তি। তাই প্রকৃতি একাধারে রমণী ও জননী।

এই যে একের প্রকৃতি-পুরুষ-রূপে দ্বিধাবিভক্তি, ইহাতে কোন অংশই অন্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হয় না, উভয়ের মধ্যেই উভয়ের অংশ বর্তমান থাকে। পুরুষের দেহের মূলরূপ পুরুষ হইলেও তাহার মধ্যে প্রকৃতির অংশও আছে, আবার প্রকৃতির মধ্যেও পুরুষের অংশ আছে। পুরুষ দুই তত্ত্বের এক ও অভিন্ন আধার, আবার নারীও দুই তত্ত্বের এক ও অভিন্ন আধার। সেই এক পরম লীলাকারী সত্তা দুই দেহেই প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রস-লীলা আস্বাদন করেন।

প্রকৃতির সত্তা যেমন রজে, পুরুষের সত্তা তেমনি বীজে। এই রজোবীজের মিলনে যেমন সৃষ্টি, অপর দিকে ইহাই তেমনি শৃঙ্গার-বিলাসের মূল। দেহের মধ্যে মস্তকে সহস্র-দলপদ্মে বীজ-রূপে পরমাত্মা অবস্থিত। তাঁহার স্বরূপ স্থির, নিস্তরঙ্গ, অচঞ্চল, কিন্তু লীলা-কারী বলিয়া বীজ-রূপী তিনি রজোরূপী প্রকৃতির রসাস্বাদনের জন্য প্রকৃতির সহিত মিলিত না হইয়া পারেন না। তাই রজঃপ্রবর্তনের তিনদিন তিনি মস্তক হইতে নামিয়া আসিয়া রজের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রকৃতির মূলাধারে আত্ম-প্রকাশ করেন। রজের মধ্যে তিনি মিলিত হন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও রজের স্বরূপ বিভিন্নমুখী। রজঃ অগ্নিময়ী, সৃষ্টিক্রিয়া-রূপিণী ও আকর্ষণকারিণী; ইহাই কাম-স্বরূপিণী। কিন্তু বীজ অচঞ্চল ও প্রেম-স্বরূপ। জল ও দুধের মতোই ইহাদের মিলন, কামের সঙ্গে প্রেম একেবারে মিশ্রিত। সুতরাং জল ও দুধকে পৃথক করিতে হইবে। এই দুধই অচঞ্চল বীজ। ইনিই লীলাময় 'সহজ মানুষ'। এই সহজ মানুষের বা মনের মানুষের আবির্ভাব হয় প্রকৃতির রজে। প্রকৃতির দেহাধারে তিন দিনের জন্য ইহার আবির্ভাব ঘটে। তারপর চতুর্থ দিনে আবার নিত্যস্থানে স্বরূপে তাঁহার অবস্থিতি ঘটিয়া থাকে।

এই তিনদিনই বাউলদের সাধনার প্রশস্ত সময়। ইহাই 'মানুষ ধরা'র সময়। এই তিন দিনের শেষে পূর্ণভাবে সহজ মানুষের আবির্ভাব হয়। ইহা সাধকের অনুভূতি-সাপেক্ষ। এই সহজ মানুষের স্বরূপের অনুভূতি শৃঙ্গারে

অচঞ্চল বীজোদ্ভূত আনন্দানুভূতি। এই আনন্দানুভূতিকে যোগ-ক্রিয়ার দ্বারা ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী করিয়া দ্বিদলপদ্ম পর্যন্ত উঠাইলে অটলবীজ-রূপী ঈশ্বর-রূপের সঙ্গে শৃঙ্গার-লীলাময় সহজ-মানুষ-রূপের মিলনে নিরন্তর অপরিসীম শৃঙ্গারানন্দের অনুভূতি জাগে। মূলতঃ পরমতত্ত্বের স্বরূপই এই প্রকৃতি-পুরুষের মিথুন-ঘটিত মহোল্লাসময় অবস্থা। এই অবস্থা-লাভই বাউলের সাধনার চরম লক্ষ্য। ইহাই তাহার আত্মোপলব্ধি—'সহজ'-অবস্থা-লাভ।

অতি সংক্ষেপে ইহাই বাউল-সাধনার মূলকথা। বাউল-গান বিশ্লেষণ করিলে ইহা পরিস্ফুটভাবে দেখা যাইবে।

এখন গানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্বে কতকগুলি সাংকেতিক বা পারিভাষিক শব্দের একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

প্রকৃতির রজঃ-প্রবৃত্তির তিনদিনকে বাউলরা "মহাযোগ" বলে। এই সুসময়ে তাহারা "মানুষ-ধরা"র সাধনা করে। এই সাধনাই তাহাদের প্রধান সাধনা।

মহাযোগ

এই রজঃস্রাবের সময়টিকে তাহারা "অম্বুবাচি", "অমাবস্যা" প্রভৃতি নামেও অভিহিত করিয়াছে। রজঃকে অনেকস্থলে তাহারা "রূপ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইহাই প্রকৃতির স্বরূপ-রূপ।

মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণদিকে পিঙ্গলা নাড়ী এবং মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত। ইহারা মূলাধারে মিলিত হইয়াছে। তন্ত্রে এই

ত্রিবেণী

তিনটি নাড়ীকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী এবং ইহাদের মিলনকে "ত্রিবেণী" বলা হয়, ইহা আমরা দেখিয়াছি। প্রতিমাসে প্রকৃতির যে রজঃস্রাব হয়, তাহাকে বাউলরা ত্রিবেণীর ত্রিধারা-বিশিষ্ট নদী-প্রবাহ-স্বরূপ কল্পনা করিয়াছে। এই প্রবাহকে তাহারা অনেক সময় "জোয়ার" বা "বন্যা" বলিয়াছে। এই নদী-ধারায় অধর মানুষ "মীন" রূপে আবির্ভূত হন। এই সময় সাধক ত্রিবেণীর "ঘাট"-এ "মৎস্য" শিকার করিবে—অর্থাৎ অধর মানুষকে ধরিবে। বহু গানে ইহার উল্লেখ আছে। ত্রিবেণীর এই প্রবাহকে তাহারা "সিন্ধু", "রূপ-সাগর" "শ্রীরূপ-নদী" প্রভৃতি নামেও উল্লেখ করিয়াছে।

দেহ-চক্রের সর্বনিম্নচক্রে মূলাধারে চতুর্দলপদ্ম অবস্থিত। পূর্বে বলিয়াছি যে, মূলাধার বলিতে বাউলরা স্বাধিষ্ঠান অর্থাৎ ষড়্‌দলকেও অনেক সময় বুঝিয়া থাকে, অনেক সময় মূলাধারে অষ্টদলপদ্মও কল্পনা করে। মোটকথা,

জননেন্দ্রিয়ের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানকে তাহারা মূলাধার বলিয়া বুঝিয়া থাকে।

ফুল

মূলাধারে রজের আবির্ভাবকে তাহারা "ফুল" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মনে হয় চক্রের বিভিন্ন পদ্ম-কল্পনার অনুসরণে সমগ্র রজঃ-প্রকাশকে তাহারা একটি রক্তবর্ণ ফুলের আকারে কল্পনা করিয়াছে। সংস্কৃতে রজের প্রতিশব্দ 'পুষ্প' বা ফুল। আবার জরায়ুর মধ্যে সন্তানোৎপত্তির সঙ্গে যে লোহিতবর্ণ মাংসপিণ্ডের সঞ্চার হয় তাহাকেও 'ফুল' (placenta) বলা হয়। যে কারণেই হোক, রজের এই বিকাশকে তাহারা "ফুল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ইহা "অষ্টদলপদ্ম", "রাধাপদ্ম", "যোনিপদ্ম" প্রভৃতি নামেও বাউলদের পুঁথিতে ও গানে বর্ণিত আছে।

রজঃ জলীয় পদার্থ। তাহাকে "নীর" বা জল বলিয়া বাউলরা অভিহিত করিয়াছে। বহুস্থলে তাহাকে "কারণ-বারি" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে। কারণ-বারিতেই সৃষ্টির বীজ ভাসিতে থাকে। সমস্ত জীবসৃষ্টির মূল রজঃ ও বীজ। এই রজঃ ও বীজ বা শোণিত ও শুক্রই প্রাণিদেহকে গঠন করিয়াছে, ইহাই তাহার মূল উপাদান। এই শোণিত মাতৃশক্তি ও শুক্র পিতৃশক্তি। এই উভয় শক্তির মিলিত রূপ বা যুগলই মানবের মূলসত্তা। শুক্রকে বাউলরা "ক্ষীর"

নীর ও ক্ষীর

বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। মানবদেহে "নীর" ও "ক্ষীর" একত্রে বিরাজ করিতেছে। এই রজোবীজ বা "নীর-ক্ষীর"-মিলিত সত্তা মানুষের 'সহজ'-সত্তা—ইহাই 'সহজ' মানুষের স্বরূপ। সহজ মানুষ "নীরে-ক্ষীরে যুগলে আছেন", "নীরে-ক্ষীরে খেলা" করিতেছেন। 'নীর'-এর স্বরূপ অগ্নিময়ী, সৃষ্টিক্রিয়া-রূপিণী, সুতরাং ইহা মোহ-সৃষ্টিকারিণী, আকর্ষণ-কারিণী, উন্মাদনা-কারিণী,—তন্ত্রের ভাষায় ইহাই 'শক্তি', 'মায়া' 'মহামায়া', 'মূলা প্রকৃতি', 'অবিদ্যা' 'কুণ্ডলিনী' প্রভৃতি। বাউলরা ইহাকে বলিয়াছে 'রতি'। এই রতিতে স্থূল দেহাকর্ষণ বা কামের স্বরূপ বর্তমান। আর 'ক্ষীর' বলিতে তাহারা বুঝিয়াছে, একটি অচঞ্চল আনন্দময় অবস্থা, যাহার স্বরূপ হইতেছে প্রেম। কিন্তু নীর ও ক্ষীর, কাম ও প্রেম একাধারেই বর্তমান, তাহাকে পৃথক করিবার উপায় নাই। তাই সাধনায় রসিক সাধক হংসের মতো 'নীর' হইতে 'ক্ষীর' বাছিয়া লইবে। ত্রিবেণীর নদী-প্রবাহকে তাহারা 'নীর-নদী' বা অনেক সময় 'ক্ষীর-নদী'ও বলিয়াছে। কারণ এখানে 'নীর' ও 'ক্ষীর' উভয়েই বর্তমান।

প্রকৃতির কারণ-বারিকে বাউলরা অনেক সময় 'রাগ' বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছে। রাগের প্রকৃত স্বরূপ কাম। এই কাম-পথকে অবলম্বন করিয়া যে-সাধনা অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক যে সাধনা, তাহাই রাগের পথের সাধনা। বাউলরা তাহাদের সাধনাকে 'রাগের ভজন', 'রাগের করণ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছে। বহু গানে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাদের 'মনের মানুষ'কেও তাহারা 'রাগের মানুষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

রাগ

'চন্দ্র' শব্দটি বাউলরা বিভিন্ন অর্থে বুঝিয়াছে এবং তাহাদের সাহিত্যেও এই শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 'চন্দ্র' শব্দে সাধারণতঃ এই কয়টি অর্থ বুঝায়,—(১) শুক্র, (২) শুক্ররূপী মনের মানুষ বা সহজ মানুষ, (৩) প্রেম, (৪) সাধনা-লব্ধ, প্রত্যক্ষ অনুভূতির জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান (৫) চন্দ্রবৎ জ্যোতির্ময় পদার্থ, (৬) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই—পঞ্চভূতের সম্মেলনে যে দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, তাহার চারিটি ভূত-স্বরূপ বা chemical substance-এ পরিণত চারিটি পদার্থ—মল, মূত্র, রজঃ, শুক্র। ইহাকে "চারি চন্দ্র" বলে। আবার দেহের বিভিন্ন স্থানে চন্দ্রের অবস্থিতি কল্পনা করিয়াছে বাউলরা। দেহের মধ্যে মোট সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র বর্তমান আছে—এইরূপ অনেক বাউল-গানে পাওয়া যায়। করনখে ১০, পদনখে ১০, দুই গণ্ডে ২, অধর ১, জিহ্বা ১, ললাটে ॥০ (অর্ধ)—এই মোট ২৪॥০ 'চন্দ্র'। আবার "অষ্টম ইন্দু" বা আটটি চন্দ্রেরও নির্দেশ আছে,—মুখ ১, স্তন ২, হস্ত ২, বক্ষ ১, নাভি ১, উপস্থ ১—এই অষ্ট ইন্দু বা 'চন্দ্র'। একটি গানে আছে:

চন্দ্র

"রস ভিয়ান করে সহজে সহজে,
সাধু বৈদ্য রসরাজে রাজে।
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র, একাদশ কলি,
অষ্টম ইন্দুকাল মাঝে মাঝে ॥" (গান নং ২৪৯)

কতকগুলি গানে দেখিয়াছি, নানা অর্থে 'চন্দ্র' বা 'চাঁদ' শব্দটি ব্যবহার করিয়া হেঁয়ালি-সৃষ্টির চেষ্টা আছে। যেমন 'হরি' শব্দটি লইয়া একটি হেঁয়ালী আছে—"হরির উপরে হরি, হরি বসে তায়। হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়॥" হরি অর্থে জল, পদ্মফুল, ব্যাঙ ও সাপ। জলের উপর পদ্মফুলে ব্যাঙ বসিয়া ছিল, সে সাপকে দেখিয়া জলে লুকাইল। 'চন্দ্র' শব্দটি লইয়াও ঐরূপ একটি কৌশল-প্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়।

"রস" বলিতে বাউলরা সাধারণতঃ দ্রবীভূত পদার্থ বুঝিয়াছে। ইহা শুক্রকে বুঝাইয়াছে, রজঃকে বুঝাইয়াছে, আবার মূত্রকেও বুঝাইয়াছে।

রস

আবার কোনো সময় শুক্র-শোণিতের মিলিত অবস্থাকেও 'রস' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক গানেই 'রসের ভিয়ান করা'—কথাটি পাওয়া যায়। 'রসের ভিয়ান করা' তাহাদের সাধনার প্রধান কথা। বাউলদের ভজন 'রসের ভজন' বলিয়া অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

দেহের মধ্যে বহু প্রকারের রসের অবস্থিতি এবং তাহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে বাউল-সাধকগণ বিশেষ অবহিত ছিলেন। মনে হয়, প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনের চরম আনন্দানুভূতি অধিগম্য করার পক্ষে সর্বদেহের endocrine glands-এর ক্রিয়া বাউলরা অবগত ছিল। ইহাদের গানের মধ্যে এবং বাউল-ভজন সম্বন্ধে যে-কয়খানি পুঁথি আমি পাইয়াছি, তাহার মধ্যেও প্রকৃতি-পুরুষের দেহে নানা রকমের রসের উল্লেখ আছে। 'মাধববিবির কড়চা' বলিয়া কথিত পুঁথির মধ্যে আছে :

"দেহকে জানিবে ভাই রস সরবব।
পিকিতি পুরুস দেহ রসের সাগর ॥

* * *

আপুনি লাএক হন লাএকা আপুনি।
আপুনি আস্বাদে রস রত্নচিন্তামণি ॥
চতুর্ব্বিংস গুন ধরে রসে করে আলা।
অতেব লাইকাতত্ব পুরাণে লিখিলা ॥"[৪৬৩]

"রসময় সরোবর অতেব বাখানি।
রসে ঢল ২ সদা প্রেমতরঙ্গিনি ॥
তরঙ্গ নিস্কল জল রন্ধ্র সরবর।
তাহাতে ডুবিআ আছে মদনমগর ॥"[৪৬৪]

৪৬৩। মৎসংগৃহীত পুঁথি পৃঃ ৮। মাধববিবি বীরচন্দ্রের শিক্ষাগুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেক মুসলমানী শব্দ আছে। তবে কে ইহার রচয়িতা, তাহা বুঝা যায় না। এক স্থানে কৃষ্ণদাসের উল্লেখ আছে। তিনি এই পুঁথির লেখক হইতে পারেন। পুঁথির কোথাও রচনাকালের উল্লেখ নাই।

৪৬৪। 'মৎসংগৃহীত পুঁথি দেহনির্ণয়'। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি নং ৬১৩। উভয়ই এক পুঁ

আবার বাউল-সাহিত্যে রস অর্থে রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রস—কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল, মধুর—এই ষড়রসকেও কোনো স্থলে বুঝাইয়াছে। দুই একটি স্থলে অলংকার-শাস্ত্রের নবরস—আদি বা শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত—এই নবরসকেও বুঝাইয়াছে। অনেক স্থলে 'রস' বলিতে শান্ত, দাস্য, সৌখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরসকেও বুঝাইয়াছে।

প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলিত দেহ-সাধনাকে বাউলগণ এক উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে। দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া একাত্ম হইয়া তাহারা এই প্রাকৃত মিলনকে অপ্রাকৃত মিলনে পরিণত করে :

"কেবল স্ত্রী-পুরুষে রমণ করা নয়,
আত্মায় আত্মায় রমণ হ'লে
রসিক তারে কয়॥" (গান নং ৩৪৮)

প্রাকৃত দেহ মিলাইয়া গিয়া ভাব-দেহেই এই মিলন সম্ভব। তাই বাউল গাহিয়াছেন :

"বাহ্য দেহ গেলে হবে সে ভাব উদ্দীপন ;
তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি,
থাকবে না তার কোন স্থিতি,
অকৈতব যেন ক্ষিতি, বাক্য নাই,
সুনির্মল রসিক জনা সেই তো ভাই।" (গান নং৩৪১)

বাউল-সাধনা-প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত বহু বৈষ্ণব সহজিয়া-পুঁথি পর্যবেক্ষণ করিয়া বৈষ্ণব-সহজিয়া-সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের নমুনা-স্বরূপ 'সহজিয়া-সাহিত্য' নামে যে-সংকলন প্রকাশ করিয়াছেন, নানা দিক দিয়া তাহা যথেষ্ট মূল্যবান। তিনিই সর্বপ্রথম বহুপরিশ্রম-সহকারে পুরাতন, অস্পষ্ট, অনেকস্থলে দুষ্পাঠ্য পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া আমাদের জন্য সহজিয়া-সাহিত্যের একটা নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তারপর বৈষ্ণব-সহজিয়া-মতবাদ সম্বন্ধে নানা আলোচনাপূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও লিখিয়াছেন এবং চণ্ডীদাসের কতকগুলি রাগাত্মিকা পদের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এই বিরলপ্রচার ও গুহ্য ধর্মশাখার প্রথম পরিচয়দানকারী হিসাবে তিনি বাংলার সাহিত্য ও বাংলার ধর্মালোচনাকারীদের নিকটে নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

কিন্তু সহজিয়া-বৈষ্ণবের কি নির্দিষ্ট সাধন-প্রণালী ছিল, তাঁহার নিকট হইতে তাহা জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। কেবল সাধনে পরকীয়া-গ্রহণ, প্রেমের প্রাধান্য ও ইহার দুরূহতার বিষয় সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া কোন্ নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহারা সাধনা করিত, তাহা উল্লেখ করেন নাই। যে-সব সহজিয়া-গ্রন্থের বিবরণ তিনি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে সাধন সম্বন্ধে যে-সব ইঙ্গিত আছে, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। তাহাদের সাধনা কিপ্রকার তাহা জানিবার জন্য কোনো চেষ্টাও হয়তো তিনি করেন নাই। অথচ দেশে রসিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না, ত্রিশ বছর পূর্বে তাহাদের সংখ্যা আরও বেশি ছিল। চেষ্টা করিলে তিনি তাহা অবগত হইতে পারিতেন। তাহা হইলে নূতন জ্ঞানের আলোকে তাঁহার মতো একজন সুযোগ্য ব্যক্তির হাত হইতে আমরা সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর্যাপ্ত সুযোগ ও অবসর লাভ করিয়াও তিনি তাঁহার কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাংলার একটি গোপন অথচ সক্রিয় ধর্মশাখার সাধনার বিষয় সেই ধর্মাবলম্বীদিগকে জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই। তাহার ফলে অনেক বিষয়ের ইঙ্গিত তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যে রাগাত্মিকা পদগুলিতে এই সাধনের নানা ইঙ্গিত আছে, তাহার ব্যাখ্যায় তিনি বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ এবং সহজিয়া-পুঁথি হইতে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। তিনি 'রূপ', 'রতি', 'রস' প্রভৃতি শব্দগুলির সাধারণ ভাবমূলক বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সাধন-ব্যাপারে এগুলির যে তাৎপর্য আছে, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এমন কি, সহজিয়া-সাধন-প্রণালীর ইঙ্গিত-জ্ঞাপক একখানামাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ 'বিবর্ত-বিলাস'-এর 'বস্তু' ও 'গ্রহ' শব্দের ব্যাখাকে ঘোর তান্ত্রিক ব্যাখ্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৪৬৫] অন্য একটি স্থলে 'বিবর্তবিলাস' হইতে যে তিনি অংশটি উদ্ধৃত-করিয়াছেন, তাহাতে 'রস ভিয়ান' করার তাৎপর্য লক্ষ্য করেন নাই।[৪৬৬] তারপর যে-সব সহজিয়া-গ্রন্থের পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোনো কোনো গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকা সম্ভব, কিন্তু সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেন নাই বলিয়াই মনে হয়। আমি নানা আখড়া ও বাউলদের নিকট হইতে যে-পুঁথিগুলি সংগ্রহ

৪৬৫। রাগাত্মিকা পদের ব্যাখ্যা—বসু, ১ম—পৃঃ ২৬

৪৬৬। ঐ ২য়—পৃঃ ২১

করিয়াছি, তাহার মধ্যে 'দেহনির্ণয়' নামে একখানা পুঁথি আছে। এই পুঁথিখানিতে দেহের নানাস্থানে নানা রকমের সরোবর, পদ্ম, ঘাট, দ্বীপ, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা আছে। এই বইখানির নাম বাউল-মোহান্তদের নিকট শুনিয়াছি এবং ইহার কোনো কোনো অংশের মৌখিক উদ্ধৃতিও তাহাদের নিকট শুনিয়াছি। মণীন্দ্রবাবু এই বই-খানির একপৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা দিয়াছেন।[৪৬৭] পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সেই গ্রন্থ ও আমার সংগৃহীত গ্রন্থ একই। কিন্তু ইহার মধ্যে 'কটিদেশনির্ণয়', 'নাভিপদ্মনির্ণয়' 'সরোবরের ঘাট কথন' প্রভৃতি অধ্যায়ে এমন অনেক পংক্তি আছে, যাহা নিঃসন্দেহে সাধন-সংকেত-জ্ঞাপক। ঘাট-বর্ণনায় আছে :

> "উত্তর ঘাটের কথা স্থন ভক্তগণ ॥
> উত্তর ঘাটে পদ্ম পফুল্লিত হয়।
> ঋতুরতিস্থান সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
> দু পক্ষ অন্তর পদ্ম ফুটে তিন দ্বিন।
> তেদণ্ডি দণ্ডির পর সে পদ্ম মলিন ॥
> তিন দিন তিন ধারা পদ্ম মধু উঠে।
> জেজন রসিক ভক্ত সেই প্রেম লুঠে ॥"

ইহাই 'রসিক ভক্ত' বা বাউল-সাধকের ভজনা। মণীন্দ্রবাবুর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই।

মণীন্দ্রবাবুর আলোচনা দৃষ্টে মনে হয় যে, পূর্ব-গঠিত একটি মতবাদের পটভূমিকায় তিনি সহজিয়া সাহিত্য বিচার করিয়াছেন। তাহা এই—বৈষ্ণব-সহজিয়াধর্মের সহিত বৌদ্ধ-সহজিয়াধর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই, ইহা একেবারে চৈতন্য-পরবর্তী। ইহা প্রেমের ধর্ম, তান্ত্রিকতার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বাহ্যতঃ দেখা গেলেও তাহা ধর্তব্য নয়।

এই অভিমত কি ইতিহাস-সম্মত ও বিচারসহ? যাহাহোক, এ সব আলোচনার স্থান ইহা নহে, তবে কেবল আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহার মতো একজন সুযোগ্য গবেষক পণ্ডিতের নিকট হইতে সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি, তাহা পূর্ণাঙ্গ নয়।

বাউলদের গান ছাড়া তাহাদের সাধন-পদ্ধতির ভিত্তি-স্বরূপ বিস্তৃত বিবরণ কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্তবিলাস' গ্রন্থে তাহাদের

৪৬৭। **'Post-Caitanya Sahajiya Cult'** —Bibliography—Pp. 93-94.

সাধনের মূল কথাটি নানা ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাই তাহাদের সাধন-সংক্রান্ত একমাত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক। ইহা ছাড়া আর একখানি গ্রন্থের নাম বাউল-মোহান্ত ও তত্ত্বজ্ঞ ফকিরদের মুখে শুনিয়াছি। ইহা হইতে তাহারা অনেক সময় প্রয়োজন-বোধে অনেক পংক্তি মৌখিক উদ্ধৃত করিয়াও শুনাইয়াছে। গ্রন্থটির নাম 'বৃহৎ নিগম'। রচয়িতা লোচন দাস। এই পুঁথিটির একটি সম্পূর্ণ পাঠ অনেক আখড়ায় অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। যাহা পাইয়াছি, তাহা খণ্ডাংশ মাত্র। অবশেষে বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে বাউল-সমাবেশের সময় এক বাউলের নিকট হইতে অন্যান্য সহজিয়া-পুঁথির সঙ্গে এই সম্পূর্ণ পুঁথিখানি পাই। সে বলিয়াছিল, এইখানি নাকি 'আসল' 'বৃহৎ নিগম গ্রন্থ'।[৪৬৮]

৪৬৮। এই পুঁথিখানি বর্তমান সুপার রয়েল আকারে বাঁধা তুলট কাগজের একখানি খাতায় লেখা। মোট ৬৪ পৃঃ। প্রতি পৃষ্টায় ২৬ হইতে ৩১ লাইন লেখা। পুথিখানি আটটি অঙ্ক ব অধ্যায়ে বিভক্ত। অনেক অঙ্কের শেষে এইরূপ ভণিতা আছে :

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
মস্তকে ধরিএ সদা সেই সব ধন ॥
গোউর ভক্তগণের পদরেণু আস।
বৃহদ নিগম কহেএ লোচনদাস ॥"

শেষ এইরূপ :

গোপনে রাখি গেহু সুন ভক্তগণ।
রসপক্ষে কথা এই রসিকের ধন ॥
প্রথম অঙ্কেতে কৈর্ল কলিধর্ম্ম কথা।
পঞ্চধর্ম্ম নাস্তি তত্ব গৌনমুক্ষ্য জথা ॥
দিতিআতে একাদস স্লোক বাক্ষান।
নিত্যানন্দ সোতা জার বক্তা ভগবান্।
তিতিআতে রূপে কৈল সহ জাতি ধর্ম্ম।
মিরাবাই পসঙ্গে যে আশ্রয় নিজ মর্ম্ম ॥
চোতুথে সামান্ন স্লোক কৈল ব্যাক্ষ্যান।
পঞ্চমে আগম উক্তি গৌরি পঞ্চানন ॥
তিতিয় স্লোকের ব্যাক্ষা আগম পুরানে।
সংক্ষেপে কহিল তাহা করি সমাধানে ॥
সপ্টমেতে ভরথ ভগবানের আক্ষান।
নরবৎ নিদ্রা ছেষ্ট বুঝ না সন্ধান ॥

'বৃহৎ নিগম' আটটি 'অঙ্ক' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। তৃতীয় অঙ্কে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, রূপগোস্বামী যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন রাধা-কৃষ্ণের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া তাঁহার নাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। মীরাবাই তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু রূপগোস্বামী বৈরাগ্য-ধর্মাবলম্বী বলিয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন না— এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। তারপর, একদিন ভিক্ষা করিতে করিতে মীরার গৃহে রূপগোস্বামী উপস্থিত হইলেন। পরিচয়ে জানা গেল, ইনি গৌড়দেশ-বাসী রাধাকৃষ্ণের ভক্ত রূপগোস্বামী। তখন মীরা তাঁহাকে দেখিয়া 'মূঢ় গোসাঞি' বলিয়া ব্যঙ্গ-হাসি হাসিয়া গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া কেন একজন নারী তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া উপহাস করিল, তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রূপগোস্বামী মীরার নিকট গেলেন। তখন মীরাবাঈ তাঁহাকে বসাইয়া প্রকৃত রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন :

"বিষ্ণুতত্ত্ব মানুস দেহে দেখ বিচারিআ।
কৃষ্ণ হআ কৃষ্ণ বল কি সাস্ত পড়িআ॥"

* * * * *

"শ্রীবৃন্দাবন পাপ্তি হয় সক্তি দ্বারে।"

তাহার পর মূল প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব ও সাধন-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে মীরাবাঈ রূপগোস্বামীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থ, বিশেষ করিয়া এই অধ্যয়টি,

সপ্তমেতে প্রেমতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব কথা।
সবিলাস বাঞ্ছার রসের বেবস্তা॥
অষ্টমে বর্ত্তমান অনুমান সার।
বিবরিআ কহিল রস সন্ধান হয় জার॥
সুনহ সকল ভক্ত রসপক্ষ সার।
অষ্টম অঙ্কেতে গেন্থ করিলা প্রেচার॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদ করি সার।
শ্রীকোবিরাজ গোসাঞি ভরসা আমার॥
ভক্তগণ পদরেণু সদা মোর আস।
বৃহদ নিগম কহেএ লোচন দাস॥
ইতি বৃহদনিগম গেন্থ সমাপ্তে অষ্টমঙ্ক।

"এই গেন্থের মালিক শ্রীশ্রীগদাধর দাস সন ১২৮৮ সাল তারিক ২০ স্রাবন বেলা তিতিয় পহর সমাপ্ত নিত্যানন্দ দাস জথাদিষ্টং তথালিখং"।

বাউলরা বিশেষভাবে মূল্যবান মনে করে। ইহার মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে পংক্তি বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া মীরা তাঁহার বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। এই পুঁথিখানি বাস্তবিকই প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক সহজিয়া-সাধনার স্বরূপ-জ্ঞাপনের দিক দিয়া মূল্যবান।

এই গ্রন্থ হইতে বাউল-সাধনার তত্ত্ব-সংক্রান্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

"নাত্রক নাইকা জবে ছিলা একস্থানে।
অন্তরে আছএ বস্তু উদ্দেশ না জানে॥
উদ্দেশ করিতে যবে ইচ্ছা হৈল মনে।
এক আত্মা দুই হইল তথির কারণে॥
সবদন অঙ্গ আঙ্গ করি নিল বাটি।
পুরুস হইল এক প্রকিতি একটি॥
পঙ্কজলপদ্মমুল এক অষ্টাক্ষর।
পত্রফুলবৃন্দপুষ্প সোল লেখাকর॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-সংগ্রহে 'বৃহৎ নিগম' নামে চারিখানি পুঁথি আছে: নং ৩৫০৭, পৃষ্ঠা ১—৩৪, তারিখ ১২৩৪ বাংলা। নং ৩৪৫৬, পৃষ্ঠা ১—৮, তারিখ ১২৮০। নং ৩৮৯১, পৃঃ ১—২৭, তারিখ ১২৮২। নং ৫৭৯৯ (খণ্ডিত)।

এই পুঁথির সহিত মিলাইয়া দেখা গেল যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথমখানি ব্যতীত অন্য তিনখানির মধ্যে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশ নাই, কেবল প্রথম পুঁথিখানির মধ্যে অঙ্কভাগ-সমেত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই পুঁথির সব অংশই আছে। তবে স্থানে স্থানে কয়েক লাইন, যাহা এই পুঁথিতে আছে, তাহা দেখা গেল না। যাহা হোক, এই পুঁথিখানি বর্তমান পুঁথির বিশ বৎসর পূর্বে লিপীকৃত বলিয়া এবং উহার সহিত সম্পূর্ণ মিল থাকায় উভয়ে নিঃসন্দেহে একই গ্রন্থ। উভয় পুঁথিতে লিপিকার প্রায় সমানই পণ্ডিত। বর্ণাশুদ্ধির আর ইয়ত্তা নাই। আলোচনায় মৎসংগৃহীত এই গ্রন্থের অবিকল পাঠ উদ্ধৃত করা গেল। বাউল-কথিত 'আসল' গ্রন্থ বলিতে এই বুঝা যায় যে, লোচন দাসের মূল গ্রন্থের অবিকল নকল না করিয়া তাহার সঙ্গে অনেকের রচনা মিশ্রিত করা হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পুঁথিখানি ব্যতীত অপর পুঁথিগুলির মধ্যে তাহার প্রমাণ আছে।

মনে হয়, লোচন দাস বাউল-সাধনার একজন বিশিষ্ট প্রামাণিক প্রচারক ছিলেন। অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্তবিলাস' গ্রন্থে লোচন দাসের পদ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তারপর বহুপূর্ব হইতে কি হিন্দু-জাতির, কি মুসলমান-জাতির বাউল উভয়ের মধ্যেই এই লোচনদাসের 'বৃহৎ নিগম' ও অকিঞ্চন দাসের 'বিবর্তবিলাস' বাউল-সাধনার প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। গান ছাড়া গ্রন্থের প্রমাণ বলিতে তাহারা ঐ দুই গ্রন্থের কথাই উল্লেখ করে।

বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত বেতালবন গ্রাম হইতে সংগৃহীত 'বৃহৎনিগম' পুঁথির একটি পৃষ্ঠার অংশবিশেষের প্রতিলিপি

[এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৮২-৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

এই সোল অক্ষর ছাড়ে নাত্রকে তরে।
সোলরূপে ছিলা সুখদুখ নাই ঘরে ॥
সুখদুখকরনে বিভাগ করিল।
অষ্ট অষ্ট অক্ষর করি অংস জে করিল ॥
পঙ্কজলপদ্মমুল পুরূসে রাখিল।
তোমার অঙ্গে তার রাখি বিবরি কহিল ॥
পঙ্ক শব্দে দুই নেত্র জল সব্দে লিঙ্গ।
মাধুজ্যের বৃস্ত হয় লিঙ্গ দিষ্টে ভিঙ্গ ॥
পদ্মসব্দে বিরাজমান হয় রসতত্ব।
নারিদেহেতে থাকি হয় পল্লিত ॥
পক্ষে ২ পফল্লিত পক্ষে ২ বাড়ি।
পুষ্পরসে ভাসি জায় হিরারত্ন প্রেড়ি ॥ (কড়ি ?)
সেই পুষ্পরস হতে কাম প্রেম হয়।
তাহাতে সাধনতত্ত্ব স্থন মহাসয় ॥
রসের করন জেবা না জানে কারণ।
সে জনা না জানে কভু সাধন ভজন ॥
আনন্দসাগর হৈতে বহে রস মত।
দুই নেত্রে সদা কাল তাহারে জাগত ॥
পুরূসের দক্ষিন চোক্ষেতে স্থিতি হয়।
নারি করএ বাঁম নেত্রে আশ্রয় ॥
মাধুজ্য হএন জখন ভগে লিঙ্গ পৈসে।
ওসজ্য হএন জখন দুই ঠাই বৈসে ॥

* * *

পদ্মফুলবিন্দপুস্প এই অষ্ট সব্দে।
এই অষ্ট কহিলাম স্থন কহি ইবে ॥
নিজধাম হয় দেখ আমি বৃন্দাবন।
ফুল শব্দে ভগ মোর স্বরিরেতে হন ॥
সেই ভগ হয় সুধ্য মাধজ্য ব্রজধাম।
তার সঙ্গে জমুনা বহে অতি অনুপাম ॥

* * *

বৃন্দু শব্দে তিন দ্বার তার সঙ্গে হয়।
পুষ্প শব্দে বিকসিত জখন উদয় ॥
এই বৃন্দাবন হয় মাধুর্য্য আখ্যান।
নিলা করি বৃন্দাবন লোকের কারণ ॥
আমি সহজ মানুষ হই কিস্নরি স্বরূপ।
তুমি সিদ্ধ মানুষ হয় কৃষ্ণের অনুরূপ ॥
এই ব্রজে এক কুঞ্জ করিআ সিজ্যন।
এক প্যারি লঞা কর রস আস্বাদন ॥
কেহ কাহা না দেখিলে হবে অনুতাপ।
দুই ঠাই করিলেক ধম্মাধম্ম পাপ ॥
না থাকিব দুই দেশে রব এক ঠাই।
এই ত কারণে দুহে মাআ জাই নাই ॥

অনুরাগি বৈরাগি করএ নিবেদন।
ইস্বর মানুস দুহার পাবে দর্স্যন ॥
ইশ্বর পুরুস হএন পিকিতি মানুস।
দুহাকার দরস্বোনে দুহা হয় বস ॥
সহস্তদল পদ্ম কিস্নুরির মস্তক উপরে।
তাহার ভিতরে রহে রজ সতধারে ॥
তাহার অঙ্গেতে হয় মানুসের গতি।
শৃঙ্গার ভজন করে বিজরূপে স্থিতি।
ইশ্বর মিলিব বলি মানুস চলি যায়।
আগে রক্ত চলে পাছে রসরূপে ধায় ॥
এইরূপে মানুস চলে হঞা রসে বস।
বিন্দুপাত হৈলে হয় মাধুর্য্যপ্রকাস ॥
সড়দলে জায় বস্তু মুত্তিমান হৈআ।
আপন সদল নয়্যা রহিল বসিআ ॥
তারপরে তিন জনে চতুদলে জায়।
কিস্নুরির কৃপালেসে সহস্তদল পায় ॥

নিজস্থানে তিনজনে আনন্দ হইআ।
জুগল সহিত রহে রস আস্বাদিআ।"
(৩য় অঙ্ক)

কিভাবে পুরুষ-প্রকৃতি বিভক্ত হইল এবং কিভাবে দুই দেশে থাকিব না বলিয়া একত্র রহিল, পদ্ম কোথায় প্রস্ফুটিত হয় এবং পদ্মপুষ্পের রসে কি ভাবে সাধন হয় এবং সহস্রদল হইতে রজঃস্রোতের সঙ্গে রসরাজ লীলা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তিনদিন তিনরূপ ধারণ করিয়া শেষে সহজ মানুষ-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তারপর প্রকৃতি-পুরুষের শৃঙ্গার দ্বারা উর্ধ্বগত হইয়া স্বস্থানে যাইয়া যুগল হইয়া নিত্যরস-লীলা আস্বাদন করেন—বাউল-সাধনের মূল ভাবটি মোটামুটিভাবে ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। এই মূল ভাবটিই গানগুলির মধ্যে নানা রূপে এবং নানা ভঙ্গীতে বিভিন্ন সাধকের অনুভূতির বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে,—তাহা আমরা দেখিব।

আমি পূর্বে বলিয়াছে যে, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দ্বারা চৈতন্য-তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার পর সহজিয়া-বৈষ্ণবধর্ম নূতন রূপে ও নূতন শক্তি লইয়া বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে। চৈতন্য-তত্ত্ব অর্থাৎ এক দেহে রাধা-কৃষ্ণের অবস্থান, 'অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গৌর', 'রসরাজ-মহাভাব'-এর একটি মিলিত সত্তা, রাধিকার অসাধারণ গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন, 'রসময় মূর্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার', 'নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত' প্রভৃতি চরিতামৃত-প্রচারিত মতবাদ সহজিয়াদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহারা প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধকে এই আলোকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাহাদের সাধনাংশেও ইহার প্রভাবকে গ্রহণ করে। এই যে বাউলদের প্রকৃতির মধ্যে সহজ মানুষের আবির্ভাব-কল্পনা, ইহা চৈতন্য-চরিতামৃত-প্রচারিত রাধার শ্রেষ্ঠত্ব এবং কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার নিরন্তর শৃঙ্গার-লীলা প্রভৃতি ভাব-প্রকাশের ফল বলিয়া মনে হয়।

এই 'বৃহদ্ নিগম গ্রন্থ'-এর কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিলে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব বুঝা যাইবে। লোচন দাস প্রকৃতির দেহে 'রসরাজ-মহাভাব'-এর যুগপৎ উপস্থিতি কল্পনা করিয়াছেন :

"কল্পকল্পন্তরে পুরাণে লেখে গেন্থকার।
ভগলিঙ্গ ভগবান সাক্ষাত সাকার॥
সিষ্টিস্থিতিপলয় কারণ কথ্য হন।
অতএব সব্বসেষ্ট পিকিতিরতন॥

রসরাজ মহাভাব পিকিতির দেহ।
পপঞ্চে গত হঞা কি জানিবে সেহ॥
পিকিতি বিলাসে সুখ জানে জেই জন।
সেই পাইবে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥" (৩য় অঙ্ক)

চৈতন্যদেব 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' হওয়ায় নবদ্বীপ গোলোক হইয়া গিয়াছে। কিরূপে প্রকৃতি-পুরুষ-দেহে তাঁহার অবস্থিতি, সে সম্বন্ধে লোচন দাস বলিতেছেন :

"নবিনমদন জেহ তিহ অপাকিত।
বৃন্দাবনে থাকে সদা হইঞা গোপত॥
কামবিজ গাত্রি হয় উপসনা তার।
বৎসরে দাদস বার উদয় তাহার॥

* * *

বৃন্দাবোনে মাসে ২ বারেক উদয়।
নবদ্বিপে উদয় জবে একজোগ হয়॥
বৃন্দাবন হয় জেই পিকিতির দেহ।
নবিনমদন তাহে নাহি জানে কেহ॥
পুরুসদেহেতে হয় নবদিপ স্থান।
এই দুই দেহে দেখ হয় বত্তমান॥
নবদ্বিপ বৃন্দাবন পুরুসপিকিতি।
এই দুই দেহ বিনে আর বস্তু কথি॥" (৫ম অঙ্ক)

চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত 'তিনবাঞ্ছা' পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিভাবে প্রকৃতি দেহে অবস্থান করিতেছেন, সে সম্বন্ধে লোচন দাস বলিতেছেন :

* * *

"তিন বাঞ্ছা পুন্ন্য করি রস আস্বাদন॥
আলিঙ্গনে ভাব পুন্ন্য কাস্তিতে চুম্বন।
সিঙ্গারে প্রেমরস বাঞ্ছিতপুরণ॥
পিরিতি আনন্দময় চিন্ময় কেবল।
সেইভাবে বস হইঞা করে সমবল॥
নিজরূপে সঅং রূপে এক রূপ হয়।
এক দেহ দুই সে জানিহ নিশ্চয়॥

নিজরূপে সঅং রূপ এক দেহ হয়।
গোলোক বৃন্দাবন বলি অতএব কয়॥" (৬ষ্ঠ অঙ্ক)

'বিবর্তবিলাস'-গ্রন্থেও দুই বস্তুর একত্র অবস্থানের কথা আছে :

"রস প্রেম দুই বস্তুর এক স্থানে পাই।
অতি গুহ্যাদিক হয় সেই মতে গাই॥
* * *
মন্ত্র স্বরূপ দীক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়।
শিক্ষাগুরু তদেকাত্মা শ্রীরাধিকা হয়॥
* * *
দুই গুরু এক ঠাঁই পাইব কেমনে।
ইহার কারণ কহি শুনহ শ্রবণে॥
দুইগুরু একবস্তু চমৎকার রূপ।
সেই বড় সাধ ভাই তেঁহ রসকূপ॥
আপনি মরিয়া যবে গৌরাঙ্গ পাইবে।
বিষম সেবা করি মন নিত্যধামে যাবে॥" (তৃতীয় বিলাস)

॥সাধনের বিশেষ সময়॥

বাউল-গান এবং বাউলদের গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের মধ্য হইতে তাহাদের সাধনার মোটামুটি কাঠামোটি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির রজঃ-প্রবৃত্তি তাহাদের সাধনার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

পরমাত্মার জগতের যে প্রকৃতি-পুরুষ—এই দুই রূপে অবস্থিতি, সেই প্রকৃতি-পুরুষের অন্তর্নিহিত মূলসত্তা রজঃ ও বীজ। রজঃ প্রকৃতির শক্তি, বীজ পুরুষের শক্তি। এই রজঃ ও বীজের মিলনে, তন্ত্রের ভাষায় এই "সিতশোণবিন্দু-যুগলং"-এর,[৪৬৯] এই শিব ও শক্তির মিলনেই সৃষ্টি। সৃষ্ট প্রাণীর প্রতি দেহেই রজঃ-বীজের মূলসত্তা রহিয়াছে। পুরুষের দেহে বীজের প্রাধান্যে সে পুরুষ, প্রকৃতির দেহে রজের প্রাধান্যে সে প্রকৃতি। প্রত্যেক দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ বীজের স্থান ও নিম্নাঙ্গ রজের স্থান। পুরুষ দেহে প্রকৃতির সত্তা কুলকুণ্ডলিনী-রূপে মূলাধারে সুপ্ত। বাউলরা পুরুষ-দেহের বীজ-রূপী সত্তাকে 'ঈশ্বর' বলিয়াছে। এই

৪৬৯। 'কামকলাবিলাস', ৬ (আগমানুসন্ধান সমিতি, আর্থার এভেলন-প্রকাশিত)

বীজের স্বরূপ চাঞ্চল্যহীন, নিস্তরঙ্গ, অটল অবস্থা। প্রকৃতির দেহে উত্তমাঙ্গে বা সহস্রারে বীজের স্থিতি। কিন্তু বাউলদের নিকট এই বীজ-সত্তা বা ঈশ্বর শৃঙ্গার-রস-ভোক্তা, লীলাময়, নিরন্তর কাম-ক্রীড়াশীল। প্রকৃতি-সত্তায় রজো-রূপের যখন পূর্ণপ্রকাশ, তখন মস্তক হইতে এই বীজ-রূপী ঈশ্বর নামিয়া আসিয়া রজের সহিত মিশ্রিত হন। এই লীলাময় মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতো পদ্মরস-আস্বাদনের জন্য রসাকারে মিলিত হইয়া শৃঙ্গার উপভোগ করেন। ইনিই তাহাদের 'সহজ-মানুষ'। 'সহজ' অর্থে দেহের মূল স্বাভাবিক সত্তা। এই মূলসত্তা রজোবীজের মিলনাবস্থা। এই মিলন মিথুনীভূত অবস্থা বা কাম-ক্রীড়া। প্রকৃতি-সত্তায় বীজ-রূপী 'মানুষ' বা 'সহজ মানুষ' বা লীলাময় ঈশ্বর রজোরূপের সঙ্গে মিথুনাসক্ত। এই মিলন কামের ক্ষণস্থায়ী, চঞ্চল ক্রীড়া নয়। সেই চঞ্চল কাম-ক্রীড়ার পরিণাম সৃষ্টি। কিন্তু এই কাম-ক্রীড়া অটল, অচঞ্চল, স্থির—ইহা প্রেমের ক্রীড়া। কামের লীলায় রজোবীজের মিলনে সৃষ্টি, আর প্রেমের লীলায় অচঞ্চল মিথুনানন্দ। এই অটল মিথুনানন্দের উদ্ভব হয় কামকে নাশ করিয়া, সৃষ্টি-ধারাকে রোধ করিয়া এবং তাহাকে ঊর্ধ্বগামী করিয়া। এই স্থির, অচঞ্চল আনন্দানুভূতিই সহজাবস্থা। রজোবীজের এই অচঞ্চল মিলনোদ্ভূত আনন্দই পরমতত্ত্বের নিত্যস্বরূপ। কিন্তু এই অচঞ্চল অবস্থায় বা প্রেমে পৌঁছিতে হইলে কামকে ত্যাগ করা যায় না। কামের সঙ্গে প্রেম মিশ্রিত আছে। রজের স্বরূপ কাম, বীজের স্বরূপ প্রেম। রজোবীজের মিলিত অবস্থায় প্রেমকে কাম হইতে পৃথক করিতে হইবে। কি প্রকারে? মন্থনের দ্বারা সাধক কাম হইতে প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে। সুতরাং রজঃ-স্রাবের সময় অবলম্বন করিয়াই বাউলদের মূলসাধনা। কামের প্রকাশ অপসারিত হইলে প্রেমের প্রকাশ হইবে। তখন সেই প্রেম-রূপী সহজ-মানুষকে অর্থাৎ স্থির প্রেমানন্দের অনুভূতিকে যোগ-ক্রিয়া অর্থাৎ কুম্ভকের সাহায্যে সাধক তাহার অটল নিত্যস্থান, শীর্ষদেশে লইয়া যাইবে। ইহাই 'বিবর্তবিলাস'-এর ভাষায় —"যাঁহাকার বস্তু তাঁহাকারে দেওয়া"। তখন প্রকৃতি-পুরুষের অবিচল প্রেম-মিলনে—দেহ-বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলনে—সাধক নিরন্তর মিথুনানন্দের উপলব্ধি করিবে। ইহাই রজোবীজের অচঞ্চল স্বরূপে আস্বাদন—ইহাই সহজাবস্থা-লাভ। ইহাই 'মানুষ-ধরা' বা 'সহজ-মানুষ ধরা'। এই সহজানন্দ-লাভই আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি।

ইহাই বাউল-সাধনার কাঠামো এবং ইহাই এই সাধনায় রজের অপরিহার্যতার রহস্য। বাউলের প্রধান সাধনার সময় আসে 'মহাযোগ' উপলক্ষ্যে। প্রতি মাসান্তে

এই মহাযোগ উপস্থিত হয়। এই সময় যখন নদীতে বান ডাকে, সেই সময়ে সহজ-মানুষ-রূপী মাছ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সুচতুর জেলে নদীতে বাঁধ দিয়া মাছ ধরে। ঐ সময়ের সুযোগ না লইলে পরে বন্যার শেষে আর মাছ পাওয়া যাইবে না। লালন বলিতেছেন :

"সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না।
জল শুকাবে মীন পালাবে, পস্তাবি রে মন-কানা ॥
তিরপিনির তীর-ধারে
মীনরূপে সাঁই বিহার করে,
(তুমি) উপর উপর বেড়াও ঘুরে,
সে গভীরে ডুবলে না ॥
মাস-অন্তে মহাযোগ হয়,
নীরস হতে রস ভেসে যায়,
করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীনরূপে খেল দেখলে না ॥" (গান নং ৫২)

এই যে নদী ইহাকে লালন 'আব-হায়াত' বা 'উল-হায়াত' অর্থাৎ 'জীবন-নদী' বলিতেছেন। ইহার রহস্য অদ্ভুত ; দেহ-রূপ নৌকায় এই গঙ্গানদী বোঝাই—অকস্মাৎ প্লাবনে নদীর পাড় ভাসিয়া যায়, আবার তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়। এই গাঙে প্রকাণ্ড এক মাছ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে :

"লীলা দেখে লাগে ভয়।
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই,
গঙ্গা ডাঙা বেয়ে যায় ॥
'আব-হায়াত' নাম গঙ্গা সে যে,
সংক্ষেপে কেউ দেখ বুঝে,
পলকে পাউড়ি ভাসে,
পলকে শুকায় ॥

* * *

জগৎ-জোড়া মীন সেই গাঙে
খেলছে খেলা পরম রঙে,
লালন বলে জল শুখালে
মীন মিশিবে হাওয়ায় ॥" (গান নং ১০৬)

এই বর্ষাকালে বাঁধ বাঁধিয়া মাছ না ধরিলে, অর্থাৎ 'সময়ে সাধন' না করিলে, কোনো ফলই লাভ হয় না। তাই নরসিংদির এক বাউল সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতেছেন :

"কিছু হবে না রে সময় গেলে।
সময়ে সাধন না হ'লে॥
এই বর্ষাকাল রইলি ব'সে,
মীন চলে যায় জলে ভেসে,
বর্ষা গেলে জল শুকালে
কি হবে পাছে বাঁধ বাঁধিলে।
অকালে কৃষি করা,
লাভ নাই তার মূলে হারা,
যদি ফলে বীজধর্মে
ফুল ফুটে তার ফল না ফলে॥" (গান নং ১৯৮)

আর একজন বাউল বলিতেছেন :

"সময় গেলে সাধন হবে না রে
অবোধ মন।
* * *
অসময়ে সাধন করা—
জল ত্যজে আল বন্ধ করা,
যে জন চতুর হবে, আল বাঁধিবে
জল থাকবে ক্ষেতে যখন॥" (গান নং ৩৭৯)

লালন এই নদীর রহস্য, মীনের যাওয়া-আসার সময় ও তাহাকে ধরিবার কৌশল সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"সামান্যে কি চিনে সেই নদী,
সেথা বিনে হাওয়ায় ঢেউ ওঠে নিরবধি,
শুভযোগে জোয়ার আসে যদি
ত্রিবেণী ভেসে যায় সমানে॥
মৃত্তিকাহীন নদী 'পরে
মীন এক আসা-যাওয়া করে,

অন্যে চিনতে পারবে কেনে।
পূর্ণিমার যোগে সে মীন ভাসে,
কারুণ্য তারুণ্য এসে লাবণ্যে যখন মিশে,
সাধকে মীন ধরিতে পারে সেই দিনে ॥" (গান নং ১১৯)

বাউলরা প্রকৃতির রজঃ-প্রবৃত্তির সময়কে 'অমাবস্যা' বলে। ইহা ঘোর অন্ধকারময় কামের সময়। কামের স্বরূপকে বাউলরা নিরবচ্ছিন্ন দেহ-ভোগের অন্ধকারময় শক্তি বলিয়া বুঝিয়াছে। এই 'অমাবস্যা'র মধ্যেই তাহাদের 'পূর্ণচন্দ্র' উদিত হয়। এই পূর্ণচন্দ্র 'সহজ্ মানুষ' বা 'অধর মানুষ', ইনিই প্রেম-স্বরূপ। তাই 'অমাবস্যা'কে অনেকস্থলে তাহারা 'কাম' বলিয়া বুঝিয়াছে এবং 'পূর্ণিমা'কে প্রেম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই 'অধর মানুষ' বা পরমাত্মা সহস্রারে অটল-রূপে বিরাজিত। ইনি এই যোগের সময় রস-রূপে প্রকৃতি-দেহে ক্রীড়া করেন এবং পূর্ণভাবে মূলাধারে প্রকৃতির কারণ-বারিতে আবির্ভূত হন। এই আবির্ভাবকে তাহারা 'পূর্ণিমার যোগ' বলে। ইহাই বাউলদের "অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়"। এই সময় তাহাদের 'অমাবস্যা-পূর্ণিমা'র একত্র যোগ। এই যোগের তৃতীয় দিনে বা কোনো সম্প্রদায়ের মতে চতুর্থদিনে 'মানুষ ধরা'র প্রশস্ত দিন। লালনের একটি গানে আছে :

"সোনার মানুষ ভাসছে রসে।

*

পিতামাতার নাই ঠিকানা,
অচিনদলে বসতখানা,
আজগুবি তার আওনা-যানা
কারণবারির যোগবিশেষে ॥
অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়,
দেখতে যার বাসনা হৃদয়,
লালন বলে, থেকো সদায়,
ত্রিবেণীতে থেকো বসে ॥" (গান নং ৪৭)

লালনের আর একটি গানে আছে যে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যে একত্র বর্তমান, তাহা 'ভাব'-প্রবিষ্ট সাধকগণই জানেন :

"সে কথা কি ক'বার কথা, জানতে হয় ভাবাদেশে।
অমাবস্যায় পূর্ণশশী পূর্ণিমাতে অমাবস্যে ॥

অমাবস্যা-পূর্ণিমার যোগ
আজবসম্ভব সম্ভোগ,
জানলে খণ্ডে এ ভব-রোগ
গতি হয় অখণ্ড দেশে ॥" (গান নং ১০৪)

প্রতি মাসেই এইরূপ অমাবস্যা-পূর্ণিমার যোগ উপস্থিত হয় :

"মাসে মাসে চন্দ্রের উদয়,
অমাবস্যা মাস-অন্তে হয়,
অমাবস্যা-পূর্ণিমার নির্ণয়
জানতে হবে নেহার ক'রে ॥" (গান নং ১০৫)

পদ্মলোচন একটি গানে বলেন :

"অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ
নাই গতাগতি,
নিতুই নিতুই হচ্ছে সেথায়
প্রেমের উৎপত্তি।" (গান নং ৪৬৪)

শিলাইদহের বাউল গোঁসাই গোপাল বলিতেছেন :

"অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র যে করে উদয়,
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে—তিন ধামেতে হবে জয় ;
সামান্যের কর্ম নয়, সাধিলে সিদ্ধ হয়।" (গান নং ২৯৯)

ঘোর অন্ধকারকে দূর করিয়া সেখানে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার বিকাশ ঘটানো, কামকে ঊর্ধ্বগত করিয়া প্রেমে পরিণত করা বাস্তবিকই কঠিন সাধনা—তাহাতে বিজয়ী সাধকের জয়-ঘোষণা ত্রিভুবনব্যাপী হইবে যে তাহাতে আর আশ্চর্য কি !

এই তিনদিন বাউলরা তিন প্রকারের সাধন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। তাহারা এই তিনদিনের কারণ-প্রবাহের কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত নামকরণ করিয়াছে। এই দিনের ক্রিয়ার শেষের দিকে 'অধর মানুষকে' ধরিবার ক্রিয়া তাহারা করে। অবশ্য এই তিনটি নামকরণ তাহারা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছে।[৪৭০] এই 'অধর মানুষ'-এর বা 'সহজ মানুষ'-এর আগমন সম্বন্ধে

কারুণ্যামৃত—ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত—ধারায় মধ্যম স্নান।

সাধককে খুব হুঁশিয়ার থাকিতে হইতে হইবে—ইহা সূক্ষ্ম অনুভূতি-সাপেক্ষ। রাঢ়ের প্রসিদ্ধ বাউল অনুরাগী গোঁসাই বলিতেছেন :

"চিন্ময় মধুরে ধর, ও সে শ্রী-অধর।
মধুরে সুমধুর আছে, দেখ না খুঁজে নিজ ঘর ॥
রূপ-সায়রের লাল জলে
সময় বুঝে মানুষ খেলে,
বুঝতে পারে রসিক হ'লে
রূপ-সায়রে দেয় নজর ॥
রূপ-সায়রে তিন-ধারা
বুঝতে পারে রসিক যারা,
সদাই রূপে দেয় পাহারা,
নিরিখ দিয়ে সেই লহর ॥
প্রথমে গুণেরি মানুষ
ভক্তি ক'রে রাখ ধ'রে হুঁশ,
দ্বিতীয়াতে হোস না বেহুঁশ,
নির্বিকারে তাঁরে স্মর ॥
পূর্ণ-ঈশ্বর উদয় তিনে,
নিষ্কাম যাজন সেই দিনে,
নিরিখ দিয়ে সেইখানে
জোয়ারেতে সন্ধান কর ॥
তার পরে সহজ আসে,
থাকে রসিক সাধক তারি আশে,
রূপ-সায়রের রূপ-রসে
মন মিশিয়ে কর খবর ॥" (গান নং ৫০৯)

গানটিতে 'রূপ-সায়রের তিনধারা'য় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দিন ও তাহার পরেও সাধকের কর্তব্য সম্বন্ধে রচয়িতা ইঙ্গিত দিতেছেন। সাধককে 'রূপ-সায়রের লাল জলে' মানুষের জন্য 'নজর দিয়া', 'নিরিখ দিয়া', 'পাহারা দিয়া' বসিয়া থাকিতে

লাবণ্যামৃত—ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা—শ্যামপট্টসাটী পরিধান।" (মধ্যের অষ্টম পঃ)

হইবে। প্রথম দিন 'গুণের মানুষ' আসিবে, দ্বিতীয় দিনে 'বেহুঁস' হওয়া চলিবে না, তৃতীয় দিনে 'পূর্ণ-ঈশ্বর'-এর উদয় হইবে, তাহার পর 'সহজ' আসিবে। সাধক 'সহজ'-এর আশায় 'রূপ-সায়রের রূপ-রসে' 'মন মিশিয়ে' 'খবর' করিবে।

॥ তিন দিনের ক্রিয়া ॥

এখন তিনদিনের ক্রিয়া ও তাহার অন্তে বিশেষ ক্রিয়াটি কি, তাহা দেখা যাক।

রজঃ-প্রবৃত্তির প্রথম সূত্রপাতের দিনকে বাউলরা 'অমাবস্যা' বলে। ঐ দিন তমোগুণের প্রকাশ হয়। উহা নিরবচ্ছিন্ন কামের অধিকার। বাউলরা ব্রহ্মাকে প্রথম দিনের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। ইহার তাৎপর্য বোধহয় এই যে, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্টি নিরবচ্ছিন্ন কামের লীলা-সূচক। ইহা তাহাদের মতে 'অধোগতি' বা 'জীবাচার'। সেইজন্য উহাকে 'ব্রহ্মার দিন' বলে। এই অমাবস্যা বা প্রথম দিনের ধারায় 'গরল'-এর প্রকাশ হয় বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। পাঞ্জু-এর পদে আছে—"অমাবস্যায় গরল প্রকাশে" (গান নং ২৪৩), "কামরতি খেলে গরলের সাথে" (নং ২৫০)। ঐ দিন অধিকাংশ সম্প্রদায়ের সাধক-সাধিকা প্রথম বর্ষণের বিন্দু পান করে। লালন-সম্প্রদায় ও নবদ্বীপের একটি প্রধান সম্প্রদায় ঐ দিন পান-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। একখানি পুঁথিতে পঞ্চানন দাস লিখিতেছেন : [৪৭১]

৪৭১। এই পুঁথিতে পুঁথির কোনো নামের উল্লেখ নাই। মেটে রঙের ¼ তা করিয়া বাঁধা খাতার মোট ৬৭ পৃঃ। নবদ্বীপে যাঁহার নিকট হইতে এই পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে, তিনি ইহাকে 'পঞ্চানন দাসের কড়চা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে চণ্ডীদাসের নানা সহজিয়া-পদ, 'বিবর্তবিলাস'-এর কতক অংশ, 'পদ্মপুরাণ', 'গীতা' প্রভৃতি গ্রন্থের অংশ বিশেষ, এবং কয়েকটি বাউল-গান উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাহার উপর টীকার আকারে পয়ারে সাধন-পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। অনেক পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। নানা স্থান হইতে তথ্য আহরণ করিয়া তিনি ইহাতে একটি সাধন-পদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছেন। বাউল-সাধনার তথ্যের দিক দিয়া গ্রন্থখানির যথেষ্ট মূল্য আছে। ঐ সঙ্গে 'রস', 'সরোবর', 'পদ্ম', প্রভৃতির নানা বর্ণনা আছে। রচনায় সাবলীল ভাব বর্তমান। লিপিভঙ্গী আধুনিক। লিপিকারের কোনো নাম বা লিপি-কালের তারিখ নাই। কেবল এক-একটি প্রসঙ্গের শেষে গ্রন্থকর্তা হিসাবে পঞ্চানন দাসের নাম আছে, :

"অপরাধ ক্ষমা কর সাধু মহাজন।
তোমাদের কৃপাবলে হয় যে বর্ণন।

"প্রথম অষ্টমে বিন্দু বিন্দু বরিষণ।
স্বাতী নক্ষত্রের বারি কর নিরিক্ষণ ॥
অতি সুমধুর হয় শুন ওহে মন।
চাতকের ন্যায় পিপাসা কর নিবারণ ॥
শূন্য বারি পানে রক্ষে আপন জীবন।
নবীন মেঘের প্রথম বিন্দু করে পান ॥
অতিরিক্ত বরিষণে ফিরিয়া না চায়।
বরিষার বারি কভু পান না করয় ॥
বড় নিষ্ঠাধর্ম্ম রিতি চাতকের হয়।
এই মত হইলে মন সাধিবে নিশ্চয় ॥" (৩৭ নং পাতা)

এই রজঃ চারিচন্দ্রের অন্যতম। ইহা পানে সাধক-সাধিকার দেহে একটা পরিবর্তন অনুভূত হয়—যে পরিবর্তন তাহার সাধন-জীবনের সহায়ক। এই গ্রহণ-ক্রিয়াকে 'ভেদ' বলে। এই ভেদে দেহ পক্ক হয়, দেহ পক্ক না হইলে বাউল-ভজনের সাফল্য নাই, সেই জন্য সাধকগণ এই 'ভেদ'-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। লালন বলিতেছেন যে, সাধারণ লোক এই গ্রহণ-ক্রিয়ার মর্ম জানে না। যে-সাধক অটল বা উর্ধ্বরেতা হইয়াছে, সে-ই ইহার মূল্য জানে। ইহা অমৃত-মেঘের বর্ষণ, ইহার একবিন্দু পান করিলে জরা-মৃত্যু রহিত হয় :

"সবায় কি তার মর্ম জানতে পায়।
জানে ভজন-সাধন ক'রে
যে সাধকে অটল হয় ॥
অমৃত-মেঘেরি বরিষণ,
চাতক ভেবে জান রে আমার মন ;
ও তার একবিন্দু পরশিলে
শমন-জ্বালা ঘুচে যায় ॥

এ অধম পঞ্চানন কাঁদে দিবারাত্রি।
সাধুপদ বিনা আর না পায় নিস্কৃতি ॥"
কিংবা
"অধম পঞ্চাননের নিবেদন বানি।
রিপুদলে দশ দিকে করে টানাটানি।

বিনে জলে হয় চরণামৃত,
যা খাইলে যায় জরা-মৃত,
অধীন লালন বলে,
চেতন গুরুর সঙ্গ নিলে
দেখিয়ে দেয় ॥" (গান নং ১৫০)

পাঞ্জ-শাহ্ একটি গানে 'রাগ'-এর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন এবং উহার একবিন্দু স্পর্শ করিলে যে শমন এড়ান যায়, তাহাই বলিতেছেন :

"এবার আগে কর রাগের অন্বেষণ।
রাগ ধ'রে প্রেম সাধলে পরে মিলবে প্রেম-রতন ॥
* * *
যে রাগেতে সহজ মানুষ করেছে আসন ॥
ও সে রাগে বেগ ধরে,
সহজ মানুষ এসে তায়
সে রাগে বারাম দেয়,
তার এক বিন্দু পরশিলে এড়াবে শমন ॥" (গান নং ২৩৮)

পণ্ডিত হাউড়ে গোঁসাই বলিতেছেন, এই যে প্রকৃতির কারণ-বিন্দু, ইহা তো রসাকারে স্থিত কৃষ্ণ-বিন্দুস্বরূপ। এই বীজ-স্বরূপ পরমাত্মা বা কৃষ্ণ বা চন্দ্র সহস্রার হইতে সুষুম্না নাড়ী বাহিয়া এই মহাযোগ উপলক্ষে মূলাধার-পদ্মে এই সুধা বর্ষণ করিতেছেন। এই রসপান অমৃতপানতুল্য :

"প্রেম সুখদ্বার, কৃষ্ণ রসাকার, রসনাতে তার কর আস্বাদন।
সে যে যোগাযোগস্থলে মৃণাল-পথে চলে, সহজ-কমলে সুধা-বরিষণ ॥
* * *
ইন্দু বিন্দুগতি সদা বিরাজয়।
জীবে নাহি জানে সাধু-সন্ত চেনে,
রসপানে জানে তারা অমৃত-সেবন ॥" (গান নং ২৭৫)

এইরূপ প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ের বিন্দু-গ্রহণের বিষয় 'বিবর্তবিলাস'-এ উল্লিখিত

দয়াদ্র নয়নে হেরি রসিকের গণ।
কৃপা করি মম সিরে দেহ শ্রীচরণ ॥"—

এইপ্রকার এক-একটি ভনিতা আছে।

আছে। ইহা আত্মরক্ষার হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঐ প্রাকৃত বিন্দু গ্রহণের পর অপ্রাকৃত বিন্দুতে পরিণত হয়ঃ

"স্ব স্ব বিন্দু পান কর আপনার করি।
নহিলে সাধন সিদ্ধি নাই, নিত্যে যাইতে নারি॥
প্রাকৃত বিন্দু গ্রহণেতে কিছু নাহি হয়।
যার যেই স্বেচ্ছা তারে কেবা নিষেধয়॥
অতএব আত্মরক্ষা হেতু সে নিশ্চয়।
অপ্রাকৃত করে বিন্দু কাঁহা নাহি যায়॥" (তৃতীয় বিলাস)

পঞ্চানন দাস তাঁহার পুঁথির এক স্থানে বলিতেছেনঃ

"এই ত্রিধারার নাম হয় ত্রিবেণী।
কারুণ্য, তারুণ্য, লাবণ্য নাম যে শুনি॥
নাম শ্রবণেতে ভক্ত হয় অনুরাগী।
পরসেতে ভাইরে সব সর্ব্ব বাসনা ত্যাগী॥
বিন্দুপান করিলে সব হয় বৈরাগী।
ত্রিবেণীর ঘাটে বসি শিব হৈল যোগী॥" (১৯নং পাতা)

'চারিচন্দ্র'-এর মধ্যে ইহা একটি 'চন্দ্র'। এই সময় এই 'চন্দ্র-ভেদ' হয় অর্থাৎ পান করা হয়।

নবদ্বীপ-সম্প্রদায়ের বাউলরা বিশেষ একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইহা গ্রহণ করে। ইহার শোধন-মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রে শোধন করিয়া পান করেঃ

"গুরুনালে খাই বীজ, ব্রহ্মনালে চাকি,
যে বয়সে খাই বীজ, সেই বয়েসে থাকি।
ঐং হ্রীং রক্তচন্দ্রশোধনং ওং স্বাহা॥"

মুসলমান জাতির বাউল বা ফকিররা কোনো মন্ত্র পাঠ করে না, তবে অনেকে 'আলেকজান', বা 'মুরশিদ্‌জান', বা 'খোদা নিরঞ্জন' প্রভৃতি উচ্চারণ বা 'জয়গুরু' প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া পান করে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, এই তিনদিনের ক্রিয়ায় সম্প্রদায়-ভেদে, স্থান-ভেদে এবং গুরু-ভেদে খুঁটিনাটি ব্যাপারে কিছু প্রভেদ আছে। কোনো কোনো স্থানের সাধক ঐ দিন রজো-বীজ মিশ্রিত করিয়া পান করে। ইহাকে তাহারা 'রসরতির মিলন' বলে। এই উভয়বস্তু-গ্রহণের একটা পদ্ধতি তাহাদের অনেকে পালন

করে। উভয় স্থান হইতে সাধক-সাধিকা মুখ দিয়া আকর্ষণ করিয়া পরস্পরের বস্তু গ্রহণ করিয়া, মিশ্রিত করিয়া উভয়ে পান করিবে—ইহাই নিয়ম। ইহা তাহাদের অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। এ সম্বন্ধে কেবল গুরু-শিষ্যের মধ্যে আলোচনা চলে, সুতরাং কোনো গানে বা পুঁথিপত্রে ইহার উল্লেখ মিলে না। নানা স্থান হইতে নানা সাধকের দ্বারা রচিত যে-প্রায় দেড়হাজার গান আমার নিকট সংগৃহীত আছে, তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি গানে ইহার উল্লেখ আছে, এইরূপ তিনটি গান আমার সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে (গান নং ১২৬, ৩৩৪, ৪২২)। অথচ এই সাধন-মার্গের বহু সাধক এইভাবে দেহের বাহিরে রস-রতির মিলন করে। কেহ একমাসে, কেহ তিন মাস পরে, কেহ ছয়মাস পরে, কেহ বৎসরে একবার এই মিলন করে। রাঢ়ের বাউলরা এ-বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানী। তাহাদের অনেকে বলিয়াছে যে, বাউল-সাধনাই উর্ধ্বরেতা হইবার সাধনা। বিন্দুমাত্র শক্তি-ক্ষয় যাহাতে না হয়, সর্বাগ্রে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, না হইলে প্রকৃত উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে। তবে ইহার প্রয়োজন সাধিকার জন্য। নায়ক-নায়িকার দেহ ও মনের সামরস্যের জন্য ইহার প্রয়োজন—এইরূপ তাহারা বলে। 'বিবর্তবিলাস'-এ উক্ত হইয়াছে যে, উভয় বিন্দুই অপ্রাকৃত হইয়া যায় এবং ইহা আত্মরক্ষার হেতু।

কারণবারি-আবির্ভাবের প্রথম ২৪ ঘণ্টাকে ('অষ্টপ্রহর') একদিন ধরা হয়। প্রথমে এই পানের পরে মিলন।

পরপর তিনদিনের মিলনকে বাউলরা 'রসের ভিয়ান' করা, 'রসের পাক' করা বলে। যেমন ময়রা খোলায় রস চড়াইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্নির তাপে কৌশলে আবর্তন করিতে করিতে রস গাঢ় করিয়া মিছরী প্রস্তুত করে, যেমন দধির মন্থনে মাখন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ তরল বস্তু হইতে গাঢ় বস্তু উৎপন্ন করিতে হইবে। যে উপযুক্ত রসের পাক ভাল রূপ জানে, তাহাকে 'রসিক ময়রা' বলিয়া অনেকগানে উল্লেখ করা হইয়াছে। দুধ ও জল মিশ্রিত থাকিলে রাজহংস যেমন জল বাদ দিয়া দুধ পান করে, রসিক সাধকও সেইরূপ 'নীর' বাদ দিয়া 'ক্ষীর'কে গ্রহণ করিবে। বহু গানে এই 'নীর-ক্ষীরের' কথা আছে। এই পৃথক করা অর্থে আবর্তন বা মন্থন করা। মন্থনের দ্বারা 'নীর' হইতে 'ক্ষীর' পৃথক হইবে, 'কাম' হইতে 'প্রেম' পৃথক হইবে। এই শৃঙ্গার রস-রতিকে উজান করিবার জন্য। ইহা দ্বারা কাম নাশ হইয়া প্রেম উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ বলা হয়।

প্রকৃতি-দেহে রজো-বীজ মিশ্রিত আকারে আছে, তাহাকে পাত্রান্তর অর্থাৎ তাহার মধ্য হইতে বীজ অংশকে মন্থনের দ্বারা পৃথক করিয়া প্রেম-রূপে উর্ধ্বগামী

করিতে পারিলে উত্তম রসের ভিয়ান করা হয়, বা রাজহংসের মতো আচরণ করা হয়। ইহাই বাউলের সাধন-কার্য।

'বিবর্তবিলাস'-গ্রন্থে আছে :

"প্রকৃতি সহিত তার উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতিসহ নাহি স্পর্শ গন্ধ ॥
এক পাত্রে আছে বস্তু শুন শ্রোতাগণ।
পাত্রান্তর করি বস্তু কর আবর্তন ॥

* * * *

পাত্রান্তর হইলে বস্তু হবে প্রেমময়।
সর্বত্র বেড়িয়া প্রেম সহস্রদল পায় ॥
কৃষ্ণপদে কল্পবৃক্ষে হবে আরোহণ।
নিগূঢ় সাধন এই রসিক করণ ॥" (চতুর্থ বিলাস)

এই রসের ভিয়ান করিতে হইলে বাণ-শিক্ষা অর্থাৎ সুকঠিন যোগ-মিলনের কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে :

"অতএব কহি ভাই সাধন করণ।
শিক্ষাগুরু পাশে বাণ করহ শিক্ষণ ॥
ঐছন সাধন বাণ শিক্ষা নহিলে নয়।
এ সব সাধনে পঞ্চবাণ যে লাগয় ॥
অতএব রস লইয়া ভিয়ান করিলে।
তবে তারে রাধাকৃষ্ণ ধন যে মিলে ॥
ইক্ষুরসে যৈছে ওলা মিছরী হয়।
তৈছে বস্তু শক্তি হইতে মহাভাব পায় ॥

* * * *

এক স্থানে রস বস্তু আছে চিরকাল।
থাকিলে বা কিবা হয় বুঝহ সকল ॥
স্থানান্তরে রস লইয়া মশলা তাহে দিয়ে।
ভিয়ান করহ রস যেই আরোপিয়ে ॥
তাহাকে রসিক কহি আর কেহ নহে।
হেন সাধন বিনে কেহ রসিক না কহে ॥"

(চতুর্থ বিলাস)

বীজ-রূপী, চন্দ্র-স্বরূপ পরমবস্তু বা কৃষ্ণ প্রকৃতি-দেহে রজো-রূপের অভ্যন্তরে বর্তমান। ইহাই বর্তমান রূপ। ইহাকে আবর্তনের দ্বারা পাক করিয়া স্থানচ্যুত করিয়া দেশান্তরে লইয়া ঊর্ধ্বগতি করাই প্রকৃত সাধন। ইহাকেই অকিঞ্চন দাস 'বিবর্ত-বিলাস'-এ বলিয়াছেন:

"সত্ত্বরূপে বর্তদেশে করায় বিহার।
বিবর্ত কহিয়ে সত্ত্ব রহে দেশান্তর॥
দেশান্তরে রহি বস্তু বিলাস করায়।
বিলাসের দ্বারা নাশে কামগন্ধ তায়॥
অকাম হইয়া রয় সর্বত্র বেড়ায়।
বিলাসরূপে পাক পাইয়া ঊর্ধ্বগতি হয়।
* * * *
শোণিত শুক্র যারে কহি আনন্দ মদন।
রতি রস তেঁই কাম কহিল কারণ॥
অতএব প্রাকৃতরূপে তেঁই সে আছয়।
ইহা সাধি অপ্রাকৃত রূপে মানুষ পায়॥"
(চতুর্থ বিলাস)

অনেক বাউল গানে এই তিনদিনের কারণ-রসের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম দিন ব্রহ্মার আধিপত্য—ইহা পূর্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয় দিন বিষ্ণুর এবং তৃতীয় দিন মহেশ্বরের আধিপত্য বলিয়া বাউলরা উল্লেখ করে। আবার প্রথম দিন তমঃ, দ্বিতীয় দিন রজঃ এবং তৃতীয় দিন সত্ত্ব-গুণের প্রকাশ বলিয়াও নির্দেশ করে। তৃতীয় দিনে মহেশ্বরকে সত্ত্বগুণের অধিকারী করার তাৎপর্য এই যে, মহাদেব যোগী এবং তিনি কামকে ভস্ম করিয়াছেন। ঐদিন বিশেষ করিয়া বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া মহাদেবের মতো যোগী হইয়া কামকে ভস্ম করিয়া সাধন করিতে হইবে।

যাহোক, বহু বাউল গানে ঐ তিন দিনের তিনটি রসের উল্লেখ আছে। পাঞ্জ শাহ্—যাঁহার অনেক গানে সাধন-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে—তাঁহার কয়েকটি গান আলোচনা করিলেই তিন রস ও তিন রতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইবে।

পাঞ্জ শাহ্ বলিতেছেন যে, ত্রিবেণী যখন জোয়ারে প্লাবিত হইয়া যায়, যখন মূলাধার-পদ্মরূপ সুখ-সাগরে সুধাবিন্দুর আবির্ভাব হয়, তখনই অধর মানুষ সেই

জোয়ারে ভাসিয়া আসেন। সেই যোগের তিথি উপলক্ষে সাধন প্রয়োজন। প্রথম যখন যোগের আরম্ভ, তখন অমাবস্যা, তখন ঠিক প্রকৃত যোগ নয়, তাহার পর জোয়ার আরম্ভ হইলে পর পর তিনদিন যোগ। এই সময় অধর মানুষকে ধরিতে হইলে ত্রিবেণীর ঘাটে বসিয়া থাকিতে হইবে:

"ত্রিবেণীর তীর-ধারে সুধারে জোয়ার আসে।
সুখ-সাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে॥
উথলে সুধা-বিন্দু সুধারে সুধার বিন্দু,
সুখময় সিন্ধুজল ছলে ছলে সাঁতার খেলে।
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে অধর মানুষ যায় গো ভেসে॥
অমাবস্যা তিথি নাস্তি,
জোয়ারে তিথি উক্তি,
অমাবস্যা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া—তিন দিন চলে।
মন, ধরবি যদি অধর মানুষ, থাক নদীর কূলে ব'সে" (গান নং ২৩৯)

পাঞ্জ-সম্প্রদায় প্রথম দিনের প্রথম অংশে সাধন-ক্রিয়া করে না। ঐ দিনের পরবর্তী অংশে যখন জোয়ার উপস্থিত, তখন হইতে অমাবস্যা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া—এই তিন দিন তিথি বলিয়া গণনা করে। ঐ তিন দিন ত্রিবেণীর ঘাটে অধর মানুষকে ধরিবার আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে।

পাঞ্জ তিনদিনের তিনটি প্রবাহকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন—প্রথম গরল-রস, দ্বিতীয় শাম্ভু-রস, তৃতীয় অমৃত-রস। অমাবস্যা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া—এই তিনদিনের তিনটি রসের মিলন দ্বিতীয়ার দিন করিতে হইবে। পাঞ্জ-এর মতে ইহাতেই সাধনের 'রত্ন'-স্বরূপ সার্থকতা লাভ করা যাইবে। প্রতিদিনের মিলন-ক্রিয়ার পরিণত ক্রিয়া তৃতীয় দিনে—ইহাই তাঁহার অভিমত:

"তিনটি রসের ভিয়ান যে জানে সে-ই পাবে নিরঞ্জনে।
শাম্ভু গরল মিলন করে সুধার মিলনে॥
যেমন দুগ্ধে জল মিলন করিলে হংস পাখী পান করে বেছে।
রসিক জন হংস হয় সেই রসের সাধনে॥
অমাবস্যায় গরল প্রকাশে,
অমূল্য হয় সাঁই আগমনে।
সাবধানেতে সাধন করে রসিকের গণে॥

পদের শেষে দ্বিতীয়ার প্রথমে
রত্ন মিলে তিন রস মিলনে।" (গান নং ২৪৩)

এই তিনদিনের তিনরসে তিন প্রকারের রতির কল্পনা করা হইয়াছে। গরল-রসে 'সাধারণী', শান্তু-রসে 'সমঞ্জসা' এবং অমৃত রসে 'সমর্থা' রতি বিরাজ করে। তিনরসের সঙ্গে এই তিনরতি যে পাক করে, সে-ই বিশিষ্ট সাধক। এই পাকের দ্বারাই প্রেম-রূপ রত্ন লাভ করা যায়। পাক করা অর্থ আবর্তনের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত অবস্থায় পরিণত করা। ইহা রূপান্তর বা বিবর্তন সংঘটন করা—কামকে প্রেমে পরিণত করা:

"আছে প্রেম প্রয়োজন।
রসিক ময়রা হ'লে পরে ওরে সে পাবে প্রেমধন॥
চৌষট্টি রস রসের মূলে, তিন রস হয় গণন,—
গরল-রস আর শান্তু-রস বলে
অমৃত-রস সুধার মূলে,
রসের রসিক তা জানে,
তিন রতি তিন রসের সনে পাক করে সে মহাজন॥
ভাল তিথির যোগে পাকের দিন আছে,
প্রথম দ্বিতীয়ার চাঁদে রসিক সে পাক করতেছে।
ও সে রাত্রদিবা অনুরাগে মহাকামের সঙ্গে করে রণ॥" (গান নং ২৪৬)

এই অধর মানুষ ত্রিবেণীর তিনধারায় তিনভাবে নদীর জোয়ার-ভাটায় আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন। পদকর্তা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর স্থলে পদ্মা-যমুনা-ভাগীরথী বলিয়াছেন। এই তিনধারায় তিনরস ও তিনরতি। গরল রসে সাধারণী। একটি গানে পাঞ্জ শাহ্ গরল-রসকে কামরতি বলিয়াছেন—ইহাই সাধারণী। দ্বিতীয় ধারার শান্তু রসে সমঞ্জসা রতি। তৃতীয় ধারার অমৃত-রসে সমর্থা রতি। আত্মমানুষ অধরচাঁদ তিনরসে চড়িয়া তিনরতি-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন:

"অধর মানুষ নদীর কূলে ঘাট বেঁধেছে।
তাহে মণিমুক্তা ভিয়ান ক'রে ঘাটে শান বেঁধে দিয়েছে॥
পদ্মা-যমুনা মিলে ভাগীরথীর লোনা জোয়ারে।
এসে তিনভাবে তিননদীর জলে ভাটা-জোয়ার খেলতেছে॥
আত্মমানুষ অধরচাঁদে একরূপ তিনরূপ ধরেছে।
তিনধারে তিনরসে মিশে বারাম দিতেছে॥

মানুষ তিনরতি হ'য়ে, তিনরসেতে সোয়ার দিয়ে।
ও সে সাধারণী সমঞ্জসা, সমর্থা—তিন নাম ধরেছে ॥
গরল-রসে সাধারণী, সমঞ্জসায় শান্তু শুনি,
সমর্থা অমৃত-রসে বিরাজ করতেছে।
যে-জন রসিক হয়েছে, রসের ভিয়ান সে-ই জেনেছে।
ও সে গুরুর কৃপায় ঘাটে নেমে তিনরতি উজান করেছে ॥"

(গান নং ২৪৭)

মুসলমান বাউল বা ফকিরদের উপরও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং চৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়—এ-কথা পূর্বে বলিয়াছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীরা তিনপ্রকার রতির উল্লেখ করিয়াছেন—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। সাধারণী রতিতে কেবল দেহ-মিলনাকাঙ্ক্ষাই প্রবল থাকে। ইহা নিছক কাম-প্রচেষ্টা। কুব্জার প্রেম সাধারণী রতির দৃষ্টান্ত। ইহা একান্ত দেহ-সম্ভোগেচ্ছা হইতেই উদ্ভূত। ইহাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিই প্রবল। সমঞ্জসা রতিতে কিছু পরিমাণে সম্ভোগেচ্ছা থাকে বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে কৃষ্ণে প্রীতি বর্তমান থাকে। এই রতির দৃষ্টান্ত হইল রুক্মিণী-আদি কৃষ্ণ-মহিষীগণ। আর যে-রতিতে বিন্দুমাত্র নিজ সম্ভোগেচ্ছা থাকে না,—কৃষ্ণ-সুখার্থ সম্ভোগেচ্ছার উদ্ভব হইয়া যে-রতির দ্বারা নায়িকা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তাহাই সমর্থা রতি। এই রতি কেবল ব্রজগোপী-গণের মধ্যে উদ্ভূত হয়। ব্রজগোপীগণের রতিই সমর্থা রতির দৃষ্টান্ত। এই রতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও শেষে মহাভাব পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। এই মহাভাব কেবল "ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যঃ"।

শেষ দিনের রতিকে বাউলরা সমর্থা রতি বলিয়াছে। এই দিনের রসের নাম 'অমৃত রস'। প্রতিদিনের ক্রিয়ায় রতি উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ হইয়া সমর্থা রতিতে পরিণত হয় বলিয়া বাউলরা কল্পনা করিয়াছে। এই তিনদিনের রসের মিলনেই 'রত্ন' লাভ করা যায়—এই রূপও উক্ত হইয়াছে। এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধির বা ক্রম-পরিশুদ্ধির ভাবটি এবং শেষদিনের 'অমৃতরস'-নামকরণটিও মনে হয় চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাবের ফল।[৪৭২]

পাঞ্জ শাহ্ বলিতেছেন যে, মানুষ তিনরসে ও তিনরতিতে ক্রীড়াশীল

৪৭২। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়।
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ-মান-প্রণয়।

অবস্থায় মানব-দেহেই বিরাজ করেন। যোগমায়া প্রকৃতির দেহে মূলে অপ্রাকৃত শক্তির আবির্ভাব-রূপ যোগের সময় সাধন করিলে সত্যকার প্রেমলাভ করা যায়।

"মানুষের করণ মানুষ ভিন্ন নয় ওরে মন,
আগে নিষ্ঠা কর শ্রীগুরুর চরণ।
রস-রতিতে খেলছে মানুষ জান তার অন্বেষণ ॥
জগৎ-কর্তা পতিত পাবন,
এই মানুষে করে বিরাজন,
তিনরতিতে খেলছে মানুষ
তিনরসের সম্মিলন।
শান্তু, গরল, অমৃত-রসে,
কামরতি খেলে গরলের সাথে,
সেবা-সুখ শান্তু রসে, সমঞ্জসায় হরে মন ॥
সমর্থা রতি অমৃত-মিলন, সাধলে পরে পাবে প্রেমধন,
যোগমায়া চিৎ-শক্তির যোগে সাধন করে সাধুজন ॥"

॥ যোগ মিলন-ক্রিয়া ॥

কারণ-প্রবাহের তিনদিন তাহারা যোগ-মিলন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। এই তৃতীয় দিনের শেষে অথবা চতুর্থ দিনের প্রথমে তাহাদের ঐ পর্যায়ের মিলন-ক্রিয়ার পূর্ণ পরিণতি। ঐদিন সহজ মানুষের আবির্ভাব বলিয়া কথিত।

রাগ-অনুরাগ-ভাব-মহাভাব হয় ॥
যৈছে বীজ-ইক্ষুরস-গুড়-খণ্ডসার।
শর্করা-সিতা-মিছরি-উত্তম মিছরি আর ॥
*　　　*　　　*
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত-আস্বাদনে ॥" (মধ্যের ১৯ পঃ)

অন্যত্র "প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।
যৈছে বীজ, ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ডসার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি, শুদ্ধ মিশ্রি আর ॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি-প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ"। (মধ্যের ২৩ পঃ)

দৃষ্টান্তটি এইরূপ মনে হয়: রতি—ইক্ষুবীজ, প্রেম—ইক্ষুযষ্টি, স্নেহ—ইক্ষুরস, মান—গুড়, প্রণয়—খণ্ডসার, রাগ—শর্করা, অনুরাগ—সিতা, ভাব—মিশ্রি (মিছরি), মহাভাব—উত্তম মিশ্রি।

ইহা পূর্বের আলোচনায় দেখিয়াছি। এই সময় মিলন সাধক-জীবনের অবশ্য কর্তব্য।

ইহা ছাড়া ইহার পরবর্তী সময়েই তাহারা যোগ-মিলন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। এই মিলন প্রকৃতি-পুরুষের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ-প্রবৃত্তি হইতে সতর দিন পর্যন্ত মিলনের সময়:

"সতর দিন রাধাপদ্ম বিকশিত রয়।
কোন দেবদেবীর অধিকার না হয় ॥

বিধিমতে এ পদ্মের নাই নিরূপণ।
রাগমার্গে হয় পরমাত্মার পূজন ॥
এ পদ্মের সুধা হয় পরমাত্মার সেবা।
বিধিমার্গে না জানে নরনারী দেবী দেবা ॥
রাগমার্গে জানে ব্রজে ব্রজাঙ্গনাগণ।
আনন্দিতা হয়ে কৃষ্ণে সুধা করে দান ॥"

(পঞ্চানন দাসের কড়চা—পৃঃ ৩২)

বাউল সম্প্রদায়ের একাংশ আনুষ্ঠানিক প্রথা-নিয়ম প্রভৃতি মানিয়া চলে। এই অংশ প্রায়ই নবদ্বীপ-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা রসিক বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব বাউল। পূর্ববঙ্গের বাউল-সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের প্রভাবাধীন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এবং বিশেষ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব ইহাদের উপর প্রবল। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকে সমস্ত বাংলার এই মতের সাধক-সম্প্রদায় তাহাদের ধর্মমতের অনুকূল করিয়া নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে একথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অকিঞ্চন দাস তাঁহার 'বিবর্তবিলাস'-এ, লোচন দাস তাঁহার 'বৃহৎ নিগম গ্রন্থ'-এ চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 'চতুর-চূড়ামণি কবিরাজ চাঁদ'-এর গূঢ় অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সাধন-তত্ত্ব ও পদ্ধতির বর্ণনা দিয়াছেন। যাহোক এই সম্প্রদায়ের বাউলরা অনেকটা প্রথা মানিয়া চলে।

নামাশ্রয় ও মন্ত্রাশ্রয়

প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ—সাধনার এই তিনটি অবস্থা ইহারা গণ্য করে। প্রবর্ত-অবস্থায় নামাশ্রয় ও মন্ত্রাশ্রয়-বিহিত।

নামাশ্রয়ের প্রথমে গুরুকরণ প্রয়োজন :

"প্রথমে আশ্রয় হয় শ্রীগুরু চরণ।
তবে নামাশ্রয় হয় শুন বন্ধুজন ॥"

গুরু প্রথমে নাম দেন। এই নাম নানা প্রকারের আছে। তাহার মধ্যে এইগুলি বিশেষ প্রচলিত :

(১) 'হরি' নাম

"হরি নাম মহামন্ত্র চারিবেদের সার।
নামাশ্রয় হয় ইথে কহিল নির্দ্ধার ॥" ('আশ্রয়তত্ত্ব')[৪৭৩]

(২) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এইভাবে গুরু প্রথম 'হরি' নাম, পরে "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম দেন।

"ষোল নাম বত্রিস অক্ষর করান আশ্রয়।
আপনার বীজমন্ত্র তবে সমর্পয় ॥"

গুরুমন্ত্র:

"ক্লিং গুরুদেবায় কৃষ্ণবৈষ্ণবস্বরূপায় সর্বশক্তিপদ্মায় নমঃ"

গুরু গায়ত্রী :

"গুরুদেবায় বিদ্বহে কৃষ্ণস্বরূপায়
ধীমাহি তন্নো দেবো প্রচোদয়াৎ।"

তার পর দীক্ষামন্ত্র :

"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"

"এই অষ্টাদশক্ষ্যর মন্ত্র দিক্ষ্যাদি করণ।
এই মন্তে গুরু করেন আত্মাসমাপন ॥
গুরু আত্মা সিদ্ধ বলি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
এই মন্ত্র দিএ গুরু আত্মা করি লয় ॥
ইহা হইতে সংস্কার মানুস হয় জিব।
সপতির ধম্ম এই জানিবে নিস্‌চিত ॥"

৪৭৩। মৎসংগৃহীত পুঁথি। বিশ্ববিদ্যালয়-সংগৃহীত ১১৪১ নং পুঁথি ও এই পুঁথি প্রায় একই পুঁথি। অধিকাংশ অংশেই মিল আছে, তবে এই পুঁথিতে কিছু বেশি অংশ আছে। পৃষ্ঠা ৮, প্রতি পৃষ্ঠায় ২৪।২৫ লাইন।

সংস্কার মানুস জেঁহো দারকার পতি।
ঐসয্য সাগরে তেঁহো করে গতাগতি ॥
*　　　*　　　*
সর্ব্ব জিবে ভাবে তেঁহ্ জিবরূপ সক্তি।
সক্ত্যারূপে বিষ্ণু সেই হয় বিধিভক্তি ॥" ('আশ্রয়তত্ত্ব')

এই সময়ে সাধকের সমস্ত আচরণ বৈধীভক্তির আচরণের অনুরূপ পালিত হয়। তারপর ভাবাশ্রয়। ভাবাশ্রয়ে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন-নিকুঞ্জে মাধুর্যলীলার সাধনার সূত্রপাত। তখন প্রকৃতি আশ্রয় ও রাগানুগা ভজন আরম্ভ হয়।

ভাবাশ্রয়

এই সময়েও নাম ও মন্ত্র-গ্রহণ আছে। তাহাকে 'পঞ্চনাম' বলে, যথা—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধা কৃষ্ণ"

মন্ত্রঃ—

"ক্লীং শ্লোং গোপীজনবল্লভায় নমঃ"
"এই দ্বাদসাক্ষর দিক্ষাদি করণ।
গোপী অনুগত হয় কৃষ্ণের ভজন ॥" ('আশ্রয়তত্ত্ব')

নবদ্বীপের একজন বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব বাউল এই পঞ্চনামের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। এই পঞ্চনামে তাঁহাদের প্রকৃতি-সাধনের ইঙ্গিত আছে, যথা—

কৃষ্ণ—অনুরাগ বা আকর্ষণ
কৃষ্ণ—বাহ্ কামাদির পরিত্যাগ
গোবিন্দ—প্রকৃতির দেহ-গ্রহণ
রাধা—আরাধন-কার্য বা শৃঙ্গার
কৃষ্ণ—সম্মিলিত সত্তার একাত্ম অনুভূতি

এই সময় সাধক কাম-বীজমন্ত্র ও কাম-গায়ত্রী এবং কৃষ্ণ ও রাধিকার নানা বীজমন্ত্র গ্রহণ করে।

কাম-বীজমন্ত্র : "ক্লীং"।

কাম-গায়ত্রী : "ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নো কৃষ্ণ প্রচোদয়াৎ।"

"কৃষ্ণের গাইত্রি শুন রসিকের গণ।
কামরূপা গাইত্রিতে রাধা উপাসন ॥

সাড়ে চব্বিশ অক্ষর শ্রীমতী উপাসন।
কৃষ্ণের আশ্রয় রাধা সুন সর্ব্বজন॥" ('আশ্রয়তত্ত্ব')

রাধিকার বীজমন্ত্র—"ওঁ শ্রীং হ্রীং রীং রাধিকায়ৈ স্বাহা।"

রাধিকার গায়ত্রী—"শ্লীং রাধিকায়ৈ বিদ্বহে প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো রাধে প্রচোদয়াৎ।"

"এই বিজের মুত্রি রাধা কৃষ্ণ অনুগত।
দুঁহে দুঁহার অনুগত ব্রজে অভিমত॥
দুঁহে দুহার অনুগত হয়ে দুই জন।
সজন মানুষ ভজে সে অতি গোপন॥
* * *
মদন-কন্দর্প দুই প্রিকিতিপুরুস।
বৃন্দাবনে অপ্রাক্রৃত সহজ মানুষ॥" ('আশ্রয়তত্ত্ব')

কৃষ্ণের অন্যান্য বীজমন্ত্র :

"ওঁ ক্লীং গ্লীং গোবিন্দায় স্বাহা"
"ওঁ ক্লীং দ্রীং কৃষ্ণগোবিন্দায় স্বাহা"

চৈতন্য-বীজমন্ত্র :

"ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।"

ভাবাশ্রয়ে প্রকৃতি-সাধনা আরম্ভ হয়। তখনই 'রসাশ্রয়'ও লইতে হয়, এই রসাশ্রয়ের পরিণতি প্রেমাশ্রয়ে। এই প্রেমাশ্রয় সিদ্ধ অবস্থা বলিয়া কথিত। ইহাই আনুষ্ঠানিক আশ্রয়-তত্ত্ব।

॥ যোগ-মিলন-ক্রিয়ার পদ্ধতি ॥

ভাবাশ্রয় বা প্রকৃতি-সাধন হইতেই যোগ-মিলন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই যে নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় প্রভৃতি উল্লেখ করিলাম, ইহা যে-সব বাউলদের মধ্যে বৈষ্ণব-সংস্কার প্রবল, তাহারা ইহা আনুষ্ঠানিকভাবেই পালন করে। কিন্তু মুসলমান বাউল বা অন্যান্য স্থানের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের বাউল আনুষ্ঠানিকভাবে ইহা পালন করে না। ফকিরগণ 'আলেখজান', 'মুরশিদজান' বা 'খোদা-নিরঞ্জন' প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু বিশেষভাবে কোনো জপ ও অন্য প্রকারের অনুষ্ঠান করে না। প্রথমে তাহারা তত্ত্ব সম্বন্ধে গুরু-মুখে প্রাথমিক আলোচনা শোনে এবং 'শ্বাসের ক্রিয়া' অভ্যাস করে।

যোগ-মিলন-ক্রিয়া এই সাধনার সর্বাপেক্ষা কঠিন অংশ। ইহাই প্রকৃত বাউল-সাধনা। আশ্রয় কেবল একটা অনুষ্ঠান মাত্র, যোগ-মিলনই ইহার সাধনা। ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্বে প্রাথমিকভাবে পূরক, রেচক, কুম্ভক প্রভৃতি শ্বাস-প্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণ এবং মূত্র-দ্বার তথা শুক্র-দ্বারের সংকোচ-প্রসার শিক্ষা করিতে হয়।

পঞ্চানন দাসের কড়চায় আছে :

"প্রথম সাধনে কার্য্য কহি যা করিবে।
মূত্রসর্গকালে মূত্র বেগ সম্বরিতে ॥
বায়ু দ্বারা মূত্রে তথা করি আকর্ষণ।
অল্পে অল্পে পুনঃ তাহা করিবে বর্জ্জন ॥
অপান বায়ুর যোগে উর্দ্ধে উঠাইবে।
গুরু আজ্ঞা অনুসারে প্রত্যহ সাধিবে ॥
এই ক্রম অনুসারে যে জন সাধয়।
বিন্দুসিদ্ধি জানিও সে সাধকের হয় ॥"

ইহা একটি ক্রিয়ামাত্র। এই সাধনার মূলে সমস্তই বায়ু-নিয়ন্ত্রণ-ক্রিয়া বা যোগ।

সর্বত্রই বাউলদের মুখে একটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সেটি 'দমের কাজ'। যে-ব্যাপারটি যোগের ক্রিয়া, তাহাকে সকলেই 'দমের কাজ' বলে। 'দম'-এর উপর তাহাদের এই কঠিন সাধনার সিদ্ধি নির্ভর করে। 'দম' অর্থে নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ বা রোধ করা। গানগুলির মধ্যে নানা স্থানে দমের উল্লেখ আছে।

প্রথমে গুরুর উপদেশ অনুসারে তাহারা শ্বাস-ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রণ—বা প্রাণায়াম অভ্যাস করে। প্রথম বাম নাসা দ্বারা বায়ু টানিয়া কিছুক্ষণ সেই বায়ু ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ নাসায় তাহা ত্যাগ করে। আবার দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু টানিয়া লইয়া, কিছুক্ষণ রাখিয়া বাম নাসায় ত্যাগ করে। প্রথমে আটবার, তারপর ষোলবার, তারপর বত্রিশবার, তারপর চৌষট্টিবার। এই ভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করে। ইহাই পূরক, কুম্ভক ও রেচক-শিক্ষা।

এইভাবে অভ্যাসের দ্বারা কুম্ভক-ক্রিয়ার শক্তি অর্জিত হয়। এই কুম্ভক-শক্তির উপর বাউলদের সাধন-ক্রিয়ার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। এই কুম্ভক দ্বারা সমস্ত নাড়ী পরিশুদ্ধ হইয়া ক্রমে বায়ু সুষুম্না-পথে চলিতে আরম্ভ করে। তখন বায়ুর সাম্যাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুর স্থৈর্য সাধিত হয়। এই স্থির

বিন্দুকে উর্ধ্বপথে চালিত করাই তাহাদের মূল-সাধনা। বাউলদের ভাষায় যে যত 'দম' রাখিতে পারিবে, সে তত শীঘ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে।

এই কুম্ভক-শক্তির উপরই বাণ-ক্রিয়া নির্ভর করে। বাণ-ক্রিয়া ব্যাপারটি কি, বুঝিতে হইবে। মদন, মাদন শোষণ, স্তম্ভন ও সম্মোহন—এই পঞ্চবাণের ক্রিয়া আছে মিলন-ব্যাপারে। 'বাণ' পুরুষ-শক্তি ও 'গুণ' প্রকৃতি-শক্তির প্রতীক। ইহাই অনেক সময় বাউলদের ইঙ্গিতার্থক ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, মূলতঃ ইহা লিঙ্গ-যোনি। এই গুণে বাণ যোজনা করিয়া উর্ধ্বদিকে ছাড়িয়া লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে—এরূপ বাউল-সাহিত্যে উল্লেখ আছে। পঞ্চানন দাসের পুঁথিতে আছে :

বাণ-ক্রিয়া

"গুণে বাণে হয় রসিকের করণ।
পঞ্চবাণেতে তাঁহারা করেন সাধন ॥" (পৃঃ ৩১)

'রত্নসার' পুঁথিতে আছে :

"মদন, মাদন আর শোষণ, স্তম্ভন।
সম্মোহন আদি করি রসিক-করণ ॥"[৪৭৪]

মিলন-ক্রিয়ায় বাউলরা প্রকৃতি-পুরুষের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক অংশের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়। কারণ, দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীণ মিলনেই উভয়শক্তির সামরস্য সংঘটিত হয়। এই মিলন না হইলে সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অনেক পদে তাহার উল্লেখ আছে :

"উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে।
সাধারণী হইলে ইথে যায় রসাতলে ॥"

—প্রেম-বিলাস (সহজিয়া পুঁথি)

"দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় তবে ॥
দোঁহার মন ঐক্য ভাবে ডুবি এক হয়।
তবে সে সহজসিদ্ধ জানহ নিশ্চয় ॥"

—প্রেমানন্দলহরী (সহজিয়া পুঁথি)

"পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয় ॥"

—চণ্ডীদাসের পদ

৪৭৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি নং ১১১১

সাধনার দিক দিয়া মদন রতি-শক্তির উত্তেজক প্রাথমিক ক্রিয়ার প্রতীক। প্রকৃতি-দেহের বিভিন্ন স্পর্শ-কাতর স্থানগুলি স্পর্শ, বিশেষভাবে চোখের দৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা উত্তেজনা বৃদ্ধি; মাদন প্রকৃত ক্রিয়ার প্রতীক—বাউলদের ভাষায় 'হিল্লোল'। এই সময় উত্তরোত্তর উত্তেজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হয়; এই সময় দক্ষিণের পিঙ্গলা নাড়ীতে সামান্য কিছুক্ষণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত করিতে হয় এবং দক্ষিণ চক্ষুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। প্রথমে মদনে বামের ইড়া-নাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস-গ্রহণ আরম্ভ করিয়া মাদনে দক্ষিণের পিঙ্গলা-নাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় কিছুসময় শ্বাস-গ্রহণ করিয়া উত্তেজনা-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়। বাউলদের 'বাম' ও 'দক্ষিণ' শব্দ দুইটি বিশেষ অর্থ-জ্ঞাপক। বামে চন্দ্রনাড়ী—ইড়ার সাম্যবস্থা, দক্ষিণে পিঙ্গলা সূর্যনাড়ী—চাঞ্চল্যজনক অবস্থা। দক্ষিণ কামের অবস্থা, এখানে বিন্দু-চাঞ্চল্য স্বাভাবিক, সেই জন্য সর্বদা তাহারা দক্ষিণ পরিত্যাগ করে। চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদে আছে:

> "দক্ষিণ দিগেতে কদাচ না যাবে
> যাইলে প্রমাদ হবে।"

কিন্তু বাণ-সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ মাদন-সাধনার সময় সামান্য কিছুক্ষণের জন্য দক্ষিণ অবলম্বন করার তাৎপর্য এই যে, কামের বৃদ্ধিতে বিলাস পূর্ণতা লাভ করে। বিলাস দ্বারা কাম-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ না করিলে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে না।

কৃষ্ণদাস 'রত্নসার' গ্রন্থে বলিতেছেন:

> "বামারাগ হয় অতি রসের উল্লাস।
> দক্ষিণা রাগেতে হয় যথাযোগ্য বিলাস॥"[৪৭৫]

'যথাযোগ্য বিলাস'-এর জন্যই, মনে হয়, এই স্তরে কামের উত্তেজনার প্রয়োজন হয়।

মদন-মাদন বাম ও দক্ষিণ নেত্রে অবস্থিত বলিয়া চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদেও উক্ত হইয়াছে:

> "মদন বৈসে বাম নয়নে।
> মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥"

তৃতীয় শোষণ-বাণ। এই বাণের ক্রিয়ায় বিশেষ যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। সাধারণতঃ যোগশাস্ত্রে যাহাকে 'বজ্রোলী মুদ্রা' বলে, অনেকটা তাহারই ক্রিয়া

৪৭৫। কলি-বিশ্ব-পুঁথি নং ১১১১

এখানে লক্ষ্য করা যায়। যোগশাস্ত্রের এই নামটি তাহাদের খুব সম্ভব অনেকেই জানে না, তবে এই ক্রিয়াটি তাহারা গুরুর উপদেশে প্রথম হইতেই আরম্ভ করে। প্রথমে লিঙ্গ-নালে জল-শোষণ, তারপর দুগ্ধ-শোষণ প্রভৃতি শিক্ষা করে, তারপর মিলন-ক্রিয়ার সময় তাহারা 'রূপ-রতি-রস' শোষণ করে। সাধন-ক্রিয়ার অঙ্গে এই কথা তিনটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। বাউলরা 'রূপ' বলিতে রজঃ, 'রতি' বলিতে স্ত্রী-বীর্য, এবং 'রস' বলিতে শুক্রকে বুঝিয়া থাকে। মন্থনে বিচলিত বিন্দু, প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ রস-ক্ষরণ এবং রজের কিছু অংশ সাধক শোষণ-বাণে আকর্ষণ করে।

তারপরেই স্তম্ভন-বাণ। স্তম্ভনে উভয়-দেহের রসের একটা স্থিরতা সম্পাদিত হয় এবং কোনো চাঞ্চল্যের আর সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থায় ক্রিয়া চলিতে থাকায় ক্রমে দেহের বিভিন্ন স্পর্শ-কাতর অংশ স্পর্শ এবং নানাভাবে এই স্থির অচঞ্চল আনন্দানুভূতিকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া চরম অবস্থায় উপনীত করা হয়।

ইহার পরই সম্মোহন বা মোহন। এই সময় ক্রমে দেহ-স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায়—কেবল বিপুল আনন্দের এক তরঙ্গায়িত চেতনা অনুভূত হয়। ইহাই বাউলদের 'জেন্তে-মরা' অবস্থা। ইহাই তাহাদের 'প্রেম'-এর অবস্থা। এখন 'কাম' বা দেহ ভোগের অবস্থা উত্তীর্ণ, এখন উভয় পক্ষেরই পুরুষ বা প্রকৃতি রূপে কোনো অভিমান নাই। কেবল একটা বিপুল আনন্দের অনুভূতি বর্তমান। ইহাই 'কামের' মধ্য হইতে 'প্রেমের' উদ্ভবের স্বরূপ।

ইহার পর এই অনুভূতিকে ক্রমে উর্ধ্বে উঠাইবার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। নাভি-পদ্ম হইতে হৃদয়-পদ্মে এই অনুভূতিকে উঠাইবার সময় বাউলরা কিছু কাঠিন্য অনুভব করে বলিয়া তাহারা বলে, তাহার পর হইতে স্বেদ, কম্প প্রভৃতি নানা ভাবের স্ফুরণ আরম্ভ হয়, নানা সুমধুর ধ্বনি শোনা যায়। শেষে চরম পরিণতি হয় আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলপদ্মে। সেই সময় পূর্ণ 'মহাভাব'-অবস্থা। শক্তি অনুসারে অর্থাৎ শক্তি-অর্জনের অনুপাতে যতক্ষণ ইচ্ছা সাধক এই অবস্থায় অবস্থান করে। তাহার পর ক্রিয়ার বিরতিতে ধীরে ধীরে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা-লাভ হয়। ইহাই বাউলদের যোগ-মিলনের ক্রিয়ার মোটামুটি কাঠামো। এখন এই তিনদিনের ক্রিয়া ও তাহার পরবর্তী চতুর্থদিনের ক্রিয়া যথাক্রমে উল্লেখ করিলেই সাধনা সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাইবে:

(১) প্রথম দিনের প্রথম অংশে বাউলরা পান-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে।

কোনো কোনো স্থলে দুই বস্তু মিশ্রিত করিয়াও পান করা হয়। ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তারপর মিলন-ক্রিয়া। এই দিনের মিলন-ক্রিয়ার এবং ইহার পরবর্তী দুই দিনের ক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা ঠিক আয়ুর্বেদের তৈলপাকের জ্বালের অনুরূপ—"মৃদু-মধ্য-খরক্রমাৎ"। ইহাই এই তিন দিনের হিল্লোলের স্বরূপ। প্রথম দিনে প্রথম দুই বাণের ক্রিয়া ছাড়া অন্য বাণের ক্রিয়া করা হয় না। অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়।

অগ্নি দ্বারা জ্বাল দিয়া এবং তৎসঙ্গে আবর্তন বা আন্দোলন দ্বারা কোনো তরল জিনিসকে গাঢ় করার কল্পনা এই সাধন-ক্রিয়ার মূলে বর্তমান দেখা যায়। এই অগ্নি কারণ-বারি, এই সময়ে ইহা নিরন্তর প্রজ্বলিত রহিয়াছে। ইহা জ্বলন্ত কাম-স্বরূপ—লালনের ভাষায়—

"জলের মধ্যে অগ্নিজ্বালা" (গান নং ৪২)।

এই কাম-অগ্নির জ্বালে এবং সুদক্ষ আন্দোলনের দ্বারা প্রেম-মিছরি পরিণত হইলেই 'পাক সিদ্ধ' হয়। ইহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই অগ্নিতে রস-জ্বালের কথা অনেক গানে পাওয়া যাইবে। প্রকৃতির রসময় দেহে বারো মাসে এই অগ্নির যে উদয় হয়, তাহা লোচন দাস 'বৃহৎ নিগম গ্রন্থ'-এও বলিয়াছেন :

"নির্গুণ মানুসতত্ত রসময় তনু।
তাহার আস্রয়এ রহে যে বত্তমান ভানু ॥
ভানু সব্দে সুর্জ্য বলি দাদস আদিত্য।
সেই সর্ব্ব রাত্রি হয় বত্তমান নিত্য ॥
ভানু বলি বারমাসে উদয় জে হয়।
নাইকার দেহে বত্তমান রয় ॥
সাক্ষাৎ স্বরূপ ব্রজে বৃন্দাবন হয়।
দাদস আদিত্য সম তাহাতে উদয় ॥" (৭ম অঙ্ক)

এই 'কারণই' প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব—তাহার বিশিষ্ট শক্তির প্রকাশ। এই শক্তি সৃষ্টির শক্তি। ইহার সহিত পুরুষের বীজের সংস্পর্শে সৃষ্টির পূর্ণরূপ। এই উভয় শক্তিকে উর্ধ্বগত বা সৃষ্টিধারার 'উজান' বাহিয়া লইয়া গেলে, জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, একটি স্থির মিলনানন্দ অনুভব করা যায়—এই প্রত্যয় বা উপলব্ধিই বোধহয় এই সময়ের মিলন-ক্রিয়ার মূলে নিহিত।

যে-সব হিন্দুজাতির বাউল অনুষ্ঠান-প্রিয়, তাহারা এই মূলাধার—ত্রিধারা-বিশিষ্ট ত্রিবেণীর ঘাটকে পূজা-বন্দনাদি করিয়া তবে সেই ঘাটে নামে। ইহার

কয়েকটি মন্ত্র সংগ্রহ করা আছে। অশুদ্ধ সংস্কৃত ও বাংলা-সংস্কৃতের একটা মিশ্র-রূপ এইসব মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। ভাষার শুদ্ধি-অশুদ্ধি-জ্ঞান তাহাদের অনেকেরই নাই, গুরুমুখে যাহা পাইয়াছে তাহাই নিষ্ঠার সঙ্গে আওড়াইয়া যায়। ঘাটে তিন-দিবসের ক্রিয়ার পূর্বে নবদ্বীপ-সম্প্রদায়ের অনেক বাউল যে-মন্ত্রে ঘাট-বন্দনা করে, তাহার একটি এইরূপ :

"ত্রিধারা মানশিক পূজা ॥"

"শ্রীংরূপ ত্রিয়োধারা লাল শ্বেত জলাঙ্কক, মাস মাস গতা আতা জীবানাং সদা চরেত্ তং।"

"দেষেণ সদাক্ষমী নিত্য দেহি কিশোরী, ইদং ভক্তি তুলশী, জ্ঞান চন্দন, প্রেম প্রদীপ শ্রদ্ধাধূপ সর্ব্বপরিপূর্ণার্থে মনপ্রাণ কারুণ্যামৃতধারায়ৈ নমঃ নমঃ ॥"

"হ্রীং রসমণি, রসকারিণী, তাপত্রয় নাসিনী মহে নিত্যদেহী কিশোরী, ইদং ভক্তি তুলসী, জ্ঞান-চন্দন, প্রেম-প্রদীপ শ্রদ্ধাধুপ সর্ব পরিপূর্ণার্থে মনপ্রাণ তারুণ্যামৃত ধারায়ৈ নমঃ নমঃ।"

"শ্রীং ভগশিরোমণি, তব দাস স্মরণাগত নিত্যদেহী কিশোরী, ইদং ভক্তি তুলসা, জ্ঞান চন্দন প্রেম প্রদীপ শ্রদ্ধাধুপ সর্বপরিপূর্ণার্থে লাবণ্যামৃত ধারায়ৈ নমঃ নমঃ।"

"নির্ব্বিকারে। অতি সাবধানে। ভক্তির সহিত।"[৪৭৬]

তিনদিনই ক্রিয়ারম্ভের পূর্বে পর পর তিনটি মন্ত্রে তাহারা ত্রিবেণী ঘাট পূজা করে।

(২) দ্বিতীয় দিনে গুরু ভেদে ও সম্প্রদায় ভেদে কেহ কেহ পান-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, আবার কেহ করে না। কেহ কেহ এই দ্বিতীয় দিনে মিলিত বস্তু পান করে। মিলন-ক্রিয়া সর্বত্র সকলেই করে।

(৩) তৃতীয় দিনে অধিকাংশ সাধকই পান ক্রিয়া করে না। মিলিত বস্তুর পান এদিন কেহই করে না। এই দিনের ক্রিয়াই মিলন।

(৪) তিনদিনের পরবর্তী ক্রিয়া মিলনের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনদিনের শেষে 'সহজ মানুষ' বা 'অধর মানুষ' আবির্ভূত হন বলিয়া বাউলগণ কল্পনা করিয়াছে। এই মিলনের সময়টি হইতেছে সেই সময়, যখন ভাটার টানে প্রবাহ শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু অতি ক্ষীণ অস্তিত্ব একটু আছে।

৪৭৬। নবদ্বীপের যে বাউল-সাধকের নিকট ইহা পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার নিজের হাতে লেখা কাগজটিতে যাহা লেখা ছিল, তাহা অবিকল উঠাইয়া দিলাম। কেবল উদ্ধৃতির চিহ্ন বা ঊর্ধ্ব-কমা যোগ করিয়াছি মাত্র।

এই সময়টি প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা, দ্বিতীয় চব্বিশ ঘণ্টা, তৃতীয় চব্বিশ ঘণ্টার পর, চতুর্থ চব্বিশ ঘণ্টার সূত্রপাতের অব্যবহিত পরেই উপস্থিত হয়। উহা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দিক হইতে চতুর্থ দিনে পড়িয়া যায়। তিনদিনের ক্রিয়ায় কাম-অংশ নষ্ট হইয়া এই সময় প্রেমের আবির্ভাব হয়—ইহাই বাউলদের ধারণা। তাহারা এই তিনদিনে তিনরতি ও তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সময়কে 'আধ-রতি' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। অনেক বাউল তাহাদের সাধনাকে 'সাড়ে তিন রতির খেলা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। (দ্রষ্টব্য গান নং ৩৫৫, ৩০০ প্রভৃতি)

এখন এই মিলন-ক্রিয়ার স্বরূপটি কি দেখা যাক।

প্রথম মিলনের পক্ষে প্রশস্ত বা উপযুক্ত সময়টি নির্দেশ করিতে হইবে। যখন চন্দ্রনাড়ী ইড়াতে অর্থাৎ বাম নাসিকায় পুরুষের শ্বাস বহিতে থাকে এবং প্রকৃতির পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস বহে, সেই সময় মিলনের সময়। এই সময়টি রাত্রের আহারের দুই ঘণ্টা পরে আসে—বাউলরা এইরূপ বলে। এই সময়টা অর্ধ-প্রহর অর্থাৎ দেড়ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। এই সময়টি সাধক-সাধিকাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই সময়ই মিলন-ক্রিয়ারম্ভের সময়।

ক্রিয়ার আরম্ভে 'আলাপন'। উহা পরস্পর দেহের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ। তাহার পর ক্রিয়ারম্ভ। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের সাধক এই সময় কাম-বীজ এবং সাধিকা কাম-গায়ত্রী জপ করে এবং পরস্পর যে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ, তাহাই অনুভব করে। ক্রিয়ার কিছুক্ষণ পরে সাধক বাম নাসায় শ্বাস-টানা বন্ধ করিয়া সামান্য কিছু সময়ের জন্য দক্ষিণ নাসায় শ্বাস টানিবে। এ বিষয় বাণ-শিক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। তারপর উত্তেজনা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইলে যদি বিন্দুর বিচলিত অবস্থা অনুভব করা যায়, তখন সাধকগণ দুইটি ক্রিয়া অবলম্বন করে। প্রথম, নিশ্বাস বা অপান-বায়ু রুদ্ধ করিয়া লিঙ্গ-মূলের নিম্নভাগে এক পায়ের গোড়ালি দ্বারা চাপিয়া ধরে এবং বার বার গুহ্যদ্বার সংকুচিত করে। দ্বিতীয়, প্রকৃতির চোখের উপর বা নিজের ভ্রূর মধ্যস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

দুইটিই যোগের ক্রিয়া। যোগে প্রথম ক্রিয়ার পারিভাষিক নাম 'মূলবন্ধ' ও দ্বিতীয়টির নাম 'অশ্বিনী মুদ্রা'।

'মূলবন্ধ' সম্বন্ধে যোগের গ্রন্থাদিতে এইরূপ উল্লেখ আছে :

"পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতঃ।
বলাদপানমাকৃষ্য ক্রমাদ্বন্ধং সমাচরেৎ ॥

কল্পিতোঽয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনঃ।
অপানপ্রাণয়োরৈক্যং প্রকরোত্যধিকল্পিতম্ ॥"
—শিবসংহিতা, ৪র্থ পটল, শ্লোক—৬৪-৬৫

সংযতহৃদয়ে পাদমূল (গুল্‌ফ) কর্তৃক গুহ্যপ্রদেশ নিপীড়িত করিয়া শক্তির সঙ্গে অপানবায়ুকে আকর্ষণপূর্বক ক্রমে ঊর্ধ্বে লইয়া যাইবে। ইহার নাম মূলবন্ধ। এই মূলবন্ধ দ্বারা জরা ও মৃত্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই মূলবন্ধের বলে প্রাণ ও অপানবায়ুর সমতা হয়।[৪৭৭]

'হঠযোগ-প্রদীপিকা'য় মূলবন্ধের এইরূপ বর্ণনা আছে:

পার্ষ্ণিভাগেন সংপাড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্ গুদম্।
অপানমূর্ধ্বমাকৃষ্য মূলবন্ধোঽভিধীয়তে ॥
অধোগতিমপানং বা উর্ধ্বগং কুরুতে বলাৎ।
আকুঞ্চনেন তং প্রাহুর্মূলবন্ধং হি যোগিনঃ ॥
গুদং পার্ষ্ণ্যা তু সংপীড্য বায়ুমাকুঞ্চয়েদ্ বলাৎ।
বারং বারং যথা চোর্ধ্বং সমায়াতি সমীরণঃ ॥
—তৃতীয়োপদেশ, ১৮ শ্লোক

পাদগুল্‌ফ দ্বারা যোনি-স্থানস্থ মূলাধারকে সবলে চাপিয়া অপানকে ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণপূর্বক গুহ্যদ্বার সংকুচিত করিবে, (ইহা দ্বারা অপানরূপী অধঃস্থ প্রাণশক্তি ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট হওয়ায় নাড়ীচক্রের সর্বনিম্ন সংযোগস্থল মূলাধারমুখ বদ্ধ হইয়া যায়, এই জন্য) ইহার নাম মূলবন্ধ বলা হয়; (ফলতঃ) যাহা (গুহ্যদেশকে) আকুঞ্চন করিয়া অধঃপথে সঞ্চরণশীল অপানকে সবলে ঊর্ধ্বগামী করে, তাহাকেই যোগিগণ মূলবন্ধ বলিয়াছেন। গুল্‌ফ দ্বারা যোনিস্থান সবলে চাপিয়া ধরিয়া বারংবার (এমন) সজোরে বায়ুকে আকুঞ্চন করিবে, যেন তাহা ঊর্ধ্বদিকে সঞ্চারিত হয়।[৪৭৮]

'অশ্বিনী মুদ্রা'র এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

"আকুঞ্চয়েদ্ গুদদ্বারং প্রকাশয়েৎ পুনঃ পুনঃ।
সা ভবেদশ্বিনী মুদ্রা শক্তিপ্রবোধকারিণী ॥"
—ঘেরণ্ড-সংহিতা, তৃতীয়োপদেশ, শ্লোক নং ৮২

৪৭৭। 'শিবসংহিতা'—বসুমতী সং,—পৃঃ ৮৪

৪৭৮। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'—বসুমতী সং,—পৃঃ ৯০-৯১

বার বার গুহ্যদ্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণ করাকেই অশ্বিনীমুদ্রা বলে। এই মুদ্রা শক্তি-প্রবোধকারিণী বলিয়া অভিহিত।[৪৭৯]

'ঘেরণ্ডসংহিতা'র অন্যস্থলে আছে :

"তাবদাকুঞ্চয়েদ্ গুহ্যং শনৈরশ্বিনীমুদ্রয়া।
যাবদ্ গচ্ছেৎ সুষুম্নায়াং বায়ুঃ প্রকাশয়েদ্ধঠাৎ ॥

—তৃতীয়োপদেশ, শ্লোক নং ৫৫

যে পর্যন্ত বায়ু সুষুম্নানাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ অশ্বিনীমুদ্রা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত করিবে।

তারপর নেত্র ও ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাও যোগেরই একটি অঙ্গ। ইহা দশবিধ ধারণার অন্যতম। দত্তাত্রেয়-কথিত 'যোগরহস্য'-এ আছে :

"প্রাঙ্নাভ্যাং হৃদয়ে চাত্র তৃতীয়ে চ তথোরসি।
কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রভ্রূমধ্যমূর্ধসু ॥
কিঞ্চতস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্মৃতা।
দশৈতা ধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্নোত্যক্ষরসাম্যতাম্ ॥"

—শ্লোক নং ৪৩-৪৪

যাহা দ্বারা মনকে ধারণা করা যায়, তাহাই ধারণা। প্রথমে নাভিতে, অনন্তর হৃদয়ে, পরে বক্ষঃস্থলে, তৎপরে যথাক্রমে কণ্ঠে, মুখে, নাসিকার অগ্রভাগে, নেত্রে, ভ্রূমধ্যে, মস্তকে এবং পরাৎপর ব্রহ্মে মনকে ধারণ করা দশবিধ ধারণা বলিয়া কথিত, এই দশবিধ ধারণাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ হয়। ইহাকে 'যোগভূমি' বলা হইয়াছে, ইহাতে আরোহণ করিলে, "ব্রহ্মস্থিতিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ"।[৪৮০]

এই দৃষ্টি-স্থাপনকে বাউলরা 'নেহার' বলে। বহুগানে এই নেহারের উল্লেখ আছে। এই স্থিরদৃষ্টিকে তাহারা 'আরোপ'ও বলে।

ক্রিয়ার এই অবস্থাতেই কুম্ভকের আরম্ভ এবং শেষ পর্যন্ত কুম্ভকেরই ক্রিয়া বর্তমান। পূর্বে বলিয়াছি যে, কুম্ভকই মিলন-ক্রিয়ার মূলভিত্তি। বাউল-সাধনা এই প্রাণ ও অপানবায়ু নিরোধ করিয়া, কুম্ভক অবলম্বন করিয়া মধ্যপথে সেই বায়ু-ধারাকে মিলাইয়া ঊর্ধ্বগত করার উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে বাউলরা এই

৪৭৯। 'ঘেরণ্ডসংহিতা'—বসুমতী সং,—পৃঃ ৩৫৪

৪৮০। 'যোগরহস্য'—বসুমতী সং, পৃঃ ২৬৭-৬৮

বায়ু-নিয়ন্ত্রণের সাধনা বা 'দম'-এর সাধনাই করিয়া থাকে। বাউলদের অন্তরঙ্গ সাধন-জীবনের পরিচয়ে জানি যে, প্রথম হইতে তাহারা দমের ক্রিয়া আরম্ভ করে এবং শেষজীবন পর্যন্ত অব্যাহত রাখে। প্রকৃতি-সংস্রব ত্যাগ করিলেও তাহাদের সাধনা এই দমের উপর নির্ভর করে। এই দমের ক্রিয়ায় যে যতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছে, এই কুম্ভকে যে যত বেশি সময় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, সে-ই সাধনায় ততখানি অগ্রসর। এই কুম্ভকে বা অটল বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত সাধকই প্রকৃত বাউল-সাধক। নকল বাউল বা ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য বাউল সাজিয়াছে, না আসল বাউল বা কঠিন যোগমূলক ধর্ম-সাধনার জন্য বাউল হইয়াছে—তাহার কষ্টিপাথর ক্রিয়া-কালীন এই কুম্ভক-শক্তি। আমি পূর্বে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রকৃত বাউল-সাধনা ইন্দ্রিয়-চর্চা নয়, ইহা সুকঠিন যোগ-সাধনা।

ইহার পর শোষণ-ক্রিয়া। সে সম্বন্ধে বাণ-শিক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছি। যোগশাস্ত্রে ইহা 'বজ্রোলী মুদ্রা' নামে অভিহিত।

'শিবসংহিতা'য় বজ্রোলী মুদ্রার এইরূপ বর্ণনা আছে :

"আদৌ রজঃ স্ত্রিয়া যোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ।
আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ ॥
স্বকং বিন্দুঞ্চ সংবধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ।
দৈবাচ্চলতি চেদূর্ধ্বে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া ॥
বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ।
ক্ষণমাত্রং যোনিতোঽয়ং পুমাংশ্চালনমাচরেৎ ॥
গুরূপদেশতো যোগী হুংহুংকারেণ যোনিতঃ।
অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ ॥"

—চতুর্থ পটল, শ্লোক—৮১-৮৪

বিদ্বান যোগী প্রথমতঃ যত্নপূর্বক লিঙ্গ-নাল দ্বারা স্ত্রী-যোনী হইতে বিধান-মতে রজঃ-আকর্ষণপূর্বক নিজদেহে প্রবেশিত করিবেন। তৎপরে তাহাতে স্বীয় বীর্য সংবদ্ধ করিয়া লিঙ্গ পরিচালনা করিতে থাকিবেন; ইহার মধ্যে যদ্যপি যোনিমুদ্রা দ্বারা উর্ধ্বে নিরুদ্ধ বিন্দু স্খলিতপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহা বামভাগে ইড়া নাড়ীতে চালিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ যোনিমধ্যে লিঙ্গ-পরিচালন বন্ধ করিবেন। তৎপরে সেই সাধক ব্যক্তি গুরূপদেশ-অনুযায়ী হুহুংকার শব্দ সহকারে অপান-

বায়ু আকুঞ্চন করিয়া শক্তি সহকারে যোনি-মধ্য হইতে রজঃ-আকর্ষণপূর্বক পুনরায় লিঙ্গ পরিচালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[৪৮১]

'হঠযোগ-প্রদীপিকা'য় বজ্রোলী মুদ্রা এইভাবে উল্লিখিত আছে :

"মোহনেন শনৈঃ সম্যগূর্ধ্বাকুঞ্চনমভ্যসেৎ।
পুরুষোঽপ্যথবা নারী বজ্রোলীসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥

*　　*　　*

এবং সংরক্ষয়েদ্বিন্দুং মৃত্যুং জয়তি যোগবিৎ।
মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ ॥

*　　*　　*

যাবদ্বিন্দুঃ স্থিরো দেহে তাবৎ কালভয়ং কুতঃ।
চিত্তায়ত্তং নৃণাং শুক্রং শুক্রায়ত্তং চ জীবিতম্।
তস্মাচ্ছুক্রং মনশ্চৈব রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ ॥
ঋতুমত্যা রজোঽপ্যেবং বীজং বিন্দুং চ রক্ষয়েৎ।
মেঢ্রেণাকর্ষয়েদূর্ধ্বং সম্যগভ্যাসযোগবিৎ ॥"

—তৃতীয়োপদেশ, শ্লোক—২৬-২৭

মৈথুনেন্দ্রিয়ের দ্বারা (মৈথুন-কালে পতনশীল বিন্দুকে) ধীরে ধীরে সম্যক্ ঊর্ধ্বে আকুঞ্চন (পূর্বক টানিয়া রাখিতে) অভ্যাস করিবে। পুরুষ কিংবা নারী (প্রত্যেকেই এই অভ্যাস দ্বারা) বজ্রোলী-সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

যে-যোগবিৎ এইরূপে (বজ্রোলী-মুদ্রা দ্বারা) সম্যক্ বিন্দু রক্ষা করেন, তিনি মৃত্যুকেও জয় করেন ; (কারণ) বিন্দুক্ষয়েই মরণ, আর বিন্দুধারণেই জীবন। যাবৎ দেহমধ্যে বিন্দু স্থির থাকে, তাবৎ কালভয় কোথায়? লোকদের জীবন শুক্রায়ত্ত, আর শুক্র চিত্তাধীন। (শুক্র-ধাতুই জীবনীশক্তির সর্বপ্রধান পোষক, সেই শুক্র আবার অষ্টাঙ্গ মৈথুনজন্যচিত্তচাঞ্চল্য দ্বারা স্থানচ্যুত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং চিত্তের স্থিরতাই শুক্ররক্ষার, আর শুক্ররক্ষাই জীবনরক্ষার হেতু।) অতএব যত্নপূর্বক শুক্রকে ও (তৎপ্রয়োজনে) মনকে স্থির করা কর্তব্য। বজ্রোলী-মুদ্রার অভ্যাসবিৎ যোগী মেঢ্রদ্বারা ঋতুমতী স্ত্রীর রজঃ এবং (স্বীয়) বিন্দুরূপ বীজ (এই উভয়েই) ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণপূর্বক স্বদেহে ধারণ করিয়া রক্ষা করিবেন।[৪৮২]

৪৮১। বসুমতী সং—পৃঃ ৮৮-৮৯

৪৮২। বসুমতী সং—পৃঃ ৯৮-১০২

পঞ্চানন দাসের পুঁথিতে বাউলদের মিলন-ক্রিয়া সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তাহা বিশেষভাবে যোগশাস্ত্রের পন্থানুযায়ী :

"নায়ক নায়িকা জবে করিবে সাধন।
সাধনের পূর্ব্বে কুম্ভকের প্রয়োজন ॥
কুম্ভক বিনা ক্রিয়া সফল না হয়।
অবশ্য কুম্ভক পূর্বে করিবে নিশ্চয় ॥
চন্দ্রনাড়ী যোগে বায়ু আসি যবে বহে।
সেই সে সাধন কাল অন্য কাল নহে ॥
সূর্য্যনাড়ী দ্বারা বায়ু হলে প্রবাহিত।
যোষা সহ সাধনেতে হইবে রহিত ॥
পৃথ্বীতত্ত্ব উদয়েতে করিবে স্তম্ভন।
অন্যতত্ত্বে হলে তাহা হইবে খণ্ডন ॥
দ্বাদশ-অঙ্গুলি বায়ু যে সময়ে বহে।
পৃথ্বীতত্ত্ব উদয়ের সেই কাল কহে ॥
কিন্তু এ সকল তত্ত্ব আনে না কহিবে।
অতি যতনে তাহা গোপন রাখিবে ॥
প্রথম অভ্যাস কালে সাধক যে জন।
গৃহ হতে রজকে করিবে আকর্ষণ ॥
অপান বায়ুকে তথা করি আকুঞ্চিত।
লিঙ্গনালে শোষণ করিবে সুনিশ্চিত ॥
দৈবাধীন বিন্দু যদি প্রচলিত হয়।
ইড়া নাড়ী যোগে উৰ্দ্ধে লইবে নিশ্চয় ॥
ক্ষণকাল স্থিরভাবে রহিবে তখন।
হুঙ্কার ছাড়ি পুনঃ করিবে চালন ॥
রেতবিসর্গক বায়ু অপান জানিয়া।
স্থির করিবেক তারে নয়নে আনিয়া ॥
সাধন সন্ধান সত্য এই জানিবে।
দণ্ডে দণ্ডে চাপি নেত্রে উৰ্দ্ধেতে লইবে ॥
নিগুড় এ সব তত্ত্ব মিথ্যা কভু নয়।
সংহিতা প্রমাণ দেখ থাকিলে সংশয় ॥" (পৃষ্ঠা—১৫)

নবুক প্রণতা।

প্রতিমা রূপীরি দেখি শরাসনে বসিবে। পূর্ব্বদিকে পশ্চীমাস্য স্থির নেত্র খাটিবে।।
ভক্তি ভাবে নিম্ন তলে সাধক ধরা মনে। দেখি আস্যে উর্দ্ধ দৃষ্টে থাকি স্থির নয়নে।।
মদন মাদনে উভয়ে দৃষ্ট আকর্ষন। নয়নে নয়নে শৃঙ্গার দেহ অনুক্ষন।।
মনে মনে মহাকাম দৃষ্ট ও দীপন। শিব বান বনবান ব্রাহ্মে সর্ব্বক্ষন।।
শিব বান ব্রহ্ম বান করি সংমিলন। শাক্তির সত্ত্বা শুদ্ধা সদা কর আকর্ষন।।
স্থির বান স্থির তন শুন ওহে মন। স্থির ভাবে স্থির চিত্তে করিবে ভজন।।
অজ্ঞদল জানিতে তাহে সহজ নয়। দৃষ্টান্ত দেখাইয়া করি যে বিবরন।।
অর্জ্জুনের লক্ষ ভেদ দৃষ্টান্ত করন অর্জ্জুনের অবি দৃষ্টি শুন ওহে মন।
তুনো পারি বানরাশি করে নিক্ষেপন। মৎস্য চক্ষু ভেদ করি আনন্দীত মন।।
গুরু ভক্তি নিষ্ঠাবল যে অর্জ্জুনের হয়। এ কারনে চক্ষু ভেদ অনায়াসে করয়।
এহে নিষ্ঠাবল হইলে সাধিবে সকল। বিপরীত ভাবে ভেদ করে অজ্ঞদল।।

পঞ্চানন দাসের কড়চার একাংশ [এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৮২২-২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

ইহার পরবর্তী সময় উভয় শক্তির স্তম্ভিত সাম্যে এক স্থির নিরবচ্ছিন্ন মদনানন্দের উদ্ভব হইবে। এই অনুভূতিকে ক্রমে ঊর্ধ্বদিকে যত উঠান যাইবে, ততই সাধক দেহ-মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধি করিবে।

এখন তিনদিনের ক্রিয়ার শেষে 'সহজ মানুষ'-এর আগমন হয় বলিয়া বাউলরা অনুভব করিয়াছে। সহজ মানুষের স্বরূপ কি? প্রকৃতি-পুরুষের বা রজো-বীজের মিলনাত্মক যে নিবিড় আনন্দময় অবস্থা, তাহাই তাঁহার স্বরূপ। নিরন্তর শৃঙ্গার-লীলাশীল তিনি—সে শৃঙ্গার একান্ত প্রেম-শৃঙ্গার। তিনদিনের রেচক-পূরক-কুম্ভক-ক্রিয়ায় নাড়ীমণ্ডলী পরিষ্কৃত হয়, বায়ুর সাম্যাবস্থা আসে এবং সুষুম্নার পথ অনেকটা সরল হয়, রজো-বীজ 'পাক' পাইয়া স্থৈর্য লাভ করে। এই সময়ের যে মিলন, তাহা অচঞ্চল, নিবিড় প্রেমানুভূতির মিলন। ইহাই সহজ মানুষের স্বরূপানুভূতির মিলন। এই প্রেম-মিলনের আনন্দাভূতিকে তাহারা 'সহজ মানুষ' বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। এই চরম আনন্দাভূতির উদ্রেক হওয়া মাত্রই তাহা স্থায়ী করিবার জন্য কুম্ভক-সাহায্যে তাহাকে উর্ধ্বে লইয়া যাইতে হইবে। এই অনুভূতিই তাহাদের 'সহজ মানুষ'। তাঁহার আবির্ভাব সাধকই বুঝিতে পারে। তাই 'সহজমানুষ'কে ধরার জন্য তাহারা সতর্ক হইয়া অবস্থান করে। একটু বিলম্ব হইলে সহজ মানুষকে পাওয়া যাইবে না। তিনি তাঁহার নিত্যস্থান সহস্রারে আবার চলিয়া যাইবেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, রজের সঙ্গেই তাঁহার আবির্ভাব, আবার রজের শেষ বিন্দুর বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার তিরোধান। সহস্রারে তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বরকে বাউল চায় না, চায় নিরন্তর প্রেমলীলা-বিলাসময় 'মানুষ'কে। তাহাদের সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য তাহারা এইভাবে নির্দেশ করিয়াছে:

> "টলে জীব, অটলে ঈশ্বর,
> টলাটল ত্যজ্য ক'রে ভজে সেই রসিক শেখর।"

> "টলিলে জীব, অটলে ঈশ্বর।
> এর মাঝে ক্রীড়া করে রসিক নাগর॥"

'বিবর্তবিলাসের' ভাষায়—

> "টলিলে যে জীব হবে না টলে ঈশ্বর।
> এই দুই ছাড়ি সাধে রসিক শেখর॥"—চতুর্থ বিলাস।

সেইজন্য শৃঙ্গার-লীলাময়রূপে এই সময়ই বাউলরা তাঁহাকে চায়। প্রকৃতির দেহেই তাঁহার সহজ মানুষ রূপে আবির্ভাব। এই সহজ মানুষ এক অপ্রাকৃত দেহধারী

কেবলমাত্র অনুভূতিগম্য, নিবিড়, অচঞ্চল মিথুনানন্দ-স্বরূপ। সেইজন্য তিনি 'ভাবের মানুষ'। তাঁহাকে বাউলরা 'দমের মানুষ'ও বলিয়াছে, কারণ 'দম' বা কুম্ভকের দ্বারাই তিনি অনুভূতিগম্য। এই সহজ মানুষকে 'ধরিয়া' ক্রমাগত ঊর্ধ্বদিকে 'উল্টাকলে' বা 'উজান বাহিয়া' লইয়া আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলপদ্মে উপনীত করিতে পারিলেই প্রকৃতি-দেহের সহজ মানুষ অর্থাৎ গভীর আনন্দানুভূতির সহিত পুরুষ-দেহের অটল ঈশ্বরের মিলনে একটা চরম মিথুনানন্দের অনুভূতি-সৃষ্টি হইবে। উহাই পরমাত্মার লীলাময় স্বরূপ। এই আনন্দই সাধনার চরম কাম্য।

বাউলের পরমাত্মা শৃঙ্গার-রস-লীলাময়। তাঁহার প্রকৃত লীলার স্থান সহস্রারে—সহস্রদলপদ্মে নয়। সেখানে তাঁহার স্বরূপ অটল, নিস্তরঙ্গ, পুরুষসত্তা-প্রকৃতিসত্তার একান্ত মিলিত একীভূত ভাব। সেখানে ভোক্তা-ভোগ্য, আস্বাদ্য-আস্বাদক—কিছু ভেদ নাই, ইহাই বাউলের কল্পনা! তাঁহার প্রকৃত লীলার স্থান দ্বিদলপদ্মে—আজ্ঞাচক্রে। তাই বহু গানে দ্বিদলপদ্মে তাঁহার 'বারামখানা' বা প্রকাশ ও বিলাসের স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সহস্রদল তাঁহার নিত্যস্থান বটে, কিন্তু দ্বিদল লীলা-স্থান। তাই দ্বিদলের ঊর্ধ্বে বাউল উঠিতে চায় নাই। তাহার বীজ-রূপী পরমাত্মার 'টল' অবস্থা সর্বাগ্রে সে পরিহার করিবে, কারণ তাহা হইলে 'জীবাচার' হইল, 'প্রেমাচার' হইল না। উহাতে সৃষ্টি,—তাহার পতন। আবার নিস্তরঙ্গ অটলরূপও আনন্দ-চমৎকারিত্বহীন বলিয়া তাহার কাম্য নয়। যাহা নিরন্তর আনন্দ-লীলার অবস্থা, তাহাই তাহার কাম্য। একটি সদা-বিরাজমান মিথুনানন্দের অনুভূতির মধ্যে আবর্তন তাহার কাম্য। ইহাকে তাহারা 'সুটল' অবস্থা বলিয়াছে। এই 'সুটল' অবস্থাই তাহাদের বাঞ্ছনীয়। ইহাই বাউলদের সহস্রদল ও দ্বিদল, 'টল' ও 'অটল' সম্বন্ধে ধারণা।

মিলন-ক্রিয়ার প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই ক্রিয়ায় দেহ-সংস্থানের প্রকার-ভেদ আছে। অনেক বাউল-সাধক বিপরীতবিহার-পদ্ধতিকে, বিশেষভাবে শেষদিনের ক্রিয়ায়, শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলেন। এই 'যোগ'-এর মিলন-ক্রিয়া ছাড়া সতর দিনের মধ্যেও অনেকে মিলন-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে। সেই-সব দিনের ক্রিয়ায় এক শ্রেণীর সাধক বিপরীত বিহার-পদ্ধতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। এই পদ্ধতির একটি বর্ণনা ও অবস্থানের রেখা-নির্দেশ পঞ্চানন দাসের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে :

> "প্রতিমারূপীনি দেবি শরাসনে বসিবে।
> পূর্ব্বদিকে পশ্চীমাস্থে স্থির নেত্রে থাকিবে ॥

ভক্তিভাবে নিম্নতলে সাধক ধরাসনে।
দেখি আস্তে উর্দ্ধদৃষ্টে থাকি স্থির নয়নে ॥
মদন মাদনে উভয়ে কর আকর্ষণ।
নয়নে নয়নে শৃঙ্গার করে অনুক্ষন ॥
মনে মনে মহাকাম কর উদ্দীপন।
শিববান বলবান রাখে সর্ব্বক্ষণ ॥
শিববান ব্রহ্ম নাল করি সংমিলন।
শক্তির সত্ত্বা শুধা সদা কর আকর্ষণ ॥
স্থির বান স্থির গুণ শুন ওহে মন।
স্থির ভাবে স্থির চিত্তে করিবে ভজন ॥
অষ্টদল ভজিতে ভাই সহজ রণ।
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কহি যে বিবরণ ॥
অর্জ্জুনের লক্ষভেদ দৃষ্টান্ত কারণ।
অর্জ্জুনের অধদৃষ্টী শুন ওহে মন ॥
গুণোপরি বান রাখি করে নিক্ষেপন।
মৎস্য চক্র ভেদ করি আনন্দীত মন ॥
গুরুভক্তি নিষ্ঠাবল যে অর্জ্জুনের হয়।
এ কারণে চক্র ভেদ অনায়াসে করয় ॥
ঐছে নিষ্ঠাবল হইলে সাধিবে সকল।
বিপরীত ভাবে ভেদ কর অষ্টদল ॥
অর্জ্জুনের অধোদৃষ্টী উর্দ্ধে নিরীক্ষণ।
অর্জ্জুন করে গুনোপরি বান নিক্ষেপণ ॥
এ সাধনে গুণ নিম্নে যুড়ি স্থির বান।
যুতে যুতে মিলাইয়া কর আকর্ষন ॥" (পৃঃ ২২)

'বিবর্তবিলাস'-গ্রন্থেও এইরূপ বাণ-সাধনার প্রসঙ্গে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ পদ্ধতির উল্লেখ আছে :

"অধো দৃষ্টি করি তেঁই মৎস্য কৈল ছেদ।
উলটা জানিবে তৈছে সাধনের ভেদ ॥
এমত জানিবে মন বাণের ভজন।
তাহাতে লইঞা পঞ্চবাণের কারণ ॥

সাধনে সমর্থ হইলে রিপু পরাভব।
দিনে দিনে রসোল্লাস পাবে অনুভব ॥" তৃতীয় বিলাস

॥ চারিচন্দ্রভেদ ॥

এখন সাধনাঙ্গে 'চারিচন্দ্র-ভেদ' কিরূপ দেখা যাক। পূর্বে বলিয়াছি যে, রজঃ, শুক্র, বিষ্ঠা ও মূত্র—ইহাই চারিচন্দ্র। বাউলদের ভাষায় রজঃকে 'রূপ' বলে, শুক্রকে অনেক সময় 'রস', বিষ্ঠাকে 'মাটি' এবং মূত্রকে 'রস' বলে। 'রতি' অর্থে 'স্ত্রী-বীর্য' বলিয়া বুঝে, কখনো বা রজঃকে বুঝে, কখনো বা ক্রিয়ার সময় উভয়ের মিলিতবস্তুকে বুঝিয়া থাকে। ইহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিষ্ঠা, মূত্র, রজঃ ও শুক্র—সাধক-সাধিকার দেহ-নিঃসৃত এই চারিটি বস্তুর গ্রহণকে 'চারিচন্দ্র-ভেদ' বলা হয়।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতই সৃষ্টির মূল উপাদান বলিয়া কথিত। ইহারা দেহের বাহিরে এবং ভিতরে স্থির হইয়া আছে—এইরূপ তন্ত্রাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে:

ক্ষিতিশ্চ বারি তেজশ্চ বায়ুরাকাশমেক চ।
স্থৈর্যং গতা ইমে পঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তর এব চ ॥"

—শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, ১ম উচ্ছাস

বাউলরা বিষ্ঠাকে ক্ষিতি, মূত্রকে অপ, তেজঃকে রজঃ এবং মরুতকে শুক্রের প্রতীক বলিয়া মনে করে। লালন শাহী ও পাঞ্জ শাহী ফকির-সম্প্রদায়ে ইহারা যথাক্রমে 'রামাত'; 'নিমাত', 'অনুমাত' ও 'নিজ'-নামেও পারিভাষিকভাবে অভিহিত হয়। দেহের এই চারিটি উপাদান দেহের মধ্যে গ্রহণে দেহের একটা পরিবর্তন সাধিত হয় বলিয়া ইহাদের ধারণা। আমি বহু সাধককে ইহার কার্যকারিতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি। একজনের অভিমত এইরূপ:—"ইহাদের সম্মিলনে মানবের শক্তি, শান্তি, আনন্দ এবং এক কথায় অস্তিত্ব। ইহাদের অধোগমনে মানুষ অস্তিত্বহারা হইতেছে। এখন রসায়নবিদ্ আলকাতরার ভিতর হইতে মূল্যবান স্যাকারিন ও চারিটি উজ্জ্বল রং বাহির করিতেছেন, প্রকৃত রসিকেরও সেইরূপ লক্ষ্য। দেহের মধ্যে ইহারা Chemical action দ্বারা নূতন শক্তি সৃষ্টি করে।"* অধিকাংশ সাধকেরই মত এই যে, এই গ্রহণে সাধক-সাধিকার

* একজন বি,এ, পর্যন্ত পড়া এই মতাবলম্বী সাধকের লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

উভয়ের দেহই 'পরিপক্ক' হয় এবং একটা স্থির অচঞ্চল শক্তির সঞ্চার হয়। সাধকগণ বলে যে, দেহ 'ভাবযোগ্য' হইতেছে কিনা, অর্থাৎ ভাব-সাধনা বা প্রেমমূলক যোগ-মিলন-ক্রিয়ার উপযোগী হইতেছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করা হয়, এই-সব বস্তু-গ্রহণের স্বাদের দ্বারা। লবণ, কটু, তিক্ত, মধুর প্রভৃতি রসের আস্বাদ এবং দুর্গন্ধ কি সুগন্ধ পাওয়া যায় একই বস্তুতে বিভিন্ন সময়ে দেহ-শোধনের অগ্রগতির পরিমাপে। তাহারা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে নির্বিকার অবস্থায় এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে এবং বিশ্বাস করে—'ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়'। ইহাদের গ্রহণের সময় তাহারা মন্ত্রপাঠ করে। স্থান ভেদে ও গুরু ভেদে এই মন্ত্রের পার্থক্য আছে। এই মন্ত্রগুলিকে তাহারা 'বীজ'মন্ত্র বলে। পূর্বে নবদ্বীপের একটি সম্প্রদায়ের 'রক্তচন্দ্র'-সাধনের 'বীজ'-মন্ত্র উল্লেখ করিয়াছি। অন্যান্য সাধনের মন্ত্র এইরূপ :

মৃত্তিকা-সাধন (বিষ্ঠা) ঃ

"ওং ক্লিং শ্রীং মাং চাং অর্ধচন্দ্র অর্ধ সমুদ্রবাণ, চন্দ্রসূর্য কাঁচা হন, গরলচন্দ্র ওং, মহাপ্রভু, তোমার সুখে চলি, তুমি যা বলাও বলি, তুমি যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিল-অর্ধ নই।"

রস-সাধন (মূত্র) ঃ

"আলেখ চন্দ্র নিরঞ্জন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন জন, করো নিষ্ঠারতি—গোঁসাই তুমি সত্যি।"

শুক্রচন্দ্রসাধন (শুক্র) ঃ

ওঁং ক্লিং শ্লীং শুক্রচন্দ্রসাধন, শোষণবান, ক্লিং আমরী সামরী, যুগে যুগে না মরি, গোরক্ষনাথে চাপি, যে বয়সে খাই বীজ, সেই বয়েসে থাকি, শ্লীং স্বাহা।"

উভয় বঙ্গের সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যেই কম-বেশি এইরূপ ধরণের মন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। কতকটা সংস্কৃত-বাংলা-মিশ্রিত, কতকটা অর্থহীন শব্দের সমষ্টি। ইহার তাৎপর্য বা অর্থ সম্বন্ধেও তাহারা বিশেষ কিছু বলিতে পারে নাই। তবে এই ক্রিয়া দ্বারা যে তাহারা সাধন-জীবনে বিশেষ ফল পাইয়াছে এবং ইহা ব্যতীত তাহাদের যোগ-ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল—এ-কথা বার বার বলিয়াছে। যাঁহারা একটু শিক্ষিত, তত্ত্বজ্ঞ ও প্রবীণ সাধক, তাঁহারাও ইহার অসাধারণ দেহ-শোধ ন-

শক্তির কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের একটি মত সাধকের নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

ইহা যে বাউলদের যোগ-জীবনের সহায়ক, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে মন্ত্রের মধ্যে গোরক্ষনাথের উল্লেখে। দেহকে 'পরিপক্ব' করিবার বিষয়ে সিদ্ধমার্গের সঙ্গে বাউল-পন্থের একটা অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

এই চারিচন্দ্র-ভেদের অনুরূপ ক্রিয়া ভারতের আরো কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ ক্রিয়া সত্যই প্রচলিত আছে কি না—জানিনা, তবে দত্ত মহাশয়ের বর্ণনাটি নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"পণ্টুদাসী, আপাপন্থী, সংনামী···এই তিনঃ সম্প্রদায়ী উদাসীনেরা এমন একরূপ বীভৎস ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, যে তাহাতেই ইহাদের সমুদায় গুণ ও সমুদায় সাধনা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেটি বাউল সম্প্রদায়ের চারিচন্দ্রভেদের অনুরূপ। সেটি নিজ নিজ মল, মূত্র ও শুক্র মন্ত্রপূত করিয়া ভক্ষণ করা বই আর কিছুই নয়। তাহারই নাম গায়ত্রী ক্রিয়া। ইহারা সেই অতীব গুহ্য-ক্রিয়াকে পরম পুরুষার্থসাধন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহা গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি লিখিত হইতেছে।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
। মণি। রস	শুক্র	ঊর্ধ্ব	বাম চক্ষু
অজর	মল	লঙ্কা	মুখ
রামরস	মূত্র	দশানন	দন্ত
চন্দ্র	নাসিকার বামরন্ধ্র	গোইন্দ্রিয়	লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বারের মধ্যস্থল
সূর্য	নাসিকার দক্ষিণরন্ধ্র		
অর্ধ	দক্ষিণ চক্ষু	দশমদ্বার	লিঙ্গের যে দ্বার দিয়া শুক্র নির্গত হয়

"উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ী ফকির অর্থাৎ উদাসীনরা এই গায়ত্রীক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। আপনার মলমূত্র ও শুক্র ভক্ষণ করিয়া থাকে।···

"গায়ত্রী ক্রিয়া তিন প্রকার। বীজমন্ত্র, অমর মন্ত্র ও অজর মন্ত্র। শুক্র সংক্রান্ত ক্রিয়ার নাম বীজমন্ত্র, রামরস অর্থাৎ মূত্রসাধনার নাম অমর মন্ত্র এবং অজর অর্থা

মলসংক্রান্ত ক্রিয়ার নাম অজর বা গুরুমন্ত্র। মল যমুনা-স্বরূপ, মূত্র গঙ্গা-স্বরূপ ও শুক্র সরস্বতী-স্বরূপ। এই তিনের সমবেত নাম ত্রিবেণী। ইহার অন্য একটি নাম ত্রিকুটি। এই তিন সম্প্রদায়ের মতে, এই ত্রিবেণীই প্রকৃত ত্রিবেণী, পুরাণোক্ত ত্রিবেণী তাদৃশ মহিমান্বিত নয়। মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে এই তিন পরম সামগ্রী ভক্ষণ করিলেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সাধনা করা হয়। ইহাকেই ত্রিবেণী-সাধন বলে। এই সাধনেরই অন্য একটি নাম ত্রি-গায়ত্রী ক্রিয়া। যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয়, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

যমুনা-পানের মন্ত্র

"অজরি বজরি ধরতহুঁ ধরতি লেও সংভার
ওঁই নাম স্মরণ করুঁ সোঁহুঁ নাম লৌলায়
কহে কবীর ধরমদাস সে কাল দাগ মিট জায়।
দয়া সদ্‌গুরুকী ॥

গঙ্গা-পানের মন্ত্র

"অমরিত আয়া অমর লোকসে জগমা রহা সমায়ি।
অমরি মূরত অমরি কন্দ অমরি তু রং পাঁচ
তত্বকা ফন্দ। কহে কবীর জো অমরি খায়
জরা মরণ ত্যজ অমর লোক কী জায়।
দয়া সদ্‌গুরুজী ॥

শুক্রপানের মন্ত্র

"অজর অজয়িন্ অজমন্ অজর অমর গুরু গম্ভীর
পঞ্চনাম পর মুক্তামন নাম কবীর।
দয়া সদ্‌গুরুকী।

"গায়ত্রী ক্রিয়া অনুষ্ঠানকারী সাধকেরা শুক্র হস্তে ধারণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অগ্রে উহা দ্বারা ললাটে উর্ধ্বপুণ্ড্র করে, পরে অঞ্জন করিয়া দুই চক্ষে লেপন করে, তদনন্তর ভক্ষণ করিয়া থাকে। সৎনামী ফকিরেরা প্রতিদিনই ত্রিকালে গায়ত্রী ক্রিয়া করে। মল-সংক্রান্ত গায়ত্রী একবার, মূত্র-সংক্রান্ত গায়ত্রী তিনবার আর, প্রতি মাসে একবার শুক্র-সংক্রান্ত গায়ত্রী-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সৎনামী প্রভৃতিরা বলে কবীরপন্থী ও দাদূপন্থীদের মধ্যেও গায়ত্রী-ক্রিয়া প্রচলিত আছে। উল্লিখিত মন্ত্রগুলির মধ্যেও কবীরের ধ্বনি রহিয়াছে

দৃষ্ট হইতেছে। শুনিলাম, সৎনামীদের ন্যায় কবীরপন্থীরাও উল্লিখিত তিনপ্রকার গায়ত্রী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। আপাপন্থী, পল্টুদাসী ও দাদুপন্থীরা কেবল শুক্রসাধন করে।"[৪৮৩]

দত্ত মহাশয় তাঁহার ঐ গ্রন্থে 'বীজমার্গী' বলিয়া এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, ঐ সম্প্রদায় শুক্রকে বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে পূজা করিয়া পান করে। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:

"'বীজমার্গী'রা শুক্রকেই পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। কেননা শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। শুক্রের নাম বীজ এই নিমিত্ত ইহাদের নাম বীজমার্গী। ইহাদের ভজন-সভার নাম সমাজ ও ভজনালয়ের নাম সমাজ-গৃহ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঐ স্থানে ভজনা হইয়া থাকে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বিরচিত ভজন সমুদায় গান করাই ইহাদের ভজনার প্রধান অঙ্গ।

"শৈব-শাক্তাদির ন্যায় ইহাদেরও একরূপ চক্র হয় ও তাহাতে অতীব গুহ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষীয় চতুর্দশীতে ঐ চক্রের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন বীজমার্গী নিজ বাটীর স্ত্রীলোক বিশেষকে কোনো সাধুর অর্থাৎ উদাসীন বিশেষের সহিত সহবাস করাইয়া তাহা হইতে শুক্র নির্গত করাইয়া লয়। এই বীজ এক শিশিতে পুরিয়া রাখে ও চক্রের দিবস ঐ শুক্র সমাজগৃহে আনয়নপূর্বক একটি বেদীর উপর পুষ্পশয্যার মধ্যস্থানে একটি পাত্রে স্থাপন করে এবং তাহাতে দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, দধি মিশ্রিত করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করে। সেই পঞ্চামৃত ঐ পাত্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প ও মিষ্টান্ন দিয়া ভোগ দিয়া সমাজস্থ সকলকে পরিবেশন করিয়া দেয়। ইহারা চক্রস্থলে জাতি বিচার অবলম্বন করে না। সকলের অন্ন সকলেই ভক্ষণ করে।

"গির্ণার অঞ্চলে কাটিবার দেশে ইহাদের বসতি আছে। ইহারা আপনাদের মত-প্রণালীকে 'বিসা-মারগ' বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা মহন্ত গৃহস্থ। শুনিতে পাই, পরমার্থ-সাধনার উদ্দেশ্যে এক বীজমার্গী অন্য বীজমার্গীর ভার্যার সহিত সহবাস করে। কাহার বিবাহ হইলে তাহার ভার্যাকে মহন্তের সহিত তিন দিবস একত্র অবস্থিতি করিতে হয়। মহন্ত সেই স্ত্রীলোককে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়া তাহার সহিত সম্ভোগ করেন।

"ইহারা ব্যভিচারী বলিয়া সর্ব্বাংশে যথেচ্ছাচারী নয়। ইহারা সদাচারী

৪৮৩। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম খণ্ড—পৃঃ ২৬৬-২৭০

বৈষ্ণবের মত গলদেশে তুলসী মালা ধারণ করে ও মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করে না।"

শুক্র উপনিষদে আত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে 'বোধিচিত্ত' বা স্বয়ং 'বুদ্ধ' বা পরমসত্তা-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, বাউলরা ইহাকে বীজ-রূপী পরমাত্মা বলিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সাধন-ক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে পান করা কেবল বাউলদের মধ্যেই দেখা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রের যে অংশটুকু আমাদের হাতে আসিয়াছে, সেই কিছু-মুদ্রিত গ্রন্থ কিছু-হস্তলিখিত পুঁথিতে এই প্রকার পানের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এখন নেপাল, তিব্বত, ভোটান প্রভৃতি দেশে এই বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ সাধন-জীবনে এইরূপ ক্রিয়া করে কিনা এবং তাহাদের বর্তমানের সাধনার রূপ কি, তাহা কোনো অনিসন্ধিৎসু লেখক বা গবেষক আমাদের দেন নাই। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমাদের যত কিছু আলোচনা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, তাহা কেবল কয়েকখানি মুদ্রিত পুস্তক ও কতকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বন করিয়া। সুতরাং বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণ যে এইরূপ কিছু করেন না, তাহা একেবারে নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এই ক্রিয়াগুলি সাধকেরা কিছুতেই প্রকাশ করে না, ইহা অতি গুহ্য ব্যাপার। সুতরাং লিখিত কোনো গ্রন্থে ইহার উল্লেখ না থাকাই সম্ভব। বাউলদের সাধনায় এই ক্রিয়া অপরিহার্য, তবুও তাহারা কদাচিৎ দুই-একটি গানে সংকেত দিয়াছে। তাহাও রজো-বীজ-গ্রহণ সম্বন্ধে, অন্য দুইটি বস্তুর কোনো উল্লেখই নাই। এই অর্ধ সহস্রাধিক গানের মধ্যে একটি গানে ইহার প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে :

"চারচন্দ্রের নিরূপণ, জান গা মন তার বিবরণ,
জানলে পরে জীবদেহেতে ঘুচে যেত কুমতি ॥"

(গান নং ২৯৯)

আর লালনের একটি গানে 'চন্দ্রগ্রহণ'-উল্লেখের দ্ব্যর্থভাষণে ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। (গান নং ১২৬)

বাউলরা এই ক্রিয়াগুলি করে সাধারণতঃ পক্ষান্তে বা পনরদিন পর পর। কারণ-প্রবর্তনের সময় একটি কি দুইটি বস্তু—রজঃ বা রজো-বীজ মিলিত অবস্থায় পান করা হয়। যাহারা মিলিত বস্তু পান করে না, তাহারা কেবল রজঃই পান করে, তাহার পর পনরদিন পরে 'মাটি' ও 'রস' পান করে। যাহারা এই মিলিত বস্তু পান করে না, তাহারা তিনমাস বা ছয়মাস বা এক বৎসর অন্তর সাধিকার জিহ্বা দ্বারা মোক্ষিত বীজ পান করে। সমস্ত পান সাধক ও সাধিকা উভয়েই করে।

এখন সাধন-বিষয়ক গানগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক।

পূর্বে বলিয়াছি যে, কুম্ভক বাউলের যোগ-মিলনের মূল ভিত্তি। সেই কুম্ভকের বা 'দম'-এর দ্বারাই যে সহজ মানুষ লভ্য হন, সে সম্বন্ধে একজন বাউল গাহিয়াছেন :

"দম লাগাও দমের ঘরে।
মানুষ সরে যাবে তোমার দমেতে পাক খেলে পরে॥
বেদম না হ'লে পরে সহজ মানুষ মেলে না।...
দম-মাদারকে ডেকে এনে দমেতে, মন, কর ভর,
দমের আগে মানুষ জাগে, চলে সে হাওয়ার উপর,
আট কুঠুরি বন্ধ ক'রে উজন তোল তারে॥
* * * *
অধর চাঁদকে ধরবি যদি দম ক'ষে দম সাধন কর।"

এই যে 'রূপ-সাগর' ইহাকে এক সাধক 'ভব-সিন্ধু'র সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। লালনের ভাষায় ইহাই 'আবহায়াত-নদী' বা জীবন-নদী। এই সমুদ্রে সেতু-বন্ধন না করিলে রাবণ বধ হইবে না এবং সীতাকেও লাভ করা যাইবে না। এই সমুদ্রে তো অতি ভয়ংকর প্রাণী সব বাস করিতেছে, তাহাদের হাত এড়াইয়া কৌশলে সেতুর উপর দিকে লক্ষ্যে পৌছিতে হইবে। কিভাবে এই সেতু-বন্ধন হইবে? গান-রচয়িতা বলিতেছেন :

"ভব-সিন্ধু সেতু-বন্ধ ক'রে হও রে পার।
* * * *
রেচক, পুরক, স্তম্ভন দিয়ে নদী কর বন্ধন,
প্রেম-ভক্তি খুঁটি তার কর স্থাপন,
এবার হেলে দুলে যাবে চলে কি করবে তুফানে তোর।
সে নদী অত্যন্ত গভীর,
আছে কাম-রূপী কুম্ভীর,
বাঁধিলে সাঁকো সে হবে ভেক
গুপ্ত হবে নীর।"

এই সাঁকো পার হইতে হইবে সুকৌশলে "যেমন শূন্যাকারে বেদে বাজি করে রজ্জুর উপর।"

গোপালচাঁদ দরবেশ বলিতেছেন যে, চণ্ডীদাস-রজকিনী দমের সাহায্যেই

নিত্যবৃন্দাবন লাভ করিয়াছিল এবং দ্বিদলপদ্মে মানুষকে সাক্ষাৎ করিয়াছিল। কুম্ভকের দ্বারাই 'মানুষ'-এর অস্তিত্ব জানা যায় :

"চণ্ডীদাস-রজকিনী
যুগল-প্রেম তারি শুনি,
আত্মায় আত্মা মিশিয়ে ধনি,
দুই আত্মায় এক আত্মা হয়।
তারা দমের ঘরে বসত ক'রে
নিত্য বৃন্দাবনে যায় ॥

* * * *

মানুষ দমের ঘরে আসন করে,
নয়ন কোণে ঝলক দেয়।

* * * *

মানুষ দ্বিদলপদ্মে কথা কয় ॥" (গান নং ৪১২)

এইভাবে সাধক প্রকৃতি-পুরুষের দুই আত্মায় এক আত্মা হইয়া দমের সাহায্যে দ্বিদলপদ্মে 'মানুষ'-এর সাক্ষাৎ পায়।

পদ্মলোচন একটি গানে বাউলের যোগ-সাধনার মূল কথাটি বলিয়াছেন, 'মনের মানুষ' দ্বিদলে বিরাজ করেন, তারপর ষোড়শদল বা বিশুদ্ধচক্রে নামিয়া আসেন, তারপর দশমদল বা মণিপুরচক্রে নামিয়া আসেন। তাহার পর একেবারে 'কুলকুণ্ডলিনী' 'যোগেশ্বরী'কে লইয়া নর্মদা নদীর কূলে দোলায় দোলায়িত হইয়া শুভযোগের সময় মূলাধারে স্থিত হন। এখন এই লীলাময় সহজ মানুষকে 'উজান' বা উর্ধ্বে লইতে হইবে। কি ভাবে? অলক্ষ্য বায়ু বা দমের শক্তিতে। এই কুম্ভক-শক্তির দ্বারা মানুষকে পূর্বস্থানে লইয়া তাহার স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইবে :

"মনের মানুষ হয় রে যে জনা,
(ওসে) দ্বিদলে বিরাজ করে এই মায়েযে,—
তুমি সহজ মানুষ চিনলে না ॥

* * * *

আলেকদম চলছে কলে,
আলেকদম হাওয়াতে খেলে,
আলেকদম সত্য হ'লে
তবেই মানুষ মিলে।

তোর দশ দরজা বন্ধ হ'লে
তবেই মানুষ উজান চলে।
গোঁসাই হরি পোদোম বলে,
বুঝবে অনুরাগী জনা ॥" (গান নং ৪৫৪)

মনের মানুষের সন্ধান কি করিয়া করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে একজন বাউল বলিতেছেন :

"তুমি বাহিরে যারে তত্ত্ব কর,
অবিরত সে যে আজ্ঞাচক্রের উপরে ॥
কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি রয় মূলাধারে,
প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে ;
শক্তি চেতন হ'লে পূর্ণানন্দ মিলে,
তোমার সদানন্দ-স্বরূপ একবার দেখ না।
বামে ইড়া নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা,
রজঃ-তমঃ-গুণে করিতেছে খেলা,
মধ্যে বিরাজে সুষুম্না,
তারে ধর না কেন সাদরে ॥" (গান নং ৩৬৯)

ক্ষ্যাপা মদন বলিতেছেন যে, ত্রিবেণী-সঙ্গম পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ দুইদিকে বিষের ধারা, মধ্যের ধারাটি কেবল অমৃত। এই অমৃত-নদী সুষুম্নার পথে চলিতে হয় কেবল কুম্ভকের সাহায্যে। কুম্ভক-সাহায্যেই ত্রিবেণী পার হইতে হইবে :

"দুই দিকে দুই বিষের নদী,
বইছে ধারা নিরবধি,
মধ্যেতে অমৃত নদী,
চিনতে পার যদি,
ক্ষেপা মদনচাঁদে কয়,
তাতে ডুবতে পারলে হয়,
নইলে কেন মিছে প্রাণ হারাবি ॥" (গান নং ৩৪২

অন্য একসাধক বলিতেছেন যে, ষড়দলে যিনি আছেন, তাঁহাবে উল্টাকলে দ্বিদলে লইতে হইবে। দ্বিদলে উঠিলে 'কামব্রহ্ম'-মূর্তি ধরিয়া দর্শ দিবেন। (নং ৩২৩)

ফরিদপুরের চণ্ডী গোঁসাই বলিতেছেন যে, মূলাধার-স্থিত মাতৃশক্তি ও সহস্রার-স্থিত পিতৃশক্তি—রজঃ ও বীজ, যোগ-ক্রিয়া দ্বারা এই দুইশক্তির যুগল-মিলন করাইতে পারিলেই সাধকের আর জন্ম-মৃত্যু হইবে না :

"হরিকে ধরবি যদি শক্তি সহায় কর।
পরমব্রহ্ম সেই হরি,
মানুষের হৃদয়-বিহারী সেই অধর ॥
মূলাধারে জগৎ-মাতা
সহস্রারে জগৎ-পিতা,
দু'জনে করলে একতা
জন্ম-মৃত্যু হবে না আর।
তন্ত্রমন্ত্র জপে সবে,
তাইতে কি সেই যুগল হবে,
তা হ'লে যোগী-ঋষি
রেচক, পূরক, কুম্ভক কেন করে অনিবার ॥"

(গান নং ২০২)

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাউলরা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের স্থান সহস্রার বা সহস্রদল-পদ্মে নির্দেশ করিলেও তাঁহার লীলাময় স্বরূপ-প্রকাশের স্থান দ্বিদলপদ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে সহস্রদলকমলে তাঁহার নিত্যস্থান। সেখানে তিনি ঈশ্বর, সেখানে চন্দ্র-সূর্যের গতি নাই, নিরাকার জ্যোতির্ময় তাঁহার স্বরূপ, স্থির নিত্যপ্রেমময় তিনি। সেখানে তিনি 'সোঽহং'। এই ঈশ্বরই বাউলদের কল্পনা ও উপলব্ধিতে লীলাময় শৃঙ্গার-রসমূর্তি হইয়া দ্বিদলপদ্মে বিরাজ করেন এবং যোগেশ্বরীর মহাযোগে সহজ মানুষ-রূপে রংমহলে উপস্থিত হন।

পাঞ্জ শাহ্—যাঁহার অধিকাংশ গানে সাধন-বিষয়ের এবং সহজ মানুষের লীলা-খেলার বর্ণনা আছে—তিনি বলিতেছেন :

"মানুষ মিলে ভাগ্য-ফলে—

ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে আছে মূলাধার-মূলে।
নাহি দিবা, নাহি রাতি, মন, মানুষের মহলে ॥
চন্দ্র-সূর্য যেতে নারে সে দল-কমলে।

যোগেশ্বরীর মহাযোগে, মন, কলে রস খেলে।
সহজরূপে দিচ্ছে বারাম পবন-হিল্লোলে ॥
এসে মানুষ রংমহলে দরজা খোলে।" (গান নং ২৩৪)

আর একটি পদে তিনি বলিতেছেন যে, সহস্রারে অবস্থিত অটল মানুষের কিরণ দ্বিদলে আসে এবং সেখান হইতে যোগেশ্বরীর মহাযোগে কিরণ পাতালে উপনীত হয় :

"যারে আমি ডাকি দয়াল ব'লে,
আছে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড'পরে নিত্যকমলে ॥
আছে মানুষ অতি গোপনে
চন্দ্র-সূর্যের কিরণ নাই সেখানে,
ও সে অটলবিহারীর কিরণ আসে দ্বিদলে ॥

* * *

যোগেশ্বরীর মহাযোগে
সে রূপের কিরণ আসে পাতালে।" (গান নং ২৭২)

লালন একটি বিশিষ্ট পদে বলিতেছেন যে, দ্বিদলেই অচিন মানুষের অত্যুজ্জ্বল রূপের বিকাশ হয়। তাহার উপরে নিত্যগোলোক। সেখানে পূর্ণব্রহ্মের আবাস-স্থল। দ্বিদল-নির্ণয় হইলেই সব জানা যায়। দ্বিদলেই 'বিদ্যুৎ-আকৃতি'তে তাঁহার স্থিতি, ষড়দলে তিনি একবারমাত্র উপস্থিত হন :

"কিবা শোভা দ্বিদলের 'পরে।
একরাশ মণি-মাণিক্যের রূপ ঝলক মারে ॥
আলোক-সম্ভব সে নিত্য গোলোক,
তাহে বিরাজ করে পূর্ণব্রহ্মলোক,
হ'লে দ্বিদল-নির্ণয়
সব জানা যায়,
বাধা থাকে না সাধন-দ্বারে ॥" (গান নং ১৩৫)

হাউড়ে গোঁসাই একটি পদে যোগের সাহায্যে সুষুম্নার মধ্য দিয়া ত্রিগুণ-ধারিণী প্রকৃতি-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ঊর্ধ্বে দ্বিদলপদ্মে লইলে বিচিত্র রঙের রূপ-দর্শন

হইবে এবং চন্দ্রের সুধা ও পদ্মের মধু, 'মূল' ও 'ফুল' অর্থাৎ বীজ ও রজের মিলনের আনন্দধারা সাধক উপলব্ধি করিবে—এইরূপ বলিতেছেন :

"পূরকেতে বায়ু যার চলে, অধঃ-উর্ধ্ব গতিবিধি যায় দলে দলে,
ঐ যে হাওয়ার সনে গেলে পরে মূলে ফুলে মিশিবে ॥
মৃণাল হাওয়ার গতি, ত্রিগুণ-ধারিণী শক্তির যথায় বসতি,
তারে জাগালে যোগনিদ্রা সাধ্যধন বাধ্য হয়,

*　　　*　　　*

উর্ধ্বেতে হইবে গতি দ্বিদল 'পরে,

*　　　*　　　*

লাল, জরদ, সবুজ আর সাদা, রকম রকম দেখবি সে রং বলি সর্বদা।
ঐ যে চাঁদের সুধা, পদ্মের মধু সাধনে সাধু খাবে ॥" (গান নং ২৭৮)

এক বাউল বলিতেছেন যে, শ্বাসের ক্রিয়া না করিলে কৃষ্ণ-দর্শন হইবে না :

"দেখবি যদি চিকণ-কালা শ্বাসের মালা জপ না।
মন রে ভোলা, কাঠের মালা জপলে জালা যাবে না ॥
জীয়ন্তে মরবি যদি, শ্বাসের সঙ্গ ধর না।
আসা-যাওয়ার যে যন্ত্রণা. জেনে কি তা জান না ॥

*　　　*　　　*

ষট্‌চক্র-ভেদী যবে হবে পাবে তব ঠিকানা।
দেখবে আলোর ভিতর কালোমাণিক,
ঘুচবে ভবের যন্ত্রণা ॥" (গান নং ৪৩১)

এই সাধনায় কাম ও প্রেম, বিষ ও অমৃত, সাপ ও মণি যে একত্র বর্তমান এবং কৌশলে কামকে পরিত্যাগ করিয়া, বিষকে নাশ করিয়া, সাপকে মারিয়া, প্রেমকে, অমৃতকে ও মণিকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইরূপে ইহা যে কঠিন সাধন, বহু গানে বহু ভঙ্গীতে তাহা বলা হইয়াছে। গানগুলির মধ্যে একবার দৃষ্টি দিলে ইহা বুঝা যাইবে।

লালন বলিতেছেন যে, সুধা ও গরলকে, কাম ও প্রেমকে মথন-দণ্ডে বা যোগ-মিলন-ক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন করিয়া লইতে হইবে :

"অগ্নি যৈছে ভস্মে ঢাকা,
সুধা তৈছে গরল-মাখা ;
মথন-দণ্ডে যাবে দেখা
বিভিন্ন ক'রে ॥

বিষামৃতে আছে মিলন,
জানতে হয় তার কিরূপ সাধন ;
দেখো, যেন গরল ভক্ষণ
ক'রো না হায় রে ॥" (গান নং ১৪৯)

এক বাউল বলিতেছেন যে, ভাবের যথার্থ তাৎপর্য ও স্বরূপ না জানিয়া কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে প্রেমের নামে মিথ্যা প্রচার করিলে কপট সাধকের মৃত্যু হইবে। চন্দ্র থাকে দ্বিদলে আর পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় চতুর্দলে (বা চতুর্দল ও ষড়্দলে একত্রে দশমদলে), কিন্তু এই চন্দ্র-পদ্মের যে মিলন, তাহা কেবল যোগ-মিলনের উর্ধ্বক্রিয়া দ্বারা। এই ক্রিয়া দ্বারাই কাম হইতে প্রেম উত্থিত হইতেছে, দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইতেছে এবং ইহা দ্বারাই 'টল'কে, চঞ্চলকে, 'অটল' অর্থাৎ অচঞ্চল করিয়া এবং অটলকেও একটু টল করিয়া অর্থাৎ 'সুটল'-এ অবস্থিত হইয়া, সাধক দুই শক্তির মিলন-জনিত আনন্দ উপলব্ধি করে :

"ভাব না জেনে প্রেমে মজে, যেমন সাপে ছুঁচো ধরে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু,—মরতে গিয়ে মরে ॥
চন্দ্রে সুধা, পদ্মে মধু—বলো যুগল হয় কি ক'রে।
চন্দ্র থাকে গগন 'পরে পদ্ম সরোবরে ॥
মৌমাছিতে চাক বানায়ে রাখে মধু সংগ্রহ ক'রে।
চন্দ্রে পদ্মে হচ্ছে মিলন কেবল ভাবের দ্বারে ॥
কাম যেথা প্রেম সেথা, দেখ না নজর ক'রে।
দুধেতে হয় ঘি উৎপন্ন মথনের জোরে ॥
টলের ঘরে অটল মানুষ, দেখ না বিচার ক'রে।
অটলে টল, টলে অটল রমণদাস কয় ভবারে ॥" (গান নং ৪২৮)

হাউড়ে গোঁসাই একটি গানে 'রস-বৃন্দাবনে' কেমন করিয়া মিলনের দ্বারা কাম ও প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। এই ক্রিয়ায় কোনো কপটতা বা অসাধুতা চলিবে না, লোভী চোর নিশ্চয়ই শাস্তি পাইবে। এখানে কঠিন পরীক্ষা—'আগুন-পারার' মিলন চলিয়াছে :

"কেন পারবি যেতে
প্রেমের পথে
ক'রে বমাল চুরি।

রস-বৃন্দাবন,
সেথায় হচ্ছে ভজন,
লবে নীর বেছে ধন
নিক্তি ধরি' ॥
সে দেশে হয় মেয়ে রাজা,
রসিক যারা, তারাই প্রজা,
লোভী কামী চোরের হয় সাজা।
সেথায় চক্ররূপে আছে হংস,
কাম হ'তে প্রেম হচ্ছে অংশ
মেলে আনন্দ-হাপরে,
ফেলছে বস্তু যে রে,
আগুন-পারার দ্বারে
মিলন করি' ॥
* * *
যেথায় রূপে রূপে হচ্ছে রতি,
সম্বন্ধহীন প্রেম-পীরিতি—
প্রকাশ হৃদ্‌কমলে,
আনন্দ হিল্লোলে
খেলছে অধরতায়
বিন্দু গিরি ॥
বিলাস আর বিবর্তলীলা
আনন্দ-মদনের খেলা,…" (গান নং ৪৬২)

আর উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত গানগুলি একবার লক্ষ্য করিলে এই সাধনার স্বরূপ ও ইহার দুরূহতা হৃদয়ঙ্গম হইবে: গান নং ৮০, ৮৩, ১৪৩, ১৫৫, ১৫৭, ১৮৬, ২১২, ৩২০, ৩৩৯, ৩৯৩, ৪০৭, ৪০৮, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৮২ ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায়

তন্ত্র-সাধনা ও বাউল-সাধনা

তন্ত্র বলিতে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র—দুই প্রকারই বুঝা যায়। আমরা দুই তন্ত্রেরই নির্দিষ্ট সাধনা আলোচনা করিব এবং উহাদের সহিত বাউল-সাধনার সাদৃশ্য বা প্রভেদ লক্ষ্য করিব।

প্রথমে হিন্দুতন্ত্র-সাধনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাক।

হিন্দুতন্ত্র-সাধনা

বহু বাউল-গানে আমরা 'দল'-এর উল্লেখ দেখিয়াছি। হিন্দুতন্ত্রের চক্র ও পদ্মের কল্পনা বাউল-সাধনার একটা প্রভাবশালী অংশ। সুতরাং চক্র ও পদ্ম সম্বন্ধে একটা পূর্ণ ধারণা প্রয়োজন।

হিন্দুতন্ত্রানুসারে চক্র ও পদ্মের অবস্থিতি ও স্বরূপ এইরূপ :

॥ মূলাধার-চক্র ॥

এই চক্র গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। এই চক্রে মূলাধার-পদ্ম বিদ্যমান। সুষুম্না-নাড়ীর মুখ-দেশের সহিত এই পদ্ম সংলগ্ন। এই পদ্ম রক্তবর্ণ, চতুর্দল-যুক্ত ও অধোমুখে প্রস্ফুটিত। এই চারিটি দলে অনুস্বার-বিশিষ্ট 'ব' 'শ', 'ষ', 'স' এই চারিটি স্বর্ণ-বর্ণাভ অক্ষর যথাক্রমে দক্ষিণাবর্তে সন্নিবিষ্ট আছে।

মূলাধার-পদ্মের মধ্যভাগে সমুজ্জল চতুষ্কোণ ধরাচক্র বিদ্যমান; তাহার চারিদিকে আটটি শূল-বেষ্টিত একটি মণ্ডল শোভা পাইতেছে; এই ধরা-চতুষ্কোণের মধ্যস্থলে পীতবর্ণ এবং বিদ্যুতের মত কোমলাঙ্গ ধরা-বীজ 'লং' বিরাজমান। এই ধরা-বীজ বা পৃথ্বী-বীজ চতুর্হস্ত, অলংকার-শোভিত ও ঐরাবতারূঢ়; ঐ বীজের অভ্যন্তরে বিন্দু-স্থানে নবীনসূর্যবৎ রক্তবর্ণ শিশু-ব্রহ্মা উপবিষ্ট। তাঁহার চারি মুখে চারিবেদ এবং চারিহস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষমালা ও অভয়মুদ্রা।

এই ধরা-চক্রে রক্তচক্ষু, সূর্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জশালিনী ডাকিনী শক্তি বাস করেন। তিনি তাঁহার চারিহস্তে শূল, খট্‌্বাঙ্গ, খড়্গ ও চষক (পানপাত্র) ধারণ করিয়া আছেন।

এই মূলাধার-পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে সুষুম্নার মধ্যস্থিত বজ্র-নাড়ীর মুখ-স্থানে 'ত্রৈপুর'-নামক একটি ত্রিকোণ যন্ত্র শোভা পাইতেছে। উহা বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিশালী, কোমল ও বিলাস-স্থল। এই যন্ত্রের মধ্যে বন্ধুকপুষ্প-তুল্য রক্তবর্ণ কন্দর্প-বায়ু ও কাম-বীজ বিরাজিত। এই ত্রিকোণাভ্যন্তরে নবপল্লব-বর্ণ, গলিতস্বর্ণবৎ কোমল, বিদ্যুৎ ও পূর্ণচন্দ্রবৎ সমুজ্জ্বলকান্তি-বিশিষ্ট, নদীর আবর্তের মতো বৃত্তাকার, লিঙ্গ-রূপী স্বয়ম্ভু অধোমুখে বিদ্যমান আছেন। ঐ স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের উর্ধ্বদেশে মৃণাল-তন্তুর ন্যায় অতিসূক্ষ্ম, জগন্মোহিনী কুণ্ডলিনী স্বীয় বদন ব্যাদান করিয়া ব্রহ্মনাড়ীর মুখদেশ আচ্ছাদন করত ব্রহ্মনাড়ী-বিগলিত সুধা-ধারা পান করিতেছেন। তিনি সর্পের ন্যায় সার্ধত্রিতয়-বেষ্টনে পরিবেষ্টন করিয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গের শিরোপরি প্রসুপ্তা রহিয়াছেন। তিনি মূলাধার-কমলে থাকিয়া শ্বাসোচ্ছ্বাস-বিবর্তন দ্বারা জগতের প্রাণিবর্গকে রক্ষা করিতেছেন।

॥ স্বাধিষ্ঠানচক্র ॥

জননেন্দ্রিয়ের মূলে সুষুম্নার মধ্যস্থ চিত্রিণী নাড়ীতে সিন্দূরের ন্যায় লোহিতবর্ণ, মনোহর, বিদ্যুদ্বৎসমুজ্জ্বল, ষড়্‌দলবিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠানপদ্ম বিরাজিত। ঐ ছয়টি দলে বিন্দু-বিশিষ্ট (অনুস্বারযুক্ত) 'ব', 'ভ', 'ম', 'য', 'র', 'ল' যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে।

এই স্বাধিষ্ঠান-পদ্মের মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকার, শ্বেতবর্ণ বরুণচক্র বা বরুণের মণ্ডল শোভা পাইতেছে। সেই মণ্ডলের মধ্যে শরৎ-চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, মকরবাহন বরুণ-বীজ 'বং' বিদ্যমান।

এই বরুণ-বীজের ক্রোড়-দেশে, নীলবর্ণ, পীতাম্বর, নবযুবা, মনোহরশ্রী-সম্পন্ন, শ্রীবৎসকৌস্তভ-ভূষিত, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ নারায়ণ গরুড়োপরি উপবিষ্ট।

এই বরুণ-চক্রে নীলেন্দীবর-সদৃশ কান্তিযুক্তা, চারিহস্তে শূল-পদ্ম-ডমরু-টঙ্ক-ধারিণী দিব্যবস্ত্রালঙ্কার-শোভিতা, ত্রিনেত্রা, ভীষণদংষ্ট্রা, রক্তধারা-বিগলিতনাসা, উন্মত্তচিত্তা রাকিণী শক্তি বিরাজ করেন।

॥ মণিপুরচক্র ॥

স্বাধিষ্ঠানচক্রের উর্ধ্বদেশে নাভি-মূলে, দশদল-বিশিষ্ট, গাঢ়মেঘ-তুল্য নীলবর্ণ মণিপুরপদ্ম বিরাজ করিতেছে। ঐ পদ্মের দশটি দলে অনুস্বার-বিশিষ্ট 'ড', 'ঢ', 'ণ', 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ', 'ন', 'প' 'ফ'—এই দশটি বর্ণ যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে।

ঐ পদ্মের অভ্যন্তরে রক্তবর্ণ, প্রভাত-কালীন সূর্যবৎ দীপ্তিশালী, ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল বিরাজিত। এই ত্রিকোণ-মণ্ডলের বহির্ভাগে তিনটি বাহুতে স্বস্তিক-চিহ্ন শোভমান আছে। এই ত্রিকোণ-মধ্যে অগ্নি-বীজ 'রং' বিদ্যমান।

ঐ অগ্নি-বীজ মেষাধিরূঢ়, নবীনতপন-তুল্য, বজ্রশক্তিবরাভয়ধর ও চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট। ঐ বীজের ক্রোড়দেশে বিশুদ্ধসিন্দুরবৎ, ভস্মলিপ্তদেহ, বৃদ্ধরূপী, বৃষারূঢ় ত্রিনয়ন, রুদ্রমূর্তি মহাকাল বিরাজ করিতেছেন। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে রক্তপদ্মোপরি শ্যামা, পীতাম্বরধারিণী, বজ্র-শক্তি-বরাভয়-করা, চতুর্ভুজা, ঘোরদ্রংষ্ট্রা, মত্তচিত্তা, লাকিণী শক্তি বিরাজমানা।

॥ অনাহতচক্র ॥

মণিপুরপদ্মের উর্ধ্বভাগে হৃদয়-প্রদেশে বন্ধুকপুষ্প-তুল্য উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, দ্বাদশদল-বিশিষ্ট অনাহত পদ্ম বিরাজমান। উহার দ্বাদশ দলে অনুস্বার-যুক্ত, সিন্দুরবৎ লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট, 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ', 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ', 'ঞ', 'ট', 'ঠ' এই দ্বাদশটি বর্ণ সন্নিবিষ্ট। ঐ পদ্মের অভ্যন্তরে ধূম্রবর্ণ, ষট্‌কোণ-যুক্ত বায়ুমণ্ডল শোভা পাইতেছে। এই বায়ুমণ্ডলের উপরে ত্রিকোণ-যুক্ত কোটিবিদ্যুৎ-প্রভাময় সূর্যমণ্ডল অবস্থিত। ঐ ষট্‌কোণ-মধ্যে, ধূম্রবর্ণ, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারারূঢ়, মাধুর্যময় বায়ু-বীজ 'যং' বর্তমান। এই বীজের মধ্যস্থলে হংসবৎধবল, বরাভয়-মুদ্রা-হস্ত, দ্বিভুজ, ত্রিনেত্র ঈশ (ঈশ্বর বা ঈশান নামক শিব) বিরাজমান।

ঐ পদ্মে বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণা, কাকিনী শক্তি বিরাজিতা। তিনি নানালঙ্কার-শোভিতা, পাশ-কপাল-বরাভয়করা, চতুর্ভুজা, কঙ্কাল-মালা-ধারিণী, অমৃত-রসাভিষিক্ত-হৃদয়া ও আনন্দোন্মত্তা।

ঐ পদ্মের কর্ণিকা-মধ্যে ত্রিকোণে কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল, অর্ধচন্দ্র-শোভিত-মস্তক, বাণ-নামক শিবলিঙ্গ এবং কোটিবিদ্যুৎ-তুল্য কোমলাঙ্গী, ত্রিনেত্রা-নাম্নী শক্তি বিরাজমানা রহিয়াছেন।

॥ বিশুদ্ধচক্র ॥

কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শদল-যুক্ত পদ্ম অবস্থিত। ঐ পদ্ম ধূম্রবর্ণ এবং উহার ষোড়শদলে যথাক্রমে লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট, বিন্দু-যুক্ত ষোলটি স্বরবর্ণ (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ) সন্নিবিষ্ট। এই পদ্মে পূর্ণচন্দ্রবৎ বৃত্তাকার নভোমণ্ডল বিদ্যমান। ঐ নভোমণ্ডল-মধ্যে শুভ্রহস্তিপৃষ্ঠারূঢ়, পাশাঙ্কুশ-বরাভয়-হস্ত ব্যোম-বীজ 'হং' বিরাজমান। এই হংকারাত্মক গগনমণ্ডলের ক্রোড়-দেশে দশভুজ, পঞ্চবদন, ত্রিনেত্র, ব্যাঘ্র-চর্মাম্বর, অর্ধনারীশ্বর সদাশিব বিরাজমান। তিনি বৃষপৃষ্ঠে সিংহাসনে উপবিষ্ট—তাঁহার দক্ষিণভাগ তুষারশুভ্র, বামভাগ স্বর্ণবর্ণ। তাহার দশহস্তে শূল, টঙ্ক, খড়্গ, বজ্র, দাহন (আগ্নেয়াস্ত্র), নাগেন্দ্র (বৃহৎ সর্প), ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা।

এই পদ্মের কর্ণিকায় শ্বেতবর্ণা, পীতবসনা, চতুর্ভুজা, শর-ধনু-পাশাঙ্কুশ-হস্তা শাকিনী শক্তি বিদ্যমানা আছেন।

ঐ বিশুদ্ধনামক পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ শশাঙ্ক-মণ্ডল শোভিত রহিয়াছে; ঐ শশাঙ্ক-মণ্ডল পরমপদ-নিরত অতিশয় শুদ্ধমনা ব্যক্তির মুক্তিদ্বার-স্বরূপ।

॥ আজ্ঞাচক্র ॥

ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্য-স্থলে আজ্ঞাচক্রের অবস্থিতি। এই স্থলে দ্বিদল-বিশিষ্ট আজ্ঞা-পদ্ম বিরাজমান। এই পদ্ম শশধরবৎ শুভ্র; ইহার দুইটি দলে অনুস্বার-যুক্ত 'হ', ও 'ক্ষ' বর্ণ বিন্যস্ত আছে।

এই আজ্ঞা-পদ্মের মধ্যে ষড়াননা,—প্রত্যেক আননে ত্রিনেত্র-যুক্তা, চতুর্ভুজা, বিদ্যামুদ্রা-কপাল-ডমরু-জপমালা-করা, পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্রা হাকিনী শক্তি উপবিষ্টা।

এই দ্বিদল-যুক্ত আজ্ঞাখ্য পদ্মের মধ্যস্থলে যোনি-রূপিণী ত্রিকোণে ইতর-শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। ঐ লিঙ্গ তড়িৎ-মালার ন্যায় উজ্জ্বল এবং ঐস্থানে বেদের প্রথম বীজ ওংকার অবস্থিত। এই পদ্মের মধ্যে সূক্ষ্মরূপী মন অবস্থিত।

এই পদ্মের অন্তশ্চক্রে পরমশক্তি-স্থলে ত্রিকোণে ভ্রূর কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞেয়-স্বরূপ অন্তরাত্মা বিরাজিত আছেন। ঐ অন্তরাত্মা দীপ-শিখার তুল্য ও প্রণবাত্মক। ঐ প্রণবের ঊর্ধ্বভাগে বিন্দু-রূপী 'ম'-কার বিরাজিত; ঐ

'ম'-কারের আদিভাগে শুভ্রবর্ণ চন্দ্র-সম নাদ অর্থাৎ একটি শিবলিঙ্গ হাস্যবদনে বিরাজ করিতেছেন।

যে-স্থানে অন্তরাত্মা অবস্থিত, সে স্থান জ্বলন্ত দীপ-শিখার তুল্য এবং প্রভাত-সূর্যবৎ জ্যোতিঃসম্পন্ন। ঐ জ্যোতি মস্তক হইতে মূলাধার-কমলের মধ্যস্থ ধরাচক্র পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এখানে সূর্য ও চন্দ্র-মণ্ডলের মতো দীপ্তিশালী, পূর্ণৈশ্বর্য, অব্যয় ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ হয়।

এই আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলপদ্মে বায়ুর লয়-স্থান। তাহার উপরে মনশ্চক্র, মনশ্চক্রের উপর সোমচক্র। এই সোমচক্রে হংস-বীজ অধিষ্ঠিত। এই হংস-বীজের ক্রোড়-দেশে পরশিব, বামে নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী সিদ্ধকালী সহ বিরাজ করিতেছেন।

॥ সহস্রার ॥

আজ্ঞাচক্রের উপরিভাগে মহানাদ-রূপে শূন্যাকার স্থান বর্তমান। এই স্থান নির্বাত—কেবল শুদ্ধবুদ্ধি প্রকাশমান। ইহার উপরে পরম ব্যোম। এই শূন্যস্থানে শঙ্খিনী নাড়ীর শিরোদেশে বিসর্গ-শক্তির নিম্নে সহস্রদল-বিশিষ্ট পদ্ম বিরাজিত। ঐ পদ্ম অধোমুখে বিকশিত ও উহার কেশরগুলি প্রাতঃকালীন সূর্যের মতো দীপ্তিশালী। এই পদ্মের দলগুলিতে অকারাদি পঞ্চাশ অক্ষর কুড়িবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবর্তিত হইতেছে।

ঐ সহস্রদল-পদ্মমধ্যে নির্মল পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাজাল বিস্তার করিয়া স্নিগ্ধ সুধা-হাস্যের মত শোভা পাইতেছে। ইহার অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ-রূপী অকথাদি ত্রিকোণ এবং ঐ ত্রিকোণ-মধ্যে মহাশূন্য-স্থলে দেবতা এবং কৌল সাধকগণের গুরু-স্বরূপ মহাবিন্দু বিরাজিত।

এই শূন্য-স্থল পরমানন্দময়, অতীব সূক্ষ্ম ও পূর্ণ শশধরবৎ দীপ্তিবিশিষ্ট। এখানে আকাশ-রূপী পরমাত্ম-স্বরূপ পরমশিব অবস্থান করিতেছেন। ইহার অভ্যন্তর-স্থানের উপরে একটি দ্বাদশদলপদ্মে 'গুরু' উপবিষ্ট আছেন। তিনিই পরমশিব, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম।

এই স্থানে তরুণ-অরুণবর্ণা, মৃণাল-তন্তুর শতাংশের একাংশবৎ সূক্ষ্মা, বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিশালিনী 'অমা'-নাম্নী ষোড়শী কলা বিদ্যমান। উহা সতত প্রকাশমানা ও অধোমুখী। উহা হইতে নিরন্তর সুধা-ধারা বিগলিত হইতেছে।

ঐ অমা-কলার অভ্যন্তর-ভাগে একগাছি কেশের সহস্রাংশের একাংশ-পরিমিত 'নির্বাণ' নামে কলা বিদ্যমান আছে। এই কলা সর্বভূতের দেবতা-স্বরূপিনী, তত্ত্বজ্ঞান-রূপিণী। তাঁহার আকৃতি অর্ধচন্দ্রবৎ এবং প্রভা দ্বাদশাদিত্যের ন্যায়। ইনিই মহাকুণ্ডলিনী নামে খ্যাতা।

এই নির্বাণ-কলার অভ্যন্তর-ভাগে পরমাশ্চর্য নির্বাণ-শক্তি বিরাজিত। তিনি কেশাগ্রের কোটি অংশের একাংশবৎ সূক্ষ্মা এবং কোটি সূর্যবৎ দীপ্তিশালিনী। তিনি ত্রিভুবন-জননী—নিরন্তর প্রেম-সুধা বর্ষণ করিতেছেন।

এই নির্বাণ-শক্তির মধ্য-স্থলে, নিত্যানন্দনামা, সর্বশক্তির আশ্রয়স্থল-স্বরূপ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান-দাতা, পরম শিবের স্থান।

এই নির্বাণ-কলার নিম্নভাগে 'অব্যক্তানন্দ'-স্বরূপিণী 'নিবোধিকা' নামক অগ্নি প্রজ্বলিত। এই নির্বাণ-কলার মধ্যে 'পরবিন্দু' বা শিব ও শক্তির মিলিত সত্তা অবস্থিত।

এই স্থানই বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের পরমস্থান। উহা বৈষ্ণবের পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্থান, মহাশক্তির উপাসকদের মহাদেবী-স্থান, মুনি-ঋষিগণের প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-স্থান।[৪৮৪]

॥ নাড়ীমণ্ডলী ॥

যোগের মূলভিত্তি বায়ু-ক্রিয়া। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বায়ু-ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহা নাড়ী। নাড়ীই বায়ু-চলাচলের পথ। বায়ুকে দেহের নাড়ীসমূহের মধ্যে সঞ্চালন করাইয়া ঊর্ধ্বগত করাইয়া যত সূক্ষ্ম ও নির্মল করা যাইবে, ততই যোগী অভীষ্ট লাভ করিবেন। মানব-দেহে জালের ন্যায় অসংখ্য নাড়ী ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এই সব নাড়ীতে সাধারণতঃ পিত্ত-শ্লেষ্মাদি আবরক পদার্থ লিপ্ত হইয়া আছে, নাড়ীকে যথাবিধি শোধন করিতে হইবে, যাহাতে বায়ুর প্রবেশ সুগম হয়। এই নাড়ীমণ্ডলীর মধ্যে বায়ু যত সরল ও সূক্ষ্মভাবে প্রবাহিত হইবে, ততই স্তরে স্তরে যোগী সাধন-মার্গে উন্নীত হইবেন। সুতরাং নাড়ীর অবস্থান ও বায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা প্রয়োজন।

৪৮৪। পূর্ণানন্দ স্বামীর 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' গ্রন্থ ও কালীচরণ, বিশ্বনাথ ও শঙ্করের ব্যাখ্যা এবং বেলুড়মঠের শ্রীভৈরবানন্দ মহারাজের বর্ণনা অবলম্বনে। (আর্থার এভেলন তান্ত্রিক গ্রন্থমালা, ২য় খণ্ড, আগমানুসন্ধান সমিতি)

মানব-শরীরে তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার নাড়ী বর্তমান। তাহার মধ্যে চৌদ্দটি নাড়ীই প্রধান, যথা,—সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহু, সরস্বতী, পুষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশোদরী ও যশস্বিনী। এই চতুর্দশ নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ী শ্রেষ্ঠ। এই তিনটি নাড়ীর ভিতরে আবার সুষুম্না নাড়ীই সর্বপ্রধানা ও যোগ-সাধনের উপযোগিনী। মনুষ্যগণের অন্যান্য নাড়ী এই সুষুম্না নাড়ীকে আশ্রয় করিয়াই বর্তমান আছে।[৪৮৫]

ইড়া নাড়ী দেহের মেরুদণ্ডের বাহিরে বামভাগে বিদ্যমান এবং সুষুম্না নাড়ীকে আলিঙ্গনপূর্বক চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ নাসা-ছিদ্র দিয়া আজ্ঞাচক্রে একত্র হইয়াছে।

এইরূপে মেরুদণ্ডের দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত। এই নাড়ীও সুষুম্না নাড়ীকে আলিঙ্গনপূর্বক চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া বামনাসা-পুট দিয়া আজ্ঞাচক্রে ত্রিবেণী-স্থলে সম্মিলিত হইয়াছে।[৪৮৬]

সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহা মধ্য-নাড়ী। ইহা মূলাধার-পদ্মের অভ্যন্তর হইতে মস্তকোপরি সহস্রদল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা সূর্য ও বহ্নি-স্বরূপা, সত্ত্বরজস্তমোময়ী ও প্রস্ফুটিত ধুস্তুরপুষ্প-সদৃশ।[৪৮৭]

ইহার অভ্যন্তরে সমুজ্জ্বল বজ্রনাড়ী অবস্থিত, এই বজ্রনাড়ীর মধ্য-স্থলে লূতাতন্তূপম সূক্ষ্ম চিত্রিণী নাড়ী এবং আবার এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্য-স্থলে ব্রহ্মনাড়ী শোভা পাইতেছে। চিত্রানাড়ীর অন্তর্গত এই ব্রহ্ম-বিবর বা ব্রহ্ম-পথ দিয়াই মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনী সহস্রারে উপনীত হইয়া পরমব্রহ্মে মিলিত হন।

এই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী মূলাধারে একত্রিত হইয়াছে বলিয়া মূলাধারকে 'ত্রিবেণী' বা তিনটি নদীর সঙ্গম বলা হয়। তারপর, ইহার পর হইতে ইহারা পৃথক হইয়া পুনরায় ভ্রূ-নিম্নে আজ্ঞাচক্রে মিলিত হয়। এইস্থানকেও ত্রিবেণী বলা হয়। প্রথমটি 'যুক্ত ত্রিবেণী' এবং শেষেরটি 'মুক্ত ত্রিবেণী' বলিয়া কথিত হয়। ("সঙ্গতা ধ্বজমূলে চ বিমুক্তা ভ্রূবিয়োগতঃ।)"

৪৮৫। শিবসংহিতা, দ্বিতীয় পটল—শ্লোকঃ ১৩।১৪।১৫।১৬

৪৮৬। ঐ ঐ ২।২৫।২৬

"বেণীবন্ধনক্রমেন সর্বপদ্মানি সংবেষ্ট্য"—ষট্‌চক্রনিরূপণ-এর টীকা

৪৮৭। "ত্রিতয়গুণময়ী", "চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপা", "ধুস্তুরস্মেরপুষ্প"—ষট্‌চক্রনিরূপণ, ২

সমস্ত নাড়ীই মূলাধার-পদ্ম হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহারা জিহ্বা, মেঢ্র, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, নাসিকা, কক্ষ, চক্ষু, অঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, পায়ু, কুক্ষি ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গমনপূর্বক নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করিয়া আবার উৎপত্তিস্থানে আসিয়াছে। এই সকল নাড়ী হইতেই শাখা-প্রশাখা-রূপে সাড়ে তিনলক্ষ নাড়ী যথাভাগে দেহে বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত নাড়ীকে ভোগবহা নাড়ী বলে। এই সকল নাড়ী দ্বারা সর্বদেহে বায়ু-সঞ্চার হয় এবং ইহারা ওতপ্রোতভাবে সর্বদেহ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

মেরুদণ্ডের অগ্রভাগে ('মেরুশৃঙ্গে') ষোড়শ কলায় পূর্ণ চন্দ্রমা নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। এই চন্দ্র সর্বদা অধোমুখে সুধা-বর্ষণ করিতেছে। সেই অমৃত দুইভাগে ভাগ হইয়া সূক্ষ্ম হইয়া প্রবাহিত হয়। একভাগ অমৃত শরীরের ?র জন্য মন্দাকিনী-স্বরূপ ইড়া নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া উহার জলরূপে সর্বশরীরের পুষ্টিবর্ধন করিয়া থাকে। এই সুধাময় কিরণ বামভাগে সঞ্চারিত হইতেছে, কারণ বামপার্শ্বেই ইড়া নাড়ীর অবস্থান। চন্দ্রমণ্ডল-জাত দ্বিতীয় অমৃতময় কিরণ বিশুদ্ধদুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ ও আনন্দপ্রদ। সৃষ্টির জন্য এই অমৃতময় কিরণ সুষুম্না-পথ দ্বারা মেরুর নিম্নদেশে গমন করিতেছে।

মেরুর মূলে দ্বাদশকলা-যুক্ত প্রজাপতি সূর্য অবস্থান করিতেছেন। এ সূর্যই ঊর্ধ্বরশ্মি হইয়া রশ্মি দ্বারা দক্ষিণমার্গে অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে প্রবহমান হন এবং নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের অমৃতময় কিরণ ও শরীরস্থ ধাতুসমূহ গ্রাস করিয়া থাকেন। এই সূর্যমণ্ডলই আবার বায়ুমণ্ডল কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সমস্ত শরীরে বিচরণ করে।

এই বিচরণকারী সূর্য মেরুমণ্ডল-স্থিত সূর্যের অপর একটি মূর্তি। ইনি লগ্নযোগে অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে ও উপায়ে দক্ষিণমার্গে (পিঙ্গলা নাড়ীতে) সঞ্চালিত হইয়া মুক্তি-পদ-প্রদায়িনী হন, আবার লগ্ন অনুসারে ইনি সৃষ্ট বস্তুসকল নাশও করিয়া থাকেন।[৪৮৮]

ইহাই সংক্ষেপে নাড়ীর অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য।

সকল নাড়ীই বায়ু-চলাচলের পথ-স্বরূপ এবং প্রাণ-বাহিনী। মূলাধার হইতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত যে সব নাড়ী বিস্তৃত রহিয়াছে—রসরক্তবহা, রূপবহা, শব্দবহা, এমন

৪৮৮। শিবসংহিতা—২। ৬-১১, ১৬-২০ ইত্যাদি এবং 'ষট্‌চক্রনিরূপণ'—১-৩ ও টীকা ও অন্যান্য যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ।

কি মনোবহা—সমস্তই প্রাণবহা নাড়ী। নাড়ী মাত্রই বায়ু-চলাচলের মার্গ-স্বরূপ এবং প্রাণ-ক্রিয়ার সহায়ক।

আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া ও বুদ্ধির ক্রিয়া—সমস্তই বায়ু স্পন্দন-জাত, সুতরাং নাড়ীচক্রের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতিও তাহাই। বায়ুর স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার উপরে নাড়ীর স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা নির্ভর করে বায়ু যোগ-ক্রিয়ার দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখন নিরুদ্ধগতি হয়, তখন নাড়ীজাল উপসংহৃত হয়। তখন জ্ঞানাদি যাবতীয় ব্যাপার নিরুদ্ধ হইয়া যা যোগশাস্ত্র-মতে ইহাই চিত্তবৃত্তিনিরোধের অবস্থা। তখন দ্বন্দ্বাতীত, পরমসাম্য ভাবের উদয় হয়। এই বায়ুর নিবৃত্তাবস্থাই নির্বাণাবস্থার নামান্তর।

সাধকের যোগ-সাধনার অগ্রগতিও এই বায়ুবিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে বায়ুই শক্তি। শক্তির প্রবাহ-মার্গই নাড়ী। যোগশাস্ত্রে আছে যে, পিণ্ড ব ভাণ্ড বা দেহের সর্বত্র যেমন নাড়ীজাল ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডেরও সর্বত্র সেইরূপ জাল ব্যাপ্ত। দেহের সূর্যমণ্ডল যেমন বায়ুর সাহায্যে সমস্ত শরীরে তাহার রশ্মি নিক্ষেপ করে, বাহ্যজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ সূর্যমণ্ডল হইতে অনন্ত রশ্মি-ধার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। লিঙ্গাত্মক জীব মৃত্যু-কালে যখন স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া যায়, তখন যে নাড়ীদ্বারে সে নির্গত হয়, সেই নাড়ীই তাহাকে যথাস্থানে বহন করিয়া লইয়া যায়। যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যোগী ইচ্ছানুসারে সূর্য-রশ্মিতে গমনাগমন করিতে পারেন। পরদেহে প্রবেশ, সূক্ষ্মদেহে যাতায়াত প্রভৃতি সব ব্যাপারই সূর্যরশ্মি বা নাড়ী-পথ আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। যাহোক, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে নাড়ীমণ্ডলীর মধ্যে বায়ুর ক্রিয়ার স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও নিরোধ অনুসারে যোগক্রিয়ার সাফল্য পরিমাপ করা যায়।

মলযুক্ত বক্রনাড়ীতে যে বায়ু সঞ্চরণ করে, সে বায়ুও বক্রগতি ও স্থূল হইয়া থাকে। বায়ুই যখন শক্তি, তখন বক্র বা স্থূল বায়ুকে জড়শক্তি আখ্যা দেওয়া যায় যোগাভ্যাস দ্বারা ঐ বায়ু ক্রমে সরল ও সূক্ষ্ম হইতে আরম্ভ করে, নাড়ী-মার্গও ক্রমে বিশুদ্ধ হয়, তখন এই সরল ও সূক্ষ্ম বায়ু সরল পথ অবলম্বন করে। এই সরল পথই সুষুম্না নাড়ী। অবশ্য প্রথম অবস্থায়ই এই নাড়ীর পূর্ণ সরলতা উপলব্ধি করা যায় না। সুষুম্নার মধ্যে বজ্রিণী নাড়ী, বজ্রিণীর মধ্যে চিত্রিণী নাড়ী, চিত্রিণীর মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। সুতরাং দেখা যায়, যোগিগণের দ্বারা সুষুম্নার সূক্ষ্মত্বের মাত্রা উপলব্ধ হইয়াছে। সাধনার দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই ব্রহ্ম-পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

যেমন জড় ও চেতন একই শক্তির দুইটি অবস্থা, সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম একই বায়ুর দুইটি অবস্থা। সাধনার দ্বারা জড়কে চেতনে, স্থূলকে সূক্ষ্মে পরিণত করা যায়। এই সাধনাই যোগ-সাধনা। সুতরাং নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া বায়ুর সাধনাই যোগ-সাধনার মূলরহস্য।

॥ কুণ্ডলিনীযোগ-ক্রিয়া ॥

যোগের সাহায্যে বিশেষভাবে 'মহাবন্ধ' ও 'মূলবন্ধ' প্রভৃতি দ্বারা অপান-বায়ুকে রোধ ও ঊর্ধ্বগামী করিয়া কুম্ভক অবলম্বন করিলে নিরুদ্ধ বায়ু অগ্নিস্থানের অগ্নিকে আঘাত করিয়া জাগাইয়া দেয়। তখন এই উদ্দীপিত বহ্নি ও বেগবান বায়ু কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করে। অধোগামী অপান-বায়ু ঊর্ধ্বগতিশীল হইয়া নাভির অধোদেশস্থ মণিপুরচক্রে বহ্নি-মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া তাহাতে আঘাত করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত শিখার রূপ ধারণ করিয়া দীর্ঘ হয়। এই অগ্নি-শিখা ও অপান-বায়ু প্রাণ-বায়ুকে স্পর্শ করে। তখন সমস্ত শরীর-ব্যাপী অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এই অগ্নি-তাপে তপ্ত হইয়া প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া সুষুম্নার মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাই মোটামুটি কুণ্ডলিনী-জাগরণের সাধারণ উপায়।

কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া ঊর্ধ্বমুখে উঠিতে আরম্ভ করিলে মূলাধারে অবস্থিত ব্রহ্মা, ডাকিনীশক্তি ও অন্যান্য দেবতা, চতুর্দলের চারিটি বর্ণ এবং গন্ধতত্ত্ব ধরা-বীজ 'লং'-এর সহিত মিলিত হইয়া কুণ্ডলিনীর দেহে লয়প্রাপ্ত হয়।

মূলাধারচক্র হইতে জীবাত্মাকে সঙ্গে করিয়া কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে প্রবেশ করে। তৎক্ষণাৎ স্বাধিষ্ঠান পদ্মের দলগুলি ঊর্ধ্বমুখী হইয়া যায়। এই চক্রের মহাবিষ্ণু, রাকিনীশক্তি, অন্যান্য দেবতা, পদ্মদলের ছয়টি বর্ণ এবং গন্ধতত্ত্ব রসতত্ত্বে মিশিয়া যায় (মাটি জলে পরিণত হয়)। কুণ্ডলিনী-দেহে যে পৃথ্বী-বীজ 'লং' কারণ-শরীরে অবস্থান করিতেছিল, তাহা বরুণ-বীজ 'বং'এর সঙ্গে মিশিয়া কুণ্ডলিনীর দেহে বিলীন হয়।

তখন রসতন্মাত্র ও জীবাত্মার সঙ্গে কুণ্ডলিনী মণিপুরচক্রে প্রবেশ করে। এই চক্রে অবস্থিত রুদ্র, লাকিনীশক্তি, অন্যান্য দেবতা পদ্মের দশদলের দশটি বর্ণ এবং রসতন্মাত্র রূপতন্মাত্রে মিশিয়া যায়। কুণ্ডলিনীর দেহে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত বরুণ-বীজ 'বং' তেজোবীজ 'রং'এর সঙ্গে মিলিয়া যায় (জল অগ্নিতে পরিণত হয়) এবং শেষে কুণ্ডলিনীর দেহে বিলীন হয়।

এই মণিপুরচক্র হইতে অনাহতচক্রে উঠিতে সাধককে ব্রহ্ম-গ্রন্থি ভেদ

করিতে হয়। এই গ্রন্থি-ভেদ কঠিন। মণিপুরচক্র পর্যন্ত প্রাকৃত বা জড়শক্তির বিস্তার-স্থান। এই শক্তি পরিশুদ্ধ হইয়া সূক্ষ্মতা লাভ না করিলে ইহার উর্ধ্বে উৎক্রমণ দুরূহ ব্যাপার। তাই সাধক এই চক্র-ভেদ করিতে কাঠিন্য উপলব্ধি করেন। যোগশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে, 'পশুভাব' বিদূরিত না হইলে সাধক ব্রহ্ম-গ্রন্থি ভেদ করিতে পারেন না।

কুণ্ডলিনী অনাহতচক্রে উপনীত হইলে ঈশ, কাকিনীশক্তি, অন্যান্য দেবতা, অনাহতপদ্মের বারটি দলের বারটি অক্ষর স্পর্শতন্মাত্রে বিগলিত হয়। কুণ্ডলিনী-দেহের রূপতন্মাত্র ও বহ্নি-বীজ বায়ু-বীজ 'যং'-এ মিশিয়া যায় (অগ্নি বাষ্পে পরিণত হয়) এবং শেষে সমস্তই কুণ্ডলিনীর দেহে বিলীন হইয়া যায়।

এই চক্র হইতে বিশুদ্ধচক্রে যাইতে হইলে আবার একটি গ্রন্থি-মোচন প্রয়োজন। এই গ্রন্থির নাম 'বিষ্ণু-গ্রন্থি'। 'দ্বৈতজ্ঞান' বিলুপ্ত না হইলে এই গ্রন্থি-মোচন করা যায় না।

জীবাত্মাকে সঙ্গে লইয়া যখন কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রে প্রবেশ করে, তখন অর্ধনারীশ্বর সদাশিব, শাকিনীশক্তি, বিশুদ্ধপদ্মের ষোলটি দলের ষোলটি বর্ণ ব্যোমতত্ত্বে বা শব্দতন্মাত্রে পরিণত হয় এবং কুণ্ডলিনী-দেহের বায়ু-বীজ 'যং' আকাশ-বীজ 'হং'-এ মিশিয়া যায় (বাষ্প ইথরে পরিণত হয়) এবং শেষে এই শব্দতন্মাত্র কুণ্ডলিনীর দেহে বিলীন হয়।

কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করিলে এই চক্র-স্থিত পরশিব, হাকিনী-শক্তি ও অন্যান্য দেবতা, দ্বিদলের বর্ণ এবং কুণ্ডলিনী-দেহের শব্দতন্মাত্র অহংকারতত্ত্বে মিশিয়া গিয়া কুণ্ডলিনীর দেহে বিলীন হইয়া যায়।

তারপর কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইতে সাধক এইস্থানে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এইস্থানে তাঁহাকে 'রুদ্র-গ্রন্থি' মোচন করিতে হয়। এই রুদ্র-গ্রন্থি ছিন্ন হইলে কুণ্ডলিনী সহস্রারে প্রবেশ করে।

সহস্রারে কুণ্ডলিনী পরমশিবের সঙ্গে আলিঙ্গিত হয় এবং এই আলিঙ্গন হইতে অমৃত-রূপ আনন্দ-ধারা বর্ষিত হয়। জীব সেই অমৃত-ধারা পান করে।

এই কুণ্ডলিনী যখন উর্ধ্বদিকে ধাবিত হয়, তখন পদ্মের সমস্ত দল তাহার সেই গতি অনুসারে উর্ধ্বমুখী হইয়া যায় এবং অত্যুজ্জল বর্ণ ধারণ করে। প্রত্যেক চক্রে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সমস্ত শক্তি চারিদিক হইতে আকুঞ্চিত হইয়া তাহার শরীরে লীন হয় এবং তিন লিঙ্গ—মূলাধারে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ, অনাহতে বাণ-লিঙ্গ এবং আজ্ঞাচক্রে ইতর-লিঙ্গ—ভেদ করিয়া সে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হয়।

বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনা

হিন্দুতন্ত্রের মতো বৌদ্ধতন্ত্রেও দেহ-মধ্যে মেরুদণ্ডকে মেরু-পর্বত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। উহাকে আশ্রয় করিয়া চারিটি চক্র বা পদ্ম পরপর অবস্থিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

॥ কায় ও চক্র ॥

বৌদ্ধতন্ত্রে এই চারিটি চক্রকে 'কায়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রথম চক্রটি নাভির নিম্নে অবস্থিত। ইহাকে 'নির্মাণকায়' বলা হয়। ইহাই 'নির্মাণচক্র'। হিন্দুতন্ত্রের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর একত্রে মিলাইয়া বৌদ্ধেরা নির্মাণ-চক্র বা 'নির্মাণকায়' বলিয়া একটি চক্র গ্রহণ করিয়াছে। এই গ্রহণের মধ্যে একটা বিশেষ যুক্তি আছে। নাভির নিম্নেই প্রকৃতপক্ষে জননেন্দ্রিয়ের স্থান এবং দেহের স্থূল অংশ এই স্থানেই বিরাজমান। এখানেই সৃষ্টির মূল। এই স্থানে সর্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। জননেন্দ্রিয়ের মূল ও নাভির নিম্নস্থল একই ভাব-দ্যোতক।

দ্বিতীয় চক্র হৃদয়-প্রদেশে অবস্থিত। ইহা 'ধর্মকায়' বলিয়া কথিত। হিন্দুতন্ত্রে ইহাই অনাহতচক্র। ইহাকে বৌদ্ধেরা 'ধর্মচক্র' বলিয়াছে।

তৃতীয় চক্রের অবস্থিতি কণ্ঠদেশে। ইহা 'সম্ভোগকায়' বলিয়া কথিত। হিন্দুতন্ত্রে ইহাকে বিশুদ্ধচক্র বলা যায়। ইহাই বৌদ্ধদের 'সম্ভোগচক্র'।

চতুর্থ চক্র মস্তকের শীর্ষদেশে অবস্থিত। বৌদ্ধেরা ইহাকে 'মহাসুখচক্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইহাকে 'উষ্ণীষকমল' বা 'মহাসুখকমল' বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই 'সহজকায়' বলিয়া কথিত।

'হেবজ্রতন্ত্র'-এ এই চক্র ও কায় সম্বন্ধে এইভাবে বর্ণনা আছে:

> "ত্রিকায়ং দেহমধ্যে তু চক্ররূপেণ কথ্যতে।
> ত্রিকায়স্য পঞ্চজ্ঞানং চক্রং মহাসুখং মতম্॥
> ধর্মসম্ভোগনির্মাণং মহাসুখং তথৈব চ।
> যোনিহৃৎকণ্ঠমধ্যে তু ত্রয়ঃ কায়াঃ ব্যবস্থিতাঃ॥
> অশেষাণাং তু সত্ত্বানাং যত্রোৎপত্তিঃ প্রমীয়তে।
> তত্র নির্মাণকায়ঃ স্যাৎ নির্মাণং স্থাবরং যতঃ॥
> উৎপদ্যতে নির্মীয়তে অনেন নির্মাণিকং মতম্।
> ধর্মচিত্তস্বরূপং তু ধর্মচক্রং তু হৃদ্ ভবেৎ॥

সম্ভোগং ভুঞ্জনং প্রোক্তং ষণ্ণাং বৈ রসরূপিণাম্।
কণ্ঠে সম্ভোগচক্রং চ মহাসুখং শিরসি স্থিতম্॥"[৪৮৯]

চক্র ও কায়ের নামকরণ সম্বন্ধে এখানে বলা হইতেছে যে, জননেন্দ্রিয়ের স্থান হইতে চেতন-অচেতন সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ঐ প্রদেশে নির্মাণকায় স্থাপিত হইয়াছে; ধর্মচক্র সমস্ত ধর্মের তত্ত্বস্বরূপ বলিয়া হৃৎ-প্রদেশে স্থাপিত; সম্ভোগ অর্থে ষড়্রস-ভোগ, সম্ভোগকায় আনন্দ-রস-সম্ভোগ-স্বরূপ, ইহা কণ্ঠ-দেশে স্থাপিত; মহাসুখচক্র তথা মহাসুখকায় মস্তকে স্থাপিত।

চক্রে পদ্ম-দলের সংস্থান বিভিন্ন বৌদ্ধতন্ত্রে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'হেরুকতন্ত্র'-এ আছে যে, মহাসুখচক্রে চারিটি পদ্মদল, তাহার বাহিরে বত্রিশদল-সমন্বিত আর একটি পদ্ম বর্তমান। সেই পদ্মের অভ্যন্তরে বোধি-চিত্তাত্মক এবং চন্দ্রের পঞ্চদশকলাত্মক 'হ'-বর্ণ অধোমুখে বর্তমান। ইহার মধ্যে চন্দ্রের ষোড়শী-কলাত্মক নিত্যমহাসুখ-স্বরূপিণী যোগিনী বাস করে। তাহার দুই পার্শ্বে আলি-কালি-রূপিণী ললনা ও রসনা নাড়ী বর্তমান। সেই পরমেশ্বরী অদ্বয় সহজানন্দ-স্বভাবা। কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে রক্তবর্ণ ষোড়শদল-বিশিষ্ট পদ্ম বিরাজমান, তাহার মধ্যে 'হুং'কার, তাহার উর্ধ্বে গ্রন্থির ছিদ্রপথে ('গ্রন্থিকরন্ধ্রমার্গেন') নিরন্তর অমৃত প্রবাহিত হইতেছে। হৃদয়ে ধর্মচক্রে অষ্টদল-বিশিষ্ট পদ্ম। ইহা 'বিশ্বপদ্ম', ইহাতে দুইটি পদ্ম অধঃ ও উর্ধ্বে মুখোমুখিভাবে সন্নিবিষ্ট। ইহার মধ্যে 'হুং'-অক্ষর অধোমুখে বিরাজিত। তাহার উপরে ব্রহ্মাণ্ডের আকার-স্বরূপ ('ব্রহ্মাণ্ডসদৃশাকারং') একটি শ্বেত-পদ্ম অবস্থিত। উহার মধ্যে বিরাজমান সর্বব্যাপী ও সততপ্রকাশমান 'বিজ্ঞান'; উহা সকলের আধার এবং স্বতঃ-উৎসারিত জ্ঞান-স্বরূপ ('স্বয়ম্ভূজ্ঞানা-ধারম্'); ইনিই 'পরমেশ্বর'। নাভি-প্রদেশে নির্মাণচক্রে নীলবর্ণের চৌষট্টিদল-বিশিষ্ট পদ্ম অবস্থিত। তাহার মধ্যে অত্যুজ্জ্বল মুক্তাবৎ 'অং'-অক্ষর সন্নিবিষ্ট। এই পদ্মের কিঞ্চিৎ নিম্নে 'কন্দ'-স্বরূপ স্থানে দেহের বাহাত্তর হাজার নাড়ী মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতেই প্রজ্ঞা-রূপিণী নাড়ী 'ললনা' এবং উপায়-রূপিণী 'রসনা' বহির্গত এবং মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণী, 'অং'-বর্ণাত্মক ও 'চতুষ্কায়'-স্বরূপিণী, সিদ্ধি ও পরমানন্দদায়িনী দেবী বিরাজমানা।[৪৯০]

৪৮৯। হেবজ্রতন্ত্র—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং ১১৩১৭—পৃঃ ৫০ (ক)

৪৯০। হেরুকতন্ত্র—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং ১১২৭৯—পৃঃ ৭৩ (খ), ৭৪ (ক) ও (খ)

'সেকোদ্দেশ-টীকা'য় দেখা যায় যে, নাভি-প্রদেশে নির্মাণচক্রে অবস্থিত পদ্মের চৌষট্টিদল, হৃৎ-পদ্মের বত্রিশদল, কণ্ঠ-পদ্মের ষোড়শদল এবং উষ্ণীষ-পদ্মের চারিটি দল।[৪৯১]

হিন্দুতন্ত্রে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি যে, বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন শক্তির বাস, বৌদ্ধতন্ত্রেও সেইরূপ চারিটি চক্রে চারিটি দেবীর কল্পনা করা হইয়াছে। নির্মাণচক্রে লোচনা, ধর্মচক্রে মামকী, সম্ভোগচক্রে পাণ্ডরা ও মহাসুখচক্রে তারা অবস্থিতা। এই চারিটি চক্রে চারিটি মুদ্রা সংযুক্ত—কর্মমুদ্রা, ধর্মমুদ্রা, মহামুদ্রা ও সময়মুদ্রা। হেবজ্রতন্ত্রে এই চারিটি চক্র ও মুদ্রার সঙ্গে চারিপ্রকার মুহূর্ত—বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ, চারিপ্রকার সাধনাঙ্গ—সেবা, উপসেবা, সাধনা ও মহাসাধনা, চারিপ্রকার আর্যসত্য—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ-নিবৃত্তি এবং উহার নিবৃত্তির উপায়, চারিপ্রকার তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব, মন্ত্র-তত্ত্ব, দেবতা-তত্ত্ব ও জ্ঞান-তত্ত্ব, চারিপ্রকার আনন্দ—আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ, চারিপ্রকার নিকায়, ষোড়শ সংক্রান্তি, চৌষট্টি দণ্ড (চারি সংখ্যার গুণিতক) এবং চারি প্রহর প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে।[৪৯২]

সেকোদ্দেশ-টীকায় এই আনন্দকে কায়ানন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ—এই চারিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের আনন্দকে আবার কায়-বাক্-চিত্ত-জ্ঞান অনুসারে চারি ভাগ করিয়া মোট ষোড়শ আনন্দ নির্দেশ করা হইয়াছে।[৪৯৩]

॥ নাড়ী ॥

চক্র-পদ্মের পরে নাড়ীর উল্লেখ প্রয়োজন। বৌদ্ধতন্ত্রে বামভাগের নাড়ীর নাম 'ললনা'। ইহাই হিন্দুতন্ত্রের ইড়া নাড়ী। ললনা নাড়ী 'আলি', 'ধমন', 'চন্দ্র' প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা কণ্ঠ-দেশ হইতে আরম্ভ হইয়া বামদিকে নাভি-প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। 'রসনা' নাড়ী নাভি-প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিক দিয়া কণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাই হিন্দুতন্ত্রের পিঙ্গলা। বৌদ্ধতন্ত্রে ইহা 'কালি' 'চমন' 'সূর্য' প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হইয়াছে। এই বাম ও দক্ষিণ নাড়ীর মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া হৃৎ-পদ্মের মধ্য দিয়া যে নাড়ীটি

৪৯১। সেকোদ্দেশ-টীকা (বরোদা সং)—পৃঃ ২৭

৪৯২। **Tantric Buddhism**—Dr. S. B. Das Gupta—Pages 165-66.

৪৯৩। সেকোদ্দেশ-টীকা (বরোদা সং)—পৃঃ ২৭, "তে আনন্দা ভেদেন ষোড়শঃ" ইত্যাদি

প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা 'অবধূতী' নামে খ্যাত। ইহাই হিন্দুতন্ত্রের সুষুম্না। বৌদ্ধতন্ত্র ইহাকে 'দেবী' 'প্রজ্ঞা', 'নৈরাত্মা', 'যোগিনী', 'সহজসুন্দরী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছে।

বৌদ্ধতন্ত্রে ললনাকে প্রজ্ঞা এবং রসনাকে উপায় বলা হইয়াছে। এই দুই নাড়ীর মিলন মধ্যনাড়ী অবধূতীতে হইলে প্রজ্ঞোপায়ের মিলন হইল। ললনা বিন্দু বহন করে, পিঙ্গলা রজঃ বহন করে এবং অবধূতী উভয়ের মিলিত বস্তু বোধি-চিত্তকে বহন করে। এইজন্য অবধূতী সহজানন্দ-স্বরূপিণী বলিয়া কথিত হইয়াছে।[৪৯৪]

আমরা হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রে চক্র, পদ্ম ও নাড়ীর অবস্থান ও তাহাদের ক্রিয়াদি লক্ষ্য করিলাম। এখন সাধন-ক্রিয়ায় বাউলধর্মের সহিত ইহার সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যাক।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, অনেক বাউল-গানে 'দ্বিদল', 'চতুর্দল', 'ষড়্‌দল', 'দশমদল', 'সহস্রদল' প্রভৃতির উল্লেখ আছে এবং সহস্রদলে পরমাত্মার নিত্যস্থান কল্পনা করিলেও দ্বিদলে তাঁহার লীলাময়-রূপে বিহার-স্থল বলিয়া অনেক গানে উল্লিখিত হইয়াছে।[৪৯৫] সুতরাং দেখা যায়, এই চক্র-পদ্ম-কল্পনায় বাউলরা মূলতঃ হিন্দুতন্ত্রকে অনুসরণ করিয়াছে। তবে একটি বিষয়ে দেখা যায় যে, মূলাধার বা ত্রিবেণীর ঘাটের অবস্থান তাহারা ঠিক মূলাধারে চতুর্দল পদ্মেই নির্দেশ করে নাই। কখনো চতুর্দল, কখনো ষড়্‌দল, কখনো দশম দল, কখনো ষোড়শ দল অর্থাৎ মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মণিপুরচক্র পর্যন্ত স্থানকে মূলাধার বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। ইহাই জননেন্দ্রিয়ের অবস্থান-প্রদেশ। এই দিক দিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে। ইহাই বৌদ্ধদের 'নির্মাণচক্র' বা 'নির্মাণকায়।'

হিন্দুতন্ত্রে প্রকৃতি-মিলন

বাউলের মূল সাধন-ক্রিয়া যোগ-মিলন। হিন্দুতন্ত্র-সাধনায় এই প্রকৃতি-মিলনের ব্যবস্থা আছে। শাক্ত তান্ত্রিকগণ নানা উপাসনা-পদ্ধতি বা 'আচার' অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন। তাহার মধ্যে বিবিধ তন্ত্রগ্রন্থে এই নামগুলি দেখা যায়—দিব্যাচার,

৪৯৪। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য **Tantric Buddhism**—Dr. Das Gupta—Pages 169-74. **Studies in the Tantras**—Dr. Bagchi—Page 69.

৪৯৫। দ্রষ্টব্য গান নং ৫১, ১৩১, ১৩৫, ২৭৮, ৩০১, ৩২৩, ৩৪০, ৪৫৯ ইত্যাদি

বীরাচার, পশ্বাচার, বামাচার, চীনাচার, দক্ষিণাচার, সময়াচার, কুলাচার ইত্যাদি। ইহার মধ্যে দিব্য, দক্ষিণ ও পশ্বাচারে সাধারণভাবে পূজা, জপ ও ন্যাসাদি মাত্র করা হয়। সময়াচারে আন্তরযাগ বা মানসপূজারই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সময়াচারীরা পূজার কোনো বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করে না। মানস ধ্যান-ধারণাই তাহাদের পূজার একমাত্র অঙ্গ। এই সময়াচার-মতাবলম্বীদের মধ্যে শঙ্করাচার্য রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ 'সৌন্দর্যলহরী'র টীকাকার লক্ষ্মীধরই প্রধান। তিনি কাপালিক, ক্ষপণক, দিগম্বর ও কৌলসম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এই সময়াচার-মতের তান্ত্রিক উপাসকের সংখ্যা খুবই কম বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ করিয়া বামাচার, বীরাচার, চীনাচার ও কুলাচারে পঞ্চ-'ম'-কার-ব্যবহার, চক্রানুষ্ঠান ও শব-সাধনাদির ব্যবস্থা আছে। কুলাচার সাধারণের চক্ষে যতই নিন্দিত হউক, তন্ত্রগ্রন্থাদিতে কুলাচার, বীরাচার বা বামাচার শাক্তমতের শ্রেষ্ঠ ও কঠিনতম উপাসনা বলিয়া বিহিত হইয়াছে। আবার কোনো কোনো দেবী-অর্চনায় বামাচার অবশ্য অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। তারা ও কালীপূজায় এই বামাচার অবশ্য পালনীয়।

ব্রহ্মানন্দগিরি প্রণীত 'তারারহস্য' গ্রন্থে আছে :

> "বামাচারং পরিত্যজ্য পূজনং বা জপঞ্চরেৎ।
> স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥
> বামাচারং বিনা দেবী তারায়াঃ পরিপূজনম্।
> শোকায় মরণায়ঽপরে চ নরকায় চ ॥"[৪৯৬]

কালীপূজাতেও পঞ্চ-'ম'-কার অবশ্যগ্রহণীয় বলিয়া তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 'নিরুত্তরতন্ত্র'-এ আছে :

> "বিনা পীত্বা সুরাং ভুক্তা মৎস্যমাংসং রজস্বলাং।
> যো জপেদ্ দক্ষিণাং কালীং তস্য দুঃখং পদে পদে ॥"[৪৯৭]

সমস্ত আচারের মধ্যে বীরাচার বা কুলাচার যে শ্রেষ্ঠ এবং বীরাচার ব্যতীত অন্য আচার সম্ভব নয়—এইরূপ উক্তিও তন্ত্রে আছে :

> "বীরাচারং বিনা নাথ দিব্যাচারং ন লভ্যতে।
> ততো বীরাচারধর্মং কৃত্বা দিব্যং সমাচরেৎ ॥"[৪৯৮]

৪৯৬। তারারহস্য—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত—পৃ: ১২

৪৯৭। নিরুত্তরতন্ত্র, ৫ম পটল (রসিকমোহন সং) —পৃ: ৬

৪৯৮। রুদ্রযামলতন্ত্র, ২৬ পটল (রসিকমোহন সং)—পৃ: ৫৯

কুলাচারী কৌল যে সমস্ত সম্প্রদায়ের উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এইরূপ 'কুলার্ণব তন্ত্রে'-এ উক্ত হইয়াছে :

"সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্ ॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি ॥"[৪৯৯]

'মহানির্বাণতন্ত্র'-এও কুলধর্ম বা কুলাচারকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে :

"সর্বধর্মোত্তমাৎ কৌলাৎপরো ধর্মো ন বিদ্যতে।"
"কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ।"[৫০০]

পঞ্চ-'ম'-কারের শেষের 'ম'-কার অর্থাৎ মৈথুন সম্বন্ধে হিন্দুতন্ত্রের ধারণা কি, হিন্দুতন্ত্র-সাধনায় ইহার স্বরূপ কি এবং তাহার সহিত বাউল-ধর্মের প্রকৃতি-সাধনার কি সাদৃশ্য ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তাহাই আমাদের বর্তমান লক্ষ্যের বিষয়।

শাক্তধর্মে প্রকৃতি-সাধন উপাস্যা দেবীর পূজার একটা অংশবিশেষ। ইহা শাক্ত তান্ত্রিকদের মূল সাধনাঙ্গ নয়। সাধারণতঃ চক্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহারা প্রকৃতি-সাধনা করে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মন্ত্র-জপ এবং তাহার পরবর্তী ক্রিয়াগুলি মূল উদ্দেশ্যের অঙ্গ-রূপেই অনুষ্ঠিত হয়। নারীকে তাহারা শক্তির সাক্ষাৎ অংশস্বরূপ বলিয়া মনে করে এবং নিজেও শিব-ভাবে তাহার সহিত মিলিত হয়। এই মিলন দ্বারাই শক্তি-পূজা পূর্ণাঙ্গ হয় বলিয়া তাহাদের ধারণা।

হিন্দুতন্ত্রে নারীকে অতি উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে সাক্ষাৎ মহামায়ার অংশ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কুমারী, যুবতী প্রভৃতি পূজা শাক্তদের সাধনার অঙ্গ। বহু তন্ত্রে নারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বা তাহার স্তুতি করা হইয়াছে।

'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র'-এর তারাখণ্ডে প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

"নারী ত্রৈলোক্যজননী নারী ত্রৈলোক্যরূপিণী।
নারী ত্রিভুবনাধারা নারী দেহস্বরূপিণী ॥
নারীচক্রে সর্বরূপং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
ন চ নারীসমং সৌখ্যং ন চ নারীসমা গতিঃ ॥

৪৯৯। কুলার্ণবতন্ত্র, ২য় উল্লাস (আগমানুসন্ধান সং)

৫০০। মহানির্বাণতন্ত্র—৫ম উল্লাস (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ৮

ন নারীসদৃশং ভাগ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ন নারীসদৃশং রাজ্যং ন নারীসদৃশং তপঃ ॥
ন নারীসদৃশং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ন নারীসদৃশো যোগো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
ন নারীসদৃশং মন্ত্রং ন নারীসদৃশং তপঃ ॥
ন নারীসদৃশং বিত্তং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তরুণীং সুন্দরীং রম্যাং যৌবনোদ্ভূতমানসাম্ ॥"[৫০১]

এই তন্ত্রের নানাস্থানে বিশেষ করিয়া ত্রয়োদশ ('কৌলতীর্থবিনির্ণয়ো নাম ত্রয়োদশঃ') এবং চতুর্দশ ('শক্তিপূজাকথনং নাম চতুর্দশঃ') পটলে শক্তি-পূজায় প্রকৃতির ব্যবহার ও ক্রিয়াদির নানা বর্ণনা আছে।

অন্যান্য তন্ত্রেও প্রকৃতিকে শাক্তদের ইষ্টদেবী দশমহাবিদ্যার নানা রূপের প্রতীক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে :

"পঞ্চাশন্মাতৃকা যা সা যুবতী পরিগীয়তে।
যুবতীরহিতং দেবি কুতো বিদ্যা কুতো মনুঃ।
নির্গুণং পরমং ব্রহ্ম প্রধানা যুবতীগণাঃ ॥"[৫০২]

"লতাদর্শনমাত্রেন কালিকাদর্শনং ভবেৎ।
দৃষ্ট্বা চ সুন্দরীং শক্তিং কালীংতত্রৈব চিন্তয়েৎ ॥"[৫০৩]

"কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী সর্বদেবতা।
ভূর্ভুবোমূর্তিকা দেবি কুমারী চ প্রপূজিতা ॥"[৫০৪]

তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনায় প্রকৃতি-মিলন না হইলে উপাসনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—এই রূপ বহু উক্তি আছে। এই মিলন সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য নির্দিষ্ট পথ। ইহা উপাসনার প্রধান অঙ্গ এবং ইহাও একপ্রকার দেবীর পূজা :

"শক্তিং বিনা মহেশানি শক্তিমন্ত্রো ন সিধ্যতি।
সর্বেষাং শক্তিমন্ত্রাণাং শক্তিঃ সিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥"[৫০৫]

৫০১ শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, তারাখণ্ড, ত্রয়োদশ পটল (বরোদা সং)—পৃঃ ৫২
৫০২ কামধেনুতন্ত্র, ১০ম পটল (রসিক মোহন সং)—পৃঃ ৬
৫০৩ নিরুত্তরতন্ত্র, ৫ম পটল (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ৫
৫০৪ বৃহন্নীলতন্ত্র, ৭ম পটল (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ১৫
৫০৫ নিরুত্তরতন্ত্র, ১৪শ পটল (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ১৬

প্রকৃতি-সঙ্গ ইষ্টদেবী-অর্চনার অঙ্গস্বরূপ :

"শক্তিযোগং বিনা হোমো নিষ্ফলা নাত্র সংশয়ঃ।

* * * *

লিঙ্গেনাকর্ষয়েদ্ যোনিং মুখৈ জিহ্বামৃতং পিবেৎ।
নখদন্তক্ষতান্যত্র পুষ্পানি বিহিতানি চ ॥
আলিঙ্গনন্তু কস্তুরী কর্পূরাগুরুচন্দনং।
চুম্বনং স্তবনন্দেবি মথনং হবনং শিবে ॥"[৫০৬]

"ঋতুযুক্তলতামধ্যে সাধয়েদ্বিধিবন্মুদা
অচিরাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি দেবানামপি দুর্লভাং ॥

* * * *

শুক্রন্তু স্তম্ভয়েদ্বীরো যৌনৌ লিঙ্গং প্রবেশয়েৎ।
আঘাতৈস্তোষয়েত্তন্তু সন্ধানভেদতঃ প্রিয়ে ॥

* * * *

ততো লিঙ্গে স্থিতে যোনৌ আজ্ঞাং তস্যাঃ প্রগৃহ্য চ।
অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং জপেদ্ধোমাদিকাঙ্ক্ষয়া ॥"[৫০৭]

"আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়োর্মর্দনং তথা।
দর্শনং স্পর্শনং যোনের্বিকাশো লিঙ্গঘর্ষণম্ ॥
প্রবেশঃ স্থাপনং শক্তের্নবপুষ্পানি পূজনে।"[৫০৮]

কৌলিকগণের চক্রে প্রকৃতি-সাধনা সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া নানা তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই ক্রিয়ায় যে লজ্জা-ঘৃণা-ভয় ত্যাগ করিতে পারে, সে-ই প্রকৃত 'বীর'—প্রকৃত 'কৌল'। সাধিকাও এই ক্রিয়ার সহায়িকারূপে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে :

"বাপীকূপতড়াগাদি দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
তৎফলাৎ কোটিগুণিতং যদি চক্রং প্রপূজয়েৎ ॥

৫০৬। গন্ধর্বতন্ত্র, ৩৪শ পটল (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ৬২
৫০৭। কামাখ্যাতন্ত্র, ৩য় পটল (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ২-৩
৫০৮। মহাচীনাচারক্রম, (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ৬

গঙ্গাতোয়ে যথা সূর্যো হীনতোয়ে তথা পুনঃ।
সূর্যস্য দূষণং নাস্তি সূর্যৈকঃ পরিতিষ্ঠতি ॥
তথৈব পরমেশানি সাধকে নাস্তি দূষণং।
মন্ত্রধারণমাত্রেণ তদাত্মা শোভনো ভবেৎ ॥
অতএব মহেশানি দূষণং নাস্তি রেতসি।
রেতঃ পবিত্রং পরমং শক্তির্মোক্ষস্য কারণম্ ॥
পূজাহীনা চ যা শক্তির্জপহীনা চ যা পুনঃ।
ধৃত্বা সাধকরেতশ্চ সা নারী কালিকা স্বয়ম্ ॥"[৫০৯]
"পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্‌যস্য ঘৃণা স্যাদ্রক্তরেতসোঃ।
শুদ্ধৌ চাশুদ্ধতাভ্রান্তিঃ পাপাশঙ্কা চ মৈথুনে ॥
স ভ্রষ্টঃ পূজয়েদ্দেবীং চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
রোগী দুঃখী ভবেদ্দেবি রৌরবে নরকে বসেৎ ॥
পঞ্চমাৎ পরং নাস্তি শাক্তানাং সুখমোক্ষয়োঃ।
ভাবরূপা চ যা দেবী রেতঃপ্রীতা সদানঘে ॥
রেতসা তর্পণং তস্যা মদ্যৈর্মাংসৈঃ সমং প্রিয়ে।
কেবলৈঃ পঞ্চমৈর্দেবি সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ ॥
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং শক্তিং রমন্ রেতো বিমুঞ্চয়েৎ।"[৫১০]

সেইজন্য

"দুর্লভং সর্বলোকেষু কৌলিকানাঞ্চ লক্ষণং।"[৫১১]

একই শ্লোক একটু পরিবর্তিত বা অনেক সময় অপরিবর্তিত আকারেই নানা তন্ত্রে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। তাহাতে মনে হয়, হিন্দুতন্ত্রের মূলসাধন-পদ্ধতিতে ঐক্য বর্তমান।

তন্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট সংগ্রহ-গ্রন্থ কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার'। বাংলায় এই গ্রন্থখানি তান্ত্রিক মহলে বিশেষ পরিচিত ও আদৃত। বাংলার সমস্ত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া সম্পাদিত হয়। এই গ্রন্থ হইতে কুলাচারের বর্ণনায় প্রকৃতি-সাধন-ঘটিত কতক অংশের যথাযথ অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে

৫০৯। নির্বাণতন্ত্র, ১১শ পটল (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ৮

৫১০। শ্যামারহস্য, কৌলতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ৩৯

৫১১। কৌলাবলীতন্ত্র, ৮ম উল্লাস (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ১৭

কুলাচারীদের প্রকৃতি-সাধনা বা হিন্দুতন্ত্র-মতে প্রকৃতি-সাধনার স্বরূপটি দেখা যাইবে :

"সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় চিন্তা করিবে…বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা বা মহাদুষ্টা নারীকেও দেবতাবোধে নমস্কার করিবে। তাহাদিগকে প্রহার বা নিন্দা, তাহাদিগের প্রতি কুটিলতা-প্রকাশ ও তাহাদিগের অপ্রিয় কর্ম একেবারেই করিবে না, করিলে সিদ্ধির হানি হইবে। স্ত্রীলোক দেবতা, স্ত্রীলোকই জীবন, স্ত্রীলোকই অলংকার এইরূপ জ্ঞান করিবে; নিয়ত স্ত্রী-সঙ্গী হইয়া থাকিবে…স্ত্রীহস্তে আহৃত পুষ্প, স্ত্রীহস্তে আনীত জল ও স্ত্রীহস্তে দত্ত বস্ত্র দেবতাকে নিবেদন করিবে।…

"শিবাগমে কথিত আছে—শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, সূর্য শক্তি, চন্দ্র শক্তি, গ্রহগণ শক্তিস্বরূপ, অধিক কি, এই নিখিল জগৎকেই যে শক্তিরূপে বুঝিতে পারে না, সে নারকী।…

"উত্তরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, রাত্রি একপ্রহর গত হইলে সাধক অঙ্গে ধূপগন্ধ মাখিয়া সর্বাঙ্গে রক্তচন্দন চর্চিত হইয়া রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্বক তাম্বূলপূর্ণ মুখে কুলগৃহে গমন করিয়া কুলনায়িকার অর্চনা করিবে।…কুলনায়িকা নটী, বেশ্যা, রজকী…ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণী কেবল ব্রাহ্মণের শক্তি হইবে। এইপ্রকার কন্যাকে পুষ্পশয্যার উপর রাখিয়া অর্চনা করিবে…যে সাধক অর্থলোভে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণার্থ সুখের জন্য এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবে, সে রৌরব নরক হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হইবে না।…

"অদীক্ষিত শক্তির সঙ্গ করিলে সিদ্ধিহানি ঘটে। শক্তি অদীক্ষিতা হইলে তাহার কর্ণে অভেদজ্ঞানে মায়াবীজ প্রদান করিবে। ইহাই শক্তিশোধন। …পর্যঙ্কমধ্যে কুলরূপিনী শক্তির উপরে একাগ্রমনে পঞ্চকামের পূজা করিবে…সিন্দুরাদি দ্বারা শক্তির ললাটে সুমনোহর ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে… ত্রিকোণ মধ্যে গণেশ ও তিন কোণে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা…দুই স্তনে বসন্ত ও মদনের পূজা করিবে…জ্ঞানার্ণবে উক্ত আছে, দক্ষিণ চরণ হইতে মস্তকের দক্ষিণ ভাগ যাবৎ এবং মস্তকের বাম দিক হইতে বামপদ যাবৎ কামকলা ও সোমকলার অর্চনা করিবে…পরে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের ষোড়শ কলার অর্চনা করিবে…ললিতাতন্ত্রে উক্ত আছে, শক্তির কুলাগারে তিনটি প্রবাহিনী নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি নাড়ী চান্দ্রী জল, আর একটি সৌরী নাড়ী রজঃ এবং আগ্নেয়ী নাড়ী বীজ ক্ষরণ করে। সাধক এই তিনটি নাড়ীর অর্চনা করিবেন।…

…উত্তর তন্ত্রে কথিত আছে, রক্তচন্দনচর্চিত মদনাগারে প্রথমে ভগমালা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ত্রি-তারা-মন্ত্র পাঠ করিবে, তাহার পরে 'ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লং ব্লং ভগমালিন্যৈ নমঃ ঐং হ্রীং শ্রীং' এই মন্ত্রে গন্ধাদি উপচার দ্বারা অর্চনা করিবে। পরে ঐ মদনাগারে নিজ ইষ্ট-দেবতার পূজা কর্তব্য…পরে নিজ লিঙ্গের অর্চনা করিবে, 'ওঁ নমঃ শিবায়' ইহাই নিজ শিব-লিঙ্গের পূজার মূলমন্ত্র…তৎপরে শক্তির অঙ্গে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, ইত্যাদি দেবতার পূজা করিবে… ত্রিকোণ মধ্যে অবধূতেশ্বরী, কুব্জা, কামাখ্যা, সমরা, চক্রেশ্বরী, কালিকা… অর্চনা করিবে। অনন্তর শক্তিকে তাম্বুল প্রদান-পূর্বক তাহার অনুমতি লইয়া গজতুণ্ডমুদ্রা দ্বারা কুলাগারে নিজ শিব নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপের মন্ত্র —'ধর্মাধর্মহবির্দীপ্ত ‥।'—অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্মরূপ হবির্দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মরূপ অগ্নিতে মনোরূপ স্রুক্ দ্বারা সুষুম্নাপথে ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সকলকে আহুতি দিতেছি। …এইরূপে শক্তিসঙ্গত হইয়া অক্ষুভিতচিত্তে অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তরশত ত্রিভুবনেশ্বরীর মন্ত্র জপ করিবে। পরে শুক্রত্যাগকালে "প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাম ‥" এই মন্ত্র অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া পাঠ করিবে।

"জ্ঞানার্ণবে বিশেষভাবে বিবৃত আছে যে, শিবশক্তি-যোগের নামই যোগ, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এই স্থলে শীংকার মন্ত্রজপ, বাক্য স্তব, আলিঙ্গন কস্তুরী, চুম্বন কর্পূর, নখক্ষত দন্তক্ষত প্রভৃতি বহুবিধ কুসুম, মথন তর্পণ ও বীজপাত বিসর্জন বোদ্ধব্য ॥

"কুলার্ণবে উক্ত আছে,—আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দন, দর্শন, স্পর্শন, যোনিবিকাশ, লিঙ্গঘর্ষণ, প্রবেশ ও স্থাপন শক্তি-পূজার এই নয়প্রকার পুষ্প।…

"জ্ঞানার্ণবে উক্ত আছে,…এই কুলদ্রব্য শিবশক্তিময় জীবামৃত, ইহা পরব্রহ্মস্বরূপ…এই কুলদ্রব্য শোধন করতঃ অর্ঘ্যপাত্রে……অর্চনা করিলে সাধক নির্বিকল্প হইতে পারেন।

"…সুগন্ধি কুসুম ও অক্ষতের সঙ্গে এই শুক্র অর্ঘ্যজলে মিশাইয়া ঐ কুলাগারেই দেবীর অর্চনা করিবে।" ('তন্ত্রসার', বসুমতীর নূতন দশম সংস্করণের বঙ্গানুবাদ—পৃঃ ৬১৮–৬৩৬)

এখানে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যে, যেখানেই যৌনমিলন সাধনার অঙ্গ-রূপে পরিগণিত, সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা বা ব্যভিচারের একটা স্থান আছে, কিন্তু তাই বলিয়া এই সাধনা যে অসংযত ইন্দ্রিয় ভোগের নামান্তর মাত্র বা ধর্মের আচরণে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া—এই ধারণা অজ্ঞতা ও

অবিবেচনা-প্রসূত। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি হয়তো মানবিক দুর্বলতাবশতঃ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া এই সাধন-পদ্ধতি বা ইহার আদর্শ যে নিন্দনীয়, তাহা নয়।

এই তন্ত্রধর্মের উদ্দেশ্যটি সর্বাগ্রে বিচার করিতে হইবে। কি হিন্দুতন্ত্র কি বৌদ্ধতন্ত্র—উভয় তন্ত্রেরই আদর্শ হইতেছে 'ভোগ-মোক্ষ'—ভোগের মধ্য দিয়া মোক্ষ-লাভ। ভোগের দ্বারা ভোগ-লালসা ক্রমাগত বর্ধিত হইতে পারে—এই আশঙ্কায় তান্ত্রিকাচার্যগণ কঠোর বিধান করিয়াছেন। যিনি পঞ্চ-'ম'-কার আশ্রয় করিবেন, তিনি হইবেন 'বীর'-সাধক। প্রকৃত অধিকারী ছাড়া কেহ কুলমার্গের সাধক হইতে পারে না। সেইজন্য আচার্যগণ নানা তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ এই পথের কঠোরতা ও সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। পঞ্চ-'ম'-কার অবলম্বন করিলেই যে সিদ্ধিলাভ হয় না, একথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'কুলার্ণবতন্ত্র'-এ আছে :

"মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি ॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ ॥"[৫১২]

এ-সাধনা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া ঐ তন্ত্রের ঐ দ্বিতীয় উল্লাসেই উক্ত হইয়াছে। কুলমার্গের গূঢ় রহস্য না জানিয়া এবং অধিকারী না হইয়া যে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে কেবল সাঁতার দিয়া অপার সমুদ্র পার হইতে চায় :

"কুলধর্মমজানন্ যঃ সংসারান্মোক্ষমিচ্ছতি।
পারাবারমপারং সঃ পাণিভ্যাং তর্তুমিচ্ছতি ॥"

অতি দুষ্কর এই সাধন-পথ। ইহা খড়্গ-ধারের উপর গমন বা ব্যাঘ্রের কণ্ঠালিঙ্গন বা হস্ত দ্বারা সর্প-ধারণের মত বিপজ্জনক ব্যাপার :

"কৃপাণধারাগমনাদ্ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলসেবনম্ ॥"[৫১৩]

৫১২। কুলার্ণবতন্ত্র, ২য় উল্লাস (রসিকমোহন ও আগমানুসন্ধান সং)

৫১৩। কুলার্ণবতন্ত্র, দ্বিতীয় উল্লাস (রসিকমোহন ও আগমানুসন্ধান সং)

কুলার্ণবতন্ত্রের ঐ দ্বিতীয় উল্লাসেই আছে যে ভোগাকাঙ্ক্ষায় সুরাপান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত উত্তপ্ত সুরা দ্বারা তাহার মুখ দগ্ধ করা—অর্থাৎ মৃত্যু।

"সুরাপানে কামকৃতে জলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনির্দগ্ধে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"

'তন্ত্রসার'-এ কুলাচার-প্রকরণ-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, কেবল কাম-ভোগেচ্ছায় প্রকৃতি-সাধন করিলে রৌরব-নরকে গমন করিতে হয়:

"অর্থাদ্ বা কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ।
লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"[৫১৪]

প্রকৃত সাধককে সত্যই 'বীর' হইতে হইবে। সে হইবে সমস্ত ভোগ-কামনা-বর্জ্জিত। তাই তন্ত্রগ্রন্থে "একাকী ভোগরহিতো নারীং গচ্ছেৎ", "নির্বিকারেণ কামিনীমধ্যে জপঞ্চরেৎ" প্রভৃতি বাক্য পাওয়া যায়। তান্ত্রিক আচার্যগণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ক্রিয়াজ্ঞান-বিশিষ্ট, তত্ত্বজ্ঞ গুরু ব্যতীত এই কঠিন সাধনা বিকৃত হইতে পারে। তাই তাঁহারা সাধারণের চক্ষে আপত্তিজনক আচার সকল সম্প্রদায়ের সাধকের জন্য নির্দিষ্ট করেন নাই। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা পঞ্চমকারের রূপক ও আধ্যাত্মিক অর্থ কল্পনা করিয়া আপত্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নিরঞ্জন পরমব্রহ্মের জ্ঞানই মদ্য। যে কর্ম দ্বারা ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা যায়, তাহাই মাংস। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত শিবের কাল্পনিক সংযোগই মৈথুন।[৫১৫] 'ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়তন্ত্র'-এর চতুর্থ পটলে পঞ্চম-কারের রূপক ব্যাখ্যা আছে।[৫১৫ক]

৫১৪। 'তন্ত্রসার'—'কুমারী তন্ত্র' হইতে উদ্ধৃত (বসুমতী সং)—পৃঃ ৬২৭

৫১৫। যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্তিতম্॥
মাং সনোতি হি যৎ কর্ম তন্মাংসং পরিকীর্তিতম্।
ন চ কায়প্রতীকস্তু যোগিভির্মাংসমুচ্যতে।
কুলকুণ্ডলিনীশক্তি র্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্॥
—বিজয়তন্ত্র ('তন্ত্রকথা'-গ্রন্থে উদ্ধৃত)

৫১৫ক। ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়তন্ত্র, ৪র্থ পটল (রসিকমোহন সং)—পৃঃ ১৪

পঞ্চমকারের এই প্রকার আরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে।

মূলাধার-স্থিত সুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া সুষুম্নাপথে সহস্রদলে নীত করিলে তত্রাবস্থিত শিবের সহিত কুণ্ডলিনী-শক্তির মিলন বা সমরসতাপ্রাপ্তিতে সাধকের হৃদয়ে যে আনন্দানুভূতি জাগ্রত হয়, তাহাই 'মৈথুন'। এই আনন্দের অনুভূতিতে সহস্রার হইতে যে অমৃত-ক্ষরণ হয়, তাহাই 'মদ্য'। জ্ঞান-খড়্গের দ্বারা পাপ ও পুণ্য-রূপ পশুবলি দিয়া 'মাংস' ভক্ষণ করা অর্থে পাপপুণ্য-মুক্ত হইয়া সাধকের পরমাত্মাতে চিত্তলয় বুঝায়। চিত্তলয়ের জন্য বাহ্য ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া অন্তর্মুখী করাই 'ম্যৎস'-ভক্ষণ এবং কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহার সেবা করাই শক্তি-সাধনা।[৫১৬]

নিম্নরূপ আর একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখাও পাওয়া যায়। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে সুধা অনবরত ক্ষরিত হইতেছে তাহাই মদ্য, মাংস অর্থে বাক্ সংযম, অর্থাৎ 'মা' শব্দ দ্বারা রসনা ও তাহার অংশ বাক্য বুঝায়, সেই বাক্য-ভক্ষণই মাংস-ভক্ষণ এবং গঙ্গা-যমুনা বা ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যে রজঃ ও তমঃ-রূপী যে দুই মৎস্য চরিতেছে, তাহাদের যে ভক্ষণ করিতে পারে, সে-ই প্রকৃত মৎস্য-সাধক। সহস্রার-মহাপদ্মের কর্ণিকা-মধ্যে শ্বেতবর্ণ পারদের ন্যায় চন্দ্র-সূর্যেরও অধিক জ্যোতির্ময় যে অতীব কোমল স্নিগ্ধ কুণ্ডলিনীরূপ আত্মা বিরাজ করেন, তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনিই মুদ্রা-সাধক। শিব-শক্তির বা আত্মা ও কুলকুণ্ডলিনীশক্তির যে মিলন, তাহাই মৈথুন। যে সাধক ইহা সম্পন্ন করিতে পারেন, তিনিই মৈথুন-সাধক।

একটি বিষয় তন্ত্রের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কতকগুলি তন্ত্রে দেখা যায়, ষট্‌চক্রভেদ সম্বন্ধে এক-একটি অধ্যায় আছে। অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিয়ার সঙ্গে এই যোগক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। সাধকের নিজ দেহ-স্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করিয়া আনন্দ-রসধারা-পান তান্ত্রিকদের একটি ক্রিয়া। মূল শক্তি-উপাসনার ইহা একটি অঙ্গ-স্বরূপ।

প্রকৃতির বিকাশ তান্ত্রিকেরা তিনভাবে অনুভব করেন। নিত্যা প্রকৃতি তিনভাবে অভিব্যক্ত—মানবদেহে সূক্ষ্মরূপে, বিবিধ বর্ণমধ্যে জ্যোতি-রূপে ও নারীতে স্থূলরূপে।[৫১৭] তান্ত্রিক উপাসনায় এই তিনরূপের সামঞ্জস্য করা হয়। প্রথম,

৫১৬। কুলার্ণবতন্ত্র,—৫ উল্লাস, ১০৫—১১৩

৫১৭। সর্বোল্লাসতন্ত্র—উল্লাস ৬৩।২৩, ৬২।২৭ ইত্যাদি।

সূক্ষ্মরূপে কুলকুণ্ডলিনী-স্বরূপিনী প্রকৃতি মূলাধারে বিরাজমানা, তাহাকে সহস্রসারে শিবের সঙ্গে মিলন করা, দ্বিতীয়, বর্ণ ও রেখাত্মক যন্ত্র-মধ্যে বহিঃপূজা দ্বারা জ্যোতি-স্বরূপিণী প্রকৃতিকে উপাসনা, এবং তৃতীয়, পঞ্চমকারাদি দ্বারা প্রকৃতির স্থূল বিগ্রহ-রূপিণী নারীকে উপাসনা। মায়াভিভূত, সৃষ্টি-লীলাভিব্যক্ত পরব্রহ্মই মূলে শাক্তের উপাস্য। শক্তি তো পরমশিব বা ব্রহ্মেরই ব্যক্ত রূপ। তারা তাই 'ব্রহ্মময়ী'। পরমহংসদেবের কথা—"কালীই তো ব্রহ্ম রে।" ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের মিলনই তান্ত্রিক সাধনার বৈশিষ্ট্য। ভাণ্ডেই প্রকৃতিকে ভাব ও ক্রিয়ার দ্বারা পূজা করিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্রহ্মের মিলন বা শিব-শক্তির মিলন করাইয়া ব্রহ্মানন্দ-উপলব্ধিই তান্ত্রিকের মূল উদ্দেশ্য।

তন্ত্রের এই প্রকৃতি-সাধন ও মন্ত্রাদি-গ্রহণ যে বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বেদ এবং উপনিষদের মধ্যেও যে ইহার ছায়াপাত হইয়াছে প্রকৃতি-সাধনের মূলবীজ যে উপনিষদের মধ্যেই নিহিত, এ-কথা আমি পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাঁহারা তন্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।[৫১৮] অবশ্য পরবর্তী সময়ে চীনা ও তিব্বতী প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছিল। উহাই চীনাচার নামে পরবর্তী তন্ত্রসমূহে উল্লিখিত এবং উহার প্রবর্তক বশিষ্ট মুনি বলিয়া কথিত।

এই 'ভোগ-মোক্ষ'-সাধনা বহুদিন হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া নানা গ্রন্থে ও কাব্য-সাহিত্যাদিতে ইহার নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। ইহা পূর্বে উল্লেখ করিরাছি। বাংলায় চারিশত বৎসরব্যাপী বৌদ্ধ-সাধনা এই ভোগ-মোক্ষের সাধনা—এই প্রকৃতি-মিলনাত্মক তন্ত্র-সাধনা। তাহার পরবর্তী সময়ে বাংলায় চৈতন্যদেবের ধর্মমত-প্রচারের পূর্ব পর্যন্ত এই হিন্দুতন্ত্র-সাধনা প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহার পরেও আধুনিক কাল পর্যন্ত এক শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে তন্ত্র-সাধনা সশ্রদ্ধ আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শ্রেণীই সমাজের তথা-কথিত উচ্চশ্রেণী—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি। এখনও বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের অধিকাংশের ধর্ম শাক্তধর্ম—কুলগুরু শাক্ত এবং বংশ-পরম্পরা তাঁহারা তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এখনও অনেক শাক্ত-তান্ত্রিক গুরুবংশ বাংলায় বিদ্যমান। বহু তান্ত্রিক আচার্য ও সাধক বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ

৫১৮ দ্রষ্টব্য : **Shakti and Shakta**—Sir J. Woodroffe —Pages 440—48.

অনেক তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা এবং বিখ্যাত শাক্ত সাধক বলিয়া পরিচিত। সাধক হিসাবে ত্রিপুরা জেলার মেহারের সর্বানন্দ ঠাকুরের নাম বাংলায় সুপরিচিত। অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে তাঁহার শব-রূপী ভৃত্যের দেহের উপর উপবিষ্ট হইয়া শব-সাধনা দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। চাঁদ রায় কেদার রায়ের গুরু গোঁসাই ভট্টাচার্যের নাম বিখ্যাত। তাঁহার নির্মিত দেবীর দুইখানি যন্ত্র এখনও তাঁহার বংশধরদের গৃহে রক্ষিত আছে। তারাপীঠের মহাশ্মশানাশ্রয়ী বামা ক্ষেপার নাম বাংলায় বিশেষ পরিচিত। তারপর বাঙালীর চিরপ্রিয় রামপ্রসাদ—যিনি গাহিয়াছেন—"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে"—তিনিও এই তান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যতম। বাঙালীর অন্যতম গৌরব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এক ব্রাহ্মণী ভৈরবীর নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে নানা তান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ী আজ সারা ভারতে পরিচিত। সাধন-জীবনের প্রথমে তিনি কি আচারে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনো প্রমাণিক জীবনচরিতে কিছু উল্লেখ নাই, তবে পরবর্তী জীবনে তিনি দিব্যাচার, অথবা সমস্ত আচারের অতীত অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

এখন হিন্দু তন্ত্রসাধনার সঙ্গে বাউল-সাধনার প্রভেদ ও সাদৃশ্য কি দেখা যাক।

প্রভেদ ঃ

(ক) প্রকৃতি-সাধন হিন্দুতন্ত্রের একমাত্র সাধনা বা মূলক্রিয়া নয়। ইহা সাধনার একটি অঙ্গবিশেষ।

(খ) হিন্দুতন্ত্র-সাধনায় যোগমূলক প্রকৃতি-মিলনের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

(গ) হিন্দুতন্ত্রের প্রকৃতি-সাধনে বিন্দু-চ্যুতির বর্ণনা আছে, কিন্তু বাউল-সাধনে বিন্দু-স্থৈর্য ও বিন্দুর উর্ধ্বগতি-দানই ভিত্তি। একটি তন্ত্রে স্তম্ভনের উল্লেখ আছে বটে, উহা জপের সুযোগ-মূলক একটি সামান্য ক্রিয়ামাত্র মনে হয়। মুদ্রিত এবং প্রচলিত কোনো তন্ত্রে বিন্দু-নিরোধের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সাদৃশ্য ঃ

(ক) ধর্মের অঙ্গ-স্বরূপ প্রকৃতি-সাধন।

(খ) রজঃ-প্রবৃত্তির মধ্যে মিলন।

(গ) শুক্রকে একেবারে পরমতত্ত্ব মনে না করিলেও উহাকে পবিত্র শিবশক্তিময় জীবামৃত', 'পরব্রহ্মস্বরূপ' প্রভৃতি মনে করা হইয়াছে।

বৌদ্ধতন্ত্রে প্রকৃতি-মিলন

এইবার বৌদ্ধতন্ত্রানুসারে প্রকৃতি-মিলনের স্বরূপ কি দেখা যাক।

প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন দ্বারা নির্মাণকায়ে অর্থাৎ মণিপুরচক্রে বোধিচিত্ত উৎপাদন করা হয়। এই বোধিচিত্ত চঞ্চল, ক্ষরণোন্মুখ বিন্দু। ইহাকে বৌদ্ধ-সহজিয়ারা 'সংবৃত্তিবোধিচিত্ত' বা 'বারুণী' নামে অভিহিত করিয়াছে। এই চঞ্চল বিন্দুকে যোগ-প্রক্রিয়া দ্বারা স্থির করিয়া ঊর্ধ্বমুখে চালনা করিয়া উষ্ণীষ-কমলে লইয়া যাওয়াই মূলতঃ বৌদ্ধসহজিয়া-সাধনা। এই চঞ্চল বিন্দু পতিত হইলে সাধনার মূলোচ্ছেদ হইবে। সে জন্য সর্বদা বিন্দুকে রক্ষা করিতে হইবে। 'রতিবজ্র'-এ উক্ত হইয়াছে :

"পতিতে বোধিচিত্তে তু সর্বসিদ্ধিনিধানকে।
মূর্ছিতে স্কন্ধবিজ্ঞানে কুতঃ সিদ্ধিরনিন্দিতা॥"[৫১৯]

বোধিচিত্তের দুইরূপ—বিবৃত ও সংবৃত। একটি স্থূল শুভ্ররূপ, অপরটি সূক্ষ্ম অচঞ্চল মহাসুখ-রূপ। 'হেবজ্রতন্ত্র'-এ আছে :

"বোধিচিত্তম্ উৎপাদয়েৎ বৈবৃত্তি-সংবৃত্তি-রূপকম্।
সংবৃতং কুন্দসঙ্কাশং বিবৃতং সুখরূপিণম্॥"[৫২০]

এই সংবৃতবোধিচিত্তের পতন নিরুদ্ধ করিয়া ঊর্ধ্বে পরিচালিত করিতে হইলে যোগের সাহায্য লইতে হইবে। এই যোগকে বৌদ্ধতন্ত্রে ষড়ঙ্গযোগ বলা হইয়াছে। 'গুহ্যসমাজতন্ত্র'-এ আছে :

"সেবাং ষড়ঙ্গযোগেন কৃত্বা সাধনমুত্তমম্।
সাধয়েদন্যথা নৈব জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা॥
প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোঽথ ধারণা।
অনুস্মৃতিঃ সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গা যোগ উচ্যতে॥"[৫২১]

৫১৯। বৌদ্ধগানের টীকা—১, ৩, (শাস্ত্রী সং)—১নং গানের টীকায় ও কৃষ্ণাচার্যপাদের দোহাকোষের টীকায় উদ্ধৃত—পৃঃ ২ ও ১২৮ (শাস্ত্রী সং)

৫২০। হেবজ্রতন্ত্র, পুঁথি পৃঃ ৪৭ (খ) ৪৮ (ক)

৫২১। গুহ্যসমাজতন্ত্র, অষ্টাদশ পটল (বরোদা সং)

প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অনুস্মৃতি, সমাধি—এই ছয়টি অঙ্গ-বিশিষ্ট যোগের কথা বলা হইয়াছে। মূলে ইহা পাতঞ্জল মতেরই যোগের অঙ্গ, কেবল যম-নিয়ম-আসন বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং একটি অঙ্গ (অনুস্মৃতি) যুক্ত হইয়াছে। গোরক্ষমতেও যোগ ষড়ঙ্গ। এই ছয়টি অঙ্গের নাম নিম্নরূপ :

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি ভবন্তি ষট্॥"[৫২২]

'অমৃতনাদ-উপনিষদে' এইভাবে ষড়ঙ্গযোগের উল্লেখ আছে :

"প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোঽথ ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে॥"[৫২৩]

'তর্ক'-শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 'আগম-অবিরোধী বাক্য' বলিয়া :

"আগমস্যাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে॥"

গুহ্যসমাজতন্ত্রে প্রত্যাহারকে বাহ্য রূপ ও বিষয় হইতে দশেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি এবং পার্থিব বিষয়সমূহের শূন্য-জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ধ্যান-অর্থে 'পঞ্চ-কাম'কে পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ বলিয়া অনুভব করা। এই ধ্যান পঞ্চপ্রকারের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যথা,—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা।[৫২৪] প্রাণায়াম-অর্থে প্রাণ-বায়ু বা নিশ্বাস-প্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণ। এই প্রাণ-বায়ু পঞ্চভূত ও পঞ্চবুদ্ধাত্মক। বামনাসিকা বা ললনায় যে শ্বাস-বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা পঞ্চস্কন্ধের জ্ঞানাত্মক ও পঞ্চভূতের প্রতীক ("পঞ্চভূতস্বভাবকম্") এবং দক্ষিণনাসায় বা রসনায় শ্বাস-বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা পঞ্চবুদ্ধাত্মক। এই উভয় বায়ু সম্মিলিত করাইয়া নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ পদ্ম ভেদ করিয়া ললাটে ভ্রূর মধ্যদেশে নাসিকাগ্রে স্থির করিয়া পঞ্চবর্ণ-বিচ্ছুরিত রত্নরূপে অনুভব করা প্রাণায়াম।[৫২৪ক] সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া রত্ন-স্বরূপ প্রাণ-বায়ুকে ভ্রূ-মধ্যগত বিন্দুতে রক্ষা

৫২২। ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ—১।৪১

৫২৩। অমৃতনাদ উপনিষৎ—শ্লোক ৬, ১৭

৫২৪। "বিতর্কশ্চ বিচারশ্চ প্রীতিশ্চৈব সুখং তথা।
চিত্তস্যৈকাগ্রতা চৈব পঞ্চৈতে ধ্যানসংগ্রহাঃ॥"

৫২৪ক। "নিশার্থ পিণ্ডরূপেন নাসিকাগ্রে তু কল্পয়েৎ।
পঞ্চবর্ণং মহারত্নং প্রাণায়ামমিতি স্মৃতম্॥"

করিয়া হৃদয়-মধ্যে নিজ-মন্ত্র ধ্যানই ধারণা।[৫২৫] এই ধ্যান-সাধনের পর পাঁচটি 'নিমিত্ত' বা চিহ্ন সাধক দর্শন করিয়া থাকেন। সেই চিহ্নগুলি যথাক্রমে—মরীচিকা, ধূম, খদ্যোতাকার, উজ্জ্বল দীপ ও 'নিরভ্র গগন'। পূর্বের সমস্ত যোগ-ক্রিয়া বা যোগের স্তরগুলিকে পুনঃ পুনঃ গভীরভাবে চিন্তা করাই অনুস্মৃতি। এই চিন্তা হইতে 'প্রতিভাস' বা মনে সত্য-জ্ঞানের উদয় হয়[৫২৬] প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনের দ্বারা উদ্ভূত সমস্ত জাগতিক সত্তাকে একটি ঘনীভূত গোলাকার 'বিম্ব'বৎ উপলব্ধি এবং হঠাৎ দিব্যজ্ঞানের অনুভূতিই সমাধি।[৫২৭]

বৌদ্ধতন্ত্রের এই ষড়ঙ্গযোগের অনেক অঙ্গের সঙ্গে হিন্দুতন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের মিল আছে। প্রচলিত যোগশাস্ত্র হইতেই তাহাদের বৌদ্ধতত্ত্বের একটু মিশ্রণ দিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ এইগুলি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যে-প্রাণায়াম বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার মূলভিত্তি, সেই রেচক-পূরক-কুম্ভক হঠযোগের প্রধান ক্রিয়া। প্রত্যাহার সম্বন্ধে পাতঞ্জল যোগদর্শনে আছে:

"স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ"[৫২৮]

স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে যে চিত্তের স্বরূপানুকার অর্থাৎ চিত্ত-নিরোধে যে ইন্দ্রিয়গণও নিরুদ্ধ হয়, তাহাই প্রত্যাহার।

'যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে'-এ আছে যে, প্রত্যাহার পাঁচপ্রকার। পঞ্চেন্দ্রিয়-যুক্ত বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিযুক্ত করিলে পঞ্চবিধ প্রত্যাহার সাধিত হয়।[৫২৯]

৫২৫। "স্বমন্ত্রং হৃদয়ে ধ্যাত্বা প্রাণং বিন্দুগতং ন্যসেৎ।
নিরুদ্ধমিন্দ্রিয়ং রন্ধ্রং ধারয়েদ্ধারণাং স্মৃতম্॥"

৫২৬। "বিভাব্য যদনুস্মৃত্যা তদাকারং তু সংস্করেৎ।
অনুস্মৃতিরিতি জ্ঞেয়ং প্রতিভাসস্তত্র জায়তে॥"

৫২৭। "প্রজ্ঞোপায়সমাপত্ত্যা সর্বভাবান্ সমাসতঃ।
সংহৃত্য পিণ্ডযোগেন বিম্বমধ্যে বিভাবয়েৎ॥
ঝটিতি জ্ঞাননিষ্পত্তি সমাধিরিতি সংশিতম্॥"
গুহ্যসমাজতন্ত্র, অষ্টাদশ পটল (বরোদা সং)—পৃঃ ১৬২-৬৩
সেকোদ্দেশ টীকা (বরোদা সং)—পৃঃ ৩০

৫২৮। পাতঞ্জলযোগদর্শন—২।৫৪

৫২৯। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য—১।৪৭-৪৮

যমাদি-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির আত্মাতে যে-মনের স্থিতি, শাস্ত্র-তাৎপর্য-বেত্তা সাধুগণ তাহাকে ধারণা বলিয়াছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চতত্ত্ব হিসাবে ধারণাও পঞ্চবিধ। জ্ঞান-বৃত্তির একতানই ধ্যান। তৈল-ধারার একতান-প্রবাহ ধ্যানের উপমা। ধ্যান পরিপক্ক হইলে স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটিয়া যে চিত্ত-স্থৈর্য হয়, তাহার নাম সমাধি। সমাধিতে জীবাত্মা-পরমাত্মার সমভাব হয়ঃ

> "সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
> ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥"[৫৩০]

বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনার মূলক্রিয়া হঠযোগের উপর নির্ভরশীল। বিন্দুর পতন-নিরোধ ও উহাকে উর্ধ্বগামী করা নির্ভর করে মুদ্রা, বন্ধ ও বিশেষ করিয়া প্রাণায়াম-ক্রিয়ার উপর। বাম ও দক্ষিণনাড়ীর বায়ুর গমনাগমন রুদ্ধ করিয়া কুম্ভক-অবলম্বনের দ্বারা মধ্যনাড়ী দিয়া বোধিচিত্তকে উর্ধ্বগত করাই এই সাধনার মূল-বিষয়-বস্তু। বাম ও দক্ষিণনাড়ী বা ললনা ও রসনাকে পরিহার করিয়া মধ্যপথ বা অবধূতীকে ধরিয়া চলিতে হইবে। যে ইহাতে কৃতকার্য হইবে, সে-ই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে, অপারগ হইলে সাধনা নষ্ট হইবে। বাম ও দক্ষিণ নাড়ী বা প্রাণ ও অপান-বায়ুর নিয়ন্ত্রণ এবং বোধিচিত্তের পতন-নিবারণ ও উর্ধ্বগতি-দানের বিষয় সহজিয়া বৌদ্ধদের নানা গান ও দোঁহায় সান্ধ্যভাষায় বর্ণিত আছে।[৫৩১]

এই বোধিচিত্তের উর্ধ্বগমনে সাধককে কতকগুলি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। সেই স্তর বা অবস্থাগুলি এবং সাধনের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন অনুভূতি নানা বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বে চারিটি 'চক্র' এবং চারিটি 'কায়', চারিপ্রকার 'মুদ্রা', চারিপ্রকার 'আনন্দ', চারিপ্রকার 'ক্ষণ'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহা স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গমনের অনুভূতি—উত্তরোত্তর বর্ধিত আনন্দের উপলব্ধি।

৫৩০। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য—৮।২, ৯।২-৩, ১০।২

৫৩১। দ্রষ্টব্য 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' (শাস্ত্রী)—গান নং ১, ৪, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ৩২ ইত্যাদি ও টীকা এবং কাহ্নুপাদের দোঁহা নং ৫ ইত্যাদি।

হিন্দুতন্ত্রের চক্রপদ্মের সঙ্গে তুলনার সুবিধার জন্য বৌদ্ধতন্ত্রের এই চক্র ও কায়কে এইভাবে সাজানো যায় :

দেহমধ্যে স্থান	চক্র	কায়	মুদ্রা	আনন্দ	ক্ষণ	দেবী
নাভি	নির্মাণচক্র	নির্মাণকায়	কর্মমুদ্রা	আনন্দ	বিচিত্র	লোচনা
হৃদয়	ধর্মচক্র	ধর্মকায়	ধর্মমুদ্রা	পরমানন্দ	বিপাক	মামকী
কণ্ঠ	সম্ভোগচক্র	সম্ভোগকায়	মহামুদ্রা	বিরমানন্দ	বিমর্দ	পাণ্ডরা
মস্তক	মহাসুখচক্র	সহজকায়	সময়মুদ্রা	সহজানন্দ	বিলক্ষণ	তারা

পূর্বে বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনার সঙ্গে বাউল-সাধনার মিলের কথা নানাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে বাউল-সাধনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

সাদৃশ্য

(ক) তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাধনা ও বাউল-সাধনার মূলক্রিয়া অভিন্ন। বায়ু-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বাম ও দক্ষিণ নাড়ীকে রুদ্ধ করিয়া বিন্দুকে মধ্যপথে পরিচালনা করিয়া উর্ধ্বগত করা উভয়েরই মূলক্রিয়া। এই 'শ্বাসের কাজ' বা 'দমের কাজ'-এর উপর বাউলদের মূলসাধনা নির্ভর করে।

(খ) বিন্দুর স্থৈর্য-সাধন বা বিন্দু-রক্ষা দ্বারা সাধনায় সাফল্যলাভ উভয় ধর্মেরই মূলকথা। এই অটল, বজ্রবৎ দৃঢ় বোধিচিত্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বজ্রসত্ত্ব—দেহস্থিত বুদ্ধ। এই বোধিচিত্তই মহাসুখের আকর। এই বোধিচিত্তের উপলব্ধিতেই মহাসুখ-রূপ নির্বাণ লাভ হয়। বাউলদেরও এই অটল বীজ-রূপী মানুষের উপলব্ধিতে অনির্বচনীয় আনন্দ-স্বরূপ আত্মোপলব্ধিই সাধনার লক্ষ্য। উভয়ের সাধনাই আত্মোপলব্ধি-মূলক এবং উভয়েরই প্রকৃতি-সংযোগের মধ্য দিয়া এই আত্মোপলব্ধি।

প্রভেদ

(ক) ঋতুযুক্তা প্রকৃতি-সাধনের কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন বৌদ্ধতন্ত্রাদির মধ্যে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণাচার্যের দোঁহাকোষের ৩নং দোঁহায় একটি পংক্তি আছে—"বোহিচিঅ রজভূষিঅঅ ফুল্লোহেলসি হুউ।" ইহার টীকায় আছে : "বোধিচিত্তং সাবৃতস্পন্দরূপং শুক্রং রজোভূষিতং অপতিতবোধিচিত্তমিতি ভাবঃ তং চিত্তবজ্রেণাশ্লিষ্টং।" এখানে শুক্রের বিশেষণে 'রজোভূষিত' শব্দটি পাওয়া যাইতেছে। টীকা হইতে বুঝা যায় যে, শুক্র রজোভূষিত হইয়া অপতিত অবস্থায় চিত্ত দ্বারা

বিধৃত বা তৎসংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, বাউলরা পতনোন্মুখ স্থূল শুক্র ও তৎসঙ্গে রজের মিশ্রণকে শোষণ করিয়া ঊর্ধ্বগত করে। যদি দোঁহার এই পংক্তিটির এই অর্থ গৃহীত হয়, তবে বৌদ্ধতান্ত্রিকদেরও ঐরূপ ক্রিয়া ছিল এবং উভয়ের সাধনায় সাদৃশ্য ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

(খ) বাউলদের গানে বা পুঁথিতে বৌদ্ধদর্শনের বা বৌদ্ধতত্ত্ব প্রভৃতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হয় না। 'পঞ্চস্কন্ধ', 'কায়-বাক্-চিত্ত' 'শূন্য', প্রভৃতির কোনো নিদর্শন বা উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব-প্রভাবে বোধহয় সেগুলি মুছিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব-প্রভাবেই 'মহাসুখ' 'মহাভাবে' পরিণত হইয়াছে।

হিন্দুতন্ত্রের ষট্‌চক্র-ভেদের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ বা বাউল-সম্প্রদায়ের প্রকৃতি-মিলনাত্মক যোগ-সাধনার মূলগত একটা ঐক্য একটু চিন্তা করিলেই লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দুতন্ত্র-সাধনার মূল-উদ্দেশ্য শক্তিকে অবলম্বন করিয়া শিবত্ব উপলব্ধি করা। তন্ত্রের শক্তি অদ্বৈত বেদান্তের মায়া নয়, ইহা সাগর ও তরঙ্গের সম্বন্ধবিশিষ্ট ক্ষণিক প্রতিভাস নয়। এই শক্তি শিব হইতে অভিন্ন। উভয়ে উভয়ের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত :

> "ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
> অন্যোন্যঞ্চ প্রবর্তেতে অগ্নিধূমৌ যথা প্রিয়ে॥
> ন বৃক্ষরহিতা ছায়া ন ছায়া রহিতোদ্রুমঃ।"[৫৩২]

শক্তি শিবের সম-তেজস্বিনী, শিবের যথার্থ অর্ধাঙ্গিনী। তিনি সাধারণ অর্থে মায়া নন—তিনি মহামায়া, অনন্তশক্তিধারিণী, শিবের হ্লাদিনী শক্তিবিশেষ।

শক্তি ব্যতিরেকে শক্তিমান মূল্যহীন। আসলে শক্তিমান বা শিব শক্তিরই শক্তিহীন বা উপাধিহীন পরমাবস্থা। শক্তি-যুক্ত শিবই সর্বতোমুখ—সর্বক্ষমতা-সম্পন্ন। তিনি সর্বাকারে স্ফুরিত হইতেও যেমন সক্ষম, সকল আকারকে সংবৃত করিতেও তেমনি সক্ষম। প্রসরণেও তাঁহার সামর্থ্য, সংকোচনেও তাঁহার সামর্থ্য বিদ্যমান। স্বশক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বশক্তি-বলে শিব বিশ্ব-চরাচরের আভাসক। যাহা নিরাভাস বা অব্যক্ত ছিল, শক্তির প্রসরণে তাহা ভাসিত বা বিকশিত হয়। আবার শক্তির সংকোচে যাহা আভাসিত বা ব্যক্ত ছিল, তাহা নিরাভাস বা অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। শক্তির প্রসারই সৃষ্টি, সংকোচই সংহার;

৫৩২। Kaulajnannirnaya —XVII, 8-9 (Dr. Bagchi edition—Page 42).

প্রসার ও সংকোচের যাহা আদি ও অন্ত, তাহাই সাম্যাবস্থা, তাহাই নিরাভাস, তাহাই শিবাবস্থা। অতএব জগতের আভাসই শক্তি-ভাব এবং নিরাভাসই শিব-ভাব।[৫৩৩]

এই শক্তি-ভাব বা আভাস বৈচিত্র্যময়ী, নানারূপ-সৃষ্টিকারিণী ও পরিণামী। কিন্তু এই নানারূপ ও বৈচিত্র্যের পশ্চাতে এক নিত্য সদ্‌বস্তু আছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। সেই অপরিবর্তনীয় সদ্‌বস্তুই শিব। শিব হইতেই শক্তির আবির্ভাব এবং শক্তি হইতেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—ত্রিলোক, চতুর্দশ ভুবন প্রভৃতির উৎপত্তি। কিন্তু তবুও শিব ও শক্তি সূর্য ও সূর্য-কিরণ, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি প্রভৃতির মতো অভিন্ন। সেইজন্যই শক্তির সাধনা ব্যতীত শিবত্বের উপলব্ধি হয় না। শক্তির উপাসনাই সাধন-ক্রিয়া, শিবত্ব-লাভই তাহার ফল।

তান্ত্রিক সাধনা দ্বৈতধারা অবলম্বন করিয়া আরম্ভ করিয়া অবশেষে অদ্বৈত-জ্ঞানে উপনীত হইয়াছে। এই অদ্বৈততত্ত্বই মোটামুটি শৈব ও শাক্ত আগম এবং তন্ত্রের পরমতত্ত্ব। শাক্তাগম ও তন্ত্রাদিতে শিব ও শক্তি অভিন্ন ও এক। এক মহাশক্তিই সত্য, শিব বস্তুতঃ সেই মহাশক্তিরই উপাধিহীন পরমাবস্থা। আবার শৈবাগম ও তন্ত্রাদিতে শক্তি পরমশিবের একটা বিশিষ্ট অবস্থা-জ্ঞাপক। শাক্ত ও শৈব উভয় মতেই মূলতত্ত্বটি অদ্বয়, শাক্তমতে তিনি মহাশক্তি, তত্ত্বাতীত হইয়াও সর্বতত্ত্বাত্মক। মহাশক্তির গুণ ও ক্রিয়াত্মিকা মূর্তির দ্বারা শিব যেন আচ্ছন্ন—এই মহাশক্তিই অদ্বৈততত্ত্ব-রূপে পরমতত্ত্ব। আবার শৈব মতে শিবই মূলতত্ত্ব, শক্তি তাঁহারই একটা প্রকাশমান অবস্থা বিশেষ। শাক্ত ও শৈব মতে শক্তি ও শক্তিমানের প্রাধান্যের তারতম্য মাত্র, কিন্তু উভয় মতেই এক ব্যতীত অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। শক্তি ব্যতীত শক্তিমান অগ্রাহ্য। শক্তিহীন শিব ও শিবহীন শক্তি কল্পনাতীত :

"শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।
অন্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব ॥"[৫৩৪]

এখন তন্ত্রের সাধনা হইতেছে এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া শিবত্বে উপনীত হওয়া। এই শিবত্বের স্বরূপ কি? অপূর্ব আনন্দময়ত্ব,—'শিবোঽহং'-অর্থে অপূর্ব

৫৩৩। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি—৪।১৩, ১৬ ইত্যাদি (ডাঃ মল্লিক সং) এবং সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ—৪।১৬ (কবিরাজ সং)

৫৩৪। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ—৪।৩৭ (কবিরাজ সং)

আনন্দের উপলব্ধি। এই আনন্দ উৎপন্ন হয় কিসে? দুইটি তত্ত্বের মিলনে। শক্তি-রূপে অভিব্যক্ত বা প্রকাশমান ও নিশ্চল শুদ্ধ রূপে অবস্থিত দুইটি তত্ত্বের মিলনে। দুইটি তত্ত্বকে প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বা দ্বৈতধারায় উপলব্ধি করিয়া উভয়ের মিলন ঘটাইলে উভয় তত্ত্বের সামরস্যে বা অদ্বয়ে উপজাত যে আনন্দ, সেই কেবলানন্দই সাধকের চরম লক্ষ্য। এই সামরস্য-সাধনই তান্ত্রিক সাধনার মূলবিষয়।

শিবের বিমর্শাবস্থা বা শক্তির প্রকাশই এই জড়জগৎ। এই দেহ-ভাণ্ড সেই জড়ের প্রকাশ-রূপ। তন্ত্র ভাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে অভেদ কল্পনা করিয়াছে এবং মূলাধারে শক্তির স্থান এবং মস্তকে শিবের স্থান নির্দেশ করিয়াছে। সূক্ষ্মরূপে এবং অদৃশ্যরূপে কুণ্ডলিনী-আকারে শক্তি মূলাধারে নিদ্রিতা। এই শক্তি তন্ত্রে নারী-রূপে কল্পিতা। তিনি স্বীয় পতি সহস্রার-স্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত হইলে উভয়ের মিলন-জনিত আনন্দ সাধক উপলব্ধি করিয়া সাধনায় সিদ্ধ হইবেন।

কুণ্ডলিনী-শক্তি এবং শিব যেমন একই দেহে অবস্থান করিতেছেন, স্থূলভাবে পার্থিব স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও তেমনি অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং উভয়ের মিলনানন্দ শিব-শক্তির মিলনানন্দ রূপেই কল্পিত হইয়াছে। এই মিলন-সাধনও কুণ্ডলিনী-মিলনের মতো তন্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

হিন্দুতন্ত্রের যোগ-সাধনা ও বৌদ্ধতন্ত্রের যোগ-সাধনার প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে উভয় পথের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

পূর্বে কুণ্ডলিনী-যোগক্রিয়ার যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, কুম্ভকের দ্বারা অপান-বায়ু নিরুদ্ধ করিলে মণিপুরচক্রের অগ্নি-মণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে, তাহাতেই কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হয়। নাভির নিম্নে অগ্নির স্থান। বৌদ্ধতন্ত্রে এবং বৌদ্ধ গান ও দোঁহার অনেকস্থলে দেখা যায়, বজ্রকমল-সংযোগে নির্মাণচক্রে (হিন্দুতন্ত্রের মণিপুরচক্রে) অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এই অগ্নিকে নারী-স্বরূপিণী কল্পনা করিয়া উহাকে 'চণ্ডালী' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ঊর্ধ্বগমনের সময় প্রত্যেক চক্রের সমস্ত তত্ত্ব, বীজ ও শক্তিকে ধ্বংস করিয়া আত্মসাৎ করে, সেই রূপ এই চণ্ডালীও এই নির্মাণকায়ে প্রজ্বলিত হইয়া সকলকে ধ্বংস করে। 'হেবজ্রতন্ত্র'-এ আছে :

"চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ দহতি পঞ্চতথাগতান্।
দহতি চ লোচনাদীনি দগ্ধে হুং স্রবতে শশী ॥"[৫৩৫]

৫৩৫। হেবজ্রতন্ত্র, পুঁথি—পৃঃ ৪ (ক)

চণ্ডালী নাভি-প্রদেশে প্রজ্বলিত হইয়া পঞ্চস্কন্ধের অধিপতি পঞ্চতথাগতকে এবং ঐ চক্রের শক্তি লোচনাকে দগ্ধ করে। যখন সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বোধিচিত্ত-রূপী চন্দ্র 'হুঁ'কারাত্মক বজ্রজ্ঞান বর্ষণ করে। গুণ্ডরীপাদের একটি পদে আছে :

"কমল-কুলিশ-মাঝে ভইঅ মিঅলী।
সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী।"[৫৩৬]

টীকা—"প্রজ্ঞোপায়সমতাং সত্যাক্ষরমহাসুখরাগানিলাবার্তায়াভৌ নির্মাণচক্রে চণ্ডালী জ্বলিতা মম।"

ভুসুকুপাদের একটি পদেও আছে :

"আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥"[৫৩৭]

চণ্ডালী সম্বন্ধে টীকায় আছে—"যস্মাৎ নিজগৃহিণীহপরিশুদ্ধাবধূতীবায়ুরূপা"।

চণ্ডালী হইতেছে প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন দ্বারা নির্মাণচক্রে প্রথম যে তেজ বা অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহাই। ইহাকে 'মহসুখরাগাগ্নি' বলে।

হিন্দুতন্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলার ক্রিয়ার মিলনে বা কুম্ভক করিয়া মধ্যনাড়ী বা সুষুম্নার মধ্যদিয়া কুণ্ডলিনী-শক্তিকে চালিত করিতে চেষ্টা করিলে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে। সহজিয়া-বৌদ্ধেরা বামনাড়ীকে ললনা এবং দক্ষিণনাড়ীকে রসনা বলিয়াছেন। ইহারাই চন্দ্র ও সূর্য বা প্রজ্ঞা ও উপায়। ইহাদের আলিঙ্গনে অবধূতী-মার্গ উন্মিলীত হয়। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে এই চন্দ্র-সূর্যের ক্রিয়া হয়। বোধিচিত্ত-উৎপাদনে এই দুই নাড়ীই ক্রিয়াশীল। যখন এই দুই নাড়ীর ক্রিয়া মিলিত করিয়া, কুম্ভকের দ্বারা মধ্যপথ অবধূতীতে সেই বোধিচিত্তকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা হয়, তখন যে মিথুনানন্দের অনুভূতি জাগে, তাহাই চণ্ডালী। ইড়া ও পিঙ্গলার মিলন বা প্রাণ ও অপান-বায়ুর সম্মিলন দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর প্রথম জাগরণে যে তেজঃ-শক্তির ক্রিয়া ঘটে, তাহা এবং প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে বাম ও দক্ষিণনাড়ী একত্রিত করিয়া অর্থাৎ প্রাণ ও অপান-বায়ুর ক্রিয়া মিলিত করিয়া অবধূতিতে চালনা করার যে শক্তিশালী অনুভূতি জাগে—ইহারা উভয়েই

৫৩৬। চর্যাপদ—নং ৪৭

৫৩৭। ঐ—নং ৪৯

মূলতঃ সমান। সাধন-মার্গে উভয় অনুভূতিই বায়ুর ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনায় প্রাণায়ামের স্থান আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। কি প্রকৃতি-বর্জিত বিশুদ্ধ যোগ, কি মিথুনাত্মক যোগ—উভয়ক্ষেত্রেই বাম, দক্ষিণ ও মধ্যনাড়ী অবলম্বন করিয়া বায়ুর ক্রিয়াই মূলসাধনা। সুতরাং কুণ্ডলিনীযোগ ও প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক যোগের মধ্যে মূলতঃ ঐক্য বর্তমান।

চণ্ডালী অবধূতীর প্রথম রূপ। সম্যক্ পরিশুদ্ধিহীন অবস্থাই চণ্ডালী। সাধনায় পরিশুদ্ধ হইয়া ক্রমে চণ্ডালী ডোম্বী-আকার ধারণ করে। তাহার পর শবরী বা নৈরাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। মূলতঃ ইহা একই শক্তির নানা অবস্থাবিশেষ। সহজিয়া-বৌদ্ধদের নানা চর্যাপদে এই চণ্ডালী, ডোম্বী, শবরী প্রভৃতির উল্লেখ আছে।[৫৩৮]

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ বলেন :

"বলা বাহুল্য, তন্ত্রশাস্ত্রে শিব ও শক্তির যে স্থান কিংবা যে তাৎপর্য, বজ্রযান ও সহজযানের শূন্যতা ও করুণা অথবা বজ্র ও কমলেরও অনেকাংশে সেই স্থান ও তাৎপর্য। সুতরাং অর্বাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে যে শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা বর্ণিত দেখা যায় অথবা যেখানে বজ্রের সঙ্গে কমলের সংঘটনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তির মিলনই বুঝিতে হইবে। তন্ত্রে যন্ত্রমধ্যে এই মিলন বুঝাইবার জন্য দুইটি সমকেন্দ্র ত্রিকোণ—একটি ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ ও একটি অধোমুখ ত্রিকোণ—পরস্পর জড়িতরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই ত্রিকোণদ্বয়কে সাধারণতঃ ষট্‌কোণ বলা হয়। এই ষট্‌কোণের কেন্দ্রস্থানেই বিন্দুর অবস্থান। সহজিয়াগণও মহামুদ্রাকে 'এবং' আকার বলিয়া বর্ণনা করেন, সুতরাং প্রকারান্তরে তাঁহারাও তান্ত্রিক সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভাষায় 'এ' বলিতে মাতা বা চন্দ্র এবং 'ব' বলিতে রতাধিপতি বা সূর্য বুঝাইয়া থাকে। বিন্দু উভয়ের মধ্যস্থল। 'এ'কার ও 'ব'কারের সংযোগ মাতা-পিতা অথবা চন্দ্র-সূর্যের সংযোগ ভিন্ন অপর কিছু নহে।"[৫৩৯]

এই হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনার সঙ্গে বাউল-সাধনারও মিল আছে। তাহারাও মূলাধারে (অর্থাৎ মূলাধার হইতে মণিপুর পর্যন্ত) এইরূপ 'কুলকুণ্ডলিনী' বা 'চণ্ডালী'-জাতীয় একটি শক্তির অবস্থান উপলব্ধি করে। তাহারা উহাকে কখনো 'কুণ্ডলিনী', কখনো 'আহ্লাদিনী' প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়াছে।

৫৩৮। দ্রষ্টব্য চর্যাপদ নং ১৮, ১৯, ২৮, ৫০ ইত্যাদি

৫৩৯। উত্তরা, ১৩৩৪ সাল, কার্তিক—পৃঃ ১১২

হাউড়ে গোঁসাই বলিতেছেন :

"মৃণাল হাওয়ার গতি, ত্রিগুণ-ধারিণী শক্তি যথায় বসতি,
তারে জাগালে যোগনিদ্রা, সাধ্যধন বাধ্য হয় ;
তবে দ্বার পারাপার দাম দামোদরে,
উর্দ্ধেতে হইবে গতি দ্বিদল 'পরে,
তবে হবে দৃষ্ট প্রণব পুষ্ট, ঘুচবে কষ্ট তাই ভেবে ॥
লাল, জরদ, সবুজ আর সাদা
রকম রকম দেখিবে যে রঙ বলি সর্বদা।"

হাওয়ার গতি—অর্থাৎ নিরুদ্ধ প্রাণাপান-বায়ুর গতি, সুষুম্না-মধ্যস্থ চিত্রিণী নাড়ীর রন্ধ্রপথে পর পর যে পদ্মের শ্রেণী সন্নিবিষ্ট, সেই মৃণাল-পথকে অবলম্বন করিয়া চলাচল করে। সেই স্থানে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী কুণ্ডলিনী-শক্তি বিরাজ করেন। তাঁহাকে জাগাইতে পারিলেই সাধ্যবস্তু করতলগত হইবে। তখন এই মৃণাল-সূত্র-পথে স্থাপিত প্রত্যেক দ্বার পার হওয়া যাইবে এবং দ্বিদলে পৌঁছান যাইবে। এই দ্বিদলপদ্মেই লাল, লাল ও নীলে মিশ্রিত জরদ, সবুজ ও সাদা রঙের সম্মিলিত জ্যোতি ওংকারাকারে দৃষ্ট হইবে। এই গানটির উল্লেখ পূর্বেও করিয়াছি।

আর একজন বাউল বলিতেছেন :

"যে আছে ষড়্দলে, তারে লও উল্টা কলে,
যদি সে যায় দ্বিদলে
উঠবে জ্বলে বাতি।

* * * * *

কামব্রহ্ম সাকার হবে, উদয় হবে গুরুর মূর্তি ॥"

যিনি ষড়্দলে আছেন অর্থাৎ নাভি-স্থানাশ্রয়িণী কুণ্ডলিনী-রূপা মহারাগশক্তিকে উর্ধ্বে উঠাইয়া দ্বিদলপদ্মে লইতে পারিলে কামব্রহ্ম গুরুমূর্তি ধরিয়া দর্শন দিবেন। এখানে 'কামব্রহ্ম' বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝানো হইয়াছে।

"বায়ু হংস-রূপে চরে, মানব দেহ-সরোবরে।
সে যারে দয়া করে, দিব্যচক্ষে দেখতে পায় ॥
গুরু গুরু বলো যারে, সে রয়েছে আলের 'পরে
আহ্লাদিনী আলে ঘোরে, দীপ্ত করে জগৎময় ॥"

মানব-দেহ-সরোবরে বায়ু-রূপ হংসের বিহার হইতেছে। তিনিই 'দমের মানুষ'।

তিনি গুরু—অন্তর্যামী; কিন্তু তিনি অবস্থান করিতেছেন—আল বা সীমানার পরপারে। সীমানার এ ধারে—আলের উপর দেহ-ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়া আহ্লাদিনী অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে সহায় করিয়াই গুরু-স্থানে গুরু-দর্শনে যাইতে হইবে।

জনৈক সাধক-প্রদত্ত বিবরণী

[তাঁহার নিজের ভাষাতেই প্রদত্ত হইল]

"মহাপ্রভু হইতে গঙ্গা-যমুনার মত মুখ্যতঃ 'অনুমান' এবং 'বর্তমান'—এই দুইটি সাধনার ধারা প্রবর্তিত হইয়া সমগ্র বিশ্বজগৎকে শাখা-প্রশাখায় ও ফল-ফুলে ভরিয়া তুলিয়াছে। এই দুইয়ের সাধন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও ইহাদের উৎপত্তি-স্থল এক এবং গন্তব্যও এক। অর্থাৎ তাহাদের সাধন—

" 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কামগায়ত্রী যার আরাধন॥'

"কাজেই সকলেই মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সুশীতল কল্পবৃক্ষ-আশ্রিত এবং সকলেই বৈষ্ণব। যদিও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ প্রায় অহি-নকুলবৎ। এই দুই ধারার মধ্যে বিরোধের কারণ এই যে, অনুমানে ভজনশীল সাধক প্রকৃতি-বর্জিত হইয়া মানসে অষ্টপ্রহর অষ্টকালীন চিন্তার দ্বারা রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়া মিলনাত্মক রসানুভব করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে বর্তমানে ভজনশীল বৈষ্ণবেরা স্ত্রী-প্রকৃতি-গ্রহণ করতঃ ঊর্দ্ধরেতা হইয়া স্বীয় দেহের অভ্যন্তরে মিথুনীভূত আনন্দ ভোগ করিয়া স্বরূপতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। উভয় সম্প্রদায়েরই ইষ্টদেব মহাপ্রভু এবং উভয় সম্প্রদায়েরই আশ্রয়-স্থল কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ। যাঁহারা অনুমানে রাধা-কৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং যাঁহারা বর্তমানে ভজন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ সহজিয়া আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই সব সম্প্রদায়ের সকলেই স্ত্রী-প্রকৃতি লইয়া রাধা-কৃষ্ণ ভজন করেন। ইহাদের মধ্যে সাধনায় নানা ইতরবিশেষ থাকিলেও সকলেই বলেন—"যাহাকার বস্তু আমি তাঁহাকারে দিব, প্রকৃতির কাছে বস্তু বিন্দু না রাখিব।" অর্থাৎ সকলেই মৈথুনাসক্ত স্ত্রী-পুরুষ ঊর্দ্ধরেতা

হইয়া এই দেহ-রূপ বৃন্দাবনেই রাধাকৃষ্ণের মিথুন-ভাবগত চরম মাধুর্যের আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনুমানে ভজনকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন—

"মনে মনে রাজা হইলে কেবা তাহা জানে।
তৈছে মনের সেবা কৈলে কৃষ্ণ নাহি মনে॥'
—বিবর্তবিলাস

"ইঁহাদের মধ্যে বহু রুচি-বিগর্হিত কার্যকলাপ আছে বলিয়া প্রকাশ। ইঁহাদের সাধন-পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহা বৌদ্ধদের প্রকৃতি-সাধন, দেহতত্ত্ব এবং চৈতন্যবাদ এই তিনের সংমিশ্রণ। তবে চৈতন্যবাদের প্রভাবে ইঁহাদের সাধন-পদ্ধতিতে শূন্যবাদের স্থলে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-বিগ্রহের মৈথুনীভূত রস স্থান পাইয়াছে এবং কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে আশ্রয় করিয়াই ইহা পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে তাঁহাদের সম্প্রদায়-পরিপোষক অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহারা এই মতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠাইয়াছেন।

"স্বয়ং মহাপ্রভুকে তাঁহারা আদি বাউল বলিয়া রূপ দিয়াছেন। অবশ্য মহাপ্রভু যদিও স্ত্রীমুখ দর্শন করিতেন না এবং ছোট হরিদাসকে স্ত্রী-প্রকৃতিকে সম্ভাষণ করার জন্য কি কঠিন শাস্তি দিয়াছিলেন, তাহা সর্বজন-বিদিত, তথাপি মহাপ্রভুকে বাউল বলিলে তাহা একেবারে অস্বীকার করার উপায় নাই। কারণ যে অদ্বৈত মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, সেই অদ্বৈত মহাপ্রভুই চৈতন্যদেবের প্রকটলীলা-অবসানের ঠিক পূর্বমুহূর্তে চৈতন্যদেবকে 'বাউল' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। আর একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, মহাপ্রভু স্বয়ং উচ্চ অধিকারীর জন্য স্ত্রী-প্রকৃতি লইয়া সাধন-পদ্ধতিকে উচ্চ সম্মান এবং আসন দিয়া গিয়াছেন। চরিতামৃতে রায় রামানন্দ ও প্রদ্যুম্ন মিশ্র-সংবাদে ইহা সুস্পষ্ট।

"'আমিত! সন্ন্যাসী আপনা-বিরক্ত করি মানি
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি।
তবঁহি বিকার পায় মোর তনুমন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন?
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন;
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন

এক দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী ;
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি।
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ ;
গুহ্য অঙ্গ হয় তাঁর দর্শন স্পর্শন।
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন ;
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ।
নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম ;
আশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন !
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার ;
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার।
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র ;
তাহা জানিবার আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র।
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে করি এক অনুমান ;
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ—
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস ;
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস।
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়।
উজ্জ্বল-মধুররস প্রেমভক্তি পায় ;
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য বিহারে সদয় ॥' " (অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ)

"ইহার পর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা কবিরাজ গোস্বামী বা মহাপ্রভু স্বয়ং স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা অনুমোদন করিতেন না বলিবার অবকাশ থাকে না। তবে একথাও সত্য যে, এই পথে ব্যভিচারের সুযোগ খুব বেশী এবং যোগ্য লোকের সংখ্যা খুবই কম। কম বলিয়াই এই পথকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

"স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু পরবর্তী কালে বসুধা এবং জাহ্নবী—এই দুই স্ত্রী লইয়া ঘর করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও রজকিনীর প্রেমে বিভোর ছিলেন। বিদ্যাপতি, জয়দেব সকলেই স্ত্রীলোক লইয়া সাধন করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-জগতের এইসব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে বাদ দিলে বৈষ্ণবধর্মের প্রাণশক্তি নিশ্চয়ই পঙ্গু হইয়া পড়ে।

"তবে একথা অনস্বীকার্য যে, রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব সকলেই গৃহী-পর্যায়ভুক্ত। অপরপক্ষে স্বয়ং রূপসনাতন, রঘুনাথ দাস, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি সাধু মহাজন এবং পরবর্তী কালেও শত শত সাধু মহাজন একক ভাবেই 'বর্তমান' সাধনা করিয়া গিয়াছেন। 'অনুমান'-ভজন স্ত্রীলোকের সাহচর্য না লইয়া হইয়া থাকে—ইহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু 'বর্তমান'-সাধনও যে স্ত্রীলোক-বর্জিত হইয়া করা যায় এবং কি ভাবে করা যায়, তাহাই সংক্ষেপে দু'-একটি কথায় বলিব।

"বর্তমান-ভজনের গোড়ার কথা হইতেছে উর্ধ্বরেতা হওয়া। শুধু উর্ধ্বরেতা হইলেই হইবে না, তাহাকে বার বার নামাইয়া আনিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রেরণ করতঃ মিথুনীভূত অপ্রাকৃত আনন্দ-রস আস্বাদনপূর্বক চিন্ময়স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বর্তমানে সাধক সম্প্রদায় মধুর ভাব আরোপ করিয়া এই অবস্থায় উপনীত হন।

"স্ত্রীলোকে মাতৃভাব আরোপ করিয়াও ঠিক একই ভাবে উপস্থিত হওয়া যায়। ব্যভিচারের আশঙ্কাও থাকে না। যেখানে দাঁড়াইয়া সাধক দেখিতে পান—

" 'জননী মন্দিরে প্রবেশি দেখিনু,
কহিতে না মানি বাধা।
শ্যামা হলো শ্যাম চরণের শিব,
উঠিয়া হইল রাধা।'

"বাৎসল্য-রস ও মধুর-রস মুখ্যতঃ একই। বাৎসল্য-রসে যৌন প্রীতি যোগ দিলেই তাহা মধুর-রসে পরিণত হয়।

"মাতৃভাবে বিভোর হইয়া সাধক স্ত্রীলোকের সহিত যৌন-প্রীতিবর্জিত হইয়া অতি সহজে উর্ধ্বরেতা হইতে পারে, ইহা লইয়া সমস্যা নয়। সমস্যা হইতেছে এই যে, রসের পরিপূর্ণ কলস হইতে রস ঢালিয়া স্ত্রীলোকের সহিত যৌন প্রীতি-বর্জিত হইয়া কি করিয়া উহা সুখে পান করা যায়। চণ্ডীদাসও সাধকের এই কঠিন অবস্থাকে উপলব্ধি করতঃ বলিয়াছেন :

" 'প্রবর্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে,
নামাইতে প্রবর্ত সাধক বিষম সঙ্কটে।'

"প্রকৃতই সাধক জীবনের এত বড় সমস্যা আর দ্বিতীয় নাই। মাকড়সা-জালের উপর দিয়া প্রমত্ত অশ্বকে ছুটাইয়া লইয়া যাওয়ার মতন কিংবা সূচী-ছিদ্রের মধ্য দিয়া হস্তী পার করার মতন বিঘ্নসঙ্কুল। যাহারা স্ত্রীলোক লইয়া

সাধন করেন এবং যাহারা স্ত্রী লইয়া করেন, উভয় পক্ষেই এইপথ দুরধিগম্য এবং বিঘ্নসঙ্কুল।

"শৃঙ্গার বলিতে আমরা সাধারণতঃ স্থূল একটি বিশেষ দৈহিক ক্রিয়াকে বুঝাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহা নয়। ইহার পশ্চাতে যে অফুরন্ত রসের উৎস আছে, তাহার সন্ধান পাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, বিশ্ব-চরাচরের ভিতরে ও বাহিরে অহরহঃ শৃঙ্গাররসের মেলা বসিয়াছে। ফুল ফুটে, সূর্য উঠে, পাখী গায়, চাঁদ আকাশ থেকে সুধা বৃষ্টি করে—সবই এই অফুরন্ত শৃঙ্গার-রসের খেলা। এই রসের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহা আট ভাগে বিভক্ত: (১) দর্শন, (২) স্পর্শন, (৩) কেলি, (৪) কীর্তন (অর্থাৎ পরস্পরের গুণকীর্তন, (৫) গুহ্য ভাষণ, (৬) সংকল্প, (নর-নারীর পরস্পরের চিন্তা), (৭) যৌনক্রিয়ার জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং (৮) ক্রিয়া-নিবৃত্তি অর্থাৎ স্থূল দেহ-ভোগ।

"যাঁহারা একক সাধনা করেন, তাঁহারা স্থূল দেহ-ভোগ না করিয়া ভাবের পরিচর্যার দ্বারা শৃঙ্গার-রসের অন্য সাতটি অঙ্গের পরিপুষ্টি-বিধান করিয়া অহরহঃ অষ্টপ্রহর শৃঙ্গার-রসের সাগরে নিমজ্জিত থাকেন:

"'বাণ আর গুণ ভাই পুরুষ প্রকৃতি।
ভাবেতে শৃঙ্গার তাতে হবে নিতি নিতি॥
সম্ভোগ বিপ্রলব্ধ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
যোনিতে লিঙ্গেতে শৃঙ্গার করে ভাই সবে।
করুক যথেষ্ট কেনে তাহে কিবা হবে॥
পশুপক্ষী জীবাদিতে করয়ে শৃঙ্গার।
প্রাপ্তি কি হইবে হেন করিলে তাহার॥
আত্মায় আত্মায় যেবা করয়ে রমণ।
রসিকের শিরোমণি জানি হেন জন॥
আর সে শৃঙ্গার সেহো ভাবেতে শৃঙ্গার।
ভাবেতে শৃঙ্গার আছে বহু মত তার॥
এ সব কহিতে মোর প্রাণ ফেটে যায়।
অতএব সে সাধন কহা নাহি যায়॥
মধুরেক হয় তার সার শৃঙ্গার কারণ।
পথে চলে ঘাটে মাঠে করয়ে সাধন॥"

"মহাপ্রভু রাত্রিদিন স্বরূপ-রামানন্দের সঙ্গে এইরূপ ভাবের শৃঙ্গার-রস আস্বাদন করিতেন।

"কাজেই যে সব সাধক স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করেন এবং যাঁহারা একক সাধনা করেন, উভয়েই মূলতঃ এক। উভয়েই নিজদেহের অভ্যন্তরে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়া এই দেহকে কৃষ্ণ-লীলাভূমি বৃন্দাবন-স্বরূপ করেন।

"আপাতদৃষ্টিতে যোগী এবং একক সাধক মূলতঃ এক মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নয়। যোগীর সহিত এই সব রসিক বৈষ্ণব একক সাধকের পার্থক্য এই যে, যোগীরা ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে ইষ্টের সহিত মিলিত হন। রসিক বৈষ্ণব সাধকেরা ষট্‌চক্র পর্যন্ত যান অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের দ্বিদল পর্যন্ত উঠেন, কখনও ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া যাইবার কল্পনাও করেন না। তাঁহারা বলেন: 'সপ্তম দ্বার পর রাজা বৈঠত, তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী'।"

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে বাউলতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া প্রকৃতি-সাধন-বর্জিত এক সম্প্রদায়ের সাধক আছেন। ইঁহাদের সাধনা ভাব-শৃঙ্গারাত্মক যোগ-ক্রিয়া।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর গুরুভ্রাতা 'নেংটা বাবা' বাংলায় এই সম্প্রদায়ের আদিগুরু। ইনি ২৫০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্রীনরহরি অবধূত। নবদ্বীপে ইনি 'পাতাল বাবা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মদনমোহন স্বামী সেই শ্রীশ্রীনরহরি অবধূত-সম্প্রদায়ের শিষ্য। ইনি বর্তমানে ১৮এ, বাবুবাগান, ঢাকুরিয়ায় বাস করিতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুফীধর্ম ও বাউলধর্ম

আমি নানাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, সুফীধর্মের সহিত বাউলধর্মের সাদৃশ্য বাহ্য মাত্র এবং তত্ত্ব-দর্শন বা সাধন পদ্ধতিতে বিশেষ কোনো মিল নাই।

সাদৃশ্য মোটামুটি কেবল তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়:

(ক) দেহের মধ্যে পরমাত্মা বা আল্লার অবস্থিতি ও মানব পরম-মানবের প্রতিচ্ছবি বা ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং মানব-জীবনের অসীম গৌরব ও সার্থকতা।

(খ) সাধনা আত্মোপলব্ধি-মূলক; সুফীর ধ্যান-ধারণা এবং বিশেষভাবে হৃদয়াবেগ বা প্রেম দ্বারা আল্লার সঙ্গে একাত্মবোধ বা 'ফানা'-অবস্থা-প্রাপ্তি—বাউলের প্রকৃতি-পুরুষের যুগল-মিলন দ্বারা মহাভাবে অবস্থিত হইয়া 'সহজ-মানুষ'-এর উপলব্ধি।

(গ) ধর্মের বাহ্য আচার বা অনুষ্ঠান-ত্যাগ।

কিন্তু একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, হিন্দু-তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিক—উভয় সম্প্রদায়ই দেহে পরমাত্মার অবস্থিতি কল্পনা করিয়া দেহকেই সাধনার কেন্দ্র করিয়াছে এবং তাহাদের সাধনাও আত্মোপলব্ধির সাধনা। তাহারা 'শিবোঽহং', 'হাউ বুদ্ধ' প্রভৃতি উক্তিতে তাহাদের সাধনার স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়াছে। তারপর ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান-ত্যাগ যে বৌদ্ধ-সহজিয়াদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহাও আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। সুতরাং ইহাতেও নূতনত্ব কিছু নাই। তবে সুফী-প্রভাবের দ্বারা এই সমস্ত ধারণা বা প্রত্যয় যে সুদৃঢ় হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মুসলমান বাউলদের গানে যে সুফী-প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মানুষের মধ্যে ভগবানের অভিব্যক্তি এবং সকল ধর্মের গুরু-স্বরূপ সিদ্ধপুরুষ বা নবী বা মহাপুরুষগণ মানুষকে ধর্মপথে পরিচালিত করেন—এই ভাবটি বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার সঙ্গে দুই-একটি গানে নাছুত, মালকুত, জবরুত, লাহুত—এই চারি মোকামের (আঃ—'মকাম') উল্লেখ আছে। কিন্তু এই মোকাম 'সহজ মানুষ'কে দেখিবার জন্য (গান নং ৩০৩) বা যে "নূর ত্রিবেণীর ঘাটে পদ্মফুলে মধু খায়" (নং ২৫৪), সেই 'নূরের মোকাম' বিশেষ। এই উল্লেখ

সুফী-সাধনার অঙ্গ হিসাবে কোনো উল্লেখ নয়। ইহা বাউলের 'সহজ মানুষ'-উপলব্ধির স্তরের সঙ্গে সুফী-সাধনার এই মোকামগুলির অজ্ঞতা-প্রসূত ও কষ্ট-কল্পিত একটা সাদৃশ্যের উল্লেখ ছাড়া আর কিছু নয়। গান কয়টির ভিতরে একটু লক্ষ্য করিলেই ইহা বেশ বুঝা যায়। সুতরাং বাউলধর্মের উপর সুফী-প্রভাব বাহিরের, মূলতত্ত্ব-দর্শন ও সাধন-সংক্রান্ত বিষয়ে নয়।

সুফীধর্মের তত্ত্ব-দর্শন ও সাধনা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। সুফীদের সমস্ত মূলগ্রন্থ আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখিত। তাঁহারা ঐ সব গ্রন্থের অধিকাংশই ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ঐ দুই ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকদের সুফী-তত্ত্ব-দর্শন সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারণা দিয়াছেন। এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছেন অধ্যাপক ডক্টর আর. এ. নিকলসন। তিনি কেবল প্রধান প্রধান সুফী-সাধকের মূলগ্রন্থসমূহের মূল্যবান অংশগুলিই অনুবাদ করেন নাই, সুফী-তত্ত্ব ও দর্শনের উপর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সমালোচনা-মূলক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছেন। ইঁহার শেষ গ্রন্থ *Rumi* (*Poet and Mystic*)-এর মধ্যে রুমীর 'দীওয়ান' ও 'মসনবী'র বিখ্যাত কবিতাগুলির উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। এই গ্রন্থের ভূমিকাটি ডাঃ নিকলসনের সুফী-মতবাদ সম্বন্ধে পরিণত মনের শেষ দান। তাঁহার *Tales of Mystic Meaning* নামক গ্রন্থে 'মসনবী'র অনেক রূপক কবিতার অনুবাদও উল্লেখযোগ্য। ই. এইচ. হুইনফিল্ড শবিস্তরি তব্রিজীর 'গুলসান-ই-রাজ' এবং জালালুদ্দিন রুমীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মসনবী'র অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ ছাড়াও এই রূপকধর্মী গূঢ়ার্থক গাথাগুলির তিনি অতি বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনীও করিয়াছেন। ই. জি. ব্রাউনও তাঁহার 'পারশিক সাহিত্যের ইতিহাস'-এ সুফী-মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ফরাসী পণ্ডিত এল. মেসিগনন মনসুর হল্লাজের অজ্ঞাত জীবনী, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, কিংবদন্তী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া অনুবাদ ও বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনী সংযোগ করিয়া দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ফরাসী ভাষায় লিখিত বলিয়া ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ পাঠকদের বোধগম্য নয়। তবে ডক্টর নিকলসন ইহার অনেকাংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া তাঁহার নানা গ্রন্থে প্রকাশ করায় হল্লাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিবার সুবিধা হইয়াছে। সুফী-মতবাদ সম্বন্ধে আরো কয়েকজন ইংরেজ লেখক কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ডক্টর শেখ মুহম্মদ ইকবাল তাঁহার *The Development of Metaphysics in Persia* গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে (Chap. V)

সুফী-মতবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। H. W. Clarke-সম্পাদিত *Awārif-ul-Māārif*. F. Hadland Davis-এর ***Persian Mystics*** (Rumi ও Jami), Sikdar Ikbal Ali Shah-এর ***Islamic Mysticism***, Mr. Waheed Hossain-এর সুফী-ধর্মের উপর ***University Extension Lectures***, ডক্টর রমা চৌধুরীর ***Sufism and Vedanta*** প্রভৃতি গ্রন্থে অল্প-বিস্তর সুফীধর্ম ও সুফী-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই সব আলোচনাকারীদের নানা গ্রন্থ এবং অনুবাদ-অবলম্বনে সংক্ষেপে সুফী-মতবাদ সম্বন্ধে একটা বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

'সুফী' শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য

সুফীদের মধ্যে অনেকেরই মত এই যে, 'সুফী' শব্দটি আরবী শব্দ 'সফা' হইতে উৎপন্ন। 'সফা'-শব্দের অর্থ 'পবিত্রতা'। যাহারা সাংসারিক নানা পঙ্ক-ক্লেদ হইতে মুক্ত এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, তাহারাই 'সুফী'-নামবাচ্য। অন্য একটি মতে 'সফ্'-শব্দ হইতে 'সুফী' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'সফ্'-শব্দের অর্থ 'শ্রেণী'। যাহারা ভগবদ্ভক্তি, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ও ধর্মের দিক দিয়া ভগবানের নিকট প্রথম শ্রেণীতে অবস্থান করিতেছে, তাহারাই 'সুফী'। সুফী-মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনাকারী অধিকাংশ পণ্ডিতেরই মত এই যে, 'সুফী'-শব্দটি 'সুফ'-শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'সুফ'-শব্দের অর্থ 'পশম'। সুফীধর্ম সম্বন্ধে লিখিত প্রচলিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আরবী গ্রন্থের লেখক বলেন যে, পশমী বস্ত্র যে সমস্ত ধর্ম-প্রচারক এবং সাধুর প্রিয় পরিচ্ছদ, তাহার পরিচয় অনেক কাহিনী ও প্রাচীন কিংবদন্তীতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণের মতে ইসলামের প্রথম দুই শতাব্দীর মধ্যে দরিদ্র সাধারণ লোক এবং যাহারা সাংসারিক ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিত, তাহারা মোটা কর্কশ পশম-বস্ত্র ব্যবহার করিত। যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে প্রাচীন সাহিত্যে 'পশম-বস্ত্রধারী' বলা হইত। পরবর্তী সময়ে সাংসারিক ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিলে তাহাকে বলা হইত 'সুফ্' অর্থাৎ পশম-বস্ত্র-পরিধানকারী। তারপর যখন এইরূপ জাগতিক সুখে বিরাগী, পবিত্র, সন্ন্যাস-ব্রতী উপাসক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল, তখন তাহারা 'সুফী'-নামে পরিচিত হইল। পারস্যেও সন্ন্যাস-ব্রতীকে সাধারণতঃ বলা হয় 'পশম-পরিচ্ছদধারী'। 'সুফ' অর্থাৎ 'পশম' হইতেই যে 'সুফী'-নামের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই বর্তমান পণ্ডিতগণের মত।

সুফীরা বাহ্য আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা অন্তরের পবিত্রতা

এবং সংসারিক ভোগসুখ অপেক্ষা দরিদ্রভাবে বৈরাগ্যময় সন্ন্যাস-জীবন-যাপনই অধিকতর কাম্য মনে করে।

সুফীধর্মকে Islamic Mysticism বা ইসলামীয় মরামিয়াবাদ বা অতীন্দ্রিয়-বাদ বলা হয়। ধর্মের দিক হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনেই মানবের একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু এই মিলন বুদ্ধির অতীত স্তরের—কোনো জ্ঞান-প্রসূত বা কোনো আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-মূলক নয়; ইহা একান্তভাবে হৃদয়াবেগ-প্রসূত। প্রেমই ঈশ্বর ও মানুষের পরিপূর্ণ মিলনের সেতু। এই মিলনে মানবের ব্যক্তিগত সত্তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বরিক সত্তায় পরিণত হয়। এই ঐশ্বরিক ঐক্য-লাভই সুফীদের ধর্মের চরম লক্ষ্য। বাগদাদ-নিবাসী হল্লাজ-গুরু জুনাইদ বলেন যে, মানুষের ক্ষুদ্র 'আমিত্ব'-এর বিনাশ ও ঈশ্বরে পুনর্জীবন-লাভই সুফীধর্মের মূলকথা।

সুফী মতবাদের দুই যুগঃ প্রাচীন ও নূতন

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যে 'সুফী'-নামটি মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয়। এই প্রাচীন সুফী-মতে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব, ঈশ্বর, আত্মা বা আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। ঈশ্বর ও মানবের যে উন্মাদনাময় প্রেম-মিলন সুফীধর্মের ভিত্তি, সে বিষয়ের কোনো আলোচনাও ইহাতে ছিল না। ইহাতে অতীন্দ্রিয়বাদের (Mysticism) পরিবর্তে নীতিতত্ত্বেরই (Ethics) বেশি প্রভাব দৃষ্ট হয়। এই প্রাচীন সুফী-মতে দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত: একটি সন্ন্যাসবাদ (Asceticism) অপরটি নিষ্ক্রিয়বাদ বা ঈশ্বরে কর্মহীন আত্মসমর্পণ (Quietism)। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান, বিচারকর্তা এবং দণ্ড-বিধাতারূপে গণ্য করিত এবং পাপ-ভয়ে সর্বদা ভীত থাকিত। পাপের অনিবার্য ফল নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি-লাভের আশায় তাহারা সাংসারিক সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্যাগী উদাসীনের মতো জীবন-যাপন করিত। প্রথমে সুফীগণ এই সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিল। পরে তাহারা পৃথক হইয়া পড়ে। সন্ন্যাসিসম্প্রদায় স্বর্গসুখলাভের আশায় ইহলোকের সুখ পরিত্যাগ করিত, কিন্তু সুফীগণ সংসারবিমুখতা ও দারিদ্র্য ঈশ্বর-লাভের উপায় স্বরূপ মনে করিয়াই গ্রহণ করিত। ক্রমে সুফীগণ বাহ্য অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, নিরন্তর ঈশ্বর-ধ্যান, ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ প্রভৃতির উপরই মনোযোগ দেয়।

এই প্রাচীন যুগের সুফীগণ কোরান ও হদিসের বাণীকে অকাট্য বলিয়া গ্রহণ

করিত এবং শরীয়ত-নির্দিষ্ট আচার-আচরণও পালন করিত। ক্রমে ঈশ্বর-প্রেমকেই ধর্মের ভিত্তি করা হয়। এই যুগের স্বনামধন্যা স্থফী রাবীয়া (খৃঃ ৭১৩—৮০১)। দরিদ্র ক্রীতদাসী হইয়াও তিনি প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিকা ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি প্রার্থনা ('মোনাজাত') বিভিন্ন স্থফী-গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়। তাহার একটি এইরূপ:

"হে প্রভু, যদি আমি কেবল নরক-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তোমার উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে নরকেই দগ্ধ কর। যদি আমি কেবল স্বর্গসুখ-লাভের আশাতেই তোমার উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে স্বর্গ হইতে বঞ্চিত কর। কিন্তু আমি যদি কেবল তোমার জন্যই তোমার উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার নিকট তোমার চিরন্তন সৌন্দর্য ও মাধুর্য প্রকটিত কর।"

রাবীয়ার হৃদয়ে ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও স্থান ছিল না, তাই তিনি কহিয়াছিলেন: "আমার নরকের ভয় নাই, স্বর্গেরও আশা নাই। আমি নবীকেও ভালবাসিতে পারি না—কারণ, ঈশ্বরের প্রেমে আমার হৃদয় এমনভাবে পূর্ণ যে, আর কাহারো প্রতি ভালবাসা বা ঘৃণা এখানে স্থান পায় না।"[৫৪০] আল্লাই যে একমাত্র সত্য এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তিনি অভিন্ন, পরবর্তী যুগের এই মতবাদের বীজরূপে ইহাকে গ্রহণ করা যায়।

রাবীয়ার সময় হইতেই স্থফী-মতবাদের নবযুগের সূচনা হয়।

স্থফী-মতবাদের নূতন যুগ আরম্ভ হয় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে। এই নূতন স্থফী-মত প্রাচীন স্থফী-মত হইতে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত হয় নাই। এই নূতন স্থফী-মত ক্রমে ইসলাম-বহির্ভূত অনেক মতবাদ দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। ভারতীয় বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন, নিও-প্লেটোনিক দর্শন (প্লটিনাস প্রভৃতির মতবাদ), খৃষ্টীয় সন্ন্যাসবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ (ascetic-ism and mysticism), নষ্টিক-মতবাদ (Gnosticism), পারশিক ভাবধারা প্রভৃতি প্রভাবের সম্মিলিত ফল বলিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন। তবে কোরানের একেশ্বরবাদের প্রভাব যে ইহাদের মূলে ছিল এবং ইহার প্রধান

৫৪০। **Tadhkirat-al-Awliya**—Faridal-Din Attar—I, 273, 3 (Nicholson). রাবীয়ার এইরূপ অনেক উক্তি Al-Ghazālı র **Ihya**-নামক গ্রন্থে আছে (Tr. by **Macdonald, Nicholson** প্রভৃতি)

শিকড় যে ইসলামীয় তাহাও বলিয়াছেন।[৫৪১] আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, এই নবতম সুফী-মতের উদ্ভবের একটি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক কারণ বর্তমান ছিল। উমাইয় যুগের রাষ্ট্রীয় অন্তর্বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা, আব্বাসীয় যুগের সন্দেহবাদ (Scepticism) ও শুষ্ক যুক্তিবাদ, উলামাগণের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠান-প্রিয়তা প্রভৃতিতে এই শুদ্ধ ঈশ্বরবাদ (Theism), সরল ধর্ম-বিশ্বাস ও আবেগপ্রধান ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে।[৫৪২]

যাহা হোক, এই নূতন সুফীবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভগবানই একমাত্র সত্য। তিনি কেবল সত্যই নন, তিনি অনন্ত প্রেমময়। ঐশ্বরিক প্রেম-লাভ মানবের কাম্য। ভগবৎ-সাধনার লক্ষ্য হইতেছে ভগবানের সঙ্গে মিলনের পূর্ণ আনন্দানুভূতি। ভগবানের সঙ্গে এই প্রেম-সম্বন্ধ ও মিলন-জাত আনন্দানুভূতিই নব সুফী-মতের বৈশিষ্ট্য। এই মতে ক্রমে ভগবানের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ তিরোহিত হইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী এক ভগবানের সত্তা বিদ্যমান; তিনিই একমাত্র সত্য (অল্-হক্), তিনি সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমের আনন্দে সাধক ব্যক্তিগত মানবীয় সত্তার বিলোপ করিয়া ভগবৎ-সত্তায় মিশিয়া যাইতে পারে। ইহা নিঃসন্দেহে ইসলাম-বহির্ভূত মতবাদ। নব সুফী-মতবাদ কোরানের একেশ্বরবাদ হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহার উপর যে ইসলাম-বহির্ভূত মতবাদের প্রভাব পড়িয়াছিল, ইহা ঠিক।

নব সুফী-মতবাদ যিনি প্রথমে বিধিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করেন, তাঁহার নাম ধূ-ল্-নূন মিশ্‌রী (মৃত্যু ৮৬০ খৃষ্টাব্দে)। ইনি মিশরদেশ-বাসী বিখ্যাত পণ্ডিত ও মরমিয়া সাধু। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রচারিত আছে। সনাতন ইসলামধর্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি কারারুদ্ধ হন, পরে মুক্তিলাভ করেন। সুফীগণ তাঁহাকে তাহাদের সম্প্রদায়ের আদিগুরু বলে। তাঁহার প্রসঙ্গে সুফী-কবি জামি বলিয়াছেন: "তিনিই আমাদের সম্প্রদায়ের আদি-প্রবর্তক। অন্যান্য সুফী তাঁহারই বংশধর, তাঁহারই আত্মীয়মাত্র।"[৫৪৩]

ইনিই প্রকৃতপক্ষে সুফী-মরমিয়া-পন্থের প্রবর্তক। ভগবান সম্বন্ধে প্রকৃত

৫৪১। **The Literary History of Persia,** I,—E. G. Browne—Pages 418ff.

৫৪২। **A Literary History of the Arabs**—Nicholson—Page 385ff.

৫৪৩। **Nafahat-al-uns**—Jami—Page 36 (Nicholson).

জ্ঞান যে কেবল মরমিয়া-সাধকগণ তাঁহাদের অন্তরের মধ্যেই লাভ করিতে পারেন, অন্য কেহ পারে না, এ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

"ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান বলিতে ইহা বুঝায় না যে, ভগবান এক ও অদ্বিতীয় ; এপ্রকার জ্ঞান সকল ধর্মবিশ্বাসীরই আছে। দার্শনিক, ধর্মশাস্ত্রবিদ্, আলংকারিক প্রভৃতি প্রমাণ এবং যুক্তি-তর্কাদির দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগবৎ-সত্তার পূর্ণজ্ঞান কেবল ভগবদ্ভক্ত সাধুগণেরই লভ্য। তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করেন ; ভগবান পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও আত্মপ্রকাশ করেন না, কেবল তাঁহাদের নিকটই পূর্ণসত্তা প্রকাশ করেন।"[৫৪৪]

সুফীদের অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তি ধূ-ল্-নূনের উক্তি বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, যথা—"তত্ত্বজ্ঞানী ('আরিফ') ব্যক্তি প্রতিদিন ধীরে ধীরে নম্র ও অবনত হয়, কারণ প্রতি মুহূর্তে সে ঈশ্বরের নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে।"

"অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ('মারিফ') আলোকের মাধ্যমেই ভগবান আমাদের অন্তরের অন্তরালে তাঁহার বাণী প্রেরণ করেন।"[৫৪৫]

হুজিয়িরির 'কাসফ্-অল-মহ্জুব' এবং ফরিদুদ্দিন আংতারের 'তাজকিরাত-অল্-আউলিয়া' ছাড়া রুমী তাঁহার 'মসনবী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ধূ-ল্-নূনকে উপলক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। যখন বিবেক-বর্জিত স্বেচ্ছাচারী লোকের হাতে ক্ষমতা থাকে, তখন ধূ-ল্ নূনের মতো সাধু ব্যক্তি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই সাধুগণই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিগ্রহ-স্বরূপ, ক্ষুদ্র সাংসারিক লোক ইঁহাদের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া ইঁহাদিগকে অবজ্ঞা করে ইত্যাদি ভাব ঐ গ্রন্থে দেখা যায়।[৫৪৬]

ধূ-ল্-নূনের সুফী-মতবাদে যিনি অনুপ্রেরণা দেন, তিনি বায়াজিদ অল্ বিস্তামি (মৃত্যু—খৃঃ ৮৭৪-৮৭৫)। ইনিই সুফী-মতবাদে ঈশ্বরের বিশ্বলীনতা (Pantheism) পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইনিই 'ফানা'বাদের প্রবর্তন করেন।

৫৪৪। **Tadhkirat-al-Awliya,**—Faridal-Din Aṭṭar, I, 5 (Tr. by Nicholson).

৫৪৫। দ্রষ্টব্য—**Kashf-al Mahjub**—Hujwiri (Tr. Nicholson), **Tadhkkirat-al-Awliya** প্রভৃতি গ্রন্থ (Nicholson).

৫৪৬। **Masnavi** —Jalālu'l-Dīn Rūmi, II, 121-128 (Whinfield).

ইহার পরই মনসুর হল্লাজের নাম (খৃঃ ৮৫৪—৯২২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পারশ্য-দেশীয় সুফী তুর্কীস্থান, মক্কা, ভারতবর্ষ (গুজরাট) প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সুফী-মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য সর্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিত। তিনি নির্ভয়ে তাঁহার উপলব্ধি—'আনা'ল হক্' অর্থাৎ 'আমিই একমাত্র সত্য বা ঈশ্বর' প্রকাশ করেন। উহা ইসলাম-বিরোধী মনে হওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন এবং সাতবৎসর বাগদাদে কারাবাস ভোগ করেন। তারপর সাতমাস ধরিয়া বিচারের পর তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয় এবং বর্ণনাতীত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। হল্লাজ সুফী-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাদি আরবী-ভাষায় লিখিত।

হল্লাজ ভগবান ও মানবের একাত্মতার প্রথম প্রচারক। তাঁহার মতে যখন ভগবৎ-সত্তার সহিত ভক্ত-প্রেমিক মানবাত্মা মিশিয়া যায়, তখন সেই সাধু ('ওয়ালি') ভগবানের ব্যক্তিগত দ্রষ্টা-স্বরূপে পরিণত হয়। তখনই সে বলে: "আমিই সৃষ্টিশীল সত্য।" ("I am the Creative Truth".)[৫৪৭]

হল্লাজের মতানুসারে ভগবানের সত্তার সারবস্তু প্রেম। সৃষ্টির পূর্বে তিনি নিজেকেই নিজে ভালবাসিতেন এবং প্রেমে নিজের স্বরূপ নিজের নিকট প্রকাশ করিতেন। তারপর বাহিরে সেই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ দেখিবার জন্য তিনি তাঁহার একটি প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে তাঁহার সমস্ত গুণ দ্বারা ভূষিত করিলেন। ভগবানের এই সৃষ্ট মূর্তিই আদম। এই আদমের মধ্য দিয়া এবং আদমের দ্বারাই ভগবান অভিব্যক্ত—ঈশ্বর মানবে রূপায়িত।

হল্লাজের কিন্তু এই মত যে, ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রেম-মিলনের ফলে মানুষের সত্তার একেবারে বিলোপ হয় না। মানবের জড় সত্তা ('নাছুত') কেবল ঐশ্বরিক সত্তায় ('লাহুত') রূপান্তরিত হইয়া যায়। মানব ও ভগবান —এই দুই প্রেমিকের মিলন একেবারে এক হইবার মিলন বা একে অন্যে নিঃশেষে পরিবর্তিত হইবার মিলন নয়। এই নাছুত ও লাহুতের মিলনকে হল্লাজ মদ ও জলের মিলনের মত বলিয়াছেন। কিন্তু মদ মদই এবং জল জলই— কেবল একত্র মিশ্রিত হইয়া একরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রেম-মিলনেই উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত এবং এক অন্যে রূপান্তরিত হয়। ভগবান যে রক্ত-মাংসের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই মানুষের পরম গৌরব।[৫৪৮]

৫৪৭। **Kitab-al-Tawasin** VI, 32 (Edited by L. Massignon).

৫৪৮। **Kitab-al-Tawasin** --Edited by L. Massignon—Pages 129-134.

হল্লাজের পরই স্পেন-দেশীয় বিখ্যাত সুফী ইবন্-অল্-আরবী (খৃঃ ১১৬৫—১২৪০) সুফী-মতবাদকে পূর্ণতত্ত্ব-দর্শন-সমন্বিত করিয়া সুদৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনিই 'ইনসান্-উল-কামেল' বা 'পূর্ণমানব'-মতের প্রথম স্রষ্টা। তাঁহার মতে সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি এবং একমাত্র মানবেই তাঁহার পূর্ণপ্রকাশ। পরবর্তী কালে ইবন্-অল্-জীলী এই 'পূর্ণমানব'বাদকে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত করেন।

যে-সমস্ত সুফী-লেখক সনাতন ইসলামের সহিত সুফী-মতের সামঞ্জস্য-সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হুজ্বিয়িরি এবং বিশেষ করিয়া অল্ গাজালীর (খৃঃ ১০৫৮—১১১১) নাম উল্লেখযোগ্য। সুফী-মতবাদ যে ইসলামধর্মসম্মত, গাজালী তাহাই প্রকাশ করেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে পারস্যে সুফীধর্ম গৌরবোজ্জ্বল উন্নতির অধিকারী হয়। ফরিদুদ্দীন আৎতার বহু সুফী-গ্রন্থ রচনা করেন। জালালুদ্দিন রূমী (খৃঃ ১২০৭—১২৭৩) সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্সী সুফী-কবি। তিনি রূমে (এশিয়া মাইনর) দীর্ঘকাল বাস করায় রূমী নামে খ্যাত। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ 'মসনবী'। ইহা 'ফার্সী কোরান' নামে পরিচিত। তাঁহার 'দীওয়ান-ই-শামসী-তাব্রিজ'ও গূঢ় আবেগ-তরঙ্গায়িত উচ্চশ্রেণীর গীতিকাব্য। ধূ-ল্-নূনের সময়

হল্লাজের বিখ্যাত পংক্তিগুলি :

"Glory to God Who revealed in His humanity the secret of His radiant divinity.
And then appeared to His creatures visibly in the shape of one who eats and drinks."

"Thy spirit is singled in my spirit as wine is mingled with pure water.
When anything touches Thee, it touches me.
Lo, in every case thou I."

"I am He Whom I love
And He Whom I love is I.
We are two spirits dwelling one body.
If thou seest me, thou seest Him
And if thou seest Him
Thou seest us both."

হইতে সুফীধর্মের যে তত্ত্ব ও দর্শন-সমন্বিত নবযুগের আরম্ভ হয়, তাহা রুমীর মধ্যে একটা অপূর্ব কাব্যময় প্রকাশ লাভ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঐ যুগের সাদী (খৃঃ ১১৮৪—১২৯১), হাফিজ (মৃত্যু ১৩৮৯ খৃঃ), জামী (জন্ম ১৪১৪ খৃঃ) প্রভৃতি বিখ্যাত সুফী-কবি। এই কবিগণ ব্যতীত এই যুগের সাদ্দ্দীন মাহ্‌মুদ শবিস্তরি তব্রিজী একজন বিখ্যাত সুফী-লেখক ছিলেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'গুলসান-ই-রাজ' (*The Mystic Rose Garden*) ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহার কিছু পরে ইবন্-অল্-জীলীর আবির্ভাব হয় (খৃঃ ১৩৬৫—১৪০৬)। তিনি একজন বিখ্যাত সুফী-গ্রন্থকার। তিনি আরবী-প্রবর্তিত 'পূর্ণমানববাদ'কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এখন এই বিখ্যাত সুফীগণের মতবাদের মূলধারাটি অবলম্বন করিয়া সুফীধর্ম সম্বন্ধে অতি-সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে।

সুফী-মতবাদের মূলতত্ত্ব হইতেছে ঈশ্বরের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব। অবশ্য এই তত্ত্বের বীজ কোরানেই নিহিত। অধিকাংশ সুফীই কোরানের মতকে তাহাদের ব্যাখ্যানুসারে গ্রহণ করে। তাহারা বলে যে কোরানের দুই অর্থ,—এক 'জাহির' বা ব্যক্ত অর্থ সাধারণের জন্য, অপর 'বাতিন' বা গুপ্ত অর্থ মরমীয়া বা প্রকৃত অধিকারীদের জন্য। সুফীরা এই 'বাতিন'-এর নির্দেশ গ্রহণ করে।

ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব ও স্বরূপ

বাউলদেরও বলিতে শোনা যায় যে, চৈতন্যচরিতামৃতে 'চতুর কবিরাজ চাঁদ' যে-গুপ্ত অর্থ ও ইঙ্গিত রাখিয়াছেন, তাহা কেবল তাহাদের সম্প্রদায়ের জন্য।

ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বময়ত্বের ধারণা কোরানে প্রচুর। ইহার মধ্যেই সুফীদের ভগবানের বিশ্বানুস্যূতির (Pantheism) বীজ নিহিত।[৫৪৯] সুফী-তত্ত্বে

৫৪৯। "He is God besides whom there is no god : the knower of the unseen and the seen; He is the Beneficent, the Merciful. He is God, besides whom there is no God; the King, the Holy, the Author of peace, the Granter of security, Guardian over all, the Mighty, the Supreme, the Possessor of every greatness; glory be to God from what they set up (with Him). He is God, the Creator, the Maker, the Fashioner; His are the most excellent names; whatever is in the heavens and the earth declares His glory; and He is the Mighty, the Wise."—*The Holy Quran,* Chapter 59—Verses 22-24.

"Everything is perishable except Allah." (Chapter 28—Verse 88).

"He has power over all things." (Chapter 67—Verse 1) ইত্যাদি।

ভগবান অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞানময়, সর্বশক্তিময়। ইহাই তাঁহার একমাত্র স্বরূপ নয়, তাঁহার বিশেষ স্বরূপ আনন্দময়। এই আনন্দের অভিব্যক্তি প্রেমে। সুতরাং এই আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে প্রেম-স্বরূপ। এই প্রেম-স্বরূপতাই তাঁহার যে মূলস্বরূপ, ইহাই সুফীদের কাছে প্রকটিত। এই সৃষ্টির মূলে প্রেমেরই প্রেরণা, মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ প্রেমের এবং সাধনার পথও এই প্রেম-মিলনের পথ। সুফী ভগবানের প্রেম-লাভের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের প্রেম লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। সকলকে ভাল বাসিয়া, সকলকে আপনার করিয়া তবেই সে অনন্ত প্রেমময়ের প্রেম লাভ করিবে। সুফী-মতবাদ এক অভিনব ভগবৎ-প্রেমের দর্শন উপস্থাপিত করিয়াছে। শেখ মুহম্মদ ইক্‌বাল বলেন :

"Sufi's message to the Individual is : Love all, and forget your own individuality in doing good to others."

"Rumi says : To win the people's heart is the greatest pilgrimage ; and one heart is worth more than a thousand *Kā'bāhas*. Ka'bah is a mere cottage of Abraham ; but the heart is the very home of God."

" . . . Semitic religion is a code of strict rules of conduct ; the Indian Vedanta, on the other hand, is a cold system of thought. Sufism avoids their incomplete psychology, and attempts to synthesise both the semitic and Aryan formulas in the higher category of Love." ৫৫০

অধিকাংশ সুফীর মতে ঈশ্বর বিশ্ব-লীন (immanent) এবং বিশ্ব-বহির্ভূত (transcendent) দুই-ই।

ঈশ্বর বিশ্ব-চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই বিশ্ব ঈশ্বর-সত্তাময়। জগৎ ও ঈশ্বরে কোনো ভেদ নাই—সমগ্র জগৎ ঈশ্বর এবং সমগ্র ঈশ্বরই জগৎ। ইহাই 'বিশ্বাত্মবাদ' বা ইংরেজী দর্শনের ভাষায় Pantheism. কিন্তু সুফী-মত ঠিক এইরূপ Pantheism নয়। ঈশ্বর জগতে এবং জগৎ ঈশ্বরে অবস্থিত বটে

৫৫০। **The Development of Metaphysics in Persia**—Shaikh Muhammad Ikbal—Pages 105-106.

এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরও বটে, কিন্তু সমগ্র ঈশ্বর জগৎ নহেন। ঈশ্বর জগতের অতিরিক্ত বা বহির্ভূতও বটেন। ঈশ্বর এই সৃষ্টি বা জগতে লীন হইয়া থাকিলেও তাঁহার ক্ষুদ্র একটি অংশই এইরূপ হইয়া আছে, তাঁহার বৃহৎ অংশ সৃষ্টির অতিরিক্ত এবং সৃষ্টির বহির্ভাগে চতুর্দিকে অনন্তপ্রসারী। সুতরাং সাধারণভাবে সুফী-মতবাদকে Panentheism বা ঈশ্বরাধিকত্ববাদ বলা যায়। বিখ্যাত সুফী ইবন-অল্-আরবী Pantheism-এর প্রধান প্রবর্তক ও প্রচারক। আরবী-সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরের প্রধানতঃ তিনটি রূপ—শুদ্ধস্বরূপ, জগদ্রূপ এবং 'পূর্ণমানব'রূপ। 'পূর্ণমানব'-রূপেই ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি—তাহার মধ্যেই ঈশ্বরের সমগ্র গুণাবলীর অবস্থিতি। মানব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ অভিন্ন হইলেও তাঁহার একটি প্রধান গ্রন্থে আছে যে, প্রকৃত সুফী 'তঞ্জীয়া' ও 'তশবিয়া'—উভয় মতবাদ অর্থাৎ 'জগদতিরিক্তবাদ' ও 'জগল্লীনবাদ'-এর মিলন করিয়া ভগবদুপাসনা করিবে।[৫৫১]

আরবীর বিশ্বাত্মবাদ ও পূর্ণমানববাদের পরবর্তী প্রচারক অল্-জীলী। ইহার মতে ঈশ্বর কেবল বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট বা লীন নন, ঈশ্বরই স্বয়ং বিশ্ব। ইহাকে 'বিশ্বাত্মবাদ' না বলিয়া 'একাত্মবাদ' বা 'জগৎ-ব্রহ্মবাদ' বলা যায়। ঈশ্বর তিনরূপে অভিব্যক্ত হন। প্রথম অবস্থা একত্ব বা শুদ্ধসত্ত্ব বা নির্বিশেষ বা সূক্ষ্মবীজ-রূপ অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা তৎ-ত্ব বা দেবত্ব, তৃতীয় অবস্থা 'আমিত্ব' বা সৃষ্টিতে জড়রূপে অভিব্যক্তি। অর্থাৎ ঈশ্বরের তিনটি সত্তা বা অবস্থা,—একটি শুদ্ধ সার-সত্তা, একটি ঈশ্বর বা স্রষ্টা-রূপ সত্তা এবং অপরটি মানব-রূপ সত্তা। ঈশ্বরেরই এই তিনরূপে অভিব্যক্তি বা আত্মপ্রকাশ।[৫৫২] কিন্তু সাধনা ও ধর্মের দিক দিয়া ঈশ্বরই করুণা, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য প্রভৃতি সকল গুণের

৫৫১। **Fusus-ul-Hikam** (Bezels of Wisdom)—Edited and Translated into English by Khan Shahib Khaja Khan with a Foreword by L. Massignon, Chapter III এবং আরো দ্রষ্টব্য—ইবন্-অল্-আরবী সম্বন্ধে নিকলসনের প্রবন্ধ **(Hastings' Encyclopedia of Religion and Ethics)**.

৫৫২। এ সম্বন্ধে Dr. Nicholson তাঁহার **Studies in Islamic Mysticism** গ্রন্থে জীলীর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন:

"If you say that it (Essence) is One, you are right. Or if you say that it is Two, it is in fact, Two. Or if you say, "No, it is Three," you are right. For it is the real nature of man."

আধার এইরূপ কথিত হইয়াছেন। রূমী প্রভৃতি সুফী-কবিগণের মত এই যে, ঈশ্বর সৃষ্টিতে লীন, না সৃষ্টির বহির্ভূত, কি উহাদের মধ্যাবস্থ;—এসব কিছুই নয়। এ-সব বিষয় বুদ্ধি, বিচার ও বিতর্ক-মূলক জ্ঞানের অন্তর্গত। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ জানা যায় না। জ্ঞানের পথ ত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রেমের পথই অবলম্বনীয়। প্রেমের দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎ মিলন বা উপলব্ধি সম্ভব।

সুফীধর্ম মূলতঃ একান্তভাবে ভগবৎ-প্রেমের ধর্ম—হৃদয়াবেগ-মূলক ধর্ম। এখানে কোনো জ্ঞান, যুক্তি, তর্ক বা দর্শনের প্রকৃত স্থান নাই। তাই শেষ যুগের রূমী, সাদী, জামী, হাফেজ প্রভৃতি সুফীগণ কাব্যেই এই অভিনব প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছেন।

মানবকে সুফীধর্মে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মানব এবং মানবের চরমোৎকর্ষ পূর্ণমানব। পূর্ণমানব মানব-দেহে ঈশ্বর—তাঁহার মধ্যেই ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি। ভগবান কেমন করিয়া নিজেকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য মানুষ সৃষ্টি করিলেন এবং মানুষের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ, ইবন্‌-অল্‌-আরবী তাহা তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফাসাস-উল-হিকম'-এর প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে ইংরেজী অনুবাদের একটু অংশ উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে :

ঈশ্বর ও মানব

"When God wanted to see the forms (*ayan*) of His names (*asma*) or to see His own form (*ayan*) in such a composition that being attributed with His own innumerable names (*asma*), exhibited His full grandeur having been endowed with His existence, He exhibited His own secret to Himself, i.e. He saw it in such a creature that exhibited all His attributes, so that His own secret manifested itself to Him. . . . . When he wanted to see His *Dhat* by means of His *asma* (names) He made a form of the Cosmos in the shape of a symmetrical figure which had no soul. That form was like a glass without brilliance and did not reflect His *asma*. When a thing is made perfect, it becomes fit to receive the breath of God. This process of reception is called blowing-in of breath. This blowing-in is called command (*amr*) and is

eternal divine *tajalli* (reflection) which then flashed on the perfected form . . . . Adam became the brilliance of that form and also its soul ; angels became the faculties, spiritual and physical of that form, which became the cosmos, which the Suffis call *Alam-i-Kabir* (macrocosm). Angels are the powers hidden in the faculties and organs of man, ... To God it is like the pupil of the eye by which He sees . . . . It is like the bezel (*fas*) on the ring, the King attaches his seal to the treasury . . . . Adam, therefore, is the Khalifah of God, and he is in the likeness of God . . . . God made man in His own image."—Chap I (The Wisdom of Adam)—Page 52 ff of *Fusus-ul-Hikam* (Bezels of Wisdom) by S. M. Ibn-i-Ali-ul Arabi, Trans. and edited by Khaja Khan.

মানবের এই চরম পরিণতি—'ইনসান্‌-উল্‌-কামেল'-মতবাদকে জীলী আরো পূর্ণভাবে সম্প্রসারিত করেন।

প্রত্যেক মানবেই পরিপূর্ণতা নিহিত রহিয়াছে। মানুষ সাধনার দ্বারা, আত্মোপলব্ধির দ্বারা স্বীয় পূর্ণস্বরূপকে বিকশিত করিতে পারে। যিনি সাধনায় যে পরিমাণে সিদ্ধকাম, তিনি সেই পরিমাণে সিদ্ধপুরুষ বা পূর্ণমানব। জীলীর মতে মহম্মদই সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণমানব।

পূর্ণমানব সাধারণ মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে মিলন-সেতু। তিনি সমগ্র মানব-জাতির আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ও পথ-প্রদর্শক। তিনি প্রকৃত সিদ্ধগুরু। সাধু ও ধর্ম-প্রবর্তকগণও পূর্ণমানব। পূর্ণমানব প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধি করেন।

কোনো কোনো সুফী, যাহারা সনাতন ইসলামধর্মের সঙ্গে সুফীধর্মের সামঞ্জস্য-বিধান করিতে চায়, তাহারা ধর্ম-প্রবর্তক বা নবী বা পয়গম্বর এবং সাধুগণের (ওয়ালি বা পীর) মধ্যে পার্থক্য করে। তাহারা বলে যে, নবীগণের মধ্যে মহম্মদই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছাড়া আর কেহ তাঁহার পর সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে বাণী প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সুতরাং পরবর্তী সকলেই ধর্ম-প্রচারকমাত্র, ধর্ম-প্রবর্তক হইতে পারেন না। একমাত্র ধর্ম-প্রবর্তকই ঈশ্বরের দূত, সাধু নন।

মহম্মদ 'পূর্ণমানব' হইতেও উচ্চ—তিনি 'দিব্যমানব'। অন্যান্য 'পূর্ণমানব' বা সাধু মহম্মদের প্রতিনিধিমাত্র।

কিন্তু কোনো কোনো সুফী-লেখক বলেন যে, প্রত্যেক মানুষই সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে বাণী প্রাপ্ত হইতে পারে। আরবীর মতে ধর্ম-প্রচারকগণ অপেক্ষা সাধুগণ শ্রেষ্ঠ। ধর্ম-প্রচারকগণ কোনো ধর্ম-প্রচারের জন্য প্রেরিত হন, তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানানুসারে ভগবদ্‌বিষয় লোককে জ্ঞাত করান, কিন্তু সাধু ভগবানের নিকটে বাস করেন। তাঁহার বাণী চিরন্তন। ধর্ম-প্রচারক যদি সাধু হন, তবেই তিনি প্রকৃত ঐশ্বরিক জ্ঞান বিতরণ করিতে পারেন।[৫৫৩]

রূমী ধর্ম-প্রবর্তক ও সাধুর মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য দেখেন নাই। যিনি সাধনার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে একত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং ঐশ্বরিক গুণাবলী লাভ করিয়াছেন, তিনি সাধুও হইতে পারেন, ধর্মপ্রবর্তকও হইতে পারেন। উভয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই—মূলে ইহারা এক।

যে-অর্থে 'অবতার' শব্দটি আমরা ব্যবহার করি, অর্থাৎ ভগবান মানব-দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, অধিকাংশ সুফী সেইরূপ অবতারবাদে বিশ্বাস করে না। অবতারবাদে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে একটা প্রভেদ সূচিত হয়। অবতার-অর্থে ভগবান মানুষ-রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। কিন্তু মানুষই স্বয়ং ভগবান, অবতারমাত্র নয়। মানুষ সাধনার দ্বারা ঈশ্বরসত্তা লাভ করিতে পারে, তখন মানবাত্মা ঈশ্বরাত্মায় পরিণত বা পরিবর্তিত হয়। তবে মূলে দুইটি সত্তার মধ্যে পার্থক্য আছে।

তবে সুফীরা এই সাধু ও ধর্মপ্রবর্তকগণকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বা তাঁহার সমপর্যায়-ভুক্ত বা তাঁহারই প্রতিমূর্তি বা 'অবতার-স্বরূপ' বলিয়া মনে করে। বাউলগণের মধ্যেও এই উপলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়।

সুফী-সাধনার লক্ষ্য

সুফী-সাধনার প্রধান লক্ষ্য দুইটি—মানবসত্তার বিলয় বা ধ্বংস এবং ভগবৎসত্তায় অবস্থিতি। মানব-সত্তার বিলয়কে বলা হয় 'ফানা' (ধ্বংস) এবং ভগবৎ-সত্তায় অবস্থিতিকে বলা হয় 'বাকা' (স্থিতি)।

হুজিয়িরি, গাজালী প্রভৃতি সুফী-লেখকগণ, যাঁহারা সনাতন ইস্‌লামধর্মের সহিত সুফীধর্মের সামঞ্জস্য রাখিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে, 'ফানা'র অর্থ আমিত্ব, অহংকার এবং সাংসারিক ভোগবাসনা-ত্যাগ এবং 'বাকা'র অর্থে ঈশ্বরের উপর

৫৫৩। Fusus-ul-Hikam—Chapter XIV.

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞাধীনে দাস-রূপে অবস্থান। কারণ, মানব ও ঈশ্বর চিরকালই স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ ভিন্ন।

কিন্তু বিশ্বাত্মবাদী সুফী আরবী, জীলী প্রভৃতির মত এই যে, ঈশ্বর ও মানব অভিন্ন এবং মানব ঈশ্বরের গুণে পরিণত হয়। জীলী মানব বা সৃষ্ট জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধকে বরফ ও জলের সম্বন্ধের অনুরূপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ঈশ্বর জল, জগৎ বরফ—এইভাবে দুইরূপে ভিন্ন। যেমন জল বরফের উপাদান-কারণ, সেইরূপ ঈশ্বরই জগতের উপাদান-কারণ। অবশ্য জীলীর মতে মানবই ঈশ্বর এবং জগৎ, মানব প্রভৃতি ঈশ্বরের বাহ্য রূপ—দর্পণ-স্বরূপ। জীলীর এই মতকে 'বিশ্বাত্মবাদ' না বলিয়া 'একাত্মবাদ' (এক আত্মাই স্বয়ং বিশ্ব) বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জীলীর মত এই যে, ঈশ্বর ও বিশ্ব অভিন্ন হইলেও, বিশ্ব সত্য, মায়ামাত্র নহে।

'গুলসান-ই-রাজ' নামক বিখ্যাত সুফী-গ্রন্থের লেখক শবিস্তরির মত এই যে, শুদ্ধসত্তা (Absolute Being) অ-সত্তায় (Not-Being) প্রতিবিম্বিত হইয়া বিশ্ব-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। দৃশ্যমান বিশ্ব স্বপ্নবৎ; মানবের ব্যক্তিত্ব মরীচিকামাত্র-সত্তা, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য।[৫৫৪] জীলী, শবিস্তরি প্রভৃতির মতবাদে দেখা যায়, ঈশ্বর ও মানব গুণতঃ ও স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং ইহাদের মতে 'ফানা'র অর্থ মানবোচিত গুণের ধ্বংস এবং 'বাকা'র অর্থ ঈশ্বর-স্বরূপে ও গুণে প্রতিষ্ঠা।

রূমী প্রভৃতি সুফীগণের অভিমত এই যে, ঈশ্বর ও মানব গুণতঃ অভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ ভিন্ন। ঈশ্বর ক্রমান্বয়ে মানব-রূপে স্বীয় সত্তা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে, 'ফানা'র অর্থ মানবীয় গুণের ধ্বংস এবং 'বাকা'র অর্থ স্বতন্ত্র-স্বরূপ-বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র-সত্তা-বিশিষ্ট হইয়াই ঈশ্বর-স্বরূপে অবস্থিতি। এই অবস্থা বুঝাইবার জন্য রূমী অঙ্গ ও অঙ্গীর, দীপশিখা ও সূর্যের, অগ্নি ও লৌহের অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে বুঝা যায় যে,

৫৫৪। "........the Ego is merely a facet of Absolute Being reflected in the mirror of Not-being. Man's belief in self, in his individuality is a mere illusion—a mere mote in the eye, when these motes are removed, he becomes conscious that he himself is a part of the One Being. When he has attained this consciousness there remains no longer the bond of positive laws, of creeds or sects. . . . ."

The Gulsan-i-Raj (Answer III)—(Whinfield).

সাধু বা পূর্ণমানব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র-সত্তা-বিশিষ্ট। রুমীর কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি সাধনায় দুইপ্রকার উপলব্ধির ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, সাধক উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার মনুষ্যোচিত গুণাবলীর ধ্বংস হইয়াছে, 'নাছুত'-অংশের বিলোপ হইয়াছে, তিনি দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিলেও তিনি পৃথিবীর লোক নহেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মনে করেন যে, তিনি ঈশ্বরের গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সমগ্র জগৎ এবং সমস্ত প্রাণী তিনি ছাড়া আর কিছুই নয়, তিনি ও জগৎ এক। রুমীর মতে সাধক জগতের সহিত ভেদ ও একত্ব উভয়ই উপলব্ধি করেন।

রুমী বলিয়াছেন :

"দেখ, আমি আমার নিজের স্বরূপ জানি না, আমি কি করিব? আমি খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী নই, ইসলামধর্মাবলম্বীও নই, আমি নাস্তিকও নই, ইহুদীও নই। পূর্ব, পশ্চিম, স্থল, জল—কোনো স্থানেরই আমি অধিবাসী নই; দেবদূত অথবা অপদেবতা কাহারও সহিত আমার আত্মীয়তা নাই; আগুন বা ফেনা—কিছু হইতেই আমি উৎপন্ন নই, ধূম বা শিশির কিছুর দ্বারাই আমি গঠিত নই; আমি সুদূর চীন, সাকসিন, বুলগার, পঞ্চনদী-সমন্বিত ভারত, ইরাক বা খোরাসান—কোনো স্থানেই জন্মগ্রহণ করি নাই; আমি ইহলোকে বা পরলোকে, স্বর্গে বা নরকে—কোনো স্থানেই বাস করি না। আমি ইডেন-উদ্যান ও স্বর্গ হইতে পতিত হই নাই, আমি আদমেরও বংশধর নই। সমস্ত স্থানের উর্ধ্বে, চিহ্ন ও উদ্দেশ-বিহীন দেশে, দেহ ও আত্মাকে অতিক্রম করিয়া আমি আমার বন্ধুর বুকে চিরনবীন বেশে বাস করি।"[৫৫৫]

এইপ্রকার ভাব রুমী আরও কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন : "পৃথিবীতে প্রেমিক যদি কেহ থাকে, সে আমি। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী, সাধু যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি। মদ্য-পানপাত্র-বাহক, গায়ক, বীণা, দীপ, প্রিয়া, মদ্য, আনন্দ—সবই আমি······মৃত্তিকা, বায়ু, জল, অগ্নি, দেহ, আত্মা—সকলই আমি।······আমি চোরের চৌর্য, রোগীর রোগ" ····· ইত্যাদি ইত্যাদি।

৫৫৫। *Unknowing* :

"Lo, for I to myself an unknown, now in God's name what must I do?
I adore not the Cross nor the Crescent, I am not a Giaour nor a Jew.

ভগবৎ-সত্তায় এই মহারূপান্তরের বা মহাপ্রেম-মিলনের অনুভূতি রূমী আর একটি কবিতায়[৫৫৬] চমৎকাররূপে প্রকাশ করিয়াছেন :

"কী আনন্দের সেই-মুহূর্তগুলো, যখন তুমি আর আমি বসি এই প্রাসাদে। দুইটি আকৃতি, দুইটি দেহ, কিন্তু আত্মা আমাদের এক। কুঞ্জের রঙ আর পাখীর কণ্ঠস্বর আসবে নিয়ে চির-অমরতা আমাদের সে মিলন-মেলায়—যখন আমরা আসবো বাগানে। আকাশ হ'তে তারা আসবে আমাদের দেখতে, আর আমাদের মাঝে তারা দেখবে চাঁদকে। তুমি আর আমি আর স্বতন্ত্র নই—দু'জনের হয়েছে আনন্দোচ্ছল মিলন হাল্‌কা কথার গুঞ্জরণ আর উচ্ছল কলধ্বনির ঊর্ধ্বে। আকাশে উজ্জ্বল-পাখা পাখীর হৃদয়ে জমে উঠবে ঈর্ষার বীজ, আমরা এমনই মধুর হাসির কলতান তুলবো সেই প্রাসাদে। কিন্তু, সবার চেয়ে বিস্ময়—যদিও মিলন আমাদের এই নিভৃতে, তবু ব্যস্ত আমরা একই মুহূর্তে—ইরাকে কি খোরাসানে।"

নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া যে-সমস্ত সুফী ভাবুক ও সাধক সুফীধর্ম সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার বা গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁহাদের শেষ পরিণতি জালালুদ্দিন রূমী এবং তাঁহার ভাব-কল্পনায় সুফীধর্ম যে রূপ লাভ করে, তাহাই সুফীধর্মের শেষ পরিণত রূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। অবশ্য, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী সুফীদের মতবাদ গ্রহণ করিয়া তাহারই উপর তাঁহার বুদ্ধি, সৃজনশীল কল্পনা ও ঘন গূঢ় আবেগ প্রয়োগ করিয়া সুফীধর্মকে এই নবরূপ দান করেন।

বায়াজিদ, হল্লাজ এবং বিশেষ করিয়া আরবী প্রভৃতির মতবাদ পাঠ করিলে মনে হয় যে, তাঁহারা ঈশ্বর ও মানবের একত্ব প্রচার করিতেছেন। ইহা যেন বেদান্তের জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব—যেমন জলের বুদ্‌বুদ ফাটিয়া জল হইয়া যাওয়া

East nor West, land nor sea is my home. I have kin nor with angel nor gnome,
I am wrought not of fire nor of foam, I am shaped not of dust nor of dew." etc.

Rumi (Poet and Mystic)
—*Dīwān*, S.P. XXXI, Translated by Dr. Nicholson—Page 177.

৫৫৬। *The Marriage of True minds* :
"Happy the moment when we are seated in the palace, thou and I
With two forms and with two figures but with one soul, thou and I." etc.
—*Dīwān*, S.P. XXXVIII, Translated by Dr. Nicholson—
Rumi (Poet and Mystic) —Page 35.

ইত্যাদি। 'ফানা'র অর্থ মানবত্বের ধ্বংস এবং 'বাকা'র অর্থ ঈশ্বরে চিরতরে অস্তিত্ববিলীন অবস্থিতি—ইহাই মনে হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিশ্বাত্মবাদী স্থফীগণের সমস্ত রচনা একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে বুঝা যায় যে, মূলে তাঁহারা মানব ও ভগবানের সর্বাঙ্গীণ একত্ব সমর্থন করেন নাই। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনে মানবের স্বরূপ-সত্তার বিলোপ হয় না, ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপত্ব এক নয়। জীব তাহার গুণাবলীর চরম পরিণতিতে ঈশ্বরের গুণাবলী লাভ করিয়া ঈশ্বরময় হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে মানবের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলোপ হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের গুণাবলীর সাধর্ম্য আছে, কিন্তু স্বরূপের নাই। সকল বিশ্বাত্মবাদী বা একাত্মবাদী স্থফীই ভগবানের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত প্রেমময় সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন। ভগবান চিরন্তন প্রেমময়—মানবের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ প্রেমের সম্বন্ধ। এই প্রেমেই ভগবানের সঙ্গে মানবের সর্ব-বিস্মরণকারী মহামিলন।

তাই স্থফীধর্ম দার্শনিক যুক্তি-মূলক জ্ঞানবাদ নহে, ইহা সাক্ষাৎ অনুভূতি-মূলক ও ভাবাবেগময় ধর্ম। ইহার স্থান মস্তিষ্কে নয়, দর্শন-শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক বা বিচারে নয়, ইহার স্থান হৃদয়ে—গভীর অনুভূতির মধ্যে। তাই এই মতবাদ চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে রূমী প্রভৃতি কবিগণের হস্তে।

রূমীর কাব্য-সাহিত্যে স্থফী-মতবাদের যে রূপটি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাই স্থফী-মতবাদের শেষরূপ। ইহার বৈশিষ্ট্য এইরূপ :

(ক) সমস্ত অস্তিত্বের মূলে একটি সত্য সত্তা আছে। এই মূল সত্য সত্তা শুদ্ধ ঈশ্বর হইতে পারেন, কিংবা এই স্থষ্টিরূপে অভিব্যক্ত মূলসত্তার রূপবিশেষও হইতে পারেন।

(খ) স্থষ্টি কোনো নির্দিষ্ট সময় হইতে আরম্ভ হয় নাই। ঐশ্বরিক অভিব্যক্তি চিরন্তন ও নিত্য-বর্তমান। যখন বিশ্বের রূপের পরিবর্তন হয় বা বিলয় হয়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিরতিহীনভাবে উহা পুনরাবির্ভূত হয়। মূলতঃ ইহা ভগবানের সত্তার মতোই শাশ্বত। সর্বসময়ই পূর্ণ স্থষ্টি ঈশ্বরের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় বর্তমান।

(গ) ভগবান বিশ্বলীন (Immanent)—এই তাৎপর্যে যে, দৃশ্যমান স্থষ্টির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ, আবার বিশ্বোত্তীর্ণ (Transcendent)—এই তাৎপর্যে যে, বিশ্বের প্রত্যেক রূপের উর্ধ্বে ও বাহিরে তিনিই একমাত্র সত্য।

(ঘ) ঐশ্বরিক স্বরূপ অজ্ঞেয়। কোরানে যে নাম ও বিশেষণে তিনি

আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সেই নাম ও বিশেষণে তিনি আমাদের নিকট পরিচিত। আমাদের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে ঐক্য দেখা গেলেও, ঈশ্বরের গুণ বহু-প্রকারের এবং পরস্পর ভিন্নধর্মী। গুণের এই পার্থক্যেই এই দৃশ্যমান জগৎ, ইহা ছাড়া আমরা ভালো ও মন্দের পার্থক্য দেখিতে পাইতাম না এবং পরম মঙ্গল কি, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। ঈশ্বরের মধ্যে মন্দ বলিয়া কিছু নাই।

(ঙ) একটি পবিত্র ধর্ম-সম্বন্ধীয় পরম্পরাগত জনশ্রুতিতে (tradition) আছে যে, ডেভিড ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : "প্রভু, কেন আপনি মানব-জাতি সৃষ্টি করিলেন ?" ঈশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন : "আমি গুপ্তনিধি, নিজেকে জানাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।" ভগবানের সমস্ত জ্ঞান এই বিশ্বে, বিশেষ করিয়া মানবের মধ্যে রূপায়িত। যে-ঐশ্বরিক জ্ঞান সৃষ্টিতে প্রকটিত, তাহা পূর্ণমানবের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশিত। সেই ঐশ্বরিক জ্ঞান বা আলোক পূর্ব হইতেই বর্তমান এবং তাহা আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ধর্ম-প্রবর্তকগণের মধ্যেই বিচ্ছুরিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের পর মুসলমান সাধুগণের মধ্যেও এই 'নূর' বা আলোক সঞ্চালিত হইয়াছে। সেই আলোকের পরিপূর্ণ প্রকাশ সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণমানব মহম্মদের মধ্যে। মহম্মদের পরবর্তী কালের মুসলমান সাধুগণ মহম্মদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। ধর্ম-প্রবর্তকই হন, আর সাধুই হন, পূর্ণমানব ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। এই পূর্ণমানব ধর্ম-প্রবর্তকও হইতে পারেন, সাধুও হইতে পারেন। তিনি ভগবানের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, তিনিই সৃষ্টির শেষ কারণ এবং তাঁহার মধ্য দিয়াই ভগবান তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন।[৫৫৭]

সুফী-সাধনায় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া

সুফী-সাধন-ক্রিয়ায় প্রথমতঃ গুরুর প্রয়োজন। সুফীরাও বিশেষ গুরুবাদী সম্প্রদায়। গুরু 'মুরশিদ', 'পীর' বা 'শেখ' নামে অভিহিত হন। শিষ্যকে সাধারণভাবে বলা হয় 'মুরিদ'। দীক্ষা-গ্রহণের পর তাহাকে 'সলিক' বা 'পর্যটক' নামে উল্লেখ করা হয়। সুফীধর্ম-নির্দিষ্ট পথ হইতেছে 'তরিক', এই পথে যিনি চলেন তিনিই 'সলিক'।

সুফী-গুরু প্রথমেই শিষ্যকে দীক্ষা দেন না বা সুফী-দলভুক্ত করেন না। তাহাকে কিছুদিন শিক্ষানবিশ হইয়া থাকিতে হয়, সেই সময় গুরু তাহার উপযুক্ততা পরীক্ষা করেন। উপযুক্ততা না দেখিলে গুরু তাহাকে দীক্ষা দেন না।

৫৫৭। **Rumi (Poet and Mystic)** —Dr. Nicholson, Introduction—Pages 23-24.

হুজিয়িরি তিন বৎসর শিক্ষানবিশ থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম বৎসর জনসাধারণের সেবায় অতিবাহিত করিতে হয়। তখন সকলেই তাহার অপেক্ষা বড়, সকলেই তাহার প্রভু, সে তাহাদের সেবক, এইরূপ মনে করিবে। দ্বিতীয় বৎসরে ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয়। ঈশ্বর-সেবার অর্থ নিজের ব্যক্তিগত সমস্ত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে ভগবানের উপাসনা করা। তৃতীয় বৎসর আত্ম-সেবা। এই বৎসর সর্বপ্রকারের মানসিক উন্নতিই তাহার কাম্য। মন হইতে সমস্ত সাংসারিক চিন্তা দূর করা, হৃদয়কে সমস্ত প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে মুক্ত করা এবং সর্বতোভাবে স্থিরচিত্তে ঈশ্বরাভিমুখী হওয়াই এই বৎসরের কার্য।[৫৫৮] এই তিন বৎসর 'ত্রি-সেবায়' যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে তখন গুরু তাহাকে দীক্ষা দেন। দীক্ষার প্রতিজ্ঞাপাঠের পর, গুরু শিষ্যকে 'তালি-দেওয়া পোশাক' পরিতে দেন। ইহাকে 'খিরপা' বা 'মুরাক্কা' বলা হয়। এই অনুষ্ঠানের পর শিষ্য সুফী-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইল এবং সুফী-পথে ভগবানের উদ্দেশে 'যাত্রী' বলিয়া গণ্য হইল।

সুফী-সাধককে জীবনে ত্যাগ, নিষ্কামতা ও নৈতিক পবিত্রতা অর্জন করিতে হইবে। 'অনুতাপ', 'বৈরাগ্য', 'উপবাস', 'বিষয়-সুখ-ত্যাগ', 'দারিদ্র্য' প্রভৃতি বরণ করিয়া লইবেন তিনি আত্মোন্নতির জন্য। 'ধৈর্য', 'সন্তোষ', 'ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস' প্রভৃতি অর্জনের পর তিনি 'ভগবৎ-প্রেম'-এ উপনীত হইবেন। তাহার পরই আসিবে 'ফানা'-অবস্থা বা 'সমাধি'।

সুফী-সাধনার ক্রিয়ার মধ্যে 'ধিকর'ই প্রধান। 'ধিকর'-এর অর্থ স্মরণ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরকে স্মরণ করা বা ঈশ্বরের নাম জপ করা। এই 'জপ'-ক্রিয়া দুই-প্রকার—উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্তন ('ধিকর জালি') এবং নিম্নস্বরে বা নীরবে নাম কীর্তন ('ধিকর খাফী' । এই জপের মন্ত্রটি—'লা ইলাহা ইল্লা আল্লা' (আল্লা এক ও অদ্বিতীয়)। নীরব জপে অনেক সময় সংখ্যা-গণনার জন্য 'তসবী' (জপমালা) গ্রহণ করা হয়।

সমস্ত সম্প্রদায়ের সুফীরাই এই দুইরূপ 'ধিকর'-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে। বর্তমানে মিশর ও তুরস্ক দেশে সুফী-সম্প্রদায় স্থানবিশেষে সমবেত হইয়া দলবদ্ধভাবে এই জপ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে।[৫৫৯]

৫৫৮। **Kashf-al-Mahjub**—Hujwiri (Dr. Nicholson)—Page 54.

৫৫৯। **Islamic Sufism**—Sirdar Ikbal Ali Shah (London, 1933)—Page 296.

নাম-জপের উদ্দেশ্য ভগবানকে বার বার চিন্তার দ্বারা ভগবানে আত্মসমর্পণ ও আত্মবিস্মৃতি। ইহাই 'ফানা'-অবস্থা-প্রাপ্তির উপায়। এই প্রকারে সাধক নিজ সত্তা বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বর-সত্তার সহিত একত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।

অনেক সময় নাম-জপের সঙ্গে একাগ্রতা-বৃদ্ধির জন্য উচ্চৈঃস্বরে কোরানের অংশবিশেষ-আবৃত্তি, নৃত্য-গীত প্রভৃতি করা হয়। দরবেশ-সম্প্রদায়ে এই নৃত্য-গীত বা 'সামা'র প্রচলন বেশি। নীরবে নাম-জপে অনেক সময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ-কার্য করা হয়। প্রতি প্রশ্বাসে 'লা ইলাহা' এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে 'ইল্লা'ল্লা' জপ চলে।

স্থফী-সাধনায় সাধক কতকগুলি স্তর বা 'মকাম' (বাংলায় মোকাম) এবং অবস্থা বা 'হাল' অতিক্রম করেন। এই 'মকাম' সাধকের সাধনা-লব্ধ বিভিন্ন মানসিক ও নৈতিক স্তর বিশেষ। কিন্তু 'হাল' অন্তর্জীবনের আধ্যাত্মিক ভাব।[৫৬০] সাধনার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জীবনের অবস্থারও পরিবর্তন হইবে।

স্থফীগণ সাধারণতঃ এই মকাম পাঁচটি বলিয়া নির্দেশ করে,—নাছুত, মলকুত, জবরুত, লাহুত ও হাউত। সাধনার দ্বারা সাধক ধীরে ধীরে এইসব স্তর বা জগৎ ('আলম') অতিক্রম করেন।

এখন বাউল-গানগুলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্থফী-প্রভাবের স্বরূপ নির্ধারণ করা যাক্।

প্রথমেই যে গানটিতে চারি মোকামের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে, সেইটির আরম্ভ এইরূপ :

> "কেউ দেখবি যদি সহজ মানুষ রূপের ঘরে যাও।
> আছে নাছুত, মালকুত, জবরুত, লাহুত—চার মোকামে চাও॥"
>
> (গান নং ৩০৩)

স্থফীদের মতে বিশ্ব-স্থষ্টিতে অসীম, অনন্ত ও অব্যক্ত ভগবান অনুলোম-গতিতে সুক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূল স্থষ্টি-রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কোনো কোনো স্থফী-সাধক এই স্তরগুলির সংখ্যা সাতটি বলেন, তবে অধিকাংশের মতে ইহা পাঁচটি। এই পাঁচটি স্তর বা জগৎ এইরূপ :

৫৬০। **Ihya** — Ghazāli (summarised by Macdonald in his **Religious Attitude and Life in Islam**—Page 220ff).

(১) আলম-ই-হাউত

এইটি সর্বোচ্চ স্তর। এই স্থান নির্গুণ, অব্যক্ত মূলসত্তার স্থান। এই স্তর অদৃশ্য ও অচিন্তনীয়। ইহা স্থান, কাল ও আপেক্ষিকতার বাহিরে। ইহা শূন্যস্থান। এই স্থান অসীম ও অনন্ত। সমস্ত সৃষ্টির ইহাই সূক্ষ্ম আদিরূপ।

(২) আলম-ই-লাহুত

ইহা ঈশ্বরের স্থান। সৃষ্টিতে এই স্থান প্রথম আবির্ভূত। এখানেই জগদ্ব্যাপী এক ঈশ্বর-সত্তার অস্তিত্ব বর্তমান। যখন সাধক এই স্তরে প্রবেশ করেন, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী ঐশ্বরিক অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে নিহিত বলিয়া উপলব্ধি করেন। ভগবৎ-সত্তায় পরিণত হইয়া সাধক অপূর্ব আনন্দের আবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠেন। এই অবস্থাতেই হল্লাজ বলিয়াছিলেন : "আমিই ঈশ্বর"। বায়াজিদ বলিয়াছিলেন : "সমস্ত প্রশংসা আমার, আমি কী গৌরবের অধিকারী!" সিব্‌লি এই অবস্থায় বলিয়াছিলেন : "আমিই কথা বলি, আর আমিই শুনি। এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই।"

(৩) আলম-ই-জবরুত

ইহা সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর। এই স্থান ঐশ্বরিক শক্তি, গৌরব, ঐশ্বর্য ও মাহাত্ম্যের স্থান। সাধক এই জগতে উপস্থিত হইলে তিনি ভগবানের শক্তি ও ঐশ্বর্য অনুভব করিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে নিজের শক্তির সন্ধান পান। মহম্মদই স্বয়ং বলিয়াছেন : "নিজেকে জানিলে ভগবানকে জানা যায়।" এই বাণীর সার্থকতা সাধক এই স্তরে বুঝিতে পারেন।

(৪) আলম-ই-মলকুত

এই স্থান সূক্ষ্মদেহীদের স্থান। এই পৃথিবীর সমস্ত জিনিস এখানে সূক্ষ্মাকারে বিরাজ করে। ইহা দেবদূতদের স্থান। দেবদূতেরা সূক্ষ্মদেহী এবং নিষ্কলঙ্কতা ও পবিত্রতার প্রতীক। সুফী-'যাত্রী' এই স্তর লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

এই স্তরে পৌঁছিলে সাধক ভগবানের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা ও তাঁহার প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করিবেন এবং সর্বদা অপবিত্র চিন্তা ও কাজ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবেন।

(৫) আলম-ই-নাছুত

ইহাই সৃষ্টির সর্বনিম্ন জড় স্তর। ইহাই স্থূল রক্ত-মাংসের জীব ও জড় প্রকৃতির স্তর।

সুফীদের সাধনা প্রতিলোম—এই সৃষ্টিধারায় উর্ধ্বগমন। প্রথম নাছুত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধক লাহুতে উপস্থিত হন। হাউতে পৌছান সুফীদের সাধনা নয়। কারণ উহা সূক্ষ্ম কারণ-স্বরূপ, অব্যক্ত ভগবদবস্থা। সেখানে জীব-সত্তার স্থান নাই।

এই স্তরগুলি 'সহজ-মানুষ'কে দেখার স্তর নয়। এরফান আলি বলিতেছেন :

"সহজ মানুষের ধারা,
ধারা ধরতে হবে জেন্তে-মরা, পাগল-পারা,
তায় ধরতে গেলে স'রে প'ড়ে নয়ন মুদে রও ॥
মানুষের বারাম দ্বিদলে,
আকর্ষণে হেলে-দুলে নিঃশব্দে চলে,
আছে চতুর্দলে লীলাখেলা, গুরুমুখে লও ॥"

ইহা সুফী-সাধনার কোনো কথা নয়। অতি স্পষ্টভাবেই তিনি আর একটি গানে বলিতেছেন :

"ভিয়ান করলে সুধা হয়।
রস-মৈথোনে যুগলকলে প্রাপ্তি বস্তু রয় ॥ (গান নং ৩০২)

আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল ফকির লালনের কয়েকটি গান দেখা যাক।

ভগবান আকারহীন, তবুও তিনি মানুষের মধ্যে আকার ধারণ করিয়াছেন, মানুষ তাঁহারই প্রতিরূপ। আদম তাঁহার প্রতিরূপ, মহম্মদ তাঁহার প্রতিরূপ। মহম্মদকে লালন ভগবানের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ বলিতেছেন যে, আহম্মদ (মহম্মদ) নামের মধ্যেই আল্লার নামের অক্ষর আছে। তিনি কেবল নিজেকে মানবাকারেই রূপায়িত করেন নাই, নাম-সাদৃশ্যও রাখিয়াছেন। লালন বলিতেছেন :

"এমন দিন কি হবে রে আর।
খোদা সেই ক'রে গেল রছুলরূপে অবতার ॥" (গান নং ১৮)

কেবল তাহাই নয়, নিজের আত্মাকে ভগবান আদমে রূপায়িত করিয়াছেন—এ-কথা তিনি নিজেই কোরানে প্রকাশ করিয়াছেন। (*The Holy Quran*, Chapter 15—Verse 29)

"আদমের রূহ্ সেই
কেতাবে শুনিলাম তাই,…"

"খোদ ছুরাতে পয়দা আদম
এও জানা যায় অতি মরম,
আকার নাই তার ছুরাত কেমন,
লোকে বলিবে তাও আবার॥"

আশ্চর্যের বিষয়, ভগবান নিরাকার, তবুও তিনি যে আদমের মধ্যে আকার ধারণ করিয়াছেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। আর মহম্মদ তো তাঁহার অবতার এবং উভয়ের নামের মধ্যে অক্ষর-সাদৃশ্যও রহিয়াছে।

"আহমদের নাম লেখিতে
মি-মুন কি হয় তার কিসেতে,
সিরাজসাঁই কয় লালন তাতে
কিঞ্চিৎ নজীর দেখ এবার॥"

গানটির এই অংশটুকু লক্ষ্যের বিষয়। কেবল লালন নয়, বাংলার প্রায় সমস্ত ফকির-মহলে ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা। লালনের আর একটি গানে আছে :

"শুনেছি এক মানুষের খবর,
আলেফের জের মিমের জবর,
লালন বলে হ'সনে ফাঁফর
মুরশিদ ধরলে জানা যায়।" (গান নং ৭৭)

আরেকটি গানের অংশবিশেষে আছে :

"আহামদ নামেতে দেখি
মিম হরফ লেখেন নবী,
মিম গেলে আহাদ বাকী
আহামদ নাম থাকে না॥" (অপ্রকাশিত)

পাঞ্জ শাহ্ একটি গানে বলিতেছেন :

"নবী চিনে করো ধ্যান।
আহাম্মদে আহাদ মিলে আহাদ মানে ছোব্বাহান ॥"

(গান নং ২৩২)

বিষয়টি এই,—আরবীতে স্বরবর্ণ-বোধক অক্ষর নাই। স্বরবর্ণ বুঝাইতে হইলে তাহা 'জের্' (ই), 'জবর্' (অ) ও 'পেষ্' (উ) দ্বারা বুঝান হয়। 'আহামদ' শব্দে আলেফ (অ) এবং মিম (ম) এই দুইটি বর্ণের সঙ্গে দুইটি স্বরবর্ণ-বোধক চিহ্ন 'জের' ও 'জবর' ব্যবহার করা হইয়াছে। 'আহামদ' লিখিতে 'মিম' হরফ লিখিতে হয়, 'মিম' বাদ দিলে 'আহাদ' থাকে।

'আহামদ' হইতেছেন মহম্মদ, এবং 'আহাদ' হইতেছেন আল্লা। ফকিরগণ বলিতে চাহেন যে, মহম্মদ ও আল্লায় কোনো প্রভেদ নাই। আল্লা আকৃতিহীন, কিন্তু তিনি মহম্মদের মধ্যে আকৃতি ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং আদমের মধ্যেও তিনি আকৃতি ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। অর্থাৎ মানুষ ভগবানের প্রতিচ্ছবি এবং মানুষের মধ্যেই ভগবানের প্রকাশ। মানুষই ভগবান। ইহা যে সুফী-মতের প্রধান কথা, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি।

আর একটি গানে (২২নং) লালন বলিতেছেন, এক ঈশ্বর ছাড়া জগতে আর কিছু নাই। যে যে-ভাবে চিন্তা করে, তিনি সেইভাবে তাহার নিকট প্রতিভাত হন। 'রাম', 'রহিম', 'করিম', 'কালা'—এগুলি সবই তাঁহার বিভিন্ন রূপ :

"যে যা ভাবে সেই রূপ সে হয়।
রাম, রহিম, করিম, কালা এক আল্লা জগৎময় ॥ (গান নং ২২)

কোরানে আছে যে, ঈশ্বর সব জিনিসকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। বিশ্বব্যাপী তাঁহার অস্তিত্ব। যাহার বিচার-বিবেচনা নাই, সে কোরানের বাণীর এই তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার—এই প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাঁহার একমাত্র আকার 'নরেকার' (নরাকার)। ঈশ্বর-চিন্তায় ও সাধনায় মনের অন্তস্তলে যে মূর্তির উদয় হয়, তাহা তো নরাকৃতি। এক আল্লাই মনুষ্য-দেহে প্রকাশিত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নরাকৃতি উপাস্য মূর্তিতে ('ঘটে পটে') তাঁহার আবির্ভাব ('রাম, রহিম, কালা' ইত্যাদি)। (তুলনীয়— "কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।")

আর একটি গানে (২৯ নং) লালন বলিতেছেন, 'সাঁই'-এর লীলা-খেলা দেখিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি তো আকার-বিশিষ্ট। নিজের আকৃতি অনুসারে তিনি আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু আকৃতি না থাকিলে কি হঠাৎ এইরূপ সৃষ্টি হইল ?—

"আদমেরে পয়দা করে খোদ ছুরাতে পরওয়ার।
ছুরাত বিনে পয়দা কিসে হইল সে কি হঠাৎকার॥ (গান নং ২৯)

'নূর' ঈশ্বরের জ্যোতি বলিয়া কোরানে উক্ত হইয়াছে। 'নূর' তো নিরাকার, কিন্তু কেমন করিয়া "নূর চোয়ায়ে হয় সংসার ?" অর্থাৎ নূর কেমন করিয়া পৃথিবী-রূপে আকৃতি ধারণ করে ? তারপর তিনিই তো মহম্মদ-রূপে আমাদিগকে এ সংসারে পরিচালনা করিতেছেন ('ছাদি'←—'হাদি') ; সুতরাং ঈশ্বরকে তো নিরাকার বলা যায় না। মানুষের আকারই তো তাঁহার আকার।

লালন আর একটি গানে (৪৩ নং) বলিতেছেন যে, মক্কায় ঈশ্বরের বাস (মক্কাকে 'ভগবানের গৃহ'—'বাইতুল্যা' বলা হয়), কিন্তু ঈশ্বর তো নিজের নূর দ্বারা তাঁহার বাসের জন্য এই মানবদেহ-রূপ মক্কা নির্মাণ করিয়াছেন। এই দেহ-মক্কায় মহাজ্যোতির্ময় তিনি উপবিষ্ট আছেন :

"ও তার চার দ্বারে চার নূরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে॥" (গান নং ৪৩)

এই জ্যোতির চারিধারে (চারিদ্বারে) চারিজন ইমাম উপবিষ্ট,—ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সাফী, ইমাম মালিক, ইমাম ইবনে হাম্বল। এই 'মানুষ-মক্কা'য় ঈশ্বর-নির্মিত সাতটি স্বর্গের মতো সাতটি 'তালা' (তল) আছে।[৫৬১] এই সপ্ত-তালার উপর হইতে নিম্ন পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া একটা অলৌকিক শব্দ উত্থিত হইতেছে। এই দেহ-মক্কার সিংহদ্বারে একজন বিনিদ্র প্রহরী আছেন। কোরানের মতানুযায়ী এই নিদ্রা-ত্যাগী দ্বারীকে জেব্রিল বলা যায়। জেব্রিলই ভগবানের বাণী মহম্মদের নিকট আনিয়া দিতেন। এই দেহ-মক্কায় সপ্ত-'তালা' অর্থাৎ ষট্‌চক্রের উপরিস্থ সহস্রারে আদি ইমাম 'মিঞা সাহেব' বাস করিতেছেন। তাঁহার বাণী জেব্রিল-রূপী সাধুপুরুষ বা গুরু মানুষের নিকট আনিয়া দিতেছেন।

৫৬১। **The Holy Quran,**—Chap. II, verse 29 (. . . . "He made them complete seven heavens . . . . .").

লালন বলিতেছেন, "গুরুপদে ডুবে ধাক্কা সামলাইলে" ইহার যথার্থ মর্ম জানা যায়। লালনের অভিপ্রায় এই যে, দেহের শীর্ষদেশে যে ঈশ্বরের অবস্থিতি, তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার মর্ম, তাঁহার বাণী প্রভৃতি গুরুর নিকটই প্রাপ্তব্য। ইহা লালনের ইসলাম ও স্থফীধর্মের মিলনের প্রচেষ্টা।

লালন আর একটি গানে বলিতেছেন যে, খোদা, নবী ও আদম একই ব্যক্তি। অনন্ত তাঁহার রূপ :

"আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি
অনন্তরূপ করে ধারণ ;"

আবার তিনিই

"মুরশিদ-রূপে ভজন-পথে ॥" (নং ৬৭)

লালনের গানের সমগ্র সংগ্রহের মধ্যে (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) দুই-তিনটি গানে এক 'অচিন মানুষ' বা 'অজান মানুষ'-এর উল্লেখ আছে। তিনি ঠিক খোদা নন, খোদা হইতে একটু ভিন্ন-মূর্তি। অথচ তিনি "নবীর বড়ো", কিন্তু "খোদার ছোট"। ১৩৮ নং গানটি দ্রষ্টব্য। আপাতদৃষ্টিতে গানটি দুর্বোধ্য মনে হয়। ঐ গানটির এইভাবে একটা অর্থ-নির্দেশ করা যায় :

এই পৃথিবীতে একজন 'অচিন মানুষ' আছেন। যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, বা সময়বিশেষে, তিনি স্পর্শমণি-তুল্য অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য হন ; অন্য সময় তাঁহার পরিচয় কেহ জানে না। নবী ঈশ্বরের বাণী-প্রচারক। (সনাতন ইসলাম অনুসারে যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বাণী প্রাপ্ত হন, বা যাঁহাদের নিকট ঈশ্বর স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাঁহারা ধর্মপ্রবর্তক। তাঁহাদের নাম— নোয়া (নুহা), এব্রাহাম (এব্রাহিম), ইসমেইল (এসমাইল), আইজ্যাক (এসাহাক), জেকব (ইয়াকুব), জেসাস (ঈশা), জব (আয়ুব), জোনা (ইয়নুস), এ্যারন (হারুণ), সলোমন (সোলায়মান) এবং ডেভিড (দাউদ)। ইহারা মহম্মদের পূর্ববর্তী নবী (*The Holy Quran*, Chapter 4—Verse 163, সুরা নেসা। ইহাদের পর মহম্মদের আবির্ভাব।) মহম্মদই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি এবং 'অলি' (ওয়ালি) অর্থাৎ সাধুপুরুষগণ তত্ত্বজ্ঞান (আরফিনে) সম্বন্ধে ঈশ্বরের বাক্য বা উপদেশাবলী জনসমাজে প্রচার করিবার সংঘভুক্ত (অর্থাৎ করিয়া থাকেন)। কিন্তু সেই 'অচিন জন' ঈশ্বর-প্রেরিত কোনো ধর্মসূত্র বা নির্দেশ প্রচার না করিয়াই

('বে-কালমায়') সমস্ত গুরুর গুরু অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। যে-দিন ঈশ্বর একাকী নিরাকার অবস্থায় ভাসিতেছিলেন, অর্থাৎ নিরালম্ব অবস্থায় ছিলেন, তখন সেই 'অচিন মানুষ' তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। সেই 'অচিন মানুষ' শক্তিশালী ("দড়ো"), তিনি খোদার ছোট (শক্তি, প্রভুত্ব ও গৌরবে) কিন্তু নবীর "বড়ো" (ঐ ঐ বিষয়ে)।

এখন "খোদার ছোট" ও "নবীর বড়ো" এই 'অচিন মানুষ'টি কে? কি তাঁহার স্বরূপ?

এই প্রসঙ্গে আর একটি গান বিচার্য (গান নং ৭৬)। ঐ গানে লালন বলিতেছেন:

এক 'অজান মানুষ' বর্তমান, তাঁহাকে জানা দরকার, তাঁহাকে চেনা দরকার। কিন্তু শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত হইলে ('বুনিয়াদ') অর্থাৎ শরীয়ত-পথে তাঁহাকে কিছুতেই জানা যাইবে না। মনের বিকার অর্থাৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনাদি প্রশমিত হইলে মারফত-পথে তাঁহাকে জানা যাইবে। ভবনদীতে এক আশ্চর্যজনক ফুল ফোটে, চিরদিনই অর্থাৎ ফুল ফুটিলেই রসিক বুলবুল-পাখী-রূপ সেই মানুষ এই ফুলের মধু খায়। লালন ঈশ্বরের নরাকার অবতার মহম্মদ নামে এক মানুষের খবর শুনিয়াছেন বটে। কিন্তু মহম্মদই কি সেই মানুষ? লালন বলিতেছেন, এই সন্দেহ নিরসন করিতে পারেন একমাত্র গুরু। তাঁহাকে ধরিলেই সব জানা যাইবে।

এই গান দুইটির অর্থ অর্থাৎ সেই 'অচিন' ও 'অজান' মানুষটি কে, সে সম্বন্ধে আমি কুষ্টিয়া অঞ্চলের অনেক লালনশাহী ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহারা নির্দিষ্ট কোনো উত্তর দিতে পারে নাই। কেবল একজন ফকির হীরু শাহ্, যিনি ঐ অঞ্চলের ফকিরদের মধ্যে বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই 'অচিন মানুষ'ই 'সহজ-মানুষ', যিনি সময়বিশেষে ত্রিবেণীতে উপস্থিত হন এবং ফুলে মধু খান। আল্লা, যিনি মস্তক-শীর্ষে ঈশ্বর-রূপে থাকেন এবং যিনি 'সহজ-মানুষ' হইয়া লীলা করেন, তাঁহাদের মধ্যে লালন একটু ভেদ করিতেছেন মাত্র। মূলমানুষ অর্থাৎ আল্লা এবং এই 'অজান মানুষ' আসলে একই—কেবল রূপ-ভেদমাত্র। তখন ঐ ফকিরের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক মনে হয় নাই। কারণ সমস্তপ্রকার 'মানুষ' বুঝাইতে লালন তাঁহার বহু গানে ঈশ্বরকেই বুঝাইয়াছেন এবং অন্যান্য সমস্ত ফকিরও তাহাই বুঝাইয়াছেন। কেবল এই দুইটি গানে লালন 'অজান মানুষ'কে 'খোদার ছোট' বলিতেছেন।

তারপর দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই পশ্চিমবঙ্গে বহু রসিক বৈষ্ণব ও মুসলমান-ফকিরকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিয়াছি এবং এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখন দেখিতেছি, হীরু শাহের ব্যাখ্যাই ঠিক।

দুইটি গান একত্র করিয়া এই 'অচিন মানুষে'র স্বরূপ নির্ধারণ করিলে ইহাই পাওয়া যায়ঃ (ক) 'অচিন মানুষ'কে শরীয়তে জানা যাইবে না, মারফতে জানিতে হইবে। ইনি 'বে-কালমা'য় অর্থাৎ প্রচলিত ইসলামধর্ম বা আনুষ্ঠানিক কোনো প্রচলিত ধর্মের বহির্ভূত বিষয়ে নির্দেশ দেন। এই প্রকারে ইনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। (খ) যখন ঈশ্বর একাকী ছিলেন—অর্থাৎ যখন ঈশ্বর স্থির, অব্যক্তরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অচিন মানুষ সঙ্গিরূপে তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। তাঁহার তখনকার কার্যের রূপ জানা যায় নাই মাত্র। (গ) এই মানুষ রসিক বুলবুলের মত পদ্মফুলে মধু খান। (ঘ) ৭৬ নং গানে এই 'অচিন মানুষ' যদি মহম্মদ হইতেন, তবে ১৩৮ নং গানে তাঁহাকে 'নবীর বড়ো' বলার অর্থ হয় না। সুতরাং লালন ৭৬ নং গানে আলেফের 'জের', ও মিমের 'জবর'-যুক্ত যে মানুষের খবর বলিতেছেন, সেই মানুষ কি এই 'অজান মানুষ'? ইহা লালনের সত্যকার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন। ইনি যে সেই মানুষ অর্থাৎ মহম্মদ নন, ইহাই লালনের অভিপ্রায়। সেই জন্য তিনি প্রকৃত খবর কেবল গুরুই বলিতে পারেন, বলিতেছেন।

'সহজ-মানুষ' সম্বন্ধে পূর্বের আলোচনা স্মর্তব্য। বাউলরা ঈশ্বর ও 'সহজ-মানুষে'র মধ্যে একটা প্রভেদ করিয়াছে। ঈশ্বর স্থির, অচঞ্চল, নিস্তরঙ্গ শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষ। কিন্তু 'সহজ-মানুষ' লীলাময়, শৃঙ্গার-লীলাশীল, প্রকৃতির দেহে সময়বিশেষে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি পুরুষের দেহে ঈশ্বর-রূপে এবং প্রকৃতির দেহে কারণ-প্রবৃত্তির চারিদিন পর হইতে ঈশ্বর-রূপে বিরাজিত। কেবল চারিদিন তিনি প্রকৃতির দেহে 'সহজ-মানুষ'-রূপে আবির্ভূত।

লালন তাঁহার কল্পনায় 'সহজ-মানুষ'-এর সঙ্গে ঈশ্বরের একটি কল্পিত ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মূলে উভয়েই এক বস্তু—কেবল রূপ-ভেদমাত্র (তুলনীয়—রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' ও 'বিশ্বদেবতা')। মাত্র কয়েকদিনের জন্য 'সহজ-মানুষে'র আবির্ভাব বলিয়া ঈশ্বর হইতে তিনি একটু ছোট—এই কথা লালন বুঝাইতে চাহেন।

পাঞ্জ শাহের গানেও লালনের মতো এই প্রকারের সুফী-প্রভাবই দেখা যায় :

"আল্লার নূরে নবীর জন্ম, নবীর নূরে সারা জাহান্।
নূরে জানে আদমতনে বসত করে বর্তমান ॥"

আল্লা ও নবীর নূর আদমের দেহে বাস করে। এই মানুষের দেহের মধ্যে আল্লা ও নবীর আবির্ভাবই 'বর্তমান'। আল্লা ও নবীতে ভেদ নাই (গান নং ২৫৫)। এই দেহ-কেন্দ্রিক সাধনাই বাউলদের 'বর্তমান' সাধনা।

এই আল্লা-নবী—

"আউয়ল, আখের, জাহের, বাতন—চারিরূপে বিরাজমান।
বাতনে গোপনে থেকে জাহেরে দেন তরীকদান ॥"

(গান নং ২৫৫)

আউয়ল (প্রথম), আখের (শেষ), জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতন (গোপন) এই চারিরূপে বিরাজ করেন। তিনি দেহমধ্যে গোপনে অবস্থান করিয়া প্রকাশ্যভাবে নির্দেশ দেন।

মানুষের মধ্যে যে নূর বিদ্যমান, তাহার চারিটি দিকে চারিজন ইমাম আছেন, ইহা আমরা লালনের একটি গানে দেখিয়াছি। পাঞ্জর একটি গানে (২৫৪ নং) আছে, নূরের আসনের চারিদিকে চারিটি বর্ণ বিদ্যমান :

"ছিয়া (কালো), ছফেদ, (সাদা), লাল, জরদে (হলুদ)
নূরের আসন ঘিরে রয়।
মোকাম নাছুত, লাহুত, মালকুত, জবরুত চারি হয়,
চার মোকামে মঞ্জিল-দ্বারে গুপ্ত বেশে কিরণ দেয়
লা-মোকামে নূরের আসন, হাউতে নবোত বাজায় ॥"

এই মোকামগুলি কেবল উল্লেখের জন্যই উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার পারম্পর্যের কোনো জ্ঞান রচয়িতার ছিল কিনা সন্দেহ। 'হাউত'-মোকামে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, সেখানে নূর নহবৎ বাজায় কিরূপে? তারপরেই নূরের আসল স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই "অঙ্গহীন নূর" "আপন জোরে বেগ ধ'রে ত্রিবেণীর ঘাটে যায়," এবং "পদ্মফুলে ভ্রমর হ'য়ে মধু খায়।" আর "এই নূরের যত্ন জানেন কেবল ফাতিমা।" ফকির পাঞ্জ শাহ্ ফাতিমাকে প্রকৃতির প্রতীক রূপে ধরিয়াছেন।

পাঞ্জর আর একটি গানে (২৫৫ নং) আছে যে, আদম, হাওয়া, আল্লা ও নবীতে কোন ভেদ নাই। তবে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে :

"সিংহাসনে বসে একেলা।
ছাদেকী এস্ক পয়দা করলেন মালেক আল্লা।
ও সেই এস্ক-জোরে নূরে পয়দা করলেন রসুলে,
এসে দোস্তি করলেন দ্বিদলে॥
সেই মহব্বতে আদম গঠিলে,
হাওয়া-আদম-আল্লা-নবীর ভেদ কেবা বলে॥"

প্রথমে আল্লা 'ছাদেকী এস্ক' অর্থাৎ মূল-প্রেম সৃষ্টি করিলেন। তিনি সেই প্রেমের বশে স্বীয় জ্যোতির দ্বারা মহম্মদকে সৃষ্টি করিলেন এবং তারপরে দ্বিদলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ভালোবাসাতেই আদমকে সৃষ্টি করিলেন।

প্রেমেই যে এই সৃষ্টি, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে যে প্রেমের সম্বন্ধ বর্তমান এবং প্রেমই যে সাধনার সহায়,—এই ভাবটি সুফীধর্ম হইতে মোটামুটিভাবে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রেমকে ফকিররা তাহাদের মূলসাধনার অঙ্গ করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। সুফীদের ভগবৎ-প্রেমকে মানবিক প্রেমের স্তরে আনিয়া ফকিররা প্রকৃতি-সাধনার সঙ্গে উহাকে যুক্ত করিয়াছে।

'ইস্কে মজাজি' অর্থাৎ জাগতিক প্রেম ও 'ইস্কে হকিকি' বা ঐশ্বরিক প্রেম—এইরূপে সুফীরা প্রেমের দুইপ্রকার প্রভেদ করে। তাহারা বলে যে, জাগতিক প্রেম ঐশ্বরিক প্রেমের সোপান। সেই জন্য নর-নারীর প্রেম-সাধনাও তাহাদের উপেক্ষার বিষয় নয়। জামী, হাফিজ প্রভৃতি পারশিক সুফী-কবিগণের রচনায় ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাংলায় লিখিত বিশেষভাবে সুফী-প্রভাবান্বিত গ্রন্থ আলি রাজার 'জ্ঞান-সাগর'। ইহাতে সুফীধর্মের অনেকটা প্রেমের রূপ আমরা পাই, কিন্তু উহার মধ্যে নর-নারীর যুগল-প্রেম, যোগ-সাধনা ও ফকিরী-ধর্মের গোপনীয়তা সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ আছে :

"প্রথমে আছিল প্রভু এক নিরঞ্জন।
প্রেমরসে ডুবি কৈল যুগল সৃজন॥
প্রেমরসে ডুবি প্রভু জাহাকে সৃজিলা।
মোহাম্মদ বুলি নাম গৌরবে রাখিলা॥" (পৃঃ ২৪)

"যুগল না হইলে কেহ না পারে চলিতে।
যুগ ভিনে প্রেমরস না পারে ভুগিতে ॥
একাত্রকি প্রেম না হএ কদাচন।
যুগল হইলে যোগ্য পিরীতি ভজন ॥" (পৃঃ ২৫)

তারপরই এই আল্লা-মহম্মদের যুগল-প্রেম যে নরনারীর প্রেমে রূপান্তরিত হইল এবং নারী ব্যতীত যে সাধনা সম্ভব নয়, তাহার বহু দৃষ্টান্ত গ্রন্থকার দিয়াছেন :

"জোলেখা হইল ভক্ত ইছুপ দেখিয়া।
* * *
উরিয়ার রামা ছিল অধিক সুন্দর।
ভক্ত হৈল সেই রূপে দাউদ পয়গাম্বর ॥
বেশ্যাকুলে ছিল নারী মৈক্ষ শকৃনাবাত।
ভক্ত হৈল দেওয়ান হাফেজ অধিক তাহাত ॥
* * * *
পরম সুন্দরী ছিল কৈবর্ত কুমারী।
নবী ছোলেমান ভক্ত পাই নেই নারী ॥
* * * *
গঙ্গা গৌরী যুগ নারী রাখি দিগম্বর
ভস্মযোগে সাধি সিদ্ধ হইল মহেশ্বর ॥
আছিল আয়েসা বিবি পরম সুন্দর।
সেই রূপে মোহাম্মদ ভক্ত পয়গম্বর ॥" (পৃঃ ৩০-৩১)

তারপর আলি রাজা বলিতেছেন :

"স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস।
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস ॥" (পৃঃ ৮০)

এই বর্ণনাগুলি বৈষ্ণব গোস্বামিগণের পরকীয়া-গ্রহণের বর্ণনার ন্যায়। তারপর যোগের কথা এবং যোগ-পথ যে শ্রেষ্ঠ, এ-কথা নানা স্থানে বলা হইয়াছে :

"মিশাই পরমহংস পবনের সনে।
পূরক রেচক সঙ্গে হৃদের কম্পনে ॥
পূরক রেচক সঙ্গে রাখি মহাহংস।
এক যুগ সাধনে যে শরীর নহে ধ্বংস ॥" (পৃঃ ৫৫)

"তন মধ্যে সরোবর ত্রিপিনীর ঘাট

পূরক রেচক হয়ে ত্রিবেনীর মাঝ।"

তারপর নর-নারীর যুক্ত যোগ-পন্থার কথাও বলা হইয়াছে :

"কোরানেতে কহিআছে জগত ঈশ্বরে।
যোগপন্থে নর নারী সব চলিবারে॥
নর নারী সব যদি ফকিরী না করে।
পূণ্যবলে স্বর্গে গেলে না দেখিবে মোরে॥
যুক্তযোগে নর-নারী করিতে গমন।
সকলের নিজ ঘটে প্রভুর আসন॥" (পৃঃ ১২৩)

তারপর এই যুক্ত যোগ-মূলক ফকিরী-পন্থা যে অতীব গোপন, সে-কথাও আলি রাজা বলিয়াছেন :

"প্রভুর গোপত তত্ত্ব ফকিরী রতন।
জে সবে গোপতে রাখে ফকির সুজন॥
ফকিরী গোপত রত্ন জে করে প্রচার।
সে সব ফকির নহে ত্রিলোক মাজার॥
আল্লার পরম রত্ন যে রাখে গোপতে।
তা সব মহিমা অতি বাড়ে ত্রিজগতে॥" (পৃঃ ১১৩)

ফকিরদের অনেক গানে একটি শব্দ পাওয়া যায় 'বর্জক' বা 'বর্জোক'। লালন বলিতেছেন :

"নজর একদিকে দিলে আর একদিকে অন্ধকার হয়।
নরে নূরে দু'টি নেহার কেমনে ঠিক রাখা যায়॥

*　　　*　　　*　　　*

আইন কল্লেন জগৎ-জোড়া—
সেজদা হারাম খোদা ছাড়া,
মুরশিদ বর্জোক সামনে খাড়া
সেজদার সময় থুই কোথায়॥" (গান নং ১৫৩)

শ্রীহট্টের ফকির কালা শাহের গানে আছে :

"মুরশিদে বর্জক ধ'রে

কাম-সাগরে যাও রে ডঙ্কা মারি ॥" (গান নং ৩৬৮)

এই 'বর্জক' শব্দটি আরবী শব্দ। এই শব্দটি কোরানে কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। (*The Holy Quran*, Chap. 23—Verse 100, Chap. 55, Verse 20 ইত্যাদি) ইহার মূল-অর্থ 'ব্যবধান', 'প্রাচীর', 'দেওয়াল' প্রভৃতি। ইহা স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী স্থলবিশেষ। মৃত্যুর পর আত্মারা শেষবিচারের দিন পর্যন্ত এইস্থানে অপেক্ষা করে।

ফকিররা এই 'বর্জক' শব্দটিকে 'মুর্শিদ' বা গুরু বলিয়া বুঝিয়াছে। গুরু আল্লা ও মানুষের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। ইনি মানুষ ও আল্লার মধ্যে সংযোগ-সাধন করেন। সমস্ত আধ্যাত্মিক কার্যে গুরুর স্থান এই সংযোগ-সাধনের, সুতরাং গুরু আল্লার মতই ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র। লালন তাই দুইজনকেই সমানভাবে প্রণাম করিয়া 'নরে' ও 'নূরে' দুইটি 'নেহার'ই ঠিক রাখিতে চাহিতেছেন।

বাংলায় মুসলমান বাউলদের উপর সুফী-প্রভাব বাহিরের। এ-প্রভাব অন্তঃপ্রবিষ্ট নয়। মূলসাধনাঙ্গে ইহার কোনো প্রভাব পড়ে নাই। পূর্বেও নানা প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়

উত্তরভারতের সন্তগণ ও বাংলার বাউল-সম্প্রদায়

আমি পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিমভারতীয় 'সন্ত'-সাধুগণের সাধনার স্বরূপটি ও তাহাদের 'সহজ'-সাধনা ও বাউলদের 'সহজ'-সাধনার মধ্যে যে মূল-প্রভেদ আছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি।[৫৬২] বাউলধর্মের সঙ্গে এই 'সন্ত'-ধর্মের তত্ত্ব-দর্শন ও সাধন-বিষয়ে যে কোনো মিল নাই, তাহা এতদূর আলোচনার পর, আশা করি, পরিস্ফুট হইয়াছে। সুতরাং এ-বিষয়ে আর আলোচনা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

তবে আচার-ব্যবহার, প্রথা ও কতকগুলি বিশ্বাসে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল আছে। যথা—

(ক) ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা।

(খ) গুরুর প্রতি অচলা নিষ্ঠা।

(গ) মানব-দেহেই পরমতত্ত্বের নিবাস বলিয়া বিশ্বাস এবং দেহকেই সাধনার কেন্দ্র করা।

(ঘ) অধিকারী সাধকদের জন্য সাধারণের দুর্বোধ্য সাংকেতিক ও হেঁয়ালি-পূর্ণ ভাষায় মতবাদ-প্রকাশ।

কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্রই এই-সব ধারণার স্রষ্টা। সন্তদের তিনশত বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ সহজিয়ারা এই-সব মতবাদ প্রচার করিয়াছে এবং এইভাবে তাহাদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে—ইহা আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখিয়াছি। তবে যুগোপযোগী করিয়া এই মতবাদগুলিকে সুন্দর ভাব ও ভাষায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করার মধ্যে যে কৃতিত্ব আছে, তাহা সন্তদেরই। কবীর, দাদূ প্রভৃতি কেবল সাধকই ছিলেন না, অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তিসম্পন্নও ছিলেন। অপূর্ব প্রকাশভঙ্গী তাঁহাদের আয়ত্ত ছিল। তাঁহাদের রচনায় ইহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান।

মধ্যযুগের এই সন্তদের প্রচলিত ধর্মসংস্কার-বর্জিত ভক্তিধর্ম-প্রচারের মূলে

৫৬২। দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৭০—১০৩

একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। হিন্দু ও মুসলমানধর্মের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এই ধর্মের উদ্ভব। প্রচলিত ধর্মের যত গোলযোগ তাহা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান লইয়া। এই সাধুগণ ধর্মের অনুষ্ঠান বাদ দিয়া, উভয় ধর্মের মূলনীতি যে ঈশ্বর-ভক্তি, তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের মতবাদ প্রচার করে। এই সন্তগণ সুফী-প্রভাবের মূলধারাটি গ্রহণ করিয়াছে। সুফীধর্মের ভিত্তি ঈশ্বরপ্রেম। যুক্তি-তর্ক বা জ্ঞানের পথের বাহিরে হৃদয় দিয়া ভগবানকে সুফীরা উপলব্ধি করিয়াছে। এই ঈশ্বর-প্রেমই সন্তদের ধর্মের মূলভিত্তি। সেই জন্য তাহারা ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়াছে, দেহের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজিতে উপদেশ দিয়াছে।

সন্তদের মধ্যে যোগ-ক্রিয়া প্রচলিত ছিল এবং কবীর যোগ-সাধনা করিতেন।[৫৬৩] কিন্তু এই যোগ চিত্ত-স্থৈর্য, দেহ-শুদ্ধি প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত হইত। ইহাকে মূলসাধনায় বিশেষ অবলম্বন করা হয় নাই এবং ইহা দ্বারা ভক্তি ব্যাহত হয় নাই। কবীরকে বলা যায় ভক্ত-যোগী—ঈশ্বর-প্রেমিক যোগী।

কবীরের রচনা সুপ্রচুর। তিনি নানা পদ রচনা করিয়াছেন। কবীর-সাহিত্যের নানা বিভাগ আছে, যথা,—'বীজক', 'রমৈণী', 'সাখী', 'শব্দ' ইত্যাদি। কবীরের বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। দাদূরও বহু পদ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য সন্তেরও উৎকৃষ্ট পদের অভাব নাই। যে-কয়টি বিষয়ে সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে উদ্ধৃতির দ্বারা এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। এ-বিষয় প্রায় সকলেই অবগত আছেন। তথাপি উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কবীরের দুই-একটি পদ উদ্ধৃত করা গেল।

ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর ও বেশ-ভূষা বৃথা :

"মন না রঁগায়ে রঁগায়ে জোগী কপড়া।
আসন মারি মন্দিরমেঁ বৈঠে
ব্রহ্ম-ছাড়ি পূজন লাগে পথরা॥
কনরা ফড়ায়* জোগী জটরা বঢ়ৌলে,
দাঢ়ী বঢ়ায় জোগী হোই গৈলে বকরা।

৫৬৩। দ্রষ্টব্য **The Nirguna School of Hindi Poetry**—*Dr.* Barthwal, Chapter III.

* কানফাটা যোগীরা কানে ছিদ্র করিয়া কুণ্ডল পরে।

জঙ্গল জায় জোগী ধুনিয়া রমৌলে
কাম জরায় জোগী হোয় গৈলে হিজরা ॥
মথরা মুঁড়ায় জোগী কপড়া রঙ্গৌলে,
গীতা বাঁচকে হোয় গৈলে লবরা।
কহহিঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
জম দররজরা বাঁধল জৈবে পকড়া ॥"

"যোগী, মন না রঙ্গিয়ে রঙ্গালি কাপড়। আসন ক'রে বসলি মন্দিরে, ব্রহ্মকে ছেড়ে পূজো করতে লাগলি পাথর। ওরে যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি আর দাড়ি রেখে হ'য়ে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জ্বাললি, রে যোগী, কামকে জীর্ণ করে হ'য়ে গেলি হিজড়া। যোগী রে, মাথা মুড়ালি, রঙ্গালি কাপড আর গীতা প'ড়ে প'ড়ে হ'য়ে গেলি মিথ্যাবাদী। কবীর বলছে, সাধু রে ভাই, শোন্, তোকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে রাখবে যমদরজায়।"

"না জানৈ সাহব কৈসা হৈ!
মুল্লা হোকর বাংগ জো দেবৈ,
ক্যা তেরা সাহব বহরা হৈ।
কীড়ীকে পগ নেরর বাজে,
সো ভি সাহব সুনতা হৈ ॥
মালা ফেরী তিলক লগায়া,
লম্বী জটা বঢ়াতা হৈ।
অন্তর তেরে কুফর কটারী,
যোঁ নহিঁ সাহব মিলতা হৈ ॥"

"জানি না তোর প্রভু কিরকম। মোল্লা হ'য়ে যে আজান দিস্, তোর প্রভু কি কালা? ক্ষুদ্র কীটের পায়ে নূপুর বাজে, তা'ও প্রভু শুন্‌তে পান। মালা ফিরাচ্ছিস, তিলক কেটেছিস, রেখেছিস লম্বা জটা। ওরে তোর ভিতরে যে রয়েছে অবিশ্বাসের ছুরি, এতে করে প্রভুকে পাওয়া যায় না।"

"সাধো, পাঁড়ে নিপুন কসাঈ।
করি অস্নান তিলক দৈ বৈঠে, বিধিসৌঁ দেরি পূজাঈ।
আতম মারি পলকমে বিনসে, রুধিরকী নদী বহাঈ ॥
অতি পুনীত্ উঁচে কুল কহিয়ে, সভা মাহি অধিকাঈ।

ইনসে দিচ্ছা সব কোঈ মাঁগে, হঁসি আৱৈ মোহি ভাঈ ॥
পাপ-কটনকো কথা সুনাৱৈ, করম করাৱৈঁ নীচা।
বূড়ত দোউ পরস্পর দীখে, গহে বাঁহি জম খীঁচা ॥
গায় বধৈ সো তুরুক কহাৱৈ, য়হ ক্যা ইনসে ছোটে।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, কলিমে বামহন খোটে ॥"

"সাধু হে, পাঁড়ে (হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ) একটি নিপুণ কসাই। স্নান ক'রে ফোঁটা তিলক কেটে বিধিমত করে দেবী-পূজা। এক পলকের মধ্যে (বলি দ্বারা) রক্তের নদী বহিয়ে দিয়ে সে নিজের আত্মাকেই বধ করে। ব'লে বেড়ায়. অতি পবিত্র উচ্চ কুলে আমার জন্ম। সভামধ্যে সেই উচ্চ কুলের অধিকার দাবি করে। এর কাছেই আবার সবাই দীক্ষা নিতে যায়। শুনে আমার হাসি পায় রে ভাই। এই পাঁড়ে অন্যের পাপ দূর করবার জন্য পুরাণ পাঠ করে, কিন্তু অন্যকে দিয়ে অতি হীন কাজ করায়। দেখা যাচ্ছে, দুই-ই পরস্পরকে ডুবাচ্ছে, আর দু'জনকেই যম হাত ধ'রে টানছে। যে গোবধ করে, তাকে বলে তুরুক। এই লোকটি তার চেয়ে কম কিসে? কবীর বলছে, সাধু রে ভাই, শোন, কলির বামুন অতি বদলোক।"

হৃদয়ের মধ্যেই ঈশ্বরকে খোঁজ করিতে হইবে। তিনি মন্দিরে, মসজিদে বা ধর্ম-শাস্ত্রে নাই:

"মোকোঁ কহাঁ ঢ়ূঢ়ে বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ,
নামৈঁ দেৱল নামৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাসমেঁ।
না তো কৌন ক্রিয়া-কর্মমেঁ, নহী যোগ-বৈরাগমেঁ,
খোজী হোয় তো তুরতৈ মিলিহৌ, পল-ভরকী তালাসমেঁ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, সব স্বাসোঁকী স্বাসমেঁ ॥"

"ওরে বান্দা, আমায় কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছিস। আমি ত তোর পাশেই রয়েছি। আমি দেউলে নেই, মসজিদে নেই, কাবাতে নেই, কৈলাসে নেই। আমি কোনো ক্রিয়া-কর্মতে নেই; যোগ-বৈরাগ্যতেও নেই। যদি সন্ধানী হোস, তা হ'লে খুব শিগ্‌গিরই পেয়ে যাবি, এক পলকের খোঁজাতেই। কবীর বলছে, ভাই সাধু, শোনো, তিনি যে আছেন সব প্রাণের প্রাণে।"

"বেদ-কতেব ইফতরা ভাঈ দিলকা ফিকর ন জাঈ।
টুক দম করারী জো করহু হাজির হজুর খুদাঈ ॥

বন্দে খোজ্ দিল হর রোজ না ফিরি পরেসানী মাহিঁ।
ইহ জু দুনিয়া সহরু মেলা দস্তগীরী নাহিঁ ॥
দরোগ পঢ়ি পঢ়ি খুসী হোই বেখবর বাদ বকাহি।
হক সচ্চু খালক খলকম্যানে শ্যাম মূরতি নাহিঁ ॥
অসমান ম্যানে লহঁগ দরিয়া গুসল করদ ন বূদ।
করি ফিকরু দাইন লাই চসমে জহঁ তহঁা মৌজূদ ॥
অল্লাহ পাক পাক হৈ সক করো জো দূসর হোই।
কবীর কর্ম করীমকা উহু করে জানৈ সোই ॥"

"ভাই বেদ কোরান মিথ্যা। ওগুলো নিয়ে মনের চিন্তা যায় না। যে প্রাণকে সামান্য মাত্র স্থির করতে পারে, স্বয়ং খোদা তার সামনে হাজির হন। ওরে বান্দা, নিজ হৃদয়ে খোঁজ কর্, রোজ বৃথা পরিশ্রম ক'রে মরিস্ না। এই যে দুনিয়া, এটা একটা সহর, একটা মেলা। এখানে হাত পাতিস না। সবাই মিথ্যা শাস্ত্র প'ড়ে প'ড়ে খুশী হয়, নিজের সম্বন্ধে অসাবধান থাকে আর যত বাজে কথা বলে। সত্য সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি এই সমস্ত জগতের মধ্যেই আছেন, মূর্তির মধ্যে নেই। আকাশের মধ্যে একটা সমুদ্র ভাসছে। তাতে স্নান করিস না কেন। এই চর্মচক্ষু দিয়েই দেখ চেয়ে, তিনি যেখানে সেখানে (সর্বত্র) উপস্থিত আছেন। পবিত্র আল্লার উপস্থিতিতে সব কিছুই পবিত্র। যদি অন্য কিছু থাকে, তাহ'লে শঙ্কা করা উচিত। কবীর বলছে, দয়াময়ের (ভগবানের) কাজ যে করে, সেই ওঁকে জানে।"

ঈশ্বর এক এবং তিনি কোনো সম্প্রদায়ের নন:

"এক নিরঞ্জন অল্হ মেরা, হিন্দু তুরুক দহূঁ নহী মেরা।
রাখূঁ ব্রত ন মহরম জানা, তিস হী সুমিরূঁ জো রহে নিদানা।
পূজা করূঁ ন নিমাজ গুজারূঁ, এক নিরাকার হিরদৈ নমস্কারূঁ।
না হজ জাঁউ ন তীরথ-পূজা, এক পিছাণ্যা তৌ ক্যা দূজা।
কহৈ কবীর ভরম সব ভাগা, এক নিরঞ্জন-স্যূঁ মন লাগা।"

"আমার নিরঞ্জন আর আল্লা এক। আমার কাছে হিন্দু তুরুক দুই নয়। আমি ব্রত রাখি না, মহরম কি জানি না, নিদানকালে যে থাকে, তাকে স্মরণ করি। পূজা করি না, নমাজ পড়ি না, হৃদয়ে এক নিরাকারকে নমস্কার করি।

হজ্জেও যাই না, তীর্থব্রতও করি না। এককে চিনলে আর দুই কিসের? কবীর বলছে, সব ভ্রম দূর হয়েছে ; এক নিরঞ্জনে মন নিবিষ্ট হয়েছে।"

হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা ('উলটবাঁসিয়াঁ') :

"অগিনী জু লাগী নীরমেঁ, কন্দু জলিয়া ঝারি।
উতর-দখিনকে পণ্ডিতা, রহে বিচারি বিচারি ॥১॥
গুরু দাঝা চেলা জলা, বিরহা লাগী আগি।
তিণকা বপুরা উবর্যা, গলি পূরেকৈ লাগি ॥২॥
অহেড়ী দৌ লাইয়া, মিরগ পুকারে রোই
জা বনমেঁ ক্রীড়া করী, দাঝত হৈ বন সোই ॥৩॥
পাণী মাহিঁ পরজলী, ভঈ অপ্রবল আগি।
বহতী সলিতা রহ গঈ, মচ্ছ রহে জল ত্যাগি ॥৪॥
সমুঁদর লাগী আগি, নদিয়াঁ জলি কোইলা ভঈ।
দেখি কবীরা জাগি, মচ্ছী রূখাঁ চড়ি গঈ" ॥৫॥

"জলে আগুন লেগেছে, পাকপাত্র একদম জ্বলে গেছে। এ নিয়ে উত্তর-দক্ষিণের পণ্ডিতেরা কেবল বিচারই করছে। গুরু আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। চেলা জ্বলে গেল। আগুন লেগেছে বিরহের। নগণ্য তৃণ (নিরভিমান ভক্ত) বেঁচে গেল এবং পূর্ণের সঙ্গে প্রীতিতে মিলে গেল। ব্যাধ (গুরু) লাগিয়ে দিল দাবাগ্নি (বিরহাগ্নি)। মৃগ (মন) কাঁদছে চীৎকার ক'রে। সে যে-বনে খেলা ক'রে বেড়াত, সেই বনই পুড়ে যাচ্ছে। জলের মধ্যে জ্ব'লে জ্ব'লে আগুন শক্তিশালী হ'য়ে উঠল। বহতী নদী র'য়ে গেল, মাছ র'য়ে গেল জল ছেড়ে। সমুদ্রে (ভবসমুদ্রে) লাগল আগুন, নদীগুলি (প্রবৃত্তিগুলি) জ্ব'লে জ্ব'লে কয়লা হ'য়ে গেল। কবীর জেগে দেখছে যে, মাছগুলি গাছে (ঊর্ধ্বব্রহ্মাণ্ডে) উঠে গেছে।"*

ইহার সঙ্গে ১৭২ ও ৪৪৯ নং বাউল-গান দুইটি তুলনীয়।

জল—ভবসাগর। আগুন—ভগবদ্-বিরহাগ্নি। পাকপাত্র—মন। উত্তর-দক্ষিণের পণ্ডিত—উত্তরের জ্ঞানমার্গী যোগী আর দক্ষিণের বৈধীমার্গী আচার্য। গুরু—ভগবান। চেলা—জীবের 'অহং' ভাব।

* 'ভক্ত কবীর'—অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস। অন্তঃস্থ 'ব' বুঝাইবার জন্য 'র' হরফটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

· দ্বিতীয় খণ্ড ·

॥ বাংলার বাউল গান ॥

●

“খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কম্‌নে আসে যায়।
ধরতে পারলে, মন-বেড়ী
দিতাম তাহার পায়

—ফকির লালন শাহ্‌

●

●

এমন সহজ পথে হুঁচট লাগে,
ওরে দিনকানা।
আপনি সহজ না হ'লে তো
সহজের পথ পাবি না ॥"

—যাদুবিন্দু

●

●

"মনের মানুষ পাই যদি ভাই,
হার ক'রে গলায় রাখি।
মানুষ যে পায়, মান-হুঁশ বটে ;
আসল সে যে, নয় মেকি ॥"

—দীনু ক্ষ্যাপা

●

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ফকির লালন শাহ্ (গান-সংগ্রহের বিবরণ, জীবনী ও গান নং ১—১৬০) …	১—১২৬
পদ্মলোচন বা পোদো (পরিচিতি ও গান নং ১৬১—১৭২)	১২৭—১৩৭
ফটিক গোঁসাই (পরিচিতি ও গান নং ১৭৩ ও ১৭৪)	১৩৮—১৪০
যাদুবিন্দু (পরিচিতি ও গান নং ১৭৫—১৮৫) …	১৪১—১৫১
রাজশাহী ও রংপুর জেলা হইতে সংগৃহীত গান (১৮৬—১৯৬ নং)	১৫২—১৫৯
নরসিংদি হইতে সংগৃহীত গান (বিবরণ ও গান নং ১৯৭—২০১)	১৬০ —১৬৬
চণ্ডী গোঁসাই (পরিচিতি ও গান নং ২০২—২০৬) …	১৬৭—১৭১
রশীদ (পরিচিতি ও গান নং ২০৭—২১০) …	১৭২—১৭৫
রাধাশ্যাম (পরিচিতি ও গান নং ২১১—২১৪) ..	১৭৬—১৭৯
শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত গান (২১৫—২১৭ নং) …	১৮০—১৮২
ফকির পাঞ্জ শাহ্ (পরিচিতি ও গান নং ২১৮—২৭২)	১৮৩—২২১
হাউড়ে গোঁসাই (পরিচিতি ও গান নং ২৭৩—২৮০)	২২২—২২৮
পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত গান (২৮১—২৯৫ নং) …	২২৯—২৪০
গোঁসাই গোপাল (পরিচিতি ও গান নং ২৯৬—৩০০)	২৪১—২৪৭
এরফান শাহ্ (পরিচিতি ও গান নং ৩০১—৩০৩) …	২৪৮—২৪৯
চণ্ডীদাস গোঁসাই (পরিচিতি ও গান নং ৩০৪—৩১২)	২৫০—২৫৬
ময়মনসিংহ হইতে সংগৃহীত গান (৩১৩—৩১৫ নং)	২৫৭—২৫৯
অনন্ত গোঁসাই (পরিচিতি ও গান নং ৩১৬—৩১৯)	২৬০—২৬৫
বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, যশোহর, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা এবং অমিয়াবালা দাসী ও ফকির আকবর শাহের খাতা হইতে সংগৃহীত গান (৩২০—৪৩১ নং)	২৬৬—৩৬৭

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কেঁদুলীর মেলায় নানা জেলার বাউলদের নিকট হইতে বিশেষভাবে সংগৃহীত গান (৪৩২—৪৫৬ নং)	৩৬৮—৩৮৮
বেতালবন বাউল-সমাবেশ হইতে বিশেষভাবে সংগৃহীত গান (৪৫৭—৫১৭ নং) ...	৩৮৯—৪৫৮
'বঙ্গবীণা' নামক কাব্য-সংগ্রহ-পুস্তক হইতে গৃহীত গান	৪৫৯—৪৬৮
অর্থ-সংকেত ও টীকা-টিপ্পনী ...	৪৬৯—৪৮০
গানের প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী ...	৪৮১—৫০০
গ্রন্থপঞ্জী ...	৫০১—৫১৬
শব্দসূচী ...	৫১৭—৬০০

চিত্রসূচী

শিলাইদহে অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ-পল্লীসাহিত্য-সম্মেলনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট বাউল গায়ক-গায়িকা	১
যশোহর জেলার বিশিষ্ট বাউল-সাধক ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৮৩
তত্ত্বজ্ঞ ও বিশিষ্ট বাউল-গুরু হাউড়ে গোঁসাই	২২২
শিলাইদহের বাউল-গুরু গোঁসাই গোপাল	২৪১
রাঢ়ের বিখ্যাত বাউল নিতাই (নিত্য) ক্ষ্যাপা	৩৮৮
বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে বাউল-সমাবেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বাউল	৩৮৯

'শলাইদহে অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলনে যোগদানকারী বিশিষ্ট বাউল গায়ক গায়িকাগণ

সম্মুখের সারিতে উপবিষ্ট (ডান দিক হইতে) (১) নেহাল শাহ, (২) বেহাল শাহ, (৩) শ্রীমতী হরিদাসী, (৪) গহর শাহ্ ও (৫) আব্বাস শাহ্ ; দ্বিতীয় সারিতে উপবিষ্ট (ডান দিক হইতে) (১) লেখক (অভ্যর্থনা- সমিতির সভাপতি), (২) খোদাবক্স শাহ্, (৩) চীরু শাহ্, (৪) শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী (অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক)

[দ্বিতীয় খণ্ড : পৃঃ ১

ফকির লালন শাহ্

গান-সংগ্রহের বিবরণ, রচয়িতার জীবনী ও অন্যান্য তথ্য

রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালন শাহ্ ফকিরের কুড়িটি গান সর্বপ্রথম 'প্রবাসী'র 'হারামণি'-শীর্ষক বিভাগে প্রকাশিত হয় (প্রবাসী, ১৩২২, আশ্বিন—মাঘ সংখ্যা)। ইহার পূর্বে লালনের দুই-চারিটি গান কোনো কোনো সংগীত-সংগ্রহে স্থান লাভ করিতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম অতগুলি গান প্রকাশ করিয়া লালনের প্রতি সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। এই গানগুলি খুব সম্ভব লালনের আখড়ায় রক্ষিত একটি খাতা হইতে নকল করিয়া লওয়া হয়, পরে রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আকারে সেগুলি প্রকাশ করেন।

ছেলেবেলা হইতে দেশের নানা মুসলমান ফকিরের মুখে লালনের গান শুনিয়া আসিতেছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লালনের বিষয় জানিবায় জন্য খুবই আগ্রহ হয়। ১৯২৫ সালে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত লালানশাহী মতের ফকির হীরু শাহের সঙ্গে বাড়ী হইতে দশমাইল পথ হাঁটিয়া লালনের সেঁউড়িয়া আখড়ায় উপস্থিত হই। ঐ দিন ছিল আখড়ার বাৎসরিক উৎসব। প্রতি বৎসর অম্বুবাচি-প্রবৃত্তির দিন ঐ উৎসব হয়। নানা অঞ্চল হইতে বহু লালনপন্থী ফকির সমবেত হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত গান ও তত্ত্বালোচনা করে। ঐ উৎসবে ফকিরদের মুখে শুনিয়া কতকগুলি গান লিখিয়া লই। উহাই আমার লালনের গান-সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা।

ঐ সময়ে আশ্রমে রক্ষিত একখানা পুরানো গানের খাতা দেখি। উহা নানাপ্রকারের ভুলে এমন ভর্তি যে, প্রকৃত পাঠোদ্ধার করা বহু বিবেচনা ও সময়সাপেক্ষ। আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবি বাবু মশায়' লইয়া গিয়াছেন। (শিলাইদহের জমিদারীর অধীন অঞ্চলে সাধারণ লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে 'বাবু মশায়' বলিয়া অভিহিত করিত—সেঁউড়িয়া রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল) লালনের শিষ্যেরা আবার সেই গানগুলি বর্তমান খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহারা আরো বলে যে, সাঁইজীর সেই গানের খাতা পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ অত বড়ো কবি হইয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, অশিক্ষিত ফকির সম্প্রদায়ের এইপ্রকার গুরুভক্তি দেখিয়া সেদিন মনে-মনে হাসিয়াছিলাম।

তারপর ১৯৩৬ সাল হইতে কুষ্টিয়ায় যখন স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করি, তখন লালনের সমস্ত গান পূর্ণাঙ্গ ও শুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। তখন ঐ খাতাখানি আর একবার দেখিবার প্রয়োজন হইলে আখড়ার তদানীন্তন মালিক ভোলাই শা ফকির বলে যে ঐ খাতা মুন্সেফ মতিলাল বাবু লইয়া গিয়াছেন, তিনি উহা দেখিতে লইয়া আর ফেরত দেন নাই। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস মহাশয় কিছু পূর্বে কুষ্টিয়ায় মুন্সেফ ছিলেন। মতিলাল বাবু যে খাতা লইয়া যান নাই, সে খাতা লালনের আস্তানাতেই আছে, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই পাওয়া গেল। যাহোক, সেই খাতা দেখিবার আবার সুযোগ মিলিল। তখন সেই খাতার সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ আকারে দুই শতের কিছু অধিক গান সংগ্রহ করিয়া রাখি। তাহাতে একটা বিষয় লক্ষ্য করি, যে-সব গান ছেলেবেলা ফকিরদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি, তাহার কতকগুলি গান ইহার মধ্যে নাই। এই খাতা যে নানাপ্রকারের ভুলে ভর্তি ও তাহার পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য নয়, তাহা শ্রীমতিলাল দাস মহাশয়ও বলিয়াছেন লালন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে (বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৪১)। যাহোক, ঐ খাতার সহিত মিলানো ও খাতার বাহিরের ফকির-গায়কদের মুখ হইতে শোনা প্রায় তিনশত গান সংগ্রহ করিয়া রাখি।

তারপর লালনের গান-সংগ্রহের ও লালনশাহী ফকিরদের সংস্পর্শে আসিবার বিশেষ সুযোগ ঘটে শিলাইদহে নিখিল-বঙ্গ-পল্লীসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে। কুষ্টিয়া অঞ্চল কেবল ভৌগোলিক সংস্থানের জন্যই নহে, অন্যান্য বিশেষ কারণেও নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলার কেন্দ্রস্থল। ঐ সমস্ত জেলার মুসলমান ফকির ও বাউলপন্থী হিন্দু বৈষ্ণব প্রভৃতির ধর্ম-সাধন-বিষয়ে অনুপ্রেরণারও এইটি একটি কেন্দ্রস্থল। লালন ও বহুসংখ্যক ঐ মতাবলম্বী ফকির এবং গোঁসাই গোপাল ও অন্যান্য বহু বাউলপন্থী রসিক বৈষ্ণবের বাস ও লীলাস্থল এই কুষ্টিয়া অঞ্চল। লালনের তিরোধানের পরবর্তী কালে পাঞ্জ শাহ (কুষ্টিয়া হইতে পাঞ্জ শাহের বাসস্থলের দূরত্ব ২০ মাইলের বেশী নয়, যদিও ইহা যশোহর জিলার মধ্যে অবস্থিত) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এই অনুপ্রেরণার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কুষ্টিয়া অঞ্চল হইতেই এই ভাবধারা চতুষ্পার্শ্ববর্তী জেলায় ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক মুসলমান ও হিন্দুজাতীয় বাউলের উদ্ভব সম্ভব হয়। তারপর এই অঞ্চলের কবি গান, জারি গান, মনসার ভাসান গান, গাজীর গীত, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ এবং প্রায় পল্লীতেই এই সব গানের একাধিক দল দেখা যায়।

এই অঞ্চলের সমস্ত ফকির ও বৈষ্ণবদের এবং এই সব পল্লী-শিল্পীদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিবার জন্য আমরা কয়েকজন মিলিত হইয়া ইহাদের সমাবেশের একটা ব্যবস্থা করি। কবি-তীর্থ শিলাইদহ এই সমাবেশের স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং নিখিল-বঙ্গ-পল্লীসাহিত্য-সম্মেলন নামে এক সম্মেলন আহূত হয় (১৯৪০ সালের মার্চ মাসে)।

বাংলার নানাস্থান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া সাহিত্যিকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সপ্তাহব্যাপী বাউল গান, কবি গান, জারি গান, মনসার ভাসান গান, গাজীর গীত প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলাম আমি এবং সম্পাদক ছিলেন শিলাইদহনিবাসী সুসাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। শচীন্দ্রবাবুর অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপূর্ব সংগঠনশক্তিতে এই সম্মেলন এই অঞ্চলের একটি স্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিয়াছে। (ইহার দীর্ঘ বিবরণ ও কতকগুলি ফটো ইং ৩১।৩।৪০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ;—পরিশিষ্টে কয়েকখানি ফটো দেখা যাইতে পারে)।

এই উপলক্ষে বাংলার বহুস্থানের বাউলদের এবং বিশেষ করিয়া লালনশাহী ফকিরদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয় ও তাহারা তিনদিনব্যাপী গান ও নানা তত্ত্বালোচনা করে। এই সুযোগে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত লালনশাহী ফকিরদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয় ও লালনের গান সম্বন্ধেও তাহাদের গান ও আবৃত্তি দ্বারা প্রকৃত পাঠ যাচাই করিয়া লই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা লালন ফকিরের খাতা হস্তগত হওয়ার গল্প ফকির-মহলে এতই প্রচলিত যে, ঐ 'সাঁইজীর আসল খাতা'য় এই গানগুলি কিরূপে আছে, তাহা না দেখিলে লালনের গানের সত্যকার রূপ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতেছিল না।

ইতিমধ্যে একটা বিষয়ে মনে-মনে যথেষ্ট পীড়া অনুভব করিতেছিলাম। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব লালনের লোকমুখে-শোনা অনেক গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (হারামণি—দুই খণ্ড)। তিনি পল্লীগীতি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছেন এবং এদিকে তিনি একজন পথপ্রদর্শক। কিন্তু লালনের যে গানগুলি তিনি ঐ দুই খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এমন বিকৃত, খণ্ডিত, অশুদ্ধ ও অনেকস্থলে অর্থহীন যে, লালনের গানের সম্যক পরিচয়-প্রদানে তাহাদের সার্থকতা নাই। অধ্যাপক সাহেব অশিক্ষিত গায়কের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, অত্যধিক উৎসাহে কিছুমাত্র

বাছ-বিচার না করিয়াই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী তাঁহার সংগ্রাহকগণও নির্বিচারে তাহাই করিয়াছে। গানগুলি 'যৎ শ্রুতং তৎ লিখিতং'-ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে।

অথচ ইহার সার্থকতা কি বুঝি না। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর রচনা, ইহাতে ভাষাগত কোনো বৈশিষ্ট্য নাই। মাঝে মাঝে ঐ অঞ্চলের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত কথ্যভাষার কতকগুলি বাগ্‌ধারা (idiom) ও ক্রিয়াপদ আছে বটে, তাহাও ঐ গানগুলির অজস্র বিকৃতির মধ্যে অক্ষত নাই। অশিক্ষিত গায়ক কোন্‌টি শুদ্ধ শব্দ তাহা না জানিয়া, রচয়িতা কি বলিতে চাহিতেছে তাহা না বুঝিয়া, যদি মনগড়া অশুদ্ধ অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করে, তবে নির্বিচারে সেই শব্দগুলি রক্ষা করা ভাব-প্রকাশের বাধা সৃষ্টি করা ছাড়া আর তাহা দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, জানিনা। তারপর, এগুলি সাধারণ ভগবদ্ভক্তিমূলক গান নয়,—একটা নির্দিষ্ট সাধনমার্গের তত্ত্ব ও বিচিত্র গূঢ় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রূপায়ণ হইয়াছে ইহাদের মধ্যে; এই গূঢ় সাধন-তত্ত্ব-সংগীতের একটি পদের পরিবর্তে আর একটি পদ বা অসম্পূর্ণ বা অর্থহীন পদ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বহন করিতে পারে না। অধ্যাপক সাহেব এদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি দেন নাই, বোধ হয় এবিষয়ে চিন্তাও করেন নাই; লালন যে কি কথা বলিতে চাহিতেছেন, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া কোনো প্রকারে লালনের ভণিতাযুক্ত কতকগুলি গান ছাপাইতে পারিলেই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, এইরূপ মনে করিয়াছেন। যাহোক, তবুও এ বিষয়ে তাঁহার প্রচেষ্টা পরবর্তী অনুসন্ধানকারীদের পথনির্দেশ করিয়াছে; তিনিই পথিকৃৎ, সেই জন্য তিনি সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই।

দেশবিভাগের পর কলিকাতায় আসিয়া কোনো এক সূত্রে খবর পাই যে, রবীন্দ্রনাথের পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে লালন ফকিরের গানসংবলিত একখানা খাতা পাওয়া গিয়াছে। ঐ খাতা শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে আছে। তখন মনে হইল, ইহাই বোধহয় সেই বহু-শ্রুত, বহু-কথিত 'সাঁইজীর আসল খাতা'। সেই খাতা দেখিবার উদ্দেশ্যে আমি ১৯৪৯ সালে শান্তিনিকেতনে যাই। আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' 'কবিতীর্থের পাঁচালি' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শিলাইদহবাসী, পল্লী-গীতির অকৃত্রিম ভক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়। রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সৌজন্যে খাতাখানা হস্তগত হইলে দেখা গেল, ইহা সেই নানাপ্রকারের ভুলের নমুনাভরা লালনের আখড়ার খাতাখানির একটি কপি। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে দেখিলাম,

ইহার মধ্যে লালনের অনেক সুপরিচিত গান নাই। বেশ বুঝা গেল, 'আসল খাতা' সেই একমাত্র খাতা যাহার নকল রবীন্দ্রনাথ লইয়াছেন, যাহা মতিলাল দাস মহাশয় দেখিয়াছিলেন এবং যাহা আমি কয়েকবার দেখিয়াছি। শচীন্দ্র বাবু বলিলেন এই হাতের লেখা তিনি ভালোরূপ চিনেন,—ইহা শিলাইদহের ঠাকুর এষ্টেটের এক পুরাতন কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যের। শচীন্দ্র বাবু বহুদিন শিলাইদহে ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথা অবিশ্বাস্য নয়। অতএব মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ লালনের আখড়া হইতে খাতাখানি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এক কর্মচারীকে দিয়া নকল করাইয়া লন, পরে উহা হইতে শুদ্ধ করিয়া কতকগুলি গান প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের আসল খাতা লইয়া যাওয়ার যে গল্প চলিয়া আসিতেছিল, তাহার মূলে যে বিশেষ কিছু নাই, তাহা পূর্বে অনুমান করিলেও এবারে নিঃসন্দেহ হইলাম। অতঃপর লালনের পূর্ণাঙ্গ গানগুলি প্রকাশের আর কোনো বাধা রহিল না।

ইহার সম্পাদনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। এই গানগুলি উনবিংশ শতাব্দীর রচনা। অনেক স্থলে তৎসম শব্দের বানান ঠিক করিতে না পারায় অশুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখিত হইয়াছে। বাগ্‌ধারা ও অনেক ক্রিয়াপদ কুষ্টিয়া অঞ্চলের সাধারণের চলিত ভাষার অনুরূপ। অজ্ঞতার জন্য যে শব্দগুলি বিকৃতভাবে উচ্চারিত বা লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি সেইরূপই রাখা অর্থহীন। সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ঐ গানগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান ঠিক করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ করিয়াছি। তবে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি শব্দ খাতায় যেভাবে লিখিত আছে, তাহাও ফুটনোটে দেওয়া হইয়াছে। খাতায় অকারান্ত শব্দ বিশেষত ক্রিয়াপদগুলি ওকারান্ত ভাবে লেখা হইয়াছে। খুব সম্ভব গানের টানে এরূপ হইয়াছে। গায়কদের ও ফকিরদের মুখেও এইরূপ শুনিয়াছি। ক্রিয়াপদগুলিতে আমি ওকার রাখিয়া দিলাম। কারণ, মূলত এগুলি গান।

দুঃখের বিষয় এই সংগ্রহে লালনের এতশত ষাটটি গানের বেশী দেওয়া আর সম্ভব হইল না, কারণ ইহা সারা বাংলার বাউল গানের সংগ্রহ, ইহাতে সকলেরই গানের স্থান দিতে হইবে। তবু লালনের গানের সংখ্যাই বেশী রহিল এবং এগুলি লালনের মতবাদ ও সাধন-তত্ত্বের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রেষ্ঠ গান।

লালনের গানগুলির সংকলনে এইরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে—

(ক) প্রথম খাতা হইতে গানগুলি নানাপ্রকারের ভুল সংশোধন করিয়া, অনেক স্থলে দুর্বোধ্য অংশের বিচার-বিবেচনা দ্বারা যতদূর সম্ভব প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিয়া প্রথম গৃহীত হইয়াছে। তারপর ঐ অঞ্চলের দুইজন বিখ্যাত লালনশাহী ফকির খোদাবক্স শাহ্ ও হীরু শাহের (যাঁহাদের লালনের প্রায় সব গানই কণ্ঠস্থ আছে) নিকট হইতে গান বা আবৃত্তি শুনিয়া সেগুলির শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করিয়া লওয়া হইয়াছে। (গ) খাতায় নাই এরূপ কিছু গান গায়কদিগের নিকট হইতে প্রথমে শুনিয়া তারপর ঐ ফকিরদ্বয়ের দ্বারা বিশেষভাবে বিচার করাইয়া গ্রহণ করিয়াছি।

যতদূর সম্ভব লালনের গানের একটা শুদ্ধ ও যথার্থ পাঠ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আমার নিকট লালনের আরো প্রায় দেড়শত গান রহিল, সেগুলি প্রায় এইসব গানেরই সম-ভাবপ্রকাশক। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভেজাল-মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়। প্রয়োজন হইলে সেগুলি পরে প্রকাশ করা যাইবে।

লালনের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই। আমি কয়েক বছর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিভিন্ন কথা শোনা যায়, তাহা প্রায়ই জনশ্রুতি। তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য হিসাবে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না।

তাঁহার সম্বন্ধে লোকমুখে যাহা শোনা যায়, তাহা ঐ অঞ্চলের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা বিবেচনা করিয়া লালনের একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী খাড়া করা গেল।

পূর্বতন নদীয়া জেলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলা) কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালী থানার অধীন কুষ্টিয়া হইতে চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণ পূর্ব কোণে গোরাই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়রা গ্রামে লালনের জন্ম হয়।

লালনের আবির্ভাব ও তিরোভাব-কাল সম্বন্ধে অনেকটা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। ১২৯৭ সালে কুষ্টিয়া লাহিনী-পাড়া হইতে 'হিতকরী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ হিতকরী পত্রিকাতে লালনের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদটিতে আছে যে, লালন ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১১৬ বৎসর হইয়াছিল। হিতকরী পত্রিকার ঐ পুরানো অংশটুকু লালনের 'আখড়া'য় রক্ষিত আছে। কিন্তু পত্রিকার তারিখের অংশটুকু নাই। অনুসন্ধিৎসু কোনো উপস্থিত ব্যক্তিকে 'আখড়া'র লোকজন ঐ অংশটুকু দেখায়। মতিলাল দাস মহাশয়ও ঐ অংশটুকু

দেখিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"হিতকরী'তে কোনো তারিখ দেওয়া নাই, কাজেই কোন্ সালের কাগজ বোঝা গেল না। অন্যত্র হইতে পাওয়া যায় যে, লালন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মারা যান—জন্মবর্ষ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ।" এই 'অন্যত্র' কোথায় ও তাহার কি সূত্র, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

'হিতকরী' পত্রিকা সম্বন্ধে বাংলার সাময়িক পত্রের ইতিহাস সংকলয়িতা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

"হিতকরী (পাক্ষিক) বৈশাখ, ১২৯৭, কুষ্টিয়া লাহিনী পাড়া হইতে প্রকাশিত। রাজসাহীর 'শিক্ষা-পরিচয়' লেখেন,—"আমরা জানিয়াছি একজন সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী সাধারণের নিকট অদৃশ্য থাকিয়া 'হিতকরী' পরিচালনা করিতেছেন।" আমাদের মনে হয়, পত্রিকাখানি মীর মশারফ হোসেনের, এবং হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) অন্তরালে থাকিয়া উহার সহায়তা করিতেন। দ্বিতীয় বর্ষে 'হিতকরী' টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়।" (বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৫৮); (বাংলা সাময়িক পত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮)

'হিতকরী' ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইয়া চৈত্র পর্যন্ত কুষ্টিয়াতে ছিল। তাহার পর বৎসর মীর মশারফ হোসেনের কর্মস্থল টাঙ্গাইলে উহা স্থানান্তরিত হয়। মীর মশারফ হোসেন এবং কাঙাল হরিনাথই কেবল এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক ছিলেন তাহা নয়, কুষ্টিয়ার তৎকালীন কয়েকজন সাহিত্যামোদী ও বিদ্যোৎসাহী উকীলও এই পত্রিকার পরিচালনা ব্যাপারে অংশ গ্রহণ ও অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। লালনের মৃত্যুসংবাদসংবলিত অংশটুকু ঐ ১২৯৭ সালের 'হিতকরী'রই অংশ তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ১২৯৭ সালের পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখা যায় ১৭ই অক্টোবর ১লা কার্তিক শুক্রবার। ঐ অংশটুকু টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত ১২৯৮ সালের 'হিতকরী'র অংশ হইতে পারে না, কারণ ১২৯৮ সালের ১৭ই অক্টোবর শনিবার দেখা যায়। সুতরাং লালনের মৃত্যুর তারিখ বাংলা ১২৯৭ সালের ১লা কার্তিক, ইংরেজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর। ঐ সংবাদে যে লালনের বয়স ১১৬ বৎসর বলা হইয়াছে, উহাই তাঁহার মৃত্যুকালীন ঠিক বয়স বলিয়া মনে হয়। জনশ্রুতি অনুসারে কেহ বলে লালনের বয়স দেড়শ, কেহ সোয়াশ, কেহ একশ-এর উপর; কেহ ঠিক বলিতে না পারিলেও এটা বুঝা যায় যে, লালন বিশেষ দীর্ঘজীবী ছিলেন। লালনের মৃত্যুর সমসাময়িক কালে প্রকাশিত স্থানীয় এক পত্রিকা কখনই বিশেষভাবে না জানিয়া নির্দিষ্ট একটা বয়সের উল্লেখ করিতে পারে না। সুতরাং লালন ১১৬ বৎসর

বয়সেই মারা যান ইহা আমরা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলে তাঁহার জন্ম হয় বাংলা ১১৮১ সালে, ইংরেজী ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে।

লালন জাতিতে হিন্দু কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল কর, কেহ কেহ বলে দাস। আমি নিজে ভাঁড়রা গ্রামে গিয়া লালনের বাস্তুভিটার অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু অনুমান ও জনশ্রুতির উল্লেখ ব্যতীত কেহই সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলিতে পারে নাই।

শৈশব হইতেই লালন ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির নানা উপাখ্যান সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। এখন একটি বিশেষ প্রশ্ন এই, লালন লেখাপড়া জানিতেন কিনা। এ সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের বহু লালনপন্থী ফকিরদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। তাহাদের অধিকাংশেরই মত লালন নিরক্ষর ছিলেন। তাহারা বলে, লালন লেখাপড়া জানিতেন না, তিনি মুখে মুখে গান রচনা করিয়া গাহিয়া যাইতেন, তাঁহার শিষ্যেরা পরে সেই গান লিখিয়া রাখিত। 'হিতকরী' পত্রিকাতেও ঐরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। লালনের গানগুলির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের যে জ্ঞান, মতবাদের উপর যে অবিচলিত নিষ্ঠা, যে সত্যদৃষ্টি ও কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিলে লালনকে নিরক্ষর ভাবিতে মন কুণ্ঠিত হয়। নিজে তিনি গান লিখিয়া রাখিতেন না, ভাবের আবেশে গাহিয়া যাইতেন, তারপর শিষ্যেরা লিখিয়া রাখিত, তাহা হয়তো সম্ভব, কিন্তু তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নাই।

তখনকার বাল্যবিবাহের যুগে অল্পবয়সেই লালনের বিবাহ হয়। প্রথম যৌবনে তিনি হিন্দুদের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থ শ্রীক্ষেত্রে যান। তখন পুরীধামে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইত। গ্রামের প্রতিবেশীদের সঙ্গে তিনি একত্রে রওয়ানা হইয়াছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। সহযাত্রীরা তাঁহাকে পথের মধ্যে রাখিয়া চলিয়া যায়। তখন সিরাজ নামে এক মুসলমান ফকির ও তাঁহার স্ত্রী লালনকে রোগযন্ত্রণায় অজ্ঞান অবস্থায় পথের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া লালনকে উঠাইয়া লইয়া সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাকে নিরাময় করেন। ঐ রোগে লালনের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ঐ ফকিরের কোনো সন্তানাদি ছিল না, তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে লালনকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। লালন তাঁহাদের নিকট সন্তানবৎ প্রতিপালিত হইতে থাকেন এবং শেষে সিরাজের নিকট হইতে ফকিরি-ধর্মে বা বাউল-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এই লালন-গুরু সিরাজসাঁই সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। মনসুর উদ্দীন সাহেব তাঁহার বন্ধুর বিবরণ অনুসারে বলেন যে "সিরাজসাঁই নদীয়া জেলার হরিনারায়ণপুর গ্রামস্থ এক পাল্কীবাহক।" (হারামণি, ভূমিকা, পৃঃ ১৮/০) আমার বাড়ী ঐ হরিনারায়ণপুর গ্রামে। সেখানে লালনগুরু সিরাজসাঁই বলিয়া কোনো পাল্কীবাহক ছিল, তাহা কোনো দিন শুনি নাই। ইহা যে নিছক বাজে গল্প তাহাতে সন্দেহ নাই।

কুমারখালী-নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীভোলানাথ মজুমদার মহাশয় ঐ অঞ্চলে সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন এবং লালনের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও দু'একটি সভায় পাঠ করেন। লালন তাঁহার পিতার বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে ছেলেবেলায় তিনি লালনকে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, লালন-গুরু সিরাজ সাঁইএর বাড়ী কুষ্টিয়া অঞ্চলে নয়। ফরিদপুর জেলার কালুখালি স্টেশনের নিকটে কোনো গ্রামে একসময়ে তাঁহার বাড়ী ছিল। কিন্তু তাঁহার কোনো স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। তিনি প্রথম জীবন হইতেই সস্ত্রীক ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গের জ্ঞানী ও সাধক—প্রকৃত দরবেশ। মুসলমান হইলেও হিন্দুদের বহু তীর্থে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনিই ঐ অঞ্চলের সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিবর্জিত ফকিরি-ধর্মের অন্যতম আদি গুরু। এই প্রকৃত জ্ঞানী ও সাধক-গুরুর প্রভাব লালনের জীবনকে নূতনভাবে গঠিত করিয়াছিল।

সিরাজসাঁই সম্বন্ধে ও সেই সঙ্গে লালনের সম্বন্ধে অন্য অঞ্চল হইতে আর একটি কথাও শোনা যায়। সিরাজ যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের একজন পাল্কীবাহক ছিলেন। লালনও ঐ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। লালন অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার বশবর্তী হইয়া গান রচনা করিতেন, কিন্তু তাহার তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করিতেন না। একদিন পাল্কীবাহক সিরাজ লালনকে তাঁহারই রচিত একটি গানের অর্থ ও ইঙ্গিত বুঝাইয়া দিতে বলেন, কিন্তু লালন তাহা সম্যক্‌রূপে পারেন না। তখন সিরাজ তাহার প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিয়া লালনকে বিস্মিত করেন। সেই অবধি লালন সিরাজকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহারই নির্দেশে সাধন-ভজন করেন এবং শেষে কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী সেঁউড়িয়াতে গিয়া আখড়া স্থাপন করিয়া বাস করেন।

নানা কারণে এই বিবরণটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে হরিশপুর যে একসময় সমগ্র মধ্যবঙ্গের মধ্যে এই মতাবলম্বী ফকিরদের একটা প্রধান আড্ডা ছিল, এবং এই মতের অনেক হিন্দু সাধকও সেখানে বাস করিত এবং

সম্মিলিতভাবে একই তত্ত্বালোচনা ও ধর্মসাধনা করিত এবং লালনের অনেক শিষ্যও এখানে বাস করিত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। লালনের পরে বিখ্যাত ফকির পাঞ্জ শাহ্‌ও এই হরিশপুরেই বাস করেন এবং বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এই মতাবলম্বী বহু মুসলমান ফকিরের আস্তানা এই গ্রামে বর্তমান দেখিয়াছি। সুতরাং লালনের বাস, এমন কি লালন-গুরু সিরাজসাঁই-এর বাস এখানে কল্পনা করা অস্বাভাবিক নয়।

এদিকে গ্রামবাসীরা বাড়ী ফিরিয়া লালনের মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া দেয়। পিতা-মাতা, পত্নী ও আত্মীয়স্বজন সকলেই শোকসন্তপ্ত হইলেন। তারপর কয়েকবৎসর পরে একদিন লালন বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তিনি তাঁহার নিদারুণ অসুখের কথা, মুসলমান ফকিরের নিকট অবস্থান ও তাঁহার অন্নজল-গ্রহণের কথা অকপটে সকলের নিকট ব্যক্ত করেন। তখন রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুসমাজ লালনকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। লালন বলেন যে, তিনি সংসার করিতে আসেন নাই, তাঁহার স্ত্রীর নিকট জানিতে চাহেন যে, সে তাঁহার সঙ্গে যাইবে কি না। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর সহিত যাইতে অস্বীকার করেন। তখন লালন একেবারে সংসারের মায়া কাটাইয়া সিরাজসাঁই-এর সহিত পুনর্মিলিত হন। গুরুর নিকট অবস্থানকালে তিনি নানা ধর্মের সমস্ত তথ্য অবগত হন এবং গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন।

গুরুর সহিত নানাস্থানে ভ্রমণের পর সম্ভবত গুরুর মৃত্যু হইলে তিনি আনুমানিক ১২৩০ সালে কুষ্টিয়ার প্রান্তে গোরাই নদীর ধারে সেঁউড়িয়া নামক পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হন। দেশের প্রতি একটা স্বাভাবিক টানের জন্যই হোক, বা অন্য কারণেই হোক, লালন এই স্থানে একটা স্থায়ী আস্তানা গাড়েন।

ঐ স্থানে বহু মুসলমান তন্তুবায়—‘জোলা’দের বাস ছিল। এখনও ওখানে অনেক ঘর মুসলমান বয়নশিল্পীর বাস। ঐ স্থানের এক মুসলমান জোলা-রমণীকে লালন নিকা করিয়া তাঁহারই বাড়ীতে বাস করেন। সেই স্থানই ক্রমে তাঁহার আখড়ায় পরিণত হয়।

মনসুর উদ্দীন সাহেবের বিবরণীতে আছে, ‘লালন এই সময় আনমেল নামক একপ্রকার কচু খাইয়া জীবনধারণ করিতেন’, ‘পানের বরোজ করিয়া ব্যবসা করিতেন।’ আনমেল কচু কি-প্রকার তাহা কোনোদিন এ অঞ্চলে দেখি নাই, বা তাহার নাম শুনি নাই। ‘পানের ব্যবসা করিতেন’—ইহার সপক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণের ইঙ্গিত বা সম্ভাব্যতা আছে কি? পরিণত বয়সে

লালন সেঁউড়িয়া আসেন, তখন তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞান, সাধু-জীবন ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যাদিতে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমান সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সহজে অনুমেয় এবং তখনকার সচ্ছলতা ও আথিতেয়তার দিনে এরূপ একটি লোকের পক্ষে জীবিকা-অর্জনের জন্য বহুশ্রমসাধ্য পানের বরোজ করিয়া ব্যাবসা ফাঁদিয়া বসা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

আমার মনে হয়, এই স্থানের বয়নব্যবসায়ী কোনো মুসলমান তাঁহাকে এ স্থানে লইয়া আসেন। প্রথম প্রথম লালন তাঁহারই বাড়ীতে ছিলেন, তারপর ঐ শ্রেণীর এক রমণীকে নিকা করিয়া তাঁহারই বাড়ীতে গিয়া বাস করেন।

কুষ্টিয়ায় দেখিয়াছি, লালনের আখড়ার প্রধান পৃষ্ঠপোষকগণ এই কারিগর বা জোলা শ্রেণীর মুসলমান। তাঁহাদের অনেকেই বর্তমানে শিক্ষিত ও অর্থশালী। তাঁহারা আখড়ার উৎসবাদিতে অর্থসাহায্য করেন। এই 'মোমিন'-শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে লালন-সম্প্রদায়ের কিছু প্রভাব আছে। যদিও শরীয়তবাদী মুসলমানদের নিন্দায় তাঁহারা একেবারে প্রকাশ্যভাবে কিছু করিতে পারেন না, তবুও তলে-তলে তাঁহারা নানাভাবে লালনের স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোকের সহিত আমার এ বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল। তাঁহাদেরও মত এই যে, লালনকে এ দেশে আনিবার বিষয়ে ও তাঁহাকে প্রথম অবস্থায় এখানে প্রতিষ্ঠিত করিবার বিষয়ে এই বয়নব্যবসায়ী মুসলমানগণই অগ্রণী ছিল।

লালন প্রথম প্রথম সেঁউড়িয়ায় খুব কম থাকিতেন। চতুস্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে—পাবনা, রাজসাহী, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায়—শিষ্যগণের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতেন। সেই সময় বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তাহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। অল্পসংখ্যক হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। এক সময় এই মধ্যবঙ্গে এই 'নেড়ার ফকির'দের সংখ্যা খুব বেশী ছিল।

৪০।৫০ বৎসর পূর্বেও এই অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১০ জন এই মতাবলম্বী ছিল। লালনের সমসাময়িক বা পরবর্তী কালে এই মতের দু'চারজন গুরুর উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু লালনই ছিলেন এ অঞ্চলে এই মতবাদের একজন শক্তিশালী আদি গুরু ও প্রচারক। শরীয়ত-বাদীদের অত্যাচারে এই নেড়ার বা বে-শরা বা মারফতী ফকিরের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া গিয়া বিলুপ্তির

সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে পাকিস্তানের আমলে ঐ সব অঞ্চলে বোধ হয় তাহাদের আর চিহ্নমাত্র নাই।

মনসুর উদ্দিন সাহেব তাঁহার বিবরণীতে লিখিয়াছেন,—"তিনি (লালন) স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।"

লালনের ধর্ম কি ইসলাম ধর্ম? লালন-গুরু সিরাজসাঁই জাতিতে মুসলমান হইলেও ধর্মে কি ইসলাম-ধর্মাবলম্বী ছিলেন? তাঁহাদের ধর্ম ফকিরি-ধর্ম—আউল-বাউলের ধর্ম—জাতি-ধর্ম-সংস্কারনির্বিশেষে একটা নির্দিষ্ট সাধনমার্গের ধর্ম।

মনসুর উদ্দিন সাহেব কি ফকিরদের গানই কেবল সংগ্রহ করিয়াছেন, গানের ভিতরে প্রবেশ করেন নাই? আশ্চর্যের বিষয়, লালনের গানে যে ধর্মমত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে কি করিয়া অধ্যাপক সাহেব ইসলাম-ধর্ম বলিয়াছেন? কোরাণের দুই চারিটি গৎ বা কয়েকটি আরবী বা ফারশী শব্দ দেখিয়াই কি অধ্যাপক সাহেব ঐরূপ অনুমান করিয়াছেন?

লালন জাতিতে জাতিতে ও ধর্মে ধর্মে কোন পার্থক্য দেখেন নাই, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মে কোনো বিভেদ বোঝেন নাই। তিনি আল্লাকে 'অধরকালা' এবং মহম্মদ ও চৈতন্যদেব উভয়কেই সমানভাবে ঐশীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহারাই মানুষের উদ্ধারের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেই ভগবানের পূর্ণ-প্রকাশ হইয়াছে। সুফী পারিভাষিক শব্দে তাঁহারাই 'অল্-ইনসানু'ল-কামেল'—দেব-মানব—The Perfect Man. তাঁহারাই মানবের প্রকৃত সদ্‌গুরু—পথপ্রদর্শক। এই সদ্‌গুরুর কৃপা না হইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না, তাই লালন তাঁহাদের উভয়েরই কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের সাধন-তত্ত্ব হিসাবে তিনি গোপী-কৃষ্ণের যুগল-প্রেমকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন এবং সেই প্রেমের মহিমা অনেক গানে কীর্তন করিয়াছেন। এ সব কি তাঁহার ইসলাম ধর্মমতের পরিচায়ক?

শরীয়তবাদী মুসলমানগণ লালনকে ভালো চোখে কোনোদিনই দেখেন নাই। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল লালনের খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিনেও তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছে। 'হিতকরী' পত্রিকায় লালনের যে মৃত্যুসংবাদ এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আছে যে, সাধুসেবা নামে লালনের শিষ্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাভিচার চলে, এবং অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়-সেবায় রত থাকে বলিয়া লালনের শিষ্যদের সন্তানাদি হয় না। ইহাই ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের লালন ও তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রতি ধারণা। এই বাউল-পন্থী

নেড়ার ফকিরেরা চিরকাল ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে।

মৃত্যুর ১৫।২০ বৎসর পূর্বে লালন দেশভ্রমণ হইতে ক্ষান্ত হন। যদিও তাঁহার স্বাস্থ্য অতি উত্তম ছিল, তবুও বার্ধক্যবশত পূর্বের মতো অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারিতেন না। তাঁহার একটা ছোটো ঘোড়া ছিল। তাহাতে চড়িয়া প্রয়োজন হইলে তিনি পার্শ্ববর্তী নানাস্থানে যাইতেন। তখন তিনি পার্শ্ববর্তী পাঁচ-ছয়টি জেলার মধ্যে বহুসংখ্যক শিষ্যের গুরু; জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী ও সাধক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট যশ ও প্রতিপত্তি এবং তাঁহার গান লোকের মুখে মুখে।

লালনের চেহারা সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক লালনপন্থী ফকির খোদবক্স শাহ্ বলেন (১৯৪০ সালে বয়স ৯৭ বৎসর) যে, লালনের মাথায় বাবরী চুল ছিল, মুখে ছিল লম্বা দাড়ি, একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন, মুখে অল্প বসন্তের দাগ,আয়ত চক্ষে এক গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়ও লালনের ঐরূপ বর্ণনা দেন। তিনি ছেলেবেলায় তাঁহাদের বাড়ীতে লালনকে কয়েকবার দেখিয়াছেন।

১

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে॥
অনন্তরূপ সৃষ্টি[১] করলেন[২] সাঁই,
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই,
দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন[৩]
জন্ম নিতে মানবে॥
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছ এই মানব-তরণী[৪]।
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা[৫] না ডোবে॥
এই মানুষে হবে মাধুর্য[৬]-ভজন
তাইতো মানুষরূপ গটলে নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
অধীন[৭] লালন তাই ভাবে॥

২

ক্ষমো অপরাধ, ওহে দীননাথ, কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে
তুমি হেলায় যা করো তাই করতে পারো, তোমা বিনে পাপীর
তারণ কে করে॥

১ লালনের আখড়া সেউড়িয়ার খাতায়—ছিষ্টি; ২ খাতা—কল্লেন; ৩ খাতা—আরাধোন; ৪ খাতা—তোরনি; ৫ খাতা—ভারা; ৬ খাতা—মাধজ্জ; ৭ খাতা—ওধীন; সাধারণ অশিক্ষিত গায়কগণও প্রায়ই এইরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে গান করে।

না বুঝে পাপ-সাগরে ডুবে খাবি খাই,
শেষকালে তোমার দিলাম গো দোহাই,
এবার আমায় যদি না তরাও গো সাঁই,
তোমার দয়াল নামের দোষ রবে সংসারে ॥
শুনতে পাই পরম পিতা গো তুমি,
অতি অবোধ বালক আমি,
যদি ভজন ভুলে কুপথে ভ্রমি
তবে দেওনা কেনে সুপথ স্মরণ ক'রে ॥
পতিতকে[১] তরাইতে পতিতপাবন[২] নাম,
তাইতো তোমায় ডাকি ওহে গুণধাম,
তুমি আমার বেলায় কেনে হইলে বাম,
আমি আর কতদিন ভাসব দুঃখের পাথারে ॥
অথাই তরঙ্গে আতঙ্কে মরি,
কোথায় হে অপারের কাণ্ডারী,
অধীন লালন বলে তরাও হে তরি',
নামের মহিমা জানাও ভবসংসারে ॥

৩

পার করো, দয়াল, আমায় কেশে ধরে।
পড়েছি এবার আমি ঘোরসাগরে ॥
মন-তরী তার ছ'জন মাল্লায়
সদাই তারা কুকাণ্ড বাধায়,
ডুবালো ঘাটায় ঘাটায়
আজ আমারে ॥
ভব-তরঙ্গেতে আমি
ডুবে হলাম পাতালগামী,

১ খাতা—পোতিত ; ২ পোতিতপাবন।

অপারের কাণ্ডারী তুমি
আমায় লওনা কেন ধ'রে ॥
আমি কার, কেবা আমার,
বুঝেও বুঝলাম না এবার ;
অসারকে ভাবিয়ে সার
পলাম ফেরে ॥
হারিয়ে সকল উপায়
শেষে তোর দিলাম দোহাই,
লালন কয় দয়াল নাম সাঁই
জানবো তোরে ॥

৪

ক্ষমো, ক্ষমো অপরাধ দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়।
বড় তুফানে পড়িয়ে এবার বারে বারে ডাকি তোমায় ॥
তোমারি ক্ষমতায় আমি,
যা করো তাই পারো তুমি,
রাখো মারো যা করো, স্বামী,
তোমার লীলা জগৎময় ॥
পাপী অধম তরিতে, সাঁই,
তোমার পতিতপাবন নাম শুনতে পাই,
সত্য মিথ্যা জানবো হে তাই
তরাইলে আজ আমায় ॥
কসুর পেয়ে মারো যারে
আবার দয়া হয় তাহারে,
লালন বলে এ সংসারে
আমি কি তোর কেহই নই ॥

৫

পাপী অধম জীব তোমার
না যদি কর হে পার
দয়া প্রকাশ ক'রে।
পতিতপাবন নাম আজ কে বলবে তোমারে
না হ'লে তোমার কৃপা
সাধন-সিদ্ধি কোথায় কেবা
করতে পারে।
আমি পাপী তাইতে ডাকি,
ভক্তি দেও মোর অন্তরে ॥
জলে স্থলে সব জায়গায়
কীর্তি তোমার প্রকাশ পায়
নানান আকারে।
না বুঝিয়ে লালন পোলো
বিষম ঘোরতরে ॥

৬

এলাহি আলামিন আল্লা বাদশা আলমপানা তুমি।
ডোবায়ে ভাসাইতে পারো,
ভাসায়ে কেনার দাও কারো,
যা করে তাই হবে তোমার—
তাইতো তোমায় ডাকি আমি
নুহু নামে এক নবীরে
ভাসালে বিষম পাথারে,
আবার তারে মেহের ক'রে

আপনি লাগালে কিনারে,
জাহের আছে ত্রিসংসারে।
আমায় দয়া করো স্বামী ॥
নেজাম নামে বাটপাড় সে ত
পাপেতে ডুবিয়ে রইত,
তার মনে সুমতি দিলে,
আউলে খাতায় নাম লিখালে।
জানা গেল এর হুমি ॥
নবী না মানিল যারা
নেহায়েৎ কাফের তারা,
সেই কাফের দায়মাল হবে,
বিনা হিসাবে দোজাকে যাবে,
আবার তারে খালাস দেবে,
জানা গেল এর হুমি।
ফকির লালন কয়, মোর কি হয়
জানো তুমি ॥

৭

আর কি হবে এমন জনম বসবো সাধুর মেলে।
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায় ঘিরে এল কালে ॥
মানব-জন্মেরি আশায়
কত দেব-দেবতা বঞ্চিত হয়,
হেন জনম দিলে দয়াময়,
দিবে কেনে ফেলে ॥
কত কত লক্ষ যোনি
ভ্রমণ করেছ তুমি,
মানব-দলে মন রে তুমি
এসে কি করিলে ॥

ভুলনা রে মন-রসনা,
সম্‌ঝে[১] করো বেচাকেনা,
লালন বলে কূল পাবা না
এবার ঠকে গেলে

৮

গোঁসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে,
আমি পড়ে আছি জঙ্গলে।
(তুমি) কত অধম পাপীতাপী অবহেলে তারিলে
জগাই মাধাই দুটি ভাই
কান্দা ফেলে মারলে গায়,
তারে তো নিলে।
আমি পাপী ডাকছি সদায়,
দয়া হবে কোন্ কালে ॥
অহল্যা পাষাণ ছিল,
সেও তো মানুষ হইল
তোমার চরণ ধূলাতে।
আমি তোমার কেউ নহি গো—
তাই কি মনে ভাবিলে ॥
তোমার নাম লয়ে যদি মরি
তবু তোমারি,
আর যাব কোন্ দলে,
তোমা বই আর কেউ নাই আমার
অধম লালন কেন্দে বলে ॥

১ খাতা—সুমজে

৯

কোথা রৈলে হে ও দয়াল কাণ্ডারী।
এ ভব-তরঙ্গে আমার দেও হে চরণ-তরী ॥
পাপীকে করিতে তারণ
নাম ধরেছ পতিতপাবন,
সেই ভরসায় আছি যেমন
চাতক মেঘ নেহারি ॥
যতই করি অপরাধ,
তথাপি হে তুমি নাথ,
মারিলে মরি।
নিতান্ত বাঁচাও বাঁচিতে পারি ॥
সকলিকে নিলে পারে,
আমাকে চাইলে না ফিরে।
লালন কয় এ সংসারে তোর আমি কি এতই ভারী ॥

১০

জানাবো হে এই পাপী হইতে
যদি এস হে গৌর জীবকে তারিতে ॥
নদীয়া-নগরে যতজন
সবারে বিলালে প্রেমধন,
আমি নর-অধম
না জানি মরম,
চাইলে না হে গৌর আমা' পানেতে ॥
তোমারি সুপ্রেমের হাওয়ায়
কাষ্ঠের পুতলী নলিন[১] হয়,

১ খাতা—নলিন—নবীন, নূতন।

আমি দীনহীন
ভজন-বিহীন,
উপায়হীন বসে আছি এক কোণেতে ॥
মলয় পর্বতের[২] উপর
যত বৃক্ষ[৩] সকলি হয় সার,
কেবল যায় জানা
বাঁশে সার হয়না,
লালন পেলো তেমনি প্রেমশূন্য চিতে ॥

১১

এ দেশেতে এই সুখ হোলো আবার কোথা যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি ॥
কার বা আমি কে বা আমার,
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি ॥
আর কি রে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়ালচাঁদের দয়া হবে,
কতদিন এই হালে যাবে
বহিয়ে পাপের তরণী ॥
কার দোষ দিব এ ভুবনে,
হীন হয়েছি ভজনগুণে,
লালন বলে কত দিনে
পাবো সাঁইএর চরণ দুখানি ॥

২ খাতা—মালোয়া পর্ব্বতের ; ৩ খাতা—বেক্ষ

১২

মনের মনে ঠিকানা হোলো না এতদিনে।
আমি আছি কোথা যাব কোথায় কার সনে ॥
আমার বাড়ী আমার ঘর—
বলা কেবল ঝকমারি সার,
পলকে সব হবে সংহার কোন্ দিনে ॥
পাকা দালান-কোঠা দিব,
মহাসুখে বাস করিব (আছে মনে) ;
ভোলা মন যে কখন যাবে শশ্মানে ॥
(আমি) কি করিতে কি করি,
পাপে বোঝাই হইল তরী,
লালন কয় তরঙ্গ ভারী সামনে[১] ॥

১৩

কারে দিব দোষ,
নাহি পরের দোষ,
মনের দোষে আম্মি পলাম রে ফেরে ॥
আমার মন যদি বুঝিত
লোভের দেশ ছাড়িত,
লয়ে যেত আমায় বিরজা পারে ॥
মনের গুণে কেহ হ'ল মহাজন,
বেপার করে পেল অমূল্য রতন,
আমারে ডুবালি অবোধ মন,
এবার পারের সম্বল কিছুই না গেলাম করে ॥
ভাবলে না অবোধ মনুরায়,
ভেবেছ দিন এমনি বুঝি যায়,

১ খাতা—ছামনে

অন্তিম কালে কি না জানি হয়,
সকল জানা যাবে যেদিন শমনে ধরে
কামে চিত্ত হত মন রে আমার—
সুধা ত্যেজে গরল খেয়ে সে বেহুঁসার,
সিরাজসাঁই কয় লালন রে তোমার
বুঝি ভগ্নদশা বড় ঘটলো আখেরে ॥

১৪

তুমি কার কে বা তোমার এই সংসারে।
মিছে মায়ায় মজে কেন এমন করো রে ॥
এত পিরিত দন্তে জিহ্বায়,
কায়দা পেলে সেও সাজা দেয়,
স্বল্পেতে সব জানিতে হয়
ভাব-নগরে ॥
সময়ে সকলি সখা,
অসময়ে কেউ না দেয় দেখা,
যার পাপে সে ভোগে একা
চার যুগেরে ॥
আপনি যখন নও আপনার
কারে বলো আমার আমার,
সিরাজসাঁই কয় লালন তোমার
জ্ঞান নাহি রে ॥

১৫

দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে না।
চরণ ছেড়োনা রে ছেড়ো না

দৃঢ় বিশ্বাস করি এখন
ধরো নিতাইচাঁদের চরণ,
এবার পার হবি পার হবি তুফান,
অপারে কেউ থাকবে না ॥
হরির নাম-তরণী ল'য়ে
ফিরছে নিতাই নেয়ে হ'য়ে,
এমন দয়ালচাঁদকে পেয়ে
শরণ কেনে নিলে না ॥
কলির জীবকে হ'য়ে সদয়
পারে যেতে ডাকছে নিতাই,
অধীন লালন বলে মন চলো যাই,
এমন দয়াল মিলবে না ॥

১৬

পারে ল'য়ে যাও আমায়।
অ-পার হ'য়ে বসে আছি ওহে দয়াময় ॥
আমি একা রৈলাম ঘাটে,
ভানু সে বসিল পাটে,
তোমা বিনে ঘোর সংকটে
না দেখি উপায় ॥
নাই আমার ভজন সাধন,
চিরদিন বিপথে গমন,
নাম শুনেছি পতিতপাবন
তাইতে দেই দোহাই ॥
অগতির না দিলে গতি,
ও নামে রহিবে ক্ষতি,
লালন কয় অধমের পতি
কে বলবে তোমায় ॥

১৭

কি করি ভেবে মরি মন-মাঝি ঠাহর দেখিনে।
ব্রহ্মা আদি খায় রে খাবি, সেই নদীর পার যাই কেমনে
মাড়ুয়াবাদী যেমন ধারা
মাঝ-দরিয়ায় ডুবায়ে ভরা
দেশে যায় পরিয়ে ধড়া—
সেই দশা মূল ভাব না জেনে॥
শক্তিপদে ভক্তিহারা
কপট ভাবের ভাবুক যারা,
মন আমার অমনি ধারা
ভাবের চুরি রাত্রি দিনে॥
মাখাল ফলটি রাঙাচোঙা
তাই দেখে মন হ'লি খোঙা,
লালন কয় তোর তা'লো ডোঙা
কোন্ ঘড়ি ডোবে তুফানে॥

১৮

এমন দিন কি হবে আর।
খোদা সেই করে গেল রছুল রূপে অবতার॥
আদমের রূহু সেই
কেতাবে শুনিলাম তাই,
নিষ্ঠা যার হল রে, ভাই,
মানুষ মুরশীদ করলে সার॥
খোদ ছুরাতে পয়দা আদম,
এও জানা যায় অতি মরম,
আকার নাই তার ছুরাত কেমন
লোকে বলিবে তাও আবার॥

আহমদের নাম লেখিতে
মি-মুন কি হয় তার কিসেতে,
সিরাজসাঁই কয় লালন তাতে
কিঞ্চিৎ নজীর দেখ এবার ॥

১৯

সকলি কপালে করে !
কপালেব নাম গোপালচন্দ্র, কপালের নাম গুয়ে-গোবরে ॥
যদি থাকে এই কপালে
রত্ন এনে দেয় গোপালে,
কপালো বিমতি হলে
দূর্ববনে বাঘে মারে ॥
কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী,
কপালের ফের হয় সবারি,
মনের ফেরে বুঝতে নারি,
খেটে মরি অন্ধকারে ॥
যার যেমন মনের ঘটনা
তেমনি ফল পেয়েছে সে না,
লালন বলে ভাবলে হয় না,—
বিধির কলম আর কি ফেরে ॥

২০

এস দয়াল আমায় পার করো ভবের ঘাটে।
দেখে ভব-নদীর তুফান ভয়ে প্রাণ কেঁদে ওঠে ॥
পাপপূণ্য যতই করি
ভরসা কেবল তোমারি,

তুমি যার হও কাণ্ডারী
ভব-ভয় তার যায় ছুটে ॥
সাধনের বল যাদের ছিল
তারা কূল-কিনারা পেল,
আমার দিন বৃথা গেল,
কি জানি কি হয় ললাটে ॥
পুরাণে সব শুনেছি খবর—
পতিতপাবন নাম তোমার,
লালন কয় আমি অধম পামর,
তাইতে দোহাই দিই বটে ॥

২১

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা
গলে কাঁথা
কটিতে কৌপীন পরা ॥
গোরা হাসে কাঁদে, ভাবের অন্ত নাই,
সদা দীন-দরদী বলে ছাড়ে হাই,
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা,
হয়েছে কি ধন-হারা ॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে,
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে,
মরি হায় কি লীলা কলিকালে
বেদবিধি চমৎকারা ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়,
গোরা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায় ;

অধীন লালন বলে
ভাবুক হ'লে
সে ভাব জানে তারা ॥

২২

যে যা ভাবে সেই রূপ সে হয়।
রাম রহিম করিম কালা এক আত্মা জগৎময় ॥
'কুল্লে সাইন মোহিত' খোদা
আপনা জবানে কয়ে একথা—
যার নাই রে বিচার, বুদ্ধি নাচার,
পড়িয়ে সে গোল বাধায় ॥
আকার সাকার নয়,
নরেকার এক জনা উদয়,
নির্জন ঘরে রূপনেহারে
এক বিনে কি দেখা যায় ॥
একে নেহার
দাও মন আমার
ছাড়িয়ে রে দো-খোদায়।
লালন বলে
একরূপ খেলে
ঘটে পটে সব জায়গায় ॥

২৩

ও মন, কে তোমার যাবে সাথে।
কোথা রবে ভাই বন্ধু সব, পড়বি যেদিন কালের হাতে
যে আশার আশায় আসা
হলো না তার রতি-মাষা,

ঘটালি রে কি দুর্দশা
অসতের সঙ্গে মেতে ॥
(ও সে) নিকাশের দায় ক'রে খাড়া
মারিবে আতশের কোড়া,
সোজা করবে বেঁকাতেড়া,
জোরজার খাটবে না তাতে ॥
যারে ধ'রে পাবি নিস্তার
তারে সদায় ভাবিলে পর,
সিরাজসাঁই কয় লালন তোমার
যাবে ভবের কুটুম্বিতে ॥

২৪

আর কি গৌর আসবে ফিরে।
মানুষ ভজে যে যা' করো, গউরচাঁদ গিয়েছে সেরে
একবার এসে এই নদীয়ায়
মানুষরূপে হয়ে উদয়
প্রেম বিলায়ে যথাতথা
গেলেন প্রভু নিজপুরে ॥
চারযুগের ভজন আদি
বেদেতে রাখিয়ে বিধি
বেদেরো নিগূঢ় রসপন্থী
সঁপে গেলেন শ্রীরূপেরে ॥
আর কি সেই অদ্বৈত গোঁসাই
আনবে গৌর এই নদীয়ায়,
লালন কয় সে দয়াময়ে
কে জানিবে এ সংসারে ॥

২৫

মন আমার আজ পড়লি ফেরে।
দিন দিন তোর পৈতৃক ধন গেল চোরে
মায়া-মদ খেয়ে মনা
দিবানিশি ঝোঁক ছোটে না,
পাঁচ বাড়ীর উল হল না কে কি করে॥
ঘরের চোরে ঘর মারে মন,
যায় না ঘুম জানবি কখন,
একবার দিলে না নয়ন আপন ঘরে॥
বেপার করতে এসেছিলি,
আসলে বিনাশ হ'লি,—
লালন, তুই হুজুরে গেলে বলবি কিরে॥

২৬

আমি কি দোষ দিব কারে রে।
আপন স্বভাবের দোষে পলাম ফেরে রে॥
সুবুদ্ধি সুস্বভাব গেলো,
কাকের স্বভাব মনের হ'লো,
ত্যজিয়ে অমৃত ফল
মাকাল ফলে মন মজিল রে
যে আশায় এই ভবে আসা
ভাঙল রে সেই আশার বাসা,
ঘটিল রে কি দুর্দশা—
ঠাকুর গড়তে বাঁদর হ'লো রে।
গুরুবস্তু চিনলি নে মন,
অসময়ে কি করবি তখন,

বিনয় করি বলছে লালন—
যজ্ঞের ঘৃত[১] কুত্তায় খেলো রে ॥

২৭

মন তোর আপন বলতে কে আছে।
কার কাঁদায় কাঁদো মিছে ॥
থাক সে ভবের ভাই-বেরাদার,
প্রাণপাখী সে নয় আপনার,
পরের মায়ায় মজিয়ে এবার
প্রাপ্তধন হারাও পাছে ॥
দিবানিশি দেখ মনুরায়—
নানান পক্ষী এক বৃক্ষে রয়,
যাবার বেলায় কে কারে কয়,—
দেহ-প্রাণ এমনি সে যে ॥
মিছে মায়ার মদ খেওনা,
প্রাপ্তপথ ভুলে যেও না,
এবার গেলে আর হবে না,—
পড়বি কয় যুগের প্যাঁচে ॥
আসতে একা আলি রে মন,
যেতে একা যাবি রে মন,
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন,
কার নাচায় নাচো মিছে ॥

২৮

জগৎ শক্তিতে ভুলালে সাঁই।
ভক্তি দাও হে যাতে চরণ পাই ॥

১ খাতা—ঘ্রেতো

রাঙা চরণ দেখব ব'লে
বাঞ্ছা সদায় হৃদ্-কমলে,
তোমার নামের মিঠায় মন মজেছে,
রূপ কেমন তাই দেখতে চাই ॥
ভক্তিপথ বঞ্চিত ক'রে
শক্তি-পথ দিছ তারে,
যাতে জীব ব্রহ্মাণ্ডে ঘোরে ;—
কাণ্ড তোমার দেখি তাই ॥
তরণের যোগ্য মন নয়,
তথাপি মন ঐ চরণ চায়,
অধীন লালন বলে, হে দয়াময়,
দয়া করো আজ আমায় ॥

২৯

সাঁইয়ের লীলা[১] দেখে লাগে চমৎকার[২] ।
ছুরাতে করিল সৃষ্টি[৩] আকার কি সে নিরাকার ॥
আদমেরে পয়দা করে খোদ ছুরাতে পরওয়ার ।
ছুরাত বিনে পয়দা কিসে হইল সে কি হঠাৎকার ॥
নুরের মানে হয় কোরানে,
নুর বস্তু সে নিরাকার প্রমাণে,—
কেমন করে নুর চুয়ায়ে হয় সংসার ॥
আহামদি-রূপে ছাদি দুনিয়ায় দিয়েছে বার ।
লালন বলে মনে দেলে সেও তো বিষম ঘোর আমার

১ খাতা—নীলে ; ২ চোমেতকার ; ৩ ছিষ্টি ; লীলা শব্দটি খাতার সর্বত্র নীলে' ও সৃষ্টি 'ছিষ্টি'—এইভাবে লিখিত।

৩০

কোন্ সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে
নামটি না-শরিকালা,
সবার শরিক সেই একেলা,
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা,
আপনি খাবি খায় ডুবে ॥
ত্রিজগতে যে বায়রাঞা
তার দেখি ঘরখানা ভাঙা,
হায়রে মজার আজব-রঙা
দেখায় ধনি কোন্ ভাবে ॥
আপনে চোরা আপন বাড়ী,
আপনে সে লয় আপন বেড়ী,
লালন বলে এ লাচাড়ি
কই না, থাকি চুপে চাপে ॥

রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে যে গানগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইহা একটি। রবীন্দ্রনাথ-গৃহীত পাঠে একটু-আধটু ভুল আছে বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ত্রিজগতে যে বাই বাঙ্গা' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু 'বাই বাঙ্গা' কথা অর্থহীন। শব্দটি হইবে 'রায়রাঞা'—ফারসী 'রায়রায়ান' (অশেষ ক্ষমতাশালী বা প্রতিপত্তিশালী) শব্দের অপভ্রংশ। তারপর রবীন্দ্রনাথ 'আজব রাঙা' পাঠ লইয়াছেন; প্রকৃত পাঠ 'আজব রঙা' হইবে বলিয়া মনে হয়। 'আজব' (আরবী, অজব) অর্থে আশ্চর্য, 'রাঙা' হইলে 'আশ্চর্যজনকভাবে লাল রঙের' বুঝায়। 'সাঁই 'আশ্চর্যজনকভাবে লাল রঙের ভাব দেখাইতেছে'—ইহা ভালো অর্থপ্রকাশ করে না। 'আজব রঙা' হইলে 'অদ্ভুত কৌতুকজনক লীলা বা ভঙ্গী দেখাইয়াছেন' (রঙ্গ>রঙা)এইরূপ অর্থ শোভন হয়। রবীন্দ্রনাথের আর একটি পাঠ 'আপনে সেলায় আপন বেড়ী'—ইহাও ঠিক পাঠ নয়। 'বেড়ী পরে বা গ্রহণ করে' ইহাই Idiom ; সেলাই করে না—এখানে সে 'লয়' ('গ্রহণ করে') হইবে। অবশ্য খাতার দুর্বোধ্যতার মধ্য হইতে শুদ্ধপাঠ বাহির করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

৩১

কথা কয়রে
দেখা দেয়না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম-ভর মেলে না॥
খুঁজি তারে আসমান-জমি,
আমারে চিনিনে আমি,
একি বিষম ভুলে ভ্রমি—
আমি কোন্ জন, সে কোন্ জনা॥
রাম কি রহিম সে কোন্ জন,
মাটি কি পবন জল কি হুতাশন,
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না॥
হাতের কাছে হয় না খবর,
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর,
সিরজসাঁই কয়, লালন রে, তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না॥

৩২

পাখী কখন যেন উড়ে যায়।
বদ হাওয়া লেগেছে খাঁচায়॥

খাঁচার আড়া প'ল ধসে,
পাখী আর দাঁড়াবে কিসে,
এখন আমি ভাবি বসে,—
সদা চমক-জ্বরা বচ্ছে গায়॥

কার বা খাঁচা কার বা পাখী,
কারে আপন কারে বা পর দেখি,
কার জন্যে বা ঝুরে আঁখি,
আমারে মজাতে চায়॥

যেদিন সাধের পাখী যাবে উড়ে
খালি খাঁচা রবে পড়ে,
সেদিন সঙ্গের সাথী কেউ হবে না
ফকির লালন কেঁদে কয়॥

৩৩

দেখনারে মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি।
আচ্ছা কপনি-ধ্বজা উড়ালে করে ফকিরি॥
যা করো তা করো রে মন,—
রেখো পিছের কথা আগে স্মরণ
বরাবরই।
(ও তোর) পিছে পিছে ঘুরছে শমন কখন দেবে হাতে দড়ি
দরদের ভাই বন্ধুজনা
সঙ্গে তারা কেউ যাবে না,
বড় সাধের বালাখানা
কোথায় রবে পড়ে তোমারি॥
সিরাজসাঁই কয়, লালন ভেড়ো,
তুই করিসনে কারও এন্‌তাজারি॥

৩৪

যেতে সাধ হয়রে কাশী,
কর্ম্মফাঁসি
বাধে গলায়।
আমি আর কতদিন ঘুরব এমন নাগরদোলায়॥
হ'লো রে একি দশা
সর্বনাশা
মনের ভোলায়।
ডুবল ডিঙে নিশ্চয় বুঝি জন্ম-নালায়॥
বিধাতার সাজা একি,
কিবা মন পাজী,
ফাঁকি দিয়ে ফেরে ফেলায়।
বাও না বুঝে বাই তরণী ক্রমে তলায়॥
কলুর বলদ যেমন
ঢেকে নয়ন
পাকে চালায়।
অধীন লালন প'ল তেমনি পাকে হেলায় হেলায়॥

৩৫

মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে।
দেখ না রে সব হাওরার খেলা বন্ধ হ'তে দের কি হবে॥
থাকতে হাওয়া হাওয়াখানা
মওলা বলে ডাক রসনা,
মহাকাল বসেছে রানায় কখন জানি কু ঘটাবে॥
বন্ধ হ'লে এই হাওয়াটি
মাটির দেহ হবে মাটি,

দেখে শুনে হও না খাঁটি,
কে তোরে কত বুঝাবে ॥
ভবে আসার আগে তখন
বলেছিলে করবো সাধন,
লালন বলে, সে কথা মন
ভুলেছ এই ভবের লোভে ॥

৩৬

আয় কে যাবি ওপারে।
দয়ালচাঁদ মোর দিচ্ছে খেয়া অপার সাগরে
যে দিবে সেই নামের দোহাই
তারে দয়া করবেন গোঁসাই,
এমন দয়াল আর কেহ নাই
ভবের মাঝারে ॥
পার করে জগৎ বেড়ি',
নেয় না সে পারের কড়ি,
সেরে স্নুরে মনের দেড়ি
ভার দে না তারে ॥
দিয়ে ঐ শ্রীচরণে ভার
কত অধম পাপী হ'লো যে পার,
সিরাজসাঁই কয়, লালন, তোমার
বিগার যায় না রে ॥

৩৭

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
তারে জনম-ভর একবার দেখলাম নারে ॥
নড়ে চড়ে ঈশানকোণে,
দেখতে পাইনে এ নয়নে,
হাতের কাছে যার
ভবের হাট-বাজার
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে ॥
সবে কয় সে প্রাণপাখী—
শুনে চুপে চুপে থাকি,
জল কি হুতাশন
মাটি কি পবন—
কেউ বলে না একটা নির্ণয় ক'রে ॥
আপন ঘরের খবর হয়না,
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা,
লালন বলে পর, পর কি পরমেশ্বর,
সে কেমন রূপ, আমি কিরূপ ওরে ॥

৩৮

আপনি আপনার মনের না জান ঠিকানা।
পরের অন্তর সে যে সমুদ্দুর, কিসে যাবে জানা ॥
পর অর্থে পরম ঈশ্বর,
আত্মারূপে করে বিহার,
দ্বিদলে হয় বারামখানা,
শতদল সহস্রদলে তার ঠিকানা ;
কেশের আড়ালে যৈছে
পর্বত লুকায়ে আছে,
দরশন হয় না ॥

এবারে হেঁট নয়ন যার
সে যে নিকটে তার,
সিদ্ধি হয় তার সব কামনা
সিরাজসাঁই কয়, ওরে লালন,
গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জেনে নে না ॥

৩৯

খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে।
কত মণিমুক্তা রেখেছে সে ধনী বাঁধাই করে তার দোকানে।
সাধু মহাজন যারা
মালের মূল্য জানে তারা,
মূল্য দিয়ে লন
অমূল্য রতন,
সে ধন জেনে-শুনে তারাই কেনে ॥
মাকাল ফলের বরণ দেখে
যেমন ডালে বসে নাচে কাকে,
তেমনি আমার মন
চটকে বিমন।
(মন তুই) দিন ফুরালি দিনে দিনে ॥
মন, তোমার গুণ জানা গেল,
পিতল কিনে সোনা বল,
অধীন লালন বলে, মন,
চিনলি নে সে ধন,
মন, তুই মূল হারালি নিজের গুণে ॥

৪০

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশীনগর,
এক পড়শী বসত করে।
(আমি একদিনও না দেখিলাম তারে ॥)
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা, নাই তরণী
পারে।
মনে বাঞ্ছা করি
দেখবো তারি—
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে ॥
কি কব সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা
নাইরে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে ॥
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম-যাতনা যেতো
দূরে।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥

৪১

মধুর দিল-দরিয়ায় যে-জন ডুবেছে।
সে না সব জবর খবর পেয়েছে ॥
পর্বতের চূড়ায় গঙ্গা,
জলের ভিতর ডাঙা,

ডুবে দেখ না, একবার ডুবে দেখ না ;
ডুবলে ডাঙা পাই,
উঠলে ভেসে যাই,
বিষম তরঙ্গ সদাই বহিছে রে ;
মাকড়সার আঁশে হস্তী বাঁধা,
লোহার তারে চেঁউটি ছেঁদা,
কখন যায় ছিঁড়ে।
একি অসম্ভব
কাজ-কর্ম সব,
যে জন ডুবেছে, সে জেনেছে ॥
যে স্তনের দুগ্ধ শিশুতে খায়
জোঁকে মুখ দিলে শুধু রক্ত পায়,
উত্তমে উত্তম, অধমে অধম,
লালন বলে যে যেমন সে তেমন পেয়েছে ॥

৪২

সে বড় আজব কুদরতি।
আঠারো মোকামের মাঝে
ওরে জ্বলছে একটা রূপের বাতি ॥
কে বোঝে কুদরতি খেলা—
জলের মধ্যে অগ্নি জ্বালা,
জানতে হয় সেই নিরালা
ওরে নীরে ক্ষীরে আছেন জ্যোতি ॥
চুনি মণি লাল জহরা
সেই বাতি রয়েছে ঘেরা,
তিন সময় তিনি যোগ সে ধরে,
যে জানে সে মহারতি ॥

থাকতে বাতি উজলময়
দেখ না যার বাসনা হৃদয়,
লালন বলে, কখন কোন্ সময়
ওরে অন্ধকার হয় বসতি ॥

৪৩

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে,
দেখ না রে মন ভেয়ে।
দেশদেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে ॥
করে অতি আজব ভাক্কা
গঠেছে সাই মানুষ-মক্কা
কুদরতি নুর দিয়ে।
ও তার চার দ্বারে চার নুরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে ॥
মানুষ-মক্কা কুদরতি কাজ,
উঠছে রে আজগুবি আওয়াজ
সাততালা ভেদিয়ে।
আছে সিং-দরজায় দ্বারী একজন নিদ্রাত্যাগী হ'য়ে
দশ-দুয়ারী 'মানুষ'-মক্কা,
গুরুপদে ডুবে দেখ গা
ধাক্কা সামলায়ে।
ফকির লালন বলে সে যে গুপ্ত মক্কা,
আদি ইমাম সেই মিঞে ॥
(ওরে, সেথা যাই কোন্ পথ দিয়ে ॥)

৪৪

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী যে জন হয়,
মুখে কথা ক'ক না ক'ক, তার নয়ন দেখলে চেনা যায় ॥
মণিহারা ফণী যেমন
প্রেমরসিকের দু'টি নয়ন,
কি দেখে কি করে সে জন,
কে তাহার অন্ত পায় ॥
রূপে নয়ন ঝুরে খাঁটি,
ভুলে যায় সে নাম-মন্ত্রটি,
চিত্রগুপ্ত তার পাপ পুণ্য
কিরূপে লেখে খাতায় ॥
সাঁইজী কয় বারে বারে
শোন রে লালন, বলি তোরে,
তুমি মদনরসে বেড়াও ঘুরে,
সে প্রেম সনে কই দাঁড়াও ॥

৪৫

ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে।
আছে কোন্ মানুষের বসত কোন্ দলে ॥
অযোনি, সহজ সংস্কার—
তারে কি সন্ধানে সাধক একবার ?
বড় গহীন মানুষ-লীলে[১]
ওরে, মানুষ-লীলে[২] ॥
ভজন-সাধন নাহি জানি,
কোথা পাই সহজ, কোথা অযোনি,
বেড়াই গোলে হরিবোল ব'লে—
ওরে, গোলে হরিবোল ব'লে

১ খাতা—নীলে; ২ ঐ—নীলে।

তিন মানুষের করণ বিচক্ষণ,
তারে জানলে হবে এক নিরূপণ,
অধীন লালন প'লো গোলমালে।
ও মন, গোলমালে ॥

৪৬

মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে ॥
মাটির ঢিপি, কাঠের ছবি,
ভূত ভাবে সব দেবাদেবী,
ভোলে না সে এসব রূপি
ও যে মানুষ-রতন চেনে ॥
জিন-ফেরেস্তার খেলা,
পেঁচোপেঁচি আলাভোলা—
তার নয়ন হয় না ভোলা,
(ওসে) মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে ॥
ফেও-ফেঁপি ফেক্‌সা যারা
ভাকা-ভুকোয় ভোলে তারা,
লালন তেমনি চটা-মারা,
ও ঠিক দাঁড়ায় না একখানে ॥

৪৭

সোনার মানুষ ভাসছে রসে।
যে জানে সে রস-পন্থী,
দেখতে পায় সে অনায়াসে

তিনশ’ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি’,
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে ॥
পিতামাতার নাই ঠিকানা,
অচিন দলে বসতখানা,
আজগুবি তার আওনা-যানা
কারণবারির যোগবিশেষে ॥
অমাবস্যায়[১] চন্দ্র উদয়
দেখতে যার বাসনা হৃদয়,
লালন বলে, থেকো সদায়
ত্রিবেণীতে থেকো বসে ॥

৪৮

কোথা আছে রে দীন-দরদী সাঁই।
চেতন-গুরুর সঙ্গ ল’য়ে খবর করো ভাই
চক্ষু আঁধার দেলের ধোকায়,
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই,
বসে নিগম-ঠাঁই ॥
এখানে না দেখলাম যারে,
চিনবো তারে কেমন করে?
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
দেখতে যদি পাই ॥

১ খাতা—আমাবাস্যায়

সুমঝে ভবে সাধন করো,
নিকটে ধন পেতে পারো,
লালন কয়, নিজ মোকাম ঢোঁড়ো,
বহু দূরে নাই ॥

৪৯

ওরে আলেকের মানুষ আলোকে রয়।
শুদ্ধ প্রেম-রসিক বিনে কে তারে পায় ॥
রস-রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝরে,
মূল খণ্ড হয় ॥
লীলায়[১] নিরঞ্জন আমার
আধ-লীলা[২] করলেন প্রচার,
জানলে আপনার জন্মের বিচার
সব জানা যায় ॥
আপনার জন্মলতা
জান গে তাহার মূলটি কোথা,
লালন কয় শেষের কথা
সাঁই-পরিচয় ॥
(হবে শেষে সাঁই-পরিচয় ॥)

৫০

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনিঋষি চারযুগ ধ'রে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥

১ খাতা—নীলেয় ; ২ খাতা—নীলে।

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদায়
আলেকে ব'সে ॥
অচিন দলে বসতি-ঘর,
দ্বিদল পদ্মে বারাম তার,
দল-নিরূপণ হবে যাহার
ও সে দেখবে অনায়াসে
আমার হ'লো কি ভ্রান্তি, মন,
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন,
সিরাজসাঁই কয় ঘুরবি, লালন,
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥

৫১

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখতে পায়।
অমাবস্যা নেই সে চাঁদে দ্বিদলে তার বারাম উদয় ॥
যেথা রে সে চন্দ্রভুবন,
দিবারাত্রি নাই আলাপন,
কোটি চন্দ্র জিনি' কিরণ,
বিজলী চঞ্চলা সদায় ॥
বিন্দুনালে সিন্ধুবারি,
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি,
অধর চাঁদের স্বর্গপুরী,
সেই তো তিনি প্রমাণ জানায়।
দরশনে দুঃখ হরে,
পরশনে সোনা করে,
এমন মহিমা সে চাঁদের—
লালন ডুবে ডোবে না তায় ॥

৫২

সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না।
জল শুকাবে মীন পালাবে পস্তাবি রে মন-কানা ॥
তিরপিনির তীর-ধারে
মীনরূপে সাঁই বিহার করে,
(তুমি) উপর উপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না ॥
মাস-অন্তে মহাযোগ হয়,
নীরস হতে রস ভেসে যায়,
করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীনরূপে খেল দেখলে না ॥
জগৎ-জোড়া মীন অবতার,
তার মর্ম আছে সন্ধির উপর,
সিরাজসাঁই কয়, লালন রে, তার
সন্ধানীকে চিনলে না ॥

৫৩

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে।
চাঁদ রয়েছে চাঁদের কোলে ঈশান কোণে ॥
প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে,
শুক্লপক্ষে আসে নেমে বামে
আবার দেখ কৃষ্ণপক্ষে
কিরূপে যায় দক্ষিণে ॥
খুঁজলে আপন ঘরখানা
তুমি পাবে সকল ঠিকানা।
বারমাসে চব্বিশ পক্ষ,
অধর ধরা তার সনে ॥

স্বর্গ-চন্দ্র দেহ-চন্দ্র হয়,
তাতে ভিন্ন কিছু নয়।
এ চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মিলে,
ফকির লালন কয় নির্জনে ॥

৫৪

যে জন দেখছে অটল রূপের বিহার।
মুখে বলুক না বলুক, সে রাখবে ঐ নেহার ॥
নয়নে রূপ না দেখতে পায়—
নাম-মন্ত্র জপিলে কি হয়,
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়,
রূপের তুল্য কার ॥
নেহারায় গোলমাল হ'লে
পড়বি মন কু-জনার ভোলে,
আখেরে গুরু ব'লে ধরবি কারে
তরঙ্গ-মাঝারে ॥
স্বরূপ-রূপের রূপের ভেলা
ত্রিজগতে করছে খেলা,
অধীন লালন বলে, মন রে ভোলা,
কোলে ঘোর তোমার ॥

৫৫

ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়।
আপন ঘর না বুঝে
বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায় ॥

আমি সত্য না হইলে
হয় গুরু সত্য কোন্ কালে,
আমি যে রূপ
দেখ না সে রূপ
দীন দয়াময় ॥
আত্মারূপে সেই অধর
সঙ্গী অংশ কলা তার—
ভেদ না জেনে
বনে বনে
ফিরলে কি হয় ॥
আপনারে আপনি না চিনিলে
ঘুরবি কত ভুবনে,
লালন বলে অন্তিম কালে
নাই রে উপায় ॥

৫৬

গোঁসাই-এর ভাব যেই ধারা,
আছে সাধুশাস্ত্রে তার
প্রমাণ আচার,
শুনে রে জীবন অমনি হয় সারা ॥
মরার সঙ্গে মরে ভাবের সাগরে
ডুবতে পারে তাহে রসিক যারা ॥
দুগ্ধেতে জলেতে মিশালে সর্বদা
মথন-দণ্ডে[১] করে আলাদা আলাদা,

১ খাতায় আছে 'মৈথনদণ্ড'। শুদ্ধ কথাটি হইবে মন্থন-দণ্ড।

ভাবের ভাবী হবে,
সুধানিধি পাবে,
মুখের কথায় নয়রে
সে ভাব করা ॥
অগ্নি ঢাকা যৈছে ভস্মের ভিতর,
সুধা আছে তৈছে গরল ভিতর,
যে জন সুধার লোভে যেয়ে
মরে গরল খেয়ে
মথনের[২] সুতার জানেনা তারা ॥
যে স্তনের দুগ্ধ খায়রে শিশু ছেলে
জোঁকের মুখে তথায় রক্ত এসে খেলে,
ফকির লালন বলে, বিচার করিলে
কু-রসে সু-রস মিলে এই ধারা ॥

৫৭

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা।
অতি নির্জনে বসে সে দেখছে খেলা ॥
কাছে রয়ে ডাকে তারে উচ্চস্বরে কোন্ পাগলা।
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাক রে ভোলা ॥
যথা যার ব্যথা নেহাৎ সেইখানে হাত ডলা-মলা।
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা ॥
যে-জন দেখে সে রূপ, করিয়ে চুপ, রয় নিরালা।
ও সে লালন ভেড়োর লোক-জানানো হরি বলা—
মুখে হরি হরি বলা

২ ঐ শব্দটিও খাতায় 'মৈথন' বলিয়া আছে। ফকিরদের মুখে 'মথন-দণ্ড' ও 'মথন' শুনিয়াছি। তৎসম শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, রচয়িতাই বা কি উচ্চারণ করিতেন, তাহাও জানা যায় না। এক্ষেত্রে ফকিরদের মুখের সরল পদ্যে ব্যবহৃত শুদ্ধ শব্দটিই গ্রহণ করা গেল। শব্দদ্বয়ের তাৎপর্যের জন্য 'অর্থ-সংকেত' দ্রষ্টব্য।

৫৮

অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।
সে তো শুধু মুখের কথা নয়॥
তার সাক্ষী আছে চাতক রে,
ও সে কোটি সাধনে যায় মরে,
চাতক অন্য বারি খায় না রে,
থাকে মেঘের জল-আশায়॥
বনের পশু হনুমান,
রাম বিনে তার নাই ধিয়ান,
মুদিলেও তার দু' নয়ন
অন্য রূপ না ফিরে চায়॥
রামদাস মুচির ভক্তিতে
গঙ্গা এল চাম-কেঠোতে,
এমন সাধন করে কত মহতে,
কেবল লালন কূলে কূলে বায়॥

৫৯

হীরা-লালমতির দোকানে গেলে না।
ভবে কিনলি রে তুই পিতল-দানা॥
চটকেতে ভুলে রে মন,
হারালি তুই অমূল্য ধন,
হেরে বাজি কাঁদলে এখন
আর সারবে না॥
শেষের কথা আগে ভেবে
উচিত যাহা তাই করিবে,
এবার গত কাজের বিধি ছাড়
মন-রসনা॥

বেপারে লাভ করলি ভাল—
গুণপণা সব জানা গেল,
অধীন লালন বলে এবার মিছে হ'লো
আওনা-যানা

৬০

চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা।
ওরে, কেমন ক'রে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা ॥
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা,
তার মাঝে অধর-চাঁদের আভা,
ও সে চাঁদের বাজার দেখে
ঘুর্ণী লাগে,
দেখিস দেখিস, পাছে হবি রে জ্ঞানহারা ॥
চাঁদের গাছ চাঁদের ফল তায়,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
একবার দৃষ্টি করে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা

৬১

শহরে ষোলজন বোম্বেটে।
করিয়ে পাগল-পারা
নিল তারা
সব লুটে ॥

১ খাতায় এই গানটিতে ভণিতা নাই। ফকিরদের মুখেও ভণিতা শুনি নাই।

পাঁচজন ধনী ছিল,
তারা সব ফতুর হ'লো,
কারবারে ভঙ্গ দিল,
কখন জানি যায় উঠে ॥
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরেরও সে শিরোমণি,
নালিশ করিব আমি
কোন্‌খানে কার নিকটে ॥
গেল গেল ধন, মালও নামায়,
খালি ঘর দেখি জমায়,
লালন কয় খাজনার দায়
তাও কবে যায় লাটে ॥

৬২

ওরে, মন আমার গেল জানা।
কারো রবে না এ ধন
জীবন-যৌবন,
তবে রে কেন এত বাসনা ॥
একবার সবুরের দেশে
বয় দেখি দম ক'ষে,
উঠিস না রে ভেসে
পেয়ে যাতনা ॥
যে করিল কালার চরণেরি আশা
জাননা, রে ও মন, তাহার কি দশা,
ভক্ত বলি রাজা ছিল,
রাজত্ব তার নিল
বামনরূপে প্রভু করে ছলনা ॥

কর্ণ রাজা ভবে বড় দাতা ছিল,
অতিথিরূপে তার সবংশ নাশিল,
তবু না হইল দুখী,
রইল অনুরাগী,
ভক্তিতে, রে মন, পেল সান্ত্বনা ॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র দেখ, কত কষ্ট তার হ'লো,
কৃষ্ণ[১] নামে তার অগ্নিতে ফেলিল,
জলে ডুবাইল, তবু না ছাড়িল
শ্রীনাম-সাধনা ॥
রামের ভক্ত লক্ষ্মণ ছিল সর্বকালে,
শক্তিশেল হানিল তাহার বক্ষস্থলে,
তবু রামচন্দ্রের প্রতি না ভুলিল ভক্তি
লালন বলে করো এ বিবেচনা

৬৩

সদায় মুখে-দেলে রাখ গো সাঁই।
বান্দার একদমের ভরসা নাই ॥
কে যে হিন্দু আর কে যবনের চেলা,
ওরে পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা।
পিছে কাল শমন
থাকে সর্বক্ষণ,
কোনদিন বিপদ ঘটায় ভাই
আমার বাড়ী বিষয় আমার—
সদায় ঐ রবে দিন গেল রে তোমার।

১ খাতা—কিষ্ট

বিষয়-বিষ খা'লি,
সে ধন হারালি,
এখন কাঁদলে আর কি হবে তাই ॥
নিকটে থাকিতে সেই ধন
সদায় চঞ্চলাতে দেখলি না রে মন,
ফকির লালন কয়,
সে ধন কোথায় রয়,
আখেরে খালি হাতে যেতে হবে ভাই ॥

৬৪

ও মন দেখেশুনে ঘোর গেল না।
কি করিতে কি করিলাম
দুগ্ধেতে মিশিল চোনা ॥
মদন রাজার ডাণ্ডা ভারী,
হলাম তাহার আজ্ঞাকারী,
যার মাটিতে বসত করি
চিরদিন তারে 'চিনলাম না
রাগের আশ্রয় নিলে তখন
কি করিতে পারে মদন,
আমার হ'লো কামলোভী[১] মন
মদন রাজার গাঁটরি-টানা ॥
উপর হাকিম এতদিনে
কৃপা করত নিজগুণে,
দীনেরও দীন লালন ভণে
যেতো রে মনের দো-টানা।

১ খাতা—কামলুভী

৬৫

কি সাধনে আমি পাই গো তারে।
ও সে ব্রহ্মাবিষ্ণু ধ্যানে পায় না যারে ॥
স্বর্ণশিখর যার নির্জন গোফা
স্বরূপে সেই তো চন্দ্রের আভা,
ও সে আভা চাই,
হাতে নাহি পাই,
কেমনে সে রূপ যায় গো স'রে ॥
তিন রসের সাধন করো,
রূপ-স্বরূপের তত্ত্ব ধরো,
লালন কয় তবে যদি পারো
প্রাণ জুড়াতে সে রূপ হেরে ॥

৬৬

পাবে সামান্যে কি তার দেখা—
যার বেদে নাই রূপরেখা।
নিরাকার ব্রহ্ম হয় সে,
সদায় থাকে অচিন দেশে,
দোসর নাইকো তার পাশে,
সে ফেরে একা একা ॥
সবে বলে পরম ইষ্টি,
কারও না হইল দৃষ্টি
বরাতে করিল সৃষ্টি,
তাই ল'য়ে লেখা-জোকা ॥

কিঞ্চিৎ ধ্যানে পায় মহাদেবে,
তার তুলনা কি আর হবে,
লালন বলে গুরু ভেবে
যাবে রে তোর সকল ধোকা ॥

৬৭

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।
মুরশিদের চরণ-সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা ;
কোরো না দেলে দ্বিধা,
যে হি মুরশিদ সে হি খোদা।
বোঝ 'অলিয়ম মরশেদা'
আয়েত লেখা কোরানেতে ॥
আপনি খোদা আপনি নবি,
আপনি সেই আদম ছবি,
অনন্তরূপ করে ধারণ ;
কি বোঝে তার নিরাকরণ,
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন,
মুরশিদ-রূপে ভজন-পথে ॥
'কুল্লে সাইন মোহিত' আরও,
'আলাকুল্লে সাইন কাদিরো'—
পড়ে কালাম নেহাজ করো,
তবে সব জানিতে পারো,
কেন লালন ফাঁকে ফেরো,
ফকিরি নাম পাড়াও মিথ্যে ॥

৬৮

আর কি বসবো এমন সাধুর বাজারে।
না জানি কোন্ সময় কোন্ দশা হয় আমারে॥
সাধুর বাজার কি আনন্দময়,
সেথায় অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়,
কত ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ দৃষ্ট হয়,
ভব-বন্ধন-জ্বালা যায়গো দূরে॥
দেবের দুর্লভ সাধুর পদ সে যে,
সাধুর নাম সকল শাস্ত্রে ভাসে,
গঙ্গা জননী
পতিত-পাবনী
সাধুর চরণ সেও বাঞ্ছা করে॥
আমি দাসেরও দাসের যোগ্য নই,
বহু ভাগ্যফলে সাধুসঙ্গ পাই,
কয় ফকির লালন
মোর ভক্তিশূন্য মন,
এবার বুঝি পলাম কাদার চরে॥

৬৯

গুরু সু-ভাব দেও আমার মনে।
তোমায় যেন ভুলিনে॥
গুরু, তুমি নিদয় যার প্রতি
ও তার সদায় ঘটে দুর্মতি,
তুমি মনোরথের সারথী,
যথা লও যাই সেখানে॥

গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী[১]
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী[২]
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী[৩]
না বাজাও বাজবে কেনে॥
আমার জন্ম-অন্ধ মন-নয়ন,
গুরু তুমি নিত্য সচেতন,
চরণ দেখব আশায় কয় লালন
জ্ঞান-অঞ্জন দেও নয়নে॥

৭০

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে।
যাবে তার সব সংসার,
অমূল্য ধন হাতে সেই পাবে॥
গুরু যার হয় কাণ্ডারী
চালায় সে অচল তরী,
তুফান বলে ভয় কি তারি,
নেচে গেয়ে ভবপারে যাবে॥
আগমে নিগমে কয়,
গুরুরূপে দীন-দয়াময়,
অসময়ে সকাশে হয়,
যে তারে ভজিবে॥
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যার,
অধঃপাতে গতি হয় তার।
লালন বলে তাই আজ আমার
ঘটল বুঝি মনের কু-স্বভাবে॥

১,২,৩ খাতায়—'তন্তের তনতোরি', 'মন্তের মনতোরি', 'যন্তের জনতোরি' এইরূপ লিখিত আছে। সাধারণ গায়কগণও এই ভাবেই গায়। বিশিষ্ট ফকিররা শব্দগুলি যে শুদ্ধভাবে 'তন্ত্রী', 'মন্ত্রী' ও 'যন্ত্রী' হইবে তাহা জানে। আমি শুদ্ধ পাঠই গ্রহণ করিলাম।

৭১

ভবে মানব-গুরু নিষ্ঠা যার
সর্ব-সাধন সিদ্ধ হয় তার ॥
নদী কিংবা বিল, বাঁওড়, খাল—
সর্বতরে একই সে জল,
একা মোর সাঁই
আছে সর্ব ঠাঁই,
মানুষে মিশে সে হয় রূপান্তর ॥
নিরাকারে জ্যোতির্ময় যে,
আকারে সাকার হ'লো সে ;
যে দিব্যজ্ঞানী হয়,
সে-জন জানতে পায়,
কালিযুগে হয় মানব-অবতার ॥
বহু তর্কে দিন বয়ে যায়,
বিশ্বাসের ধন নিকটে রয়,
সিরাজসাঁই ডেকে লালনকে কয়,
কুতর্কের দোকান খুলিস নে আর।

৭২

গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার
লও গো সুপথে।
তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধব কি মতে ॥
তুমি যারে হও গো সদয়,
সে তোমারে সাধনে পায় ;
বিবাদী তার স্ববশে রয়
তোমার কৃপাতে ॥

যন্ত্রেতে[১] যন্ত্রী[২] যেমন
যেমন বাজায় বাজে তেমন,
তেমনি যন্ত্র আমার মন,
বোল তোমার হাতে ॥
জগাই মাধাই দস্যু ছিল,
তারে গুরুর কৃপা হ'ল,
অধীন লালন দোহাই দিল
সেই আশাতে ॥

৭৩

মুরশিদ বল রে আমার মন-পাখী।
ভবে কেউ কারোর দুঃখের নয় রে দুখী ॥
ভুল না রে ভব-ভ্রান্ত কাজে,
আখেরে এ সব কাণ্ড মিছে,
মন রে আসতে একা,
যেতে একা,
এ ভব-পিরিতের ফল আছে কি ॥
হল্লা কোলাহলে সুপদ কিছু নাই,
বাড়ীর বাহির করেন সবাই,
মন তোর কে বা আপন
পর কে তখন,
দেখে-শুনে খেদে ঝুরবে আঁখি ॥
গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়
কাঁদিয়ে সবে তখন জীবন ছাড়তে চায়,
অধীন লালন বলে কারো গোরে কেউ তো যায় না,
থাকতে হয় একাকী ॥

খাতা—যন্তরেতে ; ২ খাতা—যন্তরি।

৭৪

গুরু-রূপের ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে,
ও তার কিসের আবার ভজন-সাধন লোক-জানিত ক'রে
বকের ধরণ-করণ তাহার হয়,
দিক-ছাড়া তার নিরিখ সদায়,
ও সে পলকভরে ভবপারে যায়
সেই নিরিখ ধ'রে ॥
জ্যান্ত গুরু পেলাম না হেথা
ম'লে গুরুপ্রাপ্ত হব সে কথার কথা,
অধীন লালন বলে গুরু মিলে না যথা-তথা,
গুরুরূপে নিরূপ মানুষ ফেরে ॥

৭৫

গৌর[১] কি আইন আনিলে নদীয়ায়।
এ তো জীবের সম্ভব নয় ॥
আনকা বিচার, আনকা আচার
দেখে শুনে লাগে ভয় ॥
ধর্মাধর্ম বলিতে
কিছুমাত্র নাই তাতে,
প্রেমের গুণ গায়।
জাতের বোল রাখলে না সে তো
করলে একাকারময় ॥
শুদ্ধ-অশুদ্ধ নাইকো জ্ঞান,
সাতবার খেয়ে একবার চান
করেন সদায়।

১ খাতা—গউর

আবার অসাধ্যরে সাধ্য করে,
জীবে না যায় ছোঁয় ঘৃণায় ॥
যবন ছিল দবীর খাস,
তারে গোঁসাই-পদ প্রকাশ
করল গোরা রায়।
আর লালন বলে মোমিন বংশে
জামালকে বৈরাগ্য দেয় ॥

৭৬

এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে তারে চিনতে হয়।
তারে চিনতে হয়, তারে মানতে হয় ॥
শরীয়তের বুনিয়াদে
পাবে না তা কোনো মতে,
জানা যাবে মারফতে
যদি মনের বিকার যায় ॥
মূল ছাড়া এক আজগবি ফুল
ফুটেছে সে ভবনদীর কূল,
চিরদিন এক রসিক বুলবুল
সে ফুলের মধু খায় ॥
শুনেছি এক মানুষের খবর,
আলেফের জের মিমের জবর,
লালন বলে হ'সনে ফাঁফর
মুরশিদ ধরলে জানা যায় ॥

১ খাতা—গউর

৭৭

আমার মনের মানুষের সনে
মিলন হবে কতদিনে ॥
চাতকপ্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছি কালো শশী,
হব ব'লে চরণদাসী ;
তা হয় না কপালগুণে ॥
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ,
কালারে হারালেম তেমন
ও রূপ হেরিয়ে স্বপনে ॥
যখন ঐ রূপ স্মরণ হয়
থাকে না লোক-লজ্জার ভয় ;
অধীন লালন বলে সদায়
প্রেম যে করে সেই জানে

৭৮

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে ॥
আপন ঘরে বোঝাই সোনা,
পরে করে লেনা-দেনা,
আমি হ'লেম জন্ম-কানা—
না পাই দেখিতে ॥
রাজী হ'লে দরওয়ানি
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি,
তারে বা কই চিনি-শুনি
বেড়াই কুপথে ॥

এই মানুষে আছে, রে মন,
যারে বলে মানুষ-রতন,
লালন বলে পেয়ে সে ধন
পারলাম না রে চিনিতে ॥

৭৯

ফের প'লো তোর ফিকিরেতে।
যে ঘাটসারা ফিকির-ফাকার, ডুবে মলি সেই ঘাটেতে ॥
ফিকির ছিল একনাগাড়ি,
অধর ধ'রে দিতাম পাড়ি,
এবার হ'লো খোলা দোয়াড়ি,—
তাই দেখ রেখেছি পেতে ॥
না জেনে ফিকির আঁটা
শিরেতে পাড়ালাম জটা,
সার হ'লো ভাঙ-ধুতরো ঘোঁটা,
ভজন-সাধন সব চুলোতে ॥
ফকিরি ফিকির করা
হ'তে হবে জেন্তে মরা,
লালন ফকির নেংটি-এড়া,
আঁট বসে না কোনমতে ॥

৮০

করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেমসাধন।
প্রেম সাধিতে ফেঁপে ওঠে কাম-নদীর তুফান ॥
প্রেম-রতন ধন পাওয়ার আশে
ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম ক'ষে,
কাম-নদীর এক ধাক্কা এসে
যায় ছাঁদন-বাঁধন ॥

বলব কি সে প্রেমের কথা,
কাম হইল প্রেমের লতা,
কাম ছাড়া প্রেম যথা তথা
নাই রে আগমন ॥
পরমগুরু প্রেম-পিরিতি,
কাম-গুরু হয় নিজপতি,
কাম ছাড়া প্রেম পাই কি গতি,
তাই ভাবে লালন ॥

৮১

শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি কাম-রতিকে রাখলে কোথা।
আগে উদয় কামের রতি,
রস-আগমন তা'রি সাথী,
সেই রসে হ'য়ে স্থিতি
খেলছে মানুষ দেখ গে তোরা ॥
মন জানে সেই রসের করণ ;
না করে যে রস আস্বাদন,
জল ছেঁচে তার হয় রে মরণ,
কথায় কেবল বাজি জেতা ॥
মনের অবাধ্য যে জন
আপনার আপনি ভুলে সে জন,
ভেবে কয় অধীন লালন—
কেবল ডাকলে মানুষ কয় না কথা ॥

৮২

আমার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা ॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়,
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখনা।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি,
আমার কোলের ঘোর তো যায় না ॥
আত্মরূপে কর্তা হরি,
মনে নিষ্ঠা হ'লে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা ॥
আমি আমি কে বলে মন,
যে জানে তার চরণ শরণ
লওনা।
ফকির লালন বলে মনের ঘোরে
হ'লাম চোখ থাকিতে কাণা ॥

৮৩

শুদ্ধ প্রেমরাগে সদায় থাক রে আমার মন।
সোঁতে গা ঢালান দিও না বেয়ে যাও উজন ॥
নিভাইয়ে মদন-জ্বালা
অহিতুণ্ডে করগে খেলা,
উভয় নেহার ঊর্ধ্বতালা,
প্রেমের এই লক্ষণ ॥

একটা সাপের ছু'টি ফণী—
দোমুখে কামড়ালে তিনি
প্রেম-বাণে বিক্রমে
তার সনে দাও রণ ॥
মহারস মুদিত কমলে,
প্রেম-শৃঙ্গারে[১] লও রে খুলে,
আত্ম-সামাল[২] সেই রণকালে
কয় ফকির লালন ॥

৮৪

ধর রে অধর চাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে।
ক্ষীরোদ-মথনের[৩] ধারা
ধর রে রসিক নাগরা,
যে রসেতে অধর ধরা
দেখরে সচেতন হয়ে ॥
অরসিকের ভোলে ভুলে
ডুবিসনে ভব-নদীর জলে,
কারণ-বারির মধ্যস্থলে
ফুটেছে ফুল অচিন দলে,
চাঁদ-চকোরে তাহে খেলে
প্রেম-বাণে প্রকাশিয়ে ॥
নিত্য ভেবে নিত্য থেকো,
লীলার[৪] বশে যেও নাকো,

১ খাতা—প্রেম-ছিঙ্গারে; ২ খাতা—আপ্ত-সামাল। গায়কগণও প্রায় এইভাবে গায়।

৩ খাতা—মৈথন; ৪ খাতা—নিলের।

সে দেশেতে মহাপ্রলয়,
মায়েতে পুত্র ধরে খায়,
ভেবে বুঝে দেখ, মনু রায়,
সে দেশে তোর কাজ কি যেয়ে ॥
পঞ্চবাণের ছিলে কেটে
প্রেম যজ স্বরূপের হাটে,
সিরাজ সাঁই বলেরে, লালন,
বৈদিক বাণে করিস নে রণ,
বাণ হারায়ে পড়বি তখন
রণ-খোলাতে হুবড়ি খেয়ে ॥

৮৫

বেদে কি তার মর্ম জানে।
যেরূপ সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে ॥
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষ-তত্ত্ব ভজনের সার,
বেদ ছাড়া বৈ রাগের মানে ॥

ইহাও রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের একটি গান। রবীন্দ্রনাথ ৭ম লাইনে—"বেদ ছাড়া বৈরাগ্যের মনে"—এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিশেষ কোন অর্থ হয় না। 'ছাড়া' ও 'বৈ' দুইটি অব্যয়েরই অর্থ এক—'ব্যতীত'। মনে হয় রচয়িতা এদিকে দৃষ্টি দেন নাই, একই অর্থে দুইটিই প্রয়োগ করিয়াছেন। লাইনটির অর্থ হইতেছে এই যে, রাগের অর্থ বা তাৎপর্য বেদবিধান ছাড়া—রাগমার্গ বেদে বিহিত নয়। ফকিরেরা এই গোলযোগ এড়াইবার জন্য 'বৈ' স্থানে 'হয়' স্থাপন করিয়া গায়, কিন্তু খাতায় স্পষ্ট 'বৈ' আছে।

গোলে হরি বললে কি হয়,
নিগূঢ় তত্ত্ব নিরালা পায়,
নীরে-ক্ষীরে যুগলে রয়,
সাঁইর বারামখানা সেইখানে ॥
পড়িলে কি পায় পদার্থ
আত্মতত্ত্বে যারা ভ্রান্ত,
লালন বলে সাধুমোহান্ত
সিদ্ধি হয় আপনারে চিনে ॥

৮৬

মানুষের করণ সে কি সাধারণ !—
জানে কেবল রসিক যারা।
টলে বিষয়ভোগী,
অটলে ঈশ্বর-রাগী,
টল-অটল মিশালে মানুষের করণ সারা ॥
যে ফুলের ছান্দ ধরে,
তার বিন্দু ঝ'রে পড়ে,
আর কি তারে হাতে পায় রসিক ময়রা।
যে নীরে-ক্ষীরে মিশায়
পড়ে না সে দুর্দশায়,
না মিশালে তার সাধন বিফল-পারা ॥
যে জন অনুরাগী হয়,
রাগের জোরে মানুষ সন্ধান পায়,
ত্যাজ্য করে বৈদিক রাগের ধারা।
পঞ্চবাণের ছিলে
প্রেমের অস্ত্রে কাটিলে
ফকির লালন বলে কাম যায় মারা ॥

৮৭

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে[১] আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায় ॥
আট-কুঠরী নয় দরজা-আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদর-কোঠা—
আয়না-মহল তায় ॥
মন, তুই রৈলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয়, খাঁচা খুলে
সে পাখী কোন্ খানে পালায় ॥

৮৮

সাঁই আমার কখন খেলে কোন্ খেলা।
জীবের কি সাধ্য আছে তাই বলা ॥
কখনো ধরে আকার,
কখনো হয় নিরাকার,
কেউ বলে সাকার, কেউ নিরাকার,
অপার ভেবে হই ঘোলা
অবতার অবতারী
সে তো স্বভাবে তারি,
দেখো জগৎ ভরি
এক চাঁদে হয় উজলা ॥

১ খাতা—কম্‌নে; সাধারণ গায়কগণও এই উচ্চারণেই গায়।

ভাণ্ড বেভাণ্ড মাঝে
সাঁই বিনে কি খেল আছে,
লালন কয় নাম ধরেছে
কৃষ্ণ করিম কালা ॥

৮৯

কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়।
নিগূঢ় সন্ধান জেনে শুনে সাধন করতে হয় ॥
শাক্ততত্ত্ব সাধন ক'রে
পেত যদি সে চাঁদেরে,
তবে বৈরাগীরা কেনে
আবালগুদড়ি টেনে
কুলের বাহির হয় সেই চরণ বাঞ্ছায় ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী যারা,
সদায় বলে তারা
শাক্ত-বোষ্টমের নাই মূল পরিচয় ॥
শুনে ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য
দরবেশে করে তর্ক—
বস্তুজ্ঞান যার নাই,
নাম-ব্রহ্মে কি পাই,
লালন কয় দরবেশে একি কথা কয়।

৯০

খুঁজে ধন পাই কি মতে,
পরের হাতে
কল-কাঠি।
শতেক তালা মাল-কুঠি ॥

শব্দের ঘরে নিঃশব্দের কুঁড়ে,
সদাই তারা আছে জুড়ে
দিয়ে জীবের নজরে ঘোর টাটি ॥
আপন ঘরে পরের কারবার,
আমি দেখলাম না রে তার বাড়ীঘর,
আমি বেহুঁস মুটে কার মোট খাটি।
থাকতে রতন ঘরে
একি বেহাত আজ আমারে,
লালন বলে মিছে ঘর-বাটী ॥

৯১

শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক মোর সাঁই।
আমি ভাবি সদায় কোথা সে প্রেম পাই ॥
যত সব ধ্যানী জ্ঞানী মুনি জনা
প্রেমের খাতায় সই পড়ে না।
প্রেম-পিরিতির উপাসনা
কোন বেদে নাই ॥
রোজা-পূজা করলে পরে
আপ্তসুখের কার্য হয় রে।
সাই-এর করণ কি সই পড়িবে
আমি ভাবি বসে তাই ॥
প্রেমে পাপ হয় কি পুণ্য হয় রে
চিত্রগুপ্ত তাহা লিখতে নারে,
দরবেশ সিরাজসাঁই কয়
লালন, তোরে তাই জানাই ॥

৯২

আইন-মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি।
কাল শমন এলে করবে কি ॥
ভাবতে দিন আখের হ'লো,
ষোলআনা বাকী প'লো,
কি আলস্য ঘিরে এল
দেখলি নে খুলে আঁখি ॥
নিষ্কামী নির্বিকার হ'লে
জীয়ন্তে ম'রে যোগ সাধিলে,
তবে খাতায় ওয়াশীল মিলে
নইলে উপায় কই দেখি ॥
শুদ্ধ মনে সকলি হয়,
তাও তো এবার জুটল না তোমায়,
লালন বলে করবি হায় হায়
ছেড়ে গেলে প্রাণপাখী॥

৯৩

উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই
ঢেঁকি-গেলার মত।
ওরে তা যায় না গেলা,
ওলা-গেলা করে হয় সে হত
মনটা যাতে রাজী হয়,
প্রাণটা তাতে আপনি যায় ;
পাথর দেখে সোনার মত।
আবার বেগার-ঠেলা
ঢেঁকি-গেলা
টাকশালে সই নাই তো ॥

মুচির চামকেটোতে গঙ্গা-মা
কোন্ গুণে যায়,
দেখ না কেউ ফুল দিয়েও পায়না তো।
মন যাতে নয়,
পূজলে কি হয়
ফুল দিয়ে শত শত ॥
যার মনে যা লাগে ভাই,
করুক করুক তাই,
তাতে গোল কেন আর অত।
লালন বলে লাথিয়ে পাকালে সে ফল
হয় না মিঠে, হয় তিতো ॥

৯৪

বাকির কাগজ গেল হুজুরে।
কোন দিন মন তোর আসবে শমন সাধের অন্তঃপুরে ॥[১]
যে দিন ভিঁটায় হয় বসতি,
দিয়েছিলে মন খোসকবলতি—
তুমি হরদমে নাম রাখবে স্থিতি,
এখন ভুলে গিয়েছ তারে ॥
আইন-মাফিক নিরিখ-দেনা,
ও মন, তাতে কেন তোর ইতরপনা,
যাবে রে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে ॥
সুখ পা'লে হও সুখ-ভোলা,
দুখ পা'লে হও দুখ-উতলা,
লালন কয় সাধনের বেলা
মন তোর কিসে জুৎ ধরে ॥

১ খাতা—অন্তসপুরে

৯৫

ফকিরি করবি, ক্ষেপা, কোন্ রাগে
আছে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাগে ॥
থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ,
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন,
ভেস্ত-স্বর্গ ফাটক সমান—
কার বা তা ভালো লাগে ॥
অটল-প্রাপ্তি কিসেতে হয়
গুরুর কাছে জান গে রে তাই,
টল কি অটল রতি সেই
নেহার ক'রে জান আগে ॥
ভবে ফকিরি সাধন ক'রে
খোলসা রও হুজুরে,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ে,
আত্ম-তত্ত্ব জান রে আগে ॥

৯৬

হুজুরে হ'লে নিকাশ, জানা যাবে পাওনা-দেনা।
লক্ষজনে আছে ঘিরে, বেরাদার তোর ফি জনা ॥
ক্ষিতি, জল, বাই, হুতাশন,
আকাশে হয় তাদের মিলন,
তাই দিয়ে সব বস্তু গঠন,
সবার গোড়ায় এই পাঁচজনা ॥
মুন্সি-মৌলভীর কাছে
জনম-ভর বেড়ালাম খুঁজে,
শুধালাম মূল খবর যেচে,
তবু মনের ঘোর তো গেল না ॥

হর্ত্তা-কর্তা যারে বলি, কোন্ মোকামে তার থানা,
কোন্ মহলে হয় রে ও তার আওনা-যানা,
লালন কয় লালন কোন্ জনা—
তা তো লালনের ঠিক হ'ল না ॥

৯৭

নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল।
বিধি, বিষ্ণু, হর আদি, পুরন্দর,
তাদের সে ফুল হয় মাতৃফুল ॥
কি বলিব সেই ফুলের গুণবিচার—
পঞ্চমুখে সীমা দিতে নারে হর,
যারে বলি মূলাধার, সেইত অধর,
ফুলের সঙ্গ ধরা তার সমতুল ॥
মিলে মূলবস্তু ফুলের সাধনে,
বেদের আগোচর, কেহ নাহি জানে,
সেই ফুলের নগর আছে কোন্ স্থানে
সাধুজনা ভেবে করছেন উল ॥
কোথায় সে ফুলের বৃক্ষ, কোথায় সে জল,
তরঙ্গের উপরে ভাসছে রে চিরকাল,
কখন আসে অলি
মধু খায় সে ফুলি
লালন ধরতে গেলে পায় না সে ফুল

৯৮

কারে আজ শুধাই সে কথা।
কি সাধনে পাবো তারে, যে আমার জীবন-দাতা ॥
শুনতে পাই ধার্মিক সবে
ইল্লিন-মঞ্জিলে যাবে,
সবায় কয়, মহাসুখে র'বে,
অটল-প্রাপ্তি কই ক্ষমতা।
ইল্লিন-ছিজ্জিন সুখ-দুখের ঠাই
কোন্‌খানেতে রেখেছে সাঁই,
হেথা কেন দুখ-সুখ পাই
কোথাকার ভোগ ভুগি কোথা ॥
যখনকার পাপ তখন ভুগি'
শাস্ত তবে হয় কেন রোগী,
লালন বলে বোঝ দেখি
কেন শিয়রে গোনার খাতা ॥

৯৯

অমর্তের[১] এক ব্যাধ[২] বেটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ পেতেছে।
বলবো কি ফাঁদের কথা—
কাক মারিতে কামান পাতা,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নর, নারায়ণ সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে ॥
পাতিয়ে ফাঁদের দুয়া
সে ব্যাধ বেটা দিচ্ছে খেয়া
লোভের চার খাটিয়ে।

১ খাতা—অমত্তের ; ২ বেয়াদ।

চার খাবার আশে
প'ড়ে সেই বিষম পাশে
কত লোভী কামী মারা যেতেছে ॥
জেন্তে ম'রে খেলে যারা,
ফাঁদ ছিঁড়িয়ে যাবে তারা ;
সিরাজসাঁই কয়, ওরে লালন,
মনে রাখিস আসল বচন—
জন্ম-মৃত্যুর ফাঁদ তুই এড়াবি কিসে ॥

১০০

জেন্তে-মরা প্রেম-সাধন কি পারবি তোরা।
যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী হয়েছে হারা ॥
শোসায় শোষে না ছাড়ে বাণ,
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান,
ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে
প্রেম-নদীতে জল পোরা ॥
হাঁটতে মানা, আছে চরণ,
মুখ আছে তার, খাইতে বারণ,
ফকির লালন কয় এ যে কঠিন মরণ,
তা কি পারবি তোরা ॥

১০১

আপন মনের গুণে সকলি হয়।
(ও সে) পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর পায় ॥
মুসলমানের মক্কাতে মন,
হিন্দুতে করে কাশী-ভ্রমণ,
(ওরে) মনের মধ্যে অমূল্যধন
কে দূরে যায় ॥

জাতে সে জোলা কবীর
উড়িষ্যায় তাহার জাহির,
বার-জাত তের-ত্নয়ারী
তার তোড়ানি খায় ॥
রামদাস সেই মুচির ছেলে
গঙ্গা-মাকে হ'রে নিলে
চাম-কাটুয়ায় ।
কত জনা ঘর ছেড়ে
জঙ্গলে বাঁধে কুঁড়ে,
লালন কয় রিপু ছেড়ে
যাবি কোথায় ॥

১০২

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই ।
হিন্দু কি যবন ব'লে
তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই ॥
ভক্ত কবীর জেতে জোলা,
প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ালা,
ধরেছে সেই ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্ব ধন তার ।
রামদাস মুচি এই ভবের 'পরে
পেলো রতন ভক্তির জোরে,
তার স্বর্গে সদাই ঘন্টা পড়ে
সাধুর মুখে শুনতে পাই ॥
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো,
এক বীজে সব জন্ম হ'লো,
ফকির লালন কয়, মিছে কল'
কেন করিস সদাই ॥

১০৩

রূপের ঘরে অটলরূপ বিহরে
চেয়ে দেখ না তোরা।
ফণিমণি জিনি'
রূপের বাখানি,
দুইরূপে আছে সেই রূপ হল-করা ॥
যে জন অনুরাগী হয়,
রাগের দেশে যায়,
রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখতে পায়।
রাগেরি করণ
বিধি-বিস্মরণ,
নিত্যলীলার উপর রাগ-নেহারা ॥
ও সে অটলরূপ সাঁই,
ভেবে দেখ তাই,
সে রূপের কভু নিত্যলীলা[১] নাই।
যে জন পঞ্চতত্ত্ব যজে,
লীলারূপে মজে,
সে কি জানে অটলরূপ কি ধারা ॥
আছে রূপের দরজায়
শ্রীরূপ মহাশয়,
রূপের তালা-ছোড়ান তার হাতে সদায়।
যে জন শ্রীরূপগত হবে,
তালার ছোড়ান পাবে,
অধীন লালন বলে অধর ধরবে তারা ॥

১ খাতা—সর্বত্র 'লীলার স্থলে 'নিলে' লিখিত আছে।

১০৪

সে কথা কি ক'বার কথা, জানতে হয় ভাবাদেশে।
অমাবস্যায়[১] পূর্ণশশী পূর্ণিমাতে অমাবস্থে ॥
অমাবস্যা পূর্ণিমার যোগ
আজবসম্ভব সম্ভোগ,
জানলে খণ্ডে এ ভব-রোগ,
গতি হয় অখণ্ড দেশে ॥
রবি-শশী রং-বেমুখা
মাস-অন্তে হয় একদিন দেখা;
সেই যোগের যোগে লেখাজোখা,
সাধলে সিদ্ধি হয় অনায়াসে ॥
দিবাকর নিশাকর সদায়
উভয় অঙ্গে উভয় লুকায়[২],
ইসারাতে[৩] সিরাজসাঁই কয়,
লালন ভেড়োর হয় না দিশে

১০৫

অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে কোন্ শহরে।
প্রতিপদে হ'লে উদয় দেখা যায় না তারে ॥
মাসে মাসে চন্দ্রের উদয়,
অমাবস্যা মাস-অন্তে হয়,
অমাবস্যা-পূর্ণিমার নির্ণয়
জানতে হবে নেহার ক'রে ॥

১ খাতা—আমাবস্থে ; ২ খাতা—লুকায় ; ৩ খাতা—এছারাতে

ষোলকলা হ'লে শশী
তাকে বলে পূর্ণমাসী,
সেই পূর্ণিমা হয় কিসি
পণ্ডিতেরা কয় সংসারে ॥
জানতে পারলে দেহ-চন্দর
স্বর্গ-চন্দ্রের পায় সে খবর ;
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তুই,
মূল হারালি কোলের ঘোরে ॥

১০৬

লীলা দেখে লাগে ভয়।
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
গঙ্গা ডাঙা বেয়ে যায় ॥
'আব-হায়াত' নাম গঙ্গা সে যে,
সংক্ষেপে কেউ দেখ বুঝে,
পলকে পাউড়ি ভাসে,
পলকে শুকায় ॥
ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে,
ফল আছে কোন্ অচিন দলে,
যুক্ত হয়ে ফলে ফুলে
কিবা শোভা হয় ॥
জগৎ-জোড়া মীন সেই গাঙে
খেলছে খেলা পরম রঙ্গে,
লালন বলে জল শুখালে
মীন মিশিবে হাওয়ায় ॥

১০৭

পাগল দেওয়ানার মন কি ধন দিয়ে পাই।
বলি যে আমার আমার—
আছে কি ধন আমার,
সদা মনে মনে ভাবি তাই॥
দেহ-ধন-মন দিতে হয়—
সে-ও ধন তারি, আমার তো নয়,
আমি মুটে মোট চালাই।
আবার ভেবে দেখি
আমিই বা কি
তাও তো আমার হিসাব নাই॥
ও সে পাগলটার যে পাগলা খিজি,
নয় সামান্য ধনে রাজি,
আমি কোন্ ভাবে কোন্ ভাব মিশাই।
পাগলা ভাব না জেনে
যদি কেউ যায় শশ্মানে,
পাগল হয় কি অঙ্গে মাখলে ছাই॥
ও সে পাগল ভেবে পাগল হ'লাম,
আপন পর তো ভুলি নাই।
অধীন লালন বলে,
আপনার আপনি ভুলে
ঘটে প্রেম, পাগলের এমন বাই॥

১০৮

লাগল ধূম প্রেমের থানাতে,
মন-চোরা পড়েছে ধরা রসিকের হাতে।
ও সে ধরেছে চোরকে হাওয়ায় ফাঁদ পেতে॥
ভক্তি-জমাদারের হাতে
দু'দিন চোর জিম্মা থাকে,
তিন দিনের দিন দেয় সে চালান
আষ্টেপিষ্টে বেঁধে॥
চোর আছে অটলের ঘরে,
সাধকে তাই জানতে পারে,
লালন বলে, এরূপ মিলে
দিব্যজ্ঞানের উদয়েতে॥

১০৯

এখন আর ভাবলে কি হবে।
কৃতকর্মের লেখাজোকা
আর কি ফিরিবে॥
তুষে যদি কেউ পাড়ও দেয়
তাতে কি আর চাল বাহির হয়,
আমার মন হ'ল যে তুষের ন্যায়
বস্তুহীন ভবে॥
কর্পূর উড়ে যায় রে যেমন
গোলমরিচ মিশায় তার কারণ,
মন যদি হোত গোলমরিচের মতন
বস্তু যায় কবে॥

হাওয়ার চিড়ে, কথার দধি,—
ফলার হচ্ছে নিরবধি,
লালন বলে, তেমন প্রাপ্তি
কেন না হবে ॥

১১০

ধর চোর হাওয়ার ফাঁদ পেতে।
সেই চোরকে কি ধরবি কোণা-কান্‌ছিতে ॥
পাতালে চোরের নহর,
দেখায় আসমানের উপর,
তিন তারে নিচ্ছে খবর
শুভ যোগ মতে।
হাওয়ায় তার বারামখানা, হাওয়া
মূলাধার তাতে।
সে চোর ধরবি যদি
হৃদ্‌-গারদ করগে খাঁটি,
লালন কয়, খুঁটিনাটি থাকতে
দেবে না ছুঁতে ॥

১১১

ওরে সামান্যে কি সে ধন মিলে।
মিটে সকল আশা সব পিপাসা
সে অমূল্য রতন পেলে ॥
যুগ যুগ ধ'রে যোগী-ঋষি
হয়েছে সব বনবাসী,
পাবো বলে ঐ চরণ-শশী
তারা বসেছে তরুতলে ॥

ওরে গুরুবল যে পেয়েছে,
জ্ঞান-নয়ন তার খুলে গেছে,
অমূল্য ধন তা'র মিলেছে
ভেসে আনন্দ-সলিলে ॥
তার অন্য ধনের নাই লালসা,
পূরেছে তার সকল আশা,
লালন ভেড়ো বুদ্ধিনাশা,
নাশ হ'লো সে মূলের ভুলে ॥

১১২

দেখ না রে ভাব না রে ভাবের কীর্তি।
জলের ভিতর জ্বলছে রে এক বাতি ॥
ভাবের মানুষ ভাবের খেলা,
ভাসে বসে দেখ নিরালা,
নীরে ক্ষীরেতে ভেলা বয় যুতি ॥
জ্যোতিতে রতির উদয়,
সামান্যে কি তাই জানা যায়,
তাতে কত রূপ দেখা যায়
লালমোতি ॥
যখন নিঃশব্দে শব্দেরে খাবে
তখন ভবের খেলা ভেঙে যাবে,
লালন কয়, দেখবি ফিরে কি গতি

১১৩

যে ভাব গোপীর ভাবনা।
সামান্যের কাজ নয় সে ভাব জানা ॥
বৈরাগ্য-ভাব বেদের বিধি,
গোপিকা-ভাব প্রেমের নিধি,
ডুবে থাকে তাহে নিরবধি
রসিক জনা ॥
যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র যারে
পায় না যোগধ্যান ক'রে,
সেই কৃষ্ণ গোপীর দ্বারে
রয়েছে কেনা ॥
যে জন গোপী-অনুগত,
জেনেছে সেই নিগূঢ় তত্ত্ব;
লালন কয়, রসিক মত্ত
পেয়ে সেই রসের ঠিকানা

১১৪

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে।
(ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি,
দিবারাতি নাই সেখানে ॥
কত ধনীর ভরা যাচ্ছে মারা
প'ড়ে নদীর তোড়-তুফানে
ভবে রসিক যারা, পার হয় তারা.
তারাই নদীর ধারা চিনে ॥

সপ্ততল পাতালের তলে
মূল রয়েছে গোপনে।
মূলের মানুষ স্থূলে রেখে
দেখতে পাবি রূপরসানে ॥
লালন বলে, ম'লেম জ্বলে
দিবানিশি জলে স্থলে,
আমি মণিহারা ফণীর মত
হারা হ'লেম পিতৃধনে ॥

১১৫

মুরশিদ রঙমহলে সদায় ঝলক দেয়।
যার ঘুচেছে মনের আঁধার
সেই দেখতে পায় ॥
সপ্ততলে অন্তঃপুরী,
আলিপুরে তার কাছারী,
দেখলে রে মন সে কারিগরি
হ'বি মহাশয় ॥
সজল উদয় সেই দেশেতে,
অনন্ত ফল ফলে তাতে,
প্রেম-পাতি-জাল পাতলে তাতে,
অধর ধরা যায় ॥
রত্ন যে পায় আপন ঘরে
সে কি বাইরে খুঁজে মরে ?
না বুঝিয়ে লালন ভেড়ে
দেশ-বিদেশে ধায় ॥

১১৬

আমার ঠাহর নেই গো মন-বেপারী।
এবার ত্রিধারায় বুঝি ডোবে আমার তরী ॥
যেমনি দাঁড়ি-মাল্লা বেয়াড়া
তেমনি মাঝি দিশেহারা,
কোন্ দিকে যে বায় তাহারা,
আমার পাড়ি দেওয়া কঠিন হ'লো ভারী ॥
একটি নদীর তিনটি ধারা,—
সে নদীতে নাই কূল-কিনারা ;
সেথা বেগে তুফান বয়,
দেখে লাগে ভয়,
ডিঙি বাঁচাবার উপায় কি করি ॥
কোথা হে দয়াল হরি,
আপনি এসে হও কাণ্ডারী ;
তোমায় স্মরণ করি'
ভাসাই তরী,
লালন কয়, যেন বিপাকে না পড়ি ॥

১১৭

চেয়ে দেখ না রে মন,
দিব্য নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক
মণি-কোঠার ঘরে ॥
হ'লে যে চাঁদের সাধন
অধরচাঁদ হয় দরশন,
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ঘিরে ॥

চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া,
চাঁদে দেয় চাঁদের খেয়া,
জমিনে ফলছে মেওয়া
চাঁদের সুধা ঝ'রে।
নয়নচাঁদ প্রসন্ন যার,
সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার,
লালন কয়, বিপদ আমার
গুরুচাঁদ ভুলে রে

১১৮

আপনার আপন খবর নাই।
গগনের চাঁদ ধরব ব'লে
মনে করি তাই॥
যে গঠেছে এই প্রেম-তরী,
সেই হ'য়েছে চড়নদারী,
কোলের ঘোরে চিনতে নারি,
মিছে গোল বাধাই
আঠার মোকামে জানা
মহারসের বারামখানা,
ওই রসের ভিতরে সে-না
আলো করে সদাই।
না জানি চাঁদ-ধরার বিধি,
কথার কোট সাধন সাধি,
লালন বলে, বাদী, ভেদী,
বিবাদী সদাই॥

১১৯

প্রেম-ডুবারু বিনে কে জানে।
ও সে জেনে প্রেমের গতি
কুটিল অতি
ডোবে গহীনে॥
সামান্যে কি চিনে সেই নদী,
সেথা বিনে হাওয়ার ঢেউ ওঠে নিরবধি,
শুভযোগে জোয়ার আসে যদি
ত্রিবেণী ভেসে যায় সমানে॥
মৃত্তিকাহীন নদী 'পরে
মীন এক আসা-যাওয়া করে,
অন্যে চিনতে পারবে কেনে :
পূর্ণিমার যোগে সে মীন ভাসে,
কারুণ্য তারুণ্য এসে লাবণ্যে যখন মিশে,
সাধকে মীন ধরতে পারে সেই দিনে॥
সেই নদীতে চান করিলে শুভ যোগে
ওরে ভবভয় তোর দূরে যাবে,
লালন কয় এড়াবি শমনে॥

১২০

কে বুঝিতে পারে আমার সাঁই-এর
এই কুদ্‌রতি।
অগাধ জলের মাঝে জ্বলছে বাতি॥
বিনা কাষ্ঠে অনল জ্বলে,
জল রয়েছে বিনা স্থলে,
আখেরে হবে জল অনলে
প্রণয় অতি॥

অনলে জল উষ্ণ হয় না,
জলে সে অনল নেভে না,
এমনি সে কুদ্‌রতির কারখানা
দিবারাতি ॥
যে দিন জলে ছাড়বে হুঙ্কার,
ডুবে যাবে আগুনের ঘর,
লালন বলে, সে দিন বান্দার
হয় গো কি গতি ॥

১২১

যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা ।
দ’বোচে বিপাকে প’লে প্রাণ বাঁচবে না ॥
পথেরো পরিচয় ক’রে
যাও না মনের সন্দ মেরে,
লাভ-লোকসান বুঝের দ্বারে
যায় গো জানা ॥
উজন ভেটান পথ ছু’টি
দেখ ধেয়ান করে খাটি,
দেও যদি মন গড়াভাটি
কূল পাবা না ॥
অনুরাগের তরণী করো,
ধার চিনে উজানে ধরো,
লালন কয়, তবে করতে পারো
মন-ঠিকানা ॥

১২২

একবার জগন্নাথে দেখ রে যেয়ে জাত কেমন রাখ বাঁচিয়ে
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই লয় খেয়ে ॥
জোলা ছিল কবীর দাস,
তার তোড়ানি বার মাস
উঠবে উথলিয়ে।
সেই তোড়ানি
খায় যে ধনী,
সেই আসে দরশন পেয়ে ॥
ধর্ম-প্রভু জগন্নাথ,
চায় না রে সে জাত-অজাত,
ভক্তের অধীন সে।
যত জাত-বিচারী
দুরাচারী,
যায় তারা সব দূর হ'য়ে ॥
জাত না গেলে পাই নে হরি,
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে।
লালন কয়, জাত হাতে পেলে পুড়াতাম
আগুন দিয়ে ॥

১২৩

হ'তে চাও হুজুরের দাসী।
মনে গোল তো পোরা রাশি রাশি ॥
না জানো সেবা-সাধনা,
না জানো প্রেম-উপাসনা,
সদাই দেখি ইতরপনা,
প্রভু রাজি হবে কিসি ॥
কেশে বেশে বেশ করলে কি হয়
রসবোধ না যদি রয়,
রসবতী কে তারে কয়,
কেবল মুখে কাষ্ঠ-হাসি ॥
কৃষ্ণপদে গোপী সুজন
করেছিল দাস্য-সেবন,
লালন বলে, তাই কি রে, মন,
পারবি ওরে সুখবিলাসী ॥

১২৪

সে লীলা বুঝবি, ক্ষেপা, কেমন ক'রে।
লীলার যার নাইরে সীমা,
কোন্ খানে কোন্ রূপ ধরে ॥
আপনি ঘর, সে আপনি ঘরী,
আপনি করে রসের চুরি
ঘরে ঘরে,
ও সে আপনি করে ম্যাজিষ্টারী,
আবার আপনি বেড়ায় বেড়ী প'রে
গঙ্গায় রইলে গঙ্গাজল হয়,
গর্তে গেলে কূপজল কয়
বেদ-বিচারে।

তেমনি সাঁইর বিভিন্ন আকার
জানায় পাত্র-অনুসারে
একে বয় অনন্ত ধারা,
তুমি আমি নাম-বেওরা
ভবের 'পরে।
অধীন লালন বলে, কেবা আমি
জানলে ধাঁধা যেত দূরে॥

১২৫

বিষয়-বিষে চঞ্চলা মন দিবা-রজনী।
মন তো বুঝালে বোঝে না ধর্ম-কাহিনী॥
বিষয় ছাড়িয়ে কবে
মন আমার শান্ত হবে, (হে)
আমি কবে সে চরণ
করিব স্মরণ
যাতে শীতল হয় তাপিত পরাণী॥
কোন্ দিন শশ্মানবাসী হ'ব,
কি ধন সঙ্গে লয়ে যাব; (হে)
আমি কি করি, কি কই,
ভূতের বোঝা বই,
একদিন ভাবলে না, মনা, গুরুর বাণী॥
অনিত্য দেহেতে বাসা—
তাই তো এত আশার আশা; (হে)
অধীন লালন বলে,
তাই নিত্য হইলে
আর কতই কি মনে করিতে না জানি॥

১২৬

চাঁদে চাঁদে গ্রহণ হয়।
সে যোগের উদ্দীপন যে জানে, সে-ই মহাশয়॥
চাঁদ রাহু চন্দ্রের গ্রহণ
সে বড় কঠিন করণ,
বেদ প'ড়ে তার ভেদ-নিরূপণ
ও তুই পাবি রে কোথায়॥
উভয় যেন বিমুখ থাকে,
মাস-অন্তে সুদৃষ্টি দেখে,
মহাযোগ তার গ্রহণ-যোগে
বলতে লাগে ভয়॥
ও সে কেমন রাহু রূপ ধরে,
কোন্ চাঁদে কোন চাঁদ ঘেরে,
লালন বলে স্বরূপ-দ্বারে
লীলা[১] জানা যায়॥

১২৭

জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেলে।
পুরুষ-প্রকৃতি-স্বভাব থাকতে কি প্রেমরসিক বলে॥
মদন-জ্বালায় ছিন্ন-ভিন্ন,
প্রেম প্রেম বলে জগ জানান,
অ-হকদারে রসিক মান্য—
ঘুসকিজারি প্রেম-টাকশালে॥

১ খাতা—নিলে

সহজ সুরসিক জনা
শোসায় শোষে বাণ ছাড়ে না,
সে প্রেমের সন্ধি জানা
যায় না ম'রে না ডুবিলে ॥
তিন রসে প্রেম সাধলে হরি,
শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ তারি ;
লালন বলে, বিনয় করি,'
সেই রসে প্রেম-রসিক খেলে

১২৮

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে।
ও সে ফুলে ভাবনগরে কি শোভা ধরেছে ॥
কারণ-বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একূল ওকূল,
শ্বেতবরণ এক ভ্রমর ব্যাকুল
সে ফুলের মধুর আশে ঘুরতেছে ॥
মূল-ছাড়া সে ফুলের লতা,
ডাল-ছাড়া তার আছে পাতা,
এ বড় অকৈতব কথা—
এ ফুলের ভাব কই কার কাছে ॥
ডুবে দেখ, মন, দেল-দরিয়ায়,
যে ফুলে নবীর জন্ম হয়,
সে ফুল তো সামান্য ফুল নয়,
লালন কয়, যার মূল নাই দেশে ॥

১২৯

দিনে দিনে হ'লো আমার দিন আখেরি।
আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম,
সদায় ভেবে মরি ॥
বসত করি দিবারাতে
ষোলজন বোম্বেটের সাথে,
তারা দেয় না যেতে সরল পথে,
পদে পদে করে দাগাদারি ॥
বাল্যকাল খেলায় গেল,
যৌবনে কলঙ্ক হ'লো,
বৃদ্ধকাল সামনে এল,
এবার মহাকাল হ'লো অধিকারী ॥
যে আশাতে ভবে আসা
তাতে হলো ভগ্ন দশা,
লালন বলে, হায় কি দশা,
আমার উজাইতে ভেটেনে প'ল তরী ॥

১৩০

সাঁই দরবেশ যারা,
আপনারে ফানা ক'রে
অধরে মেশে তারা ॥
মন, যদি আজ হও রে ফকির
নাও জেনে সেই ফানার ফিকির,
ধরো অধরা।
ফানার ফিকির না জানিলে
ভস্ম মাখা হয় মস্কারা ॥

কূপ-জলে সে গঙ্গার জল
পড়িলে যে হয় রে মিশাল
উভয় একধারা।
তেমনি জেনো ফানার করণ
রূপে রূপ মিলন করা ॥
মুরশিদ-রূপ আর আলেখ নূরী
একমনে কেমনে করি
দুইরূপ নিহারা।
লালন বলে, রূপ সাধিলে
হোস নে যেন রূপহারা ॥

১৩১

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে,
রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে।
ফণী-মণি-সৌদামিনী
জিনি' এরূপ উজলে ॥
অস্থি-চর্ম স্বর্ণরূপ—
তাতে মহারসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে।
ও তার একবিন্দু অপার সিন্ধু
হয় রে এই ভূমণ্ডলে ॥
উপাসনা নাই গো তার,
দেহের সাধন সর্ব-সার,
তীর্থ-ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে

রসিক যারা সচেতন
রসরতি টেনে সে জন
রূপে উদয় খেলে ;
লালন গোঁড়া লেংটি-এড়া,
মিছে বেড়ায় রূপ ভুলে ॥

১৩২

কোন্ দিন চাঁদের অমাবস্যে ।
দেখি চাঁদের অমাবস্যা মাসে মাসে ॥
বার মাসে ফোটে চব্বিশ ফুল,
জানতে হয় কোন্ ফুলে তার মূল ;
আন্দাজী সাধন কোরো না রে, মন,
মূলে ভু'লে ফল পাবি কিসে ॥
যে করে এই আশমানী কারবার,
না জানি তার কোথায় বাড়ী-ঘর,
কোন্ সময়, কখন, কোথায় আগমন,
চাঁদ-চকোরে খেলে কখন এসে ॥
আকাশে পাতালে শুনি দেহ-রতি,
চাহি উপাসনা, চাহি সে তা'র বাতি,
যদি চেতন-গুরু পাই, তাহারে শুধাই,
লালন বলে, ঘুচাই মনের দিশে ॥

১৩৩

সে ভাব কি সবাই জানে ।
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা
গোপীর সনে

গোপীপ্রেম জানে কারা—
শুদ্ধ রসের ভ্রমরা যারা,
গোপীর পাপ-পুণ্যের জ্ঞান থাকে না
কৃষ্ণ-দরশনে ॥
গোপী অনুগত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা,
তারাই জানে অধর ধরা
গোপীর সনে ॥
টলে জীব, অটলে ঈশ্বর,—
তা জানলেই কি হয় রসিক নাগর,
লালন কয়, রসিক বিভোর
রস-ভিয়ানে ॥

১৩৪

প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুলা ।
ও তার কথায় দেখি ব্রহ্ম-আলাপ,
মনে গলদ ষোলকলা ॥
ধাঁদা-বাঁধা ভূত-ছাড়ানি
সেইটে বড় ভালো জানি,
ও তোর সাধুর হাটের ঘুসঘুসানি
মিছে সে আলাপনা ॥
বেশ করে সে বোষ্টমগিরি,
রস নাই তার গুমর ভারী,
মুখে হরিনামে ডুবায় তরী,
তিলক নেয় আর জপের মালা

তার মন মেতেছে মদন-রসে,
সদায় থাকে সেই আবেশে,
লালন বলে, মিছে মিছে
লোক-জানানী প্রেম-উতলা।

১৩৫

কিবা শোভা দ্বিদলের 'পরে।
এক-রাশ মণি-মাণিক্যের রূপ ঝলক মারে ॥
অলোক-সম্ভব সে নিত্য গোলোক,
তাহে বিরাজ করে পূর্ণ ব্রহ্মলোক,
হ'লে দ্বিদল নির্ণয়
সব জানা যায়,
বাধা থাকে না সাধন-দ্বারে ॥
শত কিংবা সহস্রদল
রস-রতি করে চলাচল,
ও তার দ্বিদলেতে স্থিতি, বিদ্যুৎ-আকৃতি,
ষড়দলে বারাম যুগান্তরে ॥
ষড়দলে সে তো ষড়তত্ত্ব হয়,
দশম দলে মৃণাল-গতি গঙ্গা বয়,
ও যে তীর-ধারা তার, শ্রীগুণ-বিচার,
লালন বলে, গুরু অনুসারে ॥

১৩৬

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি,
তার কি আছে কভু গোষ্ঠখেলা।
ব্রহ্ম-রূপে সে অটলে বসে,
লীলাকারী[1] তার অংশ-কলা॥
পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ[2] রসিক-শেখর
শক্তির উদয় শরীরে যার,
শক্তিতে শিরে মহাসংকর্ষণ,
বেদ-আগমে যারে বিষ্ণু বলা॥
সত্য সত্য শরণ বেদ-আগমে গায়—
চিদানন্দরূপ পূর্ণব্রহ্ম[3] হয়,
জন্ম-মৃত্যু যার নাহি ভবের 'পর,
তবু তো নয় সোহং[4] নন্দলালা॥
দরবেশের দেল-দরিয়া অথাই,
অজান খবর সেই জানে ভাই,
ভজ দরবেশ,
পাবি উপদেশ,
লালন কয়, তার উজ্জ্বল হৃদ্‌-কমলা॥

১৩৭

সাধ্য কিরে সেই রূপ চিনিতে।
অহর্নিশি মায়া-ঠুসি বাঁধা আমার চক্ষুতে॥
আমি আর অচিন একজন
থাকি আমরা এই দুই জন,

---

১ খাতা—নিলেকারী; ২ খাতা—কিষ্ট; ৩ খাতা—পুণ্যবেহ্ম।
৪ খাতা—সঅং

(ওরে) ফাঁক রয়েছে লক্ষ যোজন,
না পাই দেখিতে ॥
ঈশান কোণে হামেস ঘড়ি
সে নড়ে কি আমি নড়ি,
আপনারে আপনি হাতড়ে ফিরি,
না পাই ধরিতে ॥
খুঁজে ফিরে হদ্দ হইছি,
এখন পিঁড়েয় বসে খেদাই মাছি,
লালন বলে ম'রে বাঁচি
কোন সে কাজেতে ॥

১৩৮

আছে দীনছুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা।
কাজের সময় পরশমণি, আর সময়ে কেউ চেনে না
নবী অলি এই ছ'জনে
কলমাদাতা দল আরফিনে,
বে-কালমায় সে অচিনজনে
পীরের পীর হয় জান না ॥
যে দিন সাঁই নৈরাকারে
ভাসলেন একা একেশ্বরে,
সেই অচিন মানুষ তারে
দোসর তৎক্ষণা[১] ॥
কেউ তারে জেনেছে দড়ো,
খোদার ছোট নবীর বড়ো,
লালন বলে, নড়চড়
সে নইলে দল পাবা না ॥

১ খাতা—তদ্‌খোনা

১৩৯

এবার কে তোর মালেক চিনলি নে তারে।
মন, কি এমন জনম আর হবে,
এমন জনম আর হবে কি রে
দেবের দুর্লভ এবার
মানব জনম তোমার,
এমন জনমের আবার
কণ্ঠী ফেরে ॥
নিঃশ্বাসের নাহি রে বিশ্বাস,
পলকেতে করবে নিরাশ,
এবার মনে রবে মনেরি আশ,
বলছি তোরে ॥
এখন শ্বাস আছে বজায়,
যা করবে তাই সিদ্ধি হয়,
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়
বারে বারে তাই লালনেরে ॥

১৪০

কৃষ্ণ[১] বিনে তেষ্টা-ত্যাগী।
ভবে সেই বটে গো শুদ্ধ অনুরাগী ॥
মেঘের জল বৈ চাতক যেমন
অন্য জল করে না গ্রহণ,
তেমনি কৃষ্ণভক্ত জনে
একান্ত কোট মনে
কৃষ্ণের লাগি'

১ খাতা—কিষ্ট

স্বর্গেরও সুখ নাহি চায় সে,
মিশিতে না চায় সাযুজ্যে,
ও তার ভাবে বুঝায়,
পষ্ট কি বলে সেই,
কৃষ্ণ-সুখের সুখী ॥
কৃষ্ণপ্রেম যার মনে,
ত'ার বিক্রম সে-ই তা জানে ;
অধীন লালন বলে, আমার
মুখসর্বস্ব মন বিবাগী ॥

১৪১

যে জন মানব-দরিয়ার কূলে যায়।
অমূল্য অটলনিধি অনায়াসে পায় ॥
অপরূপ সে নদীর পানি,
জন্মে তাতে মুক্তামণি ;
বলব কি তার গুণ বাখানি—
সে জল পরশে পরশ হয় ॥
পলক-ভরে পড়ে চড়া,
পলকে রয় তায় গুণীরা,
সে ঘাট বেঁধে মৎস্য ধরা
সামান্যের কাজ নয় ॥
বিনে হাওয়ায় মৌজ খেলে,
ত্রিখণ্ড হয় ত্রিপিনালে,
তাহে ডুবে রত্ন তোলে
রসিক মহাশয় ॥

গুরু যদি হয় কাণ্ডারী,
অথাই দিতে পারে রে পাড়ি,
লালন বলে, তারা সাধন-জোরে
শমন এড়ায় ॥

১৪২

আমার হয় না রে যে মনের মত মন ;
আমি জানব কি সে রাগের করণ ॥
প'ড়ে রিপু-ইন্দ্রিয়ের ভোলে
মন বেড়ায় রে ডালে ডালে,
এবার দু'মনে একমন হ'লে
এড়াই শমন ॥
এবার রসিক ভক্ত যারা
মনে মন মিশাল তারা,
এবার শাসন করে তিনটি ধারা
পেল রতন ॥
কিসে হবে নাগিনী বশ,
সাধব কবে অমৃত-রস,
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয় বিষেতে নাশ
হ'লি লালন ॥

১৪৩

যে পথে সাঁই চলে ফেরে, তার খবর কে করে ॥
সে পথে আছে সদায়
বিষম কালনাগিনীর ভয়,
যদি কেউ আজগবি যায়
অমনি উঠে ছোঁ মারে।
পলকভরে বিষ ধেয়ে ওঠে ব্রহ্মরন্ধ্রে[১] রে ॥
যে জানে উলট-মন্ত্র
খাটায়ে সেই তন্ত্র,
গুরু-রূপ ক'রে নজর
বিষ ধ'রে ভজন করে ॥
দেখে তার করণ-রীতি
সাঁই দরদী
দরশন দিবে তারে ॥
সেই যে অধর ধরা
যদি করতে চাহে তারা,
চৈতন্য-গুণীন যারা
গুণ শেখে তাদের দ্বারে।
সামান্যে কি পারবে যেতে
সেই দপকাপের ভিতরে ॥
ভয় পেয়ে জন্মাবধি
সে পথে না যায় যদি,
হবে না সাধন সিদ্ধি,
তাও শুনে মন ঝরে।
অধীন লালন বলে,
যা করে সাঁই থাকতে হয় সেই পথ ধরে

১ খাতা—বের্মর অন্দরে

১৪৪

এবার কি সাধনে শমন-জ্বালা যায়।
ধর্মাধর্ম বেদের মর্ম শমনের বিকার তায়॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ ক'রে
পুণ্যের ফল সে পেতে পারে,
সে ফল ফুরালে তারে
ঘুরিতে ফিরিতে হয়॥
নির্বাণ-মুক্তি সেধে সে তো
লয় হবে পশুর মতো,
সাধন ক'রে এমন প্রাপ্ত
কি সুখে সাধকে চায়॥
পথেরি গোলমালে প'ড়ে
ডুবলাম ভব-জল-মাঝারে,
লালন বলে কেশে ধ'রে
তুলে নেও, গুরু, আমায়

১৪৫

কোন্ রাগে সে মানুষ আছে মহারসের ধনী।
পদ্মে মধু চন্দ্রে সুধা যোগায় রাত্রিদিনি॥
সাধক সিদ্ধি প্রবর্ত তিন
রাগ ধ'রে আছে তিনজন,
এ তিন ছাড়া রাগ-নিরূপণ
কোথাও হয় না জানি॥
মৃণালগতি[১] রসের খেলা,
নবঘাটে

১ খাতা—ম্রেণাল

দশমে যোগকারী মেলা,
যজ্ঞেশ্বর অযোনি ॥
সিরাজ সাঁই-এর আদেশে বলছে লালন,
শোনরে মন, ঘুরতে হবে নাগরদোলন
না জেনে, মন, এই বাণী ॥

১৪৬

যেখানে সাঁই-এর বারামখানা।
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে—
দেখে যেন ভুজঙ্গনা ॥
যা ছুঁইলে প্রাণে মরি,
এ জগতে তাইতে তরি ;
বুঝে তা বুঝতে নারি,
কি করি তার নাই ঠিকানা ॥
আত্মতত্ত্ব[১] যে জেনেছে,
দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে ;
কুবৃক্ষে সুফল পেয়েছে,
আমার মনের ঘোর গেল না ॥
যে ধনের উৎপত্তি প্রাণধন,
সে ধনের হ'লো না যতন ;
অকর্মের ফল পাকায় লালন,
দেখে শুনে তার জ্ঞান হ'লো না

১ খাতা—আপ্তত্তত্ত

১৪৭

খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে।
আপন আপন ঘর বোঝ, মন,
আবার কেন হাতড়ে বেড়াও
কোলের ঘোরে ॥
সর্বদেশে মেঘের উদয়,
নীরদবিন্দু বরিষণ তায় ;
তাতে ফলবে ফল
রঙ-বি-রঙ হাল—
আজব কুদরতি কল
ভাবের ঘরে ॥
নদীনীর-গভীরে ডোবা কঠিন হয়,
ডুবলে কত আজব চিজ দেখা যায় ;
ও সে নীরভাণ্ড-পোরা ব্রহ্মাণ্ড,
কাণ্ড বলতে আমার নয়ন ঝরে ॥
ইন্দ্রডাঙা নাই সে রাজ্যে,
সহজধারা ফেরে সহজে—
সিরাজ সাঁই-এর বচন
মিথ্যা নয়, লালন,
একবার ডুব দিয়ে দেখ স্বরূপ-দ্বারে

১৪৮

জান গে মানুষের করণ কিসে হয়
ভুলো না মন বৈদিক ভোলে,
রাগের ঘরে রও ॥

ভাটির সোঁত যার ফেরে উজন
তাইতে কি হয় মানুষের করণ,
পরশন না হইলে মন,
দরশনে কি হয় ॥
টলাটল করণ যাহার
পরশগুণ কৈ মেলে তাহার,
গুরুশিষ্য যুগযুগান্তর
ফাঁকে ফাঁকে রয় ॥
লোহা যেমন পরশ-পরশে
মানুষের করণ তেমনি সে,
লালন বলে হ'লে দিশে
জঠরজ্বালা যায় ॥

১৪৯

সুমঝে কর ফকিরি মন রে।
এবার গেলে আর হবে না,
পড়বি ঘোরতরে ॥
অগ্নি যৈছে ভস্মে ঢাকা,
সুধা তৈছে গরল-মাখা ;
মথন-দণ্ডে যাবে দেখা
বিভিন্ন ক'রে ॥
বিষামৃতে আছে মিলন,
জানতে হয় তার কিরূপ সাধন ;
দেখো, যেন গরল ভক্ষণ
ক'রো না হায় রে ॥

ক'বার করলে আসা-যাওয়া,
নিরূপণ কি রাখলে তাহা ;
লালন বলে কে দেয় খেয়া
ভব-মাঝারে ॥

১৫০

সবায় কি তার মর্ম জানতে পায়।
জানে ভজন-সাধন ক'রে
যে সাধকে অটল হয় ॥
অমৃত[১] মেঘেরি বরিষণ
চাতক ভেবে জান রে আমার মন ;
ও তার এক বিন্দু পরশিলে
শমন-জ্বালা ঘুচে যায় ॥
যোগেশ্বরীর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে
মহামহাযোগ[২] সেই জানতে পারে ;
ও সে তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
এক দিনেতে সেধে লয় ॥
বিনে জলে হয় চরণামৃত[৩],
যা খাইলে যায় জরামৃত ;
অধীন লালন বলে,
চেতন গুরুর সঙ্গ নিলে
দেখিয়ে দেয় ॥

১ খাতা—অম্রেতো ; ২ খাতা—মহামইযোগ ; ৩ খাতা—চর্ণাম্রেত

১৫১

পারো নিরহেতু সাধন করিতে।
যাও রে ছেড়ে জরামৃত্যু নাই যে দেশেতে ॥
নিরহেতু সাধক যারা,
তাদের সাধন খাঁটি, জবান খাড়া ;
রূপের ভোল কাটিয়ে তারা
চলেছে পথে ॥
মুক্তিপথ ত্যজিয়ে সদায়
ভক্তিপথে রেখো হৃদয়,
শুদ্ধ প্রেমের হবে উদয় ;
সাঁই রাজী তাতে ॥
সুমঝে সাধন করো ভবে,
এবার গেলে আর কি হবে ;
লালন বলে পড়বি তবে
লক্ষ যোনিতে ॥

১৫২

যে সাধন-জোরে কেটে যায় কর্ম-ফাঁসী।
যদি জানবি সে সাধনের কথা হও গুরুর দাসী
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর
নপুংসককে শাসিত করো,
আছে যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের[১] উপর
তারে প্রকাশি' ॥

১ খাতা—বেহ্মাণ্ডের

মারে মৎস্য, না ছোঁয় পানি—
রসিকের তেমনি করণিই,
ও সে আকর্ষণে আনে টানি'
ক্ষীরোদ-শশী ॥
কারণ-সমুদ্রের[২] পারে
গেলে পায় অধর চাঁদেরে ;
অধীন লালন বলে নৈলে ঘুরে
মরবি চৌরাশী ॥

১৫৩

নজর একদিকে দিলে আর একদিকে অন্ধকার হয়।
নরে মুরে দু'টি নেহার কেমনে ঠিক রাখা যায় ॥
সকলের আত্মা ব'লে
বর্জোক লিখিলেন দলিলে,
কারে থুয়ে কারে নিলে,
দুইদিকে মন কই দাঁড়ায় ॥
আইন কল্লেন জগৎ-জোড়া—
সেজদা হারাম খোদা ছাড়া,
মুরশিদ বর্জোক সামনে খাড়া,
সেজদার সময় থুই কোথায় ॥
যদি বিলায়েতে হ'তো বিচার
ঘুচে যেতো মনের আঁধার ;
লালন বলে, এধার-ওধার—
দুই ধারে মন খাবি খায় ॥

২ খাতা—শুমুহূর্ত্ত

১৫৪

তারে দিব্যজ্ঞানে দেখ না, মনু রায়,
ঝরার খালে বাঁধ বাঁধিলে
রূপের মানুষ ঝলক দেয়
পূর্বদিকে রত্নবেদী,
ডালিমের পুষ্প-আদি,
তাতে সদায় রূপাকৃতি
মেঘে বিজলী চমকের প্রায় ॥
অথাই ক্ষীরোদ-মাঝে
অখণ্ড শিখর ভাসে,
রত্নবেদী ঊর্ধ্বপাশে,
সেথা কিশোর-কিশোরী রয় ॥
রূপের আশ্রিত যারা,
সব খবরের জবর তারা ;
লালন কয় দফাসারা,
সে মানুষ ফাঁদ পেতে ত্রিবেণী[১] রয়

১৫৫

বিষামৃতে আছে রে মাখাচোকা।
কেবা শোনে, কেবা বাজায়,
যায়না জীবের দেলধোঁকা
বিকার যবে শান্ত হ'লো,
হৃদ্‌কমলে তার সদায় আলো ;
যথায় মন্দ, তথায় ভালো—
অবশ্য সে পায় দেখা ॥

খাতা—ত্রিপিনি

মায়ের যেমন শিশু ছেলে
দুগ্ধ খায়, তায় দুগ্ধ মেলে ;
সেই জাগাতে জোঁক লাগিলে
রক্ত দেখ পায় জোঁকা ॥
হ'লে আপন দেহের নির্ণয়
সব খবরের জবর সে হয়,
লালন, তোমার মুখ সরল নয়,
মন .বকা

১৫৬

চাতক-স্বভাব না হ'লে
শুধু কথায় কি মেলে।
অমৃত মেঘের বারি
শুধু মুখের কথায় নয় রে ॥
মেঘে কত দেয় গো ফাঁকি,
তবু চাতক মেঘের ভোগী,
অমনি নিরিখ রাখে না আঁখি
চাতক-স্বভাব না হ'লে ॥
চাতকেরি এম্‌নি ধারা—
তৃষ্ণায় জীবন যায় রে মারা,
অন্য বারি খায় না তারা
মেঘের বারি না হ'লে ॥
মন হয়েছে পবন-গতি,
ও সে উড়ে বেড়ায় দিবারাতি,
ফকির লালন বলে, গুরুর প্রতি
ও মন রয় না সুহালে ॥

১৫৭

সে করণ সিদ্ধি করা সামান্যে কি হয়।
গরল হইতে সুধা নিতে আত্যশে প্রাণ যায়॥
সর্পের কাছে নাচায় বেঙ্গা,
এ তো বড় আজব রঙা—
রসিক যদি সে হয় ধোঙ্গা
অমনি ধ'রে খায়॥
ধন্বন্তরির গুণ শিখিলে,
তাই কি মানে সময়-কালে ?
সে গুণ তার উলটিয়ে ফেলে
মস্তকে দংশায়[১]॥
একান্ত যে অনুরাগী
জেন্তে-মরা ভয়-ত্যাগী,
লালন কয়, সে রসিক যোগী
আমার কার্য[২] নয়।

১৫৮

যে আমারে পাঠাল এই ভব-নগরে[১]।
মনের আঁধার-হরা চাঁদ,
সেই যে দয়ালচাঁদ,
আর কতদিনে দেখব তারে॥
কে দিবে রে উপাসনা,
করিব আজ কি সাধনা,
কাশীতে যাই কি
কাননে থাকি
আমি কোথা গেলে পাব সে চাঁদেরে॥

১ খাতা—ডংশায়; ২ খাতা—কাজ্জ।

মন-ফুলে পুজিব কি
নাম-ব্রহ্ম[২] রসনায় জপি ?
কিসে দয়া তার
হবে পাপীর 'পর
কে বলবে আমায়ে সন্ধান ক'রে।
ভেবে তারে পঞ্চমতে
ঘুরে বেড়াই পঞ্চপথে।
যে পথ সরল
সে পথে গরল,
অধীন লালন বলে তাইতে প'লাম ফেরে

১৫৯

না বুঝে মজ' না পিরিতে।
জেনে শুনে ক'রো পিরিত,
শেষ ভাল যাতে ॥
সাধুর কাছে জান গে চেনা—
লোহায় যেমন স্পর্শে সোনা,
সেই মতে ॥
ভবের পিরিত ভূতের কীর্তন,
ক্ষণেক বিচ্ছেদ ক্ষণেক মিলন,
অবশেষে বিপাকে মরণ
তে-মাথা পথে ॥
এক পিরিতের দ্বিভাব চলন,
কেউ স্বর্গে, কেউ নরকে গমন ;
বিনয় ক'রে বলছে লালন
এই জগতে ॥

---

১ খাতা—ভাবনগরে ; ২ খাতা—বেহ্ম।

১৬০

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীলোকের কি হয় বিধান ?
বামন যিনি পৈতার প্রমাণ,
বামনী চিনি কি ধ'রে ॥
কেউ মালা, কেউ তস্‌বি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ॥
গর্তে গেলে কূপজল কয়,
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়,
মূলে একজল, সে যে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে ॥
জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা তথা,
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে ॥

মহাত্মা লালন ফকির

['হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত লালন সম্বন্ধে প্রবন্ধ]

লালন ফকিরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকি নাই। শুধু এ অঞ্চ
কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রংপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেক দূর পর্য
বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য। শুনিতে
পাই, তাঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি
আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি; কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেঁউড়ি
গ্রামে ইঁহার একটী সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫।১৬ জনের বেশি শিষ্
নাই। শিষ্যগণের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে তিনি ঔরসজাত
পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভালবাসিতেন ন.
শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার বিশেষ কোন তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান
হইত না। আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতানুসারে
ইঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকেরই স্ত্রী আছে.
কিন্তু সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে
নহে, বাউল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্প্রতি
সাধুসেবা বলিয়া এই মতের নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। ... ... বাউল
লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে একটী গুহ্য ব্যাপা
চলিয়া আসিতেছে, লালনের দলে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান
জননের পথ এককালে রুদ্ধ। ... ... তিনি ধর্মজীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন
... .. মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকির বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিে
লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে
পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়; তিনি কোন শাস্ত্র পড়েন নাই, কিন্তু ধর্মালাপে
তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ্ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁহা
অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না
লালন ফকির নিজে কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোক
তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার
ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণব ধর্মের ম

পালন করিতে দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। তিনি জাতিভেদ নিতেন না; নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে। কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় ই, ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি, ইঁহার শিষ্যগণ ইঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা "সাঞ্চ" ই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নোমাজ করিতেন না, সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদহীন অভিনব বৈষ্ণব লা যাইতে পারে। বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ইঁহার অধিক টান, শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ সাধনার কথা ইঁহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক, তিনি যে একজন পরম ধার্মিক সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না, শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে, না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে

তবে সাধারণে প্রকাশ, লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন ··· ···

াঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থগমন-কালে পথে বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। পথে মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়া ফকির হয়েন। ইঁহার মুখে বসন্ত রোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত-পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুগ্ধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। ··· ··· পীড়িত কালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ববৎ সাধন করিতেন। মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন।

· অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইঁহার সহিত ধর্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্বরাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন, "আমি চলিলাম"। ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরে রাম নামও দরকার হয় নাই। হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল। তাঁহারই

উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্য শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ··· ··· লালন ফকিরের অসংখ্য গান সর্বত্র সর্বদাই গীত হইয়া থাকে। তাহাতেই তাঁহার নাম, ধর্মমত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে। ···

পদ্মলোচন বা পোদো

[পদ্মলোচন বা পোদো একজন প্রাচীন বাউল-সংগীত-রচয়িতা। তাঁহার কোথায় বাড়ী বা কোথায় আখড়া ছিল, তাহা অনেক বাউলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ঠিক জানা যায় নাই। সকলেই বলে, তিনি প্রাচীন পদকর্তা ও রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। কলিকাতার মাণিকতলা আখড়ার অতি-বৃদ্ধ অনন্ত গোঁসাই (১৯৫০ সালে বয়স ৯৫) বলেন যে, তিনিও তাঁহার গুরুর মুখে এই সব গানই শুনিয়াছেন এবং তাঁহার গুরুও পদ্মলোচনকে অতি প্রাচীন বাউল বলিয়া জানিতেন। প্রাচীন হইলেও পদ্মলোচনের যে কয়টি গান আমরা পাইয়াছি, তাহাতে প্রাচীনত্বের বিশেষ কোনো চিহ্ন নাই। হয়তো লোকমুখে চলিতে চলিতে ইহাদের অনেক বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। বাউল-গান সম্বন্ধে এ কথাটি অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু যাহা আমরা পাইতেছি তাহা হইতে ভাষা সম্বন্ধে কোনো প্রাচীনত্বের অনুমান করা যায় না। খুব বেশি হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহাদের রচনা-কাল। লালনের গানের রচনা যদি যৌবন-কাল হইতে আরম্ভ হয়, তবে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে তাঁহার রচনা আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপ সঙ্গত অনুমান করিতে পারি। লালনের গানে দুই-একটি "যৈছে" "তৈছে" প্রভৃতি পদের ব্যবহার আছে, কিন্তু পদ্মলোচনের গানে তাহাও নাই। বড় জোর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান গানগুলির রচনাকালের শেষ সীমা ধরা যাইতে পারে।

পদ্মলোচনের দুই একটি গান কোনো কোনো সংগীত-সংগ্রহের মধ্যে স্থানলাভ করিতে পারে, কারণ ইনি আদিযুগের বাউল-গান-রচয়িতা। এই সংকলনে পদ্মলোচনের দীর্ঘ কয়টি গানই বৃদ্ধ অনন্ত গোঁসাই মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন, আমি লিখিয়া লইয়াছি; কয়েকটি ঘোষপাড়ার নিকটবর্তী মদনপুরের আকবর শাহ্ ফকিরের গানের খাতা হইতে এবং অন্য কয়টি বর্ধমান হইতে সংগৃহীত।

সংগ্রহের মধ্যে পদ্মলোচনের কয়েকটি গান আমি গ্রহণ করি নাই, সেগুলি বিকৃত ও সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইয়াছে।

পদ্মলোচনের ভাষার উপর বিশেষ দখল এবং প্রকাশভঙ্গীতেও মুন্সীয়ানা লক্ষিত হয়।]

১৬১

মানুষে গোঁসাই বিরাজ করে।
তারে চিনলি নে, মন, সামান্য জ্ঞানেরে॥
ও সে বেদের করণ উলট-পালট ক'রে
নতুন পথের খবর দিয়েছেন মোদেরে।
জীবে লাগিয়ে ধান্দা
করিল বান্দা
বস্তা-বন্ধী বেদ-পুরাণেরে॥
নিত্যযোগে সাঁই বিহারে,
বিহারে হৃদ্‌বদ্ধ ঘরে,
ওরে হৃদ্‌বদ্ধ ঘরে রাগের জোরে
রসিক যারা রূপ নেহারে॥
পোদো ভেড়ো বড় নোটো,
বিষ খেয়েছে ব'লে মিঠো,
বিষ ঝাড়বার তরে গোঁসাই আমার
বিরাজ করে শ্যামবাজারে॥

১৬২

এবার পরশ ছুঁয়ে সোনা হব সাধ ছিল মনে।
হ'লো না, তা তো হ'লোনা,
কেবল ভাঁবার মিশাল জন্যে॥
স্থানগুণে গঙ্গার জল,
পাত্রগুণে ধরে ফল,
জেতের গুণে স্বভাব যায় জানা।
ও সে ভেক-ভ্রমরে কমলবনে,
কমলের স্বভাব ভ্রমরে জানে,
ভ্রমর করে মধুপান,

(ওরে মন আমার) ভেক থাকে অজ্ঞান,
জেনে শুনে মধু খায় না কেনে ॥
কে জানে হরিনামের মহিমে,—
শিলা ভাসে ঘোর তুফানে,
সেথায় পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি,
বোবায় বলে হরি,
খঞ্জ নৃত্য করে হরি-সংকীর্তনে ॥
নিম্ববৃক্ষ শতভারে
যদি দুগ্ধ দিয়ে রোপণ করে,
তবু স্বভাব ছাড়িতে নারে।
গোঁসাই হরি পোদোয় বলে
(ওরে মন আমার) স্বভাব যায় না মলে ;
স্বভাব না ছাড়িলে
ভাবের মুকুল হবে কেনে।

১৬৩

গোল ছেড়ে মাল লও বেছে।
গোলমালে মাল মিশান আছে ॥
জান না, মন, রাগের করণ,—
যেমন বালির সঙ্গে চিনির মিলন,
সহস্র বর্ণে মিশেছে।
ওরে মত্ত হস্তী টের পেল না,
চেঁউটি মরম জেনেছে ॥
গোলমাল বলতে পারে যে,
গোলের ভিতর মাল থাকলেও
চিনতে পারে সে।
ওরে পোদো হ'লো কানা বেড়াল,
দই ব'লে কাপাস খাচ্ছে ॥

১৬৪

না জেনে সে রাগের করণ
শুধু কথায় কি হয় প্রেমের আচরণ ?
রাগের করণ যজে গেছে গোঁসাই শ্রীরূপসনাতন।
প্রেম-পিরিতি করবি যদি ধর গে সাধুর শ্রীচরণ ॥
ওরে প্রবর্ত্ত, সাধক সিদ্ধি সাধলে
মেলে প্রেমরতন।
শিক্ষা ক'রে ধনুক ধ'রে বিক্রমেতে কর রণ,
অস্ত্র বিনা গেলে ওরে যাবা মাত্র হয় পতন ॥
কথার কথা সবাই তো কয়,
বোবা নয় তো জগৎ-জন,
ছেঁড়া চ্যাটায় শুয়ে থাকে,
দেখে লাখ টাকার স্বপন ·
গাভীতে হয় গোরোচনা, সে জানে না তার মরম,
দেখ সাপের মাথায় মাণিক থাকে, তবু করে ভেক ভোজন ॥

১৬৫

আপন মনের দোষে সাধুসঙ্গ ভঙ্গ হ'ল।
মিছে সুখের আশে,
রইলাম তমর বশে,
যেন শুকনো ডাঙায় মীন পড়ে ম'ল ॥
মন হয়েছে কর্মকাণা,
দিনের করণ তাও চেনে না,
কাঁচা রসে করে আনাগোনা।
ওরে কাঁচা রস তোর টকে যাবে,
তাতে কি তোর ভিয়ান হবে,

তাতে হয় না মিছরি চিনি
সাধুর মুখে শুনি,
জলে জ্বাল দিতে দিতে দিনটা কেটে গেল ॥
মন যদি আপনার হ'তো
রত্ন-মাণিক চিনে নিতো,
তাঁবা-দস্তায় হতো না রত,
তখন সাধন ক'রে হতো সিদ্ধ,
হ'য়ে থাকতো সভের বাধ্য,
ফলতো তাতে মেওয়া খাসা
বুঝলি না রে চাষা,
তাইতে তোর এ দুর্দশা ঘটে গেল
মন হয়েছে জন্ম-কানা,
কত দেনা, কত পাওনা,
মন কিছু তার হিসাব রাখলি না।
ওরে দিনে দিনে দিন যেতেছে,
পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষয় হ'তেছে,
কোন্ দিন হবে অন্ধকার,
দেখতে পাবি নাকো আর,
পদ্মলোচন এবার গুরু-সত্য বল ॥

১৬৬

আমার মন কি যেতে চাও সুধা খেতে অন্তঃপুরে।
যেতে পারবি নে পারবি নে সেথা,
ওরে রাগের মানুষ চলে নির্বিকারে ॥
আনন্দময় বাজারখানি,
সদা হচ্ছে প্রেমের ধ্বনি,
আগুনে বারুদে এক ঠাঁই ;

সেথা লোভী-কামীর যেতে বারণ,
তথা কেবল শুদ্ধ রাগের করণ,
জ্বেলে রূপের বাতি হাতে
যেতে হবে সেই পথে,
সত্ত্ব রজঃ তমঃ রেখে দূরে ॥
সেখানে নেই হিংসা-নিন্দা,
জরা-মৃত্যু, প্রভাত-সন্ধ্যা ;
রয় বর্ণচ্ছটা দীপ্তমান হ'য়ে—
সেথা নেই দিবাকর নিশাকর,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু অগোচর,
সেথা পবন যেতে নারে—
মন, ও তুই যাবি কেমন ক'রে।
উপরোধে কি কেউ ঢেঁকি গিলতে পারে ॥
গোঁসাই হরি কহেন বচন—
যার আছে নিষ্ঠা-সাধন,
অনায়াসে সে-ই যেতে পারে।
(ওরে তুই) রৈলি বেনাগাছে ব'সে,
ডুমুর গিলবি কোন্ সাহসে ?
ও তোর যাবার এই কি করণ,
শোন রে পদ্মলোচন,
পিপীলিকার পাখা ওঠে কেবল
মরিবার তরে ॥

১৬৭

মন মিছে ভাবনা, তুমি আপনার দেহের ঠিক জান না।
প্রেম-রতি তোর হবে কিসে,
জীব-রতি তোর ষোল আনা॥
সাধুসঙ্গ উয়ের মাদা,
হয় মাদা, নয় জন্ম কাদা—
এ বড় দায়,—
যেমন ফণীর মুখে বর্ষে মণি,
সাধু হৈ দিলে না ধরলে ফণা॥
হরি বলে পদ্মলোচন,
কাটলে গাছ ডাকলে মরণ,
কে বাঁচায় এখন ;
যেমন ছড়ালে বীজ গাছ উপজে,
ঐ দেখ রবির তাতে ধান সেজে না॥

১৬৮

অনুরাগের মানুষ সহজে পাগল।
ও যার হৃদে আছে রসের কল॥
পরশপাথর হিয়াতে রাখি',
অনুরাগের সোলায় ঝাড়বে, ভাই, রাগের চকমকি।
যদি দধি-মন্থনেতে উথলে বিষ,
তাহে প্রফুল্লিত হয় শতদল॥
গোঁসাই হরি আট-হাটের-হেট,
পোদো-ভেড়োকে দিয়েছে এক বাপুতি কেঠ।
অনুরাগের মানুষ ধরবি যদি,
তবে সাধ গে যা উলট কমল॥

১৬৯

মেওয়া ফলতে ফলে সবুরের গাছে।
দেখ মৃগমদ কস্তুরী মৃগের নাভিপদ্মে জন্মেছে॥
স্বাতি-বিন্দু গোপনে সঞ্চারে,
ফলে পাত্রানুসারে,
গজমতি গোরচনা পায় স্থান গুণান্তরে।
সাধু-গুরু-জনে করে সিদ্ধিলাভ প্রথমে,
অধিকারী পায় তার পিছে॥
দ্বিতীয় পরশ হইলে পরশ
আত্মসাৎ ক'রে তারে করে আত্মবশ।
মানুষ পরশমণি, পরশ জানি' সমান রয়েছে॥
গোঁসাই হরি ফুকারে,
ডেকে বলছে পোদোরে,
ভাদ্র-গঙ্গা পার হবি কি ভেড়ার লেজ ধ'রে।
হয়ে জোনাকী পোকা, লাগিয়ে ধোকা,
যেতে চাও কি চাঁদের কাছে॥

১৭০

ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে রসের মানুষ আর।
আমার ঘর হয়েছে অনাচার॥
দৈবমায়া ঘটে যার সনে,
নারিকেলের জল কোথা আসে যায়
কে-বা তা জানে,
যেমন গুটিপোকায় গুটি বাঁধে রে,
আপনার মরণ করে সার॥

ছ'টি ইঁদুর কাটুর-কুটুর কাটছে আমার ঘর,
(ও তার) চৌদিকে হাওয়া ঢুকে আলগা নয় দুয়ার,
তীর ধ'রে নীর ছেঁচতে গেলে
ঝরণা বেয়ে হয় পাথার ॥
সঙ্গে একটা বিষম সাপিনী,
মনের সাধে দুগ্ধ দিয়ে পুষলাম কাল ফণী ;
তার নিঃশ্বাসে বয় বিষের ধোঁয়া রে,
সে আমায় খায় কি রাখে ভাবছি আর ॥
গোঁসাই হরি বলে, ও পোদো নচ্ছার,
মূলে চুরি করলি রে গোঁয়ার,
ও তোর মস্তকে দংশেছে ফণী,
আমার ভাগা বাঁধা হ'লো সার ॥

১৭১

রসের মানুষ খেলা করে বিরজা-পারে।
তার করণ উল্টা,
স্বরূপ রূপের ছটা,
আছে করণ-আঁটা
অতি নির্বিকারে ॥
আটে আটে চৌষট্টি কুঠুরি ভিতরে
রসের মানুষ সেথা নিত্য লীলা করে,
তিন দ্বারে কবাট মেরে
প্রভু যান তো বাহিরে,
কভু সিংদ্বারে, কভু সিন্ধুনীরে ॥
বারুদ-কুঠুরি ঘর বেদের অগোচর,
তাহে অনল-চাপা এইটি নিট খবর,

সেখানকার মহিমা
দিতে নারি সীমা,
জানে রসিক জনা আস্বাদ ক'রে ॥
স্বচৈতন্য মানুষ বটে গরল-মাখা,
স্বভাব কিন্তু বাঁকা অহিরেব রেখা,
তার রসের ঘরে বাতি,
জ্বলছে দিবারাতি,
অখণ্ড পিরিতি আনন্দবাজারে ॥
তিন প্রভুর মর্ম, ছয় গোস্বামীর ধর্ম,
নব রসিক যারা করে এই কর্ম,
গোঁসাই হরি এমনি ধারা—
নাহি মৃত্যু-জরা,
পোদো এবার পড়লি ভবঘোরে ॥

১৭২

দিন-দুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহান ভার।
হ'লো অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ তের প্রহর অন্ধকার ॥
সূর্য-মামা ম'রে গেছে বুকে মেরে শূল,
বামুনপাড়ায় কায়েতবুড়ী মাথায় বইছে চুল।
আবার কামরূপেতে কাকা ম'ল,
কাশীধামে হাহাকার ॥
ময়রা-মামীর কুলের স্বামী বসে রয়েছে,
তার গর্ভেতে তিন জনার জন্ম হয়েছে।
আবার ভাদ্র-মাসের তেরোয় পৌষে
চড়ক-পূজার দিন এবার ॥

বৃন্দাবনে বলছে বামী বোষ্টমী—
একাদশীর দিনে হবে জন্মাষ্টমী।
আবার রাজবাড়ীতে টাট্টু ঘোড়ার
সিং বেরিয়েছে দু'টো তার॥
গোঁসাই পোদোয় কয় ভেবে এবার,
কথা শুনতে চমৎকার,
সাধক বিনে বুঝতে পারে
এমন সাধ্য কার।
কথা যে বুঝেছে, সেই মজেছে,
গিয়েছে সে বেদের পার॥

ফটিক গোঁসাই

[গোপালগঞ্জ মহকুমার (ফরিদপুর জেলা) মাচকান্দী গ্রামে নমঃশূদ্র বংশে ইহার জন্ম হয়। বহুদিন নবদ্বীপবাসী ছিলেন, বছর পনর হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন। ফরিদপুর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলায় বহু শিষ্য আছে। ইহার গানগুলি খুলনার নমঃশূদ্র-জাতীয় বাউল সতীশের নিকট হইতে সংগৃহীত।]

১৭৩

যে জন ভব-নদীর ভাব জেনেছে,
তার কিসের ভয় আছে।
ও সে ভাটার সময় ভেটেয় না রে
জোয়ারে গুণ ধরে দিয়েছে॥
দিনের বেলা জোয়ার এলে
ব'সে থাকে নদীর কূলে,
যায় না তার কাছে।
হলে নিশিযোগে চাঁদের উদয়
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে নিয়েছে॥
ভব-নদীর অকূল পাথার,
জলের ভঙ্গী কি চমৎকার,
তিনটি ধারা আছে।
তার এক ধারার জল অতি সরল,
তিন ধারায় এক পাক পড়েছে॥
যে চেনে সে ত্রিবেণীর ধার
প্রেমানন্দে দিচ্ছে সাঁতার,
তার বিপদের ভয় কি আছে।
ও সে পাঁকাল মাছের মত
পাঁকের মধ্যে ফাঁক পেয়েছে॥

ফটিক বলে, রসিক যারা,
ভাব জেনে ঝাঁপ দিচ্ছে তারা,
বিপদ নাই তা'র কাছে।
ও সে স্বরূপেতে রূপ মিশায়ে
মনের মানুষ বলে কাঁদতেছে॥

১৭৪

নিগূঢ় ব্রজরসের সাধন করা পারবি কি তোরা।
সে অতি অসাধ্য-সাধন, ফণীর মাথার মণি ধরা॥
যোগমায়া সে পৌর্ণমাসী,
পূর্ণ মাসে পূর্ণশশী
তাহার মিলন করা।
সে সব জানতে পারে ব্রজপুরে
যোগের সময় জাগে যারা॥
দুই মানুষ থাকে গোকুলে,
উদয় হয় রাসমণ্ডলে
প্রেম-পিরিতি দ্বারা।
তারে অখণ্ড গোলোকে পাঠায়
সুচতুর গোপ-গোপী যারা॥
সুরসিকার যোগের বলে
যমুনার জল উজান চলে,
তার সঙ্গে যায় তারা।
তারে অখণ্ড গোলোকে সাজায়
নিত্য চন্দ্র চিত্তচোরা॥

ভাব না জেনে ভাব ধরিলে
মননমাত্র নদীর কূলে
নরবলি সারা।
গোঁসাই ফটিক বলে, বাঁচতে পারে
নিঃস্বার্থ প্রেম করে যারা॥

যাদুবিন্দু

[যাদুবিন্দু রাঢ়ের বাউল ও বহু সংগীত-রচয়িতা। বাড়ী বর্ধমান জেলার পাঁচলোকি গ্রামে ; গুরুর নাম কুবীর গোঁসাই।

ভণিতায় নামোল্লেখে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার নাম 'যাদব' ও তাঁহার সহ-সাধিকা প্রকৃতির নাম 'বিন্দু'। এই উভয় নাম-যোগে রচিত নাম তিনি ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। নামটি হওয়া উচিত ছিল—'যাদবেন্দু'। এই ভণিতাতেও কতকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বেশির ভাগ গানেই 'যাদুবিন্দু' ভণিতা আছে। বোধ হয়, যাদবের আদর-ব্যঞ্জক ডাকনাম 'যাদু'র সঙ্গে 'বিন্দু'র মিলন করা হইয়াছে। 'কুবীর কয় শোনরে যাদু' এইরূপ পদও কয়েকটি গানে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং যাদবের ডাকনাম 'যাদু'র সঙ্গে 'বিন্দু'র নাম যুক্ত হইয়া 'যাদুবিন্দু'র সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যাদুবিন্দুর গান বাংলার বাউল-মহলে সর্বত্র গীত হয়। বাংলার, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের, এমন বাউল নাই, যাহার যাদুবিন্দুর গান দুই-চারিটি মুখস্থ না আছে। পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত যাদুবিন্দুর প্রায় একশত গান আমার নিকট আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি গান বাছিয়া লাওয়া হইল। ইহা ছাড়া রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক একখানি দীর্ঘ গানের পুঁথিও আমার নিকট আছে।]

১৭৫

আমার এই কাদা মাখা সার হ'লো।

ধর্ম-মাছ ধরব ব'লে নামলাম জলে,

ভক্তি-জাল ছিঁড়ে গেল।

কেবল হিংসে নিন্দে গুগ্‌লি ঘোঙা পেয়েছি কতকগুলো॥

এই সত্যধর্ম বিলে, সুরসিক বাগদী দুলে,

শুদ্ধভাব জালটি ফেলে,

আনন্দে মাছ ধরছে ভালো।

আমি পড়লাম ফাঁকে, মায়া-পাঁকে বল-বুদ্ধি চুলোয় গেলো

কুসঙ্গে বিল গাবালাম,
কুক্ষণে জাল নাবালাম,
ক্ষমা-খালুই হারালাম,
উপায় কি করি বলো।
আমি বিল ঘুণে পাই চাঁদা পুঁটি, লোভ ছিল লুটে নিলো।
পাঁচটা ভূত লাগল পিছে,
মাছ ধরায় প্যাঁচ পড়েছে,
ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে,
আর বাদী জনা ষোল।
আমি মাকাল পূজোর মন্ত্র ভুলে হয়েছি এলোমেলো ॥
গোঁসাই কুবীর চাঁদ ভাষে হুদার গদীতে ব'সে,
এই যাদুবিন্দু দাসে,
পাঁচলোকির পাট মস্ত হ'লো।
দিলে মোয়ান তাড়া, মূর্খ মেড়া, আপনার দোষে ম'লো ॥

১৭৬

যদি হয় মহাভাবুক জেলে,
ধর্ম মাছ ধরতে পারে
ভাবের দ্বারে গুরু-ভাব-ভক্তি-জালে।
অমূল্য মাছ প্রাপ্ত হয় সে,
হিংসা-গুগ্‌লি দেয় ফেলে
সদাই সুসঙ্গে থাকে,
পড়ে না মায়ার পাঁকে,
চলে সে ফাঁকে ফাঁকে
চেতন-গুরু-কৃপা বলে।

ও সে মাছ ধরে, লাগে না কাদা প্রেম-সরোবরের জলে ॥
গুরু-রূপ নেহার ক'রে
মাছ ধরে ধীরে ধীরে,
রাখে ক্ষমা খালুইতে পুরে
সে আপন হৃদ্‌কমলে।
তার মন-নয়ন রয়েছে তাতে, করবে কি আর লোভ-চিলে ॥
পাঁচটা ভূত থাকে যদি,
হয় নাকো প্রতিবাদী,
দিয়ে তায় নাম ঔষধি
বশ করে কলে-কৌশলে।
ও সে মাকাল পূজে হৃদয়-মাঝে প্রেম-বারি, মন-ফুলে ॥
গাব করে জাল স্বরূপ-রসে,
শক্ত জাল ছিঁড়বে আর কিসে,
পতন তার নেই কোন কালে।
ও সে জাল বেয়ে যায় বোলে জানায়,
পিরিত-মধুর অঞ্চলে ॥
জগতে যে জেলে ওঁছা,
এই যাদুবিন্দু বোঁচা,
বুদ্ধি তার অতিশয় কাঁচা
গোঁসাই কুবীর চাঁদে বলে ॥

১৭৭

অনুরাগে গাছ কাটলেই কি গাছি হওয়া যায়।
ও যে ঘোলারসে বীজ মরে না,
গাছি রাগ ক'রে রস ঢেলে ফেলায় ॥
প্রেমের গাছি হয় যে জন,
ও সে মন-দড়া দিয়ে গাছ করে বন্ধন ;

তীক্ষ্ণ দায়ে
হৃদয় ভেদিয়ে
ফটিক রসের বহায় প্লাবন।
ও সে মনের সুখে রস জ্বালায়ে মিছরি বানায়॥
অধম যাদুবিন্দু কয়, কুবীর গোঁসাই সে রস পায়।
আমার ভাঁড়ের ঘোলা রস যে
ওঠে গেঁজে ;
ও সে রসে বীজ মরে না, মিছরি হয় না,
ঘুঁটতে ঘুঁটতে জীবন যায়॥

১৭৮

এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই,
কেন দেখলি না আপনার ভুঁই।
তোর দেহ-জমির পাকা ধানে
দেখ লেগেছে ছ'টা বাবুই॥
বহু কষ্টে করলি কৃষাণি,
এই মানবদেহ চৌদ্দ-পোয়া লাল জমিখানি,
তাতে ভক্তি-ফসল জন্মেছিল,
সব খেয়ে গেল হিংসা-চড়ুই॥
চেতন-বেড়া উপড়ে পড়েছে,
সব জায়গা আলগা পেয়ে
গরু-ছাগল পাকা ফসল খেয়ে ফেলেছে।
এখন গোঁফ ফুলিয়ে ব'সে আছে—
দেখ তোর মাচা-ভরা বিল্ল-পুঁই॥

কেন ভুঁয়ের এলে বাঁধলি নে কুঁড়ে,
এখন চিন্তা-জ্বরে
মরবি পুড়ে,
তোর পেটে হবে পিলুই ॥
তোর আশা ভাঙল, ফসল গেল,
তুই ঠেকবি যখন
দেখবি তখন
নিকেশের সময়।
কাঙাল যাত্ববিন্দু ভণে, আমার এইটুকু ভরসা মনে,
আমি কুবীর-পদে মনকে থুই ॥

১৭৯

অধর মানুষ ধরব কেমন ক'রে।
(ও সে) বিরাজে বিরজা-পারে,
চর্ম-চক্ষে দেখতে পাইনে তারে ॥
অধর যদি ধরা যেত,
ধরা রূপ তার প্রকাশ পেত,
আকৃতি নিরূপণ হ'ত,
পাওয়া যেত সাধন-অনুসারে ॥
অধরের আকৃতি কেমন,
বল দেখি রে ও ভোলামন ;
কোন্ রূপ ভেবে করি সাধন—
নিরূপণ তার হ'লো না এবারে ॥
নিরাকার সে আকার-শূন্য ধন্য জগতে,
দেবতা-গন্ধর্ব-নরের সকলের পিতে,
সে পিতের সন্ধান পাব,
এমন যোগ্য কবে হব ;
যাত্ববিন্দু করে স্তব কুবীরচাঁদের যুগল চরণ ধ'রে ॥

১৮০

বিষম নদী পাতাল-ভেদী ত্রিবেণী।
তায় নামলে পরে
উঠতে নারে,
প্রাণে মরে তখনি॥
তড়কা-তুফান
ভাটি-উজান,
বইছে দিবা-রজনী।
তার বাঁক দেখে যায়
অবাক হ'য়ে মুনি-ঋষি-জ্ঞানী॥
অকূল পাথার—
সাধ্য বা কার
বেয়ে যায় তায় তরণী।
কত সাধুর ভরা
যাচ্ছে মারা,
দেবতারা খায় চুবানি॥
নেবে সেই নদীতে
ব্রহ্মা বিষ্ণু
প্রাণ ল'য়ে টানাটানি।
মহেশ্বর তাঁর সাধন-জোরে
পার হ'য়ে গেছেন ওপারে,
সামাল সামাল সেই নদীতে
গোঁসাই কুবীরের বাণী।
কাঙাল যাছুবিন্দু ডুবে ম'ল, হ'ল না সুসন্ধানী॥

১৮১

ধিক্ ধিক্ মন তোমারে, বলবো কিরে,
কাচ নিলি কাঞ্চনের দরে।
তোমার থাকতে নয়ন, ফেলে রতন,
যতন কর ঝুট পাথরে॥
কত লাল জহর-মণি,
হীরে চুনি,
আছে ঘরের মাঝারে।
তুমি তো তাও চেন না,
হ'য়ে কানা,
বেড়াও কেবল ঘুরে ঘুরে॥
আপনাকে আপনি ভুলে,
গোলেমালে
প'ড়ে গেলে বিষম ফেরে।
তুমি বুঝলে না ভুল
হ'য়ে বাতুল
মূল খোয়ালে হেলা ক'রে॥
কোমরে কাস্তে গুঁজে, বেড়াও খুঁজে,
মাঠে মাঠে কিসের তরে।
একবার দেখলি না মন, হ'য়ে চেতন,
হেলা ক'রে রূপের ঘরে॥
আমার মত বুদ্ধি হত,
দেখতে না পাই ত্রিসংসারে।
গোঁসাই কুবীর বলে, যাদুবিন্দু, প্রাণ হারালি চিন্তা-জ্বরে॥

১৮২

মন-বেদে মরবি রে ফণী ধ'রে।
কোন্ সাপের বিষ বেশি তায়,
কামড়ায় মাথায়,
যায় সে যমের দক্ষিণদ্বারে।
তুই যাস নে নেচে সাপের কাছে
বলি রে আমি তোরে॥
ফণা যখন ধরে সাপে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু ভয়ে কাঁপে ;
সামনে যায় কোন্ রোজার বাপে।
কত মুনি, ঋষি, ইন্দ্র-শশী
নাম শুনে প্রণাম করে॥
কেলে সাপের হাই লাগিলে
কত গুণী পড়ে ঢ'লে,
আপ্তসারা মন্ত্র যায় ভুলে।
চোখে দেখলে সাপে, ধরে চেপে
পা দিয়ে চেপে মারে॥
আশুতোষ ধরেছে ফণী,
বলো, কে আছে আর তেমন গুণী,
মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি।
যার শক্তি সহায়, তার কিসের ভয়
আছে জগৎ-সংসারে॥
যাদুবিন্দু দেখলে ঢোঁড়া
হ'য়ে যাবে মুলুক-ছাড়া,
দূরে থাক কেউটে আর গোখরে

১৮৩

রসিক গুণী ফণী ধরতে পারে অনায়াসে।
শিখেছে বিষহরা, আপ্তসারা
শ্রীগুরুর কৃপায় সে ;
ও সে সাপুড়ে মন্ত্র ত্যাগ করেছে
শুদ্ধ প্রেম-রাগের বিশ্বাসে ॥
ফণীর শিরের মণি খুলে
আপন শিরে নেয় সে তুলে,
পাকা গুণী নয় কাঁচা ছেলে।
ও সে সাপ খেলে, হৃদয়ে তুলে
উন্মত্ত প্রেম-রসে ॥
ফণী তাকে পোষ মেনেছে,
নত হ'য়ে পড়ে আছে,
বিষ-দাঁত তার ভেঙ্গে গিয়েছে।
ফণী ঘাড় তোলে না,
মুখ মেলে না,
রয়েছে বেদের বশে ॥
গুণী যখন সাপকে ধরে,
হাত বাড়ায় ধীরে ধীরে,
কোন সাপে তু'নজর করে।
তখন হাঁফ লেগে সাপ লটকে পড়ে,
সেই সময় ধরে ঠেসে ॥
রসিক গুণী কুবীর গোঁসাই,
সে কথা কি বলব রে ভাই ;
যাতুবিন্দুর মুখে আখার ছাই।
ও সে কুবীর ছেড়ে ঘুরে মরে, এমনি কপাল একপেশে ॥

১৮৪

মেলে তায় খুঁজলে আপনার দেহ-মন্দিরে।
ও সেই জগৎপিতা কচ্ছে কথা
অতি মিষ্ট মধুর স্বরে ॥
লুকোচুরি জানে বিলক্ষণ,
কেউ পায় না দরশন,
আকারশূন্য, জগৎমান্য জগতের জীবন।
সহস্রদলে স্থিতি,
নাভিপদ্মে গতায়াতি,
তাকে সহজে যায় না ধরা,
ও সে পলকে প্রলয় করে ॥
আপন তত্ত্ব কর আপনি
হ'য়ে চেতন দিবা-রজনী,
তবে যদি কৃপা করে সেই গুণমণি।
তারে ধরবার আশা কোরো না রে মন,
সে যে অধর-নিধি নাম ধরে ॥
মনে-প্রাণে হয় যদি বিশ্বাস,
তবে কর তাহার আশ,
কর্ম ছাড়া তর্ক হ'লে সকল কার্য নাশ।
যাদুবিন্দু ঢেঁটা, বুদ্ধি মোটা,
সে কি কুবীরকে চিনতে পারে ॥

১৮৫

এমন সহজ পথে হুঁচট লাগে ওরে দিনকানা।
আপনি সহজ না হলে তো সহজের পথ পাবি না॥
এক কানা হলি না রে মন,
কানার দলে মিশে আছিস
আর আছে ছয়জন।
এবার সাত কানার এক কানাতে প'ড়ে
প্রাণ হ'লো কানায়-কানা॥
থাকবি যদি সাধুর হাটে,
কানায় খোঁড়ায় মিলে চল
সাধুর নিকটে।
তখন অন্ধকারে দেখতে পাবি
রাঙ পিতল কোন্‌টি সোনা॥
ও তুই সরল হ'য়ে ধরগা সাধুর পায়,
তোর দিব্য নয়ন কবে দেবে হাত বুলায়ে গায়।
যাত্নবিন্দু বলে এবার আমি
সাধুর চরণ ছাড়ব না॥

রাজসাহী ও রংপুর জেলা হইতে সংগৃহীত গান

[এই পর্যায়ের গানগুলি রাজসাহী ও রংপুর জেলার নানা স্থান হইতে সংগৃহীত। এই গুলির মধ্য হইতে লালন-শিষ্য দুদ্দু ও পাঁচুর কয়েকটি গান এবং অন্যান্য রচয়িতারও কয়েকটি গান গ্রহণ করা হইল।]

১৮৬

কবাট মারো কামের ঘরে,
মানুষ ঝলক দেবে নেহারে
হাওয়া ধরো,
আগুন ঠিক করো,
(যাতে) মরিয়ে বাঁচিতে পারো,
মরণের আগে মরো,
দেখে শমন যাবে ফিরে ॥
বারে বারে করি মানা,
লীলার বশে আর যেও না,
রাখ তেজের ঘরে তেজিয়ানা,
সেই উর্ধ্ব চাঁদ ধ'রে ॥
জান না পারাহীন দর্পণ,
কিরূপে হয় রূপ-দরশন ?
বিনয় ক'রে বলে লালন,
দুদ্দু থেকো হুঁশিয়ারে ॥

১৮৭

আপনাকে চিনলে পরে চেনা যায় পরওয়ারদিগারে।
সাঁই নিরাকারে নিরন্তরে খেলছে খেলা এই আকারে
খোদার খোদা
নাই সে জুদা
আরশে খোদা দেলের ঘরে।
আছে দশ ভাণ্ডালে সে ঘর ঘেরা
দেখতে পাবি নছীব-জোরে॥
"মান আরফা নাফছাহু ফাকাদ আরফা"তে
আছে প্রচার।
সে যে আপনাকে আপনি বলেছেন নবী পরওয়ারে।
সুগুম সেই মোকামে হাজের থাকো দেল-হুজুরে।
সে যে হ'য়ে ফানা রূপখানা আশেকে মাশুক ঘেরে॥
দরবেশ লালন শা' কয়,
তরিক এই হয়,—
বন্দেগি হাল্লাজির তরে।
তুদ্দু তরিক ভুলে খাবি খেয়ে
দেশ-দেশান্তরে বেড়ায় ঘুরে॥

১৮৮

আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে।
যে চেনা আপনাকে চেনা ফরমাই নবীর হাদিচেতে।
রোজা কি নামাজ পড়া, কলমা কি হজ-জাকাতে—
ও সে জাহির করা নানা মতে,
কিন্তু নিজ পরিচয় কৈ তাহাতে।

কাবার কি নিরিখ নিরূপণ—
নিজের কাবাই নাই অন্বেষণ,
খলিলুল্লার কাবায় কি কখন
খোদাকে কেউ পায় দেখিতে ॥
খলিলুল্লার কাবা রে ভাই,
সে কাবা পিছেতে হয়,
আদম-কাবাই দেখ না, রে মন, আগে চেয়ে,—
দুদ্দু কয়, উকো সেজ্‌দা দিলে,
খোদার দেদার কই তাহাতে ॥

১৮৯

আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে।
ও যে ধারার সঙ্গে আছে মানুষ, ধর সে ধারায় রে ॥
আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে ॥
তিন শ' ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি',
সেই নদীতে প্রাণ বান্ধিলে মানুষ ধরা যায় রে।
লালন শা' ফকিরে বলে, রে পাঁচু,
বুদ্ধি তোর নাইকো কিছু,
বেদাতির রস পান করিলে মৃত্যু-হরণ হয় রে।
আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে ॥

১৯০

সূর্যের সুসঙ্গে কমল কিরূপেতে যুগল হয়।
সে প্রেম সামান্যে কি জানা যায় ॥
সমুদ্রে নামিলে, ভাই, পদ না ভিজিবে তায়।
মায়ার সঙ্গে রবে মায়া, পরশ না করিবে তায় ॥

কুম্ভীরে পতঙ্গ ধ'রে মাটির ঘরে লয়ে যায়।
আল ভাঙিয়ে কায় চাপিয়ে আপন ক'রে ছেড়ে দেয়॥
দুন্দুভি বাঁশী যে দিন বাজিবে, সে দিন শুনিবে, ভাই।
যে জন মরিবে, সেই সে যুগল চরণ পায়॥
লালন শা' বলে, রে পাঁচু, সে বড় রাগের করণ।
বাণ-ধনুকে শিক্ষা হ'লে তবে হবে রণে জয়॥

১৯১

আমার যায় না দুখের দিন, হয় না সুদিন,
আমি কিরূপে পাব শ্রীগুরুর চরণ॥
হারায়ে গুরু-বস্তু-ধন,
(আমার) দিনে দিনে দেহ-তরী
পাপেতে হ'তেছে ভারী,
ভব-পারে যাইতে নারি,
কি করি এখন॥
মায়াতে হ'য়ে বদ্ধ
ভুলেছি গুরুর চরণ-পদ্ম,
বিপদ-বাধায় পদে পদে প্রতিবাদী ছয়জন
মন রয়েছে রিপুর বশে,
শমন-ভয় এড়াব কিসে,
মোহন মদন-রসে হ'য়ে মগন॥
হ'ল না রে মোর সাধন করা,
কি গুণে সাঁই দিবে ধরা,
হারাইয়াছি গুরুর বস্তু-ধন।
যে হরি সেই গুরু, ভক্তের কল্পতরু,
কর্ণধার গুরু,
করিলে বীজ রোপণ॥

বীজের অঙ্কুর হয় না, হয় না পাতা,
অযতনে শুকায় লতা।
গোবিন্দের এই মনের কথা
মাণিকচাঁদের শোনো বচন

১৯২

দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখসে তোরা আয়।
নাছুত, লাহুত, মালকুত, জবরুত-তত্ত্ব জান গে চারজনায়
ত্রিবেণীর তিন ধারায়
অধর মানুষ আসে যায়,
ঊর্ধ্ব হ'য়ে ঝোলে মানুষ,
চাঁদের মত ঝলক দেয়।
ঢাকার সহরে আছে মানুষ
চিন-সহরে চিনতে হয়॥
আঠারো মোকামে মানুষ
চলা-ফেরা করে সদায়।
একবার ঘরে, একবার বাহিরে
সদায় হাওয়া টেনে ছেড়ে দেয়॥
বাখের শা' ফকিরে বলে, শোন ওরে বলি ভাই,
চক্ষুদানি হ'লে পরে মানুষ নাচে খেলে দেখা যায়।
ও সে হৃদকমলে থেকে মানুষ চাঁদের মত ঝলক দেয়॥

১৯৩

পাকে পাকে তার ছিড়ে যায়, দৌড়াদৌড়ি সার।
মনের অনুরাগ-তরীতে একান্ত চিত্তে হও রে সওয়ার ॥
ছয় রিপুরে বশ করিয়ে
আল্লার নামের পেরাক দেও আঁটিয়ে,
দৃঢ় কর তরীখান ;
মনের হিংসা-নিন্দা কাঠ কা'টে গুরো আঁটো,
শুদ্ধ রাগের কর পাটাতন,
শ্রদ্ধা দিয়ে ছই বানায়ে, নাড়ীতে গুণ-মাস্তুল গা'ড়ে
কপির কর সৃজন।
(ওরে) ধর্মের নামে বাদাম দিয়ে চল যেথায় রে
মানুষ-রতন এবার ॥
মানুষ-রত্ন-জনা কাঁচাসোনা,
জীবন থাকিতে চর্মচোখে তা দেখলাম না,
ভোলাই বলে ঊর্ধ্বরতি জ্বালাও বাতি,
তবে ঘুচবে মনের অন্ধকার ॥

১৯৪

পারের ঘাটে কত মানুষ মারা যায়।
ঘাটে লাগায়ে তরী আশাধারী আছেন মাঝি কিনারায়।
কামে রত যত জনা
পথ থাকিতে পথ পাবে না,
ঘাটে গিয়ে হবে কানা সেই সময়।
সেই তো নদীর কড়া জলে
সর্প কুম্ভীর কত চলে,
জীবজন্তু খাচ্ছে ধ'রে,
সত্য বটে, মিথ্যা নয় ॥

ভাবের মানুষ বল যারে,
তারা কি অযোগে চলে ?
অযোগ কুযোগ দেখিলে দাঁড়িয়ে রয়।
গুরু-পদে নেহার দিয়ে,
কুম্ভীরের পৃষ্ঠে পাও দিয়ে,
অনায়াসে পার হয়ে যায়॥
মুরশিদ নাই যার সঙ্গের সাথী,
এ জগতে সেই অনাথী ;
ঘাটে যেয়ে যে দুর্গতি,
তা বলিবার নয়।
তারা ফাঁপর মানে সাঁতার দিতে হাঁটুজলে,
খাবি খায় শত শত, ম'রে যায়,
কে করে তার নির্ণয়॥
জোয়ার-ভাটা সেই নদীতে
জানি আমি বিধিমতে,
নঙ্গর জাহাজ কত তাতে মারা যায়।
গোপাল বলে, মন-রসনা,
তার কোন্ জোয়ারে হয় রে লোনা,
কোন্ জোয়ারে মাখন-ছানা,
হংস তাহা কেমনে বাছিয়ে লয়

১৯৫

বস, রে মন, গুরুর কাছে।
গুরু বিনে ভবে কি ধন আছে॥
গুরু-বস্তু-ধন চিনলি নারে, মন,
অযতনে সে ধন মারা গেছে।

ও সে আলেক-রূপে সাঁই ভ্রমিছে সদাই,
সহজ মানুষ সহজ পথে যায়,
ও সে গয়া-গঙ্গা-কাশী তীর্থ বারাণসী,
সকল তীর্থ গুরুর শ্রীচরণে আছে ॥
ও সে পদ্ম-পত্রের জল, করছে টলমল,
অল্প বাতাসে নদীর তুফান ছুটে,
ও যে জল ছাড়া মীন বাঁচে না একদিন,
গুরু ছাড়া শিষ্য বাঁচে কিসে ?
বস, রে মন, গুরুর কাছে ॥
যে জন সাধন করেছে, গুরু ধরেছে,
অধর মানুষ ধ'রে ব'সে আছে।
গুরু বিনে ভবে কি ধন আছে ॥

১৯৬

আর আমার কেউ নাই, আর আমার কেউ নাই,
মুরশিদ তোমা বিনে।
একবার দয়া ক'রে চাও, গো মুরশিদ,
দীন-হীনের পানে ॥
মুরশিদ তোমার করুণা-গুণে শোলা ডোবে, শিলা ভাসে,
ভক্তের বাঞ্ছা পুরাও না কেনে।
যদি হ'য়ে থাকি অপরাধী, তুমি তো জগতের পতি,
তোমার দীনবন্ধু নাম, জানি হে সন্ধান,
চেয়ে আছি তোমার চরণ পানে ॥
মুরশিদ, যে জন তোমার শরণ লয়,
তার দশা কি এমন হয় ?
তা তো তোমার উচিৎ নয়,
আমি অপরাধী, তুমি হে জগৎপতি,
গতি নাই তোমার চরণ বিনে ॥

নরসিংদি হইতে সংগৃহীত গান

এই পর্যায়ের পাঁচটি গান ঢাকা জেলার নরসিংদি হইতে সংগৃহীত। নরসিংদি বহুদিন হইতে পূর্ববঙ্গ ও আসামের বাউলদের একটি প্রধান আড্ডা। এখানে বাউল বলিয়া পরিচিত বহুলোকের বাস। পার্থসারথি গুপ্ত নামে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্রকে পাঠাই নরসিংদি হইতে বাউল গান ও তথ্যসংগ্রহ করিতে। পার্থসারথির বাড়ী কুমিল্লা জেলায় ও ঐস্থানে তাহার পরিচিত লোক ছিল। পল্লী-সাহিত্যে পার্থসারথির বিশেষ অনুরাগ ছিল। 'বাউলের সাথে দু'দিন' শীর্ষক তাহার একটি প্রবন্ধ হইতে স্থানবিশেষের কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল:

"বহুদিন ধরে নরসিংদি অঞ্চলের বাউলদের সঙ্গলাভের প্রচেষ্টায় ছিলাম ......অনেকটা আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে যাবার সৌভাগ্য হ'ল। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে পাঠালেন নরসিংদি অঞ্চল হ'তে বাউল-গীতিকা ও তথ্য সংগ্রহ করতে।......নরসিংদিতে আমার একজন বিশেষ বন্ধু আছে। তার উপাধি বাউল। তার বাবা স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক। তার বিশেষ সাহায্য পাওয়ার আশায় স্থির করলাম তার সঙ্গেই প্রথম দেখা করব।......

"নরসিংদি স্টেশনে সকাল দশটার দিকে ট্রেনখানি এসে থামল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে এক চৌমাথায় এসে দাঁড়ালাম..... একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে বাউলপাড়ার রাস্তা জেনে নিলাম।.....পথটা ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে এবং দু'পাশের ঘনজঙ্গল আরও ঘনায়িত......মাঝে মাঝে বন-জঙ্গল ও বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে দু-একজন লোক বেরিয়ে আসছে দেখা যায়।......প্রকৃতির আবেষ্টনী এত নিবিড় যে, এখানে 'দিন দুপুরে শেয়াল ডাকে'।......যা-ই হোক, অনেক কষ্টে কতকটা পথ-চলার পর বন্ধুটির বাড়ী বের করলাম। বন্ধুর পিতা আমার পরিচয় পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ে আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের চিঠিখানি তাঁকে দিলাম। তিনি দীর্ঘ চিঠিখানি মনোযোগের সঙ্গে পড়ে একটু হেসে বললেন: "জানই তো আমাদের নিষেধ আছে—'আপন ভজন-কথা না কহিবে যথা তথা'। তবে এ বিষয়ে তোমাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি তোমাকে ঠিক মত জায়গায় ও লোকের কাছে নিয়ে যাব।'

"বন্ধুর বাড়ী হ'তে মেঘনা নদী দেখা যায়।····· ঐ নদীর ধারে বাউলদের আমড়া-ঘাট।·······ঝড়বৃষ্টির ধর্ষণে ও নদীর কূলভাঙ্গা ঢেউয়ে উঁচু-নীচু তট সমান হ'য়ে ঘাটে পরিণত হয়েছে······বাউলদের কল্পনায় ঐ ঘাটের সঙ্গে তাদের বাউল ঠাকুরের মাহাত্ম্য জড়িত। এই ঘাটের জলে কুমীরের কোনও ভয় নাই, এই ঘাটের আশে-পাশে অন্যত্র কুমীর দেখা যেতে পারে, কিন্তু বাউল ঠাকুরের অদৃশ্য প্রভাবে এই ঘাটে কোনদিন কুমীর আসে না এবং এ পর্যন্ত কাউকে অনিষ্ট করেনি।·······এই ঘাটের উপরেই তাদের আখড়া······আমাদের এখানকার 'পূজামণ্ডপে'র মত অনেকটা।······সন্ধ্যার পর সমস্ত বাউল ভক্তবৃন্দের এখানে বৈঠক হয়।······গান ও ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা হয়।······

"বন্ধুর পিতা বাউলদের এই সান্ধ্য বৈঠকে আমাকে নিয়ে গেলেন।····· উপস্থিত সকলের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার উদ্দেশ্যের কথা বললেন। ······ওদের মধ্যে কয়েকজন প্রথমে কিছু বলতে আপত্তি করল, কিন্তু বন্ধুর পিতা ও মাতব্বর গোছের কয়েকজন বাউলের সহানুভূতি আমার উপর থাকায়, ওদের প্রতিবাদ চাপা পড়ে গেল।······দু'দিন এদের গান শুনে ও আলাপ-আলোচনা ক'রে কতকগুলি গান ও নির্দিষ্ট তথ্য খাতায় টুকে নিলাম।·····"

নরসিংদির বাউলদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি পাওয়া গিয়াছে :

কবে হইতে এই বাউলসম্প্রদায় এখানে বাস করিতেছে, তাহার একটা নির্দিষ্ট ধারণা তাহাদের নাই, এবং তাহাদের ধর্মগুরু বাউল ঠাকুর যে কোথা হইতে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাও তাহারা জানে না। কেবল বাউলঠাকুরের অলৌকিক কীর্তি-কাহিনী সম্বন্ধে তাহাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে। কেবল তাহাদের 'ধর্মাবতার' বাউল ঠাকুরের তিরোধান-সময়টি ইহাদের অনেকে জানে। তিনি ১২৬৩ সালের চৈত্রমাসে লীলাসংবরণ করেন।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। সেই সময় ইহাদের বর্তমান ধর্মগুরু বাউল ঠাকুর উপস্থিত হন।

নরসিংদির বাউল ধর্মমত বর্তমানে হিন্দুধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। তাহাদের আখড়ায় জগদ্বন্ধু ও মহাবিষ্ণুর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও বাড়ীতে গণেশের মূর্তিও আছে। বর্তমানে প্রায় সকলেই সংসারী—স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া সংসার করিতেছে। জীবিকা হিসাবে কেহ বা চাকুরী করে, কেহ বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, আবার অনেকে সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে বা দেহতত্ত্ববিষয়ক

গান গাহিয়া নানা স্থান হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। যদিও তাহাদের জীবন যাপনের পূর্ব নির্দেশ ছিল :

'ভিক্ষা করিয়া করিবে উদর পোষণ,
নীরবে বসিয়ে করিবে নাম-সংকীর্তন।'

কিন্তু এখন অর্থনৈতিক চাপে, যে যেমন-ভাবে পারে, উদর-পোষণের চেষ্টা করিতেছে।

নরসিংদির বাউল সম্প্রদায়ের আদি গুরুর নাম রামদাস। রামদাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বহুদিন পূর্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় 'বাউল ঠাকুর রামদাস' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছিলেন (প্রতিভা, ৩য় বর্ষ, ১৩২০, রবীন্দ্রনাথ সেন): "অনুমানিক ১২৬০ সাল নাগাত রামদাস বাউল, শিষ্যশাবকসহ এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।" কিন্তু বর্তমানে স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা যায় যে, আদি ধর্মগুরু বাউল ঠাকুর ১২৬৩ সালে দেহত্যাগ করেন। এই বিবরণ অনুসারে রামদাস এখানে শিষ্যাদিসহ আসিবার তিন বৎসর পরে মারা যান। কোন্ সূত্র হইতে লেখক এই সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন নাই। নরসিংদিতে আগমনের মাত্র তিন বৎসর পরে যদি তিনি মারা যাইতেন, তবে তাঁহার মৃত্যু-তারিখের সঙ্গে আগমনের তারিখটিও লোকের মনে থাকিত। সুতরাং মনে হয়, উহার অনেক পূর্বে সম্ভবতঃ ১২০০ সালের গোড়ার দিকে তিনি এখানে এই বাউল উপনিবেশ স্থাপন করেন।

১৯৭

ধরবি যদি অধর মানুষ
ভক্তিপথে দাঁড়াও মন,
পার যদি মনফুলে নয়ন জলে
পূজগে গুরুর শ্রীচরণ।
চেতন থাকতে দেও না বেড়া,
হুঁশিয়ারে দাও পাহারা,
চৌকি রেখো নয়ন-তারা
ধরার এই করণ॥

হিংসা, নিন্দা কৈতব যাবে,
ভাব-যোগ্য দেহ হবে,
তিমির-আঁধার ঘুইচ্যা যাবে
গুরুর কৃপা হয় যখন।
ধারার উপরে ধারা,
ভক্তিপথে দাঁড়া,
জলধরের এমনি ধারা—
ইচ্ছায় বরিষণ ॥
গুরুপদে মেঘ সাজ্জাইয়া
চাতকের ন্যায় থাক না চাইয়া,
নব জলধর বরষিয়া
প্রাণ জুড়াবে ততক্ষণ।
ধারার উপরে ধারা,
স্বভাব ছাইড়্যা ভাবে দাঁড়া,
তার উপরে বিষম চড়া
সঞ্চারে উজান।
সে উজানে যায় যে ভেসে
চইল্যা যাবে বেহাল দেশে,
ভাবের অনুরাগী ভাব-আবেশে,
ইন্দ্রিয়-বশে হয় সাধন ॥*

১৭৮

কিছু হবে না রে সময় গেলে।
সময়ে সাধন না হ'লে ॥

* এই গানটিরই একটি পরিবর্তিত পাঠ কমল-এর ভণিতায় আছে। পরে দ্রষ্টব্য।

এই বর্ষাকাল রইলি ব'সে,
মীন চলে যায় জলে ভেসে,
বর্ষা গেলে জল শুকালে
কি হবে পাছে বাঁধ বাঁধিলে ॥
অকালে কৃষি করা,
লাভ নাই তার মূলে হারা,
যদি ফলে বীজধর্মে,
ফুল ফুটে তার ফল না ফলে ॥
পেয়েছ অমূল্য নিধি,
ছয়জনা তার মায়াবাদী,
চোরে নিল ধন, অমূল্য রতন,
কি হবে পাছে চৌকি দিলে ॥

১৯৯

সজনি গো, স্বভাব-দোষ আমার গেল না।
মানব-জনম সফল হইল না ॥
আছে ছয়জনা বিবাদী,
তা'রা জ্বালায় নিরবধি,
দুগ্ধেতে মিশায়ে দেয় গোরোচনা ॥
স্বভাব-দোষে হইলাম দোষী,
দোষ দিব কার, নিজেই দোষী,
বামন হ'য়ে চাঁদকে ধরা অসাধ্য আমার।
যারা না জাইন্যা যায় তীর্থ,
ডুবায় পানিকাউরের মত,
তা'রা জলে নাইম্যা জলের মর্ম জানে না।

স্বাতী নক্ষত্রের জলে
গজে মুক্তা-ফল ফলে,
ভাণ্ড বিশেষে ফলাফল জানিও নিশ্চয়।
সে জল বাঁশে যদি পড়ে,
বাঁশ-কাপুর নাম ধরে,
সিংহের দুগ্ধ মাইট্টা ভাণ্ডে টিকে না॥
আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর—
এই কথা যে না বিশ্বাস করে
সে বড় পামর।
বাউল দরবেশে বলে,—
গুরুর কৃপা না হইলে
কাঁচা কাঁঠাল কিলাইলে পাকে না॥

২০০

চেতন থাকতে লও চিনে
কোন্ বাড়ী রে কার।
চেতন মানুষ দেহে বিরাজে,—
আট কুঠুরি, ষোল দরজা,
মধ্যে হীরার দ্বার॥
দেহ-মাঝে আছেন গুরু,—
নাম জপ কার? শিষ্য হ'লা কার?
সাঁইগুরুর সুজন চেলা,
শব্দে গুরু রায়।
এ ব্রহ্মাণ্ড ভাঙিয়া গেলে সে ভাঙিবার নয়॥
বাউল দরবেশে বলে গুরুর চরণ সার।
না ভজিলে গুরুর পদ বৃথা জীবন তার॥

২০১

রাম-রহিম একই আল্লাজীর নাম,
কৃষ্ণ-বিষ্ণু বিস্‌মোল্লা—
কেহ বলে কানাই গোপ, গোপিনী রাই,
আখেরে নিরঞ্জন আল্লা ॥
ওরে বান্দা, কোরাণ কেতাব নাও,
কে বা সাধের মা-বাপ,
কোথায় হইয়াছে তার স্থিতি ?
কোথা বা নদীর জল,
কোথা বা দারাক্ষের ফল,
কে বা সাধের জাতি, কে বা জ্ঞাতি।
ওহে বান্দা, পৃথিবীতে যত জীব—
সর্বঘটে আছে শিব,
জলের মধ্যে আছে মীন,
চন্দ্র-বরণ হইয়া উদরে প্রবেশিয়া
ভোজন করিয়াছে ভিন্ ভিন।
আল্লা আল্লা বল, ভাই, ক্ষীর-নদী সাগরে,
তার মধ্যে ধারা বহে, লাতারি পাতারি ভেসে যায়,
সুজন কামেলা হয়,
গহিনেতে ডুবায় মন,
তাই সে তার গুণের লাগ পায় ॥

চণ্ডী গোঁসাই

[চণ্ডী গোঁসাই ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ফরিদপুর, খুলনা ও যশোহর জেলার নমঃশূদ্রজাতির মধ্যে ইঁহার বহু শিষ্য আছে। ফরিদপুর জেলার নমঃশূদ্রজাতীয় এক বৃদ্ধ বাউল চণ্ডী গোঁসাই-এর প্রায় একশত গান-সংবলিত একখানি খাতা আমাকে দিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি গান লওয়া হইল।]

২০২

হরিকে ধরবি যদি, আগে শক্তি সহায় কর।
পরমব্রহ্ম সেই হরি,
মানুষের হৃদয়-বিহারী সেই অধর॥
মূলাধারে জগৎ-মাতা,
সহস্রারে জগৎ-পিতা,
দুইজনে করলে একতা
জন্মমৃত্যু হবে না আর।
তন্ত্রমন্ত্র জপে সবে,
তাই তে কি সেই যুগল হবে,
তা হ'লে যোগী-ঋষি
রেচক পূরক কুম্ভক কেন করে অনিবার॥
গুরুর কাছে কাছে জানা,
ও সব কথা কইতে মানা,
তবু প্রাণে সহ্য হয় না,
গোঁসাই চণ্ডী বলে, সাধন করবি কবে আর॥

২০৩

তুই তারে ধরবি কেমন করে।
বেদবিধির উপর বসে আছে সে
সপ্ততালার 'পরে॥
বড় নিগুম ঘরে বসে আছে সাঁই,
সেথা চন্দ্রসূর্যের অধিকার নাই (হায়রে),
(ও) তা'র আপন রূপে আলো ক'রে
বসেছে মন্দিরে॥
(ও) তার হস্ত নাই—ধরিতে পারে,
নয়ন নাই—দেখে সবারে (হায়রে),
চরণ নাই—চলিতে পারে
যেথা মনে করে।
জানে চক্রভেদী শিক্ষা যারা,
ধরলে ধরতে পারে তারা,
চণ্ডী বলে, ও পাষণ্ড, তুই
গেলি না সে ঘরে॥

২০৪

খোঁজো সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, মন,
যাতে মিলিবে রতন।
খুঁজিতে খুঁজিতে যাবি মধুর বৃন্দাবন॥
আগে চতুর্দলে ধর গে গোড়া,
ষড়দলে লাগবে জোড়া,
রসিক হ'বি তোরা।
পরে মণিকোঠায় ধন পাইলে
পাবি সম্পত্তি তখন॥

ও তুই চ'লে যাবি ব্রহ্মপুরী
দিয়া হিংসা-নিন্দায় গলায় দড়ি,
ভয়-ভাবনা তুচ্ছ করি,
ছয় রিপু তোর বশ হইবে
হবি আনন্দে মগন।
ও তুই ব্রহ্মেতে চড়বি যখন,
দেখবি বেদবিধি সব ঘোলের মতন ;
তন্ত্রমন্ত্র সব খসবে তখন।
গোঁসাই চণ্ডী বলে জন্মমৃত্যু
আর তোর হবে না কখন ॥

২০৫

কি ক'রে পার হ'বি ত্রিবিনায়।
কপট সাধু যারা,
যাচ্ছে মারা
ত্রিধারা ত্রিমোহনায় ॥
ত্রিবেণী হয় ত্রিগুণে,
তিন শক্তি বয় সেখানে ;
জীবের মুক্তির কারণে
যোগের দিনে হয় উদয়।
থাকে শক্তিপদে ভক্তি যাহার
মা তারে পারে লইয়া যায়।
পূর্ণিমা-অমাবস্যায়
বান ডেকে বেগ বেশি হয়,
বিষম তরঙ্গ-মালায়
নদীর জল ওঠে কিনারায়।

সেদিন কাম-কুম্ভীরের চোট অতিশয়,
নামিলে কুম্ভীরে খায় ॥
যোগসিদ্ধ যোগী যারা,
সেই ঘাটে গিয়া তারা
হেরে নদীর ত্রিধারা,
আনন্দে আত্মহারা হয়।
(ও) কেউ সাধন-জোরে যাচ্ছে পারে
ঘাটে কেউ বা হাবুডুবু খায় ॥
ত্রিবেণী তিনটি জোড়া
তাহে বহে তিনটি ধারা,
উল্‌টা আছে ঘেরা চাঁদোয়ায়!
গোঁসাই চণ্ডী কয়, তাহার কেশীঘাটায়
নিশিতে নরবলি হয় ॥

২০৬

কাজ করে যে, সে-ই সে কাজের কাজী হয়।
আছে কথায় ধন্য, কাজে শূন্য,
অমন কতশত পাওয়া যায় ॥
কাজ করিলে হয় সে কাজী,
ধরিয়া প্রেম-তরীর মাঝি,
মনে-প্রাণে হ'য়ে রাজী
ওঠে প্রেমের নায়।
তারা প্রেমে ডগমগ হ'য়ে,
রূপ দেখে রসে যেয়ে,
গুরুর পদে বিক্রী হ'য়ে
সদায় হরিগুণ গায় ॥

গুরুর মুখ-পদ্ম বাক্য
যার হয়েছে হৃদে ঐক্য,
তার কাছে নাই বিচার-তর্ক,
গুরুর বাক্য সার।
(৩) তার ধ্যানে গুরু, জ্ঞানে গুরু,
অন্তরে বাহিরে গুরু,
রূপ নেহারে গুরু,
গুরুর রূপে রূপ মিশায় ॥
ধনী, মানী, পণ্ডিত যারা
বিচার-তর্ক করেন তাঁরা,
কথায় কথায় কার্য সারা,
কাজে কিছু নয়।
(৩) তার ভুল হ'য়ে যায় গুরুতত্ত্ব,
না জানে তার কি মাহাত্ম্য,
বই-পুস্তকে হ'য়ে মত্ত
বকাউল্লা নাম ফলায় ॥
আর বেশ-ভূষা করিয়া গায়
লোক দেখাইয়া করে হায় হায়,
লোকের কাছে ভাবুক জানায়
নামাবলী গায়।
গোঁসাই চণ্ডী বলে,
রং ধরেছে মাকাল ফলে ;
আসল কাজের কাজী না হ'লে
যেতে হবে যমালয়।

রশীদ

[রশীদ পূর্ববঙ্গের আউলিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিনিধি। বাড়ী ঢাকা জেলার ঝিটকা গ্রামে। ইনি বিখ্যাত ছাফা পীরের শিষ্য। আউলিয়া মতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার একখানি পুস্তক ছাপা হইয়াছিল শুনিয়াছি। কুষ্টিয়ার জনাব আফসার উদ্দীন সাহেব অনুগ্রহ করিয়া রশীদের কতকগুলি গান আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।]

২০৭

ঘুচিবে সকল যাতনা (ওরে মন আমার),
তোমার ঘুচিবে সকল যাতনা।
ঘরে ব'সে পাবে তারে, কেন সন্ধান কর না ॥
ঘরে ঘরে তারি ঘটা
দেখিলে ঘুচিবে লেঠা,
না চিনে কপালে কালসিটা
আর ফেলো না।
শুধু জায়নামাজে মাথা তোমার আর ঠুকো না ॥
জানিয়া নামাজের কায়দা
চিনিয়ে করিবে ছেজদা,
ছামনে রয়েছে খোদা
কেন দেখ না।
না চিনে ভূতের ছেজদা আর কোরো না ॥
কাবা কি মন্দির-ঘরে
পূজে সবে তারি তরে,
সেই ঘেরা সর্বস্তরে
চেয়ে দেখ না।
না চিনে ঘুরে মরে যত দিন-কানা ॥

ভূত-পূজা মোশরেক করে,
মেটে ভূত পূজে' মরে,
অনলে জ্বালাবে তারে
ভেবে দেখ না।
তুমি জেন্দা ভূতের পূজা কর বিপদ রবে না॥
ঘোরঘার যত ছিল,
পীর সব ভেঙ্গে দিল ;
রশীদ, তুমি মিছে কেন কর ভাবনা।
ঘেরা চান্দ এই মন-আকাশে চেয়ে দেখ না॥

২০৮

টেনে চল উজান গুণ।
নইলে নৌকা ভাটার টানে হয়ে যাবে খুন॥
টান শীঘ্র ভাটা এল,
নৌকা বালিচরে প'ল,
ছয় চোরেতে চুরি ক'রে নিবে মূলধন॥
টেনে যাও ত্রিবেণীর ঘাটে,
বান্ধ নৌকা খুঁটা এঁটে,
ঠিক রাখিও নাহি ছুটে
নিরিখ-নিরূপণ।
টানো ওরে ছয় গুণরি,
ভব-নদীর বিষম পাড়ি,
মন-মাঝি হাল সোজা রাখ
উঠিল পবন॥
টেনে হাল সোজা করো,
এল্লেল্লার বৈঠা মারো,

ছয় গুণরি আড়িগুড়ি
করে জ্বালাতন ॥
চলে উল-হায়াত নদী,
নৌকা নুর মোহাম্মদী,
রশীদ সেই নৌকায় উঠে
পারে যায় এখন।

২০৯

ডুবে দেখ দেখি, মন, স্বরূপ-সাগরে।
স্বরূপ-সাগরে যে ডুবিতে পারে অপরূপ সে রূপ নেহারে ॥
স্বরূপ-সাগরে ডুবারু যে হয়,
করিয়াছে সেই রূপের নির্ণয় ;
এ রূপ কোথা হ'তে এসে
কোথা যায় ভেসে,
ধ্যানী-জ্ঞানী যে-জন জানিতে পারে ॥
আধ্যাত্মিক জগতে রূপের উৎপত্তি,
স্বরূপ-সাগর সে দেশ লাহুতি,
আধ্যাত্মিক জগৎ আলমে মালকুত,
এ জড়জগৎ আলমে নাছুত,
আসিয়া হেথায় ভুলিয়াছ তায় কে তোমায় সৃজন করে ॥
(ও মন) তুমি কোন্ জন চিনলে না কখন,
মনে ভেবে ভেবে দেখ ওরে মন,—
ভবে আসা-যাওয়া কর কিসের কারণ,
রশীদ বলে, মন, জান রে ॥

২১০

যদি ধরবি রে অধর এই বেলা তোর
মনের মানুষ চিনে সাধন কর।
বড় নিগুম ঘরে আছে রে মানুষ,
ও তার সন্ধান আগে কর ॥
সাতে পাঁচে ঘর বাঁধিয়ে করিছে কাছারি,
তিন থানাতে বিরাজ করে রে মানুষ,
ও তার রূপ মনোহর ॥
পাঁচ কুঠুরিতে সাত মুহুরি লেখাপড়া করে,
পাঁচ-পাঁচা পঁচিশের ঘরে রে মানুষ খেলে অনিবার ॥
এক মানুষের তিনটি বরণ, জানে সর্বজন,
নবদ্বারে ঘুরে ফেরে রে মানুষ,
ও সে নিজে দীপ্তাকার।
রূপের মুরারি সেই ত্রিভুবন-জোড়া,
স্বরূপে মোহিত আছে রে মানুষ
এই সর্বরূপ তার ॥
রশীদ বলে, জেন্তে ম'রে, সাধন ভজন কর,
সহজে যাইবে ধরা রে মানুষ,
ও তুই গুরুর চরণ ধর ॥

রাধাশ্যাম

[রাধাশ্যাম দাসের বাড়ী বীরভূম জেলায়। আহম্মদপুর ষ্টেশনের নিকটবর্তী চাঁদপুর গ্রামে রাধাশ্যামের গুরু গুরুচাঁদ গোস্বামীর ভজন-আশ্রম। বীরভূম হইতে সংগৃহীত]

২১১

মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে।
তোর নাই জ্ঞান-নয়ন,
ওরে অবোধ মন,
সে মানুষ-রতন
তুই চিনবি কিসে॥
আলেকের মানুষ থাকে আলোকেতে,
মোহ-অন্ধ জনে না পারে চিনিতে,
করে স্থানস্থিতি এই মানুষেতে,
পলকেতে যায়, পলকেতে আসে॥
স্বচৈতন্য মানুষ থাকে হাওয়া ধ'রে,
রূপে নয়ন দিয়ে এক নেহারে হেরে,
গুরুর চরণ সদাই ভাবিয়ে অন্তরে,
অ-ধর ধরতে পারে সে অনায়াসে॥
গোঁসাই গুরুচাঁদ বলে, দিয়ে গালাগালি,
থাকতে চক্ষু অন্ধ হ'লি, মানুষ না চিনলি ;
ধিক রে তোর গালেতে চুন-কালি,
শত ধিক তোরে রাধাশ্যাম দাসে॥

২১২

দেহে কাম থাকিতে
সময়েতে
রস ভিয়ান কর।
তোর কাম-অনলে
রস জ্বাল দিলে
তরল রস হবে গাঢ় ॥
রসের কথা বলি তোকে—
কাঁচা রস তোর যাবে ট'কে,
জারণ-মরণ করো তাকে,
মন ঠিক রেখে নাড়চাড়।
দেখ কাম হ'তে হয় রস-আবর্ত্তন,
হয় কাম হতে প্রেম-অঙ্কুর ॥
প্রেম-খোলায় রস চাপিয়ে
জ্বাল দিবে খুব হুঁসার হ'য়ে,
উথলে যেন যায় না প'ড়ে
তা'হলে শুধু হবে কর্মসার।
যদি সু-তাকে পাক নামাবি রে
স্ব-সুখ-বাসনা ছাড় ॥
করবে মন ভিয়ানদারি,
বেচাকেনা হবে ভারী,
ষোল আনা বজায় করি'
যদি ব্যবসা করতে পার।
তবে মদনকে স্ববশে রাখ
হবে ভিয়ানে মজবুত বড় ॥
রসিক ময়রার সঙ্গ ধ'রে
রসের ভিয়ান জান গে যা রে,

গোঁসাই গুরুচাঁদ কয়, রাধাশ্যামরে
আমার এই বাক্য ধর।
এবার ব্রজের ভাবের ভিয়ান ক'রে
মধুরত্ব লাভ কর॥

২১৩

আগে দেহের খবর জান গে রে মন,
তত্ত্ব না জেনে কি হয় সাধন।
দেহে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল,—
চৌদ্দ ভুবন কর ভ্রমণ॥
এই দেহে হয় চব্বিশ তত্ত্ব,
গুরুবর্ত ক'রে দেখলি না রে
হ'য়ে অহঙ্কারে মত্ত।
আছে চব্বিশের উপর তিন তত্ত্ব,
যাতে মত্ত হয় রসিকগণ॥
আরো আঠারো চিজে দেহ গঠন হয়েছে,
পিতার চার, আর মাতার চার
দেখ রয়েছে।
আরো গুরু যে তায় দশ দিয়েছে,
সে কথা কি নাই স্মরণ॥
বলি ওরে মন-কানা, তোর ভ্রম তো গেল না,
দেহের মধ্যে কে আপন-পর, তাও তো চিনলি না।
এবার যত্ন ক'রে গুরু-দ্বারে চক্ষে দিলি না রে জ্ঞানাঞ্জন॥
এই দেহেতে আছে বাইশ মোকাম—
তার কার বা কোন্ স্থান,

দেখ না খুঁজে, কোথায় বিরাজে
তোর পরম গুরু আত্মারাম।
ক্ষেপা রাধাশ্যাম না জানিস তত্ত্ব-প্রমাণ—
গোঁসাই গুরু চাঁদের এই বচন ॥

২১৪

সেই প্রাণের নিধি আছেন নিরবধি ধরবি যদি কর সাধনা।
তিনি আত্মারূপে থাকেন সহস্রারে কেউ চেনে, কেউ চেনে না ॥
পূর্ব কথা তুমি গিয়েছ তাই ভুলে,
সেই অকূলে কূল দিয়ে যে তরাইলে
প'ড়ে মায়াজালে তারে হারাইলে,
আত্মসুখে হ'য়ে মগনা ॥
সেই অবধি, ভাই, তোমাতে রয়েছে,
সর্বদা ফিরিছে তোমার কাছে কাছে,
অনুমানে বল আমায় ছেড়ে গেছে,
বর্তমান আছে দেখ না ॥
ভুল সংশোধন কর সাধুর কাছে,
মৃতদেহে প্রাণ পেলে যেমন বাঁচে,
গুরু আত্মরূপে এলেন তোমার কাছে,
তুমি তো তারে চিনলে না ॥
আমার গোঁসাই গুরুচাঁদ তাই ডেকে বলে,
রাধাশ্যামরে তুই পাবি তারে জ্যান্তে ম'লে,
ঘরে থেকে ঘরের মানুষ চিনলি না রে,
বাইরে খুঁজলে তারে মেলে না ॥

শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত গান

[এই বাউল-গানগুলি শান্তিনিকেতনের কর্মচারী শ্রীচিত্ত দেব কর্তৃক শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত। তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

২১৫

কাম-সাগরে পাড়ি দিয়ে কূল পাওয়াটা বিষম কথা।
পাবে ইন্দ্রিয়গণ বশে রাখিলে—এইটা কোন্ কথার কথা।
শ্রীগুরুর করুণা বিনে
ওপারে যাবে কি সন্ধানে,
গুরু যদি কৃপা ক'রে ব'লে দেয় সন্ধানের কথা।—
তবে গরল হবে চিন্ময়
হ'লে শুভযুগের উদয়,
সময়কালে হবে উদয়
দ্বিদলে বিজুরী যথা॥
কামে প্রেমে আছে মিশি',
গরলাংশ যাবে খসি',
পাবে সে রস ঘাটে বসি',
শশী খ'সে পড়বে যথা।
চিন্তামণির উপদেশ-ফল—
যে পায়, তার জনম সফল ;
কান্ত বলে, যার আছে গুরুবল,
তার তরী ডুববে কোথা॥

২১৬

যদি মন স্থির থাকে গুরু-নারায়ণের যুগল-চরণে,
ভবে কি ভয় তোমার আছে হে এবার প্রাণান্ত দিনে ॥
অখণ্ড-মণ্ডলব্যাপ্তি সকল চরাচরে অন্তর্যামী,
করে চরাচরে বাস সর্বত্র প্রকাশ খ-অগ্নি-জল-ভূমি,
আছে পঞ্চতত্ত্বময়, সর্বত্র আশ্রয়, উভয় শমন-দমনে,
দিলে দেহমন শ্রীগুরুর চরণে কি করিবে কাল শমনে ॥
গোকুলে গমন, মধু-বৃন্দাবন, অযোধ্যা, ত্রিবেণী, কাশী,
গয়া-গঙ্গা-নিধি সপ্তসাগরাদি তীর্থ যত রাশি রাশি,
গুরুপাদদ্বয় বিন্দুতুল্য নয়, ইহা কি জানিবে অজ্ঞানে,
ন গুরু-অধিকং, ন গুরু-অধিকং, ন গুরু-অধিকং ভুবনে ॥
গুরু গীতা-তন্ত্র, গুরু যজ্ঞ-মন্ত্র, গুরু সে পরমগতি,
গুরু বিনে ভাই-বন্ধু কেহ নাই, গুরু বন্ধু, পিতা, পতি,
জ্যোতির্ময়দেহ মানুষবিগ্রহ চিন্ত হৃদানন্দকাননে,
নহে গুরুতুল্য রতন অমূল্য, রাখিও হৃদয়ে যতনে ॥
আগম-পুরাণ যুগধর্মজ্ঞান যজ্ঞ-তপ যত হয়,
ভক্তি-মুক্তি আদ্যা দশমহাবিদ্যা গুরুতুল্য কেহ নয়,
গুরুপাদপদ্ম সেবা-ভক্তি সাধ্য কর কর মন যতনে,
চিন্তামণি-দাস ব্রজে হবে বাস কি চিন্তা মরণে রণে ॥

২১৭

মন, তুই করলি না ঘরের খবর, দিন গেল বিফলে।
মহাজনের চাপা জিনিস পরের হাতে সঁইপ্যা দিলে রে ॥
নয় দরজা আঠার কোঠা, কোঠায় কোঠায় ধন,
মনি-মুক্তা, হীরা-মাণিক আছে অগণন,
ওরে, কোন্ কোঠায় কোন্ রত্ন আছে
শিখলি না তোর গুরুর কাছে রে ॥

শঠের সঙ্গে প্রেম করিয়ে রয়েছ ডুবিয়ে,
দিনের পর দিন গয়ে যায় অন্ধের মত হ'য়ে,
ওরে, কামক্রোধ ছয়টি রিপু ইশারায়
কুপথে চালায় রে ॥
অধম তারকচন্দ্র বলে মনেতে ভাবিয়ে,
ঘরের তালা বন্ধ রইল দেখলে না খুলিয়ে,
ঘরে জ্বলেছে বাতি, দিবা-রাতি জ্বলেছে তাহা
বিনা তৈলে রে ॥

যশোহর জেলার বিশিষ্ট বাউল-সাধক ফকির পাঞ্জু শাহ্

[দ্বিতীয় খণ্ড: পৃ: ১৮৩]

ফকির পাঞ্জ শাহ্

বাংলার বাউল-ফকির বা নেড়ার ফকিরদের মধ্যে লালনের স্থান যে সর্বোচ্চ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু লালনের মৃত্যুর পরে যিনি সারা বাংলার ফকির-মহলে লালনেরই মতো উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ফকির পাঞ্জ শাহ্। লালনের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ পাঞ্জ শাহ্ অনেকটা লালনের শূন্যস্থান পূরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। লালনের মতো তাঁহার রচিত গান বাংলার সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং ফকির-মহলে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়।

পাঞ্জ শাহের সুযোগ্য পুত্র জনাব রফিউদ্দীন খোন্দকার তাঁহার পিতার পুরাতন খাতা-পত্র হইতে নকল করিয়া প্রায় দুইশত গান আমাকে পাঠাইয়াছেন। ঐ সঙ্গে তিনি তাঁহার পিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া দিয়াছেন এবং একখানি ফটোও পাঠাইয়াছেন। এই সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাইতেছি।

খোন্দকার সাহেবের লিখিত জীবনী তাঁহার ভাষাতেই উদ্ধৃত করা গেল :

"১২৫৮ সালের শ্রাবণ মাসে ফকির পাঞ্জ শাহ যশোহর জিলার শৈলকুপা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা খাদেমালী খোন্দকার সাহেবের ইনি প্রথম পুত্র।

"ইঁহার পিতা একজন সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে উত্যক্ত হইয়া বিষয়-বিভব তুচ্ছ-বোধে ইনি স্বীয় স্ত্রী ও বালক পুত্রসহ যশোহর জিলার হরিণাকুণ্ড থানার অধীন হরিশপুর গ্রামের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন বিশ্বাস-পরিবারের মাননীয় ফকির মহম্মদ বিশ্বাস দিগরের সাহায্য ও আন্তরিক সহানুভূতি পাইয়া উক্ত হরিশপুর গ্রামেই দরিদ্রভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার আত্মসম্মান-জ্ঞান ও ভদ্রতায় তিনি গ্রামস্থ লোকের শ্রদ্ধাভাজন হন।

"ফকির পাঞ্জ শাহের পিতা একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে (Formalities) নিষ্ঠাবান হইয়া ইনি বাংলা ভাষা-শিক্ষারই বিরোধী হন এবং স্বীয় পুত্রকে আরবী, ফার্সি ও উর্দ্দু-শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে ফকির পাঞ্জ শাহ্ গোঁড়া পিতার ভয়ে বিশ্বাস-পরিবারের মহরালী বিশ্বাসের নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোপনে বাংলা ভাষা-শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

"তৎকালে হরিশপুর গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। সকল শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান পরস্পর মিলিতভাবে বসবাস করিতেন। সুফী ফকিরদের মধ্যে জহরদ্দীন শাহ্, পিজিরদ্দীন শাহ্, ফকির লালন শাহের শিষ্য দুদমল্লিক শাহ্ ইত্যাদি সুফীতত্ত্ববিদ্ সাধু ও হিন্দুদের মধ্যে মদন দাস গোস্বামী, যদুনাথ সরকার, হারানচন্দ্র কর্মকার প্রভৃতি সমবেতভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, ইসলামের সুউচ্চ তত্ত্ব ও তাছাওফের গভীর বিষয় এবং চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বিষয়সমূহ আলোচনা করিতেন। প্রায়ই সুফী ফকির ও বৈষ্ণবগণ একত্র হইয়া সুফী মতবাদ-সম্বন্ধীয় ও বৈষ্ণব তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গান ও সিদ্ধান্ত-আলোচনায় শান্তি অনুভব করিতেন।

"এই সমস্ত বিষয় ফকির পাঞ্জ শাহের পিতা পছন্দ করিতেন না। ঐ সংস্রবে যাতায়াত বা বসা-ওঠা করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও পাঞ্জ শাহ্ গোপনে যাতায়াত করিতেন এবং কখনও তাহা প্রকাশ পাইলে ইঁহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। এইভাবে পিতা বর্তমান থাকা পর্যন্ত তাঁহার মনঃকষ্টের ভয়ে ইনি সঙ্গোপনে গভীর আগ্রহ সহকারে সুযোগমত সাধুসঙ্গে সময় কাটাইতেন।

"২৪।২৫ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়।...১২৮৫ সালের ২০ ভাদ্র ইঁহার পিতা পরলোক গমন করেন।...

"পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পর ইনি খেলাফত (বৈরাগ্যবস্ত্র) ধারণ করেন।... এই সময় হইতেই তাঁহার ধর্মজীবন আরম্ভ হয়।...

"হরিশপুর গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে হেরাজতুল্ল্যা খোন্দকার নামে একজন সুফীতত্ত্ববিদ্ পরম সাধুর নিকট ইনি দীক্ষিত হন। ইনি গুরুনিষ্ঠা ও গুরুর সেবাযত্নে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন।

"প্রায় ৩৩।৩৪ বৎসর বয়স হইতেই ইঁহার ধর্মানুরাগ ও জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া ২।৪ জন করিয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে থাকে। এই সময় ইনি 'ইস্কি ছাদেকী গহর' নামে ১খানা কেতাব রচনা ও প্রকাশ করেন এবং সুফী মতবাদ-সম্বন্ধীয় গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমেই দেশ-দেশান্তরে শিষ্যসংখ্যা বর্ধিত হইতে থাকে। নিজ জেলা ছাড়া ফরিদপুর, নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা ও সুদূর আসাম বিভাগেও অনেকে ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আজিও বাংলার বহু জায়গায় ইঁহার রচিত পদাবলী আগ্রহ সহকারে গীত হইয়া থাকে। জীবনে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া ১৩২১ সালে ২৮শে শ্রাবণ ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।...

"Islamic Theologyতে ইঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়,

অথচ শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানে সাধারণ গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া কাঠমোল্লাদের কাছে ইনি "নাড়ার ফকির" বলিয়া উপেক্ষিত হন। ইহাতে ইনি কোনদিন বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।...

১৫।১৬ বৎসর হইতেই ফকির পাঞ্জ শাহ সাধুসঙ্গে আনন্দ বোধ করিতেন এবং তখন হইতেই মাংস, ডিম প্রভৃতি খাইতেন না।...ইনি পশুপাখী হত্যা করেন নাই বা অনুমোদনও করেন নাই। আহারে ও পরিচ্ছন্নতায় ইনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। প্রথম জীবনে তামাক খাইয়াছেন, কিন্তু অপরের ব্যবহৃত হুঁকা কখনও ব্যবহার করেন নাই। শেষ বয়সে তামাক বর্জন করেন। সাধারণ মুসলমান তাঁহাকে হিন্দু-আচারধারী বৈরাগী বলিয়া জল্পনা-কল্পনা করিত। তাহাতে ইনি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। আত্মীয়-স্বজন, সাধু-সজ্জন ও জনসাধারণের সেবায় ইনি অতুলনীয় ছিলেন।...১৩৬০, ২রা চৈত্র।

লিং হতভাগ্য

খোন্দকার রফিউদ্দীন

সাং হরিশপুর

পোঃ সাধুগঞ্জ। জিঃ যশোহর।"

২১৮

শ্রীচরণ পাব ব'লে ভবকূলে ডাকে দীনহীন কাঙ্গালে।
প'ড়ে এই ঘোর সাগরে, কেউ নাই, মোরে ঘিরে নিল মায়াজালে।
সৃষ্টি ক'রে আপ্তরসে কোন বা দোষে কালের বশে ফেলাইলে।
কার ভাবে ভবে এসে বেহাল বেশে দয়াল নামটি ভুলাইলে॥
পতিত পাষণ্ড যারা, পেল তারা মার খেয়ে, তায় চরণ দিলে।
আমি হ'লাম এতই পাপী, দুঃখী, তাপী ; আমার ভাগ্যে লুকাইলে
কল্পতরু নামটি ধর, বাম নয় কারো, শুনে এলাম সাধুকুলে।
দয়াল নামের মহিমা যাবে জানা এই অধীনে চরণ দিলে॥
গোঁসাই হীরুচাঁদের চরণ হয় না স্মরণ, ভজনহীন পাঞ্জ বলে।
আমায় না চরণ দিলে একে কালে মানব-জন্ম যায় বিফলে॥

২১৯

গুরুপদে নিষ্ঠারতি
হয় না মতি,
আমার গতি হবে কিসে।
মন আমার মূঢ়মতি,
সাধন ভক্তি
হ'ল না মোর মনের দোষে॥
মন আমার গুরু প্রতি
দিবারাতি
থাকত যদি চরণ-আশে।
তবে চরণ-দাসী হ'তাম,
ব্রজে যেতাম,
থাকতাম ঐ চরণে মিশে॥
পা'তাম যদি এমন বৈদ্য
মনের বেয়াধ্য
সেরে দিত সেই মানুষে।
লেগে চরণের জ্যোতি
জ্ঞানের মতি
সদায় হ'য়ে উঠত ভেসে॥
দীনহীন পাঞ্জর উক্তি—
চরণ-রতি
পান করিতাম ঘরে ব'সে।
বাঁচতাম শমনের হাতে,
অন্তিমেতে
সদয় হ'তেন গুরু এসে॥

২২০

গুরু দয়া কর মোরে গো, বেলা ডুবে এল।
তোমার চরণ পাবার আশে রইলাম ব'সে, সময় বয়ে গেল ॥
আমি অমূল্য ধন লয়ে হাতে ভবে এসেছিলাম ব্যাপার ব'লে।
ছয়জন বোম্বেটে জুটে আমায় পথ ভুলায়ে সে ধন লুটে নিল ॥
আমার বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল ; যম-রাজা ডঙ্কা বাজাইল।
মহাকালে ঘিরে এল, সঙ্গের সাথী কেহ না রহিল ॥
আমার কি হবে অন্তিমকালে, আমি রয়েছি বিনা সম্বলে।
অধীন পাঞ্জ বলে গুরু ভুলে সাধের জনম বিফলেতে গেল ॥

২২১

তুমি আমারে ফেল না মুরশিদ দয়াল হ'য়ে।
আমি চাতকিনীর মত আছি তোমার চরণ-পানে চেয়ে ॥
তোমার অধম-তারণ নাম শুনেছি, শুনে কুল ছেড়ে বেহাল হয়েছি।
এই ভব-মাঝে পতিত হ'য়ে ফিরতেছি কলঙ্কের ডালি বয়ে ॥
গুরু, তোমার রূপে নয়ন দিয়ে আমি যাই যদি নারকী হ'য়ে।
দয়াল বলে কেউ ডাকবে না, ওগো মুরশিদ, আমার হাল দেখিয়ে ॥
গুরু, শুনে তোমার নামের ধ্বনি, আমি ডাকতেছি এই রাত্রিদিনি।
অধীন পাঞ্জ বলে, গুণমণি, আমায় দয়া কর শ্রীচরণ দিয়ে ॥

২২২

দয়াল দরদী, কাঙাল এলো তোমার দ্বারে।
অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার, কেউ যাবে না ফিরে ॥
সর্বধনের দাতা তুমি ত্রিমহীমণ্ডলে,
বিনা মাঙ্গায় কত ধন দিয়াছিলে মোরে।
এখন আর কোন ধন চাই না, গুরু,
চরণ দাও আমারে ॥

কুলের বাহির হ'লাম আমি চরণ পাব ব'লে,
কত মহাপাপীর দিলে চরণ, তাই এসেছি শুনে।
দাঁড়ালাম দরজায় এসে স্কন্ধে ঝুলি নিয়ে ॥
দেও কি না দেও রাঙা চরণ, বেলা গেল চলে ;
দাতার চেয়ে বখিল ভাল, তুড়ুক জবাব দিলে।
পাঞ্জ বলে, জবাব পেলে যাই আমি চুপ মেরে

২২৩

আমারে দেও চরণ-তরী !
তোমার নামের জোরে পাষাণ গলে, অপারের কাণ্ডারী।
পড়েছি এই ঘোর সাগরে, কুপাকে ডুবে মরি ॥
ভক্ত-অধীন নামটি শুনেছি,
ভক্তের পিছে ফিরতেছ হরি,
ভক্তিহীন হ'য়েছি আমি স্মরণ নিলাম তোমারি ॥
নির্ধনের ধন, আন্ধলার নড়ি, নির্বলীর বল হও, গুণমণি,
পাপী তাপী সব তোমারি, আমায় ফেলো না হরি ॥
অহল্যা এক পাষাণী ছিল,
তোমার চরণ ধূলায় সেও মানব হ'লো ;
পাঞ্জ কাঁদে ঘোর তুফানে, পারের উপায় কি করি

২২৪

যার হয়েছে নিষ্ঠারতি,
তা'র গুরু প্রতি সদায় মতি,
গুরু ভিন্ন নাই গতি।
যেমন ইন্দ্রবারি নিষ্ঠা ক'রে রয়েছে চাতক জাতি

তার সাক্ষী দেখ রাম-অবতারে,
শিষ্য হনু রাম নিষ্ঠা করে,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি পশুর হ'লো,
নিষ্ঠা প্রেমের এই রীতি ॥
গুরুনিষ্ঠা হ'লে ভজনের উপায়—
আছে সত্য সর্বশাস্ত্রে কয়,
সত্য প্রেমী গণ্য হয়,
তার শমন পারে না ছুঁতি ॥
যার বাঞ্ছা আছে শ্রীচরণ ব'লে
পরের কথায় সে কি যায় ট'লে,
ভুলো না, মন, কারো ভোলে,
করি তোমায় মিনতি।
যেমন গোবরে পোকা ভ্রমরের সাথে
পীরিত করেছিল জগতে,
পাঞ্জ বলে, সতের সাথে
ম'লেও হয় গঙ্গাপ্রাপ্তি।

২২৫

বড় চিন্তা-ঘুণ লেগেছে আমার অন্তরে।
মুরশিদ, কোন্ গুণে পাব তোরে
আমার দুই নয়ন ঝরে,
দুঃখ বলব আর কারে,
ওগো কে আছে মোর ব্যথার ব্যথিত,
কেবা আদরে।
আমি প্রেম সাগরে ভাসাই তরীরে,
বুঝি ডুবল ভরা কিনারে ॥

আমার মন পাগল-পারা, আমার হয় না নিহারা,
আমি বনে বনে কেঁদে ফিরি, আমি পাইনা অধরা,
যেমন কলমি লতা জলে ভাসে রে
তেমনি ফিরতেছি দ্বারে দ্বারে ॥
দুঃখ কই যারে তারে এই ভব-সংসারে,
তোঁ বিনে ভরসা নাই, গুরু, চরণ দেও মোরে।
অধীন পাঞ্জ বলে, মুরশিদ বিনে
কেঁদে ফিরতেছি ঘরে ঘরে ॥

২২৬

মুখে বললে কি হয়,
গুরুর ধারে সাধন জানতে হয়,
ডুবে দেখ মনুরায় ॥
নিষ্ঠারতি যার হ'য়েছে,
রস-রতি সে-ই চিনেছে ;
এ-ভবে উজানে সে তরী বেয়ে যায় ॥
তিন রতি তিন রসের খেলা
জানিলে মন যায় রে জ্বালা,
এ সাধন দয়া ক'রে গুরু যারে কয় ॥
আছমানেতে তিন রতি বয়,
জমিনে তিন রসের উদয়,
সুরসিক শুভযোগে মিলন করে তায় ॥
অধীন পাঞ্জ কেঁদে বলে,
গুরু-সুখের সুখী হ'লে
সে জনে সহজ মানুষ ধরেছে নিশ্চয় ॥

২২৭

ঠিক রাখবি যদি সাধের ঘর
ভবের হাটে খুঁজে দেখে ভাল এক ঘরামি ধর ॥
অনুরাগের আড়া কর,
আল্লার নামে খুঁটি গাড়,
রূপের পেলা মার,
ঝড়ি-ঝটকা কি করবে তোর—
মহাসুখে বসত কর ॥
ধর রে ঘরামির চরণ,
হৃদ্‌পদ্মে কর ধারণ,
চিন্তা নাহি আর।
দুষ্ট যত আপন হবে,
কেউ রবে না পর ॥
পঞ্চবাণের ছিলে ধ'রে
ক্ষান্ত কর কাম-অসুরে,
মাল যাবে না আর।
ঘরামিকে স্বামী ক'রে
মহাসুখে বিলাস কর ॥
ঘরের মালেক মটকায় আছে,
মনুরায় তাইরি কাছে
রাখ হুঁশিয়ার,
হীরুচাঁদ কয়, পাঞ্জ যাবি
চরণ ধ'রে ভব-পার ॥

২২৮

শুধু কি আল্লা ব'লে ডাকলে তারে
পাবি ওরে মন-পাগেলা।
যে ভাবে আল্লাতালা বিষম লীলা
ত্রিজগতে করছে খেলা॥
কত জন জপে মালা তুলসী-তলা,
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,
আর কতজন হরি বলি মারে তালি,
নেচে গেয়ে হয় মাতেলা॥
কত জন হয় উদাসী, তীর্থবাসী,
মক্কাতে দিয়াছে মেলা।
কেউ বা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে
সদায় করে আল্লা আল্লা॥
স্বরূপে মানুষ মিশে, স্বরূপ দেশে
বোবায় কালায় নিত্য লীলা।
স্বরূপের ভাব না জেনে চামর কিনে
হচ্ছে কত গাজাঁর চেলা॥
নিত্যসেবায় নিত্যলীলা চরণমালা,
ধরা দিবে অধরকালা।
পাঞ্জ তাই ক'রে হেলা ঘটল জ্বালা,
কি হবে নিকাশের বেলা॥

২২৯

যে ভাবে ফিকির ক'রে সাঁইজী মোরে বানায়েছে মানবলীলে,
এ লীলা কি চমৎকার, ভেদ বোঝা ভার, নিজরূপ মিশাইলে॥
নিরাকারে আকার মেলে, সাঁই নিরালে দ্বিদলেতে বারাম দিলে।
আপন লীলাতে ভুলে, সাঁই, পাতালে পদ্মফুলে মধু খেলে॥

লীলাছলে, সাঁই, মিশিলে, ধোকা দিলে, জীবেরে ঘিরিল কালে।
ধোকার টাটি পরিপাটি, কুলের লাঠি কেনে জীবের হাতে দিলে ॥
জীবের মনে খুটিনাটি, ধুলামাটি কত জনার খাওয়াইলে।
কারো ক'রে উদাসী শ্মশানবাসী বনে বনে ঘুরাইলে ॥
গোঁসাই হীরুচাঁদ বলে, ভাব না জেনে দিন হারালে গোলেমালে।
যার ভাবে চরণ মেলে, তারে ভুলে পাঞ্জ মিছে ঘুরে ম'লে ॥

২৩০

ধরা যায় রে অধরে—
যদি নিষ্ঠা হয় স্বরূপদ্বারে।
মূলাধার সেই অটল বৃক্ষ তাহে দু'টি ফল ধরে ॥
লাল শ্বেত দুটি ফুল পিতামাতা নাম ধরে।
অটলের বরাতি মানুষ গড়েছে ফল মৈথুন ক'রে ॥
অটল মানুষ নিজরূপে স্বরূপে সে রং ধরে।
পিতামাতা পদ্মফুলে ভাসছেন সমুদ্রে ॥
মহাযোগে সমুদ্রে অটল রূপ ঝলক মারে।
পাঞ্জ বলে, তীর-ধারে ধর ভাটা জোয়ারে ॥

২৩১

রসের কথা অরসিকে ব'লো না,
কারে বলো না, কেউ ত লবে না।
যেমন কয়লাকে দুগ্ধে ডুবালে দুগ্ধের বরণ ধরে না ॥
এক মহারাজ বাঞ্ছা করলে,
তিত মিঠা করব ব'লে,
করলে শতভার চিনি দিয়ে নিম্ববৃক্ষ রোপনা।
তাহে তিনগুণ তিত বৃদ্ধি হ'লো
মিঠাগুণ তার হ'লো না ॥

যেমন কাক-তোতা এক খাঁচাতে
যত্ন করো পোষমানাতে,
বুলি ধরাইব বলে খেতে দেও মাখন-ছানা।
তোতা বুলি ধ'রে নিবে, কাকের বুলি হবে না॥
এক দরিদ্র জংলা হ'তে
দাঁড়ায় বাদশা'র দ্বারেতে ;
বাদশা' তারে দয়া ক'রে দিল ডাব-চিনিপানা।
ডাব কামড়ে খেতে দন্ত ভাঙে, ছুলে খেতে জানে না॥
রসনগরে বিষম নদী,
ডুবলি নে মন জন্মাবধি,
হীরুচাঁদের বাক্য ভুলে হ'লি টোপা-পানা।
অধীন পাঞ্জ বলে, ডুব দেখ, মন, পাবি মতি-দানা॥

২৩২

নবী চিনে করো ধ্যান।
আহাম্মদে আহাদ মিলে আহাদ মানে ছোব্বাহান॥
'আতি উল্লাহ্ আতিয়ার্ রছুল' দলিলে আছে প্রমাণ,
আল্লার নুরে নবীর জন্ম, নবীর নুরে সারে জাহান্,
নুরে জানে আদমতনে বসত করে বর্তমান॥
আউয়ল, আখের, জাহের, বাতন—চারিরূপে বিরাজমান
বাতনে গোপনে থেকে জাহেরে দেন তরিক-দান॥
তরিক ধর, সাধন কর, আখেরে পাবা আসান।
বর্তমানে নাহি জেনে পাঞ্জ হল হতজ্ঞান॥

২৩৩

আজব কারখানা বোঝা সাধ্য কার,
সাঁই করে লীলা ভবের 'পর।
এই মানুষে রঙ্গ-রসে বিরাজ করে সাঁই আমার॥
একটি ছিলেন দুইটি হ'লেন নীরে ক্ষীরে যুগল তার
সাঁই পুরুষ-প্রকৃতি-ঘটে হরেক রঙে দেন বাহার॥
পাপীর ঘটে রঙ্গ দেখে, হাকিম-ঘটে দেন বিচার।
দরিদ্রের ঘটে ব'সে ফিরতেছেন দ্বার-বেদ্বার॥
পাঞ্জ বলে, মানব-লীলা করছেন সাঁই চমৎকার।
মানুষ ভজে' মানুষ ধর, মন, যাবি তুই ভব-পার॥

২৩৪

মানুষ মিলে ভাগ্য-ফলে—
ডাকে যদি ভক্তিভাবে দীনের কাঙালে॥
ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে আছে মূলাধার-মূলে।
নাহি দিবা, নাহি রাতি, মন, মানুষের মহলে॥
চন্দ্র-সূর্য যেতে নারে সে দল কমলে।
জীবের ভাগ্যে মিলবে কেনে হালছে বেহাল না হ'লে॥
যোগেশ্বরীর মহাযোগে, মন, কলে রস খেলে।
সহজরূপে দিচ্ছে বারাম পবন-হিল্লোলে॥
এসে মানুষ রংমহলে দরজা খোলে।
চিন্তামণি-ভূমিবৃক্ষে, মন, সে ফল ফলে॥
সহজ হ'লে সহজ মানুষ ধরে বেহালে।
পাঞ্জ বলে, মিলবে কেন আমার কপালে॥

২৩৫

আগে, মন, গুরু কর রে কাণ্ডারী।
তবে পার-ঘাটায় তুফান-মাঝে চালাইবেন তরী ॥
আছে পঞ্চজন দাঁড়ী, তাদের সহায় করি',
যার যার দাঁড়ে তারে বসাও সারিসারি ॥
মাস্তুলে বাদাম দেও তুলি', সুবাতাসের ভাব জানি'।
উজন বাঁকে চালাও তরী, নামে গাও সারি ॥
নদী বেগ ধরে ভারি, ও মন, ভয় কি তোমারি ॥
দাঁড়ী-মাঝি ঐক্য হয়ে রাখবে লঙ্গর করি ॥
যখন ভাটা যায় সরি', নদী দেখ নেহারি,
ঐ নদী-স্থলে মনিমুক্তা রহিবে পড়ি' ॥
মন, আমার হ'য়ে ডুবারি, মণিমুক্তা নাও তুলি,
তবে দেখ, গুরু রূপের জ্যোতি উঠবে ঝলক মারি' ॥
জ্বালায়ে ঐ রূপের বাতি, তরী বাও দিবা রাতি।
বেয়ে সাধুর ভারা নেও কিনারা ও মন-ব্যাপারী ॥
অধীন পাঞ্জ কয় বাণী, শ্রীগুরু না চিনি',
মিছে সাধুর ভারা ডুবাইয়ে খাবি খেয়ে মরি ॥

২৩৬

কি আশ্চর্য হায় রে !
ত্রিভঙ্গ সিন্ধু-নীরে।
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে,
জগৎ মাতায় রে ॥
ক্ষণে ক্ষণে ঝলক মারে,
ক্ষণে লুকায় নীরান্তরে ;
নিরাকারে নিরঞ্জন ফুলে বারাম দেয় রে ॥

গগনের পরপারে ফুলের মূল নিগুম সহরে,
দৈবযোগে ফুল বিকশিত, পাতালে উদয় রে ॥
চতুর্দলে কিরণ দেয়, যড়দলে হয় গন্ধময়,
অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র সে ফুলে দেখায় রে ॥
ফুলেতে উৎপত্তি প্রলয়, অমূল্য গুণ প্রকাশে তায়,
যে রসিক সে ফুল ধরে, তার শমন-জ্বালা নাইরে ॥
ফুলে মধু, রত্ন-কিরণ, দ্বিতীয়ায় প্রথম নিরূপণ,
সাধুজনে করে সাধন, পাঞ্জর ভাগ্যে নাই রে ॥

২৩৭

একবার অনুরাগ যার মনে উদয় হয়,
সুধা ব'লে গরল দেখ পান করে সদায়।
ও তার গরল সুধা হয়ে যায় ॥
তার প্রমাণ দেখ, ভাই, এই মৃত্তিকার ন্যায়,
কত মিষ্ট ফল হচ্ছে জন্ম,
লোহা জেরে খায় ॥
যে জন অনুরাগী হয়,
মিষ্টফল তার কৃষ্ণ-কথা
বলতেছে সদায়।
ও সে গুরুপদে নয়ন দেয়,
রিপু করে পরাজয়,
ভব-নদীর মাঝে সদায় উজান তরী বায় ॥
করে গোপী-ভাব আশ্রয়,
ব্রজগোপীর ভাব লয়ে সে
চৈতন্য ভজয়,
করে মাধুর্য আশ্রয়,
পুণ্য-মুক্তি নাহি চায়,
পঞ্চবিধ মুক্তি ছেড়ে রূপে নয়ন দেয় ॥

তার ভক্তি-নিষ্ঠা হয়,
এই স্বরূপে সহজ মানুষ
ধরেছে নিশ্চয়।
তার শমন-জ্বালা নাই,
ও সে রসিক মহাশয়,
হীরুচাঁদ কয়, পাঞ্জ রে, তোর শুধু হায় হায়॥

২৩৮

এবার আগে কর রাগের অন্বেষণ।
রাগ ধ'রে প্রেম সাধলে পরে মিলবে প্রেম-রতন॥
অন্ধকারের আগে তাই হয় সে রাগের উদয়,
যে রাগেতে সহজ মানুষ করেছে আসন॥
যে রাগ ব্রহ্মাণ্ড উপর,
দীক্ষা-শিক্ষাগুরু বিনা সত্য রাগ চেনা হয় ভার,
নিত্যবস্তু বলে তার, জীবের অনিত্য আচার,
না জেনে জীব চৌরাশি করিছে ভ্রমণ॥
ও সে রাগে বেগ ধরে,
শুভযোগে ক্ষীর-নদী ভাসে জোয়ারে।
সহজ মানুষ এসে তায়
সে রাগে বারাম দেয়,
তার এক বিন্দু পরশিলে এড়াবে শমন॥
সে যোগ অমাবস্যা কয়,
প্রতিপদে কার্য নাই, তার সাধন দ্বিতীয়ায়,
পাত্র অন্তর লয়ে তাই,
যে নীরে ক্ষীরে মিশায়,
অধীন পাঞ্জ কেঁদে বলে, ভজি চরণ তা'র॥

২৩৯

ত্রিবেণীর তীর-ধারে সুধারে জোয়ার আসে।
সুখ-সাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে॥
উথলে সুধা-সিন্ধু,
সু-ধারে সুধার বিন্দু,
সুখময় সিন্ধু-জলে
ছলে ছলে সাঁতার খেলে।
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে অধর মানুষ যায় গো ভেসে॥
অমাবস্যা তিথি নাস্তি,
জোয়ারে তিথি উক্তি,
অমাবস্যা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া—তিন দিন চলে।
মন ধরবি যদি অধর মানুষ, থাক নদীর কুলে বসে॥'
জোয়ারের ভাটা-শেষে
মানুষ যায় অচিন দেশে,
গোপনে তিন মৌজা ফোটে ;
সেদিন স্বরূপেতে কিরণ দিয়ে মানুষ যায় গোলকে মিশে॥
অনুরাগী যে হইবে,
ত্রিবেণীর রূপ দেখিবে,
সহজে অধর ধ'রে যাবে ঐ চরণে মিশে।
সাঁই হীরুচাঁদ কয়, মানুষ খুঁজে পাগু মলি দেশ-বিদেশে॥

২৪০

(ও মন) আয় না চলে যাই সাঁইজীর লীলা দেখিতে
সুরধুনী গঙ্গার ঘাটেতে ॥
শুধু জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে রে, ফুলের সৌরভে জগৎ মাতে।
ফুলের মূল রয়েছে গোলোক-নগরে,
সে ফুল পাতালপুরে দীপ্ত করতেছে,
সে ফুল ধরবে বলে সাধুজন রে ব'সে আছে যোগ-ধিয়ানেতে ॥
সে ফুলের মধু পান করব ব'লে
দয়াল কেলেসোনা ভ্রমর হয়েছে ;
প্রভু গুন্‌গুন্ রব ধরেছে রে, সে রব জীবে না পায় শুনিতে ॥
শুভযোগের মেঘে সে ফুল ফুটেছে,
যে জন যোগ চিনে সেই ঘাটে বসেছে,
ও সে কোটি তীর্থের ফল পেয়েছে রে,পেরেছে অধরচাঁদকে ধরিতে ॥
বড় আজব লীলা হচ্ছে সেই ঘাটে,
বিষম অন্ধকারে বাতি জ্বলতেছে,
পতঙ্গের মত পাঞ্জ হ'য়ে, রে, উড়ে' পড়ে পুড়ে' মরিতে ॥

২৪১

রূপে যে দিয়াছে নয়ন,
সে জেনেছে ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে গুরুরূপে নিরঞ্জন।
জেনে শুনে সঁপেছে সে গুরুপদে দেহমন ॥
তার মন হ'য়েছে ফুলের জ্যোতি, মধুর রতি উপার্জন।
মধুর লোভে গুরু করে আত্মার সঙ্গে সম্মিলন ॥
তার হৃদয়-মাঝে গুরু রাজা, গুরু প্রজা সর্বক্ষণ।
পূজা ক'রে প্রাপ্তি করে নিত্য মধুর বৃন্দাবন ॥
সে নিত্যসেবায় বর্ত থেকে করছে প্রেমের আস্বাদন।
সে যজ্ঞে অযোগ্য হ'য়ে অধীন পাঞ্জর যায় জীবন ॥

২৪২

রসের ভাব জেনে না নিলে, সাধন যাবে রে বিফলে।
সুধা ব'লে গরল খেয়ে মরবি রে জ্বলে॥
যে রসে সাঁই বিরাজন করে,
তার ভেদ আছে, মন, অতি গভীরে।
ভেদ জেনে রস সাধলে পরে রসিক তারে বলে॥
সাঁই গুপ্ত বেশে গোপনে বসে,
বিরাজ করে অমৃত রসে।
অমাবস্যার দ্বিতীয়াতে বর্ত হয় কমলে॥
সেই যোগ ছেড়ে অযোগে সাধিলে
বিপদ ঘটে জীবের কপালে।
পাঞ্জ বলে, গোলেমালে সাধন গেলাম ভুলে॥

২৪৩

তিনটি রসের ভিয়ান যে জানে,
সে-ই পাবে নিরঞ্জনে।
শাম্ভু গরল মিলন করে সুধার মিলনে॥
যেমন দুগ্ধে জল মিলন করিলে
হংস পাখী পান করে বেছে।
রসিক জন হংস হয় সেই রসের সাধনে॥
অমাবস্যায় গরল প্রকাশে,
অমূল্য হয় সাঁই আগমনে।
সাবধানেতে সাধন করে রসিকের গণে॥
পদের শেষ দ্বিতীয়ার প্রথমে
রত্ন মিলে তিন রস-মিলনে।
পাঞ্জ বলে, রত্ন পেলে ছোঁবে না শমনে॥

২৪৪

নিরাকারে জ্যোতির্ম্ময়, নিত্যধামে প্রেমধন,
যুগলপদ্মে জ্যোতি মিশে হচ্ছে সুধার বরিষণ ॥
সপ্ততালার তালে তালে ষড়্দলে বিদ্যুৎ খেলে,
ত্রিবেণী-তীর-ধারে রসে করে আস্বাদন।
স্বরূপে রূপ মাখা-চোখা, আলো করে ত্রিভুবন ॥
জ্যোতির্ম্ময় রসে মিশে' রতি খেলে হৃদ্কমলে,
পরশমণি পরসিলে মণিকোঠায় যোগ-মিলন।
শান্তকালে ঝলমল হিল্লোলে জুড়ায় জীবন ॥
নিত্যধামে চাঁদের মূলে হেন রূপ যার হৃদয়ে দোলে,
কি করিবে তার কাল শমন, স্বধামে তার গমন।
পাঞ্জর সেই দিন কবে হবে পাইবে চরণ ॥

২৪৫

অধর ধর আমার মন,
তোর ভববন্ধন দূরে যাবে,
ওরে তুই এড়াবি শমন।
মন ধরবি যদি অধর মানুষ ধর গুরুর চরণ ॥
এই মানুষে সেই মানুষ আছে,
সে ঘরের মাঝে ঘর বাঁধিয়ে কাজল-কোঠায় রয়েছে ;
এবার গুরু দয়া করবে যারে,
ও সে পাবে সে রূপ দরশন ॥
মানুষ নীরে ক্ষীরে বিরাজ করতেছে,
তার স্থূল গেছে ব্রহ্মাণ্ড 'পরে, মূল পাতালে গেছে,
সেই মূলের সাধন গুরু জানে,
তা জেনে, মন, কর সাধন ॥

সে দ্বারে উল্টা খেলা যে জন খেলতেছে,
সে না নীরে ক্ষীরে ভিয়ান ক'রে অধর ধরেছে।
সাঁই হীরুচাঁদের বাক্য ভুলে' অধীন পাঞ্জর হয় মরণ ॥

২৪৬

আছে প্রেম প্রয়োজন।
রসিক ময়রা হ'লে পরে ওরে সে পাবে প্রেমধন ॥
চৌষট্টি রস রসের মূলে, তিন রস হয় গণন,—
গরল রস আর শাম্ভু রস বলে,
অমৃত রস সুধার মূলে,
রসের রসিক তা জানে,
তিন রতি তিন রসের সনে পাক করে সে মহাজন ॥
ভাল তিথির যোগে পাকের দিন আছে,
প্রথম দ্বিতীয়ার চাঁদে রসিক সে পাক করতেছে।
ও সে রাত্রদিবা অনুরাগে মহাকামের সঙ্গে করে রণ ॥
রণে জয় করিয়ে প্রেম পেয়েছে,
সখী অনুগত হয়ে নিত্যধামে গিয়েছে,
অধীন পাঞ্জ বামন হ'য়ে চাঁদ ধরতে যায় অনুক্ষণ ॥

২৪৭

(ও সে) অধর মানুষ নদীর কূলে ঘাট বেঁধেছে।
তাহে মণিমুক্তা ভিয়ান ক'রে ঘাটে শান বেঁধে দিয়েছে ॥
পদ্মা যমুনা মিলে ভাগীরথীর লোনা জোয়ারে।
এসে তিনভাবে তিন নদীর জলে ভাটা-জোয়ার খেলতেছে ॥
আন্ত মানুষ অধরচাঁদে এক রূপ তিন রূপ ধরেছে।
তিন ধারে তিন রসে মিশে বারাম দিতেছে ॥

মানুষ তিন রতি হ'য়ে, তিন রসেতে সোয়ার দিয়ে,
ও সে সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা—তিন নাম ধরেছে ॥
গরল রসে সাধারণী, সমঞ্জসায় শান্ত শুনি,
সমর্থা অমৃত রসে বিরাজ করতেছে।
যে জন রসিক হয়েছে, রসের ভিয়ান সে-ই জেনেছে।
ও যে গুরুর কৃপায় ঘাটে নেমে তিন রতি উজান করেছে ॥
রস-রতি উজান হ'লে গোপীকৃপা তাইরি বলে,
(ও যে) সহজ রূপে নয়ন দিয়ে জেন্তে মরেছে,
ঘাটে বসে রয়েছে, অনায়াসে মানুষ ধরেছে।
ও সাঁই হীরুচাঁদ কয়, ভাব না জেনে পাঞ্জ ঘুরে মলি মিছে।

২৪৮

অধর স্বরূপে, মূলাধারে রূপ রয়েছে,
স্বধনে শ্যাম গউর হয়েছে ॥
এবার শান্ত রতি যার হয়েছে,
পঞ্চগুণ ধ'রে সে রূপ দেখেছে ॥
স্বরূপ-শক্তি ক'রে সার, যাতে গোলকের আকার,
ও সেই রূপ-উদ্দেশে রূপের দেশে নিহেতু নিহার,
ও যার সাধনের গুণ হৃদয়ে আছে, সে মধুর রূপে বর্ত করেছে ॥
বিন্দুকোণের কিরণে মাতায় এ ত্রিভুবনে,
প্রেমানন্দে নিরানন্দ তার ঘুচে' গিয়াছে।
ও যে বর্তমানে নিত্যসেবা সার ক'রে ব'সে আছে ॥
সর্পের খোলসেরি প্রায় খসিয়া পড়িবে কায়,
সহচরী এসে করে ধ'রে শ্রীরূপের পদে দেয়,
অধীন পাঞ্জ বলে, বৈষ্ণব-দ্বারে জানি, মোর কপালে কি আছে ॥

২৪৯

রস ভিয়ান করে সহজে সহজে,
সাধু বৈছ রসরাজে রাজে।
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র একাদশ কলি,
অষ্টম ইন্দুকাল মাঝে মাঝে ॥
তাহে সিন্দুরা মেঘের আড়ে বিজুরী কড়ক ঝাড়ে,
শিলারি হয় হুঁশিয়ার, এমত ব্যবহার রসিক জনার,
তাহে চতুর্দশ স্থল মঞ্জরী কমল, চুমি' চুমি' আনে ধ্বজে ধ্বজে ॥
ওগো সে ধন-সাধন, নাগরী-নাগরগণ গোপন করণ যজে,
তাহে আরোপ ধিয়ান, অতি অনুপম, তাহে পাত্রান্তরে ধরে,
আধার মূলাধারে, রিপুগণ মজে কাজে কাজে ॥
সহজ নগর ঘনবরিষণ স্বাতী-নক্ষত্র-জল উতলায়,
রসিক জনায় চাতকপ্রাণী হয়,
তাহে শান্তি-দুগ্ধ-পানে শান্ত করে প্রাণে,
শমন পলায় লাজে লাজে ॥
ওগো, এসব করণ করে যেবা জন
কোটি নমস্কার তার পায়,
সে ত সামান্য নয়, ব্রহ্মাণ্ড করে জয়,
সে-ই নিত্যেশ্বর মণি, তাহে গুরু জানি,
পাঞ্জ ক্ষুদ্র প্রাণী ভজে ভজে ॥

২৫০

মানুষের করণ মানুষ ভিন্ন নয় ওরে মন,
আগে নিষ্ঠা কর শ্রীগুরুর চরণ।
রস-রতিতে খেলছে মানুষ জান তার অন্বেষণ ॥
জগৎ-কর্তা পতিতপাবন,
এই মানুষে করে বিরাজন,

তিন রতিতে খেলছে মানুষ
তিন রসের সম্মিলন ॥
শান্তু গরল অমৃত রসে,
কামরতি খেলে গরলের সাথে,
সেবা-সুখ শান্তু রসে, সমঞ্জসায় হরে মন ॥
সমর্থা রতি অমৃত মিলন, সাধলে পরে পাবে প্রেমধন,
যোগমায়া চিৎ-শক্তির যোগে সাধন করে সাধুজন ॥
সাধনে জয় করে ত্রিভুবন,
ভজনে প্রাপ্তি নিত্যধাম, মন,
সাধন-ভজন ভুলে পাঞ্জর জনম
গেল অকারণ ॥

২৫১

আদমেতে আল্লা আছে মিলে।
'আলাকুল্লে সাইন মোহিত' কোরাণেতে বলে ॥
মোকাম মঞ্জিল এই, দেহেতে দিয়াছে সাঁই, হায় গো,
দেহ ছাড়া আল্লা জানে শয়তানি ভোলে ॥
যে ভাবেতে আল্লা সাঁই, আদমেতে আছে ভাই, হায় গো,
না জেনে কিনার নাই, বন্দেগী করিলে ॥
দলিল পড়িয়া ভাই, মৌলবী হইল তায়, হায় গো,
মনেতে ভেবেছ এই ভেস্তে যাবে চলে ॥
ইঞ্জিল পড়িয়া কেউ, মর্দা আদমী হইল সেও, হায় গো,
মোর দিন ভাল বলে ডঙ্কা মেরে চলে ॥
ভাগবত পড়ে কেউ, পণ্ডিত হ'ল সেও, হায় গো,
বলে সেই স্বর্গে যাবে হিন্দুলোকের দলে ॥

সেই স্বর্গপুরী ভাই, হাতে ধরা কারো নাই, হায় গো,
নাচানাচি করে ভাই, প'লো গোলমালে ॥
দেহ চিনে সাঁই ধর, পার পাবা পারাপার, হায় গো,
গুরুর চরণ ধর পাঞ্জ কেঁদে বলে ॥

২৫২

খুঁজে কি আর পাবি সে অধরা, সে নয়নতারা ।
এই মানুষে মিশে আছে গোপী মনচোরা ॥
লীলা সাঙ্গ ক'রে গোরা
স্বরূপেতে মিশে আছে মায়া-পাসরা ।
স্বরূপ-রূপ রসে মিশে রসে হ'য়ে ভোরা ॥
রসে আলো হয় ছেতারা,
রসেতে রূপ গিল্‌টি করা
দর্পণের পারা ।
ও সে রসের নদী জোয়ার এসে বহে তিনটি ধারা ॥
কারুণ্য-তারুণ্যামৃত লাবণ্যেতে তিনটি অর্থ,
রসিক জানে তাহা ।
তারা নদীর কূলে অধর ধরে, পাঞ্জ মণিহারা ॥

২৫৩

ও দয়াল মুরশিদ ধন, আমি কোথায় তোরে পাব ।
ও তোর রূপ রয়েছে কার বাসরে, আমি কিরূপে দেখিব
হলাম হালসে বেহাল,
দিনের কাঙাল,
আর বাঁচিব কত কাল,
আমার সাধের জনম বিফল হ'লো,
আমি কোন্ গুণে তরিব ॥

যেমন ভ্রষ্টমতি নারীর গতি,—
খেয়ে না পুরিল আশ,
কলঙ্কে ভরিল দেশ,
আমি কোন্ কূলে দাঁড়াব ॥
হৃদয়ে পালঙ্ক পেড়ে
আমি জাগব কত রাত,
আমার সুখের নিশি দুঃখে গেল,
আমি কার পানে চাহিব ॥
আমি হই উদাসী বনবাসী,
আমার পথের সম্বল নাই,
পাঞ্জর বাঞ্ছা ছিল চরণ পেলে
আমি তাপিত প্রাণ জুড়াব ॥

২৫৪

এই মানুষে নবীর নূরে ঝলক দেয়।
দেহ খুঁজলে পাওয়া যায় ॥
ছিয়া ছফেদ লাল জরদে নূরের আসন ঘিরে রয়।
মোকাম নাছুত, লাহুত, মালকুত, জবরুত চারি হয়,
চার মোকামে মঞ্জিল-দ্বারে গুপ্ত বেশে কিরণ দেয়,
লা-মোকামে নূরের আসন, হাউতে নবোত বাজায় ॥
নূরের হস্ত-পদ-নাসা-কর্ণ কিছুই নাই,
অঙ্গহীন সে আপন জোরে বেগ ধ'রে ত্রিবেণী যায়,
সেই না ঘাটে পদ্মফুলে ভ্রমর হ'য়ে মধু খায় ॥
বড় যত্ন ক'রে ভ্রমরেরে ভজতে হয়,
কিসে যত্ন হবে তার, এও ঠেকিলাম বিষম দায়।
অধীন পাঞ্জ বলে নূরের যত্ন কেবল জানেন ফাতেমায়

২৫৫

ও মন, শুধু কথায় রতন কি মেলে।
চেতন মানুষের সঙ্গ না নিলে॥
ও মন, আল্লা-নবী আদম ছবি করেছে নীলে
দেখ কে আছে মন কি কলে॥
সিংহাসনে বসে একেলা
ছাদেকী এস্ক পয়দা করলেন মালেক আল্লা।
ও সেই এস্ক-জোরে নূরে পয়দা করলেন রসুলে,
এসে দোস্তি করলেন দ্বিদলে॥
সেই মহব্বতে আদম গঠিলে,
হাওয়া-আদম-আল্লা নবীর ভেদ কেবা বলে।
ও সেই ভেদ জানিলে অধর মেলে এ ত্রিভুবনে,
জানা যাবে মুরশিদ ভজিলে॥
মন ভেস্তে যাবার আশা করিলে,
দোজক-ভেস্তের মালেক যেবা, তারে না চে'লে।
অধীন পাঞ্জ বলে, ভেদ না জেনে কালমা পড়িলে,
শেষে পড়বি রে গোলমালে॥

২৫৬

গুরু-রূপে নয়ন দে রে মন।
গুরু বিনে কেউ নাই তোর আপন॥
গুরু-রূপে অধর মানুষ দিবে তোরে দরশন॥
পিতার ভাণ্ডে কি রূপ ছিলি,
মায়ের গর্ভে কি রূপ হলি, মন,
পূর্ব-পরে নিরন্তরে গুরুরূপে নিরঞ্জন॥

রজবীজে মিলন কে করিল,
কোথায় আছে তার আসন।
ব্রহ্মাণ্ডের গড়ন গড়ে সে কোন্ জন॥
কোথায় ছিলি, কার বা সাথে ভবে এলি,
ওরে মন।
অধীন পাঞ্জ বলে, গুরু ধ'রে কর তার অন্বেষণ॥

২৫৭

তারে ধরব কি সাধনে।
ব্রহ্মা আদি পায় না যারে যুগযুগান্তর ব'সে ধ্যানে॥
বেদ-পুরাণে পাবে নারে নিরূপ নৈরাকারে,
নিরাকারে জ্যোতির্ময় আছে ব'সে নিত্যস্থানে॥
অনাদির আদি মানুষ আছে সে গোপনে,
সেই মানুষ সাধ্য করে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে॥
চিন্তামণি-ভূমিবৃক্ষ-কল্প একে বলে—
গোপী-কৃপা যার হ'য়েছে, সে-ই পেয়েছে রত্নধনে
সখী-রূপে যে দেখেছে গুরুর ধিয়ানে,
পাঞ্জ বলে, সেই রসিক দাসী হবে শ্রীচরণে॥

২৫৮

মুরশিদ চাঁদ কি ধরা যায় রে
আগে জেন্তে-মরা নাহি ম'রে।
মরার সঙ্গে সঙ্গ ধ'রে মরতে হয় সেই স্বরূপদ্বারে॥
দু'জন মরা জেন্ত তারা, রে, সদায় ম'রে বাঁচে,
দু'জন মরার মূল রয়েছে অধর মানুষের কাছে,
মরা ধ'রে সন্ধি ক'রে থাক মরার ভাবে মরে॥

এমন মরা কে দেখেছে রে আপনি ম'রে আছে,
যমে এসে যখন ধরে তখন মরা বাঁচে।
তারা যমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দুই দিকে যায় দু'জন স'রে॥
মরা ধ'রে ভজন-সাধন, রে, কর অনুরাগে,
রাগে বাগে মরার ফাঁদে ধর মুরশিদচাঁদে,
অধীন পাঞ্জ বলে, অবহেলে পারে যাবি চরণ ধ'রে॥

২৫৯

মরার ভাব লয়ে, মন, না মরিলে
দয়া করবে কেন মরণ-কালে।
থেকে তাজা মরায় মজা,
গুরুপদে নয়ন দিলে॥
দু'জন মরা সুজন তারা রে, থাকে মানুষের কাছে,
জীবেরে ডুবায়ে মারে মায়া-নদীর মাঝে,
যে ডুবায় সেই তুলতে পারে,
তাইরি সাথে প্রেম করিলে॥
মরার প্রেমে মত্ত হ'লে রে সহজ মানুষ মেলে,
সহজ রূপে নয়ন দিয়ে রসের খেলা খেলে।
ও সে নিত্যপ্রেমে বর্ত হলে কি করবে তার যমদূত এলে॥
যে মরেছে এমন মরা, রে, তার কিসের অভাব আছে,
ভবের খেলা মরার জ্বালা সকল জানে মিছে,
সাঁই হীরুচাঁদের চরণ ভুলে পাঞ্জর জনম যায় বিফলে॥

২৬০

অধর চাঁদ মেলে
মুরশিদ আঁধার ঘুচালে।
দেখবি লীলা চাঁদের খেলা খেলে দ্বিদলে ॥
চাঁদের সিংহাসন উদয়,
তিলপ্রমাণ জায়গা বুঝায়,
রংমহল তায়,
পাঞ্জাতন সে আসন ঘিরে সকলে ॥
অমাবস্যা সে চাঁদে নাই,
দিবানিশি হচ্ছে উদয়,
দেখলে দেখা যায়,
মানব-জন্ম সফল হবে সে চাঁদ দেখিলে
দেখে-শুনে যে সাধন করে,
সে জন যাবে ভবপারে
সে চরণ ধ'রে,
পাঞ্জ বলে সাধের জনম গেল বিফলে ॥

২৬১

ভজন-সাধন করবি, রে মন, কোন্ রাগে।
আগের মেয়ের অনুগত হও গে ॥
জগৎ-জোড়া মেয়ের বেড়া রে,
কেবল একপতি সাঁইজী জাগে ॥
মেয়ে সামান্য ধন নয়,
জগৎ করছে আলোময়,
কোটি চন্দ্র জিনি' কিরণ
বুঝি আছে মেয়ের পায়।
মেয়ে ছাড়া ভজন করা রে
তা হবে না কোনো যোগে ॥

যদি রূপার টাকা পায়,
জীবে কপালে ছোঁওয়ায়,
কত রজত-কাঞ্চন সোনা-রূপা পতি
দিচ্ছে মেয়ের পায়।
মেয়ে এমন ধন নাহি চিনে রে জীব
পড়বে পাপের ভোগে॥
মেয়ে মেরো নারে ভাই,
মারলে গুরুমারা হয়,
মেয়ের আহ্লাদিনী নাম
রেখেছেন চৈতন্য গোঁসাই।
ও যার দরশনে দুঃখ হরে রে
ও তার চরণে শরণ নিগে॥
বলে হীরু চাঁদ আমার, মেয়ে মনোহর,
যার আকর্ষণে জগৎপতি করল রাধার দাস-স্বীকার।
তুই ধরবি যদি গুরুর চরণ রে,
পাঞ্জ মেয়ের চরণ ধর আগে॥

২৬২

ভজনহীন ব'লে গুরু আমার হালির কাঁটা ছেড়েছে ;
জ্বরা তরী ভরা গাঙে মনুরায়ে ভাসিয়েছে।
এ ভব সংসারে তরী ঘুরনো পাকে ঘুরতেছে॥
ছয় জনা ছিল দাঁড়ী,
সদায় করিছে আড়ি,
উঠে এল বিষম ঝড়ি,
চৌষট্টি ঢেউ বেঁধেছে॥

দশখানে উঠছে পানি,
ছেঁচে পার না পাই আমি,
ডুবে এল সাধের তরী,
পালের কেনি আড়িয়েছে ॥
অধীন পাঞ্জ কেঁদে বলে,
কপালে কূল না মেলে ;
দেবাংশে ধন নৌকায় ছিল,
তাইতে এ দশা ঘটেছে ॥

২৬৩

গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া ভুবনে।
অনন্ত অপার লীলা তোমার,
মহিমা কে জানে ॥
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ,
মন্ত্রদাতা তুমি ইষ্ট,
মন্ত্র জানতে সঁপে দিলে
সাধু-বৈষ্ণব-চরণে ॥
নবদ্বীপে গোরাচাঁদ,
শ্রীক্ষেত্রে হও জগন্নাথ,
সাধুবাক্য যাহাই হ'লো—
দয়া হবে না স্বরূপ বিনে ॥
বৃন্দাবন আর গয়া-কাশী,
সীতাকুণ্ড বারাণসী,
মক্কা-মদিনে,
তীর্থে যদি গউর পেত,
ভজন সাধন করে জীব কেনে ॥

সাধু গুরুর চরণপদ্ম,
সব তীর্থ আছে বর্ত,
পাঞ্জ বলে, অবোধ মন তোর
মতি সরল হবে কোন্ দিনে ॥

২৬৪

সাঁই-রূপ গঠে' গঠে' কত লীলা করলে, আল্লা,
সব ঘটে ঘটে।
সাঁই-এর লীলা-খেলার কথা শুনলাম
ঘাটে মাঠে হাটে ॥
বিষম লীলা দেখে এলাম রে ত্রিবেণীর ঘাটে।
কত জোয়ান-বুড়ো ডুবে ম'ল, বালক ভেসে ওঠে ॥
এক নীরে দুই ভাগ হ'য়ে রে
একটা জীব আত্মার ন্যায় গঠে।
সেই আত্মার ঘাড়ে কর্তা হ'য়ে
সাঁতার খেলতে ছোটে ॥
ত্রিবেণীতে সাঁতার খেলে রে গেল শূন্যদার ঐ মাঠে।
সেই জীব আত্মারে বন্ধক থুয়ে গেল মায়া-লাটে ॥
মায়া-লাটে প'ড়ে আত্মার বড় ত্রিতাপ-জ্বালা ঘটে।
আশীলক্ষ জনম ঘূরে ম'লেও জ্বালা নাহি মেটে ॥
গড়নদারে ভুলে আত্মা রে বেড়ায় দেশবিদেশে ছুটে।
সেই কর্তারে চিনলে আত্মার জ্বালা মিটে যেত মিটে ॥
আত্মা উদ্ধার করবে ব'লে রে সাঁই গুরুরূপে এসে।
যুগল-নামের যুক্তি দিয়ে ফিরছে দেশে দেশে ॥
যুগল-নামের করণ জানলে রে মায়া-জাল তো যেত কেটে।
অধীন পাঞ্জ বলে, গুরুর চরণ ধর, রে মন, এঁটে ॥

২৬৫

যে দেখেছে বন্ধুর রূপ সে ত আর ভুলবে না।
সেরূপ দেখতে আছে, কইতে মানা ;
সে রূপের না মিলে তুলনা ॥
দর্পণে যে রূপ দেখেছে,
তার মনের আঁধার ঘুচে গেছে ;
রূপে নয়ন দিয়ে আছে
দূরে গেছে পারের ভাবনা ॥
সদায় থাকে রূপ-ধিয়ানে,
দেবদেবী সে মানবে কেনে,
মন দিয়েছে শ্রীচরণে,
গুরু ভিন্ন অন্য রূপ মানে না ॥
তার সাধ্য-সাধন গোপীর সনে,
ভজে গুরু বর্তমানে,
প্রাপ্তি হয় তার নিত্যস্থানে,
অধীন পাঞ্জুর মনের ঘোর গেল না ॥

২৬৬

জেতের বড়াই কি।
ইহকাল-পরকালে জেতে করে কি ॥
আমার মনে বলে অগ্নি জ্বেলে দিই জেতের মুখি ॥
এক জেতের বোঝা ল'য়ে,
চিরকাল কাটালাম মানী মানুষ হ'য়ে ;
মানের গৌরব, কুলের গৌরব,
ধন্ধবাজি সব দেখি ॥

লোকে পেটের জ্বালায় দেশান্তরী হয়,
হিন্দু মুসলমানের বোঝা মাথায় ক'রে বয়,
কার বা জাতি, কেবা দেখে
ঘরে এলে চিহ্ন কি ॥
জেতে অন্ন নাহি দিবে,
রোগে না ছাড়িবে,
পাপ করিলে কোম্পানী সব জাত
ধ'রে ল'য়ে যাবে।
মৃত্যু হ'লে যাবে চ'লে,
জেতের উপায় হবে কি ॥
মন, ডাক আল্লা ব'লে
কুলের গৌরব ফেলে,
অকুলের কুল মালেক আল্লা
তাইরি লেহ চিনে।
পাঞ্জ বলে, যত করলাম,
সকলই ফাঁকিজুকি ॥

২৬৭

ভবে যার জ্ঞান আছে,
সে-না গুরুপদে নিহার দিয়ে রয়েছে।
ও সে সর্বস্বধন গুরুপদে সমর্পণ করেছে ॥
অনুরাগের বাতি জ্বেলে নয়নে রেখেছে,
ও সে তীর্থ-ধর্ম ত্যাজ্য ক'রে স্বরূপ-নিষ্ঠা করেছে।
ও সে গরল খেয়ে সরল হ'য়ে জেন্দা মরা মরেছে ॥
সে অধরচাঁদের ভাবে রতি শান্ত করেছে,
ছয় রিপু ছয় কাজে দিয়ে প্রেমের রসিক হয়েছে।
ও সে রসামৃত পান ক'রে শমন ফাঁকি দিয়েছে ॥

গুরু-সুখের সুখী হ'য়ে সেবাদাসী হয়েছে,
ও সে অন্ধকারে বাতি জ্বেলে নিত্যধামে গিয়েছে।
অধীন পাঞ্জ বলে, মায়াজালে আমায় ঘিরে রেখেছে ॥

২৬৮

মূল সাধন কর মালেক চিনে।
মীনরূপে সাঁই গভীর জলে,
যোগ-সাধন করো বর্জোক ধ্যানে ॥
মীন আল্লা নিজনাম ধরে,
কালামোল্লায় দেখ জেনে,
আছে নির্মল মহল মণিপুরে,
খেলেছে খেলা ঘাট ত্রিপিনে ॥
সে দরিয়ার মাঝে তরী,
হাওয়া বারি আতসপুরী,
কৃপানন্দ আদরিণী
বসে তথা মধুপানে ॥
মীনের খবর জীব কি জানে,
মীন ধরে অনেক সন্ধানে,
হীরুচাঁদ কয়, ভাব না জেনে
পাঞ্জ ম'লি শেউলি টেনে ॥

২৬৯

নিগূঢ় লীলা রসিক জানে,
সে যে অধিকারী হয় ভজনে ॥
অবতারে হয় কাণ্ডারী জীবের নিস্তার-কারণে ॥

দয়া কর নিমাই-রূপী,
আর আছে হজরত নবী,
নিমাই-হজরত একে ভিন্ন ছবি,
সাঁই একা একেশ্বর।
কাহে হিন্দু কাহে মোছলমান
মিলজল হও, মন, সাঁই-সেবনে॥
কেহ পুরুষ, কেহ প্রকৃতি,
সর্বঘটে সাঁইএর বসতি,
করছে খেলা রস-রতি
দেখি জগৎময়।
এক দিকে হয় ব্রহ্মার সৃষ্টি,
এক দিকে প্রেম সাধু জানে॥
গুরু দেহে করো স্থিতি,
যদি হয় মন নিষ্ঠারতি ;
শুদ্ধ ভক্তি অহৈতুকী
মূঢ় পাঞ্জর ঘটবে কেনে॥

২৭০

শ্রীরূপ দেখবি যদি মন-বিবাদী
ত্রিবেণীর ওপারে চল।
ঘাটের উপরে আছে হাটের মাঝে
শ্রীরূপের এক রংমহল॥
শ্রীগুরু কাণ্ডারী কর, নৌকায় চড়,
পঞ্চ দাঁড়ে বেয়ে চল।
পাড়াতে নিশান কর,
জেন্তে মর,
স্থির হবে বেগবতী জল॥

পার হ'য়ে নামের জোরে, পাড়া ধ'রে,
নৌকা বেঁধে নিহার ক'রে,
দেখ সেই রংমহলে
শ্রীরূপ ব'সে নিজরূপে করছে আলো ;
লিবে তোর কেশে ধরি', সহচরী
দিবে সেই চরণ-কমল।
পাঞ্জ তাই কেঁদে বলে, মোর কপালে
এমন দিন কি হবে বল ॥

২৭১

যে জানে ব্রজগোপীর মহাভাব,
ও সে জেন্তে ম'রে কৃষ্ণপ্রেমের করিছে আলাপ ॥
অনুরাগের জোরে বিধির কলম নাহি সে মানে,
বেদ-বেদান্ত দূরে রেখে করে প্রেমালাপ ॥
গোপীর সনে গোপী হ'য়ে,
রিপু ইন্দ্রিয় আপন ক'রে,
স্বরূপনিষ্ঠা ক'রে ডোবে প্রেমেরই তরঙ্গে ;
কাম-কুম্ভীরে ধ'রে
পঞ্চবাণে তারে সংহারে,
রস-রতি দিবারাতি করে তৌল-মাপ ॥
বার তিথির বারুণীতে
যোগেশ্বরীর মহাযোগে
রসের ভিয়ানে, পাত্র অন্তরে লয়ে,
কৃতংপাক সেই রসিক করে ;
ও সে গুরু-আত্মা শিষ্য-আত্মা করেছে মিলাপ ॥

অটল হ'য়ে কৃষ্ণসেবা, মানে না সে দেবীদেবা,
প্রেমে মত্ত হ'য়ে থাকে নিহেতু নিহারে,
সাঁই হীরুচাঁদে কয়, সে প্রেম কি যারে তারে হয়,
পাঞ্জ রে তোর মুখের কথা, গেল না স্বভাব ॥

২৭২

যারে আমি ডাকি দয়াল ব'লে,
আছে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড 'পরে নিত্যকমলে ॥
আছে মানুষ অতি গোপনে
চন্দ্র-সূর্যের কিরণ নাই সেখানে,
ও সে অটল বিহারীর কিরণ আসে দ্বিদলে ॥
আছে অধর নাম ধরে,
জীবের সাধ্য কি ধরে তাহারে,
রূপের কিরণ মিলে ভাগ্যফলে গুরুর দয়া হ'লে ॥
দেখলে জ্বালা যায় গো দূরে,
চরণ ধরলে যাবে কর্ম-ফাঁদ কেটে।
অখিলগুরু কল্পতরু চরণ কিসে মিলে ॥
যোগেশ্বরীর মহাযোগে
সে রূপের কিরণ আসে পাতালে।
ও সেই শুভযোগে যদি মিলে কেঁদে পাঞ্জ বলে ॥

হাউড়ে গোঁসাই

[হাউড়ে গোঁসাই ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা, পাণ্ডিত্য ও বংশগৌরবে এই শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে একটা লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। তাঁহার গানে সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং শিব-শক্তিবাদের গভীর তত্ত্বোপলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি প্রথমে শাক্তমতবাদের উপাসক ছিলেন, পরে প্রহ্লাদচাঁদ গোস্বামীর উপদেশ ও প্রভাবে রসপন্থানুযায়ী বৈষ্ণব সহজ-সাধনা গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের মধ্যে তাঁহার নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়। হাউড়ে গোঁসাই দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁহার রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা কাব্যের সুপরিচিত অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক প্রভৃতি লক্ষিত হয়।

হাউড়ে গোঁসাই-এর প্রধান শিষ্য ছিলেন নাদবিন্দু গোস্বামী। এই নাদবিন্দু গোস্বামীর জনৈক শিষ্য আমাকে 'তত্ত্ব-সাধন-গীতাবলী' নামে হাউড়ে গোস্বামীর কতকগুলি গানের এক ক্ষুদ্র মুদ্রিত পুস্তক ও তৎসঙ্গে হাউড়ে গোস্বামীর রচিত কতকগুলি গানের হস্তলিখিত সংগ্রহ আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তক হইতে ও ঐ হস্তলিখিত সংগ্রহ-খাতা হইতে কয়েকটি গান গ্রহণ করা হইল।]

ঐ মুদ্রিত পুস্তক হইতে রচয়িতার পরিচয় উদ্ধৃত হইল :

["বর্ধমানের অন্তর্গত মেড়তলা নিবাসী পূজ্যপাদ ৺হলধর সান্যালের ঔরসে ও পূজনীয়া ৺শ্যামাসুন্দরী দেবীর গর্ভে সন ১২০২ সালের ১৪ই আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে নিষ্ঠাবান ও ধী-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তখন ইঁহার নাম মতিলাল সান্যাল ছিল। ইনিই পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন।...বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালাতেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে স্বীয় জননীর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে স্বগ্রামনিবাসী শ্রীমৎ বশিষ্ঠানন্দ স্বামীর নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র এবং বেদ ও তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া শেষে শ্রীমৎ সনকানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন এবং পূর্ণাভিষিক্ত হয়েন।...কিছুদিন পরে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীমৎ প্রহ্লাদানন্দ গোস্বামীর নিকট ভাগবতাদি আলোচনা এবং বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ে উপদেশাদি গ্রহণ করেন ও হাউড়ে গোঁসাই নাম ধারণ করেন।...কলিকাতার সন্নিকটবর্তী ইটালির পূর্বস্থিত কামারডাঙ্গা নানক স্থানে ৺ মধুসূদন রায়ের কৃত আশ্রমে সন ১৩১৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া নিত্যধামে গমন করেন।"]

তত্ত্বজ্ঞ ও বিশিষ্ট বাউল-গুরু হাউড়ে গোসাই

[সংসারাশ্রমের নাম মতিলাল সান্যাল ও
সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীমৎ সনকানন্দ স্বামী]

[দ্বিতীয় খণ্ড : পৃঃ ২২২

২৭৩

স্ব-সিন্ধুপারে সে বিন্দুধার, কার সাধ্য যেতে পারে।
আছে মূলেত মূল, সে ধারার মূল, তত্ত্ব কর আধারে ॥
ত্রিগুণধারিণী ফণি-মণি-ধন ধরে শিরে।
কর তার বলে বল, হবে সফল চলাচল ব্রহ্মদ্বারে ॥
ভেদী হ'য়ে চলো উর্ধ্বে, সাধ্য-পদ্ম ভেদ ক'রে।
হবে স্বরূপ-সাধ্য, সেরূপ বাধ্য, আত্ম-পার বিম্বান্তরে ॥
প্রাণ-পুতলী মনমণ্ডলী যোগ কর ভক্তির জোরে।
হবে নিবৃত্তি প্রবৃত্তি-শক্তি প্রফুল্ল মণিচরে ॥
বাঁচে যে জন, মরে সে জন, প্রয়োজন ভাণ্ড জুড়ে।
ঘুরে' তার আশাতে আসা ভবে দ্বারাদ্বার বারে বারে ॥
হাউড়ে বলে সত্য স্বর্গ-মর্ত্য, অন্তরে অন্তর ক'রে।
হবে এই পারে পার, ভাবনা কি আর, গুরুর ধাম
চক্ষে হেরে ॥

২৭৪

শৃঙ্গার রস যে জেনেছে, তার কি ভয় আছে।
শৃঙ্গার সাধনে শৃঙ্গার-রসরাজ মূর্তি দেখেছে ॥
স্বসুখ হ'তো স্ব-সুখধাম, শক্তিগুরু কামে অকাম,
উজ্জ্বল রস তাহারি নাম, অনঙ্গ তায় ধীর হয়েছে ॥
আত্ম-দানে শক্তি আত্মায় কৃষ্ণ-আত্মা পায়,
যন্ত্রস্থানে পুষ্পকানন উদয় রসময়,
রসরতি সুখাস্বাদন, সুখরূপী কৃষ্ণের ভজন,
মধুর ভাবে ভাব ওই মিলন, তুলনা সেই রাধার কাছে ॥
সর্বচিত্ত আকর্ষয়ে যে নবীন মদন,
উপাসনা কামতত্ত্ব বীজরূপে গণন,

বিংশতি চারচন্দ্রে ঘেরা, শক্তি-অঙ্গে শক্তি ধরা,
তার উর্ধ্বতে বিন্দু-ধারা, রোহিনী-সংযোগ রয়েছে ॥
বিজলী-জড়িত রতি খেলে নিরন্তর,
পুরুষ-প্রকৃতি-রীতি গতি ভয়ঙ্কর,
যে করে সে করে বটে,
আছ্য-সাধ্য পিরিত বটে,
সুখে দুঃখে স্থিতি ঘটে,
জীয়ন্তে মরণ তার হয়েছে ॥

কন্দর্পেরি দর্প খর্ব সর্ব সিদ্ধময়,
স্থাবর জঙ্গম যত সঙ্গম-আশ্রয়,
হাউড়ে বলে এই বচন, কামেতে কাম নিবারণ,
মন্মথের ক'রে মন হরণ, রসেতে রসিক পেয়েছে।

২৭৫

প্রেম সুখদ্বার, কৃষ্ণ-রসাকার, রসনাতে তার কর আস্বাদন।
সে যে যোগাযোগ-স্থলে মৃণাল-পথে চলে, সহজ কমলে
সুধা-বরিষণ ॥
সর্ব ঘটে বটে পটে পট্টস্থিতি, শক্তিতত্ত্বগুণে আনন্দ মূরতি।
শৃঙ্গার-আকার ধরে সাধ্য কার,
ঐ যে স্বরতি-সঞ্চার নবীন মদন ॥
আছ্য সুখসাধ্য, বাধ্য কারুর নয়,
ইন্দু বিন্দুগতি সদা বিরাজয়।
জীবে নাহি জানে সাধু-সন্ত চেনে,
রসপানে জানে তারা অমৃত-সেবন ॥
মন আত্মা বপু যত রিপুচয়, দেহান্দ্রিয় সবাই তাহাতে মিশায়।
তাদের ব্রজপ্রাপ্তি দেহ, তৃপ্ত হয় জীবন

কাম, প্রেম, রতি হবে একঠাঁই,
সুখ-দুঃখ-আদি তথায় কিছু নাই,
নির্মল সে পথে হাউড়ে চায় যেতে
ঐ শক্তি আত্মশক্তি হ'লে যায় দর্শন ॥

২৭৬

ও যে স্বরূপ রূপে হেরে, সে কি ছাড়িতে পারে।
ঐ যে প্রেমানন্দ-সিন্ধু ডুবে থাকতে কিন্তু
সিঞ্চনে নাদ-ইন্দুর বিন্দু ধরে ॥
যে বিন্দুতে হয় জগৎ-উৎপত্তি,
প্রবর্ততে আত্মরসে সদা স্থিতি, কমলে বরিষণ ;—
সে যে যোগাযোগে আসে, মণি-চন্দ্র খসে,
রূপের কমল ভাসে নীরে ক্ষীরে ॥
নীর হ'তে পায় ক্ষীর, ক্ষীর হ'তে পায় সুধা,
ক্ষীরে নীরে বিম্বু ঢাকা সদা
রয়েছে দেখ না।
আছে কমলে কমল অতিশয় বিরল ;
নির্মল তার জল যত্নে নেয় হ'রে ॥
যাতে জন্ম ধর্ম কর্ম মাত্র হয়,
শক্তি সত্ত্ব-বস্তু করয়ে উদয়,
বুঝে তাই দেখ ভাই—
হ'য়ে শক্তিতে আসক্তি সাধ সাধ রসরতি,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পাবে একেবারে ॥
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে একতারে,
অভিন্নতা চিত্তে রসে ডুবে রবে,
ভেদাভেদ তথায় নাই ;—

ধ'রে হৃদি-কমলে কমল, স্বভাবে ভাব-যুগল,
বিষয়-বিষ-গরল
নাহি পান করে ॥
দুঃখে সুখ মানি' সুখ আলাপনে, উভয়ে প্রেমে রত,
বিচ্ছেদ নাহি জানে,
ভাবেতে মত্ত দু'জনে ;—
তাদের নিত্য সুখধাম, কামশূন্য কাম,
হাউড়ে যেতে স্বধাম বাঞ্ছা করে।

২৭৭

শ্রীরূপ-নদীতে এবার নাইতে নেবো না।
করি রে মানা, তথায় যেয়ো না, কাম-কুম্ভীরে ধরবে তোরে,
শেষে প্রাণে বাঁচবি না ॥
উদ্‌মুখে তরঙ্গে প'ড়ে, জন্ম-ধারায় যাবি ম'রে,
টান মুখে টান, কে রক্ষা করে।
কুবলো তায় ভারি, ও তার পাকে পড়ি',
যাবি কোটালের জলেতে ভেসে,
আর দেশে যেতে পারবি না ॥
গুণ-টানা ওই গুণই ছেঁড়ে, দমকা লেগে আছড়ে পড়ে,
বেদম হাওয়ায় বাদাম যায় ছিঁড়ে।
তিন দিন বারুণী, বারণ করি নি,
বারুণী-যোগেতে স্নানে
পূর্ণ মনের বাসনা ॥
কোমর বেঁধে, এঁটে সেঁটে, যেতে চাও সেই নদীর তটে,
ঘোলা জল তলায় ঢেউ ওঠে।
শোন সমাচার ভেসেছে পাহাড়, কত ভরা-কিস্তি
হ'লো নাস্তি,
ডোবা মাল কেউ পেলে না ॥

হাউড়ের কথা ভুবন-ছাড়া,
যন্ত্র-পদ্মে যন্ত্র ধরা,
মরা দেখে মরা যোগ করা।
কথা এই ধার্য অতি আশ্চর্য,
সুখ-নালেতে সুখের নিধি লুকানো
কেউ জানলে না।

২৭৮

মনে প্রাণে নয়নে তিনে ঐক্য যার হবে,
দেখ লক্ষ্য-বেঁধার মত লক্ষ্য, ব্রহ্মরূপ সে দেখতে পাবে॥
পুরকেতে বায়ু যার চলে, অধঃ ঊর্ধ্ব গতিবিধি যায়
দলে দলে,
ঐ যে হাওয়ার সনে গেলে পরে মূলে ফুলে মিশিবে॥
মৃণাল হাওয়ার গতি, ত্রিগুণ-ধারিণী শক্তি যথায় বসতি,
তারে জাগালে যোগনিদ্রা সাধ্যধন বাধ্য হয়,
তবে দ্বার পারাপার দাম দামোদরে,
ঊর্ধ্বেতে হইবে গতি দ্বিদল' পরে,
তবে হবে দৃষ্ট প্রণব পুষ্ট, ঘুচবে কষ্ট তাই ভেবে॥
লাল, জরদ, সবুজ আর সাদা,
রকম রকম দেখবি সে রঙ বলি সর্বদা।
ঐ যে চাঁদের সুধা পদ্মের মধু সাধনে সাধু খাবে॥
হাউড়ে বলে, স্বরূপ অন্তরে, খেলছে সে রূপ নেহারের ঘরে।
যে জন একবার দেখে, উপর চোখে, অন্ধকার তার ঘুচিবে॥

২৭৯

সাধন জেনে করণ কর, তবে হবে ফকিরি।
থাক ভাবের বশে রসে মিশে, নিত্যধন বর্ত করি' ॥
ওরে পরপরেতে পরমবস্তু, চেতন থেকো তাই ধরি'।
যেন রসের পাকে যাসনে বেঁকে, ধারাতে মরবি ঘুরি' ॥
জলে কমল কমলে জল, আসছে সদা মূল ধরি'।
খেলছে পিতৃফুলে ব্রহ্মনালে, দশম দলে সেই বারি ॥
নির্মল-সত্তা কর আত্মা, স্ব-সুখসত্তা ত্যাগ করি'।
মিছে সঙ সেজনা, ঢঙ কোরো না, ভজবে যদি শ্রীহরি ॥
হাউড়ে বলে ভালোবাসি, হৃদয়-শশী, সর্বদা পূর্ণ হেরি'।
আছে আজ্ঞা পরে, সুধাধারে, রুদ্র-দ্বার ব্রহ্মপুরী ॥

২৮০

ব্রহ্মাকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার।
তাতে ব্রহ্ম-ক্ষেত্র নিত্যভূমি, আনন্দময় সুধার ধার ॥
আছে ত্রিকোণরূপে মহাযন্ত্র, বিম্ব-ঢাকা চমৎকার।
তাহে পুরুষ-নারী রূপ-মাধুরী, শম্ভু-অম্বু-বিন্দু-পার ॥
হংস-তত্ত্ব, সাধন-তত্ত্ব, সোহং-তত্ত্ব সাধ্য তার।
তাতে নাড়ীমূলে ত্রিশূল ফেলে, শিবের আসন চমৎকার ॥
কি মা-শক্তি রক্তবরণ, অতুলন রূপ-প্রচার।
আছে পুরুষরতন শুভ্রবরণ, যোগাযোগে কর্ণধার ॥
ভাবের ভাবুক পায় না ভাবি', ঘরে দেখে অন্ধকার।
হাউড়ে ভেবে বলে, সেই কমলে গ'লে যাওয়া সন্ধি তার।

পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত গান

[এই পর্যায়ের গানগুলি ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের কয়েকজন ছাত্র কর্তৃক সংগৃহীত। রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গের বাউল।]

২৮১

কৃষ্ণপ্রেমের মরম যে জানে,

তারে কে চিনে,

যার পরমাত্মা যোগ হইয়াছে,

ওরে, সে জানে, তায় সে জানে

কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক যে জন হয়,

তার দর্শনে হয় প্রেমোদয়,

নয়ন দেখলে যায় চিনা।

গুরুর রূপে জ্যোতি মিশাইয়ে

ওরে সে রূপ হেরে দুনয়নে ॥

প্রেমের উদয় ত্রিকলে,

তা কি জানে সকলে,

গুরুকৃপা না হইলে

শুধু কথার কথায় ধন মিলে না।

ওরে শুদ্ধ অনুরাগ বিনে ॥

চণ্ডীদাস হয় প্রেমের সার,

ভাবিলে নাই পারাপার,

গোঁসাই বনমালী কয়, আর নাই সার

শুদ্ধ অনুরাগ বিনে ॥

২৮২

রসিক যে জন প্রেমজোয়ারে রসের তরী বায়,
তারা জোয়ার-ভাটার খবর জাইন্যা
সন্ধানে তরী চালায় ॥
স্থুল হইতে হয় প্রবর্তের পাড়ি,
শ্রীগুরু তার কাণ্ডারী,
যে যেখানে যায়।
কেউ প্রবর্তে, কেউ সাধকে,
কেউ সিদ্ধিগঞ্জে নাও লাগায়।
প্রেমতলা হয় প্রেমের থানা,
লোভী কামুক যাইতে মানা,
সাধু বাইয়া বাইয়া যায় ;
যার নিতাইগঞ্জের চালান ভরা,
সহজ-প্রেমে বোঝাই করা,
সে কি ঠেকে দায়।
ও সে হাসতে হাসতে প্রেমতলাতে পৌঁছে যায়
আবার কেউ মদনগঞ্জের চালন ভইর্যা
শীতালক্ষায় নাও ডুবায় ॥
গোঁসাই বনমালী বলে,
মাঝির সঙ্গে প্রণয় হইলে
তবে পাওয়া যায়—
তখন মহাজনের ষোলআনা, এড়াবি নিকাশের দায় ॥

২৮৩

গুরু গো, সুজন নাইয়া,
ভবপারে লও আমারে বাইয়া।
আমার জীর্ণ তরী
নাই কাণ্ডারী,
হারে, তরী কে লবে আউগাইয়া ॥
ভবনদীর অকূল পাথার,
আমি ত জানি না সাঁতার,
ওগো, আমারে মাইর না চুবাইয়া ॥
তোমার নামেতে কলঙ্ক হবে,
গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,
যদি মরি হাবুডুবু খাইয়া ॥
ভবনদীর দুরন্ত ধার,
(আমার) দাঁড়িতে টানতে চায় না দাঁড় ষোল আনা খাইয়া।
ওগো, মন-মাঝি বড় পাজী,
গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,
আমারে যাইতে চায় ফালাইয়া ॥
আমার পুণ্যের সঞ্চয় কিছুই ত নাই
তরী যায় বুঝি তলাইয়া।
তুমি বিপদভঞ্জন মধুসূদন,
গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,
আমার পার কর হে, দয়াল গুরু,
আছি তোমার চরণপানে চাইয়া ॥
অধীন জলধর বলে, আমি বইসে রইলাম নদীর কূলে
দীনের দীন হইয়া।
তুমি আমার পারের কর্তা, গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,
হারে, তরী নেওনা কেন বাইয়া ॥

২৮৪

আগে তোর ষোল আনা করগা ঠিক।
নদীর তলে ফাঁদ পাইত্যা চান্দ ধরবি যদি অ রসিক॥
একদিন দুইদিন কইরারে মন পূর্ণিমাতে হওগা ঠিক।
সেই পূর্ণিমার চান্দ নদীর তলে লালজলে করে ঝিকমিক॥
গুরুর কাছে ভাববস্তু আছে, তার কাছে ডুব-সাঁতার শিখ।
সেই নদীর পারে গেলে পরে জ্ঞান হইয়া যায় দিক্‌-বিদিক॥
সেই নদীতে কাম-কুম্ভীর আছে, ধইরে খায় সব অরসিক,
যদি চান্দ ধরিতে কুমীরে খাইল, পাগলারে, তোর জীবনে ধিক।
পুলিন কয়, সে চান্দ ধরবা যদি সাধনেতে হওগা ঠিক॥

২৮৫

গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে,
চিনলি না তারে।
তুই ঘরে যাইয়া দেখলি না, রে,
কত রত্ন আছে স্তরে স্তরে,
চিনলি না তারে॥
মালভরা ধন সিন্ধুকেতে,
তারে চিন্যা ল' মন পরখ কইরে।
চাবি সে শ্রীরূপের হাতে,
তারে খুঁজলে পরে মিলবে চাবি
যদি ডুবতে পারিস ঐ রূপসাগরে॥
সহজ মানুষ আছে ঢাকা,
সাধন-বলে পাবি দেখা,
সে মানুষ ত্রিভঙ্গ বাঁকা,

মানুষ উল্টাকলে সদাই চলে
ত্রিবেণীতে উজান ধইরে।
চিনলি না তারে ॥
পুলিন কয়, গুরুর কৃপা না হইলে
ওরে সে মানুষ-রতন পাইবা কি কইরে ॥

২৮৬

গুরুধনের যে কারবারী,
তার কারবারেতে ভয় কি আছে।
সে যে পঞ্চরসের দোকান খুইল্যা
মহানন্দে বইস্যা আছে ॥
পাঁচ আনা, দশ আনা, কেউ ষোল আনা,—
যার যেমন ভাব, বস্তু কিন্যা
বইস্যাছে সে জনা,
আবার পঁচিশ আনা দিয়ে কেহ সর্বস্ব কিন্যা নিয়াছে ॥
সে যে গুরুবাক্য, চোথায় দর কষিয়ে
করে দায়-ধরা,
ও তার একবাক্যেতে বেচা-কেনা,
নাইকো অন্য ধারা।
সে যে এক অপূর্ব জিনিস
যত বেচে তত বাড়ত্যাছে ॥
ওরে ভাবের পাল্লাতে তুইল্যে
প্রেমের বাটখারা
নিষ্ঠা-দাঁড়ি ধইরে জিনিস
ওজন করে তারা।
প্রেমরসের হাটে বইস্যা তারা সদানন্দে ভাসত্যাছে ॥
কেনাবেচা করে তারা বিজাতীয়ের সনে
বি-জাতি জিনিস মিলে স্ব-জাতীয়ের স্থানে,

প্রেমরসের হাটে গিয়া তারা
প্রেমবৈচিত্র্যে মইজ্যাছে ॥
অধম রসিক বলে, মন রে, তুই কি করিলি এবার,
তোর যেমনি ধন তেমনি রইল, না কইরে কারবার।
কি যে জবাব দিবি, মন রে, যাইয়ে মহাজনের কাছে।

২৮৭

সাধন-ভজন মুখের কথা না,
আছে রসিকের কাছে জানা।
যে করে তার জানে জানে
অন্যে তাহা জানে না ॥
অনুরাগের বাদাম দিয়া নায়,
ঠিক করিয়ে বৈঠা ধর,
পাকে না যেন যায়,
মনা, পাকে না যেন যায়।
ধার চিনিয়ে নাও ধরিলে
বিপাকেতে পড়ে না ॥
দেহে আছে শ্রীগুরুর আসন,
আরোপ করে রূপ-নেহারে
আছে তার লক্ষণ।
রাগী উর্ধ্বরতি কামবিরোধী
বেদের বিধান মানে না ॥
গোঁসাই অনুকূলচান্দে কয়,
নিষ্কামী গোপীর ধর্ম,
জানিও রে নিশ্চয়,
রসিক জানিও নিশ্চয়।
গুরুরতি ঠিক না হইলে সাধন-ভজন হবে না ॥

২৮৮

সুজন কাণ্ডারী ধারে চিনা ল' মন ডান কি বাঁও।
মন-মাঝি, তুই ক্যামনে বা'বি পচা নাও॥
যে জন জাত-পাটনী হয়,
ও তার তুফানে কি ভয়,
মতে শতে ঢেউ কাটিয়ে
টের গলুইতে পায়॥
সে বাতাস বুইঝ্যা নৌকা ছাড়ে,
ভাটি ছাইড়্যা উজান ধরে,
বাইয়া যায় প্রেমপাথারে,
তার কি লাগুর পাওয়া যায়॥
ঐ নাও বাইচের নামে চলে উইড়ে,
আর আমার পচা নাও যে থাকে বুইড়ে,
সারানিশি তার জল ফালায়॥
আমার নাও হইয়াছে বুড়া,
ও নায়ে ভাইঙ্গ্যাছে গুঁরা,
অনেকদিন হইল বুড়া,
ভাই, পুরান মাস্তুলায়।
অধম ঈশান কয়, এই ঘোরতুফানে
আমি ক্যামনে চালাই পচা নাও॥

২৮৯

ঘরে রাইখ্যা পরম রতন, ও ভোলা মন,
মিছে কেন মরিস ঘুরে।
পরের তালে নাইচ্যা ফিরে,
কানা সাইজ্যা দিনতুপরে
দেখলি না তারে॥

ওরে হাতের কাছে পা'তি তারে,
চোখ মেইল্যা খুঁজলে পরে ॥
হা রে সুজনের সঙ্গ ধর,
গুরুধনের কারবার কর,
সদা গুরুর নাম স্মর,
ও তোর ষড় রিপু নফর হইয়া
মন যোগাবে জীবন ভ'রে ॥
অষ্ট পাশে পড়বি না বাধা,
ষোল আনা হইবে সাধা,
পিয় গুরুর নাম-সুধা,
ওরে কাম-কাঞ্চনের যত বাধা
সবই ক্রমে যাবে স'রে ॥
জীবন-মরণ থাকবে না জ্ঞান,
থাকবে না আর মান-অভিমান,
দীন গোপীনাথ কয়, দিন থাকতে এখন
ডুইব্যা থাক ঐ প্রেম-সাগরে ॥

২৯০

প্রেমপাথারে যে সাঁতারে
তার মরণের ভয় কি আছে।
জাতি-কুল, ভয়-লজ্জা তার সব গিয়াছে ॥
বিনা অনুরাগের ধর্ম
জানে না সে কোন কর্ম,
বেদ্‌বিধি, বিষয়, কর্ম
সব ছাড়্যাছে।
ও সে মানে শুধু রসরাজ রসিকের ধর্ম,
বৈধী-জ্বালা সব গিয়াছে।
ও তার ধর্ম-কর্ম সব ঘুচ্যাছে ॥

পাগল নয় সে পাগলপারা,
দু'নয়নে বহে ধারা,
যেমন সুরধুনীর ধারা—
ও তার ধারায় ধারা মিশে গেছে।
দীন গোপাল কয়, সে আপন-ভোলা
প্রেম-পাগলা
রসের সোঁতে ভাসতেছে ॥

২৯১

তরিতে সে কাম-সাগরে
রসিকে কি ভয় করে।
আছে যার করুণ-আঁটা
পার হইতে কিসের ল্যাঠা,
রসিক জনার বান্ধা বৈঠা
তরঙ্গে কি ছান্দ ছিঁড়ে ॥
প্রেম তারে যার মন বান্ধা
তার কি আছে কোন ধান্ধা,
কাম-উর্মিতে তার কি করে।
ঈশান কয়, প্রেমের জোরে
পার হইয়া যাও ওপারে,
মদন ঝড়-তুফান তুললে পরে
অমনি তরী তল করে ॥

২৯২

প্রেম করা হইল না।
মনের মানুষ খুঁইজ্যা পাইলাম না॥
মানুষ মানুষ অনেক আছে,
প্রেম কি মিলে যার তার কাছে,
মানুষ চিনে মানুষ-রতন
কখন মিলে না॥
ওরে গুরু যারে কৃপা করে,
তৈয়ার কইয়ে লয়, রে, তারে,
গুরু দয়া কইরে নাম রাখিল
রঙ্গ ধরাইল না॥
আছে আমার কামের গন্ধ,
কিসে প্রেমের হয় সম্বন্ধ
রসিকের সঙ্গ বিনে
গন্ধ যাবে না।
ওরে সেই মানুষের সঙ্গ পাইলে
হইতাম রে সোনা॥
অম্বিকায় কয় মনের ভাবে,
প্রেম করিয়া ভাবে ভাবে,
গুরুর কাছে যাইয়া প্রেমের
রীতি শিখ না।
মানুষ ধরতে পারলে করতে পারবা
প্রেম-সাধনা॥

২৯৩

গুরু, তোমার চরণ পাব বইল্যে
বড় আশা ছিল।
আশা-নদীর কূলে বইস্যে
আমার আশায় আশায় জনম গেল,
আশা না পূরিল॥
আশাবৃক্ষ রোপণ কইরে
আমি বইস্যে রইলাম বৃক্ষতলে
ফল ফলবে বইল্যে।
ফল না ফলিতে বৃক্ষে
বৃক্ষের ডাল ভাইঙ্গা গেল,
আশা না পূরিল॥
চাতক রইল মেঘের আশে
মেঘ বইয়া যায় অন্য দেশে
চাতক বাঁচে কিসে।
জল বিনে চাতক মইল—
আমার তেমনি দশা হইল
আমার আশা না পূরিল॥

২৯৪

আরে, মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা রে
তরী ভাইটায় সই আর উজায় না॥
ওরে, জাঙ্গী রসি যতই কষি,
ওরে হাইলেতে জল মানে না।
আমার নায়ের তলী খসা, গুরা ভাঙ্গা রে,
নাও গাবগায়ানি মানে না॥

২৯৫

ধরবি যদি অধর মানুষ ধরাকে ধররে মন।
মনফুলে নয়নজলে পূজগে মানুষের শ্রীচরণ ॥
ধরার কাছে আছে ধরা,
সেই মানুষটি জ্যান্তে মরা,
মরার সঙ্গে হইয়ে মরা
খোঁজে যে বা জন।
হিংসা-নিন্দা-তমো যাবে,
তবে দেহ শুদ্ধ হবে,
তবে সে ফল হাতে পাবে,
অধর ধরার এই লক্ষণ ॥
আপন দিল-দরিয়ায় বুঝ,
বুইঝ্যা প্রেমরসে মজ,
তবে হবে ধরার খোঁজ,
হবে উদ্দীপন।
চৈতন্যকে রাইখ্যা খাড়া
হুঁসার হ'য়ে দেও পাহারা,
ঠিক রাখ তুই নয়নতারা,
সহজভাবে কয় মদন ॥
শুদ্ধভাবে নিষ্ঠা কইরা
থাক রে মন চাতক হইয়া
নবঘন-বারি পাইলে
শান্ত হবে রে ততক্ষণ ॥

এই গানটির একটি পরিবর্তিত পাঠ নরসিংদি হইতে সংগৃহীত গানের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৭নং গান দ্রষ্টব্য।

শিলাইদহের বাউল-গুরু গোসাই গোপাল

পূর্বাশ্রমের নাম রামগোপাল জোয়ারদার

[দ্বিতীয় খণ্ড : পৃঃ ২৪১]

গোঁসাই গোপাল

[লালনের তিরোধানের পর কুষ্টিয়া অঞ্চলে বাউল-মতাবলম্বী একজন রসিক বৈষ্ণব সাধকের উদ্ভব হয়। ইনি শিলাইদহের গোঁসাই গোপাল। ইঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম রামগোপাল জোয়ারদার। শেষ জীবনে এই অঞ্চলে ইনি একজন সাধক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গোঁসাই গোপালের পুত্র শ্রীরাজকুমার জোয়ারদার মহাশয়ের অশেষ সৌজন্যে তাঁহার পিতার কতকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। শিলাইদহের সুসাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী গানগুলি জোয়ারদার মহাশয়ের নিকট হইতে আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ সঙ্গে রচয়িতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখিয়া দিয়াছেন।

গোঁসাই গোপালের কতকগুলি গান পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাউলের মুখে বহুবার গীত হইতে শুনিয়াছি।

শচীনবাবু-প্রেরিত জীবনী হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

"সাধক রামগোপাল জোয়ারদার শিলাইদহ গ্রামে সন ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা গঙ্গাস্নানের শুভদিনে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামলাল জোয়ারদার এবং মাতার নাম মনোমোহিনী দেবী। রামলাল পরম বৈষ্ণব, উদারহৃদয় ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রামগোপাল পিতার সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং যৌবনকাল হইতেই সাধন-পথের পথিক ছিলেন।...

রামগোপাল বাল্যে সাধারণ বাংলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।...তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং সংগীতে লোকচিত্ত মুগ্ধ করিতে পারিতেন।... রামগোপালের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাব প্রবল হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে অধিকাংশ সময় হরিনাম-গানে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা এই অল্প বয়সেই বৈরাগ্য-লক্ষণ দেখিয়া পুত্রকে বিবাহ দিলেন। ...রামগোপাল কিছুকাল সাংসারিক জীবন যাপন করিয়া...হঠাৎ অত্যন্ত উদাসীন হইয়া সংসার-পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন।... বহু চেষ্টাতেও রামগোপালকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারা গেল না।...তিনি অবশেষে নির্জন সাধক-জীবন যাপন করিবার মানসে বসতবাটীর পূর্বদিকে জল-বেষ্টিত উচ্চ

ভূমিতে রমণীয় আশ্রম নির্মাণ করিয়া সেস্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং ধ্যান-ধারণা ও আনন্দ-কীর্তনে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বহু স্থান হইতে বহু ধর্মপিপাসু ব্যক্তি তাঁহার আশ্রমে সমাগত হইতে লাগিল। এই সময় পাঁচু ক্ষেপা নামক একজন ত্যাগী ভক্ত তাঁহার আশ্রমে আসিয়া অপূর্ব উপদেশ লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।…পাঁচু ক্ষেপাই তাঁহার গুরুর রচিত সুমধুর সংগীত বহুস্থানে প্রচার করিয়া নিরক্ষর লোকদের নিকট তাঁহার গুরুদেবের উদার ধর্মমত সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। পাঁচু ক্ষেপা নিজেও তত্ত্ববিষয়ক বহু সংগীত রচনা করিয়াছিলেন।…

সাধক রামগোপাল বৈষ্ণব মতানুযায়ী গোপীভাবের ভজন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া স্বয়ং একনিষ্ঠভাবে মাধুর্য-রস আস্বাদন করিতেন এবং তাঁহার ভক্তগণকেও ঐভাবে গড়িয়া তুলিতেন। বৈষ্ণব ধর্মের গোড়ামি তাঁহাকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারে নাই।…তিনি হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে ধর্ম উপদেশ দিতেন। জাতিভেদ প্রথার তিনি বিরোধী ছিলেন; সেই কারণে সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার ধর্মমত শ্রবণ করিতেন ও গান শুনিতেন।…

বহু অনাথ-আতুর তাঁহার আশ্রমে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিত। তাহাদের ব্যাধি-নিবারণের জন্য অনেক সময় তিনি আশ্চর্যজনক কাজ করিয়া দৈবভাবে রোগ নিরাময় করিয়া দিতেন।

তিনি তাঁহার মৃত্যুর একমাস পূর্বে তাঁহার তিরোভাবের তারিখ ও সময় নির্দেশ করিয়া ভক্তগণকে প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সন ১৩১৯ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ৺স্নানযাত্রার শুভক্ষণে সজ্ঞানে মহাপ্রয়াণ করেন।"

গোঁসাই গোপাল তাঁহার পিতা রামলালকেই গুরু বলিয়া গানে উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়।]

২৯৬

আমি বলি তোরে ও মন, গুরুর পদে রেখো স্মরণ।
যখন ত্রিবেণী শুখাবে, মীন পালাবে
ধরবে তোমায় এসে শমন॥

মায়াতে মত্ত হ'লে, গুরুবস্তু না চিনিলে,
সত্যপথ হারাইলে, সব খোয়ালে গুরুতত্ত্ব ভুলে;
দেখ, তোর দিনে দিনে দিন গত হ'ল,
অলস চেপে এল;
যদি ধরবি শশী কাটাবি ফাঁসি,
মহারাগে কর সাধন॥

ত্রিবেণীর ত্রয়োধারে, মীনরূপে গুরু বিরাজ করে,
কেমন করে ধরবে তারে, পড়বে ফেরে,
ভেবে দেখলে না রে,
সামান্যে কি সাধ্য আছে, সে মীন ধরতে পারে।
নদীতে হচ্ছে জোয়ার, খুব খব্বরদার
বেহুঁশারীর হবে মরণ॥

মহতের সঙ্গ ধর, কামের ঘরে কপাট মার,
রসিকের করণ কর, মানুষ ধর, মরার আগে মর,
গোঁসাই রামলাল বলে মিছে কেন ঘোর,
গোপাল বলে মোর কপালে
কতদিনে মিলবে চরণ॥

২৯৭

সকলে সাধ্য-সাধন বলে,
সে কি মুখের কথায় মেলে।
যে জনা সাধন করে, সেই ত পারে,
পারে না অনুরাগ না হইলে॥

সে ত নয় মুখের কথা,
আছে যার ভক্তি গাঁথা,
লাগে যার হৃদয়ে ব্যথা,
মনের কথা সেই করে সাধনা।
ইন্দ্রিয়-বারি শাসন ক'রে
থাকে জোয়ার ধ'রে,
এবার ভাটির সময় খুব হুঁশিয়ারে
থাকতে হবে বাতি জ্বেলে।

রূপ-রতি আশ্রয় কর,
মহারাগে বারি ধর,
অসাধ্যকে সাধ্য কর,
নিরিখ ধর,
তবে যাবে পারে ;
এবার দম রেখে আরোপের ঘরে,
থাক এক নেহারে,
যদি টলবে নয়ন, হবে মরণ,
আছে তার ঠিকানা দশম দলে॥

নবদ্বারে কপাট মার,
স্বরূপ-সঙ্গে খেলা কর,
তিন রসের ওলা ধর,
তবে মানুষ ধর ;
এবার আগম-নিগম না জানিলে
ধরবে কেমন ক'রে।
রাগের ঘরে গোপাল বলে কাজের কাজী না হইলে।

২৭৮

বিরজার প্রেম নদীতে যে জন ডুবেছে।
(ও সে) অটল মানুষ-রতন পেয়েছে ॥

সাধারণী আর সমঞ্জসা,
সমর্থা প্রেম কুটিল বড়,
নাই তার ভরসা ;
ইহার তিন মানুষের করিলে আশা,
হবে তার নিরাশা।
জেনে লও এক মানুষ বসে আছে ॥

ভাবের মানুষ রয়েছে তিন জন,
প্রেমের মানুষ ছয়জন খেলে শুন বিবরণ।
উল্টা কলে যে চলে উজান
জেন সেই ত আপন,
রস পাবি তুই তার কাছে ॥

ত্রিবেণী হয় নাভি-কমলে,
তাহার মধ্যে ডুবতে পারলে
অধর চাঁদ মেলে ;
গোঁসাই রামলাল এসব ভেবে বলে,
যেন যাসনে ভুলে গোপাল,
তোর দেহের মধ্যে সব আছে

২৯৯

কোন্‌খানে চন্দ্রের বসতি।
কোন্‌ পাকে রজনী ঘোরে, কোন্‌ পাকে হয় দিনের গতি ॥

পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ জানে সর্বজন,
অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ কে করে তার অন্বেষণ,
চার চন্দ্রের নিরূপণ, জানগা মন তার বিবরণ,
জানলে পরে জীব দেহেতে ঘুচে যেত কুমতি ॥

উদয়-অস্ত চন্দ্রের কর্ম জানিবে ভবে,
দীপ্ত চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র উদয় হইবে তবে;
দুই পক্ষে একটি হয়, তার নাম যুগল কয়,
আধ চন্দ্র গুপ্ত মেয়ে ব্রহ্মমূলে তার পতি ॥

অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র যে করে উদয়
স্বর্গ-মর্ত-পাতালে তিন ধামেতে হবে জয়,
সামান্যের কর্ম নয়, সাধিলে সিদ্ধ হয়;
এবার গোঁসাই রামলাল বলে,
গোপাল, দেখতে পাবি তার জ্যোতি ॥

৩০০

দমের মানুষ দমে চলে,
আলেক মানুষ আলের উপর।
আর এক মানুষ গোপনে রয়,
জেনে শুনে সাধন কর ॥

তিন মানুষের খেলা রে মন,
কারে বা কর অন্বেষণ,
তিন মানুষের তিন রূপ করণ,
সদ্‌গুরু, মন, আগে ধর ॥

জন্মদ্বার আর মৃত্যুর দ্বারে
আর এক দ্বার আর কইব কারে ;
মৃত্যুর দ্বারে যে জন্মাইতে পারে,
তার সাধন হবে অমর ॥

তিন রতিতে তিন জনে রয়,
আধরতি 'মা' গোপনে বয়,
গোঁসাই রামলাল যথার্থ কয়,
গোপাল, মরার আগে [illegible] ন্ত মর ॥

এরফান শাহ্

[এরফান শাহ্ পশ্চিমবঙ্গের একজন বিখ্যাত ফকির। ২৪পরগণার বারাসত মহকুমায় তাঁহার বাড়ী ছিল। বারাসত ও বশীরহাট মহকুমার অনেক ফকির তাঁহার শিষ্য।

গানগুলি বারাসত মহকুমার আপালসিদ্ধি-জিরেট গ্রামের পাহাড় শাহ্ ফকির কর্তৃক প্রদত্ত।]

৩০১

দ্বিদলে হয় বারামখানা।
চতুর্দলে সাঁই বিরাজ করে, মৃণালে হয় সদর থানা॥

দ্বাদশ দল ঐ হৃদ্‌মন্দিরে,
অষ্টদল মানুষের সরোবরে,
ষোলদলে কথা বলে,
ডাকলে অমনি যায় গো শুনা॥

গুরুমুখের পদ্মবাক্য
হৃদয়ে করো না ঐক্য,
তবে আত্মা হবে শুদ্ধ,
পূরবে মনেরো বাসনা॥

চাঁদ-চকোরে যুগল খেলে,
নীরের সঙ্গে নূর চলে,
শাহা এরফান বলে, লালপদ্ম
পেলে ভজলে হবে কাঁচাসোনা॥

৩০২

ভিয়ান করলে সুধা হয়।
রস-মৈথোনে যুগলকলে প্রাপ্তি বস্তু বয়॥

মতি আছে সুমধুরে, চোয়াইয়ে ধর তারে,
ভক্তি দিলে ভক্তের দ্বারে রতন পাওয়া যায়॥

সুধা আছে চন্দ্রমূলে, মধুর সুধা আছে ফুলে,
গুরুর কাছে চেতন হ'লে সিদ্ধ হয় সেবায়॥

এরফান শাহার এই বাণী, ফলে ফুলে গুণমণি,
এবার ছু'য়ে মেশাইলে দিবে পরিচয়॥

৩০৩

ও কেউ দেখবি যদি সহজ মানুষ, রূপের ঘরে যাও।
আছে নাছুত, মালকুত, জারুত, লাহুত—চার মোকামে চাও॥

সহজ মানুষের ধারা,
ধারা ধরতে হবে জেন্তে-মরা, পাগল-পারা,
তায় ধরতে গেলে স'রে প'ড়ে নয়ন মুদে রও॥

মানুষের বারাম দ্বিদলে,
আকর্ষণে হেলেদুলে নিঃশব্দে চলে,
আছে চতুর্দলে লীলাখেলা, গুরুমুখে লও॥

ওরে এরফান আলি,
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায়,
মন, তোরে বলি,
এবার সহজ মানুষ দীপ্ত ক'রে সিদ্ধ হ'য়ে যাও॥

চণ্ডীদাস গোঁসাই

[চণ্ডীদাস গোঁসাই নবদ্বীপের বনচারী বাগানের চণ্ডীদাস-রজকিনী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। যশোহর জেলার কামারহাটি গ্রামে তাঁহার আদিনিবাস ছিল। তিনি ছিলেন জাতিতে নমঃশূদ্র (কাপালি)। নবদ্বীপে তিনি ৪০ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১৩৩১ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স নাকি ১৫১ বৎসর হইয়াছিল।

চণ্ডীদাসের শিষ্য ৯৭ বৎসর-বয়স্ক নবদ্বীপবাসী সনাতন দাস আমাকে চণ্ডীদাস গোঁসাই-এর অনেকগুলি গান ও তাঁহার নিজের রচিত কতকগুলি গান দিয়াছেন এবং নবদ্বীপে তাঁহার বাড়ীতে আমাকে বিশেষ আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া সপ্তাহব্যাপী বাউল মতবাদ ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক গূঢ় তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশের যোগ্য নয়।]

৩০৪

সাধন করলে জানা যায়, কথা মিথ্যা নয়।
তুই গাছে এক ফল ধরেছে, রয়েছে ফল তু'সীমানায় ॥

সাধুসঙ্গ না হইলে, প্রাপ্তিধন যায় রসাতলে,
গুরুত্যাগী তাকেই বলে, ওরে মূঢ় মন।
দিব্যচক্ষু না হইলে, বৃথা তার সাধন।
অনুরাগী হ'লে পরে, সাধন সন্ধান জানতে পায় ॥

তু'জনা ক'রে বর্তমান, গুরুকে ফল করেছে দান,
যে জানে ইহারি সন্ধান, সে ত সচেতন ;
লভ্য কর্ম হাত মেরে, সে পুরুষ ধন্য।
তমোরে তামা দেখায়ে, কূপ-জলেতে নাহি যায় ॥

হুজুরেতে আমীন এসে, সীমানা বেন্ধেছে কষে ;
আলির কোন পায়না দিশে, দখল লিখি কার,
প্রজাগণ পেলাম না হাজির, জমিদার অধর।
চিঠে-পোটের ঠিক হ'ল না, সেই একটা তো আছে রে ভয় ॥

সত্ত্ব, রজ, তম প্রজা, সহজ মানুষ হোলো রাজা—
সেই একটি মজার কথা, এক মানুষে তিন ;
কাঙ্গাল চণ্ডীদাসে বলে, কারে ভাববো ভিন।
ঘরের মধ্যে ঘর বসায়ে বসতি করে সেই তিন জনায় ॥

৩০৫

যোগ্যপাত্র না হইলে সাধন হবে না।
সিংহের দুগ্ধ স্বর্ণপাত্র বিনে সে ধন তো রবে না ॥

পাত্র শোধন না হইলে, কথায় কি সে রতন মেলে।
প্রেমের প্রেমিক না হইলে দিবে না ধরা,
অধর ধরা, যায় না ধরা, না হলে মরা,
মরার সন্ধান যে জেনেছে,
তার কি পারের ভয়-ভাবনা ॥

অনুরাগী হয় যে জনা, জেনে নেয় সে উপাসনা,
কিসে হয় সব লেনা-দেনা, বুঝিবে করণ।
তবে হবে দিব্যচক্ষু, দীপ্তময় তখন।
সদর ঘরের সদর মানুষ, দেখতে পাবি তাই দু'জনা ॥

দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, ইহার পরে আছে গুরু,
সেই গুরু কল্পতরু, রাগেরি আশ্রয়।
আর যত আছে গুরু পথের পরিচয়।
তিমির অন্ধ বিনাশিলে নিজগুরু যায় তা চিনা ॥

চৌষট্টি রস রাগের করণ,
চব্বিশ ভেঙে নয়তে মিলন ;
সপ্তম ভেঙে পঞ্চম সাধন, তিন রস নিরূপণ।
কোন্ রস কখন উজান চলে কর উদ্দীপন,
কোন্ রসে কোন্ রতি খেলে, চণ্ডী বলে দেখে নে না ॥

৩০৬

অনুরাগ বিহনে সে মানুষ না যায় ধরা।
দেখ সাধ্যসাধন, কৃষ্ণভজন, করেছে রসিক যারা॥

যে জন অনুরাগী হয়, রাগে ডুবে রয়।
রাগ ধরে সে রাগী জনা, রাগের কথা কয়।
মনের অনুরাগে ফেরে সদা ঠিক রেখে নয়ন-তারা॥

অনুরাগে যুত ক'ষে রয়েছে বসে,
আজবলীলা দেখতে পায় সে এক ঠাঁই বসে।
যত কাম-কামনা দূর করিয়ে হয় যেন জ্যান্তে মরা॥

ও সে অধরের গোরা, যোগে যায় ধরা।
যোগ ফুরালে নিত্য মানুষ হবি রে হারা।
ও সে যোগের ঘাটে থাকলে বসে, তবে হয় করম সারা॥

গোঁসাই মদন কয় হেসে, কঠিন কথা সে,
অধর ধরা জ্যান্তে মরা হ'তে হয় শেষে।
ওরে চণ্ডী ভেড়ো, করগে দৃঢ়, স্বরূপে বিশ্বাস করা॥

৩০৭

মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে নাও তারে।
নিগমেতে আছে মানুষ, যোগেতে বারাম ফেরে॥

শুদ্ধ শান্ত রসিক হ'লে, ধরা যায় সে নেহার দিলে,
সেই নেহারে গোল বাধালে, এসে মানুষ যায় ফিরে॥

কত জন পার হব ব'লে চলে যায় সে নদীর কূলে।
হঠাৎ গিয়ে নামিলে জলে, ধরে খায় কাম-কুম্ভীরে॥

মনে প্রাণে কর আর্তি, গ্রহণ করো কাম-গায়ত্রী।
শিক্ষাগুরুর পদে ভক্তি, নৈলে কি পাবি তারে॥

গোসাই মদনচাঁদের উক্তি, কর সাধন ছুঁসনে প্রকৃতি।
তবে হবে ব্রজ-প্রাপ্তি, চণ্ডী কালা, কই তোরে॥

৩০৮

জগদ্‌গুরু এ কারু নয়, চিনতে পারলে হয়।
যায় না চেনা, ঐ ভাবনা, ভাবিলে কত ভাব উদয়॥

আসে যায়, ক্ষয় করে জীবন,
জীবনের ধন সেই জীবন।
তা বিনে কি রহে জীবন, জীবনে সে জীবন বয়॥

বায়ু হংস-রূপে চরে, মানব দেহ-সরোবরে।
সে যারে দয়া করে, দিব্য চক্ষে দেখতে পায়॥

গুরু গুরু বলো যারে, সে রয়েছে আলের 'পরে
আহ্লাদিনী আলে ঘোরে, দীপ্ত করে জগৎময়॥

গোঁসাই মদনচাঁদে ভণে, শ্রীগুরু কাণ্ডারী বিনে,
কে তরিবে সে তুফানে, চণ্ডী, তাই বল আমায়॥

৩০৯

আপন জুতে না পাকিলে কি, গাছ-পাকা ফল মিঠা হয়।
কিলিয়ে পাকালে কাঁঠাল, সুমিষ্ট সে কভু নয়॥

কতক গেল ঝড়ে প'ড়ে, কতক গেল রৌদ্রে পুড়ে,
কতক গেল শিলে ঝ'রে, দুই একটা তো রয়ে যায়॥

যে ফল গাছে থেকে পাকে
বিপদ নাই তার কোন পাকে।
ঝড়ি-ঝটকা নাহি লাগে, গুরুকৃপা তারেই কয় ॥

গুরু সেবায় লাগবে বলে, ধাক্কাধাক্কি কতই খেলে,
তেমনি মত থেকে গেলে, গুরুশিষ্য পরিচয় ॥

গোঁসাই গুরুচাঁদে ভণে, সাধনবিহীন ঘটলে কেনে
চণ্ডী, ভেবে দেখ মনে, ঠিকের ঘরে চুরি যায় ॥

৩১০

ভাবের ঘরে যে বাস করে গো,
তার কাছে করণ সারা।
ভাব না জেনে সাধন করে গো,
সে পাবে না অধরা ॥

সহজ প্রেমের রসিক যারা,
শুষায় শোষে বাণ ছাড়ে না ;
সেই প্রেমেরি সন্ধি জানা,
যায় না ডুবিলে।
ধন্য গুরুর কৃপাবলে,
হুঁশিয়ারি প্রেম-টাকশালে,
মোক্ষফলের ভক্ষণ-বলে, জয়ী হৈতে পারে তারা ॥

আপন দেল-দরিয়ায় বুঝ,
বুঝে ভাব, প্রেমরসে মজ,
তবে পাবি মানুসের খোঁজ, হবে উদ্দীপন।
চৈতন্যকে রেখে সজাগ, হুঁশিয়ারি দাও পাহারা।
ওরে তবে যাবে মানুষ ধরা, ঠিক রেখ নয়নতারা ॥

গোঁসাই মদনচাঁদে বলে,
মানুষের মধ্যে খেলে,
সেই মানুষের সঙ্গ পেলে,
হবে চক্ষুদান।
বলবো কি তাই, চণ্ডী, তোরে,
কত মজা এ সংসারে,
ওরে দেখ্‌তে পাবে জনম ভরে,
গুরুনিষ্ঠ হয় যারা॥

৩১১

মানব-দেহেতে, কি মতে, অধঃ-উর্দ্ধে দু'টি পদ্ম হয়।
শুনি ভানু-সংযোগেতে পদ্ম, প্রস্থান হ'লে মুদিত রয়॥

ও সে কোন্ পদ্মে হয় কৃষ্ণপক্ষ,
বল কোন্ পদ্মে হয় শুক্লপক্ষ,
আবার কোন্ পদ্মে হয় পূর্ণ মোক্ষ,
তাই ভেঙ্গে বল আমায়॥

বল কোন্ পদ্মে হয় আসা-যাওয়া,
বল কোন্ পদ্মে হয় দিয়া-নিয়া,
বল কোন্ পদ্মে হয় খাসা মেওয়া,
কোন্ পদ্মেতে স্বরূপ রয়॥

বল কোন্ পদ্মে পাত্র হয় দীক্ষে,
বল কোন্ পদ্মে পাত্রী হয় শিক্ষে,
আর কোন্ পদ্মেতে দিব্যচক্ষে, দীক্ষা-শিক্ষা জানা যায়॥

কাঙ্গাল চণ্ডীদাসের এই মিনতি,
ওগো সাধু গুরু সবার প্রতি,
আমি মূঢ়মতি, নাই শক্তি, কি দিব আর পরিচয়॥

৩১২

কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম, বুঝে উঠা হ'ল ভার
বুঝিবে রসিক জনা, অরসিক কি বুঝিবে তার ॥

প্রেমের জন্ম হয় যে জলে,
সেই জলেতে সাঁতার দিলে,
সাঁতার না শিখিয়ে গেলে,
মরণ হবে নদীর মাঝার ॥

জোরে-জারে নামিলে জলে,
সে যাইবে রসাতলে ;
গুরুত্যাগী তাই রে বলে
ভঙ্গ রতি হইবে যার ॥

চণ্ডী বলে দৈন্যভাবে,
যাস্ না জলে মরবি ডুবে ;
গুরুবাক্য যে জন লবে,
সে জন নদী হইবে পার ॥

ময়মনসিংহ হইতে সংগৃহীত গান

[ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমা হইতে জনৈক ছাত্র কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গান তিনটি গ্রহণ করা হইল]

৩১৩

মনের মানুষ পাইলাম না, মনে মনে ভাবছি গো তাই।
মনের দুখ্‌খু মনে রইল, মনে মনে ভাবছি তাই॥

বন পোড়া যায় সবেই দেখে,
আমার মনের আগুন কেউ না দেখে ;
আমি কার ছায়াতে প্রাণ জুড়াই॥

কি সাধনে পাইব তারে
যে আমার জীবনের ধন রে,
আমি সেই আশাতে ঘুরে বেড়াই।
দরগা-মসজিদ সব ঘুইরাছি,
মোল্লা-মুনসী সব জিগাইছি,
আমি কোন্‌খানে তারে বা পাই॥

মিঞাজান ফকিরে কয়,
তোর ঘরের কোণায় বন্ধে রয়,
তুই হয়ে দিনের কাণা
রাত-দেওয়ানা
দেখলি না রে তাই।
মনের দুখ্‌খু মনে রইল, মনে মনে ভাবছি তাই॥

৩১৪

সরলে গরল মিশে না, সরল ভাবে আছে যে জনা,
সর্প্পের মাথায় ব্যাঙ্গা নাচে, তবু সর্পে আহার করে না।
বুঝি সর্প্পের ওঝা আছে, তাই জন্মে মাথা তুলে না,
সরলে গরল মিশে না, সরলভাবে আছে যে জনা॥

পদ্মপাতায় পানি-ফুটি টলমল, পদ্ম ভিজেনা,
তার সাক্ষী আছে দধির ভাণ্ড, উপরে ভাসে ননী-ছানা।
ফকির মিঞাজানে কয়, সরল পথে থাকলে মানুষ
ধইরবা রে মনা।
সরলে গরল মিশেনা, সরল পথে রয় যে জনা,
সহজ পথে রয় যে জনা॥

৩১৫

দিয়া মাটি পরিপাটি, আগুন, জল আর হাওয়ার ভরে
গাড়ী চলছে আজব কলে॥
আবার হাওয়ার কল বন্ধ হবে,
ইঞ্জিন কল ছুইট্টা যাবে,
চড়নদার চইল্যা যাবে,
তখন চারজনায় কান্ধে কইরা
নিয়ে যাবে গোরস্থলে।
গাড়ী চলছে আজব কলে॥

ইঞ্জিলের ভিতর
চলছে কি আজব লহর,
তারেতে আনে খবর,
কি চমৎকার নীলে।

ষোলজন দিচ্ছে পাহারা সেই ঘরেতে মিলে,
মহারাণী কুণ্ডলিনী বিরাজ করে চতুর্দলে।
গাড়ী চলছে আজব কলে ॥

শিয়ালদহের ইষ্টিশনে
আছে কল মহাজনের,
চালায় কল রাত্রিদিনে,
আট কোঠারা, নয় দরজা, সদাই হওয়া খেলে,
বারামখানায় জ্বলছে বাত্তি, আলো হইল রঙমহলে।
গাড়ী চলছে আজব কলে ॥

গাড়ীর খবর জানতে হ'লে,
রাখ মুরশীদের চরণ দেলে,
আফসার ফকির কাইন্দা বলে,
গাড়ী চলছে আজব কলে ॥

অনন্ত গোঁসাই

[অনন্তের দীর্ঘ কয়েকটি গান বাংলার বাউল-মহলে বিশেষ পরিচিত। অনন্ত কোথাকার লোক, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে রচনা-রীতি ও দীর্ঘ সাঙ্গরূপক ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয়, ইনি খুব সম্ভব রাঢ়ের বাউল]

৩১৬

কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিকর,
তার কারিকুরির বলিহারী,
সেই কারিকরের কোথায় ঘর,
ধন্য কারিকর ॥

ঘরের মূল তিনটি খুঁটি,
কি পরিপাটি,
দড়ি-দড়া, বাঁধাছাঁদা সাড়ে তিন কোটি,
ঘরের দরজা নয়খান,
সকলি প্রমাণ,
অসংখ্য জানালা আছে, কে করে সন্ধান,
সে ঘরের মাপ চৌদ্দপোয়া,
চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর ॥

ঘর বেশ আঁটাসাঁটা, ছ'-তালা কোঠা,
তার উপরে আর এক তালা নাম মণিকোঠা,
সেথা দিবানিশি মণি জ্বলে,
কর্তা আছেন তার ভিতর ॥

ঘরের প্রাচীর সপ্তপুর, তার মধ্যে অন্তঃপুর,
যে সন্ধানী সে যেতে পারে, অন্যের পক্ষে দূর,
সেথা লাগবে ধাঁধা, চাকা চাঁদা,
প্রবেশ করা কষ্টকর ॥
(ধন্য কারিকর)

এক ঘরে কত কারখানা, ঘর বালাখানা,
ঘরের ভিতর বৈঠকখানা, আর তোষাখানা,
আছে ফুলের বাগান, হাওয়াখানা,
মধ্যে দিব্য সরোবর ॥

মিস্তিরির এমনি কৌশল, তার ধন্য বুদ্ধিবল,
ঘর চল বলিলে আপনি চলে, এমনি ধারা কল,
ঘরের কখন কি ঘটে অবস্থা,
কভু স্থাবর, কভু অস্থাবর ॥

একথা মিথ্যা কভু নয়, ঘরের মাটি কথা কয়,
ঘরের ভিতর আগুন-জলে এক মিশালে বয়,
সেথা সাধু-চোরে, রাক্ষস-নরে বিষামৃতে একত্তর ॥
(ধন্য কারিকর)

অনন্ত ভাবছে বসে তাই, ঘরের অন্ত কিসে পাই,
ঘরে থেকে কর্তার সঙ্গে আলাপ হ'ল কই,
কেবল দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই
না জেনে ঘরের খবর ॥

৩১৭

মন, চল যাই ভ্রমণে কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে,
সেথা গেলে প্রাণ জুড়াবে
মন্দ মন্দ আনন্দ-সমীরণে ॥

সেই ব'গানে নিত্য ফোটে পাঁচ রকমের ফুল,
তার সৌরভে প্রাণ মুগ্ধ করে
গৌরবে অতুল,
ও সে প্রাণ-মন ব্যাকুল করে রে
অপূর্ব তার সুঘ্রাণে ॥

সেই বাগানে আছে দু'জনা মালী,
তাদের একজন উড়ে, একজন বাঙালী,
তারা বাগান চষে, খুঁড়ে, নাড়ে চাড়ে,
গাছ বাড়ে তাদের যতনে ॥

সেই বাগানে আছে চতুর্দিকে বেড়া,
আছে গাছ আসমানে খাড়া,
খুঁজে তার মেলেনা গোড়া,
কত দেব-দেবতা আছে খাড়া
প্রবেশ করবার সন্ধানে ॥

বাগানের মধ্যে সরসী,
তার সুধাতুল্য জলরাশি,
সেই স্বচ্ছ জলে, সদা খেলে
হংস আর হংসী,
ওরে কোটি জন্মের পিপাসা যায়
তার একবিন্দু জল-পানে ॥

সেই বাগানে ফলে মেওয়া ফল,
তার কাছে তুচ্ছ চারি ফল,
সে ফল যে খেয়েছে, সেই মজেছে
হয়েছে পাগল।
তার জন্ম সফল, কর্ম সফল,
ফলের সন্ধান সেই জানে ॥

গোঁসাই তাই বলছেন অন্তরে,
শোন অনন্ত রে,
সেই বাগান আছে কোটি জন্মের অন্তরে,
সেথা যাবি যদি সকাম নদী
পার হবি বল কেমনে ॥

৩১৮

ওগো, সুখের ধান ভানা—
ধনি, এমন ব্যবসা ছেড় না।
কর কৃষ্ণপ্রেমের ভানা-কুটা, কষ্ট তোমার থাকবে না ॥

তোমার দেহ-ঢেঁকশালে, অনুরাগের ঢেঁকি বসালে,
ভজন-সাধন পাড়ুই দুটো দুদিকে দিলে,
আবার নিষ্ঠা আঁশকল লাগালে,
ঢেঁকি চলবে, ও সে টলবে না ॥
ওগো সুখের ধানভানা ॥

রাগ বৈধী দুজন ভানুনী,
তাদের নাম কৃষ্ণ-মোহিনী,
তাদের একজন সদ্‌গোপের মেয়ে, একজন তেলেনী,
তারা ধান ভানে ভাল, জানে ভাল,
তাদের গায়ে সোনার গহনা ॥

ঘরে বৃদ্ধা শ্রদ্ধা সেকেলে গিন্নি,
শুদ্ধমতি শুদ্ধরতি কুলো-চালুনি,
এবার কাম-কামনা ছেড়ে, ঝেড়ে ঝুড়ে
তুষ-কুঁড়ো চেলে লওনা ॥

রাগ-বিবেকের মূষল-আঘাতে,
বাসনা-তুষ তোমার যাবে ছেড়ে
পাড় দিতে দিতে,
চাল উঠবে সেঁটে, বিকার কেটে,
ঠিক যেন মিছরিদানা ॥

শ্রীগুরু শ্রীমহাজনের ধান, তাতে হবে রে সাবধান,
ষোলআনা বজায় রেখে করবে সমাধান,
তুমি লাভে লাভে কাল কাটাবে,
আসল যেন ভেঙ্গ না ॥

গোঁসাই বলে, অনন্ত, তুই ধান ভানতে জানিস না,
ও তোর ঘটবে যন্ত্রণা,
পাপ-ঢেঁকি তোর মাথা নাড়ে গড়ে পড়ে না,
দেখিস যেন বেহুঁশারে হাতে ঢেকি ফেলিস না ॥

৩১৯

ওরে মন, জানব তুমি কেমন গড়নদার,
কেমন স্বর্ণকার।
ওরে গড়ে দে তুই উপাসনার সোনার অলংকার ॥
নিষ্ঠা-নিক্তিতে ধরে সোনা জমা নে ওজন ক'রে,
দেনা-পাওনা যোলআনা সূক্ষ্মের উপরে।
ছেড়ে খুঁটি-নাটি, ময়লা-মাটি, গলিয়ে খাঁটি কর এবার

আগে জ্বাল বিবেক-হুতাশন,
ষড়রিপু-কয়লা তাতে কর রে ক্ষেপণ।
তাতে সাধুসঙ্গ-সুবাতাস দে,
আঁচ হবে তোর চমৎকার॥

আমি নিষেধ করে দিতেছি দোহাই—
যেন অসৎসঙ্গ-তামা-দস্তা খাদ দিওনা ভাই।
গলিয়ে আঁচে, ভাবের ছাঁচে ঢেলে তারে করবি তার॥

সোনা কি অমনি গলে শুধু অনলে,
তাতে দে অনুরাগ-সোহাগার ভাগ যতনে ফেলে।
গড়ে দে আমার চমৎকার কৃষ্ণভক্তি-রত্নহার॥

ব্রজের ভাব সুনির্মল,
তাতে কেটে দে ডায়মল,
গোপী-ভাবের ঝালট দিলে করবে ঝলমল।
দিয়ে শুদ্ধরতি, গাঁথলে মতি,
হবে অতি সুবাহার॥

অনন্তের অভিপ্রায়,
সে হার পরতে চায় গলায়,
কানাকড়ি হাতে নিয়ে হাতী কিনতে যায়।
ওরে কোটি জন্মের পুণ্যের সম্বল তুল্য হয় না মূল্য যার॥

[এই পর্যায়ের গানগুলি **বীরভুম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা যশোহর, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ** প্রভৃতি জেলার নানা স্থান হইতে বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত এবং এই মতবাদের সাধিকা নবদ্বীপের শ্রীমতী **অমিয়বালা দাসীর** গানের সংগ্রহ-খাতা ও ঘোষপাড়ার নিকটবর্তী মদনপুরের **ফকির আকবর শাহের** সংগীত-সংগ্রহ-খাতা হইতে গৃহীত।]

৩২০

হ'ল বিষম রাগের করণ করা,
সে যে যোগমাহাত্ম্য, রূপের তত্ত্ব, জানে কেবল রসিক যারা॥

ফণিমুখে হস্ত দিয়ে
বসে আছে নির্ভয় হ'য়ে,
করি' অমৃত পান গরল খেয়ে
হ'য়ে আছে জীয়ন্তে-মরা॥

রূপেতে রূপ নেহার করি'
আছে রাগ দর্পণ ধরি',
হুতাশনকে শীতল করি'
অনলে রেখেছে পারা॥

খোঁসাই গুরুচাঁদ বলে,
ডুবে থাক মন সিন্ধুজলে,
কিন্তু সে জল পরশ হ'লে
শুকনোয় ডুবাবি ভরা॥

৩২১

যে জন প্রেমের ভাব জানেনা,
তার সঙ্গে কিসের লেনা-দেনা ॥

কানা চোরে চুরি করে,
ঘর থাকতে সিঁধ দেয় পগারে,
শুধু বেগার খেটে মরে,
কানার ভাগ্যে ধন মিলে না ॥

কানা বিড়াল লোভী হ'য়ে
দধি বলে কাপাস খেয়ে
গলায় বেধে ছটফট করে,
শেষে ও তার প্রাণ বাঁচে না ॥

নিম্ববৃক্ষ ক'রে রোপণ
শতভার দুগ্ধ-সিঞ্চন,—
তবু কি তার স্বভাব যায় দূরে ?
ভিতরে মিঠা ঢুকতে পায় না ॥

উল্লুকের হয় ঊর্ধ্বনয়ন,
সে দেখে না সূর্যের কিরণ,
দেখ, পিঁপড়ে পায় চিনির মর্ম ;
রসিক হ'লে যাবে জানা ॥

৩২২

আপন দেহের খবর জান।
দেহের মধ্যে পরমবস্তু, বাইরে খুঁজলে পাবে কেন ॥

রক্তধাতু, শুক্রধাতু, মা-বাপ দুইজন,
ও তার শুক্রধাতু পরম পিতা,
তাহারে ভজনা কেন ॥

কুলকুণ্ডলিনী সহায় রেখে
ঊর্ধ্বে বাদাম তোল,
দশ ইন্দ্রিয়কে শিষ্য ক'রে
জ্ঞান-বড়শিতে টেনে আন ॥

সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র পঞ্চতত্ত্ব গুরুর কাছে জান।
গোঁসাইচাঁদে বলে, নিগম ঘরে
আছে গুরুর বস্তু-ধন ॥

৩২৩

আমার মন, সাজ প্রকৃতি।
প্রকৃতির স্বভাব ধর, সাধন কর, ঊর্ধ্ব হবে দেহের রতি।
যে আছে ষড়দলে, তারে লও উল্টাকলে,

যদি সে যায় দ্বিদলে,
উঠবে জ্বলে জ্যোতি।
তখন অনর্থ নিবৃত্তি হবে, নিষ্ঠা হবে রতি,
কামব্রহ্ম সাকার হবে, উদয় হবে গুরুর মূর্তি
যে আছে মূলাধারে, তারে লও সহস্রদলে,
যাবি বিরজার পারে তাহার সংহতি।

সেই যুবতী রসবতী, রসময় মুরতি,
এমন মধুর রতি জীবকে দিয়ে
প্রাপ্ত করায় কৃষ্ণপতি ॥

রূপচাঁদ বলছে স্বরূপ, আগে তুই ধরগে সে রূপ,
স্বরূপ-রূপে রূপ দেখতে পাবি
কোটি সূর্যের জ্যোতি ॥
গুরু ভিন্ন হবে না রে মূঢ়মতি,
গুরুর দয়ায় সফল হবে কৃষ্ণকৃপা-প্রাপ্তি ॥

৩২৪

এমন দিন কবে হবে, পাব মনেরি মানুষ-রতন।
আকারে নয় ত মানুষ, প্রেম-ধরম তাহার লক্ষণ ॥

প্রেম-রসের মানুষ যারা,
জীয়ন্তে মরেছে তারা,
রিপু ছয় তাদের সারা,
রয়েছে জীবন ॥

প্রাণ কাঁদে যার মানুষ তরে,
মানুষ এসে দয়া করে,
সেই মানুষ বিরাজ করে
দেখ এই চৌদ্দ ভুবন ॥

মানুষ ভেবে মানুষ হবে
যেন সাপের খোলস ছেড়ে যাবে,
ভাবময় দেহ পাবে,
হবে সেই দেহে প্রেমের সাধন ॥

শ্রীচৈতন্ত মানুষের নাম,
গোলোক-বৃন্দাবন যাহার ধাম,
কেউ বলে তারে নবঘনশ্যাম,
কেউ বলে গৌরবরণ ॥

এক মানুষ জগতের নাথ,
গৌর নিত্যানন্দ সীতানাথ,
শ্রীবাস গদাধরের সাথ,
আছে সর্বতন্ত্রে নিরূপণ ॥

মহামায়ায় দিন-কানা,
আমি দেখি মানুষ নানা,
এখনও ভ্রম গেল না,
পাজী কে আছে আমার মতন ॥

গোঁসাই প্রসন্নেরি দাস,
অধম হরির এই অভিলাষ—
রাখ গুরু-চরণের পাশ,
দয়ায় করাও মানুষ-দরশন ॥

৩২৫

ভবে রসিক যারা জ্যান্তে-মরা,
তারাই যাবে রে পারে।
যোগ চেয়ে রয়েছে বসে ভব-নদীর ধারে ॥

নাইকো তাদের সুখের বাসনা,
করে উল্টো পথে আনাগোনা,
যে জন সন্ধান জানে না
লোভে বিপদে মরে ॥

রসিক রসের মর্ম জানে,
রস বিহনে বাঁচে না প্রাণে,
যেমন ভাব জলে মীনে,
স্থলেতে রইতে নারে ॥

ঈশ্বরে রসিক সম্ভবে,
জীবের ভাগ্যে নাহি হবে,
জীব ঈশ্বরে সাধিবে
রসিকের দিকে নজর ক'রে ॥

মদনে মদন মেরে
যাবে নির্বিকারে প্রেম-নগরে,
রসিকের দেশে যাবে পরে,
মা যদি দুয়ার ছাড়ে ॥

আর যত আছে সাধন
অজাগল-স্তনের মতন,
তাতে নাহি মিলে রতন
বৃথা যতন বলে তারে ॥

প্রসন্ন গোঁসাইয়ের মত
রসিকের গুণ বলব কত,
শিষ্যের সেবাতে রত
হরিদাসের মন হরে ॥

৩২৬

মনের কথা কইতে মানা,
দরদী বিনা প্রাণ বাঁচে না ॥

যে জন দরদের দরদী হয়,
স্বভাব দেখলে জানা যায়,
নইলে ঘটে বিষম দায়,
জীবনে দেয় হানা ॥

নীরে মীন বরি' হয় সফল,
আনন্দে করে ঝলমল,
অভাবে মরণ কেবল,
বিফল পরাণ ধারণা ॥

সমভাবে হয় পীরিতি,
ভিন্নদেহ একই রীতি,
উভয়ের সমান মনোগতি,
কেবল গৌর-প্রাপ্তির বাসনা ॥

যেদিন প্রেম-বন্যায় ধরা ভাসিবে,
সেদিন আপনি তরী তীরে লাগিবে,
ভাগ্যবান আরোহিবে,
অভাগার হবে কেন বল না ॥

গোঁসাই প্রসন্ন কয়,
তার ভাবে সদাই রইতে হয়,
শুভ যোগে চাঁদের উদয়
বুঝি হরির ভাগ্যে হ'ল না ॥

৩২৭

আত্মতত্ত্ব বিচার কর দেখি ওরে মন-পাখী।
তুমি কি পড়ে পণ্ডিত হয়েছ, তোমার স্বরবর্ণ আছে বাকী ॥

আত্মতত্ত্ব স্বরবর্ণ, সে তো নয় রে সামান্য,
পরতত্ত্ব ব্যঞ্জনবর্ণ ফলাতে গণ্য,
সে যে স্বর ভিন্ন নয়,
স্বর হ'তে হয় দুয়েতে মাখামাখি ॥

যারে গুরুতত্ত্ব কয়, সে যে যুক্তাক্ষর হয়।
স্বরবর্ণ-জ্ঞান বিনে যুক্ত কেহ না বুঝয় ॥
ও যার স্বরেতে ভুল, লেগেছে গোল,
কি হবে যুক্ত শিখি' ॥

যেমন আগে স্বরবর্ণ, তেমনি সজ্ঞান ভিন্ন
পরের জ্ঞানে সাধন-ভজন হয় না রে জান।
বল, পরের দেখায় কে দেখিতে পায়
যদি নষ্ট হয় আঁখি ॥

দেহের কোথায় চারি ধাম, ভ্রমি অবিশ্রাম,
সেতুবন্ধ, দ্বারকা আর বদরিকা যার নাম,
গেলে জগন্নাথে, সর্ব্বজাতে একত্র মিশে থাকি ॥

যেমন তথায় একাকার, এক ভিন্ন দুই নাইক রে আর,
জাতি-কুল মহৎ বিদ্যা সামাজিক ব্যাপার,
যার লক্ষ্য হবে, সব ঘুচিবে, সূক্ষ্মভাব নিবে ছাঁকি' ॥

সুখ লক্ষ্য হবে যার, সে কি ভজে নিরাকার,
স্বরূপে রূপ মিশায়ে রূপের সাধন কর।
রামকৃষ্ণ কয়, অন্য জ্ঞান লবে না বৈদিক থাকি' ॥

৩২৮

ও ভাই, এস প্রেমের গাঁজা খাবে কে।
ধরবে নেশা, ঘুচবে বাসা, লহ আশ্রয় ধর্ম-কলিকে ॥
রাগের খরসান দিয়ে, মধুর রসের জল মিশায়ে,
গোলাপ-তক্তি নীচে থুয়ে,
কাট রিপুকে প্রেম কাটারিতে ॥

কিন্তু কলকেয় দিয়ো ঠিকরে,
নইলে পড়ে যাবে ঠিকরে,
ঠিক ছাড়া হোয়ো না ভাই—
কাজের কথা বলি তোমাকে ॥

সাঁপিখানি করে লয়ে,
কলকের তলাতে দিয়ে,
প্রেমের গাঁজা খাও পিয়ে,
নিষ্ঠা-দম রেখে গুরুর পদে ॥

দীন পঞ্চানন কয়,
প্রেমের গাঁজা যে জনা খায়,
তার কি আবার নেশা হয়
অন্য গাঁজাতে ॥

৩২৯

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্ত হ'তে ইচ্ছে যার, তার শাক্ত হ'তে হয় ॥
শক্তি হ'লে প্রকাশ, সেই শক্তিতে প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান-অসম্মান বলিদান দিয়ে কর রিপু জয় ॥

রিপু-জয় হ'লে হয় জ্ঞানের বৃদ্ধি,
অনায়াসে তখন হবে সিদ্ধি,
নইলে মন অ আ ই ঈ করতে হয় ॥

সিদ্ধি হ'লে, মন, বৈষ্ণব লক্ষণ,
তখন হিংসা আদি হয় রে বারণ,
বিবেকী যখন হয় রে মন,
তখন ভক্তির উদয় ॥

কাঙ্গাল বলিছে ভক্তি হয় যখন,
ওরে ভেদজ্ঞান থাকে না তখন,
যায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি,
জগৎ দেখে ব্রহ্মময় ॥

৩৩০

অক্ষয় নামে আদি পুরুষ নিত্য উপরে।
শূন্যে ফিরে, শূন্যে ঘোরে, সূক্ষ্ম রূপ ধ'রে ॥

তার ইচ্ছায় এক বিন্দু এলো,
বীজ ফুলে ফল তিনটি ছিল,
তার স্বভাবে মিশে ছিল,
তিন শাখা দুই কে কে রে ॥

বলতে গেলে বল থাকে না,
আছে দুই, এক চেন না,
আছে সব দেশে, নাই সব দেশে,
সেবক কিশোর কিশোরী রে ॥

দেহ ধরি' বৃন্দে সখি,
চার ভূষিত গুরূপ দেখি,
একে দেখি, ওকে দেখি,
কালাচাঁদ পাগল ভাবে অন্তরে ॥

৩৩১

তোর মন যদি তুই না চিনিস,
তবে পরকে চিনবি বল কেমনে ॥
পরকে চিনে আপন কর,
পর আপন হবে সুমনে ॥

পরকে চিনতে বাঞ্ছা কর,
আত্মতত্ত্ব সেরে ধর,
বাহিরকে ভিতরে পুর,
তবে চিনবি সহজ অধর জনে ॥

দেখবি নিগম মানুষ চোখে,
থাকবি ঐ মানুষের সুখে,
পড়বি না আর ভব-কূপে,
মন দিবি রাঙা চরণে ॥

কালাচাঁদ পাগলে বলে
শুনেছি সুধারায় মেলে,
গুরুকৃপা না হলে,
ভক্তিশূন্য আমার মিলবে কেনে ॥

৩৩২

মজার খেলা রসের ঘরে।
গোঁসাই কল পেতেছে আপন জোরে॥
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,
দম চলেছে কলের ঘরে॥

কলে কলে কল করেছে,
কল দেখে মন ভুলে আছে,
কলের কলে কল পড়েছে,
এ কল হারালে চলবে না রে॥

অধরা সে দেয় না ধরা,
ভক্তিভাবে দিবে ধরা,
দেখবি যদি মনোহরা
মনে প্রাণে এক হ'লে পরে॥

কালাচাঁদ পাগলে বলে
কলওয়ালাকে খুঁজলে মেলে,
তার ভাবে মন না হ'লে,
নির্মলরূপ দেখবি কোন্ অনুসারে॥

৩৩৩

চাঁদ-ধরা ফাঁদ জাননা মন।
নেহার নাই তোমার, নাচানাচি সার,
লাফ দিয়ে ধরতে চাও গগন॥

সামান্য রূপের গণ্য পাবে কে,
শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক যে,

সেই প্রেমকে, মন, কর নিরূপণ,
প্রেমের সন্ধি জেনে থাক চেতন ॥

ভক্তির পাত্র আগে কর নির্ণয়,
মুক্তিদাতা এসে হাতে বারাম দেয়,
নইলে হবে না প্রেম-উপাসনা,
মিছে জল বাড়ায়ে হবে মরণ ॥

মুক্তিদাতা আছেন নয়নের অজান,
ভক্তিপাত্রে সিঁড়ি আছে বর্তমান,
মুখে দীন দীন বলো, সিঁড়ি ধরে চলো,
সিঁড়ি ছাড়লে ফাঁকে পড়বি, মদন ॥

৩৩৪

বেদ ছাড়া ফকিরের এই ধারা ॥
মানে না কেতাব-কোরান, নবীর তরীক ছাড়া ॥

মসরেক তরীক ধরে, চন্দ্র-সূর্য পূজা করে,
পঞ্চরস সাধন করে, চন্দ্রভেদী যারা ॥
সরল চন্দ্র, গরল চন্দ্র, রোহিণী চন্দ্র ধারা,
রস-বীজ মিলন ক'রে পান করেছে তারা ॥

সব চুলে মাথায় জটা, খায় সিদ্ধি ভাঙ ঘোঁটা,
কথা কয় এলোমেলো, বুঝা যায় না সেটা ॥
তাদের ভঙ্গী দেখে লোক ভুলে যায়,
গানের বড়ো ঘটা।
এ দীন রসিক বলে বেতরীক
সে আউল-বাউল-নেড়া ॥

৩৩৫

ভজন-সাধন, প্রেম-উপার্জন
মহারাগের করণ ॥
আগে হৃদয়ে জ্বাল জ্ঞানের আলো,
হবে তত্ত্ব নিরূপণ ॥

যার আকর্ষণে জীব মরে প্রাণে,
জানতে হবে সে কোন্ জন,
তারে ভ'জে প্রেমে ম'জে, আত্মায় চায় মিলন ॥

পঞ্চবাণের সন্ধান জেনে,
পরাজিয়ে কাল-শমনে,
স্বরূপদ্বারে আশ্রয় ক'রে,
মানুষ ধরতে হবে, মন ॥

ভীষণ কথা বলব কি তা'
বেদবিধি'পর রয় গোপন,
সে রসের রসিক যারা, জানে তারে,
করে রসের আস্বাদন ॥

ব্রজপুরী গোলোকপুরী, আছে নিত্য মানুষের আসন,
ওরে হৃদানন্দ, পাবি পূর্ণানন্দ
হেরিলে সে রূপের কিরণ ॥

৩৩৬

যদি সাধ কর সাধনে।
নিক্তি ধ'রে টোকা মেরে তিন কাঁটা কর সমানে ॥

ও তার বিন্দু-বিসর্গ হ'লে,
ভজন যাবে রসাতলে,
গুরুত্যাগী তারে বলে,
প্রাপ্ত ধন যায় ভজন বিনে ॥

সে মানুষ রসাকৃতি ল'য়ে,
উদয় হয় গুপ্ত আলয়ে,
পদাশ্রিত হ'য়ে তারি সাধ মনে মনে
খপ্ করে কি পাবি রে তুই সেই রত্ন ধনে।
মহাব্যাধি ভাল হয় কি তেলাকুচার সত্ত্ব পানে ॥

সাধনের করণ ভারি,
সাধন নয় ভারিভুরি,
আহা মরি যে জানে সেই জানে।
চণ্ডিদাস আর রজকিনী জেনেছিল দুইজনে।
তারা সাধন-গুণে কৃষ্ণধনে প্রাপ্ত হ'ল বৃন্দাবনে ॥

তোমার নাই জমায় বুদ্ধি,
কেবলি খরচ-বৃদ্ধি,
করলে সাধন সিদ্ধান্ত না জেনে।
গোঁসাই অটল বলে, গেলি ভুলে
দিন-কানা তুই নারাণে।
এবার বিষ হারায়ে, ধোড়া হ'য়ে,
ইস্ ইস্ ক'রে মরিস কেনে ॥

৩৩৭

তত্ত্ব ক'রে আঁধার ঘরে সে ধন কি যায় রে চেনা।
আঁধারে খুঁজলে পরে পড়বি ফেরে, সে ধন হাতে আর পাবে না

যেখানে আছে সে ধন, মাণিক রতন,
যতন বিনা যায় কি জানা।
জ্বালায়ে রঙের বাতি, তড়িৎ-ভাতি,
চিনে নে রাঙ কি সোনা॥

কতজন কতো ভাবে তারে ভাবে,
ভাবে রে তার লেনা-দেনা,
সে যে সব ভাবাতীত,
ভাব ব্যতীত তারে লাভ হবে না।
নিশিতে শাখা খুলে শশীর কোলে
অরূপের রূপ দেখে নে না॥

হারালে শশীর কিরণ
হারাবি ধন,
ভোর হ'লে সে আর রবে না॥

দীনহীন পুণ্যে বলে, আলোক জ্বেলে
পলকে সেরূপ দেখে নে না।
শ্রীগুরুর কৃপা বিনে অন্ধ জনার নজরে পড়ে না॥

৩৩৮

খেলছে মানুষ বাঁকানলে।
পঞ্চভূত বড়ই মজবুত, ঘিরে আছে দশম দলে॥

সে দেশের উল্টো কথা, ফুলে খায় ফলের মাথা,
হুঙ্কারে ঝুলছে লতা আজব তরু-কলে।
উঠছে তায় কিরণের ছবি, সেথা দিনে চন্দ্র, রাত্রে রবি,
দেখলে তুই খাবি খাবি, জলের ভিতর মণি জ্বলে॥

যোগশক্তি তাহার ভূষণ, মূলাধারেতে আসন,
যখন করে আকর্ষণ ঊর্ধ্বে সদা চলে।
আলো ক'রে সপ্ততালা, প্রভু গুপ্ত ঘরে হন উজলা,
সে কমল বোঁটা-খোলা,
রসভরে আপনি দোলে॥

শোণিত-শ্বেত সরোবরে হংস আর হংসী চরে,
নিরন্তর যুগল ক'রে,
প্রমোদ-জঙ্গলে।
উপরেতে অগ্নিপুরী, বিষম আতস ভারী,
খাটবে না ছল-চাতুরী,
কথাতে কি ধন মেলে॥

মহাতল তলাতলে তার ভিতর তলিয়ে গেলে,
ডুব দিয়ে রত্ন তোলে, শুদ্ধ রাগের বলে।
গোবিনচাঁদের মধুর বাক্য,
গোপাল মনে প্রাণে করগে ঐক্য,
ঘুচবে সব বৈদিক তর্ক,
দেখতে পাবি জ্যান্তে ম'লে॥

৩৩৯

শ্রীরূপ-নদীটি অতি চমৎকার।
তোরে বলি সার, হৃদে কর বিচার,
দেখে ভব-গর্ত হলি মত্ত,
আস্বাদন কি বুঝলি তার॥

বিষম সে ত্রিপানি নদী,
ত্রিকোণ যন্ত্র পাতালভেদী,
মধ্যে আছে মহা ঔষধি।
ওঠে ঘুরণো জল, যদি না থাকে গুরুবল,
তবে খুলবে মণিকোঠা, বাধবে ল্যাঠা,
সেখানে খুব খবরদার॥

নদীর ভিতর তলায় গরল-সুধা,
এক পাত্রেতে রহে সদা,
সুধা খেলে যায় ভব-ক্ষুধা।
গরল পান ক'রে প্রাণেতে মরে,
ছুটে সেই উল্টো কল নেমেছে ঢল,
শিখতে হবে আপ্তসার॥

ত্রিপানিতে তিনটি ধারা,
নিধারাতে আছে ধরা,
ঠিক রেখ নয়নের তারা।
পলকে প্রলয়, হ'য়ে যাবি ক্ষয়,
স্থূলে মূলে সকল ভুলে
করতে হবে হাহাকার॥

বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
যেতে হবে নিষ্কপটে
সাধুবাক্য ধ'রে এঁটে।

তিন দিন বারুণী, তাইতে স্নান শুনি,
নাইলে সে মহাযোগে অনুরাগে,
কাম-কুম্ভীর কি করবে তার

রসিক ডুবুরী হ'লে,
ডুব দিয়ে সেই গভীর জলে,
অনায়াসে রত্নধন তোলে।
গোঁসাই গোবিন কয়, কুবীরচাঁদের জয়,
ভেবে গোপাল মূর্খ, পায় রে দুঃখ,
দিনে দেখে অন্ধকার ॥

৩৪০

মন রে, চল রূপনগরে।
আগে পারাসারা কর ফুটের দ্বারে ॥

গোলোকের পতি, তার মূলে স্থিতি,
সে রূপ সতত বিরাজ করে,
ও তার দ্বি-দল পদ্ম নাম, বৃন্দাবন ধাম,
তাহে গোলোকপতি বিলাস করে ॥

সুষুম্না ধরিয়ে, মৃণাল বাহিয়ে, উঠ সেই-পদ্ম 'পরে।
দেখবি চৌষট্টি কুঠুরি আছে সারি সারি,
মণিময় চাঁদা সেই শহরে ॥

রূপাশ্রয় করি, চল অধঃ ছাড়ি
রূপ ধ'রে চল মণিপুরে।
পাবে এক মহাজন, মানুষ রতন,
দেখতে হ'লে জেন্তে রবি ম'রে ॥

বেদে নাহি বলে, সূর্য নাহি টলে,
তবু কালাচাঁদ কহে বারে বারে।
সেথা জন্মমৃত্যু নাই, গুণাতীত ঠাঁই,
গোপালে কি জানবি কামাতুরে॥

৩৪১

আগে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হও রে আমার মন।
সাধনের মূল সাধন॥
বলি, মন, তোরে বারে বারে,
যেন পিতৃধন তোর না লয় চোরে,
থাকতে হবে জ্যান্তে ম'রে
পুরুষ-প্রকৃতি দু'জন॥

বাহ্য দেহ গেলে হবে সে ভাব উদ্দীপন;
তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি,
থাকবে না তার কোন স্থিতি,
অকৈতব যেন ক্ষিতি, বাক্য নাই,
সুনির্মল রসিক জনা সেই তো ভাই।
যেমন স্বাতী নক্ষত্র-জলে, গজে গজ-মুক্তা ফলে,
চৈতন্যেরি কৃপা হ'লে,
উদয় হয় প্রেম-রত্ন ধন॥

যেমন আগুন, পারা—দুই জনাতে সমভাব,
সে হবে নিক্তির কাঁটা, থাকবে না তায় খাদ বাঁটা,
ধর্মপক্ষে হবে আঁটা নিশান-সই,
রণভঙ্গ দিবে না তায় সমজয়ী।
থাকে আগুন, পারা ফুটের দ্বারে, এ কথা আর বোলবো কারে,
আপনি ম'রে পরকে মারে,
প্রাপ্তি হয় তার নিত্যধন॥

হাতে গলায় বাঁধি দোঁহে এক ঠাঁই,
যেমন মুখ থাকিতে বাক্য বন্ধ,
চক্ষু থাকিতে অন্ধ,
কিছু নাই কামেরি গন্ধ
মনে তার,
শুদ্ধ প্রেম ক'রে এবার হবে পার।
আমার মানুষ-চাঁদের মনের আশা,
সাপেরি মুখে ভেকের বাসা,
প্রকারান্তরে বললেম তোরে,
করগে যা সত্য সাধন ॥

৩৪২

ত্রিপানির পারে কোন্ সাধনে যাবি।
ও তোর সাহস দেখে বসে বসে ভাবি ॥

ত্রিপানির ঐ বাঁধা ঘাটে দুয়ার আঁটা তিনটি কাঠে,
রূপ-রসের কপাটে।
সেথা শব্দ-গন্ধ কল, প্রেমেরি শিকল,
স্থানে স্থানে ও তার উল্টো চাবি ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু গুণাতীত,
আছে মহামায়াবৃত,
সে সব শুনি নিদ্রাগত, চৈতন্যরহিত।
সেথা কত মহাজন, কাণ্ডারী-বিহন,
বাঁত্তড়ে প'ড়ে খাচ্ছে খাবি ॥

শচীসুত বল যারে,
ত্রিপানির ঢেউ লেগে তারে,

সেই জোয়ারে ভেসে এসে
ফিরছেল দ্বারে দ্বারে।
সে যে ত্রিপানির ভাস, নন্দের শ্রীনিবাস,
রাধার জন্য হলেন ভাবের ভাবী ॥
(নদেয় এসে)

দুইদিকে দুই বিষের নদী, বইছে ধারা নিরবধি,
মধ্যেতে অমৃত-নদী চিনতে পার যদি,
ক্ষেপা মদনচাঁদে কয়,
তাতে ডুবতে পারলে হয়,
নইলে কেন মিছে প্রাণ হারাবি ॥

৩৪৩

যথা গরল তথা সুধা, দুয়েতে এক পাত্রে রয়।
গরল রেখে অন্যান্তরে সুধা খেতে পারলে হয় ॥

সুধা গরল এক পাত্রে রে, জানিয়ে যে সাধন করে,
গরল রেখে অন্যান্তরে সুধা সে জন খায়।
যে সুধা সে-ই অমৃত, সাধকেতে করে বর্ত্ত,
পাইয়ে পরমতত্ত্ব,, নিরপেক্ষ ব'সে রয় ॥

শুনেছি এক কালনাগিনী, তার কাছেতে বিষের খনি,
যথা ফণি তথা মণি, সাধু-শাস্ত্রে কয়।
আত্ম-তত্ত্ব নাহি সেরে, ধরতে যায় যে অজগরে,
মাণিক পাবার আশা ক'রে,
উল্টে ছোঁ মারে তার গায় ॥

মৃগ সিংহ দুইজনে, বসে আছে একাসনে,
হিংসা নাহি কারু মনে,
সাধক তদ্রূপ প্রায় ॥
আনন্দমোহিনী বলে, পূর্ণ যে জন সাধক হ'লে,
ফণির মণি নেয় সে তুলে,
মদন ফকির ইহাই কয় ॥

৩৪৪

ও মন রতির ঠিক না হ'লে সতীর কৃপা হবে না।
রতির ঘরে পতি বাঁধা, খুঁজে দেখ না ॥

রতিকে সাব্যস্ত কর, তবে যদি যেতে পার,
কুলকলঙ্ক শিরে ধর, নইলে হবে না ॥

সত্য-মহাজনের দেশে, যেতে চাও, মন, কোন্ সাহসে,
নিক্তি ধ'রে আছে ব'সে, চাই ষোলআনা ॥

সেখানে যায় কার বা সাধ্য,
না হইলে রতি-বাধ্য,
অসাধ্য না করলে সাধ্য, যেতে দিবে না ॥

সেথা যাবি কেমনে বল, মধ্যে সেতু, দু'পাশে জল ;
তার ভিতরে মায়া-শিকল, বাইতে পারবি না ॥

আগুনের গড়, খাঁড়ার ধারে, পার হবি বল কেমন ক'রে,
টললে পরে মরবি পুড়ে, ঘটবে যন্ত্রণা ॥

জ্ঞান-বলে বাঁধ রে জোর, চল চল মিটিয়ে ওজর,
জোরের মধ্যে কমলের জোর,
সেই জোর ধর না ॥

৩৪৫

দম লাগাও সেই দমের ঘরে।
মানুষ স'রে যাবে তোমার দমেতে পাক খেলে পরে ॥

বেদম না হ'লে পরে সহজ মানুষ মেলে না,
যদি বল, বললে কি হয়,
ছান্‌চের জল কি মটকায় যায়,
সে কেবল কথার কথা, বলি শোন ওরে ॥

দম-মাদারকে ডেকে এনে দমেতে, মন. কর ভর,
দমের আগে মানুষ জাগে, চলে সে হাওয়ার উপর,
আট কুঠ্‌রি বন্ধ ক'রে উজন তোল তারে ॥

অধরচাঁদকে ধরবি যদি দম ক'ষে দম সাধন কর।
নারাণে বলে, করব কি,
দম লাগে, দম দেব কি,
এবার তুমি দম মারগে অটলচাঁদের চরণ ধ'রে ॥

৩৪৬

যার যে দিন শুভ দিন হবে,
তার মনের আঁধার ছুটে যাবে
দিব্যজ্ঞানে মন-নয়নে
দেখলে, মানুষ-দর্শন পাবে ॥
সেই মানুষ বহুদূরে নাই,
আপনাকে চেনা হ'ল দায়,
আপনাকে চিনলে পরে
অনায়াসে মানুষ পাবে ॥

সেই আত্মসারা করণ যারা জানে,
জ্ঞান-অঙ্কুশী দিয়ে আপনাকে টানে,
ঠিকের ঘরে দেখলে পরে
মানুষ জানা যাবে ॥

তারণের এই নিবেদন,
ডুবে দেখ দেখি, রে মন,
ভুবনে মিলবে গুরু-রত্ন-ধন,
সেদিন দৈত্য-জ্ঞান তোর ঘুচে যাবে

৩৪৭

প্রেম-পাথারে সাঁতার দিও খুব হুঁশিয়ারে।
নিশান-সই না হ'লে
নদার কূলে দাঁড়ালে,
তোর লাভে মূলে সব যাবে স'রে ॥
গুরুর কৃপা হ'লে
তরিয়ে তোলে,
যেমন সুধা খেলে
ক্ষুধা সারে ॥

জলের ভিতর কি তামাসা,
যেমন মাণিক-মুক্তা,
তেমন ফণীর বাসা,
বলী দেখে মনের আশা,
পিপাসা যায় দূরে ॥

যেরূপ আছে নিরিখ আঁটা,
জোয়ার এলে রবে না ভাটা,
ছুটবে তখন রূপের ছটা,
দেখবি ঘটা কিরূপ রে ॥

আছে ভাটি-মুখ বান,
সেই ফাঁদে পড়বে চাঁদ—
এ ভবে রস-রতি সব
উজান চলে বে ॥

৩৪৮

রসিক রসিক সবাই বলে, রসিক মেলে কয় জনা।
যেমন জল-ছাড়া মীন বাঁচে না গো,
তেমনি রস বিনে রসিক জনা ॥

রায় রামানন্দ রসিক ভাল,
পঞ্চরসের বিধান ক'রে গেল,
সে রস আনের ভাগ্যে মিলবে কেন,
ও সে রস সাধন করে সাধক জনা ॥

দিবানিশি রমণ করে,
রসিক সুজন বলে তারে,
রসিকের রমণ সাধন
রমণ ভজন,
রসিক তো রমণ ছাড়া থাকে না ॥

কেবল স্ত্রী-পুরুষে রমণ করা নয়,
আত্মায় আত্মায় রমণ হ'লে
রসিক তারে ক'॥
তারা শুধু আত্মাকে ভেদ করিয়ে
সদাই লক্ষ্য-পানে দেয় না ॥

কৃষ্ণ অধর বলছে বাণী,
মনোহর, তুই আর হ'সনে না,
নেত্রকোণে গুণের করণ,
যেন রমণ ক'ভুল না ॥

৩৪৯

আগে আত্মতত্ত্ব বিচার ক'রে সাধন করতে হয়।
আত্মতত্ত্ব পঞ্চ আত্মা জানিও নিশ্চয় ॥

ষড়রিপু, দশ ইন্দ্রিয়, আর তিন গুণে হয় ২৪ তত্ত্ব,
আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব কয় ॥

আত্মতত্ত্বে আত্মরক্ষা, পরতত্ত্বে পরক্রিয়া,
গুরুতত্ত্বে সেবা নিয়া কর ব্রজভাবাশ্রয় ॥

আত্ম-রূপে কৃষ্ণ তিনি, পরতত্ত্বে রাধারাণী,
গুরুতত্ত্বে প্রেম বাখানি,
হয় মহাভাবের উদয় ॥

কৃষ্ণ অধরে বলে, মনোহর নে যত্ন ক'রে,
দিলাম তোরে তত্ত্ব ব'লে,
সাধনের এই নির্ণয় ॥

৩৫০

অকৈতব মানুষের কথা কইতে লাগে ভয়।
মনে হয়, ফল্গুনদী নিরবধি যেমন অন্তঃশীলা বয়

মানুষ মানুষ সকলেতে কয়,
কথা মিথ্যা কিছু নয়,
ই মানুষের প্রলয়েতে
তিন মানুষ হয়।
মানুষ স্বয়ং শক্তি,
জীবের ভক্তি,
যুক্তি ক'রে জানতে হয় ॥

রত্নবেদীতে নিধি ব'সে রয়,
এ তিন মানুষের কেউ নয়,
পূর্ণিমার চাঁদ ষোলকলা নিগমে উদয়।
ইহার নির্ণয় ক'রে ধরো তারে,
সে সকলের অগোচর রয়॥

ভাণ্ড হইতে এ ব্রহ্মাণ্ড হয়,
যুগে আছে পরিচয়,
হ'লে মরা, যাবে ধরা রসিক মহাশয়।
মদন কয়, সে মানুষ-বেশে, এই স্বদেশে,
লাগিয়ে দিশে দেশে রয়॥

৩৫১

ক্ষ্যাপা মন, এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে ভজন কর।
মানুষ পালাবে, প'ড়ে রবে শূন্য ঘর॥

বড় সাধ ক'রে বানালে রঙমহল,
দেখ, যেন যায় না রসাতল,
মন, আমার।
ঘরের ছয় জনাতে যুক্তি ক'রে
উড়িয়ে দেবে মটকার খড়॥

ঘরের নয় দরজা খোলা রয়েছে,
তার ভিতরে রসের মানুষ বিরাজ করতেছে,
এখন চৌকিদারকে সজাগ রেখে,
ফাঁদ পেতে তুই মানুষ ধর॥

এবার ভেবে চিন্তে জ্ঞানচন্দ্রে কয়,
ঘরের জুতের খুঁটি কোণায় গিয়ে রয় (মন আমার),
এখন মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে
এই মানুষের চরণ ধর॥

৩৫২

মানুষ রত্ন-ধন, তারে চিন্‌লি না রে মন।
নর মানুষ নর শিরে, নর হ'তে পথের উদ্দেশ করে,
নররূপে কেঁদে বেড়ায় তোমরা যারে বল নারায়ণ ॥

বাহান্ন হাজারের গলি, পয়দা করলে আদম আলী,
ও তোর সুখ-নালেতে বিরাজ করে
ঐ দেখ, খোদ খোদা নিরঞ্জন

মানসেতে পূজবো এবার মানুষ-শ্রীচরণ,
আশা-তরু-মূলে বসি' করব যোগ-সাধন,
প্রাণকে প্রফুল্ল ক'রে,
সেই ফুল নিব যুগল করে,
করবো গো একান্ত ক'রে মানুষ-পদেতে অর্পণ ॥

ভক্তির পাল খাটায়ে দিব,
সত্য বাক্য জপ করিব,
মন-মানুষের সঙ্গ লব,
কেদার কয়, কমলচাঁদের এই বচন ॥

৩৫৩

আপন মনের মানুষ মনে রেখো যতনে।
দিয়ে দর্পণে পারা, ঠিক রেখো দুই নয়ন-তারা,
প্রেম-রসে অঞ্জন করা, আপনি লাগবে নয়নে ॥

মনের মানুষ মন-ছাড়া কেউ কোরো না,
কলে-বলে ষোল আনা, হিসাবে উসুল ভুলো না,
বোম্বেটে ব'সে আছে ছয়জনে ॥

প্রাপ্ত ধন গেলে পরে,
ভাসবি অকূল পাথারে,
সাথী সব যাবে ছেড়ে,
কাঁদতে হবে নির্জনে ॥

খুঁটো ধ'রে ব'সে আছে যে জনা,
জাঁতার ঘেঁষ তার গায় লাগে না,
কত তুফান কেটে যায়,
তেমনি ধারা মত্ত থাক সাধনে ॥

যেমন চুনে হলুদ দিলে পরে,
দুই রঙ যায় আপনি সেরে,
শেষ কালেতে লাল রঙ ধরে,
ঠাউরে দেখ চেতনে ॥

গুরুবর্ত্ত করেছে যে জনা,
গুরু-শিষ্য একই আত্মা,
যার জ্ঞান হয়েছে পরমাত্মা,
বর্ত্তমান করেছে কর্ত্তা সুজনে ॥

দীন কানাইলাল কয়, গেল বেলা,
ভাঙল রে ভবের খেলা,
ভাব-সাগরে দাও গো মেলা,
কাজ কি অন্য সন্ধানে ॥

৩৫৪

ভাব-সাগরে ভাবের মানুষ
ব'সে আছে ভাব ধ'রে।
খুঁজতে গেলে কই সে মেলে,
আওয়াজ বুঝে নাও ধ'রে ॥

ভাব ছাড়া সে কয় না কথা,
পঞ্চভাব তার হৃদে গাঁথা,
ভাবের মানুষ আলেক-লতা,
আল-জিহ্বায় সে বেদ পড়ে

ভাবে আসে, ভাবে বসে,
ভাবে লেখে, ভাবে দেখে,
আন কথা তার নাইকো মুখে,
রয়েছে ভাব-নেহারে ॥

থাকতে স্বভাব হয় না সে ভাব,
স্বভাব গেলে কিসের অভাব।
সেই ভাবেতে হয় মহাভাব,
সেই ভাবে জ্যান্তে মরে ॥

জাতি-বিদ্যা মহৎ-আনা
থাকতে দেহে ভাব হবে না,
ভবা রে, তুই স্বভাব-কানা,
পড়েছিস কলির ঘোরে ॥

৩৫৫

শুদ্ধ প্রেম সাধবি যদি কাম-রতি রাখ হৃদয়ে পুরে।
সাড়ে তিন রতির খেলা,
না জানলে ঘটবে জ্বালা,
জেনে শুনে মারো তালা
হরণ-পুরণ-সাধন-দ্বারে ॥

সাধারণের ভাটির করণ,
সামঞ্জস্যার হয় রে মরণ,
সমর্থার রয়গো উজল,
আধ-রতি প্রেম গোপীকারে ॥

শান্ত রসে মিলন-রতি—
তাতে কারো হয় না মতি,
সম্পূর্ণ ঐ রাধা সতী
পূর্ণ প্রেমে আছে জ্যান্তে ম'রে ॥

৩৫৬

বল, কোন্ গুরুর কর অন্বেষণ।
গুরু দেহদাতা মাতা-পিতা এই দুইজন,
তারে কর অন্বেষণ ॥

শিক্ষা-দীক্ষা গুরু দুইজন,
কর্ণে করায় মন্ত্র গ্রহণ,
মনের গুরু কল্পতরু,
মূল গুরু আছেন গোপন ॥

কর সেই গুরুর সন্ধান
দিয়ে ভক্তি অনুপান,
সিদ্ধ হবে ধ্যান,
তোর ভজন-পূজন ॥

অতিথ গুরু চক্ষু সুজন,
দেহের গুরু আছে তেমন,
তাইতে দেয় জীবপত্তন,
হয় জীবের সর্বপ্রাণ নারায়ণ ॥

তখন হয় তো দিব্যজ্ঞান,
রত্ন-চক্ষু-দান,
ডোর-কোপীন নাইকো তার তীর্থ-পর্যটন ॥

সাড়ে চব্বিশ গুরু যখন এই দেহে করে গমন,
আদিগুরু হয় কোন্ জন,
কর কোন্ গুরুর বাক্য নির্বাচন।
জেনে সাড়ে চব্বিশ রতি
হও গুরুর সারথি,
ধর্মপথে মুক্তিপথে যার আসন ॥

কাতরে কয় দিনমণি,
গুরু পুরুষ কি রমণী,
ষড়পদ্ম-বিলাসিনী
কি ত্বং হি কুলকুণ্ডলিনী ॥

আমার হৃদ্-পদ্মে নীলপদ্ম আছে,
নীলপদ্মেতে বদ্ধ সোনার পদ্ম
ফুটে রয়েছে এখন ॥

৩৫৭

কি ভাবে ভাব-নগরে পাবি তারে,
বল দেখি, মন, হিসাব ক'রে ॥
হিসাবে মিল না হ'লে, গোঁজা দিলে,
সে ধন তোর মিলবে না রে ॥

এ সংসার ভাবের মেলা, ভাবের খেলা,
ভাবের লীলা সবাই করে,
কোন্ ভাবে পাবি সে ধন, বল দেখি, মন,
সে ভাব কেমন, কি ফল ধরে ॥

কেহ তাই দাস্যভাবে সদা ভাবে, কেহ ভাবে মধুরে,
কেহ বা সখ্যভাবে তারে ভাবে, বাৎসল্য-প্রেম
সাধন করে ॥

কেহ বা শান্তরসে সদা ভাসে, শান্তি আসে
এ সংসারে।
যে ভাবে যার মজে মন, করে ভজন,
সেই ভাবে সে ভাবের ঘরে ॥

কিন্তু এই ভাবের স্বভাব কল্পিত সব,
স্বভাবে কে এ ভাব ধরে।
তাই রে ভাব কেহ পারে, কেহ হারে,
কেহ সে ভাব বুঝতে নারে ॥

স্বভাবের ভাব না হ'লে, ভাব ধরিলে,
সে ভাবে কি লাভ হবে রে।
জনমের সঙ্গে যে ভাব হয়েছে লাভ,
সহজ স্বভাব বলে তারে ॥

সে ভাবে করলে সাধন, সাধনের ধন
পাবি রে মন, আপন জোরে।
দীনহীন পুণ্যে বলে মায়ের কোলে
যে ভাব-শিক্ষা পেয়েছ রে ॥

৩৫৮

মন যদি চড়বি রে সাইকেল।
আগে দে কোপ্‌নি এঁটে, অকপটে সাচ্চা কর্‌ দেল ॥

ফুটপিনে দিয়ে পা,
হপিং করে এগিয়ে যা,
পিনের 'পরে উঠে দাঁড়া,

বেদবিধি হবি ছাড়া,
সামনে কর নজর কড়া,
আগাগোড়া ঠিক রাখিস হ্যাণ্ডেল ॥
সীটের 'পরে ব'সে (মন)
ব্যালান্স ধরবি ক'ষে ;
যাবি উর্দ্ধশ্বাসে কুম্ভক-ন্যাসে,
চাস না আশেপাশে, ছয় আর দশে,
মূলমন্ত্রে কর প্যাডেল ॥
কর সুপথে সুলক্ষ্য
ছাড়ি'কুশাগ্র-কুতর্ক,
দিবি রান হ'য়ে অধ্যক্ষ,
ভিতর বাহির ক'রে ঐক্য, হ'য়ে সুদক্ষ,
বাজাবি তুই বিবেক-বেল ॥
(স্বামী) মাধবানন্দ ভাষে, ভবানী, তুই কর্ম্মদোষে
ফুল মোশানে ব্রেক ক'ষে রইলি ব'সে,
ভূমেতে পড়লি খ'সে অবশেষে,
এমনি বোকা, বে-আক্কেল ॥

৩৫৭

কি দেখে মজেছ রে মন, না দেখে ভাব কি রে ।
না মজিলে হয় না ভজন,
পাবে কি রে নিরাকারে ॥
নিরাকার যার নাই রে আকার,
তারে ধরা যায় কি প্রকার,
মানুষে মানুষ সাকার—
হেরে, ভ্রম-অন্ধকার গেল না রে ॥
শুধু পরের কথা শুনে
কি ভাবি রে অনুমানে,

হেরি না যা বর্তমানে
কেমনে ধরিব তারে ॥

অনুরাগ যার হয় রে মনে
সে কি পরের কথা শুনে।
কেবল ভ্রান্ত নরে ভ্রান্তিতে
খুঁজিছে দূরে ॥

আগে মনকে শুদ্ধ কর,
দূরে নয় সে, কাছে হের,
মনের ময়লা পরিষ্কার কর
আছে রে তোর অন্তরে ॥

রূপে যার হ'রে নিবে মন,
ত্রিভুবনে ধন্য সে জন,
খুলে যাবে তার জ্ঞানের নয়ন,
মানুষ গুপ্তভাবে আছে হেরে ॥

দেখাদেখি দেখে সবে,
অন্ধকারে থাকে ডুবে,
কার নয়নে কে দেখিবে,
পরের চোখে কি দেখতে পারে ॥

রাজকৃষ্ণ কয়, হায় কি হোলো—
কাছের মানুষ হারাইলো,
যার প্রেমে মজিলে রূপে,
তারে কেউ ধরলো না রে ॥

৩৬০

প্রেম পাথারে চল সাতারে,
পার যেতে ভয় কি আর ॥
এই ভব-নদী পার হবি যদি
আগে দে নেহার ॥

রূপ-রসে মাখা, বেদে আছে ঢাকা,
না বুঝে খেলি অসার।
জপ-তপ ছাড়, পিরিতি কর,
আরোপ ধর, পাবে সার ॥

হ'লে রূপাশ্রিত অতীব অদ্ভুত,
প্রেম-চরিত্র দেখি সার।
প্রেমে হাঁসায় কাঁদায় নাচায় গাওয়ায়,
দূর করে দেহের বিকার ॥

রূপ-স্বরূপে হ'লে মিলন
চৌদ্দ ভুবন দীপ্তাকার।
ভক্তিযোগে শক্তিযোগে
আপনি যাবে সহস্রার ॥

সাধন-বলে রসে খেলে,
অধো হ'লে জীবাচার।
ছাড়ি' টলাটল কর সুটল,
হবে সত্য রাগে অধিকার ॥

গুহ্যাতিগুহ্য এ রস-মাধুর্য
রসিক জনার গলার হার।
ওরে হৃদয়ানন্দ, কেন মতি-ভ্রান্ত,
ডেকে কয় রাজ্যেশ্বর ॥

৩৬১

রাগ না জেনে রাগের ঘরে
যাবি কি ক'রে।
সেথা লোভী কামী যেতে নারে
জন্মাবধি ঘুরে ঘুরে ॥

রাগ-রতি দু'টি হয়, এ ভবে জেনে লও নিশ্চয়,
অনুরাগী জনা রাগের ঘরে তালা খোলা পায়।
গুরুর কৃপাবলে, অবহেলে
রূপের ঘরে গিয়া ধরে তারে ॥

এই ভবে পণ্ডিত যে জনা,
ও সে আছে মন-কানা ;
ও সে শাস্ত্র ঘেঁটে মরে
তত্ত্বের মর্ম জানে না।
আপন জন্মযোগের নাই ঠিকানা,
পরের বিধান কি দিতে পারে ॥

মনে মনে দেখ বিচার ক'রে,
ও তুই কোন্ যোগ ধ'রে জন্ম নিলি
এই ভবের মাঝারে।
যে যোগে শঙ্কর যোগী হয়,
মৃত্যুকে করেছে জয়,
গোঁসাই মতিচাঁদ কয়,
এ বিধান তালপাতাতে লেখা নয় ;
থাকতে বিকার, সাধ্য কি তার
সেই রাগ সহরে যায়।
ভেকের বাসনা যায় কি ভবপারে ॥

৩৬২

গুরু-বীজ করলে রোপণ পাষাণে,
অঙ্কুর হবে কিসে, বিনা রসে, শুকিয়ে যায় দিনে দিনে ॥
যাতে নাইকো রসের সঞ্চার,
ও সে কৃষি-কর্মে কোনো জন্মে শস্য হয় না তার।
আবার চিরদিনের শুক্‌নো তরু
বল সঞ্চারিবে কেমনে ॥

মহৎ স্থান মলয়া-কানন,
সব তরু হয় যার বাতাসে চন্দন।
আবার অসার এরণ্ড তরু
বল চন্দন হবে কোন্ গুণে ॥

অসার মলিন কায়,
বিনা গুরুদত্ত জ্ঞান-পদার্থ,
ধন থাকে না তায়।
দেখ সিংহের দুগ্ধ রয় না যেমন
স্বর্ণপাত্র বিহনে ॥

গোঁসাইচরণ বলে, গুরুর কৃপা হ'লে,
সুফল ফলে, হৃদ্-কমলে
ও তার সৌরভে হয় আমোদিত,
সে রস পান করে সাধুজনে ॥

৩৬৩

গুরু যারে কৃপা করে, সেই যায় পারে,
অনায়াসে ডঙ্কা মেরে।—
থাকেনা সন্ধ, মেটে দ্বন্দ্ব, নিত্যমানুষ দীপ্ত ক'রে ॥
আলোকে আলেক সাঁই, আছেন গোঁসাই,
রূপে মিশে দমের ঘরে।

চারদলে বারামখানা, আনাগোনা
অধঃ-উর্ধ্ব হাওয়া-ভরে ॥

সাধিতে বিষয়-করণ, রূপ-সনাতন
করোয়া ধারণ, কৌপীন পরে।
হইলো হালসে বেহাল, দীনের কাঙাল,
ব্রজ-গোপীর রূপ নেহারে ॥

সে রসে রসিক যারা, মাতোয়ারা,
সদাই আছে জ্যান্তে ম'রে।
হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণ, দেখে স্পষ্ট
যুগল চরণ রত্নপুরে ॥

চণ্ডিদাস-রজকিনী, ধন্য ধনী
মিশেছে তাই তারে তারে।
গোপাল আঁধলা-কানা, ঠিক হ'লো না,
(ওসে) উলট্‌ কলে সদাই ফেরে ॥

৩৬৪

মানুষে নিষ্ঠারতি কর, মন।
তবে রতি ফিরবে, জানতে পারবে
মানুষ কেমন বস্তু-ধন ॥

পরমাত্মা পরম-ঈশ্বর,
তিনি সর্বঘটে স্থিতি বটে,
বেদবিধি অন্তর।
এবার পরমজ্ঞানে ভাব তাঁরে,
হবে ভাবলে ভাবের উপার্জন ॥

এই মানুষকে করবে বিশ্বাস,
এই মানুষ জানিও সত্য-নির্যাস।
এই মানুষ বিনা হবে নাকো
সেই সহজ মানুষের করণ॥

এই মানুষে আছে সেই মানুষ,
তার ভাব অগম্য, পরব্রহ্ম, পরম পুরুষ।
এই মানুষ ধরে যাবি ত'রে,
গোঁসাইচরণ বলে কুবীর, শোন।

৩৬৫

যার জন্যে বাউল, কেন সে কাজেতে হচ্ছে ভুল।
নিয়ে জপের মালা, আঁচলা-ঝোলা (মন রে)
মিছে দেশ জুড়ে বলা বাউল॥

ত্যজে রত্ন-সিংহাসন, রূপ-সনাতন ভাই দু'জন,
করে করোয়া ধারণ,
হ'য়ে হালসে বেহাল, দীনের কাঙাল,
(মন রে) তাদের কিসে ছিল অপ্রতুল॥

তুমি কেন ঘামাও মাথা, গায়েতে ছেঁড়া কাঁথা,
ছিলে বা কোথা।
দেখি কপনি আঁটা, দীর্ঘ ফোঁটা,
(মনরে) তোমার মুখে দাড়ি, লম্বা চুল॥

শুনি হরিনাম রসের গাছে,
চার ডালে চার ফল আছে,
কে যায় রে তার কাছে।

শুনি পাতায় পাতায় চন্দ্র গাঁথা (মন রে),
খোঁজ না কোন্‌খানে তার বৃক্ষের মূল ॥

তোর গুরু বসে কোন্‌ ফুলে, মৃণালে মৃগ খেলে,
সে ফুল ভাসে কোন্‌ জলে।
অধীন গোপাল বলে, সেই কমলে (মন রে)
কোন্‌ ভ্রমরা বসায় হুল ॥

৩৬৬

জাগলে ঘরে হবে না চুরি, ও মন-বেপারী,
ছয়জন ডাকাত আইস্যা
লুইট্যা যে নেয় তেরেজুরী,
জাগলে না হবে চুরি,
ও মন-বেপারী ॥

মহাজনে পুঁজি দিয়া
দিল ভবে ভাসাইয়া,
আইলা তুমি হইয়া বেপারী।
ব্যাপারেরও নাই দিশা,
সোনার দরে কিনলে সীসা ;
নপ্‌ছ রাজার সৈন্য-সেনা
বাড়াইল চল্লিশগুণ দেনা,
ও তুমি সব ডুবাইলা কাম-সাগরের পারে,
ও মন-ব্যাপারী ॥

কাম-সাগরে জ্বলছে এক সোনা-পুরী,
সেই পুরীতে যাবে যারা,
জেন্তে-মরা হবে তারা,
মরামুখে কিসের বাহাদুরি,
ও মন-ব্যাপারী ॥

জবানেতে জিবরাইল, লাহুতে আজরাইল,
নাছুতে জাগাও দুইপরী,
কল্পতরু খবীর গড়ে,
মুরশিদে বর্জক ধ'রে
কাম-সাগরে যাও রে ডঙ্কা মারি'

উদয় মাইয়ার শাসন,
মণিপুরে মুরশিদের ধন,
নয়নপুরে মাইয়ার কর্মচারী।
কখন মারে, কখন কাঁদায়,
এস্কের পুতুল কলে নাচায়,
বর্জক-ধেয়ানে লাগাও ডাণ্ডা বেড়ি,
ও মন-বেপারী ॥

আট বাগ, বার থানা,
মাইয়ার চৌদ্দ জেলখানা,
চোর আইলে করবে গ্রেপ্তারি,
ও মন-বেপারী ॥

কালা শা কয়, বুঝ মন,
মুরশিদ অমূল্য ধন,
তায় ভজিলে মিলিবে কাণ্ডারী।
এ-কূল ও-কূল দুইকূল পাবে,
ভব-যাতনা ঘুচে যাবে,
মুরশিদের কর তাঁবেদারি,
ও মন-বেপারী ॥
জাগলে ঘরে হবে না চুরি ॥

[এই গানটি শ্রীহট্টের জনৈক ফকিরের নিকট হইতে সংগৃহীত]

৩৬৭

কি মজার ফুল ফুটেছে এই রঙের মাঝার।
দেখতে চমৎকার ভাসছে রে ফুল নিরাকার॥

মূল রয়েছে তদন্তরে, তদন্তরে নবীর দৃষ্টিকার,
লগ্নযোগে লিখা কোষ্ঠী, দৃষ্টি রাখে সৃষ্টিধর,
কি চমৎকার সেই অমূল্য ফুল তোলে সাধ্য কার॥

যোগীন্দ্র, ইন্দ্র আদি ফুলের চতুর্ধার,
ফুলে নৃত্য করে ভ্রমর-অলি,
ফুলে ব'সে আছে শশধর,
ফুলের উপর লিখছেন বিধি, দেবতা আদি,
বুঝা ভার, সাধ্য হয় কার॥

গরল ফুলের চতুর্ধারে,
তাই খেয়ে যে জীর্ণ করে,
এমন সাধু কোথাকার রে,
শুনে লাগে ভয়,
সে স্থলে বার পুষ্প ফোটে,
বার মাস দেখা যায়;
অলগ্নে খেললে জুয়া,
কত ফুল পড়ে ভূয়া,
লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়।
ফুল যেন সে চাঁদের তুল্য,
তাক লেগে যায় দেখতে তার॥

সে ফুল পায় কোন্ জন,
হক নজরে দয়া ক'রে
দিয়েছেন বিধি যারে যেমন।
ওরে পাগলা কানাই, না ধরে বিচার,
করে মিছে কাঠকাছারী সার॥

৩৬৮

গুরু এক রূপেতে তিন রূপ হয়,
রসিক হ'লে তা জানতে পারে।
জানতে পারে, ওরে জানতে পারে,
গুরুর কৃপা হ'লে তা বুঝতে পারে

আচার্যরূপে মন্ত্রদাতা,
তিনি হ'লেন পারের কর্তা,—
তা না হ'লে তোর ভজন বৃথা—
যেমন ভেকে কল্লোল ক'রে মরে॥
এই তিনরূপ ভেঙে একরূপ ক'রে
অন্তরে যে ধারণ করে,
ডঙ্কা মেরে যায় সে ব্রজপুরে,
বলছে নবীন দৈন্য ক'রে॥

৩৬৯

আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে,
চল না আপন অন্তরে।
তুমি বাহিরে যারে তত্ত্ব কর,
অবিরত সে যে আজ্ঞাচক্রের উপরে॥

কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি রয় মূলাধারে,
প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে,
শক্তি চেতন হ'লে পূর্ণানন্দ মিলে,
তোমার সদানন্দ স্বরূপ একবার দেখ না।
বামে ইড়ানাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা,
রজঃ-তমঃ-গুণে করিতেছে খেলা,
মধ্যে বিরাজে স্বষুম্না,
তারে ধর না কেন সাদরে।

তখন আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে
উদয় হবে প্রাণে
তুমি যারে খোঁজ সদা বাহিরে॥

৩৭০

রসিক জনার মনের কথা রসিক জনা জানে।
অরসিকে রসিক জনার মর্ম জানবে কেনে॥

অরসিকের এমনি ধারা
ঠিক যেন নেবুর পারা,—
মশায় তাহার মর্ম জানে,—
অন্যে মর্ম জানবে কেনে॥

পদ্মের মধু পদ্মে থাকে ভ্রমরা তা জানে,
গোব্‌রে পোকা গোবরে থাকে, মধু চিনবে কেনে॥

রাধা-কৃষ্ণের নিগূঢ়-তত্ত্ব আছে বৃন্দাবনে,
গোপীর না হইলে অধীন, আনে জানবে কেনে॥

৩৭১

আপন দেহের খবর জান রে মন।
আছে তোর এই দেহে চৌদ্দ ভুবন॥

সবে বলে ৪০ সেরে মণ,
এবার সে মণে মন-মাটির ওজন
খাটবে না, মন, চাই ১২০ সেরের ওজন ;
আপন মনের সঙ্গে মিশাও মন॥
এবার এ মন সে মন একমন হ'লে
পাবি গুরুর দরশন।
ও তোর কুমন আজ করলে সুমন
শেষে মনের মত মিলবে মন॥

৩৭২

আপন দেহের খবর জান।
দেহের মধ্যে পরমবস্তু,
বাইরে খুঁজলে পাবে কেন॥

রক্ত ধাতু, শুক্র ধাতু, মা-বাপ দুইজন,
ও তার শুক্র ধাতু পরম পিতা
তাহারে ভজনা কেন॥

কুলকুণ্ডলিনী সহায় রেখে উর্ধ্বে বাদাম তোল,
দশ-ইন্দ্রিয়কে শিষ্য ক'রে জ্ঞান-বড়শিতে টেনে আন॥

সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র পঞ্চতত্ত্ব গুরুর কাছে জান।
গোঁসাইচাঁদে বলে নিগুম ধ'রে আছে গুরুর বস্তু-ধন॥

৩৭৩

আমার জীর্ণ তরীর ভাবনা গেল না।
নৌকায় পানি তো আর মানায় না ॥
ওগো, গুরো জেঁতে উঠল পানি
ডওরাতে লাগল লোনা ॥

আমার নৌকায় আর জল মানায় না,
দয়াল, নজর ক'রে তাও দেখলে না,
ধর, মুরশিদ, প্রাণে মরি'
আমাতে আর আমি না।

আমি যখন হুগলীতে গেলাম,
কালনার ঘাটে নাও বাঁধিলাম ,
নঙ্গর করলাম ক'যে কিনারায়,
ছয়জনা বোম্বেটে জুটে,
আমার নৌকার মাল সব নিল লুটে,
কাছি-দড়ি কেটে-কুটে
ভাসিয়ে দিল যমুনা ॥

আমি নিব সাধু-গুরুর চরণ-ধূলো,
আমার নৌকা-বাঁচার উপায় বল ;
গোঁসাই বলে, ছিরু,
তুমি মনের ময়লা রেখো না।
তা হ'লে বাঁচবে তোমার নৌকা,
ও সে টলবে না ॥

৩৭৪

নূতন চাষা ম'ল পরাণে চাষের ভাব না জেনে।
আমজোয় শুক্‌না ডাঙায় ধান বোনে বেগুন-জ্ঞানে॥

যাদের জমি জোয়ার-জল-ভরা,
আমজোয় বুনছে রে তারা,
যখন জল শুকাবে, ধান মরিবে, তখন বেড়াবি মুষল টেনে॥

যাদের টই-টম্বুর জমি, চাষেরও কমি,
মানে না সে ঢেলা-খোলা এমনি জমিনে।
অনুরাগের মই নইলে রে তুই ঢেলা ভাঙবি রে কোন্ গুণে॥

(ও তুই) কিনলি বলদ দুটি,
শোন্ তাদের কথাটি,
তার একটি ঢিলে, একটি গড়ে'—
এমনি জোড়াটি।
(তাদের) ধরে এনে জুড়ে দিলে অমনি গড়িয়ে পড়ে জমিনে।

গোঁসাই পরমানন্দ কয়, মতে তোর কর্ম নয়,
নূতন চাষ করতে গেলে এমনি দশা হয়।
ভক্তি-প্রেমের বিদে নইলে রে ধান নিড়াবি কোন্ জ্ঞানে॥

৩৭৫

কন্দর্প-রসে মত্ত হ'য়ে প্রেম-তত্ত্ব করলাম না॥
সাধক চতুর যারা,
হংসেরি সমান গো তারা,
তাদের বিপরীত ধারা।
নীরে-ক্ষীরে মিশাইলে, ক্ষীর খায় নীর ফেলে,
মনের ভুলে নীর পান করে না॥

প্রেম করেছিল বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন,
শতকোটী গোপীতে কাম-নির্বাপণ,
নিরন্তর কাম-ক্রীড়া তাহার আচরণ,
রাধা-প্রেম রত্ন-খনি,
তাহাতে নিভে সকল অগ্নি,
সেই রাধার প্রেমের দায়
নবদ্বীপে গৌর হ'য়ে কেঁদে প্রেম বিলায়,
পাত্রাপাত্র দেখে না ॥

রামী আর চণ্ডীদাস, লছিমা-বিদ্যাপতি,
বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি, আর জয়দেব-পদ্মাবতী,
এরাই তো জেনেছিল বিশুদ্ধ পিরিতি।
নব রসিকের কর্ম, তিন প্রভুর মর্ম,
যে জন পালে গোস্বামী-ধর্ম,
তার গর্ভ-যন্ত্রণা আর হবে না ॥

৩৭৬

আত্ম-সুখ নাইকো যার, তারি হবে গোপী-ভাব।
তার নাইকো অন্য অভাব,
কৃষ্ণ-সুখে তৎপর তাহার স্বভাব,
সেই ভাবেতে বশ কৃষ্ণ, না হ'লে কৃষ্ণ-কৃপা হবে না ॥

প্রথমে আয়াস-যোগে দুখময় বিষ-ভোগ,
গুরু-কৃপা-বলে হরে সর্বরোগ,
যে সদ্‌গুরু-বদনে তত্ত্ব নাহি শুনে,
তারে প্রকৃতি-সাধনে শপথ দিয়ে করি মানা ॥

দুরন্ত যে মত্ত বারণ বারণ নাহি মানে,
অঙ্কুশাঘাতে মাহুত তারে বশে আনে,
ক্ষিপ্ত হইলে মাহুত অমনি করীর শিরে হানে
মনোমত চালায় তাবে,
সমরে সে কভু না হারে ;
তেমনি যে বাণ, পিরিতি-রসের সন্ধান,
কাম-লোভে হারায় না জ্ঞান,
তার পরাজয় হবে না ॥

গোঁসাই প্রসন্নকুমারের এই সত্য-বাণী,—
প্রেমধন আছে যার, সেই তো ধনী,
নশ্বর ধনে ধনী কিসে বা গণি ।
রাখ প্রেম হিয়ার মাঝারে,
কভু যেন ছেড় না রে,
শুন বলি হরি, কামের বিষ হরি',
সাধ কৈতব পরিহরি'
লাজ, ভয়, ঘৃণা ॥

৩৭৭

কৃষ্ণের অধীন হওয়া মুখের কথা নয় ।
কেবল রসিক অনুরাগীর কর্ম,
রাগের গুণে সুলভ হয় ॥

অনুরাগীর এই লক্ষণ—
ভাবে মগন তনু-মন ,
বাতুলের প্রায় দরশন,
বোবা-ন্যাকার ভঙ্গী তায় ।

তৃণাদপি সুনীচ জন,
সর্বত্র যার সম জ্ঞান,
কৃষ্ণময় যার দ্বিনয়ন,
তার ধ্যানে সদাই কৃষ্ণ রয় ॥

ছিন্ন-অষ্টপাশ যে জন,
কৃষ্ণ-ভজনের যোগ্য সে জন,
সদা পূর্ণানন্দ তার
দিন-রজনী সমান যায়।
অপ্রাকৃত গোবিন্দ কয়,
সদাচার-কদাচারে নয়,
কেবল গোপী-প্রেমে ঋণী হয়,
শ্রীভাগবতে ব্যাসদেবে কয় ॥

গোপী-প্রেমের বলিহারি,
শঙ্কা, স্বজন পরিহরি',
কৃষ্ণ-সুখ লক্ষ্য করি'
নিশিতে নিকুঞ্জে যায়।
কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্মল,
যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
তপ্ত ইক্ষু-চর্বণ-ফল
সেই প্রেমাস্বাদে উপজয় ॥

যে জন বিষামৃতের বিষে মরে,
নিজে মরে পরকে মারে,
বহে জীবন মৃতাকারে,
হবে না তার গোপী-ভাব-উদয়।

শান্ত-মধুর ভাব সিদ্ধ হ'লে,
ব্রজ-গোপীর দেহ মিলে,
রাগ বাড়ে তার তিলে তিলে,
অহি-শার্দূলেতে নাহি খায়

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম,
সকলি মনের ভ্রম,
গোবিন্দ-ভজনের ক্রম
না সাধলে কি সাধন হয়।
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক হরি,
ঘটে ঘটে বিরাজকারী
চৈতন্য কৃষ্ণ নাম ধরি',
তার তত্ত্ব পাবে, নিলে—
মধুর রসের আশ্রয় ॥

৩৭৮

মধুর রসের ভিয়ান কর আত্মায় ॥
আশ্রয় ল'য়ে যে জন ভজে,
তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
একথা না জেনে যে অন্ধ মজে,
সে ভবকূপে খাবি খায়।
যেতে চাও ব্রজধামে,
শবের গমন স্বং বামে—
তবেই যাত্রা শুভ কামে,
সেই মানুষ সঙ্গে মানুষ পায়

নিত্য বৃন্দাবন-পুরী,
বিধি-অগোচর মাধুরী,
বিধি-মার্গে ঘুরি'-ফিরি'
ব্রজের কৃষ্ণচন্দ্র নাহি পায়।
শুনি গোপীর ভাবামৃতে
লোভ জন্মালে হারায় চিতে,
সে পারে কৃষ্ণ উপাসিতে
বদ ধর্ম লঙ্ঘি' গুরুর কৃপায় ॥

গোপী-ভাব নিষ্কামী বলে,
তা ঘটে সহজ সাধন-বলে,
রামানন্দ-গৌর মিলে
সাধ্যবস্তু-নিরূপণ ;
ধনের সন্ধান দৈবজ্ঞ-গণন,
শ্রীমহাপ্রভু সনাতনে কয়

গোঁসাই প্রসন্ন ভাষে,
অমর পূর্ণশশী ভাসে
সেই অধর ধরবার আশে,
মূঢ় বামন হরি কর বড়াই।
পিপীলিকার সাধ উড়িবারে,
পাখা পায় সে বিধির বরে,
কিন্তু পক্ষী হইতে নারে,
সে পক্ষীর গ্রাসে প্রাণ হারায় ॥

৩৭৯

সময় গেলে সাধন হবে না রে অবোধ মন।
যতন-আগ্রহ বিনে মিলবে কি রে প্রেম-রতন ॥

অসময়ে সাধন করা—
জল ত্যজে আল বন্ধ করা ;
যে জন চতুর হবে, আল বাঁধিবে
জল থাকবে ক্ষেতে যখন ॥

দিনে দিনে দিন যে গেল,
আয়ু ক্ষীণ হ'য়ে এল,
যেদিন আসবে শমন করবে বন্ধন
তোরে রক্ষা করবে বলি কোন্ জন ॥

শ্রীগুরুর চরণ ধর,
আত্মনিবেদন কর,
গুরুর দয়া হইলে সুফল ফলে
যেমন রাজার কোলে তনয়-রতন।

যেন ছয় চোরে যুক্তি ক'রে
দেহের ধন না লয় হ'রে,
সিঁদ কেটে চোর পালায়ে গেলে
ধেয়ে যাওয়া বিফল কারণ ॥

গোঁসাই প্রসন্নের বাণী—
বাক্য মানিলে গুরু মানি,
গুরু কৃপা করে তার উপরে ;
হরির অধরে গোঁসাইএর চরণ ॥

৩৮০

বড়র কাজ নয় গো জেনো,
ছোট হ'লে মিলে প্রাণের হরি ॥

দেখ, মেঘ থেকে পড়ে জল,
আশ্রয় করে নিম্ন স্থল,
নিশ্চয় জানিও কেবল
নীচে জমে কৃপাবারি ॥

ছোট কি ছোট হ'তে পারে,
বড় হবার আশা করে,
যার মন রয়েছে মান-খাতিরে
কিরূপে করবে ফকিরি ॥

ছয় রিপু খাটো কর,
জ্ঞানের আরশি হাতে ধর,
বাঁকা মন সরল কর,
ভজনে হবে অধিকারী ॥

একটি সার যুক্তি ধর,
মাটির কাছে শিক্ষা কর,
শক্ত বাঁধ বাঁধিয়ে সর,
পাঁকে পড়বে না তরী ॥

শ্রীগুরুর চরণে বাস
যার হয় না আশা, তার সর্বনাশ ;
দিনে দিনে ভজনে উল্লাস,—
ত্বরায় যাও হে মদন মারি' ॥

উপজিলে প্রেমাঙ্কুর,
ভাঙবে তোমার দুঃখের পুর,
সেই প্রসন্ন মথুরাপুরী,
কেমনে বাঁচবে হরি প্যারী ॥

৩৮১

ইন্দ্রিয় দমন কর আগে, মন,
না হ'লে সাধন হবে না, হবে না।
যে উপায়ে, মন, তোর ঘুচিবে বন্ধন,
সেই উপায়ে মনকে রাজী কর না, কর না।

পরের কথা শুনে হরি ব'লে নাচ,
হরি কোথা আছে, তারে না দেখিছ ;
শুনেছ, শোনা কথা কহিছ,
নিশ্চিন্ত রয়েছ, পরিণাম ভাব না।

আত্মরূপে হরি প্রতি ঘটে ঘটে,
তারে না চিনিয়ে বেড়াইছ ছুটে ;
জ্ঞান-আঁখি যার ফুটে,
অষ্টপাশ সে-ই কাটে ;
শোনা-কথা তুমি শুন না, শুন না।
পিতৃ-বীজ-তত্ত্ব না জেনে কখনো
হরিকে পাবে না, পাবে না ॥

৩৮২

আগে মনের মানুষ ধর।
হবে তোমার সাধন-সিদ্ধি,
বৃদ্ধি হবে প্রেমাঙ্কুর॥

কেবল বকাবকি, ফাকাফুঁকি,—
তোমার ভজন বাকী, সাধন বাকী,
উশুল বাকী, খরচ বাকী,
ঠিক দিবা কি, ভেবে মর

মুখে বল সাধনের কথা,
সাধন কি কথার কথা,
কত মুনি, ঋষি সাধতে গিয়ে
দেখে সাধন ভয়ংকর॥

যত সব মজুর-মুটে,
পিতৃ-ধন নিল লুটে,—
যদি ভাগ্যক্রমে থাকে কিছু,
তবে হবে প্রেমাঙ্কুর।
নইলে সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হ'য়ে
মাথা কুটে ঘুরে মর॥

যে থাকে অনুরাগে, তুমি তারে ধর বেগে,
ব'সে যোগাযোগে যোগসাধনে
তারে শরণ নিতে পার।
তুমি বিকারের রোগী, অম্বলে সাধ কর,
আগে কালকূট বিষ শোধন ক'রে
বিকার-বিষকে ঘিরে মার॥

বলি সাধনের রীতি,—
ল'য়ে প্রকৃতি সতী
অগ্নি-পারাতে গতি,—
উভয়রীতি থাকতে যদি পার,
তবে সেই মানুষকে সঙ্গে ক'রে
রঙ্গে-ভঙ্গে ফের।
গোঁসাই অটলচাঁদ বলে, নারাণে তুমি
মিছে ভব-ঘোরে ঘুরে মর॥

৩৮৩

ভব-সিন্ধু সেতু-বন্ধ ক'রে হও রে পার।
গুরু-উপাসনা ছাড়া পার হওয়া হবে ভার॥

যেমন রাম-অবতারে সীতা লয় হ'রে,
সীতানাথ উদ্ধারিল বাঁধি জলধিরে,
রাম রাবণকে নিধন ক'রে তখন কৈল উদ্ধার॥

রেচক, পূরক, স্তম্ভন দিয়ে নদী কর বন্ধন,
প্রেম-ভক্তি খুঁটি তার কর স্থাপন,
এবার হেলে দুলে যাবে চলে কি করবে তুফানে তোর॥

সে নদী অত্যন্ত গভীর, আছে কাম-রূপী কুম্ভীর,
বাঁধলে সাঁকো সে হবে ভেক, গুপ্ত হবে নীর।
সেথায় আছে লোভ-রূপ রাঘব, ক্রোধ-রূপ হাঙর আর

সুদৃঢ় শ্রদ্ধা-দড়িতে ধরা বাঁশ বাঁধ তাতে,
গোঁসাই রামলাল বলে, রামচন্দ্র যাও ধরে তাতে,
যেমন শূন্যকারে বেদে বাজি করে রজ্জুর উপর॥

৩৮৪

বিশ্বাসী হও ঐ চরণে।
সৌভাগ্যে পাওয়া যায় না,
ওরে, বিশ্বাসে পায় অমূল্য ধনে॥

বিশ্বাসী সর্বত্র সুখী,
অবিশ্বাসী সদাই দুখী,
এবার অবিশ্বাসী আমায় দেখি
হারিয়েছি ঐ নিত্যধনে॥

অভিমানী ভক্তিহীনে,
দুঃখ পায় সে চিরদিনে,
আমার মন কাঁদে ঐ চরণ ব'লে,
পেলে সভক্তি হই এই ক্ষণে॥

কালাচাঁদ পাগলে বলে,
ভক্তি ভজিলে মিলে,
আমি অভয় পাব কেনে
এই ভক্তিশূন্য অভাজনে॥

৩৮৫

মানবদেহ কল্প-ভূমি
যত্ন করলে রত্ন ফলে।
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে
শুভযোগে চাষ করিলে॥

কর্ম-ধাতুর লাঙল ধ'রে,
ছয় বলদে নে চাষ ক'রে;

সময় হ'লে রতন মিলে,
জো থাকিতে বীজ বুনিলে ॥

এই জমি তোর চৌদ্দ পোয়া,
ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া,
মন্ত্র-বীজে নে সৃজে,
গাছ হ'লে বীজ জন্মে মূলে ॥

কালাচাঁদ পাগলে বলে,
ফুল ফুটিবে জলে,
ঐরূপ মিলে ভজন সত্য হ'লে,
হৃদ্-কমলে প্রেম উথলে ॥

৩৮৬

এই দেহ-জমিনে শুদ্ধ শুভ দিনে গেছে বিছন বুনে
গুরু রূপ ধরি ॥

শোন্ আমার মন, বিলম্ব আর কেন, সু-সাধু কিরষাণ
আন ত্বরা করি ॥

মন, তোমাকে বলি, শোন আমার কথা,
এই পতিত জমিনে শুদ্ধ লতাপাতা,
বীজ রোপাইয়ে গেছেন মন্ত্রদাতা,
যত্ন ক'রে এবার সেচ নিত্যবারি ॥

দীক্ষা-গুরু মন্ত্র দিয়েছে শ্রবণে,
সাধু-সঙ্গ বিনে উপায় দেখি নে,
আবাদ না করলে জমিন ফসল পাবি নে,
আবাদের এবার কি উপায় করি ॥

৩৮৭

আমার গৌরচাঁদের দরবারে
একমন হ'লে সে-ই যেতে পারে।
দুই-মন হ'লে পড়বি ফেরে,
পারবি না যেতে পারে ॥

ওরে চার দশে হয় চল্লিশ সেরে মণ,
ও তার রতি-মাষা কমতি হ'লে লয় না মহাজন,
সদরের হুকুম আছে, রাধারাণী পার করে ॥

ওরে কাঠুরেতে মাণিক চেনে না,
ময়রার বলদ চিনি বয়, তার স্বাদ জানে না,
সোনার বেনে সোনা চিনে পরখ ক'রে নেয় তারে ॥

ওরে সদরে আছে শ্রীরূপ গোঁসাই সনাতন,
ওরে আনন্দ-বাজারে তারা প্রেমের মহাজন,
প্রেম-দাঁড়ি ধ'রে, ওজন ক'রে, ঘষে মেজে লয় তারে

যে জন চাক্তি-গুড়ের ভিয়ান জানে না,
কাঁচা রসের ভিয়ান ক'রে ওলা বাঁধবে কি ক'রে ॥

৩৮৮

দেখ না মন নেহার ক'রে।
আছে এক বস্তু চাপা, রসে ঢাকা,
রসিক জনার অন্তরে ॥

রসিকের পাগল দশা দেখে
জীবের নেক নজরে না ধরে '
তাতে রতি-মাষা তফাৎ
হ'লে টেনে দেয় দূরে ॥

ওরে বেদবিধির পর রত্ন আছে
দেখলাম তত্ত্ব ক'রে।
আমার গ্রন্থকর্তা রাখলেন কলম
সহজ লিখতে না পেরে

৩৮৯

স্বরূপের বাজারে থাকি।
শোন রে ক্ষ্যাপা, বেড়াস একা,
চিনতে নারলে ধরবি কি॥

কানার সঙ্গে বোবা কথা কয়,
কানা গিয়া স্মরণ মাগে, কে পাবে নির্ণয়;
আবার অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে
তার মর্মকথা বলব কি॥

মরার সঙ্গে মরা ভেসে যায়,
জ্যান্ত ধরিতে গেলে হাবুডুবু খায়,
মরা নয় সে রসের গোরা
তার রূপে দাও আঁখি॥

৩৯০

এলো প্রেমরসের কাঁসারি।
আয়, সবে ভাঙা-ফুটো বদল করি॥

একটি নয় গো ছিদ্র নয়টা,
রস বিহনে অন্তর ফাটা,
জল থাকে না একটি ফোঁটা
আঠা দিয়ে যত সারি॥

সকলে ভরে গাগরি,
দেখে দেখে ফেটে মরি,
জাগন্ত ঘরে হয় গো চুরি,
এ জ্বালা কি সইতে পারি ॥

৩৯১

সহজ শুদ্ধ রাগের মানুষ কই মেলে।
ও তার কিঞ্চিৎ প্রেমের অঙ্কুর হ'লে
বৈদিক রাগে যায় জ্বলে ॥

যদি হয় প্রেমের অঙ্কুর,
সে দেখে আপনাকে ঠাকুর,
লঘুগুরু মানে না সে বৈদিক রাগে চুর।
হ'য়ে মনে মোটা, মেজাজ চটা,
লোককে কুবাক্য বলে ॥

বলে আমরা রসিক হ'য়েছি,
টল-অটল সেধে আমরা সুটল হ'য়েছি,
স্ব-সুখের জন্যে অটল হয়ে
সার-পদার্থ গেছি ভুলে ॥

ব্রজনাথ ব্রজে এসে রসের ভিয়ান পেতেছে,
ব্রজে রাধা না পেয়ে ধাক্কা খেয়ে নদেতে এসেছে ;—
চাঁদগৌর বলে, গৌরহরি কাঁদছেন
রাধা রাধা বলে ॥

৩৯২

যার ঠিক হয়েছে নিরিখ-নিরূপণ
দরশন সে পেয়েছে।
সে দূরবীন্ ধ'রে, নজর ক'রে,
এক রূপ ধ'রে রয়েছে॥

পূর্বে যার সাধন আছে,
এ সব ভেদ সে জেনেছে,
সে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় ক'রে
এক নাম ধ'রে ব'সে আছে।
ও সে বেদ-বেদান্ত জেনে হায়
যমকে ফাঁকি দিয়েছে॥

আবে আতশ মিশায়ে, খাক বাত সব হিসাব করে,
এক নাম জপে কোণে বসে,
যার নামে জগৎ জুড়ায় তারে কেবা চিনেছে॥

গোঁসাই পূর্ণচাঁদে বলে,
মানুষ ধরলে মানুষ মিলে,
সেই মানুষের ঘর চিনিলে
তারে যায় ধরা।
সে ত ভাবের গোরা, আবের ছায়া,
মানব রূপে বিরাজ করিছে॥

৩৭৩

মানুষ কি কথায় যায় ধরা।
ধ্যান ক'রে পায়না যারে ব্রহ্মা-আদি দেবতারা ॥

গুরুর কৃপায় বশ মানিবে ভজনবাদী ছয় চোরা,
তোমার সাধন-সিদ্ধি তলিয়ে যাবে ছুটলে নয়নতারা।
ধরবি যদি অধর মানুষ ঠিক রেখো নয়নতারা ॥

বিরজার পূর্বপারে এক মানুষ বিরাজ করে,
সেই মানুষ নেহার কর, চেতন মানুষ তারা,
কামিনী সাপিনী কূলে হয়ে থাক মরা,
চোরা ঘুমের ঘোরে বিভোর হ'য়ে
লাভে-মূলে হবি হারা ॥

যার গুরু কামেল আছে, ঠিক মানুষ সেই ধরেছে,
সে অনায়াসে ঘাট পার হ'য়ে বসে আছে,
গোঁসাইচাঁদ বলে, সে কাল-শমনের ভয় রাখে না ॥

৩৭৪

দেশ ছেড়ে যেতে হ'ল কাম-মশার কামড়ে।
মশা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে কানের কাছে গান করে ॥

মশার কিবা মধুর গান,
শুনে প্রাণ করে আনচান,
জ্ঞান-চাপড়ে মারব মশা করেছি সন্ধান।
জ্ঞান হ'ল না, মশা ম'লনা,
হে-হুঁশিয়ারী চাপড়ে ॥

ঘরের ভাঙা দরজা,
মশা পেয়েছে মজা,
আচার-বিচার খুঁটিনাটি
ঘরের চারিদিকে গোঁজা।
মশা ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে যাচ্ছে,
বে-ওয়ারীশ মহল পেয়েছে,
দেহের রক্ত চুষে খাচ্ছে,
প্রাণ বাঁচাই কি ক'রে ॥

৩৯৫

গুরু, কবে হবে গো সেই শুভক্ষণ।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাইকিশোরী দিবেন দরশন ॥

চম্পকবরণ যিনি শ্রীগোবিন্দমোহিনী,
কবে সেই বিনোদিনী হেরে জুড়াব নয়ন

কবে মোর যাবে প্রকৃতি,
অন্তরে হবে নব প্রকৃতি,
সখী-ভাবের সুপ্রকৃতি
কবে হবে আলম্বন ॥

যার তরে প্রাণ কেমন করে,
পাব সে রতন কেমন ক'রে
রবিসুত-দূত-করে
কিসে পাব পরিত্রাণ ॥

গোঁসাই পূর্ণচন্দ্র ভণে,
কন্দর্পকে বাঁধ মনে,
ভাবে মিলাও স্বরূপ জেনে,
এই ভাণ্ডেতে আছে রতন ॥

৩৯৬

মরি কি কলের বাতি
দিবারাতি জ্বলছে এ শহরে।
লণ্ঠনের মধ্যে পোরা,
দেখ গে তোরা,
ঝড়-বাতাসে নেভে না রে॥

টিপ দিলে বাতির কলে,
বাতি জ্বলে বিনা তৈলে;
সে ধরম জানে যারা, জ্বালায় তারা,
অন্যে কি জ্বালাতে পারে॥

এ আলোর এমনি ধারা,
অন্ধকারে তারাও হেরে অন্ধ যারা;
এ রঙ-বেরঙের আলো জ্বলছে ভালো,
অখণ্ড মণ্ডলাকারে॥

এ দীন পুণ্যে রটে, ঘোর সঙ্কটে
আলোয় শহর রক্ষা করে।
এ আলো নিববে যখন, জানবি তখন
শহর যে তোর টিকবে নারে॥

৩৯৭

সাধ্য কার আপন জোরে যেতে পারে ভব-পারে।
গুরু-কৃষ্ণ যারে কৃপা করে, সে-ই যেতে পারে পারে॥

ভব-নদীর মধ্যস্থলে চুম্বক পাথর সদাই খেলে,
তার আকর্ষণে গলুই খসে,

অমনি তরী যায় গো ফেঁসে,
দাঁড়ী-মাঝি ভাবে ব'সে,
দিশে-হারা সেই নীরে ॥

যে নদীতে দৃষ্টি যায় ভুলে,
সে ইষ্ট-নিষ্ঠ সব হারায়ে ফেলে,
কটাক্ষে তার তরী পড়ে পাকে,
ও তায় এক চাপনে খণ্ড করে ॥

যে নদীর হাওয়া বুঝে তরী ছাড়ে,
পাল-গুণ তার ছেঁড়ে না রে,
সে ডঙ্কা মেরে চলে যায় পারে

গোঁসাই রামলাল বলছে ডেকে,
কামী-লোভী পড়বে পাকে,
রামচন্দ্র, শোন্ বলি তোকে
ভাবে ডুবলে যাবি ভব-পারে ॥

৩৭৮

চিনে নে রে রাং কি সোনা।
কত জন কত ভাবে, তারে ভাবে,
ভাবে রে তার নেনা-দেনা।
সে যে সব ভাবাতীত, ভাব-অতীত,
ভাব ব্যতীত লাভ হবে না ॥
নিশিতে আঁখি খুলে শশীর কোলে
অরূপের রূপ দেখে নে না।
হারালে শশীর কিরণ, হারাবি ধন,
ভোর হ'লে সে আর রবে না

দীনহীন পুণ্যে বলে, আলোক জ্বেলে
পলকে সে রূপ দেখে নে না।
শ্রীগুরুর কৃপা বিনে অন্ধ জনে
সে রূপ নজরে দেখতে পায় না ॥

৩৯৯

সহজ ভাবে দাঁড়াবে কি সে রে,
মনের মানুষ না হ'লে পরে ॥

আসমানে তার গাছের গোড়া,
জমিনে তার ডাল রে।
সে গাছে ফুল ধরে, তার ফল ধরে না,
সাঁইজীর হাতে ফল রে ॥

গঙ্গা ম'ল জল-পিপাসায়,
অগ্নি ম'ল শীতে রে।
জলের মধ্যে পাখীর বাসা
গাছের মাথায় ডিম রে ॥

উত্তরে তার শিয়রখানি
দক্ষিণে তার পা রে।
পূর্বদিকে হাত দু'খানি
পশ্চিমে কয় কথা রে ॥

তিন তারে এক সুর বেঁধেছে,
তাইতে বাজনা বাজে রে,
সে ঘোড়া ছুটে, বাজনা বাজে,
তার রব ঠিক রাখ রে ॥

গুরু যাবে নৌকায় চড়ে,
আমি যাব তড়ে রে।
গুরুর সঙ্গে দেখা হবে
নিমতলার ঐ ঘাটে রে

৪০০

কামী জীব দেখলে যায় চেনা।
কামী জীবের বহুৎ নিশানা॥
পিপীলিকার ফোড় হ'লে সে উড়তে শেখে,
সে তো মউতের ভয় করে না॥

শকুন বহুদূরে উড়ে
তার লক্ষ্য থাকে ভাগাড়ে,
কামী জীবের তেমনি গতি
সদাই মদনের গাঁটরি টানা॥

শপথ করলেও ভুলে যায় বাণী—
আমি তা বিশেষরূপ জানি ;
ওরে কাম থাকিতে প্রেম হবে না,
তারণ কর্ গুরুর উপাসনা॥

৪০১

নদী নদী হাতড়ায়ে বেড়াও অবোধ, মন!
মিছে ভ্রমেতে কর ভ্রমণ॥
তোমার হৃদয়-রত্নাকরের মাঝে,
আছে অমূল্য রতন॥
দেহে থাকতে সহজ মানুষ, ধরতে না পারে যে জন।
তার বৃথাই জন্ম, নরের অধম, বিধাতারই বিড়ম্বন॥

কাঞ্চন ত্যজিয়ে কেবা কাচেতে করে যতন।
যেমন স্বর্গ ত্যজে ইচ্ছা করি নরকে করে গমন ॥
যে যা বলে তারই কথায় দৌড়ে বেড়ায় ত্রিভুবন।
তোমার ঘরের মধ্যে বিরাজ করে বিশ্বজয়ী সনাতন ॥

কারুর কথা না শুনিবি, শুন্‌বি স্বগুরুর বচন।
তবে ঘরে বসি দিবানিশি কর্‌বি তাঁরে দরশন ॥
ছাড়্‌বি না পাইলে রসিক, প্রেমিক. সুজন মহাজন।
ও তোর যে দিনে চৈতন্য হবে, লক্ষ্য কর্‌বি নিত্যধন ॥
নিতাইদাস বাউলে বলে, শুন শুন সাধুজন,
কেন আত্মতীর্থ ত্যাজ্য ক'রে মিছে তীর্থ-পর্যটন ॥

৪০২

আমার কি লাভ হ'ল
এসে এই ভবের বাজারে।
আমার বেসাত কিছু হ'ল না রে
খালি হাতে যাই ফিরে ॥
এমন আশী-লক্ষ বার কেবল ঘোরাঘুরি সার।
প্রাণ গেল রে এই ক'রে।

ভাণ্ডারে আছে রতন,
জানিনা তার কেমন গঠন,
না লই যতন,
আমার চক্ষু থাকতে পাইনে দেখতে
বেড়াই খালি ঘুরে ঘুরে ॥

হাটের যত জহুরি, আত্মসারে তারা গেল কাজ সারি,
আমায় কাঙাল ব'লে কেউ দেখলে না,
চোর লুটে নিল ভাণ্ডারে ॥

দীন ভুবন বলে, মিছে কেন তুমি ভাব রে।
ধর গুরু-মহাজনের চরণ,
তাঁদের কৃপায় চিনবে রতন,
মিলবে তখন,
ভাল বেসাত হবে এ সংসারে ॥

৪০৩

ধর্ম-সাধন করতে হ'লে গুরু মারতে হয়।
কথা মিথ্যে নয়, সাধুশাস্ত্রে কয়,
স্ত্রী থাকতে গৃহশূন্য, সাধক বলি তায়

মনে করি গুরু মারি,
মনের দোষে নাহি পারি,
হামেশাই তারা দাগা দেয় ॥

গুরুর হস্ত-পদে লাগাও বেড়ি,
কাট একখানা প্রেমের ছড়ি,
এমনি ক'রে মার বাড়ি,
যেন চারযুগ বেঁধে দাগ বয় ॥

মার উদরে বাবা গেল
তারা দু'জনে একসঙ্গে ম'ল,
সহমরণে দু'জন গেল
ম'রে একটি বস্তু পায় ॥

মার কোলেতে বাবা ব'সে
দুগ্ধ খাচ্ছে হেসে হেসে,
পাড়ার লোক দেখসে এসে
পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয় ॥

গুরুর মাথা শিষ্যের পদ
চারযুগ আছে দিবারাত ;
ফকির ভেবে হ'ল হত,
পঞ্চুচাঁদ ব'লে যায় ॥

৪০৪

বেহুঁশিয়ার হুঁশার হয়ে চাবি দে রে মাল ঘরে
মহাজনের পুঁজি এনে বসে আছ চুপ করে ॥

ঠক-বাজারে দোকান ক'রে
মাল-মসল্লা তোর নিল চোরে,
ও তুই অচেতনে রইলি প'ড়ে
কি ধন দিবি ভবপারে ॥

সব হারাস তুই ঠক-বাজারে,
ঋণী হ'স তুই বারে বারে,
তাইতে ঘুরিস মায়ার দ্বারে,
কেমনে যাবি সদরে ॥

এখন তুই হুঁশার হ'য়ে,
সাধুজনার চরণ ধ'রে,
ব্যবসা নাও শিক্ষা করে ;
হবে বিকিকিনি পরে পরে ॥

বলে দীন মনোহরে
চল ভবনদীর তীরে,
কৃষ্ণ অধরের চরণ ধ'রে
পাড়ি দিবি একবারে ॥

৪০৫

যে-জন বেকুব তার বেকুবানা কই গেল।
মন-বেকুব পরের ভোলে ঘরে বাতি নিভাল ॥

শুন, মন, বলছি বারে বার,
আগে ঘর জেনে কর্ম কর,
ঘর না জেনে মন্দোদরী
নিজ বাণে রাবণ ম'ল ॥

কারিকর মোমিন মুসলমান,
সে বেটা জাতের প্রধান,
উলুর ভুঁয়ে সাঁতার দিয়ে
জলুস প্রকাশ করল ॥
কথা বলব কি সভায়,
বলতে লজ্জা হয়,
বার নারিকেলে তের ব্রাহ্মণের
ঘাড় ভেঙে তারাই ম'ল ॥

সহবত করে তার সন্ধান,
তার আমি কি দিব প্রমাণ,
ঢোঁড়া গোবরে বিষ হারাল,
তারণ তোর ললাটে তাই হ'ল

৪০৬

ভজ রে ভজ রে, ও মন, শক্তি মূলাধারে।
শক্তি বিনে মুক্তিপদ এ ভবে কেউ দিতে নারে ॥

শক্তি কি যে অমূল্য ধন
জানেন শ্রীনন্দের নন্দন,
তাই রাধা নাম করেন কীর্তন
স্বহস্তে তার পায়ে ধ'রে।
আবার নদেয় এসে অধীর হয়ে
কাঁদেন 'রাধা' ব'লে ভূমে প'ড়ে ॥

আবার দেখ মহেশ্বরে,
শক্তির চরণ বক্ষে ধরে,
জীবে সে ভাব বুঝতে নারে,
মরে গিয়ে কামাচারে ॥

চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণের ছেলে
রজকিনীরে ভজিয়ে,
আত্মায় আত্মা মিশায়ে
নিত্যধামে গমন করে ॥

আর কত দিব উপমা
বিদ্যাপতি ভজেন লছিমা,
বৈষ্ণব শাস্ত্রে যায় রে শোনা
রূপ ভজেন মীরা বাইরে।
তারণ কয়, ভজ শক্তির চরণ,
শক্তি বিনে সাধন হবে না রে ॥

৪০৭

ওরে প্রেম করা কি কথার কর্ম,
আছে কামের মধ্যে প্রেমের জন্ম ॥

সেই প্রেম করা জ্যান্তে মরা,
কুমরে পোকার যেমন ধারা ;
রসিক যারা জানে তারা,
কামকে প্রেম করে সারা,
সুজন হ'লে উজন চলে,
ঐ দেখ টলে নাই তার সে সব ধর্ম ॥

সৃষ্টিছাড়া দৃষ্টি করা,
নিগুমেতে নেহার করা,
পূর্ব পরে বিচার ক'রে
রণ দিতেছে বিকারশূন্য ॥

প্রেম যদি সামান্য হতো,
প্রেমরসে কি সাধু ডুবতো ;
সেই প্রেম গোপীর ভাবাশ্রিত,
নারাণের এই মন-বৃত্ত—
ঐ অটল-চিন্তায় গেল জন্ম ॥

৪০৮

আছে কাম-প্রেমেতে মাখামাখি, প্রেমের জন্ম বুঝা ভার
আছে কামনদীতে বেনাপাতি জল,
ডুবে ডুবরি সব যায় রসাতল,
যার আছে গুরু-কৃপা বল
সে জনা যাবে পার ॥

ও তার প্রমাণ আছে দেখ সবে—
যেমন এক গাছেতে হয় দুই রকমের ফুল,
লাল ও শ্বেতেতে হয় সমতুল,
কাম আর প্রেম এইরূপ দুই জনা।

কাম লোহা, প্রেম কাঁচাসোনা,
গাভীর ভাণ্ডে গোরোচনা,
ননী যেমন দুগ্ধের সর॥

ও যে-জন চিনেছে জগৎস্বামী
কামে থেকে হয় নিষ্কামী,
তার আর কর্ম আছে কি,
ওসে প্রেমেতে খেলে সাঁতার॥

৪০৯

সে তো এই ভাণ্ডে আছে, ব্রহ্মাণ্ড খুঁজলে পাবি কি রে॥
বিশ্বেতে নাই ব্রহ্মাণ্ডে নাই,
বেদেতে নাই, বিধিতে নাই,
আছে নিরালে,
তার স্বরূপে মানুষ এসে
বিরাজ করে এই দেহপুরে॥

আসমানে তার ভাবের গোলা,
সহজ বস্তু আছে তোলা,
এই কথাটি বলতে গেলে
আর তো কিছু থাকে না রে॥

৪১০

সু-মানুষের সঙ্গ কর মায়াতে ভুলে থেকো না।
ভুলে ভ্রান্ত হ'য়ে রে মন, যেন নদী-নালায় জল খেওনা।
রূপের অনুগত না হলে সে ধামে যেতে পারবে না॥

অনুমান ছেড়ে ধর বর্তমানে
ঐ রূপ হেরি' দুনয়নে,
নেহার রেখ ঐ চরণে,
তোরে শমনে ছুঁতে পারবে না॥

মানুষ মানুষ সবাই বলে—
মানুষ ধরলে মানুষ মেলে,
জ্যান্তে-মরা না হইলে
চৈতন্য-কৃপা হবে না॥

থাক রে মন, চাতক হ'য়ে
গুরু-রূপে নেহার দিয়ে,
গুরুর কৃপা না হ'লে পরে
ভবপারে যেতে পারবে না॥

শম্ভুচাঁদের মানুষ-লীলে,
জীব তরালে অবহেলে;
ভেবে অধীন প্যারী বলে
আমার ভাগ্যে তাও হ'ল না

৪১১

সাধন কর মানুষ ধ'রে,
সে মানুষ চিনলাম না রে
মনের অহংকারে ॥

তোমরা দেখ রে যেই শ্রীচৈতন্য,
সে নয় কলিতে অবতীর্ণ,
সে নয় মানুষ ভিন্ন,
দেখ দেখ কোন্ মানুষ হৃদয়ে ব'সে
রূপের ঝলক মারে ॥

দেখ সহজ মানুষের এমনি ধারা,
সেই মানুষ ভাব-নেহারা—
এবার জেনে সেই মানুষের তত্ত্ব
হও গে তার অনুগত,
পাবি তুই পরমার্থ
তোর গুরুর দ্বারে ॥

দেখ এই মানুষ মানুষের গুরু,
প্রেমদাতা কল্পতরু,
মানুষ জগৎ-গুরু।
এই মানুষ মানুষের জন্যে
সদাই কেঁদে ফেরে ॥

ভেবে অধীন প্যারী বলে,
কেন মন, রইলি ভুলে,
ও দিন যায় বিফলে;
ঠাকুর শম্ভুচাঁদ যদি
কাঙাল বলে দয়া করে

৪১২

দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখসে তোরা আয়।
মানুষ পাঁচ-পাঁচা পঁচিশের ঘরে চাঁদোয়া ধ'রে ব'সে রয়

ভজনে সিদ্ধ হ'লে
সেই কথা তারে বলে,
রাখে তায় মাথায় তুলে,
নয়নকোণে ভাব দেখায়।
যেমন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ খেলে,
আয়না-মহল ঝলক দেয়॥

চণ্ডীদাস-রজকিনী
যুগল-প্রেম তারি শুনি,
আত্মায় আত্মা মিশায়ে ধনি,
দুই আত্মায় এক আত্মা হয়।
তারা দমের ঘরে বসত ক'রে
নিত্য বৃন্দাবনে যায়॥

রক্ত-কুমুদ অলখ বনে,
সেই খানে বারাম শুনে,
মানুষের খবর জেনে
রূপ-সনাতন ফকির হয়।
তারা বাদশাহী উজিরী ছেড়ে
ছিন্ন কন্থাগলায় লয়॥

বার চাঁদ বার মাসে
চব্বিশ পুর তায় ঘিরেছে,

চৌষট্টি রস মন্থন ক'রে
পঞ্চরসে ছাঁচ বানায়।
মানুষ দমের ঘরে আসন করে,
নয়ন কোণে ঝলক দেয় ॥

চার মানুষ চারটি দ্বারে
রয়েছে চাঁদোয়া ধ'রে,
দশ পদ্ম তার ভিতরে
কোন্ পদ্মে কোন্ মানুষ রয়।
ভেবে গোপালচাঁদ দরবেশে বলে
মানুষ দ্বিদল-পদ্মে কথা কয় ॥

৪১৩

ভাবের ভাবুক, প্রেমের প্রেমিক
হয় রে যে জন,
ও তার বিপরীত রীতি-পদ্ধতি,
কে জানে কখন
সে থাকে কেমন ॥

তার নাই আনন্দ-নিরানন্দ (ভাবের মানুষ)
লভি' নিত্য প্রেমানন্দ,
আনন্দ সলিলে যেন
তার ভাসছে দুনয়ন ;
ও সে কখন আপন মনে হাসে
আবার কখন বা করে রোদন ॥

সে জ্বালাইয়ে প্রেমের বাতি
ব'সে থাকে দিবারাতি,

ভাব-সাগরের অকূল পাথারে
ডুবায়ে দেয় মন।
ও তার হ'লেও সুখের চাবি হস্তগত
করে না সুখ অন্বেষণ ॥

তার চাল-চলন সব বে-আড়া,
সকল কাণ্ড সৃষ্টিছাড়া,
পূর্ণিমার চাঁদ হৃদয়-বেড়া
তার আছে সর্বক্ষণ।
সে শশীর নিশিদিশি সমান উদয়
সে চাঁদের আর নাই রে অস্তগমন ॥
(তার হৃদয় চাঁদের)

তার চন্দনে হয় যেমন প্রীতি,
পাঁক দিলেও হয় তেমনি তৃপ্তি ;
চায় না সে ধন-জন-খ্যাতি
তার তুল্য পর-আপন।
সে আসমানে বানায় ঘরবাড়ী
দগ্ধ হ'লেও এ চৌদ্দভুবন ॥*

৪১৪

মহাভাবের মানুষ হয় যে জনা,
তারে দেখলে যায় রে চেনা।
(৩) তার আঁখি দুটি ছলছল
মৃদুহাসি বদন খানা ॥

* এই গানটি ৩।৪ স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে, কোথাও ইহার ভণিতা তাই। সামান্য একটু-আধটু পরিবর্তন আছে।

সদায় রে তার শুদ্ধরতি,
নির্জনে তার গতাগতি,
করে জগৎপতির সাধনা।
ও তার কামনদীতে চর পড়েছে
প্রেমনদীতে জল ধরে না॥

মন রয়েছে দমের ঘরে,
নয়ন আছে রূপ নিহারে,
সেই তো রসিক জনা।
হেতু সম্বন্ধ নাই রে তাহার
নিহেতু প্রেম-বেচাকেনা॥

মন বসেছে ফুলের ঘরে,
ফলের আশা সে না করে
সেই তো রসিক জনা।
গোঁসাই আনন্দ কয় শোন্ রে জনা,
ও তোর গুরুতে বিশ্বাস হ'ল না॥

৪১৫

সহজ মানুষ আলেক লতা,
আলেকে বিরাজ করে,
বাহিরে খুঁজলে পাবি কোথা

আলেকের প্রেমের কোলে,
পেতেছে বাঁকানলে,
ত্রিবেণীর জল উজন চলে,
বহিছে সর্বদা।

আপনি চলে নলের সাথে,
সে নল কেউ নারে চিন্তে
চিন্তামণি চিন্তাদাতা ॥

আলেক ছুনিয়ার বীজে,
আলেক সাঁই বিরাজে,
আলেকে খবর নিচ্ছে
আলেকে কয় কথা।
আলেক-গাছে ফুল ফুটেছে,
যার সৌরভে জগৎ মেতেছে,
আলেক হয় গাছের গোড়া
ডাল-ছাড়া তার আছে পাতা।

আলেক মানুষের রসে
সনাতন সদা ভাসে,
বাউলে, তোর লাগল দিশে
যেতে নারবি সেথা।
তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে
মানুষ চিনবি কেমন করে।
যেদিন ধরবে তোরে—
মুগুর দিয়ে ছেঁচবে মাথা ॥

৪১৬

মনের মানুষ এই মানুষে আছে লও, চিনে,
তারে দেখ রে মন, জ্ঞান-নয়নে।
রসিক যারা, জানবে তারা,
অরসিকে জানবে কেনে॥

নীরে ক্ষীরে এক জায়গাতে রয়,
রসিক হংস হ'লে নীর বেছে ক্ষীর পায়,
যেমন পাকা আম শৃগালে খায় না,
দেখ, মন থাকে তার কু-ভোজনে॥

সমুদ্রে রত্ন পোরা রয়,
রসিক ডুবুরি হলে সেই রত্ন তুলে লয়,
যেমন জেলে জলে জাল ফেলিয়ে
মন রাখে শুধু মাছ-ধরণে॥

এই গুড়ে ভাই কেউ চিটা বানায়,
রসিক ময়রা হ'লে মিছরীর তাক নামায়,
ক্ষ্যাপা মদন বলে, রসিক হ'লে
যুগল-তত্ত্ব সেই সব জানে॥

৪১৭

ও মন-ভোলা, এ মানুষে হচ্ছে রে মানুষের খেলা।
পারিস তো ধর না কেন এই বেলা॥

ঘরে মানুষ, বাইরে মানুষ, ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই মানুষ,
আমি খুঁজে পাইনে মনের মানুষ,
হ'ল কি জ্বালা,
সে শোনে সকলের কথা, অন্যে ডাকলে পরে হয় কালা

স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বিচে
অনিত্য সহজ মানুষ আছে,
মানুষে মানুষ মিশেছে
নীরে ক্ষীরে গোলা।
কুবীর বলে, মানুষ ভজে অন্তিমকালে
পাই যেন ঐ চরণ-ধূলা॥

৪১৮

গুরু ত্যজে গোবিন্দ ভ'জে কেহ পায় নাকো নিস্তার।
পরকালের কার্য কিছু হয় নাকো তার॥

যে জন গুরু চেনে না,
হয় ভজনহীন ডহর-কানা ;
হ'লেও খাসের প্রজা,
আখেরে পায় না নিস্তার।
গুরু অমূল্য রতন, গুরুবাক্য মূল ভজন,
গুরু কৃষ্ণ, গুরু বৈষ্ণব, গুরু নিত্যধন,
গুরুর চরণ ক'রে স্মরণ,
হবি অকূল ভবসিন্ধু পার॥

যে জন গুরুকে ভুলে, মুখে হরি হরি বলে,
তারা গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালে।
তোর দেহ জমিনে গুরু দেয় বিছন বুনে,
দীক্ষা-গুরু শিক্ষা-গুরু বিনে,
তোর আবাদের হয় না উপকার॥

উপদেশে গোল যদি রয়,
শুধু গোলে হরি বললে কি হয়,
গোঁসাই ক্ষেপাচাঁদে কয়,
গুরু বিনে ঘোর তুফানে হবি নাকো পার ॥

৪১৯

যার হয়েছে মহাব্যাধি,
কি করবে তার সামান্য জ্বরে।
সাগরে শয়ন যার,
শিশিরে কি সে ডরে ॥

যাহার প্রেম বিরহ-দুঃখ,
দূরে আছে স্বকীয় সুখ,
সে না পায় মায়িক দুঃখ
যে ভেসেছে দুঃখ-সাগরে ॥

যার চিন্তামণির চিন্তা প্রবল,
কুচিন্তা সকল রসাতল,
শ্রীগুরুর চরণ ক'রে সম্বল,
রূপ দেখে অন্ধকারে ॥

যার ভিতরে জ্বলছে আগুন,
হাওয়া পেলে জ্বলে দ্বিগুণ,
গুণ পুড়ায়ে হয় নির্গুণ,
রয়না বেদের আচারে ॥

যার হিয়ার জ্ঞান-দ্বীপের বাতি
জ্বলে সমান দিবারাতি,
শুভাশুভে নাই তার মতি,
যুগল-রীতি নেহারে ॥

গোঁসাই প্রসন্ন নিপুণ ভারি,
দেহ-তরীর সেই কাণ্ডারী,
ভজিয়ে কিশোর-কিশোরী
তরী-জন্ম সফল করে ॥

৪২০

কেউ সহজ মানুষ চিনতে পারে না।
লোক পার হয় নিমিষে, যায় সহজের দেশে,
অনা'সে দেখতে পায় সে কারখানা,
যা দেখতে এক্ষণেতে করছ বাসনা ॥

ফিরে যে মুলুকে সহজ লোকে
বানিয়েছে কুঠি,
হাজারি হয় সবাকারি সাড়ে ছয়,
তেত্রিশ কোটি
গেলে মিলবে দেখা তার কি লেখা,
কেউ খামকা ফেরে না ॥

কোন লোক-জবানি কোন ধনীর
শুনে সংবাদ,
এক্ষণে তাই ক্ষণে ক্ষণে
দর্শনের হচ্ছে মনে সাধ।

সেই সহজ দেশে সহজ এসে
করতেছে কারবার ;
সেই যে সহজের দেশে বাস করিতে
ইচ্ছা হয় তোমার।
আমি পার করিব, পৌঁছে দিব,
বাতলাব ঠায়-ঠিকানা ॥

এসে করলে বিধি তদ্‌বধি
সৃষ্টি-স্থিতি-পালন,
সেই অবধি বিধি-কৃত বিধি
ভব-জলধির চলন।
এই যে স্বর্গ-মর্ত্য, পাতাল ইস্তক
চোদ্দ ভুবন ;
তাই ফলবে ফল, দেখতে পাবে
কালেতে যা করবে রোপণ।
যারা কৃষি ক'রে ভরসা করে
ধরণী ধরিয়ে,
ফলবে আলবৎতা কালে তাই ভেবে
দেবতারে ধিয়ে।
তাই এই মুলুকে সহজ লোকে
করতেছে দেনা-পাওনা ॥

বড় মেঘ করেছে, আকাশে হচ্ছে
আঁধিয়ারি,
দেখছি কটা মস্ত মস্ত ফোঁটা,
জলটা হবে ভারি।
লোকের চেষ্টা ছিল, বৃষ্টি হ'ল,
ঘুচল সংশয় ;

ধার যোগায় আর ব্রহ্মডাঙ্গার,
তার ডগায় প্রেম-তরঙ্গ বয়।
যত তল তলাতল, আসমানী কল,
জল যোগাবার মূল ;
মানুষের আদেশে রসে সহজে
ভাসতেছে তিনকূল।
দেশে রস যোগাতে মানুষ এসে
করতেছে আনাগোনা।
লালশশী রচে, মানুষ এসে
করতেছে আনাগোনা॥

[কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রচারক দুলালচাঁদ ওরফে **লালশশী** রচিত 'ভাবের গীত' নামক পুস্তক হইতে নমুনার জন্য উপরের গানটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল। এগুলি ঠিক গান নহে, দীর্ঘ কবিতা ; অনেকক্ষেত্রে অবান্তর উল্লেখবহুল এবং আসল কথাটি ঢাকিতে গিয়া নানা দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

"লাল শশী কে ? এরূপ ভণিতাই বা কেন হইল ? এরূপ বোধ হয় দু-একটি পাঠক মহাশয়ের মনে উদিত হইতে পারে। কর্তা-ভজন-ধর্ম-প্রচারক স্বর্গীয় রামদুলাল যিনি দুলালচাঁদ বা শ্রীযুত বলিয়া খ্যাত, তাঁহারই রচিত। **লালশশী** তাঁহার নামের অপভ্রংশমাত্র। (দ্র) লাল + চাঁদ = শশী।"]

৪২১

এক ডালেতে ফুটেছে দুটি ফুল।
ফুলের রঙ চিনে ফুল বেছে তোল ॥

এক ফুলে হয় আদিত্য-কিরণ,
আর এক ফুলে চন্দ্রকান্তি উজ্জ্বল বরণ,
ও তার এক ফুলেতে জীবকে নাচায়
আর এক ফুলে মজার কুল ॥

এক ফুলে হয় যুগল কিশোর,
আর এক ফুলে পঞ্চদলে মধ্যে দিগম্বর,
তারা দুজনাতে একই বরণ গো
এক-বোঁটা দুজনের মূল ॥

বলে ধন্য মালীর চারার আমি
বালাই লয়ে যাই ;
কেউ কারোর সঙ্গে মিশে নাই,
এমন কোথায় দেখি নাই।

ও তার জগৎ জুড়ে পাতা নড়ে,
আসমানে তার গাছের মূল ॥

আমার গোঁসাই বলে, চিনবি কিরে,
তুই রে কোন ছার—
তুই রে কোন ভার।
এই ফুলের জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ডটা,
কেউ আউল, কেউ বাউল ॥

৪২২

সে ফুল মিলতে পারে মালীর বাগানে।
আমার গোঁসাই বই আর কে জানে ॥

আবার অমাবস্যা পূর্ণিমার চাঁদ
দুয়ের গ্রহণ একদিনে।
সে ফুলে যায় না ভ্রমর, গন্ধে অমর,
দগ্ধ ভ্রমরীর সনে ॥

ও তার উল্টো লতা, পাঁপড়ি-ছটা,
কেশর থাকে মাঝখানে।
দেবের দুর্লভ বটে, কিন্তু সন্ধি না পায় ব্রাহ্মণে ॥

সে ফুল পেলে পরে দিবি কারে রে,
পূজার মন্ত্র কে জানে ;
সে ফুল তুলবি কিরে ঘুরে ফিরে,
আসতে নারে পথ চিনে।
রেজো ক্ষ্যাপা কয়, যার ইচ্ছা হয়—
ডোর-কৌপীন লয় নাম শুনে ॥

৪২৩

অলসে মাকে পূজলি না কেনে !
সে যে আদ্যাশক্তি, পূজো শক্তি দশভুজা
যথাশক্তি আয়োজনে ॥

মাঝে মাঝে পূজা ঘটে একবার,
তৃতীয় দিবসে না হ'ল সুসার,
ষষ্ঠী আদি বোধন পূর্ব দিনে তার,
মায়ের শ্রীচরণ শ্রীফল বিনে ॥

নবধা ভক্তি হয়, নব অঙ্গ-সাধন,
নব নব ভাব-রস-উদ্দীপন,
ষোড়শ শৃঙ্গারে ষোড়শ উপচারে
নৈবেদ্য আত্ম-নিবেদনে ॥
সন্ধি-পূজার কথা গূঢ় অভিসন্ধি,
চতুর সাধকে জানে অভিসন্ধি,
কাম-ছাগ তারে আগে কর বন্দী,
বলিদান বলিদানে ॥

নবমীর পরে বিজয়া আখ্যান,
সর্ব্বীজ-মধ্যে আমার গুরু বলবান ;
হরগোবিন্দের মনে উদয় সমাধান,
বৃথা শ্রীগুরুর শ্রীচরণ বিনে

৪২৪

ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন,
তবে করগে যা স্বরূপ সাধন ॥
স্বরূপের রূপ রূপের স্বরূপ,
স্বরূপ দেহে হয় মিলন ॥

রূপের দেহে স্বরূপের স্থিতি,
স্বরূপেতে রসের মানুষ করেন বসতি,
রসের মানুষ ধরবে যদি
রাগের পথে কর গমন ॥

সেথা রাগের আশ্রয়
রূপ-রতির নির্ণয়,
রতি গাঢ় হ'লে প্রেম নাম ধরয়,
তখন অনায়াসে রাগের ঘরে
হবে রে মানুষ-মিলন ॥

আচার বিচার নাইকো সে দেশে,
স্বরূপ-রূপে নেহার দিয়ে আছে গো যে বসে,
সেই নেহারে রসের মানুষ
করতেছে সব দরশন ॥

রূপ-নগরে রসের নদী বয়,
রেজো ক্ষ্যাপা সাঁতার ভুলে অমনি ডুবে যায়,
দয়াল প্রসন্ন সাঁই দয়া ক'রে
হাত ধরে তোলে তখন ॥

৪২৫

গুরুবীজ অঙ্কুর হবে কি মোর এ পাষাণে।
চাষ হোল কই ?
পড়ল না মই,
পতিত রইল জমি মনের গুণে ॥

মন-চাষা মোর বিষম কুড়ে,
ভুলে যায় না জমির ধারে,
কৃষাণ ছ'টা গোঁফ-খেজুরে
আ'লে বসে সদায় তামাক টানে ॥

হিংসা-নিন্দা উলু-বেনা,
যত খুঁজি তার মূল মেলে না,
আসল জমি চোট নিলে না,
ফেরে প'লাম এবার জমি না চিনে

উঁচু জমি জল টেকে না,
নীচু হ'লে ফলত সোনা,
নদীর বেগে নটা-হানা,
ভেঙে গেল জমি তোড়-তুফানে ॥

ভক্তিশূন্য মনানলে
গুরু-বীজ ঐ যাচ্ছে জ্ব'লে,
ভক্তি-বারি সিঞ্চন করিলে
বেড়ে যেত লতা দিনে দিনে ॥

এক জমি, তার তিন শরিকদার,
কোন্ সীমানায় কার অধিকার,
ভবা বলে জানব এবার,
জানায় যদি গুরু নিজগুণে ॥

৪২৬

শুধু পাগল হ'লে গোল তো ঘোচে না।
পাগল সে যে ভবের মাঝে করতেছে আনাগোনা

ভবে পাগল হয় যারা,
বুঝে সকল পাগলের গোল
জীয়ন্তে মরা,
তাদের নাই কোন ভয়, সরল হৃদয়,
অন্তরে কালো সোনা ॥

রিপু ইন্দ্রিয়গণ, বড় দুষ্ট এই কয় জন,
সর্বদা সঙ্গেতে ফেরে করে জ্বালাতন,
এদের দমন ক'রে রাখে যে জন,
ভবে পাগল সেই জনা ॥

যারা প্রকৃত পাগল,
তাদের বোঝা যায় না বোল,
সেই মানুষ ধ'রে তাদের নয়ন-যুগল
হেরে যুগল,
তারা যুগল প্রেমে মগনা ॥

গোপী-ভাব করি' অঙ্গীকার
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার,
তাদের কোথায় নিদ্রা কোথায় আহার,
স্বসুখ-বিহার জানে না ॥

প্রেমানন্দে তারা কৃষ্ণ-সেবাতে
সদা নিযুক্ত থাকে নিষ্ঠা মনেতে,
তারা কোটি সুখ পায় স্ব-সুখ হ'তে
অসুখ কেমন জানে না ॥

গোঁসাই হরিচাঁদ রটে, কথা সত্য বটে,
শ্রীদাম তোর কি যেতে মানা সতের নিকটে,
(ও তুই) আজন্ম রইলি ছটফটে
তোর লম্পট-স্বভাব গেল না ॥

৪২৭

রাগ না জেনে রাগের ঘরে যাবি কি ক'রে।
ও তোর ইজ্জত নষ্ট, ততো ভ্রষ্ট হ'ল চিত্ত-বিকারে ॥

রাগ বলে কারে রে ক্ষ্যাপা, রাগ বলে কারে,
আমি চিনলাম না তারে।
ও তার কেমন আচার, কেমন বিচার,
কোন্ পথে চলে ফিরে ॥

রসরতি দু'টি হয়,
যে করেছে নির্ণয়,
অনায়াসে রাগের ঘরে তালা খোলা পায়।
গুরুর কৃপা হ'লে অবহেলে,
রূপের ঘরে ধরে তারে ॥

পণ্ডিত যে জনা, আজন্ম কানা,
শাস্ত্র ঘেঁটে মরে, শাস্ত্রের মর্ম জানে না,
আপন জন্ম-যোগের নাই ঠিকানা,
পরের বিধান দিতে পারে ॥

গোঁসাই পরমানন্দে কয়,
বিধান তালপত্রে লেখা নয়,

থাকতে বিকার, সাধ্য কি তার,
সেই শহরে যায়।
মতে, তোর বাসনা যেন ভেকের বাসনা
যেতে সাগর-পারে ॥

৪২৮

প্রেম করা কি সহজ কথা, আগে স্বভাব রাখ দূরে।
তোমায় আমায় করব পিরিত এ জনমের তরে ॥

ভাবের মানুষ প্রেমে বেহুঁস সদায় ভাসে প্রেম-সাগরে
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, কৈতবে যায় স'রে ॥

ভাব না জেনে প্রেমে মজে, যেমন সাপে ছুঁচো ধরে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু,—মরতে গিয়ে মরে ॥

চন্দ্রে সুধা, পদ্মে মধু—বলো যুগল হয় কি ক'রে।
চন্দ্র থাকে গগন 'পরে পদ্ম সরোবরে ॥

মোমাছিতে চাক বানায়ে রাখে মধু সংগ্রহ ক'রে।
চন্দ্রে পদ্মে হচ্ছে মিলন কেবল ভাবের দ্বারে ॥

কাম যেথা প্রেম সেথা, দেখ না নজর ক'রে।
দুধেতে হয় ঘি উৎপন্ন মথনের জোরে ॥

টলের ঘরে অটল মানুষ, দেখ না বিচার ক'রে।
অটলে টল, টলে অটল, রমণদাস কয় ভবারে ॥

৪২৯

আছে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা।
মেঘ না কাটলে চাঁদের
পাবি না রে দেখা॥

যখন মেঘ তোর কেটে যাবে,
তখন চাঁদের উদয় হবে,
জ্ঞান-চন্দ্রে দেখতে পাবে
চাঁদে চাঁদে মাখা-চোকা॥

মেঘের কোলে চাঁদ রয়েছে,
চাঁদের কোলে বিদ্যুৎ-সখা।
মেঘ কেটে চাঁদ উদয় করা,
সেটা কিন্তু লেখা-জোখা॥

মদন বলে, অন্ধকারে
ধন্ধ হয়ে রইলাম একা।
যার হয়েছে গুরু-কৃপা
সেই পেয়েছে চাঁদের দেখা॥

৪৩০

সহজ মানুষ লীলা করে রেবা নদীর তটে।
সে যে মাধব-নিশিযোগ, প্রথম সম্ভোগ
বেতসী তরু তলার ঘাটে

রথে জগন্নাথ দেখে,
সেই শ্লোক প্রভুর মুখে
ইহার অর্থ না বুঝে লোকে।

ইহার অর্থ কেবল বুঝিলেন স্বরূপ,
আভাসেতে পেলেন শ্রীরূপ,
হবে কুরুক্ষেত্রে মিলন
শ্রীরাধার বর্ণন,
ব্রজে কৃষ্ণ পেলে আশা মিটে ॥

ভরত-মুখে শুনি বার্তা,
লোভী হ'লেন গোলোক-কর্তা ;
ভজিতে তাদৃশ সৎ সত্তা
এলেন বৃন্দাবনে নর-রূপে,
প্রকাশ তদনুরূপে ;
নরলীলা চমৎকার,
কে বুঝিবে তত্ত্ব তার ?
ভেবে দেখ সে কি মানুষ বটে

প্রভুর শিক্ষা সনাতনে
নিত্যলীলা রয় এক স্থানে,
হয় প্রকট ব্রহ্মার একদিনে,
শুদ্ধ মাধুর্য, নাই ঐশ্বর্য,
পরকীয়া ভাব-তাৎপর্য ;
হেরে পদ্মলোচন ব্যাকুল
ভ্রমর না পায় ফুল,
আপনার ওষ্ঠ আপনি চাটে ॥

৪৩১

দেখবি যদি চিকণ-কালা শ্বাসের মালা জপ না।
মন রে ভোলা, কাঠের মালা জপলে জ্বালা যাবে না ॥

জীয়ন্তে মরবি যদি শ্বাসের সঙ্গ ধর না,
আসা-যাওয়ার যে যন্ত্রণা জেনে কি তা জান না

যার চেতন-গুরু মেরেছে লাথি,
তার কিসের অভাব বল না।
নিদান-কালে হরি ব'লে দ্বিদলে প্রাণ যাও না ॥

ষটচক্র-ভেদী যবে হবে পাবে তব ঠিকানা।
দেখবে আলোর ভিতর কালো মাণিক
ঘুচবে ভবের যন্ত্রণা ॥

গোবিন বলে, দেখলে পরে আসা-যাওয়া আর রবে না
একুশ হাজার ছয় শ' বার জপ করে তা দেখ না ॥

কেঁদুলীর মেলায় বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা হইতে সমাগত বাউলদের নিকট হইতে বিশেষভাবে গৃহীত বাউল গান

৪৩২

কোন্ সাহসে নিতে চাও রে, অবোধ মন,
নব রসিকের করণ।
শুধু সাজ-সজ্জাতে নারবি নিতে
থাকতে আত্মসুখ-যাজন ॥

নব রসিকের করণ,
সে যে শুদ্ধ আচরণ,
যেমন তেলাপোকায় কুম্‌রা পোকায়
ধরায় সব বরণ।
তেমনি স্বরূপেতে শুদ্ধ চিতে
কর গা দেহের আরোপণ ॥

নয় সাত পাঁচ অক্ষর,—শুধু তিন তার ভিতর,
তিনে তিনে ভাবলে দেহ হয় রূপান্তর,
তখন রস চিনবি, রসিক হবি,
করবি রসের আস্বাদন ॥

তিনে তিন গুণেতে নয়, তিন ছাড়তে হয়,
যে থাকে তাহাতে ডুবায় হ'য়ে রসাশ্রয়,
এ রস কে জানে রায় রামানন্দ বিনে,
স্মরণ কর তাঁর চরণ ॥

সেথা আনন্দনগর রাকার উদর,
তার উপরে সহজ কক্ষে সেই রসিকের ঘর।
সেথা করলে গতি, রসের মূরতি
প্রাপ্তি হয় মদনমোহন ॥
উমেশচন্দ্র গোঁসাই কয়, বেণী, তোর কর্ম নয়,
ফল-ফুলে পশু-পক্ষীর হেন ধরতে হয়,
নইলে নারবি যেতে প্রাণ থাকিতে,
পার মন, জীয়নে হলে মরণ ॥

৪৩৩

ব্রজের শ্যামসুন্দরকে ধরবি যদি স্বরূপ সাধন করো
নইলে হবার নয়, ও সে পাবার নয়,
তিন জন্ম যদি মাথা খোঁড়ো ॥

গ্রন্থকারে লিখে গেছে গ্রন্থমধ্যে,
স্থাপিত আছে ভক্তি-সিন্ধু-মাঝে দেখ যে,
বুঝে-সুজে গ্রন্থের ডোর খুলবি,
নইলে ছারেখারে যাবি,
প্রাকৃত জীবে না পারবি,
ফেরেফারে বোঝো মূঢ় ॥

বিদ্যুতের ন্যায় কলা এসে,
শীঘ্র পলায় পূর্বদেশে,
খুব হুঁশারে থাকবি রে বসে।
দৃষ্টি ছাড়া হলে পরে,
আবার আসবি ভবে ঘুরে ;
সাধু-গুরুর সরল বাক্য
হৃদয়-মন্দিরে গাড়ো ॥

মানুষ চলে উল্টো কলে,
অনুরাগী নেয় গো তুলে,
নেহার দিয়ে পারে যায় চলে ;
গুরু-শিষ্যে একই হ'লে
ভাব-স্বভাবে তবেই মিলে।
গোঁসাই হরি বলে, শোন পদ্মলোচন,
এবার তোর কপালে বিষম ফের ॥

৪৩৪

আমি কিসে বা বিভোর,
আমার নাই রে কিছু ঠিক-ঠাহর।
আমি পরকে কেবল আপন ভাবি রে,
আমার আপন সে যে হয়েছে পর ॥

আমার নাই রে কিছু কাণ্ডাকাণ্ড,
বয়ে যাচ্ছি মায়ার ভাণ্ড,
মহাপাষণ্ড,
বুঝতে নারি কিবা আছে রে খুলে দেখলাম না ভাণ্ডের ভিতর।

আমি, চেষ্টা করি সৎসঙ্গে বাস,
অসৎ লোকে করে উপহাস,
তখন ভেঙে যায় সাহস,
মুখে মাত্র গৌর গৌর বলি রে,
ভজন-সাধনে রতি না জন্মিল ভাই রে মোর ॥

গৌরতত্ত্ব বড়ই জটিল, ভজনও জটিল,
গোঁসাই বলে, জটিল রে, তুই ভাবিস না জটিল,
অনুরাগের সঙ্গে ভাব মিশায়ে রে,
দৃঢ়ভাবে শ্রীগুরুর চরণ ধর ॥

৪৩৫

একবার দেখ না বুঝে হৃদয়-মাঝে মানুষ-রতন।
মন-নয়ন যাতে জনম করবে তারে অন্বেষণ ॥

এই তুই বুঝতে পার যদি,
পার হবি তুই ভব-নদী,
রাগের রসে রসের নিধি
হেরেছে অন্তরে যে-জন ॥

সেই তুজন সন্ধান করিয়ে,
যাবি যমকে ফাঁকি দিয়ে,
নয় অন্যথা দেখ বুঝিয়ে,
সাধু-গুরু-শাস্ত্রের বচন ॥

তত্ত্ব বর্ত কর আত্মাপ্রতি,
যাতে জনম তাতে স্থিতি,
মন, কেন হওরে বিস্মৃতি,
ধর ধর পৈতৃক ধন ॥

গোঁসাই নরহরির উক্তি,
প্রাকৃতে অপ্রাকৃত স্থিতি,
সৎসঙ্গে করগে যুক্তি,
নইলে চৌরাশী ভ্রমণ ॥

৪৩৬

তিনদিন পরে ত্রিগুণের পারে স্রোতের জলেতে ডুবিল প্রতিমা
দশমীর দশা এক সমদশা, কি বলে বুঝাব বুঝিতে পারি না ॥

পার্বতী চলে গেলেন কৈলাসে,
মিশেছেন সতী কূটস্থ পুরুষে,
সুখে কি দুঃখেতে বিপদে হরষে
কে আমি, আমার মনেই আসে না ॥

ইচ্ছা খেলে হয় যার নাম সিদ্ধি,
পরমানন্দ যাতে হয় বৃদ্ধি,
ভাল-মন্দ যায় হ'লে পরাবুদ্ধি,
মান-অপমান কিছুই থাকে না ॥

কর্ম শেষ হ'লে সে দশা কি হয়—
কথাতে বলিয়া বুঝাবার নয়,
ক্রিয়াবান লোকে বুঝিবে নিশ্চয়,
বিজয়াতে জয়, সফল বাসনা ॥

৪৩৭

সামালে সামাবি রে মন ভাবের ভিতরে।
অমূল্য ধন পাবি রতন, মন রে, ভব-সংসারে ॥

ভাবের অপার মহিমা,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব দিতে নারে সীমা,
কি দিব ভাবের উপমা,
ক্ষুদ্রমতি নরে ॥

যাতে হয় দ্বি-ভাব, সে-তো অসঙ্গত ভাব,
মজিস না এ ভাবে, কিছু পাবি না রে লাভ,
ভুলেও ভাবিস না রে দ্বি-ভাব,
তাতে ডুববি দুঃখের সাগরে ॥

ভাবের ডাল-পাতা দেখে হোস না রে বেতাল,
মূলে রাখবি ঠিক খেয়াল,
দেখিস যদি হোস অসামাল,
পড়ে থাকবি ভাবের বাহিরে ॥

ভাবে ভাবনা যায় (মন রে),
ভাবে আছে আয়,
সদা লাভ তায়,
ষোল আনা থাকবে রে বজায়।
ভাব ধরলে মহা আনন্দ পায়,
অনায়াসে যায় পারে ॥

ভাবগ্রাহী জনার্দন যদি করবি দরশন,
ভাবুক হ'য়ে যতনে ভাব কর গা রে সাধন,
ভাবের ভাব না জেনে ভাব-রতনে
চায় দ্বিজ গদাধরে ॥

৪৩৮

সহজ ভজন কঠিন করণ যে পারে এই সহজের ঘরে।
সহজ ভজন না যায় লিখন আছে বেদবিধি পরে ॥
বেদবিধি-পার, সৃষ্টিছাড়া, সহজের করণ নিহারা।
হ'তে হয় জীয়ন্তে মরা, আগুন-পারা সে ধরে ॥

অগ্নিস্পর্শ হইলে ঘৃত যদি নাহি গলে।
(তখন) রূপ-রতি-রস উজান চলে, বত্রিশ কোঠার উপরে
বত্রিশ কোঠার তালা আঁটা, তার উপরে মণি-কোঠা।
রূপ-রসেতে চাবি-আঁটা, সদর-খিড়কি দুইধারে॥
সদর-খিড়কি এই দুই দ্বারে রূপ-রতি-রস বসত করে।
দেখতে হবে নিহার ধ'রে সেথায় রসরাজ বিরাজ করে॥
রসরাজরূপ রসের স্বরূপ, মহাভাবে মিলে হয় এক রূপ।
সাকার বিন্দু নিরাকার রূপ অধর-ধরা যে ধরে॥
সহজে আসে সহজে যায়, এই কথাটি সকলে কয়।
না হইলে সহজের প্রায় যেতে হয় ধামান্তরে॥
আরেক সহজ বিন্দু আছে, সে বিন্দু নায়কের কাছে।
পুরুষ-নারী লবে বেছে, সমর্থার গুণ যে ধরে॥
আরেক সহজ বিন্দু মিলে অধঃ-ঊর্ধ্ব দু'দিক চলে।
শ্রীঅঙ্গে ভাণ্ডার হইলে বিন্দু বিন্দু দান করে॥
অদ্বৈত সহজ উপায়, যত উপায় তত অধ্যায়।
সিন্ধু কভু নাহি শুকায়, বেঙাটুনি পান করে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু।
রাধা পেলেন পূর্ণবিন্দু, গোপীগণে বিন্দু বিন্দু।
পান করে যত ভক্তবৃন্দ কামবিন্দু জগৎ-সংসারে॥
যাদুবিন্দু বলছেন স্পষ্ট, যার যে ভাব সেই সে শ্রেষ্ঠ।
নৈষ্ঠিক হইলে পরে তথা-বস্তু বিচার করে॥

৪৩৯

গুরু-মহাজনের চেক সাধুর ব্যাঙ্কে নাও ভাঙায়ে।
নিত্য-প্রেম-পরমার্থ-তত্ত্ব আত্মদান মোহর করিয়ে॥
নিয়েছ বীজ মন্থন ক'রে
গুরু-জিহ্বা-লিঙ্গ দিয়ে,

রাখ কর্ম-যোনির পাত্রে,
বাড়াও শ্রদ্ধাভক্তির পোষণ দিয়ে ॥

ক, ল, ই অনুনাসিকায়,
বুঝ তত্ত্ব সাধু যথায়,
ভুলো না আর দ্বৈত কথায়,
মজ না যেন অন্য মন্ত্র নিয়ে ॥
সেই বীজের অর্থ নিজে
কাজে দেখ না বর্ত করি' হৃদি মাঝে,
বীজে পঞ্চতত্ত্ব আছে,
বোঝ সৎসঙ্গ করিয়ে ॥

ভাব, প্রেম, রূপ, রসে
বীজের অঙ্কুর উঠবে ভেসে,
গোঁসাই নরহরি হেসে
অনুরাগীকে যায় কহিয়ে ॥

৪৪০

হও না জ্ঞাত বীজের তত্ত্ব, অব্যক্ত রূপ নিরাকারে।
রূপ নিরাকার, স্বরূপ সাকার কহে সাধু গ্রন্থাকারে ॥
স্বরূপ সাকার বর্তমানে, রূপ নিরাকার আত্মজ্ঞানে।
বুঝবি নিত্য তত্ত্ব জেনে, বসত ক'রে রূপ-নগরে ॥
রূপ-নগরের রূপ-সায়রে আত্মবীজ ভাসছে নীরে।
নিত্যতত্ত্ব আত্মজোরে বুঝ সাধু সঙ্গ ক'রে ॥
সেই বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে বপন হ'লে দীক্ষাসূত্রে,
নিরাকার হয় অজ্ঞাতে, জ্ঞাত হ'লে রয় সাকারে ॥
গোঁসাই নরহরি রটে, নামে দেহ জন্ম বটে।
অনুরাগী বুঝ না ঘটে একাক্ষর অনাক্ষরে ॥

৪৪১

গুরুর রতি-নিষ্ঠা হ'লে মিলাতে পারে অকৈতবে।
যে-ভাবে যে ভজন করে, মিলায় তারে সেই ভাবে

দময়ন্তী তার প্রমাণ আছে,
ভারতে ব্যাস লিখে গেছে;
বহু দুঃখে প্রাণ পেয়েছে
আর গিয়েছে ধর্মে ডুবে॥

সাবিত্রীর নিষ্ঠা সত্যবানে,
বাঁচাল পতি যমে জিনে,
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অন্ধজনে
চক্ষুদান আর পুত্র লভে॥

মরা পতি বেহুলা বাঁচায়
মনসার পাদপদ্ম-নিষ্ঠায়.
কর্ণ বৃষকেতু বাঁচায়
ছদ্ম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেজে॥

রোহিতের প্রাণ শৈব্যা বাঁচায়,
দ্বিজপুত্রে ছাত্র বাঁচায়,
মরা ছেলে ব্রাহ্মনী পায়,
পার্থের নিষ্ঠা বাসুদেবে॥

গোঁসাই নরহরি ভণে,
খাটলে বেতন পায় চার গুণে,
শেষে ভাতা বয় পেন্সনে,
অনুরাগী বুঝে নাও ভাবে॥

৪৪২

গুরুবাক্যে যে ঐক্য করেছে, তারই লক্ষ্য ভেদ হয়েছে।
বাক্ ধরে যে বাঘ ধরে সে, পুথী-পত্রে প্রমাণ আছে ॥
কবীর হয় যবনের ছেলে, গোঁসাই গুরুর বাক্ ধরিলে।
রামানন্দের কৃপা পেলে, রামরূপ হৃদে ছাপ পড়েছে ॥
রাণী দেবীর কৃপা পেয়ে, তুলসীদাস মহৎ হ'য়ে
রামচরিত আর দোঁহা গেয়ে প্রকাশ হ'ল বিশ্বমাঝে ॥
একলব্যের ঐক্য-ধারা কেবল মাটির মূর্তি গড়া,
হৃদে ধ্যান মূর্তি ভরা, যুদ্ধে বিশারদ হয়েছে ॥
গোঁসাই নরহরির বাক্য অনুরাগীর নাইকো লক্ষ্য,
গুরুবাক্যে হ'লে ঐক্য ভাবনা নাই ভবের মাঝে ॥

৪৪৩

ধর্ম নষ্ট ইষ্ট ভজলে নয়, জেনো সুনিশ্চয়।
রক্ষা করে ধর্ম তারে, নিজ ধর্মে যে জনা রয় ॥

ধর্ম ধৃ ধাতু শাস্ত্রে কয়,—
ধারণা জান সুনিশ্চয়,
ধারণ ক'রে ধর্ম-বস্তু পোষণ করতে হয়।
ডুকৃঞ ধাতুর অর্থে সধর্মে চৈতন্যময় ॥

আগে ধর্মবস্তু কর নিরূপণ,
তবে হবে তার যাজন,
শোনা কথায় শেখা কথায় হয় না তো করণ,
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মে সদা ভয় ॥

সত্যযুগে ধর্ম শুক্লবর্ণ,
ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ,

কলিতে পীতবর্ণ হয়,
অপবিত্র সত্য হয় না প্রাপ্ত, বিষ্ণু মন্দিরে না ঢুকয়॥

গোঁসাই নরহরি কয়,
ধর্ম নিজের কাছে রয়,
চৈতন্য যার সেই তো বুঝে ধর্ম কারে কয়।
তাই অনুরাগী সর্বত্যাগী গুরুবস্তু ধ'রে রয়॥

৪৪৪

গুরু বিনে আর ভজি না কারে
গুরুময় এ ত্রিসংসারে!
গুরু-তত্ত্ব লাগি' গোলোক-ত্যাগী
সাধলেন গুরু ব্রজপুরে॥

গুরু লাগি' শিব শ্মশানবাসী,
শুক, সনক, নারদ-আদি হ'লেন উদাসী,
জনক আদি যত ঋষি
সাধলেন গুরু নিষ্ঠা করে॥

দ্বাপরেতে শ্রীনন্দনন্দন
রাধা সহ গুরুবস্তু করিল যাজন,
না হয় রস-নির্যাস আস্বাদন
তাই এলেন নদেপুরে॥

গুরু কৃষ্ণ নিত্য ভগবান,
আব্রহ্মস্তম্ব গুরু নিত্যস্থান,
গুরু ব্রহ্মা, গুরু শিব,
গুরুরূপে সর্ব বিহরে॥

কলিযুগে গৌর ভগবান
গুরুতত্ত্ব নিত্যজ্ঞানে করে বর্তমান,
গুরুবস্তু ধ'রে রূপ-সায়রে
অনুরাগী সদা সাঁতারে ॥

৪৪৫

মনের মানুষ পাই যদি ভাই,
হার ক'রে গলায় রাখি, ।
মানুষ যে পায় মান-হুঁস বটে,
আসল সে যে, নয় মেকি ॥

মানুষ রয় কল্প-বটে,
ঘুরে বেড়ায় ঘটে-পটে ।
ইঙ্গিতে প্রাণ নেয় লুটে,
তার ভাবের কথা কইব কি ॥

দীনু ক্ষ্যাপা কয়, ঘুরে সে নয়নের দ্বারে,
চামের চোখে, পাগল রে, চিনবি কি ক'রে ।
যদি ধরবি মানুষ, হোসনে বেঁহুস !
এবার বংশী-বটে রাখ রে রাখ আঁখি ॥

৪৪৬

যে-জন গুরুর করণ করেছে, তার বরণ আলাদা ।
না পড়ে পলক, কপালে ঝলক, মুখে ফুটে তার কত সুধা ॥
ও তার বরণ আলাদা ॥

অঙ্গেরই কিরণ মেঘের বরণ,
গুপ্ত বিন্দু রয়েছে বাঁধা,
প্রেমের হিল্লোলে সদাই হেলে দোলে
দুঃখ জানে না, আনন্দ সদা ॥

তার মুখের হাসি যেন পূর্ণশশী
অধরে প্রকাশে দড়িম্ব আধা।
সে যে অধরায় ধরায় সদা মাতোয়ারা,
চলনে বলনে নাহি কোনো বাধা ॥

ষোলতে ষোল দিয়ে হরি হরি শিঙ্গারে
চৌষট্টি স্থাপন করি'।
তম হরিয়ে রাসবিহারী
নিজে বিহরে তার হৃদয়ে সদা ॥

৪৪৭

ক্ষ্যাপা মন আমার পরের জন্য কাঙাল চিরকাল।
জয় গুরু জয় গুরু ব'লে তোমার ঝরে না দুই চোখের জল ॥

উপায় যতদিন আদর ততদিন এই জগতের কল,
যেদিন উপায় ফুরাইবে, আদর কমে যাবে,
সে দিন কেউ দিবে না অন্নজল ॥

সাধ ক'রে খাল কেটে ঘরে আনলি নোনাজল,
সেই জলের স্রোতে ভেসে. কাম-কুম্ভীর এসে,
খেল তোমার বুদ্ধিবল ॥

হাতি-ঘোড়া টাকার তোড়া মায়াই সকল,
ক্ষ্যাপা সনাতন বলে মন তোমার অন্তিমকালে
সঙ্গে কেউ দেবে না ছেঁড়া কম্বল ॥

৪৪৮

পর বিনে জগতে কে আপন।
পরের জন্য যার প্রাণ কাঁদে
সেই তো জানে পরের মন॥

যেমন লোহা-কাঠ সংগ্রহ করি'
সমুদ্রেতে ভাসায় তরী,
তার কে হয় কার আপন।
তরী একবার ভাসে, একবার ডোবে,
তবু না ছাড়ে প্রেমের বাঁধন॥

যেমন মেয়েরা যায় পরের বাড়ী,
পরকে লয় আপন করি',
হয় মহা-মিলন।
তারা একরার হাসে, একবার কাঁদে,
না ছাড়ে প্রেমের বাঁধন॥

ক্ষ্যাপা বলে, পর আপনার করা,
হতে হবে জ্যান্তে মরা,
হয়েছিল চণ্ডীদাস একজন।
তারা এক মরণে দুজন ম'ল,
এমনি তাদের প্রেমের মিলন॥

৪৪৯

মামা-শ্বশুর ভাগ্নে-বধূর কোলে ব'সে রয়েছে।
যে তিন জনা বাঁজানারী সেই তিন জনার ছেলে সে॥
আবার একজন নারীর শুনি একটি পুত্র দুই সম্পর্ক পাতিয়েছে;
আবার কথা শুনে লোকে হাসে পিসির গর্ভে হয় পিসে॥

একজন নারীর নাইকো কসুর, দিনে শ্বশুর, রাতে হয় ভাসুর।
চিনেছে সে ধর্ম প্রচুর, জগতে নিশান তুলে রয়েছে ॥
অষ্টমীতে একাদশী, উদয় হ'ল পূর্ণশশী।
বিধবার মন বড় খুশি, সেই দিনের দিন ধরেছে ॥
সতীর গর্ভে আছে পতি, সাধনে তার হয় সুখ্যাতি।
কুবীরচাঁদের দৃঢ় মতি যুগল চরণ ধ'রে রয়েছে ॥

৪৫০

অনুরাগের কল-গাড়ীতে চড়বি আমার মন।
সে গাড়ীতে চড়লে পরে দেখতে পাবি সাধুজন ॥

ছয়রিপুতে রেল গড়েছে,
দশ ইন্দ্রিয়ে তার চাকা ঘুরছে,
গাড়ী আসমান-জমিনে লেগে আছে,
জীবের অদর্শন ॥

থর থর হ্যাঁটু পরে,
নানা রত্ন তার ভিতরে,
নুরের বাতি রোশনাই করে
সদা সর্বক্ষণ ॥

সেই ভাবে যে ভাব মিশাবে,
সেই ভাবে যে তার টানাবে,
আজব খবর ব'সে পাবে
গোপাল কয় বচন

৪৫১

চল দেখি মন গৌরাঙ্গের টোলে।
হয় ভাগবত, গীতা, হরিকথা প্রেমদাতা নিতাই বলে॥

আমার গৌরাঙ্গ চার শাস্ত্রে নিপুণ
সাংখ্য-পাতঞ্জল শাস্ত্রে কভু নহে উন,
গাম্ভীর্য, মাধুর্য, ধৈর্য, ষড়ৈশ্বর্য হৃদ্‌কমলে॥

তিনি প্রধান হেডমাস্টার, করেন ন্যায়রত্ন বিচার,
ধর্মেতে ধার্মিক তিনি সদাই সৎ-আচার,
চান না পড়ুয়াদের জেতের বিচার রাধারাণীর নাম নিলে॥

আগে ধরান প্রথম ভাগ, যাতে হয় রে অনুরাগ,
রাগ বৃদ্ধি হ'লে পরে দেয় রে বিরাগ,
তাতে হ'লে বৈরাগ্য দেয় দেগে দাগ,
সেই দাগে দাগে বুলালে প্রেমের বিদ্যা মিলে॥

হলে বর্ণ-পরিচয় যাবে ভেদাভেদ নিশ্চয়,
তখন কৃষ্ণময় এই জগৎ দেখে হবি রে তন্ময়,
এবে মনে কত হবে উদয়, পাবে উপাধি ক্ষ্যাপা ব'লে॥

যারে ধরান ইতিহাস, মনে বাড়ে তার উল্লাস,
যবে বোধোদয় হয় শেষ তখন হয় রে বিশ্বাস,
মনের আঁধার ঘুচে গেলে॥

শব্দ-সন্ধি ব্যাকরণ-ব্যাখ্যায় ধাতুর নিরূপণ,
সাংখ্য-পাতঞ্জল শাস্ত্রে মিলিবে গণন,
হবে সংখ্যা মিলে একা, আদি অন্ত মধ্য মূলে॥

পরে স্বভাবের সাধন, পাবি রূপে দরশন,
স্বভাব-দোষ থাকিলে হবে স্বভাব-সংশোধন,
পাবি গুরুর করণ, ধরণ-ধারণ, পাবি জীব-রতি ঘুচে গেলে

যদি পড়তে যাবি মন,
দাস নবদ্বীপের কথা শোন,
গুরু বলাইচাঁদের চরণ আগে কর সাধন।
হবে সাধন-সিদ্ধ-প্রেমের বৃদ্ধি, যুগল-মন্ত্রেতে সিদ্ধ হ'লে।

৪৫২

ভজ ভজ মানুষ ভগবান,
মানুষ ভজলে পাবি নন্দের নন্দন,
সে যে সদা বর্তমান॥

মানুষ-রূপে গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু,
মানুষ রত্ন পায়, মানুষ ডুবুরু,
মানুষের আছে অতিক্রম উরু,
(আগে) মানুষের গুরু মানুষকে জান

মানুষ রূপে হরি মানুষ ভবনে,
মানুষ লীলা করছে এই মানুষের মনে,
মান-হুঁস জানে মানুষের মান॥

মানুষ-প্রেমে ভোলা নিত্যানন্দ ভৃত্য,
কে বুঝিবে মানুষের চিত্তবিত্ত,
মানুষ বটে সত্য, স্বতঃসিদ্ধ নিত্য,
নিত্য নিত্যানন্দ রসে মত্তবান॥

গোঁসাই বলেন কথা, শোনরে বাউল,
মানুষ বটে সত্য ভজনের মূল,
এই মানুষ-বাগানে মনের ফুল তুল
মানুষ-মন্ত্রে ফুল কর সম্প্রদান ॥

৪৫৩

এ মায়া-সংসারে ঘিরেছে আমায় সপ্তরথীতে।
আমি পড়েছি এই মায়াচক্রে চক্রব্যূহতে ॥
আমার মন কুমতি দুর্যোধন, তার সঙ্গে রথী ছয়জন।
আমার বধিতে আইল প্রাণ অন্যায় যুদ্ধেতে ॥
কাম কর্ণ মহাবীর, তার শরে প্রাণ জরজর,
ম'লাম ক্রোধ-দুঃশাসনের দুষ্ট শাসনেতে ॥
ঘিরেছে লোভ-শকুনি, মোহ কৃপ, মদ অশ্বত্থামাতে,
মাৎসর্য সে দ্রোণাচার্য দুর্জয় জগতে ॥
শুনিয়াছি আগমমন্ত্র, নাহি জানি নিগমতন্ত্র,
এ সময়েতে কোথায় পার্থ, অনুরাগ পিতে ॥
ভজন-সাধন পাণ্ডব-সৈন্য, সঙ্গেতে মোর কেউ নাই অন্য
এখন আমার পূর্ণ তূণ শূন্য হ'ল এ পাপ রণেতে ॥
অভিমন্যু নিধনকালে ডেকেছিল কৃষ্ণ ব'লে,
অনন্তের ভাগ্যে তাই ঘটিল, ভয় কি ভবেতে ॥

৪৫৪

মনের মানুষ হয় রে যে জনা,
(ও সে) দ্বিদলে বিরাজ করে এই মানুষে,-
তুমি সহজ মানুষ চিনলে না ॥

ষোড়শ দল আর দশম দলে,
তার পিছে মানুষ দোলে নর্মদার কূলে,
বামে কুলকুণ্ডলিনী, যোগেশ্বরী, যোগরূপিণী,
নিত্যলীলাকারিণী,
ব্রজলীলা যার ঘটনা ॥

শুভাশুভ-যোগকালে, সুগঠন গতি মিলে,
স্থিতি হয় সেই কমলে, চতুর্দলে বারামখানা ॥

মৃণালের পূর্বকোণে, আনন্দ আর মদনে,
মন ভোলায় এ দুজনে
করে উচাটন।
শুন না তাদের কথা, সদা থেক সচেতন,
নির্বিকারী হয়ে মনে দৃঢ়ভাবে কর সাধনা

আলেক-দম চলছে কলে,
আলেক-দম হাওয়ায় খেলে,
আলেক দম সত্য হ'লে,
তবেই মানুষ মিলে।
তোর দশ দরজা বন্ধ হ'লে
তবেই মানুষ উজান চলে।
গোঁসাই হরি পোদোয় বলে,
বুঝবে অনুরাগী জনা ॥

৪৫৫

ইন্দ্রিয় দমন আগে কর মন, তা নইলে সাধন হবে না হবে না।
যার লাগি' মন, এ ভববন্ধন, সে পথের অন্বেষণ কেন কর না॥

পরের কথা শুনে হরি ব'লে নাচ,
হরি কোথায় আছে তাকে কেউ দেখেছ।
শোনা কথা শুনে নিশ্চিন্ত ব'সে আছ,
নাই পরিণাম-ভাবনা॥

দীক্ষামন্ত্র শুধু করিয়া গ্রহণ
জপিছ, ভাবিছ হয়েছে সাধন,
বীজের তত্ত্ব না জেনে, ভাব অনুমানে,
কখনো জীবনে পাবে না, পাবে না॥

আত্মারূপে গুরু প্রতি ঘটে ঘটে,
তারে না চিনে কেন বেড়াও ছুটে ছুটে,
রাধাপদ গোঁসাই রটে, জ্ঞান-আঁখি যার ফুটে,
তার অষ্টপাশ কাটে,
শোনা কথা সে মোটে শোনে না, শোনে না॥

৪৫৬

গুরুর নাম যার হৃদে গাঁথা,
মুখে ধরে আত্ম-তত্ত্ব-কথা,
সে কি মুড়িয়ে মাথা
তিলক-মালা-ঝোলা ধরে।
চলে না সে সাধুর ভোলে
একই কালে
মন-মদনকে বাধ্য করে॥

গুরু-ধোপায় ধোপ দিলে পর
দেহের ময়লা যাবে ধুয়ে,
রাগ-সাবানে মন মাজিলে
হৃদ্-কমলে
আলো জ্ব'লে
সোনার মানুষ ঝলক দিবে রে।
গাভীর পেটে হয় যে বৎস,
সেই তো মাঠে ঘাটে চরে ফেরে ॥

যার আছে একান্ত মন,
সেই রত্ন-ধন,
ঘরে বসে মিলবে তারে।
দীনু কয় উদয়চাঁদে,
গুরুর চরণ ভুলে
যাবি কিরে ভব-পারে ॥

রাঢ়ের অন্যতম বিখ্যাত বাউল বর্ধমান জেলার
বেতালবন-দ্বারনট্টীর নিতাই (নিত্যা) ক্ষ্যাপা

অজিত ভট্টাচার্য

[দ্বিতীয় খণ্ড : পৃঃ ৩৮৯]

বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে অনুষ্ঠিত বাউল-সমাবেশে যোগদানকারী
নিতাই ক্ষ্যাপা, নবদ্বীপ দাস ও অন্যান্য বিশিষ্ট বাউলের সঙ্গে
গ্রন্থকার ও শ্রীযতীন্দ্র সেন

[ফটো : অজিত ভট্টাচার্য]

[দ্বিতীয় খণ্ড : পৃঃ ৩৮

বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামের বাউল-সমাবেশ হইতে বিশেষভাবে সংগৃহীত

৪৫৭

না হ'লে ভাবের ভাবী,
কোথায় পাবি,
ভাবের মানুষ যায় কি ধরা।
ও সে করেছে নিগমে থানা,
বৃথা বাইরে হানা,
যায় না জানা সাধু কি চোরা ॥

ধরতে সেই মানুষ-রতন
কত মহাজন
ফাঁদ পেতে রয়েছে তারা।
গোলকনাথ গোলক ছেড়ে
তাহার তরে
বুলছে হ'য়ে ক্ষ্যাপার পারা ॥

ধরবি কি সেই রসের কল,
সহজে পাগল,
অনুরাগ যার অঙ্গে পোরা।
মনেতে নিষ্ঠা হ'লে
বস্তু মিলে,
তর্কেতে না পায় কিনারা ॥

বলছেন তাই শ্যামানন্দ,
ভজন সিদ্ধ
'আমি'কে চিনেছে যারা।
'আমি'কে চিনে না যে জন,
করয়ে ভজন,
যেমন অজ্ঞান গাভীর পারা ॥

৪৫৮

ফণিশিরে মণি আছে ;
মণি পেয়েছে কয়জন ।
মণি-আশে ফণী পুষে,
ফণীর বিষে যায় জীবন ॥

ফণী দেখিতে সরল,
পরশে শীতল,
কুটিলমতি, খল জাতি সে
উগারে গরল ।
ফণীর শ্বাসে আসে সর্বনাশ,
বল-বুদ্ধি করে হরণ ॥

মণি কেমনেতে পাই,
আমার নিগম জানা নাই,
বে-হুঁশিয়ারে অন্ধকারে
সাপ ধরিতে যাই ।
নিগম না জানিয়ে
প্রবেশিয়ে
যেমন অভিমন্যুর হয় পতন ॥

যাদের ব্যবসা সাপ-ধরা,
মণি চায় নাকো তারা,
তাদের ধর্ম নিত্যকর্ম—
সাপের গাড় খোঁড়া ।
তাই বে-হুঁশারে যাচ্ছে মারা
ক'রে আত্মসমর্পণ ॥

মণি কেমনেতে পাই,
কেবল গুরুজীর কৃপায়,
যত্নে মণি দিবেন আনি'
ব্রজ-নায়িকায়।
প্রাপ্তি সারে নবম দশায়,
দশম দশায় সম্পূরণ ॥

কহেন গোঁসাই হরিচাঁদ,
মণি স্বশরীরে বাঁধ,
ক্ষ্যাপা নিত্য রে তুই হরি ব'লে
নিত্য নিত্য কাঁদ ;
মণিমুক্তার অভাব কি রে
আছে মুক্তালতার বন ॥

৪৫৯

ঝাঁপ দিয়ে রূপের সাগরে
কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে।
ওগো, কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে ॥

ওগো, সাপ ধরতে জানে যারা
তারাই জানে মণি-ধরা ;
মণি পেয়ে ধনী হয় তারা,
অরসিক যারা, পায় না তারা,
দংশনেতে ঢ'লে পড়ে ॥

যেমন রত্ন থাকে অগাধ জলে,
ডুবুরীতে ডুবে তোলে ;

সে কি মিলে যার তার কপালে,
সে যে ডুব দিতে দম ফেটে মরে ॥
দুধে জলে মেশা যেমন,
কামে প্রেম মাখা তেমন ;
সুরসিক হংস হ'লে
সুকৌশলে
ক্ষ্যাপা রে, সে যে নীর ফেলে ক্ষীর পান করে ॥

৪৬০

মদনা-চোর ঢুকছে শহরে,
ক্ষ্যাপা মন রে ।
যদি পালবি প্রজা, হ'য়ে রাজা
চাবি দে রে মাল-ঘরে ॥

সেই আনন্দ-বাজার
যাবি মন আমার,
গুরুদত্ত অস্ত্র ধ'রে চল, মন আমার
সেথায় প্রলোভন-রূপ অন্ধকারে
জ্ঞানের প্রদীপ নাও করে

সেই বাজার খুব খাসা,
আজব তামাসা
সেই বাজারে রসিক-জনার
সর্বদাই বাসা ;
নাই কামনা, অন্য আশা,
রয় সদা আরোপ ধ'রে

গেলে স্ব-সুখের বাজার
হবে সব আজার,
ও তুমি অন্ধকারে মরবে ঘুরে',
প্রাণ যাবে তোমার ;
সেথায় দুষ্টলোকের মিষ্ট বোলে,
প্রাণ হারাবি অন্ধকারে ॥

গেলে মোহ-বাজারে,
সে চোর সর্বদাই ফেরে,
পেলে পরে ছাড়বে না ভাই,
দেবে সাফ ক'রে ;
সেথায় সাবধানে সচেতন হ'য়ে,
পার হবি ভক্তির জোরে ॥

ও সেই কৃতাঞ্জলিপুর,
অতি সুমধুর,
যে সন্ধান জেনে যেতে পারে,
সে বড় চতুর ;
সেথায় নেই কো শঙ্কা,
প্রেমের ডঙ্কা
শুনবি কর্ণকুহরে ॥

ওরে পাগল মন,
আমার কথা শোন,
গোসাই হরির বাক্য ধ'রে
কর দেখি গমন ;
াদাম রে, তোর মিলব রতন,
একবার দেখ রে যতন ক'রে ॥

৪৬১

আগে না জেনে প্রেম-ফল
খেয়েছিলাম প্রেমের গাছে উঠে ॥
জানলে খেতাম না,
গাছে উঠতাম না,
এখন বিষের জ্বালায়
বেড়াই ছুটে ॥

সরল দেখে উঠলাম গাছে,
নামাইতে কে আর আছে,
বল সজনী, দাঁড়াই কার কাছে।
সে প্রেম সরল নয় গো, গরল-মাখা,
জন্মাবধি স্বভাব-বাঁকা ;
খেয়ে উগারিতে নারি,
উহু মরি মরি,
এখন বিষের জ্বালায়
আমার পরাণ ফাটে ॥

কে বলে সই, পীরিত ভালো,
পীরিত ক'রে এই লাভ হ'লো—
সোনার বরণ কালি যে হ'লো,
পীরিত কর্ণ-দ্বারে প্রবেশিয়ে,
ঢুকল গিয়ে হৃদ্-মাঝারে
শেষে ধরে আপন জোর,
আমায় করে চোর,
অকলঙ্কে কলঙ্ক রটে ॥

গোঁসাই হরি পোদোয় রটে,
পীরিতের ঐ স্বভাব বটে,
কাজ কিরে তোর
সে সব কুট-কাটে ॥

প্রেম চিনে না বাউলে ছোঁড়া
ঘরে ভাত নাই, লম্বা কোঁচা,
পোদোর শিকায় দোলে হাঁড়ি,
হ'লো প্রেমের ছড়াছড়ি,
ব্যাপার করে পোদো মাথার মুটে

৪৬২

কেন পারবি যেতে
প্রেমের পথে
ক'রে বমাল চুরি।
রস-বৃন্দাবন,
সেথায় হচ্ছে ভজন,
লবে নীর বেছে ধন
নিক্তি ধরি' ॥

সে দেশে হয় মেয়ে রাজা,
রসিক যারা, তারাই প্রজা ;
লোভী কামী চোরের হয় সাজা।
সেথায় চক্ররূপে আছে হংস,
কাম হ'তে প্রেম হচ্ছে অংশ,
মেলে আনন্দ হাপরে,
ফেলছে বস্তু যে রে,
আগুন-পারার দ্বারে
মিলন করি' ॥

সে দেশের হয় আচরণ,
সতী নয়, সতীত্ব-সাধন,
আপ্তসুখ নাই, সুখী সর্বক্ষণ ;
সেথায় রূপে রূপে হচ্ছে রতি
সম্বন্ধহীন প্রেম-পীরিতি—
প্রকাশ হৃদ্‌কমলে,
আনন্দহিল্লোলে
খেলছে অধর তায়
বিন্দু গিরি ॥

বিলাস আর বিবর্ত-লীলা,
আনন্দ-মদনের খেলা,
ঐ পর্যন্ত যাচ্ছে তার মেলা ;
সেথায় হবি হরণ,
হচ্ছে পূরণ,
অক্রূরের মণি-হরণ,
ফণী নয় সংযোগে,
সদা রয় যোগে,
সদানন্দ রাগে
ত্রিশূল-ধারী ॥

সে দেশের হয় এমনি করণ,
চৌকিদার হয় মঞ্জরীগণ,
লোভী-কামী-চোরের হয় মরণ,
গোঁসাই প্রহ্লাদচাঁদের মর্ম বোঝা-
সাপে যেমন ধরে ছুঁচা,
হাউড়ে সেই ঘরেতে প'ড়ে

রংমহলের দ্বারে
ঘুচে গেল হাউড়ের
জারিজুরি ॥

৪৬৩

গেল দিন রে মন, ভুলো না, ভুলো না।
ম কার রতি ধরি',
সাধু-নিষ্ঠা করি',
দ্বিদলেতে ঐ দেখ না, দেখ না ॥

শতদলের সত্তা দ্বিদলেতে আসি'
ষড়দল-মধ্যে ব'য়ে যায় রে ভাসি',
লাবণ্য-তীরেতে পলকে প্রবেশি'
নিশি-দিশি হ'ল না ঠিকানা ॥

সহস্রদল পদ্ম করি মহাগণ্য,
যাতে বিরাজিত নিত্য শ্রীচৈতন্য,
তারুণ্য-লাবণ্য আছে পরিপূর্ণ,
কারুণ্যাদি প্রেম হ'ল না ঠিকানা ॥

লাল নীল পদ্ম আছে সেই স্থানে,
শ্বেত পীত আছে অগম্য কাননে,
তাঁর তত্ত্বের মহত্ত্ব জানেন রসিক জনে,
জীব-রতি তাহে কভু যে মিশে না ॥

গোঁসাই কালা কহেন সুমধুর স্বরে,
দুরাত্মা গোপালে, তোর চেতন হ'ল না রে,
এ রস-মাধুরী কহিব কি করি'
নিগূঢ় জেনেছে নিষ্কামী যে জনা ॥

৪৬৪

মন রে তুই, আমার মনে
মিশবি যদি আয়।
তুই মনেতে এক মন হ'য়ে
চল রে আজব শহর যাই ॥
নির্বিকারে চলরে মন আজব সহরে,
আজব আজব দেখবি লীলা প্রেম-কপাট খুলে,
সেথায় শুকনা ডাঙায় চলছে তরী
ভেকে হরিগুণ গায় ॥

সে দেশের এমনি, ভাই, ধারা,
সেথায় নাই গাছের গোড়া,
আসমানেতে রসের ডাল
ফুল-ফলে ভরা ;
সেথায় নাইকো রে জল,
দেখি অ-স্থল,
ভাসলো রাজার গড়ের খাই ॥

জন্ম দিয়ে বাপ পালালো,
মা গেল কাশী ;
কার ছেলে কে খেলে ঝাল,
খায় পাড়া-পড়শী।
যে জন রসিক হবে,
বুঝতে পারবে,
চাপবে এসে ভাবের নায় ॥

সে দেশের এমনি, ভাই, রীতি,
সেথা নাই কো প্রকৃতি,

উল্টো প্যাঁচে ছুঁচোর পোঁদে
গলাচ্ছে হাতী।
সাত দরজা পার হইলে,
নয় দরজায় রাত পোহায়॥

অমাবস্থায় চন্দ্রগ্রহণ,
নাই গতাগতি,
নিতুই নিতুই হচ্ছে সেথায়
প্রেমের উৎপত্তি।
সেথায় সাপে নেউলের পীরিত দেখে
প্রকৃতি তায় মূর্ছা যায়॥

সাত দরজা ডিঙিয়ে পোদো,
করতে গেলি চায,
জমির মাথায় আছাড় খেয়ে
হারিয়ে এলি শ্বাস।
সেথায় প্রেমতরঙ্গের হুঁচকো ঢেউয়ে
ভাঙলো জমির নটা-ঘাই॥

৪৬৫

আয়, মজা দেখবি আয়,
ভাব-নদীর মাঝখানে,
রসরাজ উঠছে ডুবছে, হাসছে খেলছে,
ডাকছে ভাবুক জনে॥

সৌরভেতে গৌরব ত্রিকূল,
হেরতে হেরতে দিশেহারা,
হচ্ছে প্রাণ আকুল;

ভেবে পাই না স্থূল,
সকলই হয় ভুল,
নদীর ঊর্দ্ধে চড়া,
ছু'ধার বেড়া,
মাথা নেড়া
ষট্ কোণে ॥

দেখি নদীর একি আজব টান,
নদী ক্ষুণ্ণ ছিল, পূর্ণ হ'ল,
পড়লো প্রলয়-বান :
বড় তীক্ষ্ণ টান,
জীব পড়লে হয় ছুইখান,
নদীর লাল জলে ভাসিল ছু'ধার
সামলানো ভার সেইখানে

গোঁসাই কালা কয় মহাভাবে—
নিষ্কাম নির্বিকার মনে
পার হ'তে হবে ;
শোন রে গোপালে,
বসে ভাবলে কি হবে,
ভাব-নদীর কাণ্ডারী হরি,
করণধারী নাও চিনে ॥

৪৬৬

কৃষ্ণপ্রেম কি সহজে মেলে।
অকৈতব প্রেম
জম্বুনদ-হেম,
উদয় হয় ভাগ্য-ফলে ॥

সাধারণী কিছু নয়,
সমঞ্জসা কিছু হয়,
সমর্থা প্রকৃত প্রেমের
হয় রে উদয়।
প্রেমে হয় না বিয়োগ,
সদাই থাকে যোগ,
ম'রে যায় বিয়োগ হ'লে ॥

মা বাশুলীর পূর্ণ কৃপায়
যেমন দ্বিজ চণ্ডিদাস,
অপূর্ণ সম্পূর্ণ প্রেমে
মিটলো প্রেমের আশ ;
প্রেমের রামী হয় গুরু,
কল্পতরু,
প্রেম-ভাণ্ডার দেয় খুলে ॥

কৃষ্ণপ্রেম সুধাসিন্ধু
বিন্দুর কণা যদি পায়,
বিন্দুর প্রভাবে
চৌদ্দভুবন ডুবে যায়।
এ তো কইবার কথা নয়,
কে করিবে প্রত্যয়,
প্রেমের ভজন না জানিলে ॥

এমন প্রেমেতে বিমুখ,
ফেলে ভাবি আপ্তসুখ,
সুখে এবার বৈরী হ'লাম,
সুখের উপর দুখ।

ধরণীর কৃপায়
হৃষীকেশে কয়,
এই ছিল কি কপালে

৪৬৭

যদি রূপনগরে যাবি,
অনুরাগের ঘরে মার গে চাবি ॥

গাছের আড়ে গাছ রয়েছে,
শিকড়ে তার ফুল ফুটেছে,
ফুলে ফলে ঢেউ খেলিছে,
নজর করলে দেখতে পাবি ॥

শোন্ ওরে মন, তোরে বলি,
তুই আমারে ডুবাইলি,
পরের ধনে লোভ করিলি,
সে ধন রে তুই ক'দিন খাবি

নিরঞ্জনের নাইকো আকার,
নাইকো রে তার আকার-প্রকার,
বিনা বীজে উৎপত্তি তার,
তারে দেখলে পাগল হবি ॥

গোঁসাই প্রেমচাঁদে বলে,
গাছ রয়েছে অগাধ জলে,
শিকড়ে মূল, গাছ পাতালে,
তারে খুঁজলে কোথায় পাবি

৪৬৮

আছে মানুষ মানুষেতে,
যে পারে মানুষ দেখিতে চিনিতে।
মান-হুঁশ হ'য়ে মানুষ ল'য়ে
ফিরছেন সদাই তিনি হুঁশেতে॥

মানুষই চোর, মানুষেতে মানুষ মিলে—
মানুষেতে কই তা বলে!
মানুষেতেই মানুষ খেলে
মানুষকে ছলিতে॥

মানুষেতে মানুষ আছে,
মানুষ নাচায়, মানুষই নাচে;
মানুষ যায় মানুষের কাছে
মানুষ হইতে॥

মানুষ বাঁকা, মানুষ সোজা;
মানুষ ভূত, আর মানুষ ওঝা,
মানুষ রাজা, মানুষ প্রজা,
মানুষকে পূজিতে॥

মানুষ ধার্মিক, মানুষই দস্যু,
মানুষই মানুষের পোষ্য,
মানুষ গুরু, মানুষই শিষ্য,
দৃশ্য হয় সূক্ষ্মেতে॥

মানুষ ইতর, মানুষই ভদ্র,
মানুষ নরক, আর মানুষই শুদ্ধ,
মানুষ মুক্ত, আর মানুষই বদ্ধ,
মানুষের মায়াতে ॥

মানুষ চণ্ডাল,
মানুষই দয়াল,
কেউ মনিব, কেউ মুনিষ-বাগাল,
মানুষ হ'য়ে নন্দের দুলাল
এসেছেন ঐ নদীয়াতে ॥

মানুষ পিতা, মানুষ মাতা,
মানুষ ভগ্নী, মানুষ ভ্রাতা,
পুত্র-মিত্র-দারা-সুত
গাঁথা প্রেম-সূত্রেতে ॥

নারায়ণ মানুষ-রূপ ধ'রে
নর-নারায়ণ হন দ্বাপরে,
যুগে যুগে অবতার তিনি
এই মানুষ-রূপেতে ॥

মানুষই মানুষকে মারে,
মানুষে মানুষকে ধরে,
মানুষে মানুষকে সারে
সারে-অসারেতে ॥

মানুষ ডোবে, মানুষ ভাসে,
মানুষ কাঁদে, মানুষ হাসে,
মানুষ যায়, মানুষ আসে
কেবল কর্ম প্রকাশিতে ॥

যদি মানুষ হ'তে খোঁজ,
তবে মানুষ, মানুষ ভজ ;
ক্ষ্যাপা নিত্য বলে নিত্য পূজ,
এই মানুষের চরণেতে ॥

৪৬৯

মানুষ মানুষ সবাই বলে,
আমি তাই ভেবে মরি, বুঝতে নারি,
কোন্ গাছেতে মানুষ ফলে ॥

কোন্ মানুষের কারণ
শ্মশানে সেই ত্রিলোচন,
সদা সে করে ভ্রমণ
নাম-রসেতে ডুবে,
ঢুলু ঢুলু ছ'নয়নে,
দৃষ্টি করে দ্বিদল-পানে,
বসিয়ে যোগাসনে,
হাড়ের মালা গলায় দোলে ॥

কোন্ মানুষের লাগি'
গোলোকনাথ হলেন যোগী,
তেয়াগিয়ে ষড়ৈশ্বর্য
কার ভাবেতে হয় তপস্বী,
ইচ্ছা যদি আছে মনে,
তবে চিনে ধর মানুষ-ধনে,
নিরিখ ঠিক কর যতনে
সুষুম্নাতে যে জন চলে ॥

কালাচাঁদ কইছে হেসে,
গোপালের লাগলো দিশে,
ইড়া-পিঙ্গলায় ব'সে
মানুষ ধরবে কোন্ সাহসে।
দীননাথ হয়েছে দীনের কাঙাল,
দয়া যেচে হ'ল হালসে বেহাল,
রাই-রূপেতে মিশাল,
মহাভাবে পড়েন ঢলে॥

৪৭০

সচৈতন্য থাকে না ঘরে,
ভ্রমে ঘুম ধরে।
আমার মা ঘুমালেন মূলাধারে,
আমারে কোলে ক'রে॥

সচৈতন্য রূপ হন যিনি,
আঁধারে চৈতন্য-রূপিণী,
অচৈতন্যেতে এই জগৎ সৃজন হয় জানি ;
যদি অচেতন সবাই হ'ল,
তবে চেতন করায় কে কারে॥

যদি অচেতনে হয় এই দেহ সৃজন,
কিসে হবে সংশোধন,
চারি বেদ, চৌদ্দ শাস্ত্র,
নব ব্যাকরণ।
শব্দ-সন্ধি প'ড়ে সন্ধি পাওনি,
বন্দী হবে ফন্দির ফেরে॥

ক্ষ্যাপা গৌরচাঁদ কয়,—
বোবায় গান করছে,
কালা বসে তাই শুনছে,
পঙ্গু উঠে নৃত্য করছে,
ঠুঁটোয় বাজাচ্ছে,
কাণায় ব'সে রঙ্গ দেখছে,
হায় কি মজা এ সংসারে ॥

৪৭১

গোঁসাই, হই নাই তোমার,
তুমি আমার হবে কেনে।
আমার মরমের ভক্তি,
নাই কোন শক্তি,
সিদ্ধান্ত উক্তি
করি অভ্যাসের গুণে ॥

থাকতাম যদি তোমার হ'য়ে
পূর্বশৈলে কৃপা-ভানু
উঠত তবে প্রকাশ হ'য়ে ;
ও তা হবে কেন কপাল মন্দ,
ঘিরে নিল তমঃ-অন্ধ,
হ'ল কন্দর্পের রাজ,
আপন ইন্দ্রিয়-ইচ্ছা কাজ,
তাইতে প'ড়ে গেলাম
আত্মনিবেদনে ॥

ভাঙা গাঁয়ের তালুকদারি,
করতে নারলাম মাল-গুজারি,
হবে যখন হিসাব-আখেরী,
আমার পূর্বধন যা ছিল ঘরে,
কাল খেয়ে কাল নিল হ'রে ;
গোঁসাই, এ নয় হীনের ধর্ম,
করলাম পিতৃদ্রোহী কর্ম,
তাইতে প'ড়ে গেলাম
পিতার বিষ-নয়নে ॥

গোঁসাই হরি পোদোয় বলে,
সিংহের দুগ্ধ শাণে খেলে,
যার যা স্বভাব যায় না ম'লে,
পোদোর ঘটল না সে দশা,
ভাঙলো আশার বাসা,
তাইতে যেতে হ'ল চৌরাশী-ভ্রমণে ॥

৪৭২

সহজ গোপন প্রেম কেন করলাম না,
আমার মনে জানে, প্রাণে জানে, অন্যে জানে না ॥

সহজের ভাব জেনে শুনে,
পীরিত কর সতের সনে,
যেমন কুমরে পতঙ্গ পেলে
কভু ছাড়ে না ॥

অটল পীরিত যে করেছে,
তার মনের অন্ধকার ঘুচেছে,
গুরু-শিষ্য একই আত্মা,
ভিন্ন থাকে না ॥

লক্ষ যোজনের উপরে,
রবির কিরণ-তাপ লাগিলে,
যেমন জলে পদ্ম বিকশিত,
মুদিত থাকে না ॥

পোদো এবার পদ্মবনে
পু'ড়ে ম'লো মনাগুনে,
গেল জন্ম দিনে দিনে
ভজন হ'ল না ॥

৪৭৩

মানুষ-রতন করো যতন,
অযতনে পাবি না।
সেই মানুষের সঙ্গ নিলে
বরণ হবে কাঁচা সোনা

এই মানুষে মানুষ আছে,
করণ ধ'রে নাও গো বেছে ;
অটল মানুষ যে ধরেছে,
তার কি আছে তুলনা

খেলছে মানুষ বাঁকানলে,
দুলছে মানুষ হৃদ্‌কমলে,
অটল মানুষ উজান চলে,
দ্বিদলে তার যায় গো জানা

মানুষ-রসের রসিক যারা,
মানুষ চিনে ভজে তারা ;
তারা সব ক্ষ্যাপার পারা,
কারও কথা শোনে না ॥

সেই মানুষের আজব কথা
শুনে ঘুরে যায় গো মাথা,
গোঁসাই হরি বলছে পোদো,
মনের মানুষ চিনে নে না

৪৭৪

বে-হুঁশিয়ারী হ'য়ো না রে মন,
বে-হুঁশিয়ারী হ'লে পরে
হারাবি অমূল্য ধন ॥

কত মহাজনের ভারা
বে-হুঁশারে যায় রে মারা,
অগ্নির মুখে রেখে পারা
করতে হয় ধন-উপার্জন ॥

অগ্নির মুখে পারা ছুটে,
যায় না যেন চ'টে-ফেটে,
হ'তে হবে মাথার মুটে,
সাধু-গুরুর এই করণ ॥

রমণীর মন হরণ ক'রে—
থাকতে হয় জীয়ন্তে ম'রে,
অনুরাগের দীপক ধ'রে
রূপে দিয়ে দু'নয়ন ॥

মুখ থাকিতে বাক্য বন্ধ,
নয়ন থাকতে হ'তে হয় অন্ধ,
যেখানে নাই কাম-সম্বন্ধ,
শুধুই কেবল প্রেম-রতন ॥

লোভেতে পানা-পুকুরে
ডুব দিলি রে ঠিক দুপুরে,
পোদো ম'ল সগু জ্বরে
আশী-চৌরাশী ক'রে ভ্রমণ ॥

৪৭৫

ভাবীর কাছে ভাব ফুরাল,
ভাব গেল লীলাপুর দিয়ে।
যোগী ছিল, যোগ ভাঙ্গিল,
যোগীর মুখে ধূলা দিয়ে ॥

খেয়ে অমর কলা
হ'ল জ্বালা,
ভোগ ছাড়ে কি জনমকে খেয়ে ?
দিন ছিল, রজনী হ'ল,
রাহুর কোলে ভানুকে থুয়ে ॥

গুরু কল্পতরু
থুয়ে হুরু,
মরি সমঞ্জসার বালাই লয়ে ॥

ছিল সাধারণীর ছিটে
সময় গুণে প্রকাশিল,
সে যে রসান দিতে চিড়কে গেল,
বেরুল তামা ঝলক দিয়ে ॥

গোঁসাই হরি বলে, শলদা ছেড়ে
যাব পোদোকে এলাজ দিয়ে,
পোদো কখনও আমীর, কখনও ফকির,
শুতে নারে ছেঁড়া চাটাইয়ে ॥

৪৭৬

ও যার আছে গুরু-বল
জনম সফল,
বিফলেতে জনম যায় না।
যার গুরু দয়াময়,
হয়েছেন সদয়,
ফুলের বাতাস লাগে না ॥

নামে প্রেমে সে যে ভাসায়ে রসনা,
জাগিতে ঘুমাতে ঘোষিছে ঘোষণা,
রতি-নিষ্ঠ রাগ জাগিছে হৃদয়ে,
শিক্ষা সাধারণে মিশে না ॥

তার ফুটেছে কমল দ্বিদল-দলে,
জেগে' চতুর্দল মৃণালের মূলে,
সে ধন আলেকেতে খেলে, আলেকেতে মেলে,
বিবেক-আলো জ্বেলে দেখ না ॥

অষ্টসিদ্ধি, নব যে বিধি,
ভেদাভেদ নাই, সে-ই সত্যবাদী,
জানে না কখনও
বিচ্ছেদ কেমন,
মিটে গেছে মনের বাসনা ॥

গোঁসাই কৃষ্ণচাঁদ জগন্নাথে বলে,
পরেশ ছুঁলে সোনা হয় ধাতু হ'লে,
কুমুরিয়া পোকা বিঁধিয়া যেমন
করে নেয় শেষে আপনা ॥

৪৭৭

মেয়েকে না চিনতে পেরে
ঘটল বিষম দায় ;
মেয়ে সর্বনাশী, জগৎ ডুবায়,
মেয়ে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যায় ॥

মেয়ে যাকে স্পর্শ করে,
পাঁজরাকে ঝাঁঝরা করে,
কাঁচা বাঁশে যেমন ঘুণ ধরে,
মেয়ে কটাক্ষ-বাণ হানে যারে,
তার মাথার মণি খ'সে যায় ॥

সেই ভয়েতে স্বয়ং শঙ্কর
রাখলেন মেয়ে বুকের উপর,
জয়দেব আদি নব রসিক, আর ছয় গোস্বামী
মাতলো মেয়ের সাধনায় ॥

যে বিষেতে মানুষ মরে,
সেই বিষেতে ব্যাধি সারে,
সুজন বৈদ্য দেয় শোধন ক'রে
তারা জারণ-বড়ি তৈরী ক'রে,
যত বিকারী রোগীকে খাওয়ায় ॥
গোবিন্দ গোঁসাইয়ের বচন,
যাতে জনম, তাতেই মরণ,

করতে পারলে তাতে হয় সাধন,
হ'ল কানা বিড়াল কৃষ্ণদাস যেমন
শিকায় দই দেখে কাপাস খেতে যায়

৪৭৮

নাম ধ'রে কাম কর মন,
চেতন রাখ ঘরে।
অচেতন হ'লে পরে
মাল নেবে তোর চোরে ॥

এই ঘরের মধ্যে সবাই বাদী রে,—
তাও কি জান না রে ?
ফাঁকি দিয়ে নেবে কেড়ে
পড়বি বিষম ফেরে ॥

রঙ-বেরঙ খেলছে জগৎ রে,
ও মন, তাও কি জান না রে,
গুরুপদে জ্যোত মিশায়ে
যোগাও তারে তারে ॥

মন-কানা তুই আনাগোনা
করলি বারে বারে।
তোর দফা রফা হ'য়ে গেছে
কুহকেতে প'ড়ে ॥

গোঁসাই মদন বলছে ডেকে
শোন্ কান ঠারো ক'রে রে,
স্বরূপেতে নেহার দিয়ে
রূপে তলিয়ে যা রে ॥

৪৭৯

গুরু, আমায় ভবে কর পার।
আমি অধম দুরাচার,
ভজন জানি না তোমার ॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি
দেখি সেই দিক অন্ধকার

গুরু তোমার নামের বলে—
সলিলে ভাসালে শিলে,
সেই বলে দিয়েছি সাঁতার।
আমি যদি ডুবে মরি,
কলঙ্ক তোমার ॥

পুরাণে শুনেছি আমি
অধমের বন্ধু তুমি,
অজামিলে করিলে উদ্ধার।
এইবার আমা হ'তে জানা যাবে
মহিমা তোমার ॥

গঙ্গাধরের এই বাসনা,
ভবে যেন আর আসি না,
যাতনা সহে না বারংবার।
এবার মরি যেন জয় গুরু জয় ব'লে,
ভবে যেন আসি না আবার

৪৮০

একটি হেমের গাছে প্রেমের লতা
বেষ্টিত হ'য়ে আছে।
শুধু হেম নয় ও নীলকান্তমণি
তাতে মিশায়েছে ॥

ফুল ছাড়া ফল ধরে,
ফল থাকে আট ক্রোশ অন্তরে,
তবে তায় ফল ধরে কি ক'রে ?
তবে সেচের গুণে হ'তে পারে,
সলিল থাকে কোন্ সায়রে ?
সে যে মালীর পরিপাটী
মাটি করে খাঁটি,
নীর ফেলে ক্ষীরে সেচ করেছে ॥

কি বস্তু ফলের ভিতরে
খাইলে জীয়ন্তে মরে,
অনিত্য জীব বাঁচাতে পারে ;
সে ফল সুধা-মাখা,
গরল-ঢাকা,
জন্মাবধি হয় না পাকা ;
সে ফলে কাঁচাতে সুরস,
রসে করে বশ,
সেই রসেতে যেজন ডুবে আছে

শাখা নাই, পল্লব বাড়ে,
তরু যায় ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে,
ছত্রিশ কোটি যোজন উপরে ;
তার উপরে রসের কলি—

বিকশিত, উড়ছে অলি ;
ফুলের কিবা বর্ণ ভিন্ন,
সাড়ে সাত বর্ণ
যে ফুলেতে জগৎ মেতে আছে ॥

আসমানে তার গাছের গোড়া,
ডালপালা তার জমিন বেড়া,
আয় নাগরী, দেখে যা তোরা ;
গোঁসাই হরি পোদোয় ভণে,
পোদোর কি ভাব উঠল মনে,
সে তো বার দিনের কথা,
বৃক্ষ আছে যথা,
ছত্রিশ দিনের তিন দিন
লও গো বেছে ॥

৪৮১

ভজ গুরু অকৈতবে।
এবার গরজ ছাড়তে হবে ॥

ছাড় কৈতবের গরজ,
মদে মত্ত গরজ,
ভবপারের বীজ
সব ভেঙে যাবে ॥

যেদিন ধ্বজে হবি মূঢ়া,
ভবপারের গোড়া,
কোন্ নবাবের খুড়া
তোরে পার করিবে

কর অকৈতবের সেবা,
ছাড় দেবী-দেবা,
বাসনা মনে আর না করিবে

কর অনন্যভজন,
অজগল স্তন,
সকল অকারণ
তেয়াগিবে ॥

এসে ছাড় রে প্রপঞ্চ,
যোগাও রে মালঞ্চ,
গোপী-ভাব-হৃদে
ধরতে হবে ॥

মুখে বল গোউর,
হৃদে হবে প্রেমাঙ্কুর,
ব্রজরসপুর
প্রাপ্ত হবে ॥

পোদো হ'লি নোচা,
পায়ে বাঁশের খোঁচা
লাগালি অ-চাঁছা,
কোন্ স্বভাবে ॥

ভেবে গোঁসাই হরি বলে,
যা থাকে কপালে,
ভজ গে পোদো, এবার
মানুষ ভবে ॥

৪৮২

হরির হীরের গিরে
স্থিরে অস্থিরে ধীরে জানে।
যেজন অধীরে, কি জানে গিরে ?
হীরে জিরে ক্ষীরে নীরে সুজন চেনে॥
যার ঘুচেছে মনের আঁধার ধাঁধা,
আনন্দ-আস্বাদ বাঁধা,
মগ্ন যেন চকোর আর চাঁদা :
তাদের অবিচ্ছেদ নিশি-দিশি,
প্রতিপদহীন পৌর্ণমাসী,
সেথা নাহি অমাবস্যা, মুখে মৃদু মধুর হাসি
কিরণ প্রকাশিত হয় চিরদিনে॥

হীরে জিরে বিভিন্ন, নীরে ক্ষীরে বাছে হংস,
সাধু বাছে অসার-সারাংশ ;
সেথা অনিত্য কি নিত্য ধাম,
ধৈর্য রামের আত্মারাম,
বেদের বিধাতা না জানে,
নইলে বিধি বলব কেনে,
অবিধি আচরে ব্রজজনে॥

গোঁসাই হরি বলছে জোরে,
সুরা রেখে স্বর্ণাগারে,
নড়াতে চাও সুমেরু ধ'রে ?
পদো, তোর তেজে কি নড়ে গিরি,
ক্ষুদ্র শশধরে হেরি'
বলিস জোতে জোত না জেনে॥

৪৮৩

ভাবছ কি মন, ব'সে ব'সে,
অনুরাগ নইলে কি গৌরচাঁদ আসে।
চাষ করেছ পরশমণি,
ফললে রতন রাখবি কি সে॥

আসলে তুই বে-বনেদী,
আশা-দেহে শুষ্ক নদী,
তাতে ছয়জনা বাদী,
বেদ-মতে ভেদ নাই, সবাই বলে,
টিক ধ'রে নীর নিলে শুষে॥

আজন্মকাল ঝাঁট পড়ল না,
চাম-চটা এগার জনা,
তারা করেছে থানা,
ঠাঠ-করা তালপাতার কুঁড়ে,
কুঁড়ে রইলো বুঁজে
পাঁশে তুষে॥

গোঁসাই হরি কয় বারংবার,
ও তোর নান্দায় গুড় নাই, ভোঁ ভোঁ সার,
এসে করলি কি এবার,
পোদোর মন্দিরেতে নাই রে মাধব,
শাঁখ ফুঁকে গোল করলি শেষে॥

৪৮৪

তুমি দুখ দাও হে, দুখ দাও রাধানাথ,
দাও হে সইতে পারি যত দিন।
আমার দুখের বোঝা
হয় না সোজা,
দুখ বইব কি,
আজ তনু হ'ল ক্ষীণ ॥

সিঁধ-চুরি আর হামাল খুনী,
দফায় দফায় ঘর-জ্বালানী,—
এই তিন কর্মের কর্মী আমি,
ভবে এসে আমার বাকী রইল তিন

দায়মালের আসামী আমি,
দেয় না বোধ কপালে স্বামী,
যদি আইন খেলাপ করেছি আমি,
দ্বীপ-চালানে দাও দন্তে ধরি তৃণ ॥

কোথায় আছে বাউল সাধু,
দ্বীপ-চালানে চললো পদু ;
আমি খেয়েছি বিজাতীয় মধু
সেই কারণে আজ ছিঁড়লো কৌপীন ॥

৪৮৫

হিসাবি বেহিসাবি হয়োনা, ভাই, তোমায় বলি তাই।
পড়ে রইল খশড়া খতিয়ান, আপন হিসাব দেখলি নাই
ঐ মহাজনের কাছে হিসাব,
আনলি রত্ন করলি, রে, ভাব,
হয়না যেন কথার খেলাপ,
তার সনে আলাপ রাখা চাই ॥

ঋণ করে মন রত্ন নিলি,
যত্নে জাহাজ বোঝাই দিলি,
লাভে মূলে সব খোয়ালি,
এখন হল ডুবে জল-শায়ী ॥

মনে মনে কত আশা,
করব এবার ন্তু'ন ব্যবসা,
ফুরালো তোর আশার বাসা,
এখন পুড়ে হ'ল ছাই ॥

কত ভরা মহাজনের
গেছে মারা মাঝ তুফানে,
গোঁসাই নরহরি ভনে,
অনুরাগীর বুদ্ধি নাই ॥

৪৮৬

অনুরাগ ধরে যে জনে,
সে বেদ-বিধি না মানে ॥

তার সমান শীত-উষ্ণ,
সমান দুঃখ-কষ্ট,
সদা থাকে তুষ্ট
কৃষ্ণনাম-গানে ॥

অনুরাগ আগে করায় সংসার-মুক্তি,
শিক্ষা-সঞ্চারণ অবিধেয় ভক্তি,
স্বয়ং চিৎ-শক্তি, সাধু-সঙ্গে যুক্তি,
ভক্তি-রাণীর প্রতি চিন্তা রাত্র-দিনে

অনুরাগে যে জন সদা থাকে রাগে,
সমঞ্জসায় সাধারণী তিক্ত লাগে ;
রতি-নিষ্ঠা রাগ যার হৃদে জাগে,
শুক্ল বস্ত্রের দাগ ঘুচবে কত দিনে ॥

চাতকের ধর্ম-কর্ম নিষ্ঠার জোরে,
তৃষ্ণায় যদি মরে, জল স্পর্শ নাহি করে ;
অনুরাগের জোরে তৃষ্ণা যায় তার দূরে ;
তন্ময়ী সাগরে যাব কতদিনে ॥
সান্নিপাতীর ইচ্ছা পান করতে সিন্ধু,
সদ্‌গুরু-বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ;
সেই তো প্রাণের বন্ধু, তরায় ভবসিন্ধু,
কল্লোলের এক বিন্দু পাব কতদিনে

গোঁসাই রামকৃষ্ণের বাণী
সুধা-তরঙ্গিনী ;
পরা ঠাকুরানীর চরণ দু'খানি
রাগিণীর জোরে
কি না করতে পারে,
রাগহারা হ'য়ে হরে দুখী মনে

৪৮৭

লাভ করতে এসে
রইলাম ব'সে,
লাভে মূলে গেল।
কিছুই হ'ল না,
কিছুই হ'ল না,
এবার আসল ভেঙ্গে
উস্থুল দিতে হ'ল

আসিয়ে বাণিজ্যের আশে,
লাভশূন্য রইলাম ব'সে
আসলে উস্থুল দিব কিসে ?
হ'ল জমা ছোট, খরচ বেশী ;
কাজ দেখে ভাবছি বসি',
সকল নিলে বাকির দায়ে,
পূর্বধন যা ছিল ;
তোলা দিতে দিতে
আমার সব ফুরাল ॥

একমনে থাকি রে ঘরে,
তবে কে কি করতে পারে ?
আপনি সব দিয়ে যাই ছেড়ে।
আছে ছয়জনা তার মন্ত্রীদার,
দশজনা তার সমিভ্যার,
আর পঞ্চজনে জুটে,
তাদের সঙ্গে ছুটে ছুটে
আপনার ফাঁদে আপনি পড়তে হ'ল ॥

গোঁসাই হরি কইছে এঁটে,
পোদো, এলি ভবের হাটে,
আপনার আপনি মলি রে ফেটে।
তুই চক্ষু থাকতে অন্ধ হ'লি,
চোরের হাতে গলা দিলি,
কোন্ দিন কাটা যাবে মাথা,
তখন দাঁড়াবি কোথা,
বাঁচার চাইতে এবার মরাই ভালো ॥

৪৮৮

অনুরাগ-উদয়
হ'লে পাত্র অনুসারে হয়।
ও সে অন্যজনার হবে কেনে রে,
যার ভাবে গদগদ চিত্ত নয়

যার হৃদয়ে নাই ভাব-নিধি,
ঘেঁটে মরে বেদ-বিধি,
তার হয় না মনশুদ্ধি,

মিছে তর্ক ক'রে ব'কে মরে রে
যেমন স্থূল তুষে অবঘাত হয় ॥

রাগ-রূপাশ্রিত যে জনা,
রাগ-পথে তার গমনা,
কোটিতে একজনা ;
সে রাগের ঘরে বিরাজ করে রে,
অনুরাগ ছাড়া তিল-আধ নয় ॥

বিল্বমঙ্গল নাম ছিল,
চিত্তে গাঢ় রাগ হ'ল,
মরা ধ'রে পার হ'ল,
সে শিক্ষা পেয়ে রাগ ল'য়ে রে
তার নিত্যবৃন্দাবন-প্রাপ্তি হয়

গোঁসাই গোপাললাল ভণে,
গোপী-ভাবাশ্রয় বিনে
রাগ হবে রে কেনে,
চাকুরে তোর নাই কোন ঠাওর রে,
ও তোর ভাবের অভাব সমুদয় ॥

৪৮৯

দিল-দরিয়ার মাঝে উঠছে
আজব কারখানা।
ডুবলে কত রত্ন পাবি,
ভাসলে পরে পাবি না ॥

মাঝে মাঝে জাহাজ গেছে,
দাঁড়ি-মাঝি ছয়জন আছে,

নয়জনা তার গুণ টানিছে,
হাল ধরিছে একজনা ॥

ধারে ধারে বাগান আছে,
নানাজাতি ফুল ফুটেছে,
সৌরভে জগৎ মেতেছে,
আমার নাসা মাতলো না ॥

দরিয়াতে ফুল ফুটেছে,
তাতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব রয়েছে,
তিনকে যে এক করেছে,
তার কিসের ভাবনা ॥

অনুরাগে যে ব'সে আছে,
দিলের খবর সে-ই রেখেছে,
মনকে সে ঠিক করেছে,
করছে হরির সাধনা ॥

গোঁসাই গিরিলালে ভণে,
চাকুরে, যাবি কোন্ সাধনে,
ধর গা গুরুর শ্রীচরণে,
নইলে যাওয়া হবে না ॥

৪৯০

অনুরাগ ধ'রে যে জন
ভজে নন্দ-কিশোরে,
শুদ্ধ রতি তার পীরিতি রে,
তার বসতি ব্রজপুরে ॥

অনুরাগী জনার ঢেউ
বুঝতে নারে কেউ,
যেমন বাঘের পিছে ফেউ ;
ও সে যায় না কাছে,
ফেরে পিছে রে,
যেমন দূরে থেকে ষড় করে ॥

অনুরাগেরি করণ,
ব্রজ-গোপিকার ধরণ ;
আনে জানে না মরম,
ও তার শুদ্ধ গুণাত্মক মহিমা রে
কে বুঝবে বল অন্তরে ॥

গোঁসাই গোপাললাল ভণে,
চাকরা রে তুই, কোন্ গুণে
পাবি অনুরাগ-ধনে ?
অনুমানকে বর্তমানি' রে
যদি ভাবতে পার অন্তরে ॥

৪৯১

কোন্ খানে হারায়ে খোঁজ, কোন্ খানে ?
সন্ধান না জেনে
ঘরের মধ্যে রেখে মাণিক
খুঁজতে গেলি মনভ্রমে ॥

সে যে বহু কষ্টের ধন,
বহু কষ্টে হয় রে উপার্জন ;
সেই ধন ল'য়ে ভূতের ঘরে
করলি সমর্পণ ।

পরে পরে পার করে দাও
যেখানের ধন সেইখানে ॥

সে ধন গোপনে ছিল,
কে কোথায় পেল ?
যত্ন ক'রে রাখতে নারলি
কোথায় পড়িল।
মুগ্ধ সিংহের দুগ্ধ ল'য়ে
রাখলি মাটির বাসনে ॥

কর গুরু কৃষ্ণ সার,
এই নাম বল রে মন, আমার,
দীনদয়াল, তোর ঘর-তল্লাসী
করলি না একবার।
তোর ঘর-বিবাদী ছ'জন বাদী
তারাই সব সন্ধান জানে

৪৯২

ঢাকা সহর ঢাকা যতক্ষণ।
ঢাকা খুলে দেখলে পরে
থাকবে না তোর সাবেক মন ॥

ঢাকার কথা শোন্ তোরে বলি,
ঢাকার ভিতর আছে ঢাকা তেপ্পান্ন গলি ;
তাতে চতুর মানুষ কেউ না পড়ে,
পড়ে যত অন্ধজন ॥

ঢাকায় কূপ রয়েছে গোটা আট-নয়,
আটের কাছে যেমন-তেমন,
একের কাছে ভয়।
সেথায় বেহুঁশারে পড়লে পরে
তখনি হারাবি জীবন॥

ঢাকাতে আছে বহুতর কারবার,
মহাজন অনেক আছে, ছুটকো দোকানদার ;
ও কেউ লাভে মূলে হারিয়ে বসে,
কেউ লাভ করে অমূল্য ধন॥

চাঁদ সুদীন বলে, হায় কি করিলাম,
ঢাকেশ্বরী না পূজে কেন ঢাকাতে এলাম !
সেথায় কেউ বা দেখছে মণি-কোঠা,
আমি দেখি উলুবন॥

৪৯৩

মন-মাঝি, শ্রীগুরু কাণ্ডারী তরীতে বসাও।
দেখি, আত্মনদীর বিষম পাথার,
পাছে এই তরী ডুবাও॥

ও সে ত্রিবেণীর খালে,
বিষম তরঙ্গের জলে
মরবি ডুবে খাবি খেয়ে,
বাঁচবি কার বলে ?
তাই বলছি তোরে বারে বারে
চেতন গুরু সঙ্গে নাও॥

যারা বেচে জন-ধনে,
রত্ন-মাণিক কি চেনে ?
তাদের সঙ্গে সওদাগরি
পটবে কেমনে ?
তাদের পুঁজি নাস্তি, বোঝাই কিস্তি,
ফড়েতে কি জানে ভাও ॥

আছে মণি-বাঁধা ঘাট,
দ্বারে মুকুন্দ-কপাট,
চারি চন্দ্র শহরে ফিরে
মাঝখানে তার লাট।
গেলে দেখতে পাবে, সুসার হবে,
আগে সব জ্বালা মেটাও ॥

গোবিন্দ ভাবছে বসিয়ে
সঙ্গের সঙ্গী না পেয়ে,
সঙ্গী পেলে এতদিনে
পৌঁছিতাম গিয়ে।
এ সব কারবারীদের কারবার দেখে
যেতে ইচ্ছে নাই কোথাও ॥

৪৯৪

যোগ-মোহিনী যোগিণী
কি মোহিনী যোগ জানে।
কত মহাযোগী ম'জে গেছে
এই যোগ-মোহিনীর যোগ-ধ্যানে ॥

যে জানে যোগিণীর মায়া,
যোগে জগৎ করেছে ছায়া,
বৃন্দাবনে যোগমায়া
হ'ল লীলার কারণে ॥

অমাবস্যায় ঘোর ত্রিবেণী,
ত্রয়োদশীতে বারুণী,
হইয়ে মকর-বাহিনী
ভাসছে গো তোড়-তুফানে ॥

গড়ের মাঠে সিংহদ্বারে
ব'সে আছে দ্বারকে ঘিরে ;
ফণীতে মণি উগারে,
রং-বারি বয় নয়নে ॥

রামরস কয় উত্তমারে,
পাত যা মাথা সিংহদ্বারে,
যদি সুধা খাবি, প্রাণ জুড়াবি,
সুখে থাকবি রে এ জীবনে।

৪৯৫

মনের মানুষ খুঁজলে কই মেলে।
আমি দুখের দুখী দেখতে পাইনা,
আত্ম-সুখী সকলে ॥

আপ-গরজী ভাব জানে না,
গরজে সদাই চলে,
গরজ পেলে গরজ-কথা
কইবে গো হেসে খেলে ॥

মনের মত বলে কয়ে
গাছেতে উঠায় ঠেলে,
ও সে নামায় না, পালিয়ে যায়,
কাঁদতে হয় ব'সে ডালে ॥

এই যে বেইমানীর হাট, কপট স্বভাব
কথাতে স্বর্গে তোলে।
মুখের সাটক নাইক আটক,
যত নয় তত বলে ॥

উত্তমা কয় বলব কি আর,
পড়েছি মায়াজালে ;
কত দোষী হয়েছি আমি
গৌর-শ্রীচরণ কমলে ॥

৪৯৬

আগেতে মনে বুঝে
দেখ না খুঁজে,
মানুষ আছে এই মানুষে ॥

মানুষকে কে চিনতে পারে,
ও সে বেদের পারে
প্রেম-নগরে বসত করে ;
হয়েছে সেই তো খাঁটি, কলের কাঠি
নাড়ছে সদাই ব'সে ব'সে।
কত মধুর লীলা, রসের খেলা
করছে ঘরের ভিতরে ব'সে ॥

মানুষে মানুষ আছে,
দেখলে খুঁজে,
মানুষ হ'লে যাবে জানা।
আঁচলে থাকলে সোনা গোপন হয় না,
বাইরে কিরণ প্রকাশে ॥

বাঁশে হয় বংশলোচন,
গাভীতে হয় গোরোচনা,
হ'য়ে তুই সোনার বেনে
হচ্ছিস কানা,
রাং কি সোনা দেখ না ক'ষে ॥

মৃগতে মৃগমদ
জন্ম-অন্ধ, পায় না দেখতে অদ্যাবধি,
এমনি অবোধ ফণী
মাথায় মণি
থাকতে ভেক-ভোজনে আসে ॥

কহে গোঁসাই রমানাথ বাউল
গুপের নাই উল,
তিনটি ত্রিশূল বসবি কিসে ?
ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি,
রঙ্গ দেখে ম'লাম হেসে ॥

৪৯৭

আছে সাত-সমুদ্র তের-নদী
ত্রিবেণীর তিনধারা।
কোন্ ধারায় সুধারা বয়,
করে সহজ মানুষ চলা-ফেরা॥

কোন্ নদী বল শুনি,
মিষ্ট, টক, লোনাপানি,
কোন্ নদীর পানি তিত জহরা।
কোন্ নদী উজান চলে,
কোন্ নদী বয় ভেটেলে,
কোন্ খানে দাঁড়িয়ে
রূপের মানুষকে যায় ধরা॥

কামেল দরবেশগণে
সেই দরিয়ায় দেল-ইমানে
ব'সে থাকে তারা।
বাহ্যকাজ ত্যজ্য ক'রে
থাকে রূপ নেহার ক'রে,
আহা মরি বলব কারে
সহজে কি পূরা॥

রসিক সুজন লোকে
ডুব মে'রে চুপ ক'রে থাকে,
কাহারেও ধরা দেয় না গো তারা।
যখন নদীর হুমো ডাকে,
তখন কিনারায় থাকে,
নঙ্গর করিয়ে রাখে,
জাহাজ আর বজরা॥

অধীন রূপের বাণী,
হীরা-কাঞ্চন-মুক্তামণি,
ছিল মোর এই ডিঙ্গিখানি পুরা।
বাউল চাঁদের বাক্য কে'টে
জন পাঁচ-ছয় কুঠে-মুটে
ভাগ করে নিল লুটে,
আমার সঙ্গে ছিল যারা॥

৪৭৮

কিছু হয় নাই আর হবে নাই।
যা আছে তাই, যা আছে তাই॥

স্বপ্নে হয়েছিলাম রাজা,
জগৎ জুড়ে আমার প্রজা,
ঘুম ভাঙ্গিতে আর কিছু তার
দেখতে নাহি পাই॥

ব'সে ছিলাম রাজসিংহাসনে
সিংহসম রাজশাসনে,
ছিলাম আনন্দ মনে,
মনের সুখে কাল কাটাই।
সিংহ বলে মানত সবে,
পাশ মোড়া দিয়ে দেখলাম ভেবে,
সিংহ নই, সিংহের মামা
ভোম্বল দাসের মাসতুতো ভাই॥

ঘৃত-কলসী ল'য়ে মাথে
চলছে মুটে সরান পথে ;

ছাগল-গরু কিন্‌তে বেচতে
মনে মনে মনকলা খাই।
বিয়ে করব সেই ধনেতে,
লেড়কা হলে বলবে খেতে ;
"নেহি খাঙ্গে" ঘাড় ফিরাতে
কলসী ভেঙ্গে সেই লাথি খাই ॥

যা আছে তাই এর তত্ত্ব
বুঝলে হবে ষত্ব-ণত্ব,
জানলে পরে পরমার্থ,
তত্ত্ব কথা তোরে জানাই ॥

তেগাছাখান পিছু ক'রে
ল'য়ে গেছে গ্রামের রাস্তা ধ'রে,
যা সুধীর, কিছু দূরে,
দেখতে পাবি কেউ কোথাও নাই ॥

৪৯৯

বোকা হয় গেলে ঢাকা সহরে।
বিষম ঘোর লাগবে চোখে
শহর দেখে,
ঘোরে ঘোর অন্ধকারে ॥

দেবতা, ঋষি, মুনি
দেখে সেই শহরখানি,
বুদ্ধিহীন হয় তখনি
নিরূপণ করিতে নারে।

ফিরে আসবে কিসে,
ঝিমায় ব'সে
বিদ্যা-বুদ্ধি নেয় হ'রে ॥

অনেকে জানে সন্ধি,
যে যাবে হবে বন্দী,
বেড়াবে কান্দি' কান্দি'
শহরের গলিতে প'ড়ে।
সেথায় বিধি-বিষ্ণুর
লাগে ধাঁধা,
তেমাথা রাস্তা হে'রে ॥

ঢাকাতে ঢাকেশ্বরী
এলোকেশী, দিগম্বরী,
রণবেশ-ভয়ঙ্করী,
আছেন তিনি অসি ধ'রে।
সেথায় সিদ্ধপীঠে
শ্মশান ঘাটে
তরঙ্গ বয় রুধিরে ॥

ভোলানাথ শক্তি পূজে,
সহরের সন্ধি বুঝে,
নিয়েছে খুঁজে খুঁজে
নিজ কার্য-সাধন ক'রে।
যাদবিন্দু বোকা
গুবরে পোকা
এইবার পড়েছিস যমের ঘরে

৫০০

তারে খুঁজলে মিলতে পারে,
বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা
দেখ আপন ঘরে ॥

সেথা দুর্গম রাস্তা, জলপন্থা,
সেথায় কেউ তো যেতে নারে
কালী-কুণ্ডলিনী নামের ফণী
বিষের চক্কর শিরে ॥

গুরুতত্ত্ব-ভক্তির জোরে
তারে কেহ কেহ ধরে।
লোভী-কামী যেতে নারে
সেই সকাম নদীর পারে ॥

দাস নরহরি কয়, কিশোরী আছে
সপ্ত তলার 'পরে।
নেহার দিয়ে দেখ গে গিয়ে
যদি তিনি দয়া করে ॥

৫০১

ডাকলে যারে দেয় না সাড়া,
কাজ কি ডেকে তায়।
সে যে শুনবে আমার মরমের কথা
কি দেখে তা জানা যায় ॥

কেমন গঠন, কেমন বর্ণ তার,
কেউ তো কিছু বলতে নারে
বিশেষ সমাচার ;
তবু কতজনে কত বলে
শুনে আমার হাসি পায় ॥

জন্মাবধি দেখি নাই যারে,
বল দেখি তার অস্তি-নাস্তি
জানব কেমন ক'রে ?
দেখি সবাই তারে ধরবার তরে
অন্ধকারে হাত বাড়ায় ॥

কেউ বা বলে স্বর্গে তার থানা,
কেউ বলে সে কোথায় থাকে
যায় না কো জানা ;
শুনে আমার মনে লাগলো ধাঁধা
পাঁচজনাকার পাঁচ কথায় ॥

কেউ বা তারে পাবার প্রত্যাশে
করে সাধন-ভজন, তীর্থ-ভ্রমণ,
রয় উপবাসে ;
কেউবা পরে গেরুয়া বসন,
কেউ বা নিরামিষ্য খায় ॥

তারে আল্লারসুল বলে মুসলমান,
খৃষ্টানে কয় যীশুখৃষ্ট, হিন্দু ভগবান ;
ও সে একজনাই সকলই বটে
সন্দেহ কি আছে তায় ॥

দেখলাম মনে বিচার করিয়ে,
আছেন আপনি হরি বিরাট রূপে
সাকার সাজিয়ে ;
ও সে কি বা সিন্ধু, কি বা বিন্দু,
তার ভিতরেই শোভা পায় ॥

দাস গোবিন্দ বলে, গোলোক মতিমান,
তুই রাজার বুঝে কইবি কথা,
হবি রে সাবধান ;
সাচ্ কহে তো মারে লাঠি,
ঝুটাতে জগৎ ভুলায় ॥

৫০২

আমার ভিতর আমি কে, তার
খবর রাখলি না।
শুধু 'আমি' 'আমি' করে বেড়াও
সেই 'আমি' বল কোন্ জনা ॥

খাই না আমি ভাত কি তরকারি,
ময়ান-দেওয়া খাস্তা লুচি
কিংবা খাস্তা কচুরি ;
খাই না মুড়ি-মুড়কি, মণ্ডা-মিছরি,
আমি খাই না মাখন-ক্ষীর-ছানা ॥

শাল-দোশাল পোশাক নয় আমার।
রং-বেরংয়ের কোট-কামিজে
আমার কি দরকার ?
ছেঁড়া টেনা কৌপীনখানা
তাও তো আমার লাগেনা ॥

রায়বাহাতুর খেতাব নয় আমার,
উকিল-মুন্সেফ নই কো আমি
জেলার ম্যাজিষ্টার।
নই কো আমি মুটে-মজুর,
বড়লোকের খানসামা ॥

নই আমি সাধু-সন্ন্যাসী,
গৃহী কিংবা ব্রহ্মচারী
নই বনবাসী ;
আমার বারব্রত, তীর্থ-যত,
তাতেও নাই কো বাসনা ॥

অষ্টসিদ্ধি, নবতুষ্টি আর
সে সব কথার কথা
আমি মূলাধার ;
আমার নাই কো কোন সাধন-সিদ্ধি,
আমার নাই কোন উপাসনা ॥

আমার বাসের কোন নাইকো নির্বন্ধ,
বুঝবি কি ভাই, দেহের সনে
কেমন সম্বন্ধ,
ভাই রে, পাখী যেমন গাছে থাকে,
গাছে পাখী ধরে না ॥

তোদের মত স্বভাব নয় আমার,
দেখ, কারেও তোরা বাসিস ভালো,
কারেও বা করিস বেজার ;
আমি সবারে আপনার দেখি,
কারেও আমার নাই ঘৃণা ॥

বাজিকর এক জুড়েছে বাজি,
সেই কারখানায় নাম লেখায়ে
নানা সাজ সাজি’ ;
সাজ খুলে ঠিকানায় গেলে,
কার বল এই ঠিকানা ॥

নির্দিষ্ট আমার নাই কো কোন নাম—
গৌর, গদাই, গোপীকান্ত,
কেশব, কেনারাম ;
আমার নাই উপাধি তর্কনিধি,
আমার নাই কো জাতির নিশানা ॥

দ্বিজ আশুতোষ বলে, যা খুশি যার,
কর গে যা তোরা ;
আমি কেবল দেখছি তোদের
কাজের কি ধারা ।
দাস গোবনে বলে, গোলোক রে, তোর
অহঙ্কার ষোল আনা ॥

৫০৩

গুরুর করণ-সাধন—দিবানিশি ঐ ভাবনা,
তা হ’লা না ॥

গুরুর করণ বিষম যাজন,
বেদ্-বিধি তার সৃষ্টিছাড়া ।
আমার কথায় দৈন্য, কাজে শূন্য,
কেবল হ’ল তানা-নানা ॥

সাধ ক'রে পুষিলাম পাখী,
রাধাকৃষ্ণের নাম বলে না ;
কোন দিন শিকলি কেটে যাবে চ'লে,
জংলা পাখী পোষ মানে না ॥

সমুদ্রের ঐ ভিতরে ব'সে
ভাবছে একটি অবোধ মানুষ,
রাধার প্রেমতরঙ্গ উজান বহে,
বালির বাঁধে ঠেক মানে না ॥

মহাজনের দেনা ভারি,
দেনার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না
আমি হিসাব ক'রে দেখলাম বুঝে,
উস্থল-বাকি তা-ও মিলে না ॥

গোঁসাই হরি বলে, পদ্মলোচন,
ভজন-সাধন যোগ্যকালে ;
মদে মত্ত হ'য়ে রইলাম ভুলে,
গুরুর পদে ফুল দিলাম না ॥

৫০৪

বেদ-ছাড়া এক মানুষ আছে
ব্রহ্মাণ্ডের উপরে।
স্বরূপ-শক্তি যুক্ত হ'য়ে
আছে এক নেহারে

চৌষট্টি রস সাধ্য ক'রে
ব'সে আছে রাগের ঘরে,

অসাধ্য সাধনে
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিনজনে
বʼসে আছে দীপ্ত কʼরে ॥

শুদ্ধ রসিক হʼলে পরে
তবে যাবে রূপের ঘরে,
মহতে তাই বলে।
রাগের করণ বিষম যাজন,
সামান্যে কি পারে ॥

গোঁসাই রামলাল বলে, সত্য
এ বড় কঠিন তত্ত্ব,
ধরবি কেমন কʼরে ?
গোপাল বলে, রস সাধিলে
সেই তো যাবে পারে ॥

৫০৫

মানুষ কি মুখের কথায় মেলে,
তার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিলে ॥

সহস্র দলেতে স্থিতি হয় যাহার,
দ্বিদল-মধ্যে বারাম দিচ্ছে নিরন্তর,
শুন ওরে মন, তাহার বিবরণ,
দশম দলে বিজলী খেলে ॥

ষড়্‌দল পদ্মেতে ব্রহ্মা করেন বাস,
তাহার মধ্যে আছে জ্যোতির্ময়-প্রকাশ,
তারে কর সাধনা,
পূরিবে বাসনা
মনে প্রাণে এই দুʼয়ে এক হইলে

চতুর্দল পদ্মেতে কুলকুণ্ডলিনী,
তিনি হচ্ছেন একের ব্রহ্মসনাতনী ;
সেইখানেতে হয়
মহাযুগের আশ্রয়,
গোপলা পারে যদি সাধন-বলে ॥

৫০৬

দরদী বলব কি তায় আন্দাজী ?
ঘাটের বেওড়া জানে,
জানে রসিক ঘাট-মাঝি

ঘাটের জমা হ'তেছে,
তাহে থানা বসায়েছে,
তাতে নিশান গেড়েছে ;
যেমন ঘাটাল হ'ল পূর্ণশশী,
মন হ'ল অধিক পাজি ॥

ঘাটে জোয়ার এসেছে,
তাহে দুকূল ভেসেছে ;
রূপ-সনাতন তারাই দু'ভাই
ডুবিয়ে হ'ল প্রকৃতি ॥

পৃথিবী আকারে সাকার,
পৃথিবী ন'তে নৈরাকার,
কেবল গুরুতত্ত্ব সার ;
তিন নালেতে সাধ্য-সাধন,
এক নালেতে হয় রতি ॥

৫০৭

আমার মন যদি সুপথে যায় মতে এসে।
তবে ব্রহ্মাণ্ড করি' করতল, যমরাজার ভয় কিসে

ও মনের পায়ে ধরি,
রাধাকৃষ্ণ-নামামৃত
বল হরি হরি।
কর শুদ্ধ সাধন,
রস-আস্বাদন,
ব'সে থাক দিলখোশে॥

আমার মন যে গরজী,
সে নয় কাজের কাজী,
দেখে শুনে তবু তো মন
হ'ল না রাজী ;
পলকে প্রলয় ঘটায়
ফিরায় গো দেশ-বিদেশে

আমার মন যে ঘোড়া,
তার পাঁচ লাগাম জোড়া,
পাঁচজনায় পাঁচ দিকে টানে,
খাচ্ছে গো কোঁড়া।
জ্বালায় চৌদ্দ ভুবন দেখায়,
মজবে কিসে প্রেমের রসে॥

আমার মন যে বিকল,
সে জানে কত ছল

হরবুলি মন বলতে পারে
কুবোল-সুবোল ;
রাম গোঁসাই বলে উত্তমারে,
ঘুচল না মনের দিশে ॥

৫০৮

সচেতনের আপনি মূলাধার।
বল, ঘুম ভাঙ্গায় ভবে কেবা কার ॥

সচেতনের আপনি মূলাধার,
আমি কে, তা জানতে পারলে
পাবি রে নিস্তার।
এই ভাণ্ডের ভিতরে কত ব্রহ্মাণ্ড,
ঘুরছিস অনাহত জীবন ভর ॥

এই চৌদ্দপোয়া দেহেরি ভিতর
স্থূল-সূক্ষ্ম জীব বহুতর,
ঘরের ভিতর ক'রে আছে ঘর ;
তারা নীরের ভিতর খাচ্ছে রে ক্ষীর,
সচেতনে হংস-হংসীর হয় বিহার

ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে
দেহের গঠন হয় ক্রমে,
এই পঞ্চতত্ত্ব পঁচিশ তত্ত্ব
ভুলিস না ভ্রমে।
ওই যে আজ্ঞাচক্রে মায়াবিনী
করে কুহকেতে অন্ধকার ॥

ঐ দেখ বীণাযন্ত্রে সুরটি বেঁধেছে,
মধুর ঝঙ্কার দিতেছে,
ঐ দেখ বাগ্‌-বাদিনী
আহ্লাদিনী
জেগে রয়েছে।
হংস-হংসী-রূপে গুরু
হ'য়ে আছেন মূলাধার॥

গোঁসাই বলাইচাঁদের এই বাণী—
সেই তো জগৎ-চিন্তামণি,
সচৈতন্য আছেন রে যিনি,
দাস নবদ্বীপ তুই আধার মাত্র,
গুরুকে দান কর গে দেহ আপনার॥

৫০৯

চিন্ময় মধুরে ধর, ও সে শ্রী-অধর।
মধুরে সুমধুর আছে দেখ না খুঁজে নিজঘর।

রূপ-সায়রের লাল জলে
সময় বুঝে মানুষ খেলে,
বুঝতে পারে রসিক হ'লে
রূপ-সায়রে দেয় নজর॥

রূপ-সায়রে তিন-ধারা
বুঝতে পারে রসিক যারা,
সদাই রূপে দেয় পাহারা,
নিরিখ দিয়ে সেই লহর॥

প্রথমে গুণেরি মানুষ,
ভক্তি ক'রে রাখ ধরে হুঁশ ;
দ্বিতীয়াতে হোস্ না বেহুঁশ,
নির্বিকারে তাঁরে স্মর ॥

পূর্ণ-ঈশ্বর উদয় তিনে,
নিষ্কাম যাজন সেই দিনে,
নিরিখ দিয়ে সেইখানে
জোয়ারেতে সন্ধান কর ॥

তার পরে সহজ আসে,
থাকে রসিক সাধক তারি আশে,
রূপ-সায়রের রূপ-রসে
মন মিশিয়ে কর খবর ॥

মধুর মূরতিখানি
হেরে হরে মন-পরাণী,
গোঁসাই নরহরির বাণী,
অনুরাগী, তুই নিরিখ ধর ॥

৫১০

যাও রে, আনন্দবাজারে চ'লে যাও।
বাজারে বসতি ক'রে স্বরূপ-রূপে মন মাতাও

সহজ সে আনন্দবাজার,
সহস্র খবর খুলেছে যার,
সহজ আছে হৃদে তোমার,
হেরে ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াও

ভাল-মন্দর মাঝখানে
সহজ রয় অতি গোপনে,
মনের সনে নিরজনে
আকর্ষণে প্রাণ জুড়ায় ॥

সহজ স্বরূপ জ্ঞানাঞ্জন,
খুললে স্বরূপ-দরশন,
ত্য'জে অহং ভাবে মগন,
রূপ-রসে প্রাণ মাতাও ॥

শ্রীরূপ ধ'রে ডুবে যাবে,
তবে স্বরূপ-রত্ন পাবে,
নিত্যানন্দ-হৃদি হবে,
আরও কিছু পাবে যাও ॥

গোসাই নরহরি রটে,
ব'সে অনুরাগীর ঘটে,
রূপ-সায়রের পিছল ঘাটে
রসের মানুষ হেরে নাও ॥

৫১১

ভবে এসে কিছু কাজ হ'ল না,
কেবল হ'ল ভবে আনাগোনা ॥

আনাগোনা ঠিক রাখলি না,
করলি থানা যাতে মানা,
বইলি না হাল থাকতে হেলে,
ম'লেও তো এ দুঃখ যাবে না ॥

ভবে সৃষ্টি যাতে, দৃষ্টি তাতে,—
একি বিধির বিড়ম্বনা,
ব্রহ্মা-আদি রাক্ষস-নরের,
দেখি, কারো ঘরে বাদ পড়ে না॥

স্যাকরা হ'য়ে ঠেকলি গিয়ে,
কৈলি সোনার বদলে খরিদ তামা।
ও তোর পূর্ণকলসী শূন্য হ'ল,
তবু পিপাসার আশা মিটল না॥

গোঁসাই নরহরি বলছে ধীরি,
সাধু সঙ্গে ফলতো সোনা।
হ'ল অনুরাগী বেদাগ দাগী,
প্রাণ-পাখী যেন ছেড় না॥

৫১২

পাগল পাগল, সবাই পাগল,
তবে কেন পাগল-খোঁটা।
দিল-দরিয়ায় ডুব দিয়ে দেখ,
পাগল বিনে ভাল কেটা॥

কেহ বা ধনে কেহ বা জনে,
কেউ পাগল অভাবের টানে,
কেহ বা রূপে, কেহ বা রসে,
কেহ পাগল ভালবেসে,
কেউ বা পাগল কাঁদে হাসে,
ঐ পাগলামির বড় ঘটা॥

সবে বলে পাগল পাগল,
পাগলামি কি গাছের ফল ?
তুচ্ছ করি' আসল-নকল,
সমান সকল তিতা-মিঠা ॥

৫১৩

এ নীতে কেউ নারবি নিতে।
এমন হদ্দ ওঁছার জোড়া নাই আর
অবনীতে ॥

আঁট ভাব অন্তরে রাখে,
বাইরে সে উড়ন-পাকে,
বুঁদ হ'য়ে বসে থাকে
সে আপন স্বভাবেতে ॥

ও সে কভু হাসে, কভু কাঁদে,
কভু নাচে, কভু যাচে,
সদা সমান ভাব তার
শুচি-অশুচিতে ॥

ভাল কি মন্দ ছু'য়ে
তাদেক দ্বারেতে থুয়ে,
পাষাণে বেঁধে হিয়ে
রহে আনন্দেতে ॥

ঘরাঘর দাঁত-খামুটি,
ধরা-ধন ভিক্ষা-মুঠি,
তায় যদি গৃহস্থটি
কহিল ফিরিতে।

ফিরে কথা কবার
নাই অধিকার,
হরি ব'লে সব পরিহার,
বুঝে তেনার
খেলা সকলিতে ॥

সহজে লক্ষ্মীছাড়া,
তায় ভিক্ষে করা,
আজব এক ক্ষেপার পারা
ধারা বিপরীতে।
ঘোরা বার মাস তের জেলা,
যেন ঘর-দরজা গাছের তলা,
নাছের ভিখারী, ঝোলা কাঁথা ছাড়া
পুঁজি নাই বলিতে ॥

৫১৪

কবে হবে আমার সে রাগের উদয়।
কবে রাই-রূপলাবণ্যে, নির্বিকার মনে
অবগাহন ক'রে হইব তন্ময় ॥

রূপ-সায়রেতে কবে যাব আমি,
আমার আমিত্ব দিয়ে ভজিব হে আমি,
সতীর আদর্শ যেন হয় নিজ স্বামী,
আমার প্রাণ তেমনি হবে ভাবময়

তত্ত্বজ্ঞানী যারা রূপ-রসে ভরা,
অধিরূঢ় ভাব রাগে মাতোয়ারা,
তারাই অধর ধরে হ'য়ে আপ্তসারা,
সেই ভাবে ভরা শচীর তনয় ॥

রাইরূপ-সায়রে তিন ধারা চলে,
মাসে মাসে উদয় সুধাবিন্দু খেলে,
সাধুসঙ্গ হ'লে অনায়াসে মেলে
দুর্ভাগ্য কপালে সে তো হবার নয় ॥

নামে নিষ্ঠা হ'লে রুচি উপজিবে,
রুচিতে আসক্তি হ'লে রতি যে বাড়িবে,
হ'লে রতি-পতিজ্ঞান প্রাপ্তি ভগবান,
কর স্বরূপে সন্ধান শ্রীরূপ-আশ্রয় ॥

এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবেতে বিভোরা,
রাধা রাধা ব'লে কেঁদে বেড়ায় গোরা,
তিন বাঞ্ছা লাগি' বয় দু'নয়নে ধারা,
ধারা ধ'রে গোরা বিভোর হয় ॥

তার পর সহজ-অন্বেষণ কর,
তিন ধারার শেষে নজর দিয়ে ধর,
গোঁসাই নরহরি নর-বপু-চিহ্ন স্মর,
অনুরাগী হের আপন হৃদয় ॥

৫১৫

দেখ না, ঠিক দিয়ে অন্তরে, ওরে।
দাও আপনার মনে ঠিক
আপনার অঙ্কের দিক,
বেঠিক হ'লে যাবি ধামান্তরে ॥

ঠিক কর আগে আপন অন্তরে,
ঠিক হ'লে ঠিকানা মিলবে ঠিক তোরে,
মন-কাগজে যা নিয়েছ অঙ্ক ক'রে,
মন বিনে কেউ জানিতে না পারে ॥

রাখ যত্ন ক'রে পৈতৃক রত্ন ঘরে,
পচা পুকুরে ডুব দিস না লোভে প'ড়ে,
খুব হুঁশিয়ারে থাকবি রাগের ঘরে,
বে-হুঁশিয়ারি হ'লে লবে সব কেড়ে-কুড়ে

রাঙা ফল দেখে মুখে লাল ঝরে,
খাবার লাগি' তারে দেখ ঘুরে ফিরে,
খেতে গিয়ে আপনি খাওয়াইলি পরে,
পতঙ্গ যেমন অনলে পড়ে রে ॥

গোঁসাই নরহরি কহে ধীরি ধীরি,
ভাঙব এবার অনুরাগীর জারিজুরি,
খাটবে না, সে যে হীরার ধার ছুরি,
ফল ধরে কর্ম অনুসারে ॥

৫১৬

ডুব দিও না, পার পাবে না
কাম-নদীতে আর।
সে যে অকূলনদীর তুফান ভারি
কূল-কিনারা নাই তাহার ॥

ডুব দিও না, পারে থেকো,
জোয়ার ভাঁটার খবর রেখো,
বিবেক-হলদী গায়ে মেখো,
কুম্ভীরে ছোঁবে না আর ॥

কিবা সাধ্য আছে তোমার
পাড়ি দিতে দাও হে সাঁতার,
কিঞ্চিৎ পাড়ি দিতে পারো
গুরু যদি দেয় কিনার ॥

পঞ্চ রসের রসিক যারা,
জোয়ার-ভাটা চেনে তারা,
তাদের তরী যায় না মারা,
বেয়ে যায় সে প্রেমের দাঁড় ॥
দুধ আর মিশায়ে জলে
জল চলে সে ঊর্ধ্বনলে,
দ্বিজ কৈলাসচন্দ্র বলে,
রাজহংসে দেয় সাঁতার ॥

৫১৭

কিবা দুলিছে ভুবনমোহন !
মম দ্বাদশ কমল দোলায়
কমলিনী সনে কমল নয়ন

প্রেম-পবনে দোলাইছে দোলা,
দেখরে মানস অপরূপ লীলা,
যেন অচলে চপলা,
কোলে করি' করে খেলা,
নবীন নীরদ প্রেমে নিমগন ॥

মদনমোহন নিরখি নয়নে
প্রেমেতে কালিন্দী বহিছে উজানে,
কুলু কুলু রবে সরস্বতী-সনে,
সুরধুনী-সনে হ'য়ে নিমগন ॥

প্রেমাবেশে দিগম্বর-দিগম্বরী
নাচিছে, বলিছে হরি হরি হরি,
শ্রীরাধা-গোবিন্দ, মুকুন্দ-মুরারি,
জয় যদু-রাণী লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥

ছিল যে কামাদি অরাতি ছ'জন,
তারা সবে মিত্রভাব করেছে ধারণ,
তারা শঠতা ত্যজিয়ে মন প্রাণ দিয়ে
ও রাঙা চরণে লয়েছে শরণ ॥

দ্বিদলে ত্রিবেণী-মহাতীর্থধামে
শশাঙ্কশেখর গৌরী ল'য়ে বামে
নিরখি নয়নে সেই রাধাশ্যামে
আনন্দ-সলিলে ভাসে অনুক্ষণ।

মূলাধারে চতুর্দল পদ্ম-'পরে
সাপিনী নিদ্রিত ছিল নতশিরে,
দোলেরি গোলেতে জাগিয়া শিহরি'
উচ্চমুখে প্রেমে করে নিরীক্ষণ

দীনরাম বলে পূর্ণিমার দিনে,
যতনে গোপনে অন্তর-নয়নে
হেরিলে এ-দোল জনমে মরণে
অজয়ে জিনিতে পারে সর্বজন।

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গবীণা' নামক প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা কাব্য-সংগ্রহ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি বাউল গান।

[এই গানগুলি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত বলিয়া পরিচিত]

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে ?

দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই,
যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়া-হুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড,
তাই ভরসা দণ্ড,
এর কাছে কোন্ উপায় ?
কয় যে মদন,
শোন নিবেদন,
দিসনে বেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে॥

সহজ ধারা
আপন হারা
তাঁর বাণী শুনে।
রে গরজী।

—মদন বাউল

২

ধন্য আমি—বাঁশীতে তোর
আপন মুখের ফুঁক,
এক বাজনে ফুরাই যদি
নাই রে কোন দুখ।
ত্রিলোকধামে তোমার বাঁশী,
আমি তোমার ফুঁক।

ভালমন্দ রন্ধ্রে বাজি,
বাজি নিশুইত রাত।
ফাগুন বাজি, শাওন বাজি,
তোমার মনের সাথ॥

একেবারেই ফুরাই যদি,
কোন দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলাম বাইজ্যা
আর কি আমি চাই॥

৩

আমি মজেছি মনে।
না জানি মন মজলে কিসে, আনন্দে কি মরণে
ওগো এখন আমার ডাকা মিছে,
আমার নাই যে হিসাব আগে পিছে,
আনন্দে এই মন নাচিছে
তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে॥

আজব ব্যাপার তাজব লেগেছে,
কই সে সাগর, কই এ নদী,
এ তরঙ্গ দেখবি যদি
মিলা নয়ন হৃদয় সনে।
এত রঙ্গ দেখবি যদি, মিলা মন, হৃদয়-নয়নে ॥

আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে,
এবার দয়াল ফুটেছে আখীর।
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি
দয়াল আমার সম্মুখে জাহির,
রে সম্মুখে জাহির ॥

ফুল ঝরে, পাখী উড়ে, পাতায় শিশির,
গলে রে রোদের তাপে আলোক নিশির,
দয়াল আলোক শশীর।
তাই ভেবে কান্দে ঈশান, যাতনা গভীর,
বড় যাতনা গভীর ॥

—ঈশান ফকির

৫ ৷

আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তারে প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল্, বল্ রে শ্রবণে—
'সে এসেছে, সে এসেছে পূরব গগনে'

'তোর বন্ধু এসেছে, এসেছে সে পূরব গগনে।'
কমল মেলে কি আঁখি
তারে সঙ্গে না দেখি,
তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে ॥
আমি মেলুম না নয়ন
যদি না দেখি তায় আমার প্রথম চাওনে ॥

৬

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মস্‌জিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই, চলতে না পাই—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে ॥

ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই,
ওরে তাতেই যদি জগৎ পুড়াই,
তবে অভেদ-সাধন মর্‌লো ভেদে ॥
ওরে প্রেমদুয়ারে নানান তালা—

পুরাণ, কোরান, তসবী মালা,—
হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা,
কাঁইন্দ্যা মদন মরে খেদে ॥

—মদন ব[illegible]

৭

চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটি,
প্রাণ-রসনায় দেখ্‌ রে চাইখ্যা রসের সাঁই খাঁটি।
রূপের রসের ফুল ফুট্যা যায়,
মরম-সূতা কই ?
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশী—
আমি শুইন্যা আকুল হই।

আমার মিলনমালা হইল না রে,
আমি লাজে পথ হাঁটি ॥

আমি চলি দূর আর দূর
তবু সমান শুনি সুর—
কতদূর আর যাবি বান্দা,
সবই সাঁইয়ের পুর।
আরে যে-ই সমুদ্র সে-ই দরিয়া, সে-ই ঘাটের ঘাটী

৮

হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে
কত যুগ ধরি',
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
উপায় কি করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল,
ফুটার হয় না শেষ ;
এই কমলের সে এক মধু,
রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর
পারো না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
মুক্তি কোথায় পাই ॥

৯

আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে
গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী,
রসের লহরী।

ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী,
সাঁইয়ের বাঁশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হ'য়ে সকল পাসরি'
ঘর ছাড়িয়ে।
শুধু কেঁদে মরি—ভাসাই কুম্ভ-রসের নীরে।
আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে॥

১০

(আমার মন উদাসী হতে চায় ?)
এগো ভাটী সোঁতে ভাটারি গড়ান ;
এগো সাগর যেমন সদা টানে নদীর পরাণ,
সে টান এতই সবল—মনের গরল
অমৃত হইয়ে যায় !
সে যে কেমন ক'রে দেয় গো মন্ত্রণা,
এগো উড়ায়ে দেয় মনের পাখী, মানে না মানা !
সে যে উড়ে যায় বিমানের পথে
শীতল বাতাস লাগে গায় !

(অজ্ঞাত ভাটিয়াল গান)

১১

ঢেউ খেলে রে ! ঝিলমিল সায়রে ঢেউ খেলে !
ঢেউয়ের আড়ি ঢেউয়ের পাড়ি
ঢেউয়ের কারখানা—
(গোঁসাই, ঢেউয়েরি কারখানা)
(আর) ঢেউ কাটিয়ে ধর পাড়ি,
ওরে মাঝি সোনা !

আগা দিয়ে উঠে ঢেউ
পাছা দিয়ে যায়—
(গোঁসাই, পাছা দিয়ে যায়)
জীবনের কাণ্ডারী নেয়ে
ব'সে পাল ঘুরায়।
বাঙ্গলা মুলুকের মাঝি
ভাইটাল পাল খাটায়।
(গোঁসাই, ভাইটাল পাল খাটায়)
জাহাজে খালাসী নেয়ে
উজান বেয়ে যায়॥

১২

ওগো দরদী! আমার মন কেন
উদাসী হ'তে চায়!
এগো ডাক নাহি হাঁক নাহি গো—
আপনে আপনে চলে যায়!
এগো ধৈরজ না ধরে অন্তরে—
যেন কেঁদে উঠে মন শিহরি' নয়ন ঝরে—
নীরবে সুরবে সদা
বলিতেছে "আয় গো আয়"॥

১৩

পরাণ আমার সোতের দীয়া!
(আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে?)
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার,
আন্ধার নিশুইত ঢালা,—
আন্ধার-মাঝে কেবল বাজে
লহরেরি মালা! (গো)

তারার তলে কেবল চলে
নিশুইত রাতের ধারা ;
সাথের সাথী চলে বাতি
নাই গো কূল-কিনারা !
(দিবা রাতি চলে গো)
(বাতি জ্বলে সাথে সাথে গো)
অচিন্ ফুলে নদীর কূলে
ডাকে গো কারা !
("কূলে ভিড়া", "ক্ষণেক জিরা")
অকূল পাড়ি থাম্‌তে নারি—
(আর) চলে যে ধারা।
(আমি চলি বে-ঠিকান্)
অকূলের কূল গো !
দরিয়ার সাগর !
"আয়" কয় বা কে ? কেমন ডাকে ?
পাইমু গো লাগর।
তোমার কোলে লইবা তুলে
জুড়াইমু গিয়া !
তোমার বুকে নিবুম সুখে
জুড়াইমু গিয়া ॥

১৪

ওরে ডুবছে নাও ডুবাইয়া বাও
ওরে রসিক নাইয়া।
ওরে ভাঙ্গা নাও যে বাইতে পারে
তারে বলি নাইয়া।
ওরে হাল ছেড়ো না, ভয় কোরো না,
পারাবারে যাইতে বাইয়া।

ও তোর ভাঙ্গা নাও লোনা পানি
ছাইড়া দিছে খাইয়া।
ওরে পথের মাঝে ফাঁদ পেতেছে
বাজীকরের মাইয়া॥

—সুখারাম বাউল

১৫

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অতিথ গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন
কারে প্রণাম করবি মন ?
গুরু যে তোর বরণডালা,
গুরু যে তোর মরণ-জ্বালা,
গুরু যে তোর হৃদয়-ব্যথা,
যে ঝরায় দু'নয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন ?

রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত বাউল-গান

[প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২২]

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে !
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে,
লাগি' সেই হৃদয়শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হতো খুশী,
দেখতাম নয়ন ভ'রে।

আমি প্রেমানলে মর্‌ছি জ্বলে, নিভাই কেমন ক'রে,
মরি হায়, হায় রে।
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে,
ওরে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কি,
যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
সামান্যে কি দেখিতে পারে তারে।
তারে যে দেখেছে
সেই মজেছে
ছাই দিয়ে সংসারে!
মরি হায়, হায় রে!
ও সে না জানি কি কুহক জানে
অলক্ষ্যে মন চুরি করে!
কুলমান সব গেল রে
তবু না পেলাম তারে,
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে!
তাইতে মোরে দেয় না দেখা সে রে।
ও তার বসত কোথায়
না জেনে তায়
গগন ভেবে মরে।
মরি হায় হায় রে।
ও সে মানুষের উদ্দিশ
যদি জানিস্‌
কৃপা ক'রে,
আমার সুহৃৎ হ'য়ে,
ব্যথার ব্যথিত হ'য়ে,
আমায় ব'লে দে রে! —গগন হরকরা

অর্থ-সংকেত ও টীকা-টিপ্পনী

[এই গানগুলির অধিকাংশই নানাপ্রসঙ্গে গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া যে-গুলির প্রয়োজন-বোধ হইয়াছে, সেগুলির ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করিয়া অর্থ-সংকেত এবং টীকা-টিপ্পনী প্রদত্ত হইল।]

লালন: ১। তন্ত্রধর্ম, সুফীধর্ম ও বাউলধর্মের মূল অবলম্বন এই মানব-জীবন ও মানব-দেহ। তাই লালন মানব-জীবনের অপরিসীম মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে পূর্বের সব আলোচনা দ্রষ্টব্য। ২—৫। ভগবানের নিকট দৈন্য, আর্তি ও শরণাগতি। ৬। এলাহি আলামিন—ইহকাল ও পরকালের কর্তা; আলমপানা—জগতের ত্রাণকর্তা; নূহ নবী—নোহার জল-প্লাবনের প্রসঙ্গ; মেহের—কৃপা; জাহের—প্রকাশিত; নেজাম নামে বাটপাড়—কথিত আছে যে, বিখ্যাত সাধু নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন; ৯৯টি হত্যাকাণ্ডের পর ১০০তম হত্যাকাণ্ডের সময় অকস্মাৎ তাঁহার মনের গতি পরিবর্তিত হয় এবং শেষে তিনি ধর্ম-জীবন যাপন করিয়া নিজামুদ্দিন আউলিয়া নামে পরিচিত হন। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'য় নিজাম ডাকাতের পালা দ্রষ্টব্য। হদি—আরবী 'হদিস' শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অর্থ—সন্ধান, তত্ত্ব বা তাৎপর্য। কুষ্টিয়া-অঞ্চলের অশিক্ষিত সাধারণ লোক এই অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকে। দায়মাল—অপরাধী। দোজাক—নরক। ৮। লালন চৈতন্যদেব, রাম প্রভৃতিকে ভগবান-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের নিকট করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। ১৮। ছুরাত—আকৃতি; গ্রন্থ-মধ্যে এই গানের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ২২। গ্রন্থ-মধ্যে এই গানের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; "কুল্লে সাইন মোহিত"—ঈশ্বর সব জিনিসকে ঘিরিয়া আছেন (কোরান) ২৩। আতশের কোড়া—জ্বলন্ত চাবুক। ২৭। মনুরায়—মন বা প্রাণ;—এই শব্দটি বৌদ্ধ-সহজিয়াদের গ্রন্থে 'মণ-রাঅ'-রূপে (কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ—নং ১৯) এবং নাথ-সাহিত্যে 'মনুরা'-রূপে অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রাম্য গানেও 'মনুরা' বা 'মনুরাই'-রূপে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। "মনুরা উড়িয়া গেল পড়ি রৈল কায়া"—পূর্ববঙ্গগীতিকা। ৩০। এই গানটি ভগবানের লীলাবাদের রহস্য ব্যক্ত করিতেছে। অসীম, অনন্ত, অরূপ ভগবান মানুষের মধ্যে সসীম হইয়া, আকার ধারণ করিয়া, মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়াছেন। নিজে একেশ্বর ('না-শারিকালা'), সর্বশক্তিমান্ ('রায়রাঞা') হইয়াও সাধারণ মানুষের বিচিত্র সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন—ইহা অদ্ভুত রহস্যজনক লীলা। লালন এই রহস্য নিজে নিজেই লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হন, কিন্তু কাহাকেও বলেন না। সুফীধর্মের ঈশ্বর ও মানুষের সম্বন্ধের প্রভাব আছে এই গানটির উপর। (দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়—বিশেষভাবে রূমীর কবিতার উদ্ধৃতিগুলি); লাচাড়ি—মূল অর্থ ত্রিপদী ছন্দ—এখানে রহস্যজনক তত্ত্ব। ৩৩। বালাখানা—কোঠা-বাড়ি। ৩৪। নাগরদোলায়—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে। ৩৫। মওলা—প্রভু, কর্তা অর্থাৎ ভগবান; রাণায়—বারান্দায় বা রকে। ৩৬। দেড়ি—মূল অর্থ বাকী বা অসমাপ্ত, যথা—'দেড়ি কাজ'—কুষ্টিয়া অঞ্চলের সাধারণ লোকের কথায় ব্যবহৃত; এখানে ইতস্ততঃ ভাবনা। ৩৭ ও ৩৮। লালনের অত্যন্ত জনপ্রিয় গান—গ্রন্থ-মধ্যে ইহার আলোচনা দ্রষ্টব্য। ৩৯। লালন নিজের দোষে প্রকৃত

রত্ন না চিনিয়া অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া বাহিরের চাকচিক্যে ভুলিয়া সাধনা-ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ৪০। অত্যন্ত জনপ্রিয় গান; পড়শী—মনের মানুষ। ৪১। ত্রিবেণী-দরিয়ায় না ডুবিলে ইহার অদ্ভুত রহস্য জানা যায় না। সেখানে অসম্ভব সম্ভব হইতেছে; একই বস্তু লোকবিশেষে দুইরূপে প্রতিভাত হইতেছে। স্তন টানিলে শিশু দুধ পায়—জোঁক পায় রক্ত। একই বস্তু হইতে সাধনা অনুসারে কেহ পায় অমৃত, কেহ বিষ। ৪২। সহজ মানুষের লীলা—সাধনা-অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ৪৫। অযোনি, সহজ ও সংস্কার-মানুষের উল্লেখ সহজিয়া-সাহিত্যে আছে; দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের 'মনের মানুষ'-প্রসঙ্গ। ৪৬। এই গানটির মধ্যে কুষ্টিয়া-অঞ্চলের নিতান্ত সাধারণ লোকের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ আছে। পেঁচোপেঁচি—অপদেবতা—পুরুষ ও স্ত্রী; আলাভোলা—আলেয়ার আলো—Wilo-the-Wisp; ফেঁও-ফেঁপি—ক্ষুদ্র ও নিম্নস্তরের লোক; ফেক্‌সা—সারহীন; ভাকা-ভুকো—মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারণা। চটা-মারা—চঞ্চল, ছিটকে-পড়া স্বভাবের; কোনো কাঠ বা বাঁশে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিলে একটি খণ্ড যেমন ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ। লালন গানটিতে বলিতেছেন যে, যে মানুষ-তত্ত্ব সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, সে হিন্দু-মতের মাটি বা কাষ্ঠ-নির্মিত দেব-দেবীকে ভূত মনে করে, আর মুসলমান-মতের জিন, ফেরেস্তা প্রভৃতির বিবরণ তাহার চোখে ধুলা দিতে পারে না। ৪৭। সহজ-মানুষের লীলা-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। সাধনা-অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ৪৯। নিরঞ্জন—এই শব্দটি ঈশ্বরকে বুঝাইতে বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে, 'নিষ্কলঙ্ক', 'পবিত্র'। পূর্বে ইহা ব্রহ্ম বা পরমাত্মার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মধ্যযুগ হইতেই এই শব্দটি একটি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। কৃষ্ণাচার্যের দোঁহায় (১নং) 'নিরংজনলীণ' কথাটি আছে। এখানে উহার মূল অর্থটি বিবৃত করিয়াই বলা হইয়াছে—"নির্গতানি অঞ্জনানি রাগদ্বেষাদিক্লেশা অস্মিন্নিতি নিরঞ্জনঃ সহজকায়ঃ। তত্র লীনো নিমগ্নমনা যোগীন্দ্রঃ।" ধর্ম-পূজার ধর্মদেবতাকে বলা হইয়াছে 'নিরঞ্জন'। ধর্মপূজা-বিধানে নিরঞ্জনের ধ্যানের শেষ লাইনটি এইরূপ:—"…নিরঞ্জনোঽমরবরঃ পাতু মাং শূন্যমূর্তিঃ"। শূন্যপুরাণে ধর্মের ধ্যান এইরূপ:—"শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্নবিনাশনং। সর্বপরঃ পরদেবঃ তস্মাত্ত্বং বরদো ভব। নিরঞ্জনায় নমঃ।" এই ধর্মদেবতার উপর বৌদ্ধ-শূন্যবাদের প্রভাব আছে। বাংলাদেশের যোগী-জাতির এক শ্রেণী শিব ও ধর্মনিরঞ্জন উভয়কেই পূজা করে। বৌদ্ধ-শূন্যবাদ-প্রভাবান্বিত হইয়া এই নিরঞ্জন অলক্ষ্য হইয়া 'অলখ নিরঞ্জন'-এ রূপান্তরিত হইয়াছেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের সন্তদের নিকট। বাউল-দের গানেও পরমাত্মা বা ঈশ্বর বুঝাইতে এই নিরঞ্জন শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই নিরঞ্জন যে মূর্তি ধরিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণরূপে লীলা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার মাহাত্ম্যের আধখানা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, মানব-দেহে সহজ-মানুষরূপে অর্থাৎ রজোবীজের মিলনে যে লীলা, তাঁহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ লীলা। মানুষ তাহার জন্মলতার মূল জানিলেই এই সাঁই-এর পরিচয় পাইবে। ৫১। 'মনের মানুষ' অমাবস্যাহীন পূর্ণচন্দ্র। যখন দ্বিদলে স্বরূপে তাঁহার স্থিতি হয়, তখন তাঁহার সত্তা বিদ্যুদ্দীপ্ত ও জ্যোতির্ময়, কিন্তু যখন তিনি তাঁহার অস্তিত্বের পরিচয় দেন, তখন সমুদ্রের তরঙ্গায়িত স্বল্পপরিসর স্থানে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। সেই তরঙ্গের মধ্যস্থলে স্বর্ণ-মণ্ডিত পর্বতে অধরচাঁদের অবস্থান। সেই সমুদ্র-তরঙ্গে ডুবিলে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। বাউল-সাধনা অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ৫৬। মথন-দণ্ড—লিঙ্গ। মন্থনে বিষ হইতে অমৃত পৃথক হইবে। ৬১। বোলজন বোম্বেটে—

৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয় ও ৬ রিপু; পাঁচজন ধনী—বিবেক, জ্ঞান, সংযম, বৈরাগ্য ও ভক্তি। রাজেশ্বর ইত্যাদি—সহজ-মানুষের স্বভাব চোর-সদৃশ। দ্রষ্টব্য : লালনের গান নং ১০৮ ও ১১০। এই দুইটি গানে সহজ মানুষের চোর-স্বরূপত্ব লালন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতি-দেহে সহজ-মানুষের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলেই তাঁহার চোর-স্বভাব বুঝা যাইবে। সাধনা-অধ্যায় দেখুন। ৬৬। বরাতে করিল সৃষ্টি—মানুষরূপে; এই 'নিরাকার ব্রহ্ম' বা অচিন মানুষের খবর কেবল মহাদেব ধ্যানযোগে কিঞ্চিৎ জানেন। লালন বলিতেছেন যে, যোগী ব্যতীত কেহই এই মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। যোগই বাউল-সাধনার মূলভিত্তি। ৭১। কলিযুগে মানবই নিরাকার জ্যোতির্ময়ের অবতার। ৭৪। গুরু-অর্থে ঈশ্বর বুঝানো হইয়াছে। ৭৯। ঘাটসারা—ঘাটে আত্মরক্ষার সতর্কতামূলক ক্রিয়া। দোয়াড়ি—মাছ ধরিবার বাঁশ-নির্মিত যন্ত্রবিশেষ,—ইহা পাতিবার কৌশল না জানিলে মাছ বাহির হইয়া যায়। ৮২। লালনের অন্যতম জনপ্রিয় গান। লক্ষণা—অলংকার-শাস্ত্রে শব্দের ভাব-প্রকাশক তিনটি শক্তি বা 'বৃত্তি'র কথা উল্লিখিত আছে,—মুখ্যবৃত্তি, লক্ষণাবৃত্তি বা গৌণীবৃত্তি ও ব্যঞ্জনাবৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-শক্তি, লক্ষণা-শক্তি এবং ব্যঞ্জনা-শক্তি। 'হরি' শব্দ দ্বারা স্বরূপতঃ বিষ্ণু বা ভগবানকে, 'গো' শব্দদ্বারা গো-দেহধারী গরুকে, 'শুক্ল' শব্দ দ্বারা শ্বেতবর্ণকে এবং 'পাচক' বলিতে পাকক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে বুঝায়। ইহাই শব্দের অভিধা-শক্তি, অর্থাৎ মূল বা প্রধান অর্থ-বোধক শক্তি। লক্ষণা-শক্তি বা বৃত্তি শব্দের যাহা মূল বা মুখ্য অর্থ বুঝায়, তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থকে প্রকাশ করে। যেমন 'গঙ্গায় গোপ-পল্লী অবস্থিত'। এখানে শব্দের মুখ্য-বৃত্তি ধরিলে 'গঙ্গা'-শব্দে ভাগীরথীর খাতের জল-প্রবাহকে বুঝিতে হয়, কিন্তু জলের মধ্যে কোনো পল্লীর অবস্থিতি সম্ভব নয় বলিয়া গঙ্গা-সম্বন্ধ-যুক্ত তীরে বসতি করিতেছে—এইরূপ বুঝিতে হয়। শব্দের যে শক্তির দ্বারা 'গঙ্গা' শব্দে জল না বুঝাইয়া তীর বুঝাইল, তাহাকেই লক্ষণা বলে। এই লক্ষণা-শক্তি কোনো বিশেষ প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য করিয়া আশ্রয় করা হইয়া থাকে। শব্দের যে শক্তি দ্বারা ঐ প্রয়োজন জ্ঞাপন করা হয়, তাহাকে বলা হয় ব্যঞ্জনা-বৃত্তি বা ব্যঞ্জনা-শক্তি। যেমন 'দেবদত্ত একটি সিংহ' বলিলে দেবদত্ত চতুষ্পদ পশু হইয়াছেন এবং মস্তকে সিংহের কেশর ধারণ করিয়াছেন—ইহা বুঝায় না, তিনি সিংহের শৌর্যবীর্যাদি-গুণযুক্ত হইয়াছেন—ইহাই বুঝায়। সুতরাং দেখা যায়, লক্ষণা বা গৌণী এবং ব্যঞ্জনা-বৃত্তিতে, শব্দের মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া একটি নূতন অর্থ কল্পনা করিতে হয়। লালন বলিতে চাহিতেছেন যে, শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া 'আত্মরূপে কর্তা হরি'কে জানিতে কেবল লক্ষণাকেই জানিতে হয়। এই স্থানে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় :

"সর্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি।
লক্ষণা হইলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥
এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণ অর্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া॥" (আদি, ৭ম)

৮৩। অহিভুণ্ডে কর গে খেলা—বাউল-সাধনা বিষধর সাপ লইয়া খেলার মতো। কামকে জয় করিলেই সেই সাপের মাথায় চড়িয়া নাচিয়া খেলা করা যায়। মহারস ইত্যাদি—সহজানন্দ

বা তীব্র মহাসুখের উপলব্ধি শৃঙ্গার দ্বারাই লভ্য, কিন্তু সেই যুদ্ধে আত্মরক্ষা করা প্রয়োজন। ৮৪। মায়েতে পুত্র ধরে খায়—পিতার আত্মা পুত্রে রূপায়িত; পিতার বীজ পুত্র-স্বরূপ, সুতরাং রজের সঙ্গে বীজের মিশ্রণে জন্ম-অর্থে মা নিজ সন্তানকে, পুত্রকে খাইয়া ফেলে। বাউলের সাধনা এইভাবে রজোবীজের বিচ্যুত মিলন নয়। সুতরাং লালন সাধককে সাবধান করিতেছেন। ৮৬। বাউলের সাধনা 'টল'ও নয়, 'অটল'ও নয়—'সুটল'। ৮৯। আবালগুদড়ি—বৈরাগীর নাকে ও কপালে তিলক ও ফোঁটা—নিতান্ত সাধারণ লোকের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত। ৯০। শব্দের ঘরে নিঃশব্দের কুঁড়ে—নানা কোলাহলমুখর দেহের মধ্যে অতি গোপন শব্দহীন সত্তা পরমাত্মার বাস। ৯৫। ভেস্ত—স্বর্গ, ফার্সী বেহেশ্‌ত্‌ <আবেস্তা বহিষ্ট <সংস্কৃত বশিষ্ট। ৯৮। ইল্লিন-মঞ্জিল—স্বর্গ-রূপ প্রাসাদ; ইল্লিন-ছিজ্জিন—স্বর্গ ও নরক; গোনার খাতা—ধর্মের নির্দেশ পালন না করার ফলে কৃত পাপের তালিকা। ৯৯। এই গানটিতে বাউলদের সাধনার উদ্দেশ্য যে জন্ম ও মৃত্যুর ফাঁদ এড়ানো—সেই কথা বলা হইতেছে। অমর্তের এক ব্যাধ ইত্যাদি—ব্যাধ যেমন পাখী ধরিবার জন্য জাল পাতে এবং তাহার মধ্যে লোভজনক নানা খাদ্য রাখে, ভগবানও সেইরূপ মানুষকে এই সৃষ্টি-ধারা বা জন্ম-মৃত্যুর ফাঁদে ফেলিবার জন্য জাল পাতিয়া বসিয়া আছেন। এমন কি, দেবতারা পর্যন্ত এই ফাঁদে পড়িয়াছেন। কিন্তু এই ফাঁদ ছিঁড়িয়া যাইতে হইবে—এই সৃষ্টিধারার প্রতিলোম গতিতে চলিতে হইবে,—ইহাই বাউল-সাধনা। ১০১। পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর পায়—একটি প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য। পিঁড়ের অর্থ ঘরের বারান্দা। পেঁড়ো—পাণ্ডুয়া শব্দের অপভ্রংশ। পাণ্ডুয়া একদিন বাংলার রাজধানী ছিল। এই Idiom-টির অর্থ এই যে, ঘরের বারান্দায় বসিয়াই রাজধানীর খবর পায়। তোড়ানি—পান্তা ভাতের জল। ১০৪। সাধন-সংকেত। ১০৭। দেওয়ানা—পাগল; খিজি—অর্থহীন জিদ। ১০৮ ও ১১০। চোর-রূপী সহজ-মানুষের লীলা—সাধনা-অধ্যায় দেখুন। ১১২। ভাবের মানুষ নীরে-ক্ষীরে বর্তমান আছেন। ১১৪ ও ১১৫। মানুষের অবস্থিতি দেহের অতি উর্ধ্বস্তরে জ্ঞানের অগম্য রূপে, কিন্তু সময়বিশেষে তিনি দেহের মধ্যেই উদিত হন। তখনই সেই অধরকে ধরা যায়। ১১৮। দেহের নির্মাতা এই দেহের মধ্যেই আছেন—দেহের প্রেম-রসেই তিনি বিরাজ করিতেছেন। এই দেহের চাঁদকে ধরিবার জন্য গগনের চাঁদের দিকে তাকাইলে হইবে না। এই চাঁদ-ধরার বিধি জানা দরকার। কোট-সাধন—কোট কথাটি কুষ্টিয়া-অঞ্চলের বিশেষ ব্যবহৃত ভাষা। ইহার অর্থ—অপরিবর্তনীয় দৃঢ় সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা। ১২০। কারণ-বারির বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। ১২১। দবোচ বা দপকাপ—সঙ্কটজনক অবস্থা—কুষ্টিয়া-অঞ্চলে সাধারণ কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত। ১২৪। এক ঈশ্বর সৃষ্টিতে নানারূপে বিভিন্ন মূর্তিতে অভিব্যক্ত। তুলনীয়: রূমীর 'দীওয়ানী-শামসী-তব্রিজ'-এর বিখ্যাত কবিতা—'Unknowing'—এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্ধৃত। বেওরা—পাগল। ১২৬। চাঁদ—শুক্র; রাহু—রজঃ—পুরুষ ও প্রকৃতি-শক্তি। সাধনা-অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ১২৭। ঘুসকিজারি—অবৈধ ব্যবহার। তিন দিনের রতির তিন রকমের বর্ণ এবং চতুর্থ দিনের আর একটি বর্ণ কল্পিত হয়। এই বর্ণ দ্বারা নূরের আসন ঘেরা—'ছিয়া, ছুফেদ, লাল, জরদ'—এইরূপও গানে উল্লেখ আছে। ১৩০। মুরশিদ নূর-সদৃশ, আর তাঁহার সঙ্গে এক অলক্ষ্য নূরীর মিলন প্রয়োজন—ইহাই কানার কয়ণ। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন লালনের নিকট আলেখ নূর ও নূরীর মিলন বলিয়া অনুভূত। ইহাই কূপ-জল ও গঙ্গা-জলের মিলন। উভয়ের একাত্মতা-সাধনই

প্রকৃত বাউল-সাধনা। লালন সুফীধর্মের ভগবান ও ভক্তের—প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনকে বাউলদের পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ১৩২। সাধনা-অধ্যায়ে 'অমাবস্যা'র তাৎপর্য দ্রষ্টব্য। ১৩৪। সাধারণ বাউল বৈষ্ণব ও ফকিরদের কপটাচার ও অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলা হইতেছে। ধাঁদা-বাঁধা—যে প্রসূতির গর্ভপাত হয় বা সন্তান হইয়া মারা যায়, তাহার প্রতিকারের জন্য নানা ক্রিয়া এবং মন্ত্রাদি পাঠ করা। লালন বলিতেছেন যে, ফকিরেরা কেবল ধাঁদা-বাঁধা ও ভূত ছাড়াইবার কাজ অর্থাৎ ভূতের রোজাগিরি করিয়া বেড়ায় এবং নিজেদের সাধু বলিয়া প্রচার করে; বৈষ্ণবরাও ঐরূপ তিলক কাটিয়া জপের মালা হাতে করিয়া নিজেদের প্রকৃত বোষ্টম বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু সত্যকার প্রেম কাহাকে বলে, তাহারা তাহা জানে না। ১৩৬। লালন লীলাকারী কৃষ্ণ এবং পরমাত্মা-রূপী কৃষ্ণের মধ্যে প্রভেদ করিতেছেন। ১৩৮। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ১৪৩। বাউলের প্রকৃতি-ঘটিত সাধনা বিষম কালনাগিনী লইয়া খেলা করার মতো, যে-কোনো মুহূর্তেই মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু ইহাই সাধনার পথ। যদি ভয়ে এ-পথ ত্যাগ করিতে হয়, তবে আর সাধনা সম্ভব নয়। সেজন্য উৎকৃষ্ট সাপুড়ে হইতে হইবে—যাহার মন্ত্রে সাপ মাথা তুলিতে পারিবে না। অন্যান্য বাউলেরও বহু গানে ইহার উল্লেখ আছে। লালনের আর একটি গান—"যা ছুঁইলে প্রাণে মরি, এ জগতে তাইতে তরি" (নং ১৪৬) দ্রষ্টব্য। ১৪০। সাযুজ্য, সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য ও স্বারূপ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি। ১৪৫। মহারস বা সহজানন্দ-রূপ রত্নে ধনী যে 'মানুষ', তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পদ্মের মধু অর্থাৎ রজঃ এবং চন্দ্রের সুধা অর্থাৎ বীজ-রূপে নিত্য-বিরাজমান। সেই মানুষকে কোন্ সাধনায় পাওয়া যাইবে? প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ—সাধকের এই তিন অবস্থা আছে। এই তিন স্তরের সাধনার মধ্য দিয়া ছাড়া আর কোনো পথে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুষুম্না নাড়ী ধরিয়া নবদ্বারের নবঘাট পার লইয়া দশম দ্বারে অযোনি যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে মিলিতে পারিলে 'নাগর-দোলন' অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর হাত এড়ানো যাইবে। 'নবদ্বার', 'নবঘাটলা', 'দশমে যোগকারী মেলা' প্রভৃতি লালন কোনো নির্দিষ্ট যোগশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বলিতেছেন না, ইহা তাঁহার নিজের মোটামুটি একটা ধারণা-অনুযায়ী মন্তব্য। নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহের মধ্যদিয়া কুম্ভকের সাহায্যে রস-রতিকে ঊর্ধ্বগত করিয়া দশমে অর্থাৎ উচ্চস্থানে দ্বিদলপদ্মে লইতে পারিলেই সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। ১৪৭। মেঘের বরিষণে ভাবের ঘরে কত রঙ-বেরঙের অবস্থা দেখা যায়। দেহ-ব্রহ্মাণ্ড নীরপূর্ণ হইলে সেই নীরে ডুবিলে কত আশ্চর্যজনক জিনিস লক্ষ্যগোচর হয়। সেখানে কোনো ডাঙ্গা নাই—কেবল সহজ-ধারা প্রবাহিত। ১৫২। যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের উপর আছে, অর্থাৎ অধর মানুষকে উপলব্ধি করিবার জন্য স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও নপুংসক-লিঙ্গ—সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। এই লিঙ্গ-শাসনের পর অর্থাৎ কাম-দমনের পর কারণ-সমুদ্রের পারে গেলেই অধরচাঁদকে পাওয়া যায়। মারে মৎস্য ইত্যাদি চণ্ডীদাসের পদের প্রতিধ্বনি—"কলঙ্ক-সাগরে সিনান করিবি, এলায়া মাথার কেশ। নীরে না ভিজিবি, জল না ছুঁইবি, সম দুখ সুখ ক্লেশ।" "হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাঁটিবি, না ছুঁইবি হাঁড়ি।" "সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, তবে ত রসিক-রাজ।" ১৫৪। ধরার খালে ইত্যাদি—রস-রতি-নির্গমন বন্ধ করিয়া ঊর্ধ্বগতি করিলে রূপ-সাগরে মানুষের বিশিষ্ট অবস্থানের বিষয় জানা যায়। ১৫৭। আভ্যাশে—ভয়ে—কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত। 'বিষামৃতে আছে মাখাচোকা' (১৫৫), 'গরল হইতে সুধা নিতে', 'সর্পের কাছে

নাচায় বেজা', 'এক পীরিতির দ্বিভাব চলন, কেউ স্বর্গে, কেউ নরকে গমন' (১৫৯)—ইত্যাদি সমস্ত উক্তিই বাউল-সাধনার দুরূহতা-জ্ঞাপক।

লালনের ৫৩, ৬০ ও ১১৭নং গানে 'চাঁদ'-এর উল্লেখ অনেকটা হেঁয়ালি-রূপে প্রতিভাত হইতে পারে। লালন প্রকৃতি-পুরুষের দেহাধারে আশ্রিত রূপকেই চন্দ্র বলিতেছেন। চন্দ্র যাবতীয় সৌন্দর্যের মূল—তাই বাউলের নিকট পরমাত্মা 'অধরচন্দ্র'। প্রকৃতি-পুরুষের দেহ-আধারে শরীর-তত্ত্বের দিক দিয়া সূক্ষ্ম কারুকার্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রকাশ। এই সমস্ত সৌন্দর্যের মূল চন্দ্র—দেহের মূলবস্তু—অর্থাৎ রজঃ ও বীজ। পুরুষ ও প্রকৃতি-দেহে সেই চন্দ্র-স্বরূপ মূল সত্তার গতিবিধি, ডাহিনে, বামে, দক্ষিণে, বার মাসে, চব্বিশ পক্ষে লালন অপূর্ব বিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছেন। চাঁদের অত্যাশ্চর্য প্রকাশ দেখিয়া লালন বলিতেছেন, "দেখিস দেখিস পাছে হবি জ্ঞানহারা।" 'দেহ-চন্দ্রে'র খবর জানিলেই 'স্বর্গ-চন্দ্র'-এর খবর পাওয়া যায়—"না জেনে চাঁদের খবর তাকাও কেন আসমানে।" 'নয়নচাঁদ' যাহার 'প্রসন্ন'—'তাহারই সকল চাঁদ দৃষ্ট হয়।'

পদ্মলোচন (পোদো) : পদ্মলোচনের আরো ষোলটি গান পরে সংযোগ করা হইয়াছে : নং ৪৩০, ৪৩৩, ৪৫৪, ৪৬১, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৭, ৫০৩।

১৬১। মানুষে যে গোঁসাই বা সাঁই বিরাজ করেন, তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় হৃদবন্ধ ঘরে এবং রাগের সাহায্যে—অর্থাৎ প্রকৃতি-মিলনের সময় কুম্ভকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া। ১৬৩। বালির সঙ্গে চিনি মিশ্রিত আছে—কিন্তু বালি ত্যাগ করিয়া চিনিকে বাছিয়া লইতে হইবে—ইহাই বাউল-ভজনের বৈশিষ্ট্য। ১৬৪। রাগের করণ সামান্য ব্যাপার নয়। সাধু-গুরুর নিকট এই প্রেমের সাধনা শিখিতে হইবে। যে আত্মতত্ত্ব জানে না, সে এই সাধনার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। ১৬৫। কাঁচা রস ভিয়ান করিয়া মিছরি-চিনি বানাইতে হইবে—বাউল-সাধনার ইহাই মূলকথা। সর্বদা ইহা মনে রাখিতে হইবে। পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষয় হ'তেছে—দিন দিন আয়ুক্ষয় হইতেছে। ১৬৬। সুধা-পানের জন্য যে গুপ্ত আনন্দময় স্থানে সাধকের প্রবেশ প্রয়োজন, যেখানে লোভী-কামীর প্রবেশ নিষেধ। সমস্ত গুণের অতীত হইয়া শুদ্ধ রাগের জোরে কেবল সাধক সেখানে যাইতে পারে। ১৬৯। সাধনায় সাফল্যের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সাধনার স্তর উত্তীর্ণ হইতে হইবে। উপযুক্ত সময় না হইলে ফলের অধিকারী হওয়া যায় না। উপযুক্ত সময়েই হরিণের নাভিতে কস্তুরী জন্মে। সময়েই স্বাতী-নক্ষত্রের জলে মুক্তা ফলে। ১৭০। সাধনা দ্বারা দেহ-গৃহের শুদ্ধি-সাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ১৭১। বিরজা-পারে—অনেক বাউল গানে বিরজার পারে সহজ-মানুষের বাস বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বিরজা নদী-রূপে পুরাণ এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই নদীর পারেই পরম ব্যোমধাম এবং নিত্যচিন্ময়-ভূমি অবস্থিত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে যে, বিরজা একজন কৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপী ছিলেন। কৃষ্ণের সহিত তাঁহার গোপন-বিহারে রাধা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কৃষ্ণ রাধার ভয়ে তাঁহাকে ত্যাগ করেন। বিরজা প্রাণত্যাগ করিয়া বিশাল নদীতে রূপান্তরিত হন। (৪৯ অধ্যায়)। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে নারদের বর্ণনায় আছে : "যৎপারে বিরজাং বিরাজিত পরমব্যোমেতি যদ্দীয়তে, নিত্যং চিন্ময়ভূমি চিন্ময়লতা কুঞ্জাদিভির্মঞ্জুলং" ইত্যাদি। 'ভগবৎসন্দর্ভ'-এ আছে : "প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা"

ইত্যাদি (৩০ অঙ্ক)। সহজিয়া-বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে: "বিরোজা নদীর পার সেই দেশখান। সহস্রপুর সদানন্দ নামে সেই গ্রাম।" (অমৃতরত্নাবলী)। বাউলরা দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে বিরজা-পারে মস্তকে তাঁহার নিত্যস্থান কল্পনা করিয়াছে। রসের মানুষ এ-স্থানে অবস্থান করেন বটে, কিন্তু কখনো আবির্ভূত হন সিন্ধুনীরে, কখনও সিংহদ্বারে। তিন প্রভু—চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত। ছয় গোস্বামী—রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস। নব রসিক—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি। ৪৩০। "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকটি পদ্মলোচন নিজ সাধন-তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন। ৪৩৩। ভক্তিসিন্ধু—'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক গ্রন্থ। রূপগোস্বামী-রচিত। সহজিয়া-বাউলরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকে, তবে তাহাদের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা ও অর্থ নির্দেশ করে। বিদ্যুতের ন্যায়……সহজ মানুষের অনুভূতি। গুরু-শিষ্য…গুরু—সহজ-মানুষ, শিষ্য—সাধক; আবার গুরু-শিষ্য—পুরুষ-প্রকৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে, স্থানবিশেষে অর্থ নির্দিষ্ট হইবে। ৪৭৪। বাউল-সাধনা অগ্নি-পারার সাধনা—অগ্নির মধ্য হইতে পারাকে শোধন করিয়া তুলিতে হইবে। এই উপমাটি অনেক গানে পাওয়া যায়। কাম দূর না হইলে এইরূপ প্রেমমূলক আত্মবিস্মৃত অবস্থা আসে না। ৪৭৫। ভাব ও লীলার মধ্যে প্রভেদ বর্ণিত হইতেছে। লীলা ভোগমূলক সাধারণ প্রেম, ভাব রস-রতির ঊর্ধ্ব-গমনশীল প্রেম। হুরু—তফাৎ, দূরে। ৪৮০। সহজ-মানুষের অবস্থান ও সাধন-সংকেত। ৪৮১। অকৈতবে—অকপটে; নোচা—খোড়া। ৪৮২। প্রকৃত সাধককে হীরা ও জিরা, ক্ষীর ও নীর বাছিয়া লইতে হইবে। ৪৮৩। চাম-চটা—চামচিকা; এগার জনা—পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষড়্‌রিপু; নান্দায়—গুড়ের হাঁড়িতে।

ফটিক গোসাঁই: ১৭৩। ত্রিবেণীতে চাঁদের উদয় ও সাধন সম্বন্ধে সংকেত। ১৭৪। নিগূঢ় ব্রজ-রসের সাধন সম্বন্ধে সংকেত।

যাদুবিন্দু: যাদুবিন্দুর আরো দুইটি গান (৪৩৮ ও ৪৯৯ নং) পরে যোগ করা হইয়াছে। ১৭৫। মাকাল—মৎস্যের দেবতা। মোয়ান—জোর, কড়া। ১৭৮। লাল—উৎকৃষ্ট (ফার্সী লাল—রক্তবর্ণ চুনি)। ত্রিবেণী-নদীর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। এই নদী যোগী মহেশ্বরই কেবল পার হইতে পারেন—বহু বাউল-গানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ১৮২। বাউল-সাধনা সাপ-ধরার সঙ্গে তুলনীয়। ১৮৩। প্রকৃত রসিক গুণী উৎকৃষ্ট সাপুড়ে। ৪৩৪। 'সহজ'-এর স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, —প্রথম সহজ, রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত রূপ, তারপর পুরুষের সহজ-বিন্দু শুক্র এবং নারীর সহজ-বিন্দু রজঃ। ৪৯৯। মূলাধারের বিপজ্জনক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

রাজশাহী ও রংপুর হইতে সংগৃহীত গান: ১৮৬। সংক্ষেপে বাউল-সাধনার মূল-কথাগুলি বলা হইয়াছে। ১৮৭। পরওয়ারদিগর—ঈশ্বর; আরশে—সিংহাসনে; "মান আরফা নাফছাহু ফাকাদ আরফা"—"যে ব্যক্তি নিজেকে জানিতে পারিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে জানিয়াছে" (হদীস)। সে যে……পরওয়ার—ঈশ্বরের ইঙ্গিতেই মহম্মদ নিজে নিজে এইরূপ উক্তি

করিয়াছেন। দেল-হুজুর—হৃদয়স্থিত প্রভু; আশক—প্রণয়ী; মাশুক—প্রণয়িণী। বন্দেগি হল্লাজের তরে—মনসুর হল্লাজের মৃত্যুর পর তিনি পরবর্তী সুফীগণের নিকট তাহাদের সম্প্রদায়ের মহিমান্বিত সাধু ও গুরুরূপে বিবেচিত হন। তাই মনসুরের আত্মার শুভকামনায় ভগবানের 'দোয়া' প্রার্থনা করা হয়। হল্লাজ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ১৮৮। খলিলুল্লার কাবা—মক্কায় ভগবানের গৃহ ইব্রাহিম খলিলুল্লার দ্বারা নির্মিত বলিয়া কথিত। উকো—মিছামিছি (চলিত); সেজদা—প্রণাম। দেদার—দয়া বা দাক্ষিণ্য। ১৮৯। বেদাত্তির রস······মৃত্যুহরণ হয়—এই মারফতী মতের বৈশিষ্ট্য জানিলে অমর হওয়া যায়। ১৯২। আঠারো মোকাম—মুসলমান-বাউলদের গানে আঠারো মোকাম কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। লালনের গানে আছে—"আঠারো মোকামের মাঝে জ্বলছে একটা রূপের বাতি।" আবার কেহ 'বাইশ মোকাম' বলিয়াছেন (নং ২১৩), আবার কেহ 'পাঁচ-পাঁচা পঁচিশের ঘর' বলিয়াছেন (নং ২১০)। সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল এবং নাছুত, মালকুত (মলকুত), জব্রুত ও লাহুত—এই চারি মোকামকে ধরিয়া বোধ হয় মুসলমান-বাউলরা আঠারো মোকাম বলিয়াছে।

নরসিংদি হইতে সংগৃহীত গান: ১৯৭। স্বভাব ছাড়িয়া ভাবে দাঁড়াইয়া উজান বাহিয়া চলিতে হইবে। ১৯৯। পানকাউর—পানি-কৌড়ি নামক পাখী বিশেষ। স্বাতীনক্ষত্রের ইত্যাদি—অনেক বাউল-গানে এই কথাগুলি পাওয়া যায়। পাত্রবিশেষে অধিকারী হইলেই সাধনার ফলাফল লাভ করা যায়। ২০০। রায়—রব করে বা কথা বলে। ২০১। দারাক্কের—বৃক্ষের; বিস্‌মোল্লা—কোরানের প্রত্যেক সুরার (নবম সুরা—সুরা বরত ব্যতীত) প্রথমে "বিস্‌মিল্লা-হি রহমান-ই-রহিম"—'করুণাময় আল্লার নামে' (আরম্ভ করিতেছি) এইরূপ উল্লিখিত আছে। বান্দা—মূল ফার্সী শব্দের অর্থ—ক্রীতদাস, গোলাম—বাংলা ভাষায় কতকটা ব্যঙ্গার্থে সাধারণ মানুষ বুঝাতে ব্যবহৃত।

চণ্ডী গোঁসাই: ২০২। কেবল তন্ত্রমন্ত্র জপ করিলে যুগল হইবে না,—যোগী-ঋষির মতো পূরক-রেচক-কুম্ভক করিতে হইবে—এই যোগক্রিয়াই বাউল-সাধনার মূল ক্রিয়া।

২০৫। ত্রিবিণায়—ত্রিবিনি বা ত্রিপিনী ত্রিবেণীর অপভ্রংশ (ত্রি+আপনী =ত্রিপথগা> ত্রিবেণী>ত্রিপিনি বা ত্রিবিনি)।

রশীদ: ২০৭। জায়নামাজ—উপাসনার স্থান—যে মাদুর পাতিয়া উপাসনা করা হয়, তাহাও বুঝায়। মোশরেক<আরবী মুশ্রীক—ঈশ্বরের একত্বে ও অদ্বিতীয়ত্বে অবিশ্বাসী। জেন্দা ভূত—মানুষ। উল-হায়াত—জীবন-নদী।

রাধাশ্যাম: রাধাশ্যামের মূল বাড়ী বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে; কিন্তু তিনি বীরভূমের চাঁদপুরে তাহার গুরুদেবের ভজনাশ্রমেই বাস করিতেন।

পাঞ্জু শাহ্‌,—পাঞ্জুর সাধন-সংক্রান্ত গানগুলির অধিকাংশই গ্রন্থ-মধ্যে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গানের অর্থ-সংকেত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে: ২৪৪। নিরাকারে

জ্যোতির্ময়...ইত্যাদি। এই গানটি পাঞ্জ শাহের একটি বিখ্যাত গান। ইহা অত্যন্ত জটিল ভাব ও সাধন-জীবনের গূঢ় অভিজ্ঞতা-প্রকাশক। থিওসফি-মতে মানুষের স্থূলদেহ ছাড়া আরও তিনটি দেহ আছে—জ্যোতির্দেহ (Astral body), মানসদেহ (Mental body) এবং নিমিত্তদেহ (Casual body)। স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়াই এগুলি বর্তমান আছে। এই জ্যোতির্দেহই নিত্যধাম বলিয়া কল্পিত হইতে পারে। স্থূল প্রকৃতি-পুরুষ-দেহাশ্রয়ে এই জ্যোতির্দেহের পবিত্র মিলন-তৃপ্তিই সুধা বা অমৃত-বর্ষণ। বাউলদের যে যোগ-মিলন, তাহা স্থূলদেহের উর্ধ্বগত জ্যোতির্দেহ বা ভাবদেহের মিলন বলিয়া কল্পিত। সপ্ততালা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইত্যাদি সপ্তলোক। ইহাদের বিভিন্ন উপাদানের মিলিত আকর্ষণ-শক্তির বিকাশই বিদ্যুৎ—এই বিদ্যুৎ জননেন্দ্রিয়ের মূলে ষড়্দলে তিনধারায় প্রকাশিত হইয়া তৃপ্তি লাভ করে ('রস-আস্বাদন')। জ্যোতির্ময়...রসাশ্রয়ে—জ্যোতির্দেহে এই 'রতি' পুরুষ-হৃদয়ে উদিত হয় এবং বাঞ্ছিত ('পরশমণি') স্পর্শে 'মণিকোঠায়', সহস্রদলপদ্মে বা দ্বিদলপদ্মে উভয়ের মিলন হয়। যে-সময় পর্যন্ত উভয়ে বিচ্ছিন্ন না হইয়া আত্মবিস্মৃত অবস্থায় থাকে, সেই কালটুকু শান্ত অবস্থা—তাহাতে জীবন জুড়ায় অর্থাৎ পরমশান্তি লাভ করা যায়। পরমাত্মার আধার জ্যোতির্দেহই নিত্যধাম। চাঁদ—পরমাত্মা, স্বধাম—বাঞ্ছিত স্থান। ২৪৯। এই গানটিও একটি বিশিষ্ট গান। রস-ভিয়ান করে সহজে সহজে—সৃষ্টির মূল কারণ-বারি। ইহা হইতেই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—তারপর শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ—পাঁচটি গুণ। এই গুণের সার প্রকৃতি ও ভাব-পুরুষ—দৃশ্য ও দ্রষ্টা। স্থাবর, জঙ্গম, কীটানুকীটের ভিতর নানা আকারে ইহারই প্রকাশ। এই রসের সাধন যোগ্য পুরুষ-প্রকৃতিতেই সম্ভব :

"সহজ সহজ সব জন কহে
সহজ জেনেছে কে।
তিমির অন্ধকার যে হয়েছে পার
সহজ জেনেছে সে।"—চণ্ডীদাস

ইহা পুরুষ-প্রকৃতির কেবল দৈহিক মিলন নয়, ইহা অনেকটা সসীমের মধ্যে অসীমের মিলন-সাধন। তাই সাধক দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া পবিত্র মনে অসীমের গোপন ইঙ্গিতের সন্ধান আপন রিপু ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে লন এবং ইহারই ভিতর দিয়া লক্ষ্যস্থল গুরুতে (ultimate reality-তে) পৌঁছেন। সেই সন্ধানের জন্যই দেহের মধ্যে খোঁজাখুজি এবং ইহারই নাম সাধন। সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র—করনখে ১০, পদনখে ১০, দুইগণ্ডে ২, অধর ১, জিহ্বা ১, ললাটে ।০ (=২৪।)। একাদশ কলি—নেত্র ২, রসনা ১, কর্ণ ২, স্তন ২, হস্ত ২, হাঁটু ২=১১ কলি। অষ্টম ইন্দু—মুখ ১, স্তন ২, হস্ত ২, বক্ষ ১, নাভি ১, উপস্থ ১=অষ্টম ইন্দু :

"ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু
সেও এক পূর্ণচন্দ্র মানি।
কর-নখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট
তার গীতি মুরলীর তান॥
পদ-নখ চন্দ্রগণ"...ইত্যাদি —চৈ, চ, মধ্য ২১

সিন্দুরা মেঘের আড়ে বিজুরী কড়ক ঝাড়ে—পাঞ্জ শাহের আর একটি গানে পাওয়া যায়—"অখণ্ড গোলোকধাম, নিত্য-লীলা যার নাম, রত্ন-বেদী তাহার উপর। দাড়িম্ব পুষ্পের জ্যোতি, রত্ন-বেদীর আকৃতি, তাহে প্রভু বিরাজে অধর",—কাম-রূপ মেঘের, বিজুরী (ক্ষণিক মোহ)—ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধককে শিলারি (যাহারা মেঘ-শিলাকে তন্ত্র-মন্ত্র বলে আয়ত্তে রাখিতে পারে, বাংলায় তাহাদিগকে শিলারি বলে) হইতে হইবে—যাহাতে ইহা সাধককে ধ্বংস-পথে লইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে না পারে। রসিক (chemist) তুচ্ছ জিনিস হইতে রত্ন আহরণ করিতে সক্ষম। তেমনি রক্ত-মাংস-ক্লেদ-কৃমিকীট-সমাহিত, কাম-কলুষিত দেহ হইতে যিনি প্রেম-রত্ন আহরণ করেন, তাঁহাকেই রসিক সাধক বলা হয়। চতুর্দশ স্থল মঞ্জরী কমল—১৪ স্থানে ১৪ মঞ্জরী : ১। ললাটে ভানু-মঞ্জরী, ২। নেত্রে রূপ-মঞ্জরী, ৩। নাসায় কস্তুরী-মঞ্জরী, ৪। জিহ্বায় রস-মঞ্জরী, ৫। কর্ণে গুণ-মঞ্জরী, ৬। কণ্ঠে ভৃঙ্গ-মঞ্জরী, ৭। কুচযুগে রঙ্গ-মঞ্জরী, ৮। নাড়িতে লবঙ্গ-মঞ্জরী, ৯। কটিতে কিঙ্কিণী-মঞ্জরী, ১০। লিঙ্গে রতি-মঞ্জরী, ১১। উরুতে মোহন-মঞ্জরী, ১২। পায়ে পদ্ম-মঞ্জরী, ১৩। হস্তে বিলাস-মঞ্জরী, ১৪। হৃদয়ে প্রেম-মঞ্জরী। সে ধন সাধন নাগরা……মজে কাজে কাজে—নাগরী-নাগর (পুরুষ-প্রকৃতি)। সাধারণ পুরুষ-প্রকৃতির মিলন-উদ্দেশ্য—দেহের সাররত্ন শুক্র ধ্বংস করিয়া ক্ষণিক তৃপ্তি-লাভ, সাধকের মিলন আত্মরক্ষা করিয়া সসীমের মধ্যে অসীমের সন্ধান। আরোপ ধিয়ান—(গুরুর ধ্যান), আধার (একদেহ অন্যদেহের আধার), মূলাধার—অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (Intuition) স্থান। এই সাধকের রিপুগণ তাহার সাধনায় সহায়তা করিতে বাধ্য হয়। সহজ নগর ঘন বরিষণ স্বাতী নক্ষত্র জল……শয়ন গলায় লাজে লাজে—সহজ নগর সহস্রদল, "সোমধারা ক্ষরেদ্‌যাস্তব্রহ্মরন্ধ্রাৎ"……এই পবিত্র সোমধারা-পানে সাধক তৃপ্ত হন এবং যমকেও জয় করিবার অধিকারী হন। এসব করণ করে……ভজে ভজে—যিনি এই ক্রিয়া করেন, পদকর্তা তাঁহাকে মাথার মণি জ্ঞান করেন ; তিনি তুচ্ছ নন, তিনি ব্রহ্মাণ্ড-জয়ের অধিকারী হন ; যিনি গুরু, তিনি নিত্য ঈশ্বর, পদকর্তা তাঁহার ভজনাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। ২৬৯। পদকর্তা নিমাই ও হজরত উভয়েরই করুণাভিক্ষা করিতেছেন। নিমাই ও হজরত একই—কেবল দুই মূর্তি দুইপ্রকার। সাঁই বা ঈশ্বর এক—ইঁহারা তাঁহার প্রতিচ্ছবি মাত্র। মিলজল—ঈশ্বরের আরাধনায় হিন্দু ও মুসলমান একত্র মিলিত হও। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিবর্জিত, বিশিষ্ট সুফী মনোভাব।

হাউড়ে গোঁসাই : আর একটি গান (৪৬২নং) পরে সংযোজিত হইয়াছে। ২৭৩। মূল বিন্দুর স্থান সমুদ্রের ওপারে অর্থাৎ নাগালের বাহিরে বা বহু ঊর্ধ্বে, কিন্তু তাহার মূলের তত্ত্ব আধারে করিতে হইবে। শক্তিই সেই সাপের মাথার মণি বহন করেন, তাঁহার সহায়তায় ব্রহ্মদ্বার দিয়া পদ্ম ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিলেই স্বরূপ-সাধনা সফল হইবে। তখন প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইবে এবং 'জেন্তে-মরা' অবস্থা লাভ হইবে। তখন জন্ম-মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারা যাইবে। ২৭৪। শৃঙ্গার-সাধনেই কন্দর্পের দর্প খর্ব হইয়া শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তির দর্শন লাভ করা যায়। ২৭৬। যোগাযোগে রূপের কমল নীরে ক্ষীরে ভাসে—এই নীর হইতে ক্ষীর, ক্ষীর হইতে সুধা লভ্য হয়, ইহাই প্রকৃতি-পুরুষের রস-রতির সাধনা। ২৭৭। শ্রীরূপ-নদীর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইতেছে। ২৮০। সহস্রারে

শিব-শক্তির মিলনের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ৪৬২। বাউল-সাধনার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে এই গানটিতে।

পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত গান : ২৮২। নদীতে নৌকা বাওয়ার রূপকে সাধন-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ২৮৬। পাঁচ আনা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্ ; দশ আনা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ ও বাক্য এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ; ষোল আনা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ষড়্‌রিপু। পঁচিশ আনা—দশেন্দ্রিয়, ষড়্‌রিপু, অষ্টপাশ এবং মন। ২৮৮। মতে শতে—কোনো মতে ; লাগুর পাওয়া—ধরিতে পারা বা সাহচর্য পাওয়া। গুরা—নৌকায় আড়াআড়িভাবে বসানো কাঠ, যাহার উপর পাটাতন থাকে। ২৮৯। নফর—চাকর। ২৯১। কি ছান্দ ছিঁড়ে—নির্দিষ্ট তালে পতিত হইবার ক্রম কি নষ্ট হয়? ২৯৪। জাঙ্গী—মোটা দড়ি ; গাবগায়ানি—গাবের রসে ভিজানো নেকড়া ঠুকিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া নৌকার ছিদ্র বন্ধ করা।

গোঁসাই গোপাল : ২৯৭। বাউল-সাধনার মূলক্রিয়াটি বর্ণিত হইয়াছে। অন্য কয়টি গানেও সাধনার সংকেত প্রদত্ত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস গোঁসাই : ৩০৪। পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপ গাছে একটি ফলেরই অভিব্যক্তি, কিন্তু দুইটি পৃথক সীমানায় অবস্থিত। ৩০৫। পাত্র সুদৃঢ় বা ভাণ্ড পরিপক্ব না হইলে সিংহের দুগ্ধ রাখা যায় না ; অনুরূপ উক্তি অনেক গানে পাওয়া গিয়াছে। তিনরস-নিরূপণ—তিন রস ও তিন রতি-সম্বন্ধে সাধনা-অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনন্ত গোঁসাই : অনন্ত গোঁসাইয়ের বাড়ী ঠিক কোথায়, পূর্বে তাহা জানিতে পারি নাই, পরে জানিয়াছি। তবে ইনি যে রাঢ়ের বাউল, এই অনুমান সত্য হইয়াছে। বেতালবনে বাউল-সমাবেশে বাঁকুড়া হইতে আগত বাউলদের নিকট জানিতে পারিয়াছি যে, বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রের দক্ষিণে বালশীগ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে তিনি মারা গিয়াছেন। এই গানগুলির মধ্যে ধান-ভানা, স্যাকরার দোকানে গহনা-গড়া প্রভৃতি পল্লী-জীবনের ঘটনাগুলি প্রতিফলিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত গান : ৩২১। উল্লুক—এখানে উলূক অর্থাৎ পেঁচা-অর্থে ব্যবহৃত। ৩২৪। সাপের খোলস হইতেছে—প্রবৃত্তি-দেহ, উহা ছাড়িলেই ভাবময় দেহ পাওয়া যায়, ঐ দেহেই সাধনা হয়। এই ভাব-দেহে মানুষের সাধনাতেই সাফল্য। ৩২৫। রসের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। আর সব সাধনা—অজাগল-স্তনের ন্যায় অর্থাৎ বৃথা। সাধারণ জীবের পক্ষে প্রকৃত রসিক হওয়া কঠিন। ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিরই রসিক হওয়া সম্ভব। ৩২৯। প্রকৃত ভক্ত হইতে গেলে আগে শক্তির উপাসনা করিতে হইবে। শক্তির উপাসনায় প্রবৃত্তি-নাশ হইলে জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তখন প্রবুদ্ধবিবেক মনে ভক্তির সঞ্চার হয়। ৩৩০। নিত্য-দেশের আদিপুরুষ সূক্ষ্মভাবে কিশোর-কিশোরীর দেহে বর্তমান, অথচ তাঁহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৩৩৩। চাঁদ ধরিতে হইলে সর্বাগ্রে নেহার ঠিক রাখিতে হইবে। ৩৫৪। ভাব না সাধনা হইবে না, জাতি, বিদ্যা ও ঐশ্বর্যের গর্ব ত্যাগ না করিলে দেহে ভাব আশ্রয় করিবে না। ৩৬৫। কপ্‌নি আঁটিয়া দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া ও লম্বা চুল-দাড়ি রাখিয়া বাউল-নাম জাহির করিলেই সাধনা হইবে না। বাউল-সাধনা করিতে হইলে তত্ত্ব জানিতে হইবে। ৩৬৬। কালা শাহের নিবাস শ্রীহট্ট জেলার দাইপুর গ্রামে। নবীনগরের চাওয়াল শাহ্‌ ফকির এই গানের সঙ্গে আরো কতকগুলি গান আমাকে দিয়াছিলেন এবং শ্রীহট্টের ফকিরদের বর্তমান অবস্থা ও সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তেরেজুরী—Treasury; নপ্‌ছ—সাংসারিক ভোগের জীবন। জবানেতে—জিহ্বায়; আজরাইল—যমদূত; বর্জক—গ্রন্থমধ্যে আলোচনা দ্রষ্টব্য; মাইয়ার—মেয়ের—প্রকৃতির। ৩৬৭। যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমায় ছিল পাগলা কানাই-এর বাড়ী। তাঁহার গানগুলি 'ধুয়া' বা 'শব্দগান' নামে পরিচিত। পাগলা কানাই-এর অন্যান্য বিষয়ের রচনা আমার নিকট অনেক সংগৃহীত আছে। তাঁহার রচিত প্রকৃত বাউল-গানের সংখ্যা কম। এইটি তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট বাউল-গান। 'ফুল'-এর বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ৩৯২। আব—জল; আতশ—আগুন; খাক—মৃত্তিকা; বাত—বায়ু। ৪১৫। আলেক বা আলেখ—<অলক্ষ্য,—আলেক মানুষ দেহের মধ্যে নানাভাবে অলক্ষ্যে লীলা করিতেছে। ৪২০। সহজ-মানুষের আগমন সম্বন্ধে লালশশী বলিতেছেন যে, যখন জলের প্লাবনে চারিদিক ভাসিয়া যায়, তখনই মানুষ আসিয়া আনাগোনা করেন। ৪২১। একই ডালে লাল ও শ্বেতবর্ণের দুইটি ফুল ফুটিয়াছে, ফুলকে চিনিয়া বাছিয়া তুলিতে হইবে। এই 'ফুলের জন্যই সারা ব্রহ্মাণ্ডটা, কেউ আউল, কেউ বাউল'। সাধন-সংকেত। ৪২৩। আদ্যাশক্তির পূজা তিন দিন ও পরে বিজয়ার দিনও করা কর্তব্য। সাধন-সংকেত।

কেঁদুলীর মেলায় সংগৃহীত গান: ৪৩২। নবরসিকের করণ অতি কঠিন। ফল-ফুলে যেমন পশু-পক্ষী ধরিয়া ঝুলিয়া থাকে, সেইরূপ আচরণ করিলে আনন্দনগরে মদনমোহন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪৩৬। তিন দিনের জন্য আদ্যাশক্তি মায়ের আগমন—তারপর বিজয়ায় সতী কূটস্থ শিবে মিশিয়া যান। সাধন-সংকেত। ৪৩৭। সামালে—ধীরে ধীরে, সাবধানে; সামাবি—প্রবেশ করবি।

বেতালবনে বাউল-সমাবেশে সংগৃহীত গান: ৪৫৭। বুলছে—বিচরণ করিতেছে (রাঢ়ের গ্রাম্য চলিত ভাষা)। ৪৬৮। নিতাই (নিত্য) ক্ষেপার বিখ্যাত গান। এ সংসার মানুষেরই নানা লীলায় পূর্ণ।

গানের প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৩১০	অকেতব মানুষের কথা কহতে লাগে ভয়	মদন	২৯২
২৬০	অধরচাঁদ মেলে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২১২
২৪৫	অধর ধর আমার মন	ঐ	২০২
১৭৯	অধর মানুষ ধরব কেমন ক'রে	যাদুবিন্দু	১৪৫
২৪৮	অধর স্বরূপে, মূলাধারে রূপ রয়েছে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২০৪
১৩৬	অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি	লালন ফকির	১০৬
৪৮৮	অনুরাগ উদয়	চাকুরে	৪২৫
৪৯০	অনুরাগ ধ'রে যে জন	ঐ	৪২৭
৪৮৬	অনুরাগ ধরে যে জনে	হরি	৪২৩
৫৮	অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়	লালন ফকির	৫৩
৩০৬	অনুরাগ বিহনে সে মানুষ না যায় ধরা	চণ্ডীদাস গোঁসাই	২৫২
১৭৭	অনুরাগে গাছ কাটলেই কি গাছি হওয়া যায়	যাদুবিন্দু	১৪৩
৪৫০	অনুরাগের কল-গাড়ীতে চড়বি আমার মন	গোপাল	৩৮২
১৬৮	অনুরাগের মানুষ সহজে পাগল	পদ্মলোচন	১৩৩
৫১	অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখতে পায়	লালন ফকির	৪৮
৯৯	অমর্তের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ পেতেছে	ঐ	৮০
১০৫	অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে কোন্ শহরে	ঐ	৮৪
৪২৩	অলসে মাকে পূজলি না কেনে	হরগোবিন্দ	৩৫৯
৩৩০	অক্ষয় নামে আদিপুরুষ নিত্য উপরে	কালাচাঁদ	২৭৫

আ

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৯২	আইন-মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি	লালন ফকির	৭৬
৩৪৯	আগে আত্মতত্ত্ব বিচার ক'রে সাধন করতে হয়	মনোহর	২৯২
২৮৪	আগে তোর ষোল আনা করগা ঠিক	পুলিন	২৩২

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
২১৩	আগে দেহের খবর জান গে রে মন	রাধাশ্যাম	১৭৮
৪৬১	আগে না জেনে প্রেম-ফল	পদ্মলোচন	৩৯৪
২৩৫	আগে, মন, গুরু কর রে কাণ্ডারী	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	১৯৬
৩৮২	আগে মনের মানুষ ধর	নারাণ	৩২৩
৪৯৬	আগেতে মনে বুঝে	গোপীনাথ	৪৩৩
৩৪১	আগে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হও রে আমার মন	অজ্ঞাত	২৮৫
৪৩	আছে আদি মক্কা এই মানব-দেহে	লালন ফকির	৪৩
৪০৮	আছে কাম-প্রেমেতে মাখামাখি, প্রেমের জন্ম বুঝা ভার	অজ্ঞাত	৩৪২
১৩৮	আছে দীন দুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা	লালন ফকির	১০৭
৪২৯	আছে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা	মদন	৩৬৫
২৪৬	আছে প্রেম প্রয়োজন	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	২০৩
৪৬৮	আছে মানুষ মানুষেতে	নিত্যক্ষ্যাপা	৪০৩
৫৭	আছে যার মনের মানুষ, মনে সে কি জপে মালা	লালন ফকির	৫২
৪৯৭	আছে সাত সমুদ্র তের নদী	রূপ	৪৩৫
২৩৩	আজব কারখানা বোঝা সাধ্য কার	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	১৯৫
৩২৭	আত্মতত্ত্ব বিচার কর দেখি ওরে মন-পাখী	রামকৃষ্ণ	২৭৩
৩৭৬	আত্মসুখ নাইকো যার, তারি হবে গোপী-ভাব	হরি	৩১৫
২৫১	আদমেতে আল্লা আছে মিলে	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	২০৬
৩০৯	আপন জুতে না পাকিলে কি	চণ্ডীদাস গোঁসাই	২৫৩
৩২২	আপন দেহের খবর জান	গোঁসাইচাঁদ	২৬৮
৩৭১	আপন দেহের খবর জান রে মন	অজ্ঞাত	৩১২
১০১	আপন মনের গুণে সকলি হয়	লালন ফকির	৮১
১৬৫	আপন মনের দোষে সাধুসঙ্গ ভঙ্গ হ'ল	পদ্মলোচন	১৩০
৩৫৩	আপন মনের মানুষ মনে রেখো যতনে	কানাইলাল	২৯৪
১৮৮	আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে	দুদ্দু	১৫৩
১৮৭	আপনাকে চিনলে পরে চেনা যায় পরওয়ারদিগারে	ঐ	১৫৩
১১৮	আপনার আপন খবর নাই	লালন ফকির	৯৩
৩৮	আপনি আপনার মনের না জান ঠিকানা	ঐ	৩৯
৮২	আমার আপন খবর আপনার হয় না	ঐ	৬৯

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
১৭৫	আমার এই কাদা-মাখা সার হ'লো	যাদুবিন্দু	১৪১
৩৭	আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে	লালন ফকির	৩৯
৪০২	আমার কি লাভ হ'ল	ভুবন	৩৩৭
৩৮৭	আমার গৌরচাঁদের দরবারে	অজ্ঞাত	৩২৭
৭৮	আমার ঘরের চাবি পরের হাতে	লালন ফকির	৬৬
৩৭৩	আমার জীর্ণ তরীর ভাবনা গেল না	ছিরু	৩১৩
১১৬	আমার ঠাহর নেই গো মন-বেপারী	লালন ফকির	৯২
৫০২	আমার ভিতর আমি কে, তার	গোলোক	৪৪১
১৬৬	আমার মন কি যেতে চাও সুধা খেতে অন্তঃপুরে	পদ্মলোচন	১৩১
৫৭	আমার মন যদি সুপথে যায় মতে এসে	উত্তমা	৪৪৭
৩২৩	আমার মন, সাজ প্রকৃতি	স্বরূপ	২৬৮
১৮৯	আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে	পাঁচু	১৫৪
৭৭	আমার মনের মানুষের সনে	লালন ফকির	৬৬
১৯১	আমার যায় না দুখের দিন, হয় না সুদিন	গোবিন্দ	১৫৫
১৪২	আমার হয় না রে যে মনের মত মন	লালন ফকির	১১০
২২৩	আমারে দেও চরণ-তরী	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	১৮৮
৪০	আমি একদিনও না দেখিলাম তারে	লালন ফকির	৪১
২৬	আমি কি দোষ দিব কারে রে	ঐ	৩১
৪৩৪	আমি কিসে বা বিভোর	জটিল	৩৭০
২৯৬	আমি বলি তোরে ও মন, গুরুর পদে রেখো স্মরণ	গোঁসাই গোপাল	২৪৩
৩৬	আয় কে যাবি ওপারে	লালন ফকির	৩৮
২১	আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা	ঐ	২৮
৪৬৫	আয়, মজা দেখবি আয়	গোপাল	৩৯৯
১৯৬	আর আমার কেউ নাই, আর আমার কেউ নাই	অজ্ঞাত	১৫৯
২৪	আর কি গৌর আসবে ফিরে	লালন ফকির	৩০
৬৮	আর কি বসবো এমন সাধুর বাজারে	ঐ	৬০
৭	আর কি হবে এমন জনম বসবো সাধুর মেলে	ঐ	১৯
৩৬৯	আর কেন মন, ভ্রমিছ বাহিরে	অজ্ঞাত	৩১০
	আরে মন-মাঝি, তোর বৈঠা নে রে	অজ্ঞাত	২৩৯

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
	ই		
৪৫৫	ইন্দ্রিয় দমন আগে কর মন	রাধাপদ গোঁসাই	৩৮৭
৩৮১	ইন্দ্রিয় দমন কর আগে, মন	অজ্ঞাত	৩২২
	উ		
৯৩	উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই	লালন ফকির	৭৬
	এ		
৩৮৬	এই দেহ-জমিনে শুদ্ধ শুভ দিনে	কালাচাঁদ পাগল	৩২৬
২৫৪	এই মানুষে নবীর সুরে ঝলক দেয়	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২০৮
৫০	এই মানুষে সেই মানুষ আছে	লালন ফকির	৪৭
৭৬	এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে, তারে চিনতে হয়	ঐ	৬৫
৪৮০	একটি হেমের গাছে প্রেমের লতা	পদ্মলোচন	৪১৬
৪২১	এক ডালেতে ফুটেছে দুটি ফুল	(সম্ভবতঃ) রেজো ক্ষ্যাপা	৩৫৭
১২৮	এক ফুলে চার রঙ ধরেছে	লালন ফকির	১০০
২৩৭	একবার অনুরাগ যার মনে উদয় হয়	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৯৭
১২২	একবার জগন্নাথে দেখ রে যেয়ে	লালন ফকির	৯৬
৪৩৫	একবার দেখ না বুঝে হৃদয়-মাঝে মানুষ রতন	নরহরি গোঁসাই	৩৭১
১০৯	এখন আর ভাবলে কি হবে	লালন ফকির	৮৭
১১	এ দেশেতে এই সুখ হোলো	ঐ	২২
৫১৩	এ নীতে কেউ নারবি নিতে	(সম্ভবতঃ) কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ	৪৫৩
২৩৮	এবার আগে কর রাগের অন্বেষণ	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৯৮
১৪৪	এবার কি সাধনে শমন-জ্বালা যায়	লালন ফকির	১১২
১৩৯	এবার কে তোর মালেক চিনলি নে তারে	ঐ	১০৮
১৬২	এবার পরশ ছুঁয়ে সোনা হব সাধ ছিল মনে	পদ্মলোচন	১২৮
১৭৮	এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই	যাদুবিন্দু	১৪৪
৩২৪	এমন দিন কবে হবে, পাব মনেরি মানুষ-রতন	হরি	২৬৯
১৮	এমন দিন কি হবে আর	লালন ফকির	২৬
১	এমন মানব-জনম আর কি হবে	ঐ	১৫
১৮৫	এমন সহজ পথে হুঁচট লাগে, ওরে দিনকানা	যাদুবিন্দু	১৫১

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৪৫৩	এ মায়া-সংসারে ঘিরেছে আমায় সপ্তরথীতে	অনন্ত	৩৮৫
৬	এলাহি আলামিন আল্লা বাদশা আলমপানা তুমি	লালন ফকির	১৮
৩৯০	এলো প্রেমরসের কাঁসারি	অজ্ঞাত	৩২৮
২০	এস দয়াল, আমায় পার করো ভবের ঘাটে	লালন ফকির	২৭
	ও		
৩০৩	ও কেউ দেখবি যদি সহজ মানুষ, রূপের ঘরে যাও	এরফান শাহ্	২৪৯
৩১৮	ওগো, সুখের ধান-ভানা	অনন্ত গোঁসাই	২৬৩
২৫৩	ও দয়াল মুরশিদ-ধন, আমি কোথায় তোরে পাবো	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২০৭
৩২৮	ও ভাই, এস প্রেমের গাঁজা খাবে কে	পঞ্চানন	২৭৪
২৪০	(ও মন) আয় না চলে যাই সাঁইজীর লীলা দেখিতে	পাঞ্জ শাহ্	২০০
২৩	ও মন, কে তোমার যাবে সাথে	লালন ফকির	২৯
৬৪	ও মন, দেখে শুনে ঘোর গেল না	ঐ	৫৭
৪১৭	ও মন ভোলা, এ মানুষে হচ্ছে রে মানুষের খেলা	কুবীর	৩৫১
৩৪৪	ও মন, রতির ঠিক না হ'লে সতীর কৃপা হবে না	জ্ঞান	২৮৮
২৫৫	ও মন, শুধু কথায় রতন কি মেলে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২০৯
৪৭৬	ও যার আছে গুরু-বল	জগন্নাথ	৪১২
২৭৬	ও যে স্বরূপ রূপে হেরে, সে কি ছাড়িতে পারে	হাউড়ে গোঁসাই	২২৫
৪৯	ওরে আলোকের মানুষ আলোকে রয়	লালন ফকির	৪৭
৪০৭	ওরে প্রেম করা কি কথার কর্ম	নারাণ	৩৪২
৬২	ওরে, মন আমার গেল জানা	লালন ফকির	৫৫
৩১৯	ওরে মন, জানব তুমি কেমন গড়নদার	অনন্ত গোঁসাই	২৬৪
৪৫	ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে	লালন ফকির	৪৪
১১১	ওরে সামান্যে কি সে ধন মিলে	ঐ	৮৮
২৪৭	(ও সে) অধর মানুষ নদীর কূলে ঘাট বেঁধেছে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২০৩
	ক		
৩১	কথা কয় রে, দেখা দেয় না	লালন ফকির	৩৫
৩৭৫	কন্দর্প-রসে মত্ত হ'য়ে প্রেম-তত্ত্ব করলাম না	অজ্ঞাত	৩১৪
১৮৬	কবাট মারো কামের ঘরে	দুদ্দু	১৫২

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৫১৪	কবে হবে আমার সে রাগের উদয়		
৮০	করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম-সাধন	লালন ফকির	৬৭
২০৬	কাজ করে যে, সে-ই সে কাজের কাজী হয়	চণ্ডী গোঁসাই	১৭০
২১৫	কাম-সাগরে পাড়ি দিয়ে কূল পাওয়াটা বিষম কথা	কান্ত	১৮০
৪০০	কামী জীব দেখলে যায় চেনা	অজ্ঞাত	৩৩৬
৩১২	কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম, বুঝে উঠা হ'ল ভার	চণ্ডীদাস গোঁসাই	২৫৬
৯৮	কারে আজ শুধাই সে কথা	লালন ফকির	৮০
১৩	কারে দিব দোষ	ঐ	২৩
২৩৬	কি আশ্চর্য হায় রে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৯৬
১৭	কি করি ভেবে মরি, মন-মাঝি ঠাহর দেখিনে	লালন ফকির	২৬
২০৫	কি ক'রে পার হ'বি ত্রিবিনায়	চণ্ডী গোঁসাই	১৬৯
১৯৮	কিছু হবে না রে সময় গেলে	অজ্ঞাত	১৬৩
৪৯৮	কিছু হয় নাই আর হবে নাই	সুধীর	৪৩৬
৩৫৯	কি দেখে মজেছ রে মন, না দেখে ভাব কি রে	রাজকৃষ্ণ	৩০০
৫১৭	কিবা দুলিছে ভুবনমোহন	দীনরাম	৪৫৭
১৩১	কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে	লালন ফকির	১০২
১৩৫	কিবা শোভা দ্বিদলের 'পরে	ঐ	১০৫
৩৫৭	কি ভাবে ভাব-নগরে পাবি তারে	পুণ্য	২৯৮
৩৬৭	কি মজার ফুল ফুটেছে এই রঙের মাঝারে	পাগলা কানাই	৩০
৮৯	কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়	লালন ফকির	৭৫
৬৫	কি সাধনে আমি পাই গো তারে	ঐ	৫৫
৪৬৬	কৃষ্ণ-প্রেম কি সহজে মেলে	হৃষীকেশ	৪০
২৮১	কৃষ্ণ-প্রেমের মরম যে জানে	বনমালী গোঁসাই	২২
১৪০	কৃষ্ণ বিনে তেষ্টা-ত্যাগী	লালন ফকির	১০
৩৭৭	কৃষ্ণের অধীন হওয়া মুখের কথা নয়	অজ্ঞাত	৩১
৪২০	কেউ সহজ মানুষ চিনতে পারে না	লালশশী	৩৫
৩১৬	কে হ গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিকর	অনন্ত গোঁসাই	২৬
৪৬২	কেন 'পারবি যেতে	হাউড়ে গোঁসাই	৩
১২০	কে বুঝিতে পারে আমার সাঁই-এর এই কুদরতি	লালন ফকির	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৪৮	কোথা আছে দীন-দরদী সাঁই	লালন ফকির	৪৬
৯	কোথা রৈলে হে ও দয়াল কাণ্ডারী	ঐ	২১
২৯৯	কোন্‌খানে চন্দ্রের বসতি	গোঁসাই গোপাল	২৪৬
৪৯১	কোন্‌খানে হারায়ে খোঁজ, কোন্‌খানে	দীনদয়াল	৪২৮
১৩২	কোন্ দিন চাঁদের অমাবস্যে	লালন ফকির	১০৩
১৪৫	কোন্ রাগে সে মানুষ আছে মহারসের ধনী	ঐ	১১২
৪৩২	কোন্ সাহসে নিতে চাও রে, অবোধ মন	বেণী	৩৬৮
৩০	কোন্ সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে	লালন ফকির	৩৪

খ

৮৭	খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়	লালন ফকির	৭৩
২৫২	খুঁজে কি আর পাবি সে অধরা, সে নয়নতারা	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	২০৭
৯০	খুঁজে ধন পাই কি মতে	লালন ফকির	৭৪
৩৯	খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে	ঐ	৪০
১৪৭	খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে	ঐ	১১৪
৩৩৮	খেলছে মানুষ বাঁকানলে	গোপাল	২৮২
২০৪	খোঁজো সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, মন	চণ্ডী গোঁসাই	১৬৮

গ

৪৭৯	গুরু, আমায় ভবে কর পার	গঙ্গাধর	৪১৫
৩৬৮	গুরু এক রূপেতে তিন রূপ হয়	নবীন	৩১০
৩৯৫	গুরু, কবে হবে গো সেই শুভক্ষণ	পূর্ণচন্দ্র গোঁসাই	৩৩২
২৬৩	গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া ভুবনে	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	২১৪
২৮৩	গুরু গো, সুজন নাইয়া	জলধর	২৩১
২৯৩	গুরু, তোমার চরণ পাব বইল্যে	অজ্ঞাত	২৩৯
৪১৮	গুরু ত্যজে গোবিন্দ ভ'জে কেহ পায় নাকো নিস্তার	ক্ষেপাচাঁদ	৩৫২
২২০	গুরু, দয়া কর মোরে গো, বেলা ডুবে এলো	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	১৮৭
৭২	গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার	লালন ফকির	৬২
২৮৬	গুরু-ধনের যে কারবারী	রসিক	২৩৩
৭০	গুরু-পদে নিষ্ঠা মন যার হবে	লালন ফকির	৬১

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	
২১৯	গুরু-পদে নিষ্ঠারতি	ফকির পাঞ্জ শাহ	১৮৬
৪৪২	গুরু-বাক্যে যে ঐক্য করেছে, তারই লক্ষ্য ভেদ হয়েছে	অনুরাগী	৩৭৭
৪৪৪	গুরু বিনে আর ভক্তি না কারে	ঐ	৩৭৮
৪২৫	গুরু-বীজ অঙ্কুর হবে কি মোর এ পাষাণে	ভবা	৩৬১
৩৬২	গুরু-বীজ করলে রোপণ পাষাণে	গোঁসাইচরণ	৩০৪
৪৩৯	গুরু-মহাজনের চেক সাধুর ব্যাঙ্কে নাও ভাঙায়ে	অনুরাগী	৩৭৪
৩৬৩	গুরু যারে কৃপা করে, সেই যায় পারে	গোপাল	৩০৪
২৮৫	গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে	পুলিন	২৩২
৫০৩	গুরুর করণ-সাধন—দিবানিশি ঐ ভাবনা	পদ্মলোচন	৪৪৩
৪৫৬	গুরুর নাম যার হৃদে গাঁথা	উদয়চাঁদ	৩৮৭
৪৪১	গুরুর রতি-নিষ্ঠা হ'লে মিলাতে পারে অকৈতবে	অনুরাগী	৩৭৬
২৫৬	গুরু-রূপে নয়ন দে রে মন	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২০৯
৭৪	গুরু-রূপের ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে	লালন ফকির	৬৭
৬৯	গুরু, সু-ভাব দেও আমার মনে	ঐ	৬০
৪৬৩	গেল দিন রে মন, ভুলো না, ভুলো না	গোপাল	৩৯৭
৮	গোঁসাই, আমার দিন কি যাবে এই হালে	লালন ফকির	২০
৫৬	গোঁসাই-এর ভাব যেই ধারা	ঐ	৫১
৪৭১	গোঁসাই, হই নাই তোমার	পদ্মলোচন	৪০৭
১৬৩	গোল ছেড়ে মাল লও বেছে	ঐ	১২৯
৭৫	গৌর, কি আইন আনিলে নদীয়ায়	লালন ফকির	৬৪

ঘ

২৮৯	ঘরে রাইখ্যা পরম রতন, ও ভোলা মন	গোপীনাথ	২৩৫
২০৭	ঘুচিবে সকল যাতনা (ওরে মন আমার)	রশীদ	১৭২

চ

৪৫১	চল দেখি মন, গৌরাঙ্গের টোলে	নবদ্বীপ	৩৮৩
৬০	চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা	লালন ফকির	৫৪
১২৬	চাঁদে চাঁদে গ্রহণ হয়	ঐ	৯৯
৩৩৩	চাঁদ-ধরা ফাঁদ জান না মন	মদন	২৭৭

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
১৫৬	চাতক-স্বভাব না হ'লে	লালন ফকির	১২০
৩৯৮	চিনে নে রে রাং কি সোনা	পূর্ণ্য	৩১৪
৫০৯	চিন্ময় মধুরে ধর, ও সে শ্রী-অধর	অনুরাগী	৪৪৯
১১৭	চেয়ে দেখ না রে মন, দিব্য নজরে	লালন ফকির	৯২
২০০	চেতন থাকতে লও চিনে	অজ্ঞাত (নরসিংদি)	১৬৫
	জ		
২৮	জগৎ শক্তিতে ভুলালে সাঁই	লালন ফকির	৩২
৩০৮	জগদ্‌গুরু এ কারু নয়, চিনতে পারলে হয়	চণ্ডীদাস গোঁসাই	২৫৩
৩৬৬	জাগলে ঘরে হবে না চুরি, ও মন-বেপারী	কালা শা	৩০৭
১৭৮	জান গে মানুষের করণ কিসে হয়	লালন ফকির	১১৪
১০	জানাবো হে এই পাপী হইতে	ঐ	২১
১২৭	জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেলে	ঐ	৯৯
২৬৬	জেতের বড়াই কি	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	২১৬
১০৫	জেন্তে-মরা প্রেম-সাধন কি পারবি তোরা	লালন ফকির	৮১
	ঝ		
৪৫৯	ঝাঁপ দিয়ে রূপের সাগরে	নিত্য ক্ষ্যাপা	৩৯১
	ট		
২০৮	টেনে চল উজান গুণ	রশীদ	১৭৩
	ঠ		
২২৭	ঠিক রাখবি যদি সাধের ঘর	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	১৯১
	ড		
৫০১	ডাকলে যারে দেয় না সাড়া	গোলোক	[illegible]
৫১৬	ডুব দিও না, পার পাবে না	দ্বিজ কৈলা[illegible]র	৮২
২০৯	ডুবে দেখ দেখি, মন, স্বরূপ-সাগরে	[illegible]লোচন	৪১৭
	ঢ		
৪৯২	ঢাকা সহর ঢাকা যতক্ষণ	[illegible]	১৯০

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
	ত		
৩৩৭	তত্ত্ব ক'রে আঁধার ঘরে সে ধন কি যায় রে চেনা	পুণ্য	২৮১
২৯১	তরিতে সে কাম-সাগরে	ঈশান	২৩৫
৫০০	তারে খুঁজলে মিলতে পারে	নরহরি	৪৩৯
১৫৪	তারে দিব্যজ্ঞানে দেখ না, মনু রায়	লালন ফকির	১১৯
২৫৭	তারে ধরব কি সাধনে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২১০
২৪৩	তিনটি রসের ভিয়ান যে জানে	ঐ	২০১
৪৩৬	তিনদিন পরে ত্রিগুণের পারে	অজ্ঞাত	৩৭১
২০৩	তুই তারে ধরবি কেমন ক'রে	চণ্ডী গোঁসাই	১৬৮
২২১	তুমি আমারে ফেল না মুরশিদ, দয়াল হ'য়ে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৮৭
১৪	তুমি কার কে বা তোমার এই সংসারে	লালন ফকির	২৪
৪৮৪	তুমি দুখ দাও হে, দুখ দাও রাধানাথ	পদ্মলোচন (পদু)	৪২১
৩৩১	তোর মন যদি তুই না চিনিস	কালাচাঁদ	২৭৬
৩৪২	ত্রিপানির পারে কোন্ সাধনে যাবি	মদনচাঁদ	২৮৬
২৩৯	ত্রিবেণীর তীর-ধারে সুধারে জোয়ার আসে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৯৯
	দ		
৩৪৫	দম লাগাও সেই দমের ঘরে	নারাণ	২৮৯
৩০০	দমের মানুষ দমে চলে	গোঁসাই গোপাল	২৪৬
২২২	দয়াল দরদী. কাঙাল এলো তোমার দ্বারে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৮
১৫	দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে না	লালন ফকির	২
৫০৬	দরদী বলব কি তায় আন্দাজী	অজ্ঞাত	৪৪
১২৯	দিনে দিনে হ'লো আমার দিন আখেরি	লালন ফকির	১০
১৭২	দিন দুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহান ভার	পদ্মলোচন	১৩
	দি া মাটি পরিপাটি	আফসার ফকির	২৫
	রিয়ার মাঝে উঠছে	চাকুরে	৪২
	ক দিয়ে অন্তরে, ওরে	অনুরাগী	৪
	হার ক'রে	অজ্ঞাত	৩
	রে ভাবের কীর্তি	লালন ফকির	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৩৩	দেখ না রে মন, ঝকমারি এই দুনিয়াদারি	লালন ফকির	৩৬
৪৩১	দেখবি যদি চিকন-কালা শ্বাসের মালা জপ না	গোবিন	৩৬৭
১৯২	দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখসে তোরা আয়	বাখের শা	১৫৬
৪১২	দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখসে তোরা আয়	গোপালচাঁদ	৩৪৬
৩৯৪	দেশ ছেড়ে যেতে হ'ল কাম-মশার কামড়ে	অজ্ঞাত	৩৩১
২১২	দেহে কাম থাকিতে	রাধাশ্যাম	১৭৭
৩০১	দ্বিদলে হয় বারামখানা	এরফান শাহ্	২৪৮
	ধ		
৮৪	ধর রে অধর চাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে	লালন ফকির	৭০
১১০	ধর চোর হাওয়ার ফাঁদ পেতে	ঐ	৮৮
১৯৭	ধরবি যদি অধর মানুষ	অজ্ঞাত (নরসিংদি)	১৬২
২৯৫	ধরবি যদি অধর মানুষ ধরাকে ধর রে মন	মদন	২৪০
২৩০	ধরা যায় রে অধরে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৯৩
৪৪৩	ধর্ম নষ্ট ইষ্ট ভজলে নয়, জেনো সুনিশ্চয়	অনুরাগী	৩৭৭
৪০৩	ধর্ম-সাধন করতে হ'লে গুরু মারতে হয়	পঞ্চুচাঁদ	৩৩৮
১৮১	ধিক ধিক মন তোমারে, বলবো কি রে	যাদুবিন্দু	১৪৭
	ন		
১৫৩	নজর একদিকে দিলে আর একদিকে অন্ধকার হয়	লালন ফকির	১১৮
৪০১	নদী নদী হাতড়ায়ে বেড়াও অবোধ মন	নিতাইদাস	৩৩৬
২৩২	নবী চিনে করো ধ্যান	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৯৪
৫৩	না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে	লালন ফকির	৪৯
১৬৪	না জেনে সে রাগের করণ	পদ্মলোচন	১৩০
১৫৯	না বুঝে মজ' না পিরিতে	লালন ফকির	[illegible]
৪৭৮	নাম ধ'রে কাম কর মন	গোঁসাই মদ[illegible]	
৪৫৭	না হ'লে ভাবের ভাবী	শ্যা[illegible]	
১৭৪	নিগূঢ় ব্রজরসের সাধন করা পারবি কি তোরা	[illegible]	
২৬৯	নিগূঢ় লীলা রসিক জানে		
২৪৪	নিরাকারে জ্যোতির্ময়, নিত্যধামে প্রেমধন		

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৯৭	নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল	লালন ফকির	৭৯
৩৭৪	নূতন চাষা ম'ল পরাণে চাষের ভাব না জেনে	মতি	৩১৪

প

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৪৪৮	পর বিনে জগতে কে আপন	ক্ষ্যাপা	৩৮১
১৯৩	পাকে পাকে তার ছিঁড়ে যায়, দৌড়াদৌড়ি সার	ভোলাই	১৫৭
৩২	পাখী কখন যেন উড়ে যায়	লালন ফকির	৩৫
১০৭	পাগল দেওয়ানার মন কি ধন দিয়ে পাই	ঐ	৮৬
৫১২	পাগল পাগল, সবাই পাগল	অজ্ঞাত	৪৫২
৫	পাপী অধম জীব তোমার	লালন ফকির	১৮
৬৬	পাবে সামান্যে কি তার দেখা	ঐ	৫৮
৩	পার করো, দয়াল, আমায় কেশে ধ'রে	ঐ	১৬
১৬	পারে ল'য়ে যাও আমায়	ঐ	২৫
১৯৪	পারের ঘাটে কত মানুষ মারা যায়	গোপাল	১৫৭
১৫১	প্যারো নিরহেতু সাধন করিতে	লালন ফকির	১১৭
৪২৮	প্রেম করা কি সহজ কথা, আগে স্বভাব রাখ দূরে	ভবা	৩৬৪
২৯২	প্রেম করা হইল না	অম্বিকা	২৩৮
১১৯	প্রেম-ডুবারু বিনে কে জানে	লালন ফকির	৯৪
১৩৪	প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুলা	ঐ	১০৪
৩৬০	প্রেম-পাথারে চল সাঁতারে	হৃদয়ানন্দ	৩০২
২৯০	প্রেম-পাথারে যে সাঁতারে	গোপাল	২৩৬
৩৪৭	প্রেম-পাথারে সাঁতার দিও খুব হুঁশিয়ারে	অজ্ঞাত	২৯০
২৭৫	প্রেম-সুপথার, কৃষ্ণ রসাকার	হাউড়ে গোঁসাই	২২৪

ফ

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
[illegible]	...ক্ষেপা, কোন্ রাগে	লালন ফকির	৭৮
[illegible]	...চ	নিত্য ক্ষ্যাপা	৩৯১
[illegible]	...রিতে	লালন ফকির	৬৭

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
	ব		
২২৫	বড় চিন্তা-ঘুণ লেগেছে আমার অন্তরে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৮৯
৩৮০	বড়র কাজ নয় গো জেনো	অজ্ঞাত	৩২১
১১৪	বল, কি সন্ধানে যাই সেখানে	লালন ফকির	৯০
৩৫৬	বল, কোন্ গুরুর কর অন্বেষণ	দিনমণি	২৯৭
১৯৫	বস, রে মন, গুরুর কাছে	অজ্ঞাত	১৫৮
৯৪	বাকির কাগজ গেল হুজুরে	লালন ফকির	৭৭
২৯৮	বিরজার প্রেম-নদীতে যে জন ডুবেছে	গোঁসাই গোপাল	২৪৫
৩৮৪	বিশ্বাসী হও ঐ চরণে	কালাচাঁদ	৩২৫
১৮০	বিষম নদী পাতাল-ভেদী ত্রিবেণী	যাদুবিন্দু	১৪৬
১২৫	বিষয়-বিষে চঞ্চলা মন দিবা-রজনী	লালন ফকির	৯৮
১৫৫	বিষামৃতে আছে রে মাখাচোকা	ঐ	১১৯
৫০৪	বেদ-ছাড়া এক মানুষ আছে	গোপাল	৪৪৪
৩৩৪	বেদ-ছাড়া ফকিরের এই ধারা	রসিক	২৭৮
৮৫	বেদে কি তার মর্ম জানে	লালন ফকির	৭১
৪৭৪	বে-হুঁশিয়ারী হ'য়ো না রে মন	পদ্মলোচন	৪১০
৪০৪	বে-হুঁশিয়ার হুঁশার হ'য়ে চাবি দে রে মাল-ঘরে	মনোহর	৩৩৯
৪৯৯	বোকা হয় গেলে ঢাকা সহরে	যাদুবিন্দু	৪৩৭
৪২৪	ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন	রেজো ক্ষ্যাপা	৩৬০
৪৩১	ব্রজের শ্যামসুন্দরকে ধরবি যদি স্বরূপ সাধন করে।	পদ্মলোচন	৩৬৯
২৮০	ব্রহ্মাকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার	হাউড়ে গোঁসাই	২২৮
	ভ		
৩২৯	ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়	কাঙ্গাল	২৭৪
১০২	ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই	লালন ফকির	৮২
৪৮১	ভজ গুরু অকৈতবে	পদ্মলোচন	৪১৭
২৬১	ভজন-সাধন করবি, রে মন, কোন্ রাগে	ফকির	
৩৩৫	ভজন-সাধন, প্রেম-উপার্জন		
২৬২	ভজনহীন ব'লে গুরু আমার হালির কাঁটা ছেড়েছে	ফকির	

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৪৫২	ভজ ভজ মানুষ-ভগবান	অজ্ঞাত	৩৮৪
৪০৬	ভজ রে ভজ রে, ও মন, শক্তি মূলাধারে	তারণ	৩৪১
৩৮৩	ভব-সিন্ধু সেতু-বন্ধ ক'রে হও রে পার	রামচন্দ্র	৩২৪
৫১১	ভবে এসে কিছু কাজ হ'ল না	অনুরাগী	৪৫১
৭১	ভবে মানব-গুরু নিষ্ঠা যার	লালন ফকির	৬২
২৬৭	ভবে যার জ্ঞান আছে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২১৭
৩২৫	ভবে রসিক যারা জ্যান্তে-মরা	হরিদাস	২৭০
১৭০	ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে রসের মানুষ আর	পদ্মলোচন	১৩৪
৪৮৩	ভাবছ কি মন ব'সে ব'সে	ঐ	৪২০
৩৫৪	ভাব-সাগরে ভাবের মানুষ	ভবা	২৯৫
৪৭৫	ভাবীর কাছে ভাব ফুরাল	পদ্মলোচন	৪১১
৩১০	ভাবের ঘরে যে বাস করে গো	চণ্ডীদাস গোঁসাই	২৫৪
৪১৩	ভাবের ভাবুক, প্রেমের প্রেমিক	অজ্ঞাত	৩৪৭
৩০২	ভিয়ান করলে সুধা হয়	এরফান শাহ্	২৪৯

ম

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৩৩২	মজার খেলা রসের ঘরে	কালাচাঁদ	২৭৭
৪৬০	মদনা-চোর ঢুকছে শহরে	শ্রীদাম	৩৯২
৪১	মধুর দিল-দরিয়ায় যে-জন ডুবেছে	লালন ফকির	৪১
৩৭৮	মধুর রসের ভিয়ান কর আত্মায়	হরি	৩১৮
২৫	মন, আমার আজ পড়লি ফেরে	লালন ফকির	৩১
৩৫	মন আমার, কি ছার গৌরব করছ ভবে	ঐ	৩৭
৩১৭	মন, চল যাই ভ্রমণে কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে	অনন্ত গোঁসাই	২৬২
২১৭	মন, তুই করলি না ঘরের খবর, দিন গেল বিফলে	তারকচন্দ্র	১৮১
২৭	মন, তোর আপন বলতে কে আছে	লালন ফকির	৩২
১৮২	মন-বেদে, মরবি রে ফণী ধ'রে	যাদুবিন্দু	১৪৮
	... শ্রীগুরু কাণ্ডারী তরীতে বসাও	গোবিন্দ	৪৩০
	...না, তুমি আপনার দেহের	পদ্মলোচন	১৩৩
	...ড়বি রে সাইকেল	ভবানী	২৯৯

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৩৪০	মন রে, চল রূপনগরে	গোপাল	২৮৪
৪৬৪	মন রে, তুই আমার মনে	পদ্মলোচন	৩৯৮
২৭৮	মনে প্রানে নয়নে তিনে ঐক্য যার হবে	হাউড়ে গোঁসাই	২২৭
৩২৬	মনের কথা কইতে মানা	হরি	২৭২
১২	মনের মনে ঠিকানা হোলো না এতদিনে	লালন ফকির	২৩
৩০৭	মনের মানুষ অটলের ঘরে, খুঁজে নাও তারে	চণ্ডীদাস গোঁসাই	২৫২
৪১৬	মনের মানুষ এই মানুষে আছে লও চিনে	মদন	৩৫১
৪৯৫	মনের মানুষ খুঁজলে কই মেলে	উত্তমা	৪৩২
৪৪৫	মনের মানুষ পাই যদি ভাই	দীনু ক্ষ্যাপা	৩৭৯
৩১৩	মনের মানুষ পাইলাম না	মিঞাজান ফকির	২৫৭
৪৫৪	মনের মানুষ হয় রে যে জনা	পদ্মলোচন	৩৮৫
২৫৯	মরার ভাব লয়ে, মন, না মরিলে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২১১
৩৯৬	মরি কি কলের বাতি	পুণ্য	৩৩৩
৪১৪	মহাভাবের মানুষ হয় যে জনা	জনা	৩৪৮
৩৮৫	মানব-দেহ কল্প-ভূমি	কালাচাঁদ	৩২৫
৩১১	মানব-দেহেতে কি মতে অধঃ-উর্ধ্বে দুটি পদ্ম হয়	চণ্ডীদাস গোঁসাই	২৫৫
৩৯৩	মানুষ কি কথায় যায় ধরা	গোঁসাইচাঁদ	৩৩১
৪৬	মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে	লালন ফকির	৪৫
৪৬৯	মানুষ মানুষ সবাই বলে	গোপাল	৪০৫
২৩৪	মানুষ মিলে ভাগ্য-ফলে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৯৫
৪৭৩	মানুষ-রতন করো যতন	পদ্মলোচন	৪০৯
৩৫২	মানুষ রত্ন-ধন, তারে চিন্‌লি না রে মন	কেদার	২৯৪
১৬১	মানুষে গোঁসাই বিরাজ করে	পদ্মলোচন	১২৮
৩৬৪	মানুষে নিষ্ঠারতি কর, মন	কুবীর	৩০৫
২১১	মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে	রাধাশ্যাম	১৭৬
২৫০	মানুষের করণ মানুষ ভিন্ন নয়, ওরে মন	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২০৫
৮৬	মানুষের করণ সে কি সাধারণ	লালন ফকির	৭২
৪৪৯	মামা-শ্বশুর ভাগ্নে-বধূর কোলে ব'সে রয়েছে	কুবীরচাঁদ	৩৮১
২২৬	মুখে বললে কি হয়	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৯০

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
২৫৮	মুরশিদ-চাঁদ কি ধরা যায় রে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২১০
৭৩	মুরশিদ বল্ রে আমার মন-পাখী	লালন ফকির	৬৩
৬৭	মুরশিদ বিনে কি ধন আছে রে এ জগতে	ঐ	৫৯
১১৫	মুরশিদ রঙমহলে সদায় ঝলক দেয়	ঐ	৯১
২৬৮	মূল সাধন কর মালেক চিনে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২১৮
১৬৯	মেওয়া ফলতে ফলে সবুরের গাছে	পদ্মলোচন	১৩৪
৫৭৭	মেয়েকে না চিনতে পেরে	কৃষ্ণদাস	৪১৩
১৮৪	মেলে তায় খুঁজলে আপনার দেহ-মন্দিরে	যাদুবিন্দু	১৫০

য

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৩৪৩	যথা গরল তথা সুধা, দুয়েতে এক পাত্রে রয়	মদন ফকির	২৮৭
২১০	যদি ধরবি রে অধর এইবেলা তোর	রশীদ	১৭৫
২১৬	যদি মন স্থির থাকে গুরু-নারায়ণের যুগল চরণে	কান্ত	১৮১
৪৬৭	যদি রূপনগরে যাবি	প্রেমচাঁদ	৪০২
৩৩৬	যদি সাধ কর সাধনে	নারাণ	২৮০
১৭৬	যদি হয় মহাভাবুক জেলে	যাদুবিন্দু	১৪২
৫১০	যাও রে, আনন্দবাজারে চ'লে যাও	অনুরাগী	৪৫০
৩৬৫	যার জন্যে বাউল, কেন সে কাজেতে হচ্ছে ভুল	গোপাল	৩০৬
৩৯২	যার ঠিক হয়েছে নিরিখ-নিরূপণ	পূর্ণচাঁদ গোঁসাই	৩৩০
৩৪৬	যার যেদিন শুভ দিন হবে	তারণ	২৮৯
২২৪	যার হয়েছে নিষ্ঠারতি	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৮৮
৪১৯	যার হয়েছে মহাব্যাধি	প্রসন্ন গোঁসাই-শিষ্য	৩৫৩
২৭২	যারে আমি ডাকি দয়াল ব'লে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২২১
১৫৮	যে আমারে পাঠাল এই ভব-নগরে	লালন ফকির	১২১
১২১	যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা	ঐ	৯৫
১৪৬	যেখানে সাঁই-এর বারামখানা	ঐ	১১৫
৪৪৬	যে-জন গুরুর করণ করেছে, তার বরণ আলাদা	অজ্ঞাত	৩৭
৫৪	যে-জন দেখেছে অটল রূপের বিহার	লালন ফকির	৫
৩২১	যে-জন প্রেমের ভাব জানে না	অজ্ঞাত	২৬

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৪০৫	যে-জন বেকুব, তার বেকুবানা কই গেল	তারণ	৩৪০
১৭৩	যে-জন ভব-নদীর ভাব জেনেছে	ফটিক গোঁসাই	১৩৮
১৪১	যে-জন মানব-দরিয়ার কূলে যায়	লালন ফকির	১০৯
২৭১	যে জানে ব্রজগোপীর মহাভাব	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	২২০
৩৪	যেতে সাধ হয় রে কাশী	লালন ফকির	৩৭
২৬৫	যে দেখেছে বন্ধুর রূপ সে ত আর ভুলবে না	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	২১৬
১৪৩	যে পথে সাঁই চলে ফেরে, তার খবর কে করে	লালন ফকির	১১১
১১৩	যে ভাব গোপীর ভাবনা	ঐ	৯০
২২৯	যে ভাবে ফিকির ক'রে সাঁইজী মোরে	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	১৯২
২২	যে যা ভাবে সেই রূপ সে হয়	লালন ফকির	২৯
১৫২	যে সাধন-জোরে কেটে যায় কর্ম-ফাঁসী	ঐ	১১৭
৪৯৪	যোগ-মোহিনী যোগিনী	উত্তমা	৪৩১
৩০৫	যোগ্যপাত্র না হইলে সাধন হবে না	চণ্ডীদাস গোঁসাই	২৫১

র

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
২৪৯	রস ভিয়ান করে সহজে সহজে	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	২০৫
১৮৩	রসিক গুণী ফণী ধরতে পারে অনায়াসে	যাদুবিন্দু	১৪৯
৩৭০	রসিক জনার মনের কথা রসিক জনা জানে	অজ্ঞাত	৩১১
২৮২	রসিক যে জন প্রেম-জোয়ারে রসের তরী বা	বনমালী গোঁসাই	২৩০
৩৪৮	রসিক রসিক সবাই বলে, রসিক মেলে কয়	মনোহর	২৯১
২৩১	রসের কথা অরসিকে ব'লো না না	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	১৯৩
২৪২	রসের ভাব জেনে না নিলে	ঐ	২০১
১৭১	রসের মানুষ খেলা করে বিরজা-পারে	পদ্মলোচন	১৩৫
	রাগ না জেনে রাগের ঘরে যাবি কি ক'রে	দেশে মতিচাঁদ গোঁসাই	৩০৩
১২৭	রাগ না জেনে রাগের ঘরে যাবি কি ক'রে	ঐ	৩৬৩
০১	রাম-রহিম একই আল্লাজীর নাম	পারিজাত (নরসিংদি)	১৬৬
১০৩	রূপের ঘরে অটলরূপ বিহরে	লালন ফকির	৮৩
৪১	রূপে যে দিয়াছে নয়ন	ফকির পাঞ্জ শাহ্‌	২০০

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
	ল		
১০৮	লাগলো ধুম প্রেমের থানাতে	লালন ফকির	৮৭
৪৮৭	লাভ করতে এসে	পদ্মলোচন	৪২৪
১০৬	লীলা দেখে লাগে ভয়	লালন ফকির	৮৫
	শ		
৬১	শহরে ষোলজন বোম্বেটে	লালন ফকির	৫৪
২২৮	শুধু কি আল্লা ব'লে ডাকলে তারে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৯২
৪২৬	শুধু পাগল হ'লে গোল তো ঘোচে না	শ্রীদাম	৩৬২
৯১	শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক মোর সাঁই	লালন ফকির	৭৫
৮৩	শুদ্ধ প্রেমরাগে সদায় থাক রে আমার মন	ঐ	৬৯
৩৫৫	শুদ্ধ প্রেম সাধবি যদি কাম-রতি রাখ হৃদয়ে পুরে	অজ্ঞাত	২৯৬
৮১	শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি কাম-রতিকে রাখলে কোথা	লালন ফকির	৬৮
৪৪	শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী যে জন হয়	ঐ	৪৪
২৭৪	শৃঙ্গার-রস যে জেনেছে, তার কি ভয় আছে	হাউড়ে গোঁসাই	২২৩
২১৮	শ্রীচরণ পাব ব'লে ভব-কূলে	ফকির পাঞ্জ শাহ্	১৮৫
২৭০	শ্রীরূপ দেখবি যদি মন-বিবাদী	ঐ	২১৯
৩৩৯	শ্রীরূপ-নদীটি অতি চমৎকার	গোঁসাই গোবিন	২৮৩
২৭৭	শ্রীরূপ-নদীতে এবার নাইতে নেবো না	হাউড়ে গোঁসাই	২২৬
	স		
১৯	সকলি কপালে করে	লালন ফকির	২'
২৯৭	সকলে সাধ্য-সাধন [illegible]	গোঁসাই গোপাল	২৪'
৫০৮	সচেতনের আপনি[illegible]ল ব[illegible]	নবদ্বীপ	৪৪
৪৭০	সচৈতন্য থাকে না এই ভ[illegible]	ক্ষ্যাপা গৌরচাঁদ	৪০
১৯৯	সজনি গো, স্বভাপথে ম আমার গেল না	অজ্ঞাত (নরসিংদি)	১৬
৬৩	সদায় মুই-[illegible]গো সাঁই	লালন ফকির	৫
১৬০	সব লোকে কয় [illegible] করেকি জাত সংসারে	ঐ	১২
১৫০	সবায় কি তার [illegible]টল রূপেতে পায়	ঐ	১[illegible]
৩৭৯	সময় গেলে সা[illegible]ব জানো রে অবোধ মন	হরি	৩[illegible]

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৫২	সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না	লালন ফকির	৪৯
৩১৪	সরলে গরল মিশে না	ফকির মিএাজান	২৫৮
৪৭২	সহজ গোপন প্রেম কেন করলাম না	পদ্মলোচন	৪০৮
৪৩৮	সহজ ভজন কঠিন করণ যে পারে এই সহজের ঘরে	যাদুবিন্দু	৩৭৩
৩৯৯	সহজ ভাবে দাঁড়াবে কি সে রে	অজ্ঞাত	৩৩৫
৪১৫	সহজ মানুষ আলেক-লতা	অজ্ঞাত	৩৪৯
৪৩০	সহজ মানুষ লীলা করে রেবা নদীর তটে	পদ্মলোচন	৩৬৫
৩৯১	সহজ শুদ্ধ রাগের মানুষ কই মেলে	গৌরচাঁদ	৩২৯
৮৮	সাঁই আমার কখন খেলে কোন্ খেলা	লালন ফকির	৭৩
১৩০	সাঁই দরবেশ যারা	ঐ	১০১
২৯	সাঁইয়ের লীলা দেখে লাগে চমৎকার	ঐ	৩৩
২৬৪	সাঁই-রূপ গঠে' গঠে' কত লীলা করলে, আল্লা	ফকির পাঞ্জ শাহ্	২১৫
৪১১	সাধন কর মানুষ ধ'রে	প্যারী	৩৪৫
৩০৪	সাধন করলে জানা যায়, কথা মিথ্যা নয়	চণ্ডীদাস গোঁসাই	২৫০
২৭৯	সাধন জেনে করণ কর, তবে হবে ফকিরি	হাউড়ে গোঁসাই	২২৮
২৮৭	সাধন-ভজন মুখের কথা না	অনুকূলচান্দ গোঁসাই	২৩৪
৩৯৭	সাধ্য কার আপন জোরে যেতে পারে ভব-পারে	রামচন্দ্র	৩৩৩
১৩৭	সাধ্য কি রে সেই রূপ চিনিতে	লালন ফকির	১০৬
৪৩৭	সামালে সামাবি রে মন, ভাবের ভিতরে	দ্বিজ গদাধর	৩৭২
২৮৮	সুজন কাণ্ডারী ধারে চিনা ল' মন	ঈশান	২৩৫
১৪৯	সুমঝে কর ফকিরি মন রে	লালন ফকির	১১৫
৪১০	সু-মানুষের সঙ্গ কর মায়াতে ভুলে থেকো না	প্যারী	৩৪৪
১৯০	সূর্যের সুসঙ্গে কমল কিরূপেতে যুগল হয়	পাঁচু	১৫৪
২১৪	সেই প্রাণের নিধি আছেন নিরবধি	রাধাশ্যাম	১৭৯
১০৪	সে কথা কি ক'বার কথা, জানতে হয় ভাবাদেশে	লালন ফকির	৮৪
১৫৭	সে করণ সিদ্ধি করা সামান্যে কি হয়	ঐ	১২১
৪০৯	সে তো এই ভাণ্ডে আছে, ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজলে পাবি কি রে	অজ্ঞাত	৩৪৩
৪২২	সে ফুল মিলতে পারে মালীর বাগানে	রেজো ক্ষ্যাপা	৩৫৮
৪২	সে বড় আজব কুদ্রত্তি	লালন ফকির	৪

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
১৩৩	সে ভাব কি সবাই জানে	লালন ফকির	১০৩
১২৪	সে লীলা বুঝবি, ক্ষেপা, কেমন ক'রে	ঐ	৯৭
৪৭	সোনার মানুষ ভাসছে রসে	ঐ	৪৫
৩৮৯	স্বরূপের বাজারে থাকি	অজ্ঞাত	৩২৮
২৭৩	স্ব-সিন্ধুপারে সে বিন্দুধার	হাউড়ে গোঁসাই	২২৩

হ

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
৪৪০	হও না জ্ঞাত বীজের তত্ত্ব, অব্যক্ত রূপ নিরাকারে	অনুরাগী	৩৭৭
১২৩	হ'তে চাও হুজুরের দাসী	লালন ফকির	৯৭
২০২	হরিকে ধরবি যদি, আগে শক্তি সহায় কর	চণ্ডী গোঁসাই	১৬৭
৪৮২	হরির হীরের গিরে	পদ্মলোচন	৪১৯
৩২০	হ'ল বিষম রাগের করণ করা	গোঁসাই গুরুচাঁদ	২৬৬
৪৮৫	হিসাবী বেহিসাবী হ'য়ো না	অনুরাগী	৪২২
৫৯	হীরা-লালমতির দোকানে গেলে না	লালন ফকির	৫৩
৯৬	হুজুরে হ'লে নিকাশ, জানা যাবে পাওনা-দেনা	ঐ	৭৮

ক্ষ

ক্রমিক সংখ্যা	গানের প্রথম পংক্তি	পদকর্তার নাম	পৃষ্ঠা
২	ক্ষমো অপরাধ, ওহে দীননাথ	লালন ফকির	১৫
৪	ক্ষমো, ক্ষমো অপরাধ, দাসের পানে একবার চাও	ঐ	১৭
৫৫	ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর	ঐ	৫০
৪৪৭	ক্ষ্যাপা মন আমার পরের জন্য কাঙাল চিরকাল	সনাতন ক্ষ্যাপা	৩৮০
৩৫১	ক্ষ্যাপা মন, এই বেলা তোর মনের মানুষ	জ্ঞানচন্দ্র	২৯৩

গ্রন্থপঞ্জী

[এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ও উল্লিখিত পুস্তক-পত্রিকাদির তালিকা]

বাংলা ও সংস্কৃত

১। অথর্ববেদ—শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামী-সম্পাদিত (আজমীর, বৈদিক যন্ত্রালয়) এবং English Translation by W. D. Whitney (Harvard Oriental Series).

২। অর্থশাস্ত্র—কৌটিল্য (Edited and Translated by R. Shamsastri, Mysore).

৩। অষ্টাধ্যায়ী—পাণিনি (জীবরাম শর্মা-সম্পাদিত ; মোরাদাবাদ, ১৯০৫)।

৪। আত্মনিরূপণ (পুঁথি)—লেখক-সংগৃহীত।

৫। আশ্রয়তত্ত্ব (পুঁথি)—লেখক-সংগৃহীত।

৬। উজ্জ্বলনীলমণি—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, মুর্শিদাবাদ ও শ্রীমৎ পুরীদাস-মহাশয়-সম্পাদিত ও ময়মনসিংহের আলোয়া-নিবাসী শ্রীশচীনাথ রায় চতুর্ধুরীণ-প্রকাশিত সংস্করণদ্বয়।

৭। উত্তরা (মাসিক পত্র)—কার্তিক, ১৩৩৪ ; জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ১৩৩৫।

৮। উপনিষৎ-গ্রন্থাবলী :
ঈশোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ প্রভৃতি মঃ মঃ দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-সম্পাদিত এবং উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড (উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা)।

৯। ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ—শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামী-সম্পাদিত (আজমীর, বৈদিক যন্ত্রালয়) এবং English Translation of the Rigveda by H. H. Wilson (London).

১০। ঐতরেয় আরণ্যক (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ ও আনন্দাশ্রম সংস্করণ)।

১১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—(সত্যব্রত সামাশ্রমী-সম্পাদিত, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণ)।

ঐ (Edited and Translated by M. Haug, Bombay, 1863).

১২। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়—এফ. ডবলিউ. টমাস-সম্পাদিত (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি)।

১৩। কবীর—ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী।

১৪। কাব্যবিচার—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা)।

১৫। কামধেনুতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

১৬। কামাখ্যাতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

১৭। কুলার্ণবতন্ত্র—Agamanusandhan Samiti (Arthur Avalon Tantrik Texts Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'আগমানুসন্ধান সং' বা 'আর্থার এভেলন সং') এবং রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংস্করণ (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

১৮। কোর্-আন্ শরীফ—ভাই গিরীশচন্দ্র সেন।

১৯। কৌলাবলীতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

২০। গন্ধর্বতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

২১। গাহা-সত্ত-সঈ (গাথাসপ্তশতী)—ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক-সম্পাদিত সংস্করণ (জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা)।

২২। গীতগোবিন্দ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন-সম্পাদিত।

২৩। গুরুগীতা—গোপালানন্দ ব্রহ্মচারী-সম্পাদিত (কাশী)।

২৪। গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য—মঃ মঃ ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ (প্রবন্ধ)—উত্তরা (মাসিক পত্র), বৈশাখ, ১৩৫০।

২৫। গোরক্ষসংহিতা—প্রসন্নকুমার কবিরত্ন-সম্পাদিত।

২৬। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত (সরস্বতী-ভবন, কাশী হইতে প্রকাশিত), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'কবিরাজ সং')।

২৭। গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

২৮। ঘেরণ্ডসংহিতা (বসুমতী সং)।

২৯। চণ্ডীদাস-চরিত—ডাঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

৩০। চণ্ডীদাস-পদাবলী—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন-সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ)।

৩১। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়—মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ)।

৩২ (ক)। চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ।

৩২ (খ)। চৈতন্যমঙ্গল—লোচন দাস।

৩৩। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা)।

৩৪। জ্ঞান-সাগর—আলী রাজা (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ)।

৩৫। তন্ত্রকথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী (বিশ্বভারতী)।

৩৬। তন্ত্রতত্ত্ব, ১ম খণ্ড—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

৩৭। তন্ত্রবার্তিক—(কাশী, চৌখাম্বা সংস্করণ)।

৩৮। তারারহস্য—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

৩৯। তন্ত্রসার (বসুমতী সংস্করণ)।

৪০। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ এবং শতপথব্রাহ্মণ (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ)।

৪১। তৈত্তিরীয় সংহিতা (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ)।

৪২। ত্রিপুরাসমুচ্চয়তন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

৪৩। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী—মণীন্দ্রমোহন বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৪৪। দীপকোজ্জ্বল (পুঁথি) ও অন্যান্য সহজিয়া-পুঁথি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৪৫। ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্ধন : ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত (এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা)।

৪৬। নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী—ডাঃ কল্যাণী মল্লিক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৪৭। নারায়ণ (মাসিক পত্র), ২য় বর্ষ।

৪৮। নিরুত্তরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

৪৯। নির্বাণতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

৫০। পদ্যাবলী—রূপগোস্বামী : ডাঃ সুশীলকুমার দে-সম্পাদিত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৫১। পঞ্চানন দাসের কড়চা (পুঁথি)—লেখক-সংগৃহীত।

৫২। পাতঞ্জল-যোগদর্শন—হরিহরানন্দ আরণ্য-সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৫৩। পাদুকাপঞ্চক—Agamanusandhan Samiti (Arthur Avalon Tantrik Texts Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'আগমানুসন্ধান সং')।

৫৪। পুরাণ-গ্রন্থাবলী :
কূর্মপুরাণ (এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ) এবং পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

৫৫। প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি ও জ্ঞানসিদ্ধি—Edited by Dr. B. Bhattacharya (Two Vajrayana Works: Gaekwad's Oriental Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'বরোদা সং')।

৫৬। প্রবাসী (মাসিক পত্র, কলিকাতা), ১৩৩৩।

৫৭। প্রাকৃতপ্রকাশ (ব্যাকরণ)—বররুচি (ডাঃ সি. কে. রাজা, আদিয়ার লাইব্রেরী)।

৫৮। বক্রোক্তিজীবিত—কুন্তক (নির্ণয়সাগর প্রেস, আনন্দাশ্রম সংস্করণ)।

৫৯। বঙ্গবীণা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত (ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা)।

৬০। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

৬১। বঙ্গশ্রী (মাসিক পত্র, কলিকাতা), ১৩৪০।

৬২। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৬৩। বঙ্গে সুফীপ্রভাব—ডাঃ এনামুল হক।

৬৪। বাঙালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬৫। বাঙালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়।

৬৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—ডাঃ সুকুমার সেন।

৬৭। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৮। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত (এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা)।

৬৯। বিদগ্ধমাধব— রূপগোস্বামী (পুরীদাস-সম্পাদিত ও শচীনাথ রায় চতুর্ধুরীণ-প্রকাশিত)।

৭০। বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত।

৭১। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৭, ১৩৬২, ১৩৬৩।

৭২। বৃহৎ দেহনির্ণয় (পুঁথি)—লেখক-সংগৃহীত।

৭৩। বৃহৎ নিগম—লোচন দাস (পুঁথি)—লেখক-সংগৃহীত।

৭৪। বৃহন্নীলতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

৭৫। বেণীসংহার—ভট্টনারায়ণ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংস্করণ, কলিকাতা)।

৭৬। বোধায়ন ধর্মসূত্র—চিত্রস্বামী-সম্পাদিত (কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা)।

৭৭। বৌদ্ধগান ও দোহা—মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৭৮। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য—ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগছী (বিশ্বভারতী)।

৭৯। ব্রহ্ম-উপাসনা ও পৌর্ণমাসীর গুপ্তকথা— শ্রীকাঙ্গাল প্রেমচাঁদ বাউল-প্রকাশিত (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-গ্রন্থাগার, পুস্তক নং ৫০৩)।

৮০। ভক্ত কবীর—অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা)

৮১। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম খণ্ড—অক্ষয়কুমার দত্ত।

৮২। ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ।

৮৩। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা)।

৮৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী—ডাঃ সুকুমার সেন।

৮৫। মধ্যযুগের বাঙ্গালা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮৬। মনুসংহিতা (কুল্লুকভট্ট-টীকা-সহ)—পঞ্চানন তর্করত্ন (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

৮৭। মহাচীনাচারক্রম—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

৮৮। মহানির্বাণতন্ত্র (বসুমতী ও রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংস্করণদ্বয়)।

৮৯। মহাভারত (সভাপর্ব ও ভীষ্মপর্ব)—মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ-সম্পাদিত।

৯০। মাধববিবির কড়চা (বীরচন্দ্র-শিক্ষাপত্র)—পুঁথি—লেখক-সংগৃহীত।

৯১। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (আনন্দাশ্রম সংস্করণ)।

৯২। যোগশাস্ত্রাবলী :
যোগরহস্য, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থের সংগ্রহ—
(শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, কালিকা প্রেস, কলিকাতা)।

৯৩। যোগিনীতন্ত্র—কালীমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত।

৯৪। রত্নসার (পুঁথি)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৯৫। রাগাত্মিকা পদের ব্যাখ্যা—মণীন্দ্রমোহন বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট জারনেলের দ্বাবিংশ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত)।

৯৬। রামচরিত—সন্ধ্যাকর নন্দী : ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক-সম্পাদিত (জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা)।

৯৭। রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)—The Research Department, D. A. V. College, Lahore.

৯৮। রুদ্রযামলতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

৯৯। ললিতমাধব (নাটক)—রূপগোস্বামী : সত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত (বসুমতী সাহিত্য-মন্দির) এবং পুরীদাস-সম্পাদিত ও শচীনাথ রায় চতুর্ধুরীণ-প্রকাশিত সংস্করণদ্বয়)।

১০০। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী—আগমানুসন্ধান সমিতি-প্রকাশিত (কলিকাতা)।

১০১। শারদাতিলক—Agamanusandhan Samiti (Arthur Avalon Sanskrit Text Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'আর্থার এভেলন সং')।

১০২। শিবসংহিতা (বসুমতী সংস্করণ)।

১০৩। শূন্যপুরাণ—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত : ভূমিকা—ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (বসুমতী সংস্করণ)।

১০৪। শ্যামারহস্য—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও প্রকাশিত (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'রসিকমোহন সং')।

১০৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বসন্তরঞ্জন রায়।

১০৬। শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মালাধর বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

১০৭। শ্রীমদ্ভাগবত (মুর্শিদাবাদ সংস্করণ)।

১০৮। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা)।

১০৯। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী ও শ্রীরাধা-গোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত সংস্করণদ্বয় (অনেকস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত—'চৈ-চ')।

১১০। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত—(গৌড়ীয় মঠ-প্রকাশিত, কলিকাতা)।

১১১। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—বৈষ্ণবদাস সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ)।

১১২। শ্রীশ্রীবিবর্তবিলাস গ্রন্থ (তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স, কলিকাতা)।

১১৩। ষট্‌চক্রনিরূপণ—Agamanusandhan Samiti (Arthur Avalon Tantrik Text Series).

১১৪। সংক্ষিপ্তসার (ব্যাকরণ)—ক্রমদীশ্বর (শ্যামাচরণ কবিরত্ন-সম্পাদিত, কলিকাতা)।

১১৫। সদুক্তিকর্ণামৃত—পণ্ডিত রামাবতার শর্মা এবং এইচ. ডি. শর্মা-সম্পাদিত (পাঞ্জাব ওরিয়েণ্টাল সিরিজ নং XV)।

১১৬। সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

১১৭। সহজিয়া সাহিত্য—মণীন্দ্রমোহন বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), (সংক্ষেপে উল্লিখিত —'সহজিয়া সাহিত্য—বসু')।

১১৮। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৭, ১৩২৬, ১৩৩৫, ১৩৩৭, ১৩৪২, ১৩৬০ (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'সা-প-প')।

১১৯। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি—গোরক্ষনাথ-কৃত (ডাঃ কল্যাণী মল্লিকের 'নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী'-গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত)।

১২০। সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত (সরস্বতীভবন-প্রকাশিত, কাশী), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'কবিরাজ সং')।

১২১। সূত্রালংকারবৃত্তি—বামন (নির্ণয়সাগর প্রেস, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, পুণা)।

১২২। সর্বোল্লাসতন্ত্র—রাসমোহন চক্রবর্তী-সম্পাদিত, কুমিল্লা।

১২৩। হঠযোগ-প্রদীপিকা—শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দস্বামী-সম্পাদিত(বসুমতী সংস্করণ)।

১২৪। হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, ২য় খণ্ড (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ)।

১২৫। হর্ষচরিত—বাণভট্ট (কাশী, চৌথাম্বা সংস্করণ)।

১২৬। হেবজ্রতন্ত্র (Sanskrit Buddhist Manuscripts No. 11317—Asiatic Society of Bengal).

১২৭। হেরুকতন্ত্র (Sanskrit Buddhist Manuscripts No. 11279 —Asiatic Society of Bengal).

দ্রষ্টব্য : মুদ্রিত বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক-পুস্তিকা-প্রবন্ধাদির এবং সংস্কৃত পুঁথির উদ্ধৃত অংশসমূহের বানান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান অনুসারে লিখিত হইয়াছে, কেবল বাংলা পুঁথির বানান অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে।

ইংরেজী

1. Advanced History of India, Part I & II—Macmillan.
2. Advayavajrasangraha (অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ)—Edited by M.M. Dr. Haraprasad Sastri (Gaekwad's Oriental Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'বরোদা সং')
3. A History of Indian Literature, Vol. I—Winternitz (Calcutta University, 1927).
4. A History of Indian Philosophy, Vol. I—Dr. S. N. Das Gupta.
5. A Literary History of the Arabs—Dr. R. A. Nicholson.
6. Ancient and Hindu India—V. A. Smith.
7. Ancient Symbol Worship—H. M. Westropp (New York, 1874).
8. An Introduction to Buddhist Esoterism—Dr. B. Bhattacharya (Humphrey Milford—Oxford University Press, 1932).
9. An Introduction to the Post Caitanaya Sahajia Cult (Reprint from the Journal of the Department of Letters, Calcutta University, Vol. XVI)—Manindramohon Bose.
10. An Introduction To Tantric Buddhism—Dr. S. B. Das Gupta (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'Tantric Buddhism').
11. Annual Report of Dacca Museum, 1939-40.
12. A Note on the Addition to the Varendra Research Society Museum, 1925-26.
13. An Outline of the Religious Literature of India—Farquhar.

14. Archælogical Survey of India Annual Report—1921-22.
15. Awarif-ul-Maarif—Edited by H. W. Clarke.
16. Bengal District Gazetteers (Nadia).
17. Buddhism in Tibet—E. Schlagintweit (London, 1863).
18. Buddhist Records of the Western World—S. Beal.
19. Buddhist Survivals in Bengal (Article)—Dr. S. K. Chatterjee (B. C. Law Vol. I).
20. Catalogue of the Coins in the British Museum, London—John Allan.
21. Classical Sanskrit Literature—Keith.
22. Corpus Inscriptionum Indicarum, III—Fleet (সংক্ষেপে উল্লিখিত—C. I. I.)
23. Cultural Heritage of India, Vol. II.
24. Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts, Vol. I—H. P. Shastri (Asiatic Society of Bengal).
25. Dhammapada—Edited by Dr. S. Radhakrishnan (London, 1950).
26. Divyavadan—Edited by Cowell and Neil (Cambridge University Press, 1886).
27. Dohakosa (with notes and Translations of Tillopada, Kanhapada and Sarahapada: "সরহপাদস্ত দোহাকোষঃ")—Dr. Prabodh Chandra Bagchi (Journal of the Department of Letters, University of Calcutta—Vol. XXVIII-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধ ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত—Calcutta Sanskrit Series No. 25c—Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'দোহাকোষ'—বাগছী সং).

28. D. R. Bhandarkar Volume (Calcutta, 1940).
29. Early History of India—V. A. Smith.
30. Early Sculpture of Bengal—S. K. Saraswati.
31. Epigraphia Indica. Vols., I, II, IV, VI, X, XII, XIV, XV, XVII, XVIII XX, XXI, XXII (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'E. I.').
32. Excavations at Paharpur—K. N. Dikshit.
33. Fusus-ul-Hikam—Ibn-i-Ali-ul Arabi (Edited and Translated by Khan Sahib Khaja Khan with a foreward by L. Massignon).
34. Glimpses of Philosophy and Religion—Swami Abhedananda (Sri Ramkrishna Vedanta Math).
35. Gulsan-i-Raj—Sabistari Tabrizi (Edited and Translated by E. H. Whinfield).
36. Hasting's Encyclopedia of Religion and Ethics.
37. Hinduism and Buddhism, Vol. III—Sir Charles Eliot (London).
38. Hindu Religions or An Account of the Various Religious Sects of India (H. H. Wilson, 2nd. Edition, 1899).
39. History of Bengal—Vol. I and Vol. II (Dacca University), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'D. U.').
40. History of Buddhism in India (Geschichte des Buddhismus in Indien—by Anton Schiefuer : Translated into English by Dr. U. N. Ghosal and Dr. N. Dutt in I. H. Q.)—Taranath (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—তারনাথ').

41. History of Philosophy, Vol. I—Sponsored by the Ministry of Education, Govt. of India.

42. Indian Antiquary, 1877, 1885, 1886 (Vol. XV), 1925.

43. Indian Historical Quarterly, 1944 ; Vols. VI (1930), IX (1933) and X (1934).

44. Indian Philosophy, Vol. I—Dr. Radhakrishnan.

45. Indo-Aryan and Hindi—Dr. S. K. Chatterjee.

46. Indo-Aryan Races—Ramaprasad Chanda.

47. Influence of the Phallic Idea in lhe Religions of Antiquity—C. Staniland Wake (New York, 1874).

48. Inscriptions of Bengal—N. G. Majumdar (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'I. B.').

49. Islamic Mysticism—Sikdar Ikbal Ali Shah (London).

50. Jain Sutras, Part I (Sacred Books of the East Series—Harvard).

51. Journal and the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. V.

52. Journal Asiatique, Tome, CCXXV, No. 2, Buddhist Researches—Rahula Sankrityana.

53. Journal of the Asiatic Society of Bengal—N. S. XIX, Numismatic Supplement.

54. Journal of the Asiatic Society of Bengal, LXIX.

55. Journal of the Indian Socicty for Oriental Art, IX.

56. Journal of the Royal Asiatic Society—New Series, XXIII.

57. Journal of the Royal Asiatic Society, 1913.

58. Journal of the University of Bombay, V, Part I.

59. Kashf-al-Mahjub—Hujwiri (Tr. by Nicholson).

60. Kaulajnannirnaya (কৌলজ্ঞাননির্ণয়)—Dr. P. C. Bagchi (Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta).

61. Kitab-al-Tawsin—Edited by L. Massignon (Tr. by Nicholson).

62. Majma-ul-Bahrain—Dara Shikuh (Edited and Translated by Prof. M. Mahafazul-Haq : Asiatic Society of Bengal).

63. Masnavi—Jalalu'lDin Rümi (Edited, Translated and Annotated by E. H. Whinfield, 2 Vols.).

64. Materials for the Study of the Early History of the Vaishnava Sect—Dr. Hemchandra Roy-Chowdhury (Calcutta University), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'The Early History of the Vaishnava Sect').

65. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, I, No. 6.

66. Milinda-Panho—Edited by Trenckner (Royal Asiatic Society, London, 1928).

67. Modern Buddhism and its Followers in Orissa—Nagendranath Basu (Viswakosh Office, Calcutta).

68. Mohenjo Daro and Indus Civilisation—Sir John Marshall.

69. Mystics of Islam—Dr. R. A. Nicholson.

70. Nafahat-al-uns—Jami (Translated by Nicholson).

71. New Indian Antiquary, Bombay, V.

72. Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature—Dr. S. B. Das Gupta.

73. On Yuan Chwang's Travels in India, II—T. Watters.

74. Oxford History of India—V. A. Smith.

75. Pag Ṣam Jon Zang—Sumpa Mkhan Po : Edited by Sarat Chandra Das (Govt. of Bengal, Calcutta, 1908), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'পগ্ সম্—দাস').

76. Phallic Worship—George Ryley Scott (London, 1941).

77. Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India—Sylvan Levy (Translated into English by Dr. P. C. Bagchi).

78. Proceedings of the Indian Science Congress, 1936 (Presidential Address, Anthropological Section—Haran Chandra Chakladar).

79. Rajtarangini—Translated by Aurel.

80. Records of Buddhist Kingdoms—James Legge.

81. Rumi (Poet and Mystic)—Dr. R. A. Nicholson.

82. Sadhanmala, 2 Vols.—Dr. B. Bhattacharya (Gækwad's Oriental Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'সাধনমালা', ১ম ও ২য় খণ্ড, 'বরোদা সং').

83. Saktisangama Tantra, Vol. II—Edited by Dr. B. Bhattacharya (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, তারা খণ্ড—Gaekwad's Oriental Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'G. O. S'. বা 'বরোদা সং'.).

84. Sekoddeshtika (সেকোদ্দেশ-টীকা)—Ed. by Dr. M. Carelli (Gaekwad's Oriental Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'সেকোদ্দেশ-টীকা, বরোদা সং').

85. Sexual Life in Ancient Rome—Otto Kiefer (London, 1934).

86. Shakti and Shakta—Sir John Woodroffe.

87. Siyar-ul-Mutaakhkhirin—Translated by Hazi Mustaffa (Calcutta, 1902).

88. Studies in Islamic Mysticism—Dr. R. A. Nicholson.

89. Studies in the Tantras—Dr. P. C. Bagchi.

90. Sufism and Vedanta—Dr. Roma Chowdhuri.

91 Tadhkirat-al-Awliya—Faridal-Din Attar (Translated by Nicholson).

92. Tales of Mystic Meaning—Dr. R. A. Nicholson.

93. Tathagataguhyaka or Guhyasamaja—Dr. B. Bhattacharyya (Gækwad's Oriental Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'গুহ্যসমাজতন্ত্র, বরোদা সং').

94. The Archælogy of World Religions—Jack Finegan (Princeton University, U. S. A.).

95. The Brahmans of the Vedas—K. S. Macdonald.

96. The Buddhism in Tibet or Lamaism—A. Waddel (London, 1895).

97. The Development of Metaphysics in Persia—Dr. Shaik Muhammad Iqbal.

98. The Encyclopedia of Islam—Vol. IV.

99. The Holy Quran—Translated by Muhammad Ali (Lahore).

100. The Idea of Personality in Sufism—Dr. R. A. Nicholson.

101. The Indian Buddhist Iconography—Dr. B. Bhattacharya (Humphrey Milford, Oxford University Press, 1924).

102. The Karnatak Historical Review, 1937.
103. The Literary History of Persia, Vol. I—E. G. Browne.
104. The Nirguna School of Hindi Poetry—Dr. Barthwal.
105. The Origin and Development of the Bengali Language—Dr. S. K. Chatterjee
106. The Persian Mystics (Rümi and Jami)—T. Hadland Davis (Wisdom of the East Series, London).
107. The Rehala of Ibn Battta—Dr. M. Hossain (Oriental Institute, Boroda).
108. The Religion of the Veda—Bloomfield.
109. The Religious Attitude and Life in Islam—D. B. Macdonald (Chicago, 1912).
110. The Sanskrit Drama—Dr. Keith.
111. The Way of a Mahomedan Mystic—W. H. T. Gairdiner (London).
112. University Extension Lectures—Waheed Hossain.
113. Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems —R. G. Bhandarkar.
114. Varendra Research Society's Monographs, No. 4.
115. Vimalprava—Edited by G. Tucci (Gaekwad's Oriental Series), (সংক্ষেপে উল্লিখিত—'বিমলপ্রভা —বরোদা সং').

শব্দসূচী

[গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান শব্দের ও বর্ণিত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমিক তালিকা]

প্রথম খণ্ড

অ

অংশ-কলা ৩৪৩
'অকথাদি' ত্রিরেখা, ত্রিকোণ ৪৪২
অকিঞ্চন দাস ৪৫, ২৮৯, ৩৭৯, ৪০ ৪০৫
অক্ষর-বীজ ৩৫০
অক্ষয়কুমার দত্ত ৫৬, ৫৯,৬১, ৪২৬
অক্ষর-ডম্বর ২০৬
অক্ষোভ্য ২২৭, ২২৮
অক্ষোভ্য-লোচনা ২২৮
'অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া'-ভিনসেন্ট স্মিথ ('Oxford History of India'-V. A. Smith)
অগ্নি-উপাসক ২০০
অগ্নি-বীজ 'রং' ৪৪০
অগ্নি-মণ্ডল ৪৪৭
অগ্নি-স্বাহা ২১৪
অগ্নিহোত্র ১৯৪
অঘোর-রুদ্র (শিব) ১৯৮
অঙ্গ ১৪৯
অঙ্গামি নাগা ১৫৪
অচিন জন ৩২২ ৫০৯
অচিন মানুষ ৪৩৪, ৫০৯, ৫১০, ৫১১
অজপা-জপ ১০১
অজর মন্ত্র ৪২৬
অঞ্জন ৪২৭
অজান মানুষ ৫০৯, ৫১০, ৫১১
অটল ৯২, ৩৪৩, ৪২২, ৪৩৬
অটল-প্রতিষ্ঠা ২৯২
অটল-বিন্দু ৪১৮
৪৬৯
অটল-মানুষ ৯১, ৩৪৬, ৩৬৭, ৪৩৪, ৪৩৬
অটল-রূপ ৯১, ৩৬৩
অটলের ঘর ৩৪৪
অট্টহাস গ্রাম (বর্ধমান) ২১৬
অতল (পাদের অধোভাগ) ৩৩২
অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ('মারিফ') ৪৮৮
অতীন্দ্রিয়বাদ ৪৮৫, ৪৮৬
অতীশ দীপঙ্কর ২৪০
অত্যন্তবল্লভা (রাধা) ১৮
অথর্ববেদ ১০১, ১৪৫, ১৪৬, ১৭২, ১৭৭, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ২৯৯
অথর্ববেদশাখিনী ২৯৭
'অথর্ববেদ সংহিতা' (Atharva Veda Samhita, Bk. IV -Tr. by W. D. Whitney) ১৭৮
অদ্বয় ৩১, ২৩৩, ৩১২, ৪৭১, ৪৭২
অদ্বয়-পরমতত্ত্ব ৩১
অদ্বয়বজ্র (তান্ত্রিকাচার্য, অবধূতীপাদ) ৪২, ১৩০, ২৪১, ২৪৩

অদ্বয়বজ্র-সংগ্রহ ৪২, ২১৪, ২৩২, ৩৫২

অদ্বয়-সহজানন্দময়ী (পরমেশ্বরী) ৩৫১

অদ্বৈত (প্রলয়-অবস্থা) ২৬০

অদ্বৈত-কড়চাসূত্র ১৫

অদ্বৈত জ্ঞান ৪৭১

অদ্বৈততত্ত্ব ৪৭১

অদ্বৈত বেদান্ত ২২৫, ২৭৯, ৪৭০

অদ্বৈত ভাব ২৫৮

অদ্বৈত মহাপ্রভু ৪৭৭

অদ্বৈতাচার্য ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৬২, ৬৯

অধর ৯২

অধর কালা ৫৫, ১০৭, ৩৬৬

অধরচাঁদ ৪০২, ৪৩০

অধর ধরা ৮৭

অধর মানুষ ৫৫, ৯১, ৩৪০, ৩৯১, ৩৯২, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪১৪

অধরা ৩৬৬

অধিমবণ ১৭৬

অধ্যাত্মবিদ্যা ১৪৫

অনঙ্গবজ্র ৩২, ২৪৪

অনন্ত গোঁসাই ৩২৬

অনন্ত (আনন্ত) বড়ু চণ্ডীদাস ৬

অনন্ত বর্মা (কাশ্মীর-রাজ) ২১

অনন্যরাগ ৮৬

'অন্ য়ুয়ান্ চোয়াংস্ ট্র্যাভেল্‌স্ ইন ইণ্ডিয়া' ('On Ywan Chwang's Travels in India', II, —T. Watters) ১৯২, ২১৩

'অন হিয়া' ('আমিই তিনি') ৩৫২

অনাদির আদি (শ্রীকৃষ্ণনিধি) ৫৫, ৩৪২

অনাহত চক্র ৪৪০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯

অনাহত পদ্ম ৪৪০, ৪৪৮

অনিরুদ্ধ ভট্ট ২৪৬, ২৫৭

অনুমাত (তেজঃ, রজঃ) ৪২২

অনুমান ৮২, ১২২, ৩৭১, ৪২৬

অনুমান-ভজন ৭৭৯

অনুরাগী ৩৬১

অনুরাগী গোঁসাই, অনুরাগী মোহান্ত ৩০৮

অনুশাসন-লিপি ১৪৯

অনুস্মৃতি (ষড়ঙ্গ যোগের অঙ্গবিশেষ) ৪৬৬, ৪৬৭

অনূপ ২৬৯

অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গৌর ১৮৫

অন্তর্জীবন ৫০

অন্ধ্র ২০, ১৪৮

'অন্নদাকল্পতন্ত্র' ৩১৮

অপ ৪২৪, ৪৬৮

অপরাজিতা (দেবীমূর্তি) ২১৭

অপান-বায়ু ৩৯২, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮–১৯, ৪৪৭, ৪৫২, ৪৭১

অবতারবাদ ১৯৭, ৪৯৬

অবধূত ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৩২০

অবধূতপাদ অদ্বয়বজ্র ২৪১

অবধূত বৈষ্ণব ৪৩

অবধূতমার্গী ৪২

অবধূত-সাধনা ৪১

অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র ২৪৭

অবধূতী ৪৩, ৩১৬, ৪৫২, ৪৬৮, ৪৭৩, ৪৭৪

অবধূতীপাদ ৪২, ২৪৪

অবধূতী-মার্গ ২৬১, ৪৭৩

অবধূতেশ্বরী ৪৫৯

অবন্তী ১৪৯

অবলোকিতেশ্বর ৩০, ২০৩, ২০৪, ২৪২, ২৫৩

'অব্‌স্‌কিওর রিলিজিয়াস্ কাণ্টস্' ('Obscure Religious Cults' —Dr. S. B. DasGupta) ২৫৮

অবিদ্যা ৩৭৪
অবৈবর্তিক মহাযানী ভিক্ষুসঙ্ঘ ২০৩
অভয়মুদ্রা ৪৩৮, ৪৪১
অভয়াকর গুপ্ত ২৩৫
অভিনন্দ (কবি) ২৪১
অভিনব গুপ্ত ৩০
অভিমন্যু গোপ ২৮৭
অভিসময়ালঙ্কার ২৪১
অভিসারিকা ২৫
অভেদানন্দ, স্বামী ১৪৫
অমরকোষ ২৬৭
অমর মন্ত্র ৪২৬
অমা-কলা (ষোড়শী কলা) ৪৪২
অমাবস্যা (নারীর ঋতু-কাল) ৩৭৩, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৪, ৪০১
অমিতাভ-পাণ্ডরা ২২৮
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৩০
'অমৃতরত্নাবলী' (পুঁথি) ৫৪
অমৃতনাদ উপনিষৎ ৪৬৬
অমৃত রস ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪
'অমৃতরসাবলী' ৫৪, ৩৩৬
অমৃত-সেবন ৩৯৬
অমোঘনাথ ২৪৪
অমোঘসিদ্ধি ২২৭, ২২৮, ২২৯
অমোঘসিদ্ধি-আর্যতারা ২২৮
অম্বুবাচি (নারীর ঋতুকাল) ৩৭৩
অম্ভৃণ ঋষি ১৭১
অম্মা (স্ত্রী-দেবতা) ১৬৪
অরু (চর্যাপদের রাগবিশেষ) ১৩০
অর্জুন (সামন্তরাজ) ২৭০
অর্থ-ডম্বর ২০৬
অর্ধনারীশ্বর-মূর্তি ২০৭
অর্হৎ ২০৫
অলংকার-ডম্বর ২০৬
অল্-ইনসান-উল-কামেল (পূর্ণমানব) ৩০৫, ৩৩৯
অল্-গাজালী (Al-Ghazali) ৪৮৬, ৪৯০, ৪৯৬
অলম্বুষা নাড়ী ৪৪৪
অল্-হক (একমাত্র সত্য) ৪৮৭
অলিয়ম-মরশেদা ৩০৪
অশোক ১৯০
অশ্বমেধ যজ্ঞ ১৪৬
অশ্বিনী ১৪৮
অশ্বিনী মুদ্রা ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭
অষ্টদল পদ্ম ৩৬৫, ৩৭৩, ৩৭৪
অষ্টপ্রহর ৩৯৮
অষ্টম ইন্দু ৩৭৫
'অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা' ২২১, ২৪১
অসঙ্গ বসুবন্ধু ২১০, ২২৫
'অসতীব্রজ্যা' ২২, ২৭
অ-সত্তা (Not-being) ৪৯৭
'অসুর' ভাষা ১৫৯
অস্ট্রিক জাতি ১৫৭, ১৫৮
অস্ট্রিক ভাষা ১৫৮, ১৫৯, ১৬০
অস্ট্রেলিয়া ১৫৪

আ

আইজাক (এসাহাক) ৫০৯
আইন-ই-আকবরী ২৫১
আউল ৪০, ৫০, ৫৬, ৬১, ৬৯, ৪৭৬
আউলচাঁদ ৬২, ৬৭
আউরল ৫১২
আউলিয়া ৫০, ৬১, ২৮১
আকবর, সম্রাট ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩, ২৬৯, ২৮১, ২৮২
আকবরনামা ২৫১
আকাশ-বীজ 'হং' ৪৪৮
আকাশের পঞ্চগুণ ৩৩১
আখড়া ১৩২

আখের ৫১২
আগম ২০৭, ২৬৪, ২৮৬, ৩৪২
'আগম' (সহজিয়া-তত্ত্বগ্রন্থ) ৫৩
আগম-মন্ত্র ১২৩
আগমশাস্ত্র ৪১, ২৯৭
'আগমসার' (পুঁথি) ৫৪
আগমানুসন্ধান সমিতি ২৯৭, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮, ৩৩৪, ৩৫০, ৪৪৩
আগুন-পানার মিলন ৪৩৬, ৪৩৭
আগ্নেয়ী নাড়ী ৪৫৮
'আগ্রামেস' (Agrammes) ১৫২
'আচারাঙ্গসূত্র' (জৈন শাস্ত্র) ৪২, ১৪৯, ১৯০
আজীবিক ১৯০, ১৯৪
আজীবিক-সম্প্রদায় ১৯০
আজ্ঞাচক্র (দ্বিদল) ৮৫, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৬৫, ৪২২, ৪৩২, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৮, ৪৮১
আজ্ঞাপদ্ম ৪৪১
আট চন্দ্র ৩৭৫
আত্মচৈতন্য ৩২৬
আত্মতত্ত্ব ৩১২, ৩২২, ৩৩৫
'আত্মনিরূপণ' (গ্রন্থ) ৩৩৮
আত্মস্বরূপ ৩৬৮, ৩৮৮
আদম ২৮২, ৩০৫, ৪৯৮, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৮, ৫১২, ৫১৩
আদম-মঞ্জিল ৩২৬
আদাবাড়ী তাম্রশাসন ২৪৭
আদি-ইমাম ৩২৫, ৫০৮
আদিগুরু ৬২
আদিত্যবর্ধন ২০১
আদিনর্ডিক ১৫৭
আদি বাউল (শ্রীচৈতন্যদেব) ৪৭৭
আদিবুদ্ধ ২২৪, ২২৭, ২৩৪, ২৩৫
আদিমানব ৫৫, ২৮৩
আদিযামল ২৯
আদি (শৃঙ্গার) রস ৩৭৭
আদ্যমানুষ ৪০২
আদ্যাপ্রকৃতি ২৮
আধ-রতি ৪১৫
আন (দেবতা) ১৬৪
আনন্দ (চতুর্বিধ) ৪৬৮, ৪৬৯
আনন্দবর্ধনাচার্য ২১
'আনন্দভৈরব' (পুঁথি) ৫৪, ৭০, ৩৩৭
আনন্দময় সত্তা ১৭৩
'আনাল্ হক্' ('আমিই একমাত্র সত্য') ৩৫২, ৪৮৯
আনাম ১৫৯
আনুলিয়া তাম্রশাসন ২৪৬
আফগান ১৩৩
আপাপন্থী ৪২৮
আব-হায়াত (জীবন-নদী) ৩৮৯, ৪৩০
আব্দুল লতিফ ১৩৮
আব্বাসীয় যুগ ৪৮৭
আভীর জাতি ১৯৫
আমগাছী তাম্রশাসন ২১৩
'আমিত্ব'-এর বিনাশ ৪৮৫
'আয়রঙ্গসুত্ত' (জৈনশাস্ত্র) ১৪৯
আয়ান ঘোষ ২৮৭
আয়েত ৩০৪
আয়েসা বিবি ৫১৪
আরণ্যক ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮
আরফিন (তত্ত্বজ্ঞান) ৫০৯
আরবী ২৬৮, ৫০৭, ৫১৬
আরশী-নগর ৩২৯
আরাকান ২৫৩
আরিফ (তত্ত্বজ্ঞানী) ৪৮৮
'আরিফ-উল-মারিফ' ('Awarif-ul-Maarif') ৪৮৪
আরোপ ৩৬০, ৩৬১, ৪১

আরোপ-পদ্ধতি ৩৬০
আরোপ-সাধন ৩৬০, ৩৬১
'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া অ্যানুয়্যাল রিপোর্ট' ('Archaeological Survey of India Annual Report') ২২৮
আর্য-অবলোকিতেশ্বর ২০২
আর্যতারা ২২৮
আর্যদেব ২৩৮, ২৪৩
আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প ১৫৯
আর্যসত্য ৪৫১
আলম (লোক, জগৎ) ৫০৩
আলম-ই-জবরুত ৫০৪
আলম-ই-নাছুত ৫০৫
আলম-ই-মলকুত ৫০৪
আলম-ই-লাহুত ৫০৪
আলম-ই-হাউত ৫০৪
আলাপন ৪১৫
আলি (ইড়া বা ললনা নাড়ী) ৪৫১
আলি-কালি-স্বরূপিণী (ললনা ও রসনা) ৩৫১, ৪৫০
আলিরাজা ('জ্ঞান-সাগর'-প্রণেতা) ৫১৩, ৫১৫
আলেকজাণ্ডার ১৫২
আলেক-দম ৪৩১
আলেখজান ৩৭৭, ৪০৮
আলেখ (আলেক)-নূর ৩৭১
আলেখ (আলেক)-মানুষ ৯১, ৩৪০
"আলেফের জের মিমের জবর" ৫০৬, ৫১১
আল্লা ৫৫, ৮৩, ২৮৩, ৩০৫, ৩২৫, ৩৬৬, ৪৮২, ৪৮৬ ৫০৫, ৫০৬, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬ ৫৬
আশ্রয় ও বিষয় ৩৪, ৩০০
'আশ্রয়তত্ত্ব' (পুঁথি) ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮
আসাম ১৫৮
আসিরীয় ১৫৭, ১৬০
আস্থরা ২৫১
আস্তিক দর্শন ১৪৫
আস্তিক ধর্ম ১৪৫
আশ্রফপুর (ঢাকা) ২০৪
আহম্মদ, আহমদ, আহামদ ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭
আহাদ ৫০৭
আহ্লাদিনী শক্তি ৪৭৪, ৪৭৬
'অ্যাডভান্সড্ হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া' ('Advanced History of India' —Macmillan) ১৩৬, ১৩৯, ১৪৪
'অ্যান্ আউটলাইন অব্ দি রিলিজিয়াস্ লিটারেচার অব্ ইণ্ডিয়া' ('An Outline of the Religious History of India'—Farquhar) ১৭০
'অ্যান্ ইনট্রোডাকশন্ টু বুড্‌ডিস্ট এসোটেরিজ্‌ম্' ('An Introduction to Buddhist Esoterism'-Dr. B. Bhattacharya) ২২১
'অ্যান্ ইনট্রোডাক্‌শন টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজ্‌ম্' ('An Introduction to Tantric Buddhism'—Dr. S. B. DasGupta) ২২৭, ২২৮, ২৩১
'অ্যানুয়্যাল রিপোর্ট অব্ ড্যাকা মিউজিয়াম্' ('Annual Report of Dacca Museum') ২১০
অ্যাল্‌পাইন জাতি ১৫৬, ১৫৭, ১৬০, ১৬১

ই

ইংরেজ ১৩১
ইউরোপ (উত্তর) ১৫৭
ইকবাল আলি শাহ্, সর্দার ৪৮৪

ইকবাল, ডাঃ শেখ মুহম্মদ ৪৮৩, ৪৯২
ইক্ষুসাগর ৩৩৪
ইছুপ (ইউসুফ) ৫১৪
ই-ৎ-সিং ২০৪, ২২২
ইড়া ৩৩, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ৩৩৬, ৩৪৫, ৩৭৩, ৪১১, ৪১৫, ৪১৮, ৪২০, ৪৩২, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৫১, ৪৬২, ৪৭৩
ইড়া (গঙ্গা) ৯৮, ৩৩৮
ইড়া (ললনা) ২৫৯
ইড়া ও পিঙ্গলার সমীকরণ ২৬২
'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' ('Indian Antiquary') ১৩, ২২, ২০০, ২১৫
'ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' ('Indian Philosophy' -Dr. Radhakrishnan) ১৩৪, ২২৬
'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি' ('Indian Historical Quarterly') ১৩, ৩৪, ১৯৩, ১৯৭, ২০৩, ২৩৪
'ইণ্ডো-এরিয়ান অ্যাণ্ড হিন্দি' ('Indo-Aryan and Hindi'—Dr. S. K. De) ১৬২, ১৬৪
'ইণ্ডো-এরিয়ান রেসেস্' ('Indo-Arynn Races' —R. P. Chanda) ১৫৩
ইতর শিবলিঙ্গ ৪৪১, ৪৪৮
ইদিলপুর তাম্রশাসন ২৪৭
ইদ্রা তাম্রশাসন ২১৩
'ইনফ্লুয়েন্স অব্ দি ফ্যালিক আইডিয়া ইন্ দি রিলিজিয়ন্স্ অব্ অ্যান্টিকুইটি' ('Influence of the Phallic Idea in the Religions of Antiquity' —C. Staniland Wake) ১৬৮
'ইনস্ক্রিপশন্ অব বেঙ্গল' ('Inscription of Bengal' —N. G. Mazumdar ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭
ইনসান-উল-কামেল (পূর্ণমানব) ৪৯০, ৪৯৫
ইন্দোর তাম্রশাসন ১০১
ইন্দ্র ৪৫৮
ইন্দ্রপুর ২০১
ইন্দ্র-পুলোমজা ২১৪
ইন্দ্রভূতি ২২৬, ২২৭, ২৪২, ২৪৪
ইব্‌ন-অল-জীলী ৪৯০, ৪৯১, ৪৯৩, ৪৯৫, ৪৯৭
ইব্‌ন-অল-আরবী ৩৫২, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৯
ইব্‌ন-বতুতা ২৫২
ইবাদৎখানা ১৩৮
ইব্রাহিম-আল-জীলী ৩৭২
ইমাম ৫০৮, ৫১২
ইমাম আবু হানিফ ৫০৮
ইমাম ইবনে হাম্বল ৫০৮
ইমাম মালিক ৫০৮
ইমাম সাফী ৫৫৮
ইরাক ৪৯৮
ইরুবন ১৬৪
ইলিয়াসশাহী বংশ ২৬৬, ২৬৮
'ইসলামিক মিস্টিসিজ্‌ম্' ('Islamic Mysticism'- Sirder Ikbal Ali Shah ৪৮৪
ইসলামীয় মরমিয়াবাদ ৪৮৫
ইসমেইল (এসমাইল) ৫০৯
ইসিনদন (ঋষিনন্দন) ১৯২
ইস্কে মজাজি ৫১৩
ইস্কে হকিকি ৫১৩
'ইহিয়া' ('Ihya')-অল্-গাজালী ৪৮৬, ৫০৩

ঈ

ঈশ (ঈশান নামক শিব) ৪৪০, ৪৪৮
ঈশ-উপনিষদ (ঈশোপনিষৎ) ১৪৭, ৩৪৮
ঈশান ১৭৮, ১৯৮
ঈশান বাউল ১০৭

ঈশ্বর গুপ্ত ৭৭
ঈশ্বরবাদ ৪৮৭
ঈশ্বরাধিকত্ববাদ (Panentheism) ৪৯৩
ঈশ্বরানুমান ২৭৫

উ

উইণ্টারনিজ্ (M. Winternitz) ১৯, ১৪৫, ১৮০
উইলসন (H. H. Wilson) ৫৬, ৬৪, ৬৭
উগ্রতারা ২৩০
উচাটন ২৯৮
২৩২
উজান বাওয়া ৩৪০, ৪১৩, ৪২২, ৪৩১
'উজ্জ্বলনীলমণি' ১৮, ১৯, ২৫, ৩৯, ৯৭, ২৮৭
উড়িয়া ২৫৩, ২৭৮
উড্ডিয়ান ২৪৩, ২৪৪
উত্তর আফ্রিকা ১৫৫
২৮৭
'উত্তরতন্ত্র' ৪৫৮, ৪৫৯
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৩৫, ১৫৭
উত্তরবঙ্গ ১৫৮, ১৮৮, ১৯১, ১৯৭, ২০২, ২০৭, ২৪১, ২৪৭, ৩০৬, ৩০৮, ৩৭০
উত্তরভারত ১৫৮, ১৫৯, ২৪৩
'উত্তরা' (মাসিক পত্র) ১৬০
উদয়কর দেবশর্মা ২৪৬
উদান (বায়ুর দশগুণের অন্যতম) ৩৩২
উধিলিপি (ভিক্ষুণী) ২৪১
উন্মাদ (বাউল) ১০২
২৯৮
উপনিষদ ৮৫, ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৮৪, ২২৫, ২২৬, ২৫৭, ৩১৪, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৮, ৪২৯, ৪৬৩
উপনিষদ্‌বাদী ২২৫
উপমিতেশ্বর (শিবমূর্তি) ১৯৮
উপসেবা (সাধনাঙ্গ) ৪৫১
উপায় ৪৫০, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৭৩
উপায়-প্রজ্ঞা ১৯৮
উমাপতিধর ২০৬
উমা-মহেশ্বর ১৯৮, ২০৭, ২০৮, ২৪৭
উরিয়া ৫১৪
উরু-নীলপদ্ম (মহানীল সরস্বতী) ২১৫
'উলট বাঁসিয়াঁ' (হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা) ৫২২
উল-হায়াত (জীবন-নদী) ৩৮৯
উলামা (উলেমা) ৪৮৭
উল্টাকল ৩৪০, ৩৬৩, ৪২২, ৪৩২, ৪৭৫
উল্টাসাধন ৩৪০
উষ্ণীষ-কমল ২৬১, ৩৫১, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫২, ৪৬৫

ঊ

ঊর্ধ্ব ক্রিয়া ৪৩৬
৪২৭
ঊর্ধ্ব রেতা ৪৭৬, ৪৭৯
ঊর্ধ্ব স্রোত ১০১

ঋ

ঋক্ ১৭৭
ঋক্-পরিশিষ্ট ১৯
ঋগ্বেদ ১৪৫, ১৪৬, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৯৪
ঋগ্বেদ-সংহিতা ১৪৬
ঋষি-নন্দন ('ইসিনন্দন') ৯২

এ

একক বাউল ৮৫
একজটা (বৌদ্ধদেবী) ২৩০
একদণ্ডী ২৯৯
একাত্মবাদ ৪৯৩, ৪৯৭
একাত্মবাদী ৩৫৩, ৫০০
একাদশ দ্বার-বিশিষ্ট পুর (দেহ) ৩৪৯

একাদশ রুদ্রের উচ্চ দেউল ২১৫
একেশ্বরবাদ ১৪২, ৪৮৬, ৪৮৭
একেশ্বরবাদের স্বীকৃতি (কলমা) ৫২
'এন্‌সেন্ট অ্যাণ্ড হিন্দু-ইণ্ডিয়া' ('Ancient and Hindu India'—V. Smith).
'এন্‌সেন্ট সিম্বল ওয়ারশিপ' ('Ancient Symbol Worship'-Westropp)
এনামুল হক, ডক্টর ১২৮
'এ নোট অন্ দি অ্যাডিশন্‌স্ টু দি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি মিউজিয়াম্' ('A Note on the Additions to the Varendra Research Society Museum'.) ২২৮
'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' ('Epigraphia Indica' : সংক্ষেপে উল্লিখিত—'E. I.') ১৩৫, ১৪৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০১, ২১৩, ২৪৫
'এপিগ্রাফিয়া জৈন' ('Epigraphia Jaina'—Guerinot) ১৯১
এবং (এবম্) আকার, 'এবম্'কার ২৫৮, ৪৭৪
এব্রাহাম (এব্রাহিম) ৫০৯
এরফান আলি, এরফান শাহ্, ৩৪৪, ৫০৫
এলাহাবাদ প্রশস্তি-লিপি ১৯৭
এলিয়ট (Eliot) ২২৯
এশিয়া মাইনর (রূম) ১৫৭, ১৬৫
'এক্সক্যাভেশন্‌স্ অ্যাট পাহাড়পুর' ('Excavations at Paharpur' —K. N. Dikshit) ২৪০
এসিরিয়া-ব্যাবিলন ১৪৮
এসিরিয়ান ১৬৬
'এ হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' ('A History of Indian Philosophy'—Dr. S. N. DasGupta.) ১৯, ১৪৮, ১৭৩
'এ হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' ('A History of Indian Literature' —M. Winternitz.) ১৮০
এ্যারন (হারুণ) ৫০৯

ঐ

ঐতরেয় আরণ্যক ১৪৯
ঐতরেয় উপনিষদ ১৪৭, ১৭৭
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৪৬, ১৪৮, ১৯৬

ও

ওংকার ৪৪১
ওদন্তপুরী বিহার ১২৮, ২৪৯, ২৫৩
ওয়াটার্স, টি. (T. Watters) ১৯২, ২০৩
ওয়াডেল (Waddel) ২৩৬, ২৩৭
ওয়ালি (সাধু) ৪৮৯, ৫০৯
ওয়াহীদ হোসেন ৪৮৪
ওয়েস্ট্রপ, এইচ. এম. (H. M. Westropp) ১৬৭

ঔ

ঔরঙ্গজেব ১৪৩

ক

ককেশস ১৫৭
কঙ্কণ (সিদ্ধাচার্য) ২৪১
'কঙ্কালমালিনী' তন্ত্র ৩১৭
'কটিদেশ-নির্ণয়' ৩৭৯
কঠ-উপনিষদ (কঠোপনিষৎ) ১৪৭, ৩১৪, ৩৪৯
কড়চা ৫৪, ৩৭০, ৪০৯
কনকলেখা (রাজকন্যা) ৩৭

কপিলাবাস্তু ২২২
কপিলেশ্বর ১৯৮
কবিরাজ গোস্বামী ৯৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ২৭১
কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ২১, ২৭
কবীর ৭৩, ৮৬, ৮৮, ৯৯, ১০১, ১২২, ১৩৭, ৩০২, ৩১৪, ৪২৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২
কমল (বজ্ররূপিণী নারী) ২৩২, ৪৭৪
কম্বলাম্বরপাদ (সিদ্ধাচার্য) ২৪৩
কম্বোজান্বয় ২১৬, ২১৭, ২১৮
করতোয়া ২৪২
করুণ ৩৭৭
করুণা ২৫৮, ২৬৩, ৪৭৪
কারোয়া (জনগোষ্ঠী) ১৫৫
কর্ণ ২২৭
কর্ণদেব (হৈহয়-রাজ) ২১৬
কর্ণসুবর্ণ ২০৩, ২০৪
কর্ণাট ১৮৮
কর্ণাটক ১৬৪
কর্ণাট-ক্ষত্রিয় ১৮৮
কর্তাবাবা (রামশরণ পাল) ৬১, ৬২, ৬৮
কর্তাভজন ৬২, ৬৪
কর্তাভজন ধর্ম ৬৩, ৬৭
কর্তাভজা ৫৬, ৬১, ৬২, ৬৯
কর্তাভজা-সম্প্রদায় ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৮
কর্দিয়ে, ডক্টর পি. ১৩০, ২৪৩
'কর্পাস্ ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌শনাম্ ইণ্ডিকেরাম্' ('Corpus Inscriptionum Indicarum'—Fleet : সংক্ষেপে 'C. I. I.') ২০০, ২০১
'কর্পূরমঞ্জরী' ৩৮
কর্বটরাজ ১৫০
কর্মপাদ (বৌদ্ধাচার্য) ২৪৪
কর্মমুদ্রা ৪৬৯, ৪৫১
কলমা (একেশ্বরবাদের স্বীকৃতি) ৫২
কলসপোত ২১৬
কলহান্তরিতা ২৫
কলিঙ্গ ১৮৮
কলিকাতা ৬১, ৭৪, ২০৭
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৭২, ২২৯, ২৪৭, ৩৩৮
কলের বাতি ৩৪৭
'কল্পসূত্র'—ভদ্রবাহু ১৯১
কল্যাণী মল্লিক, ডক্টর ২৫৮
কল্যাণসুন্দর (শিব) ১৯৮
কহ্লন ২০০
কাওয়েল ও নীল (Cowel & Neil) ১৯০
কাঁচরাপাড়া ৬৩
'কাকচণ্ডেশ্বরী মত' (তন্ত্রগ্রন্থ) ২৯৯
কাকদ্বীপ ২৩০
কাকনিক (মুদ্রা) ১৪৯, ১৫২
কাকিনী শক্তি ৪৪০, ৪৪৮
কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ১০৩
কাজল-কোঠা ৩৪৩
কাত্যায়ন ১৭৮
কাদার (জনগোষ্ঠী) ১৫৪
কাদিরী ১৩৯, ১৪০
কান্তাপ্রেম ৯৬
কান্তিদেব (হরিকেল-রাজ) ২১৬
কান্যকুব্জ ২২২
কাপালিক ৩৭, ৩৮
কাবা ৩২৫
কাবুল ১৩৭
'কাব্যবিচার'—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২১
কাম-কলা ৩৮৭, ৪৫৮
'কামকলা বিলাস' ৩৮৭
কামক্রীড়াসাম্য ২৮৮
কাম-গায়ত্রী ৮৪, ৪০৭, ৪১৫, ৪৭৬
কামতাপুর ২৬৯
'কামধেনুতন্ত্র' ৪৫৫

কামবীজ ৮৪, ৪০৭, ৪১৫, ৪৭৬
কাম-বীজমন্ত্র ৪০৭
কামব্রহ্ম ৪৭৫
কামরূপ ১৮৮, ২০৮, ২৬৯
কামরূপ-রাজ ১৯৯
কামাখ্যা ২০৮, ৪৫৯
'কামাখ্যাতন্ত্র' ৪৫৪, ৪৫৬
কামোদ ১৩০
কায়তত্ত্ব ৩৬৯
'কায়'বাদ ৩৪০
কায়সাধন ২৫৭, ২৫৯
কায়সিদ্ধি ২৫৭, ২৫৯
কায়াযোগ ১০১
কারণ-প্রবাহ ৩৯২, ৪০৪
কারণ-বারি ৩৯৮, ৪১৩
কারুণা, কারুণ্যামৃত ১০৭, ৩৯২, ৩৯৭
কার্তিকেয় ২০০
কার্টিয়াস ১৫২
কালকেতু-কাহিনী ২৭৪
কালচক্র ২৩৫, ২৫৮
'কালচক্রতন্ত্র' ৩৩৫
কালচক্রযান ১০১, ২১০, ২২৩, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৪৫, ২৯০
কালচক্রযানী ২৩৫
কালচক্রাবতার ২৩৫
'কাল্‌চার‍্যাল হেরিটেজ্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া' ('Cultural Heritage of India'—Nilakantha Sastri)
'কালবিবেক' (স্মৃতিগ্রন্থ) ২৪৮
কালাচাঁদ পাগল (বাউল) ৩২৭
কালি (পিঙ্গলা) ৪৫১
কালিকা ৪৫৯
কালী ৬৯
'কালীকুলার্ণবতন্ত্র' ২৯৭
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮, ২৭৪
কাশীপুর, গ্রাম (২৪-পরগণা) ২০১
কাশ্মীর ১৫৮, ২৪০
কাশ্মীর-রাজ অনন্তবর্মা ২১
'কাসফ-অল্‌-মহ্‌জুব' ৪৮৮, ৫০২
কাহ্নুপাদ ২৩৮, ২৪২, ২৪৭
'কিতাব-অল্‌-তামিন' ৪৮৯
কুক্কুরিপাদ (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৪৩
কুণ্ডলিনী ৪৩২, ৪৪৪ ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৬২, ৪৭২, ৪৭৫
কুণ্ডলিনী-জাগরণ ৪৪৭
কুণ্ডলিনী শক্তি ৩২৯, ৪৬২, ৪৭২, ৪৭৩ ৪৭৫
কুবের (বৌদ্ধদেবতা 'জম্ভল') ২৩০
কুবের-ভদ্রা ২১৪
কুব্জা (দেবী) ৪৫৯
কুব্রাই (সুফীদের একটি শাখা) ১৩৯
কুমারখালী (পূর্বতন নদীয়া জেলা) ১০৩
কুমারগুপ্ত ১৯৪, ২০১
কুমারচন্দ্র, অবধূতাচার্য ২৪২
কুমারপাল ২১৮
কুমারপুর (রাজশাহী) ২০১
'কুমারসম্ভব' ২৬৭
কুমারিলভট্ট ২৪৫
'কুমারীতন্ত্র' ৩২
কুমারী-পূজা ৪৫৪
কুমিল্লা ৩৪, ২৪২
কুম্ভক (আলংকারিক) ২০, ২৬০, ৪০৯, ৪১৭, ৪২১, ৪২২, ৪৩০, ৪৩১, ৪৬৭, ৪৭৩
কুরুব (জনগোষ্ঠী) ১৫৫
কুরুক্ষেত্র ২৫
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ৪৩১, ৪৬১, ৪৬৩, ৪৭৩, ৪৭৫
কুলদ্রব্য ৪৫৯
কুলনায়িকা ৪৫৮

কুলপর্বত ৩৩৩
কুলমার্গ ৪৬০
কুলাগার ৪৫৮
কুলাচার ২৯৭, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৭
কুলাচারী ৪৫৮
কুলাবধূত ৪৩
'কুলার্ণবতন্ত্র' ২৯৭, ২৯৮, ৩১৩, ৩১৫, ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬২
কুলীন গ্রাম ২৭১
কুল্লুক ভট্ট, কুল্লুক ভট্ট-টীকা ২৯৭
কুশিনারা ২২২
কুষাণ ১৩৩, ২০০, ২০১
১৩৬, ২০০
কুহূ নাড়ী ৪৪৪
কূর্ম (বায়ুর দশগুণের অন্যতম) ৩৩২
'কূর্মপুরাণ' ২৯৮
কৃকর (বায়ুর দশগুণের অন্যতম) ৩৩২
কৃষ্ণ ৮৩, ২৪৮, ২৭৯, ২৮৮, ৩১২
কৃষ্ণকীর্তন, কৃ.-কী. ৯, ১০, ২৭৬, ২৭৭, ৩১২
কৃষ্ণতত্ত্ব ২৮৮
কৃষ্ণদাস ('অদ্বৈত কড়চাসূত্র'-প্রণেতা) ১৫
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৩, ১৮, ১৯, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৫৪, ৫৫, ১২৯, ২৭২, ২৮০, ৩২৪
কৃষ্ণদ্বারিকা-মন্দিরলিপি ২১৫
কৃষ্ণধামালী ১৪
২৮৭
কৃষ্ণ-বাসুদেব ১৯৫
কৃষ্ণযাত্রা ১৪
কৃষ্ণ-লীলা ১০৩, ১৯৮
কৃষ্ণসাগর ১৫৭
কৃষ্ণ-স্বরূপ ৩১২
কৃষ্ণাচার্য (কাহ্নপাদ) ২৪২, ৪৬৫, ৪৬৯
২১৭
কৃষ্ণানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ২৯, ৪৫৭, ৪৬৩
কেদার মিশ্র (দেবপাল ও বিগ্রহ পালের মন্ত্রী) ২১৭
কেঁদুলীর মেলা ৬২, ৭৩, ১০৮
কেন-উপনিষদ ১৪৭
কেবলানন্দ (সামরস্য-সুখ) ৩৫৭
কেরল ১৫৮
কেলান গ্রাম (ত্রিপুরা জেলা) ১৯৭
কেশবপুর, গ্রাম (বরিশাল) ২২৯
কেশব সেন ১৮৮, ২০১, ২৪৭, ২৫৭, ২৭৬
কেশব ছত্রী (হোসেন শাহের প্রধান দেহরক্ষী) ২৬৯
কৈকেয়ী ১৫০
কৈলান তাম্রশাসন ২০৩
কোকামুখ স্বামী ১৯৭
কোরান ১৪২, ২৮২, ৩০৪, ৩০৫, ৩৭০, ৪৮৫, ৪৯১, ৫০০, ৫০৩, ৫১৫, ৫১৬
কোল (জনগোষ্ঠী) ১৫৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০
কোটিবর্ষ (দিনাজপুর) ১৯১
কোটিবর্ষীয় ১৯১
কোড়িবর্ষীয় ১৯১
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ১৫১
কৌমারী ২১৫
কৌল, কৌলিক ৪৫৪, ৪৫৬
'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' ২৫৯, ৪৭০
কৌলাচার ২৯৭
'কৌলাবলীতন্ত্র' ৪৫৭
'ক্যাটালগ অব্ দি কয়েন্স্ ইন্ দি 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম্' ('Catalogue of the Coins in the British Museum') ১৯৯
কৌশাম্বী ২২
'কৌশীতকী ব্রাহ্মণ' ১৪৬
ক্ষং (বর্ণ), আজ্ঞাচক্র-স্থিত ৪৪১
ক্ষান্তিপারমিতা (বৌদ্ধদেবী) ২২০

ক্ষিতিমোহন সেন ৭০, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২
ক্ষীর ৩৭৪, ৩৯৮
ক্ষীরনদী ৩৭৪
ক্ষীরোদ সাগর ৩৩৪
ক্ষেত্রনাথ দত্ত ৭৩
ক্ষেত্রপাল (দেবতা) ২৭৪
ক্ষেপা (ক্ষ্যাপা) ৪৭
ক্ষেমরাজ ('মালিনীবিজয়'-তন্ত্রকার) ৩০

খ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক ৬
খড়্গাবংশ ২০৪, ২১৭, ২১৮
খড়্গোদ্যম ১৮৪
খণ্ডিতা ২৫
খদিরবনী তারা (বৌদ্ধ দেবী) ২২৮
খমের ১৫৯
খরোষ্ঠি লিপি ১৩৬
খান্‌কা ২৫৫
খারওয়ার (জনগোষ্ঠী) ১৫৫
খালিমপুর তাম্রশাসন ২১৪
খাসিয়া ১৫৮
'খিলহরিবংশ' ১৭
খুলনা জেলা ১০৭, ২১৫, ৩৭০
খেতুরের মেলা ৬২
খোদা নিরঞ্জন ৩৯৭, ৪০৮

গ

গগন হরকরা ৯৫
গঙ্গা (নদী) ১৪৯, ১৫১
গঙ্গা (ইড়া) ৯৮, ৩৩৮
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (নব্যন্যায়) ২৭৫
গঙ্গাপানের মন্ত্র ৪২০
গঙ্গা-যমুনা (ইড়া-পিঙ্গলা) ৪৬১
গঙ্গারাম নমঃশূদ্র ১০১
গঙ্গারাষ্ট্র ১৫১, ১৫২
গঙ্গারিডেই ১৫:
গণপতি-দেউল ২১৫
গণেশ-মূর্তি ২০০
গণেশ, রাজা ২৬৬, ২৬০
গণ্ডক ১৪৯, ১৫২
'গন্ধর্বতন্ত্র' ৪৫১
গবড়া (চর্যাপদের একটি রাগ) ১৩০
গয়া ৩০, ২১৫
গরল-রস ৪০১, ৪০২, ৪০১
গরুড়ধ্বজ ১৩৫
গর্গ (ধর্মপাল-মন্ত্রী) ২১০
গল্‌সী থানা (বর্ধমান) ১০৬
গাঙ্গেশ উপাধ্যায় ২৭৫
গাণপত্য ১৯৬, ২০০, ২২১, ২৯৩
'গাথা সপ্তশতী' ('গাহা সত্তসঈ') ২০
গান্ধারশিল্প ১৩৬
গান্ধারী নাড়ী ৪৪৪
গাজালী ৪৯৬
গাজী ২৫৫
গার্ডিনার (W. H. T. Gairdiner) ৫৩
'গাহা-সত্তসঈ' (গাথা-সপ্তশতী) ২০
'গীতগোবিন্দ' ৮, ১১, ১২, ২৩, ১২৭, ১৩০, ২০৬, ২৪৭, ২৬২, ২৭৬, ২৭৭
'গীতা' ৩১২
গুঞ্জরী (চর্যাপদের রাগিণী বিশেষ) ১৩০
গুঞ্জরীপাদ ৪৭৩
গুণরাজ খাঁ (মালাধর বসু) ২৭১
গুণাইঘর তাম্রশাসন ১৯৯, ২০২, ২০৫
গুণের মানুষ ৩৯৪

গুণ্ডরীপাদ (ধামপাদ) ২৪৩
গুপ্তচন্দ্রপুর (সহজপুর) ৩০২
গুপ্ত-পর্ব ১৯৮, ২০০
গুপ্ত-পূর্ব যুগ ১৮৩, ১৮৪, ১৯০
গুপ্ত-যুগ ৩০, ১৮৩, ১৮৪, ১৯০ ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৫, ২০৮, ২১২, ২২২
গুপ্ত লীলা ৫৪
গুপ্ত সম্রাট ১৫২, ১৮৪, ১৯৩, ১৯৪, ২০০, ২০১
গুপ্ত সাধনা ৪২, ৪৩
গুপ্তোত্তর যুগ ১৮৩
গুয়েরিনট (Guerinot) ১৯১
গুরুগায়ত্রী ৪০৬
গুরুতত্ত্ব ৫৪, ৯৭, ৩১১, ৩১২, ৩১৭
গুরু-পীঠ ৬১
গুরুমন্ত্র ৪০৬
'গুরু-প্রসঙ্গ' ৬২, ১০৮
গুরু-বন্দনার পদ ১১২
গুরুবাদ ৫৫, ৬৯, ২৯১, ৩০৩
গুরুবাদী ১০৪, ৩০৪
গুহ-নন্দী ১৯১
গুহ্যপ্রক্রিয়া ১৮৬
'গুহ্যসমাজতন্ত্র' ২৩১, ৪৬৫, ৪৬৬
গুহ্যযোগ-সাধনা ২৫৬
গুহ্য সাধনা ৪২, ৪৩
গোইন্দ্রিয় ৪২৬
গোদাবরী ২০
গোদাস ১৯১
গোদাসগণ ১৯১
গোধিকাবাহনা চণ্ডীদেবী ২৭৪
গোপথ ব্রাহ্মণ ১৪৬
গোপচন্দ্র (রাজা) ১৮৪
গোপাল (কৃষ্ণ) ১৯৫
গোপাল, ২য় ২১৩, ২৪১
গোপালচাঁদ দরবেশ ৪৩০
গোপালদেব ৫১, ১৮৫, ২১৪
গোপাল দেব (রাজা)-দেদ্দদেবী (রাণী) ২১৪
গোপাল বাউল ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৮
'গোপালোত্তরতাপনী উপনিষদ' ১৯
গোপীনাথ কবিরাজ, মহামহোপাধ্যায়, ডক্টর ২৫৯, ৩২০, ৩২১, ৪৭৪
গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ) ২৬৯
গোপীনাথ বাউল ১২৪
গোবর্ধন ২৬৮
গোবিন্দচন্দ্র (চন্দ্রবংশ ?) ১৮৮
গোবিন্দচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ, গৌড়েশ্বর ১৮৫
'গোবিন্দচম্পূ' (কাব্য) ২৮৭
গোবিন্দদাস বাউল ১২৬
গোবিন্দপুর তাম্রশাসন ২৪৬
গোবিন্দ স্বামী ১৯৭
গোরক্ষনাথ ২৫৯, ৪২৮
গোরক্ষ-মত ৪৬৬
'গোরক্ষসংহিতা' ৩৩৮, ৩৩৯
'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' ৪২, ৩২০, ৪৩৮
গোয়ালভিটা ১৯১
গোরাচাঁদ ৬৭
গোলাম হোসেন ২৫১
গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩
গোঁসাই গোপাল ১০৭, ৩৯২
গোঁসাই ভট্টাচার্য ৪৬৪
গোঁসাই হরি ১১৫, ১১৬
গৌড় ২৪৪
গৌড়দেশ ১৫১, ১৫৯, ৩৮১
গৌড়পুর ১৫১
গৌড়রাজ ১৯৯, ২১৬
গৌড়রাজ্য ২৬৯
গৌড়-লেখমালা ২১৩, ২১৪, ২১৫

গৌড়িক ১৫১
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ৩২৭
গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ ১৭, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩৪, ৪৪, ৪৬
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ৩৪, ৫৪, ৫৫, ৬৯, ১০৬, ১২৬, ১২৯, ২৮০, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৮, ২৯৬, ৩২২, ৪০৩, ৪০৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র ৯৭
গৌরীপাট ৮৫
গ্রহণ-ক্রিয়া ('ভেদ' : 'চারিচন্দ্র-ভেদ') ৩৯৫
গ্রন্থিমোচন ১০১
গ্রিয়ারসন (গ্রীয়ারসন) ১৩
গ্রীক ১৩৩, ১৩৬, ১৫১, ১৫২
'গ্লিম্প্‌সেস্ অব্ ফিলসফি অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন' ('Glimpses of Philosophy and Religion'—Swami Abhedanand)

ঘর (গদি) ৬১
ঘাট-বন্দনা ৪১৪
ঘেরণ্ডসংহিতা ৪১৬, ৪১৭
ঘোষপাড়া (২৪ পরগণা) ৬১, ৬৩, ৬৭, ৬৮
ঘোষপাড়ার মেলা ৬২, ৭৩
ঘোষাণ্ডী-প্রস্তরলিপি ১৯৫

চক্র ৩৩৯, ৩৬৯, ৪২৮
চক্রতত্ত্ব ৩৩৯
চক্রপাণি (বোধিসত্ত্ব) ২২৮
চক্রভেদ ৩৪০
চক্রানুষ্ঠান ৪৫৩
চক্রেশ্বরী ৪৫৯
চট্টগ্রাম ১৫৮, ১৮৯, ২২৮, ২৪১, ২৪৪, ২৭১
চট্টগ্রাম তাম্রশাসন ২৪৭
চড়কগাছ ২৪৭
চণ্ডালী ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪
চণ্ডিকা, মহিষমর্দিনী (৩২ হস্তা) ২১৫
চণ্ডী (দেবী) ১৮৩, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৯, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭
চণ্ডী গোঁসাই (বাউল-গুরু) ১০৭, ৩০৭
চণ্ডীদাস ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২ ১৩, ১৭, ১৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৫৩, ২৭৭, ২৮৯, ৩২১, ৩৬১, ৩৭৭, ৩৯৪, ৪৭৮, ৪৮৯
চণ্ডীদাস গোঁসাই বাউল-গুরু) ১০৭, ৩১০, ৩৪৪
'চণ্ডীদাস-চরিত' ৯, ১০, ১১
চণ্ডীদাস-পদাবলী ৫, ৭, ৯, ১২, ১৯, ২৮
চণ্ডীদাস-ভণিতা ৬
চণ্ডীদাস-রজকিনী ৪১০
চণ্ডীদাস-রজকিনী-আশ্রম ১০৭
চণ্ডীদাস-সমস্যা ৫, ৬
চণ্ডীদাসের সহজিয়া-পদ ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৫, ৪১০, ৪১১
চণ্ডীদেবী, গোধিকাবাহনা ২৭৪
চণ্ডীপূজা ২৭৩
'চণ্ডীমঙ্গল' ২৭৪
চতুর্দল (মূলাধার) ৩৪৩, ৩৪৫, ৪৩৬, ৪৪৭, ৪৫২, ৫০৫
চতুর্দল পদ্ম ৩৫১
'চতুর্বজ্রগীতিকা' (অদ্বয়বজ্র-রচিত) ১৩০
চতুর্ভুজা সরস্বতী
চতুর্মুখ লিঙ্গ
চতুষ্কায় (নির্মাণকায়, ধর্মকায়, সম্ভোগকায় ও সহজকায় ৪৪৯
চতুষ্কায়-স্বরূপিণী দেবী ৪৫০
চতুষ্পীঠ ৩৬৫
চন্দ্র , ৪২৬
চন্দ্রগুপ্ত ১৯১

চন্দ্রগুপ্ত, ২য় ১৯৮, ২০২
চন্দ্রগ্রহণ ৪২৯
চন্দ্রচূড় ১৯৯
চন্দ্র-নাড়ী (ইড়া) ৪১১, ৪১৫, ৪২০
চন্দ্রবংশ ১৮৮, ২১৭, ২১৮, ২৪৯
চন্দ্রবর্মা ১৯৭
চন্দ্রভেদ ৫৭, ৩৯৭
চন্দ্র-রোহিণী ২১৪
চন্দ্রশেখর (শিব) ১৯৮, ১৯৯
চন্দ্র-সূর্য (প্রকৃতি-পুরুষ) ২৫৮, ৪৭৩
চন্দ্র-সূর্য-মিলন (প্রকৃতিপুরুষ-মিলন) ২৬১, ৪৭৪
চন্দ্র-স্বরূপ পরমবস্তু ৪০০
চব্বিশ পরগণা ৩৬৬
চমন (পিঙ্গলা, রসনা, কালি বা সূর্য নাড়ী) ৪৫১
'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ৪৪, ২৪২, ৪৭০
'চর্যাগীতি' (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-রচিত) ১৩০
'চর্যা-দোহাকোষ-গীতিকা' (কঙ্কণ-রচিত) ১৩০
চর্যাপদ ৪৪, ১৩০, ৩১৯, ৩২২, ৩৩৬, ৪৭৪
'চর্যাপদ ও হঠযোগপ্রদীপিকা' ২৫৯
চাওয়াল শাহ্ ৫৮
চাকুরে (বাউল) ২৯৫
চাটিল (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৪৩, ৩১৯
চাঁদ ৩৭৫
চাঁদ রায়-কেদার রায় ৪৬৪
চান্দ্রনাড়ী ৪৫৮
চামুণ্ডা ৩৮, ২১৬
চামুণ্ডী ২১৫, ২১৬
চারক্যশাখা (যজুর্বেদ) ১৯৫
চারিকায় ৩৩৬
চারিচক্র ৩৩৬
চারিচন্দ্র ৫৭, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪২৪, ৪২৯
চারিচন্দ্র-ভেদ ৫৬, ৫৭, ৮১, ৮৫, ২৮৯, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪২৪, ৪২৬
চারিপদ্ম ৩৩৬
চারিপ্রহর ৪৫১
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭
চিত্তমাত্রতা ২২৪
চিত্তলয় ৪৬২
চিত্রজল্প ৯৭
চিত্রমতিকা দেবী ২১৭
চিত্রস্বামী ১৪৯
চিত্রানাড়ী ৪৪৪
চিত্রিণী নাড়ী ৩১৭, ৪১৯, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৭৫
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৮৭, ২০৯
চিন্ময়-স্বরূপ ৪৭৯
চিন্তী ১৩৯
চীনাচার ৪৫৩, ৪৬৩
চেঙ্কু (জনগোষ্ঠী) ১৫৫
চৈতন্য, চৈতন্যদেব ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ২৪, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪১, ৪৫, ৫৪, ৫৫, ৬৩, ৬৯, ১০২, ১২৭, ১২৯, ১৩১, ১৩৭, ২৪৭, ২৬৩, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ৩১২, ৩২০, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬৭, ৩৭৯, ৩৮৬, ৪০৩, ৪৬৩, ৪৭৭
চৈতন্যচরিতকার ৪৩
'চৈতন্যচরিতামৃত' (সংক্ষেপে 'চৈ. চ.') ৩, ৪, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৫৪, ১০৬, ১০৭, ১২৯, ২৬৮, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ৩১২, ৩২০, ৩৭০, ৩৮২, ৩৮৫, ৩৮৬, ৪০৫, ৪১১
চৈতন্যতত্ত্ব ৫৪, ১২৯, ৩১২, ৩৫৬, ৩৮৫
চৈতন্যধর্ম ২৭৯, ২৮১, ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮
চৈতন্য-বীজমন্ত্র ৪০৮
চৈতন্যবাদ ৪৭৭
'চৈতন্যভাগবত' ৩৭, ৪২, ২৭১, ২৭২, ২৭৮, ২৮০

'চৈতন্যমঙ্গল' ১২, ২৭২, ২৭৩
চৌষট্টি তন্ত্র ২৯৭
৪৫১

ছ

'ছদ্মবেশে দেব-দেবী' ৩১
ছবগুগিয় ১৯৩
ছাতনা ৯, ২৯, ৩১
ছাতনা, উত্তর ৯
ছাতনার রাজবংশ ৯
ছান্দোগ্য উপনিষদ ১৪৭, ১৭৬, ১৭৭, ৩১৪, ৩৪৯
ছান্দোগ্য-শাখা (সামবেদ) ১৯৪
ছুটি খাঁ ২৭১
ছুন্নত ২১

জ

জগদীশ ভট্টাচার্য (নব্যন্যায়) ২৭৫
জগদ্দল বিহার ২৪১, ২৪২, ২৫৩
জগদানন্দ ৪০
জগন্নাথ ২৫
জগন্নাথ-দর্শন ২৫, ২৬
জগা কৈবর্ত ১০১
জগাই-মাধাই ২৭২, ২৭৪
জন মার্শাল (John Marshall) ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
জনলোক ৩৩১
জবরুত ৫৫, ৯২, ১৪০, ৪৮২, ৫০৩, ৫০৪, ৫১২
জয়দেব ১২, ১২৭, ১৩০, ২০৬, ২৪৭, ২৬২, ২৭৬, ২৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯
জয়নগর, জয়নগর-মজিলপুর ১০৮, ১৯৯
জয়নাথ, মহাসান্ধিবিগ্রহিক ২০৩
জয়ন্ত ১৪৫
জয়পাল ২৪১
জয়ানন্দ ২২, ২৭২, ২৭৩
জলধর (বাউল) ১০৭, ১১২
জলের পঞ্চগুণ ৩৩১
জাকাত ৫২
জাজিলপাড়া তাম্রশাসন ২১৩
১৮৪
জাতবর্মা ১৮৮
'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫৮, ১৬০
জাভা (যাভা) ২২৯
জামী (সুফী কবি) ৪৯৪, ৫১১
'জার্নাল্ অব্ দি ইউনিভার্সিটি অব্ বোম্বে' ('Journal of the University of Bombay') ১৬৪
'জার্নাল্ অব্ দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট' ('Journal of the Indian Society of Oriental Art') ১৯৯
'জার্নাল অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' ('Journal of the Asiatic Society of Bengal') ১৪৩, ১৫৭, ১৯৯, ২১৩, ২১৫
'জার্নাল অব্ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি' ('Journal of the Royal Asiatic Society') ১৮০
'জার্নাল অ্যাণ্ড প্রসিডিংস্ অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' ('Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal') ২৭০
'জার্নাল এশিয়াটিক' ('Journal Asiatique') ২১১, ২৪৩
জালালুদ্দীন, সুলতান ২৬৭
জালালুদ্দীন রূমী, সুফী-কবি ৩৪২, ৩৫২
জাহ্নবী (নিত্যানন্দ-পত্নী) ৪৭৮
জিজিয়া কর ২৫২, ২৬৫
জীব গোস্বামী ১৬, ১৯, ২৮
জীবন-নদী ('উল-হায়াত' বা 'আব্-হায়াত') ৩৮৯, ৪৩

জীবাচার ৩৯৪, ৪২২
জীমূতবাহন ২৪৬, ২৬৭
-মরা ৪১২
জেন্তে-মরা ৪৩৫
জেমস্ লেগ (James Legge) ২০২
জেস্যুইট পাত্রী ১৩৮
জৈনধর্ম ১৯০, ১৯১, ২০২, ২৪৯
জৈনধর্মসূত্র ১৯০, ১৯৪
'জৈন সূত্রজ্' ('Jain Sutras') ১৫০, ১৯১
জ্ঞানসিদ্ধিতন্ত্র ২২৭
'জ্ঞানার্ণবতন্ত্র' ৪৫৮, ৪৫৯
জ্যাক ফিনিগান (Jack Finegan) ১৬৩, ১৬৪
জ্যান্তে-মরা ৮৯, ৩৬৪

ট

ট্রেংকনার (Trenckner ২২৪

ড

ডাকিনীবজ্র-গুহ্যগীতি' (সরহপাদ) ১৩০
ডাকিনী শক্তি ৪৩৯, ৪৪৭
ডালিমতলা ৬৯
ডালিমতলার মাহাত্ম্য ৬২
ডেস্ক্রিপ্টিভ্ ক্যাটালগ্ অব্ স্যান্স্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপ্টস্ ('Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts.') ১৫০
ডোম্বী ২৪৩, ২৫৮, ৪৭৪

ঢ

ঢাকা (জেলা) ৩০, ৫৮, ২১৫
ঢাকা চিত্রশালা ২০১, ২১৬, ২২৮, ২২৯, ২৩০
ঢাকা-বিক্রমপুর ২২৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮
ঢাকুরিয়া ৪৮১

ত

তক্ষশীলা ১৫৭
তজ্জায়া (জগদতিরিক্তবাদ) ৪৯৩
তত্ত্ব, চতুর্বিধ ৪৫১
'তত্ত্বচিন্তামণি' ২৭৫
তত্ত্ববীজ ৩১৮
তত্ত্ববোধভু বোধিদেব (রামপালের মন্ত্রী) ২১৮
'তন্ত্রকথা'-শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৮৭, ২০৯, ৪৬১
'তন্ত্রতত্ত্ব'—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ২৮৬
তন্ত্রধর্ম ১৮৯, ২০৮, ২১০, ২৯৬, ৩০৩, ৩১৩, ৩২১ ৪৬০
'তন্ত্রপ্রামাণ্য' ২৯৭
তন্ত্রবাদ, তন্ত্রসাধনা ২৫৬
'তন্ত্রবার্তিক'—কুমারিল ভট্ট ২৯৮
তন্ত্রমার্গ ২৯৬
তন্ত্রযান ২১০
তন্ত্রশাস্ত্র ৪১, ২৮৬, ২৯৬, ২৯৮, ৩১৩
'তন্ত্রসার' ২৯, ৩২, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬১
তন্ত্রসাহিত্য ৩১৩
'তন্ত্রাধিকারিনির্ণয়' ২৯৮
তপোলোক ৩৩৩
'তবকাৎ-ই-আকবরী' ২৫১
'তবকাৎ-ই-নাসিরী' ২৫১
তমোগুণ ৪৭৫
তরীক ৫২
তরীকত, তরীকত-পন্থী ৫২
তল ৩৩২
তলবকার ব্রাহ্মণ ১৪৬
তলাতল ৩৩২
তল্লবিয়া (জগল্লীন বা বিশ্বলীনবাদ) ৪৮৩
তাকলা-মাকান মরুভূমি ১৫৬
তা-চেং-তেং ২০৪
তাঞ্জোর ২৫৬
তাড়কপাদ (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৪৩
তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ১৪৬, ১৭৮

তান্ত্রিকতা, তান্ত্রিকধর্ম ২১৯-২২১, ২৮০, ২৮১
তান্ত্রিক চক্র ২৭২
'তান্ত্রিক বুদ্ধিজ্‌ম্' ('Tantric Buddhism' —Dr. Das Gupta) ৪৫১, ৪৫২
তান্ত্রিক বৌদ্ধ ৩৪০
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ২০৭, ২১০, ২১৮, ২২১, ২৪২, ২৬২, ২৯০, ৩৩৪, ৩৩৬, ৪২৯
তান্ত্রিক মত ২৭৪
তান্ত্রিক শাক্তধর্ম ২৬৪, ২৭১
তান্ত্রিক সাধনা ২১২
তান্ত্রিক হোম ২৬৪
তামলিপ্তিয় ১৯১
তামিল ১৬০
তাম্রলিপ্ত ১৫০
তাম্রলিপ্তক ১৯১
তাম্রলিপ্তি ১৯১, ২০২, ২০৩
তারনাথ ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৯৭
তারা ২২৮, ২২৯, ৪৫১, ৪৬৯
তারাপীঠ ৪৬৪
'তারারহস্য' (গ্রন্থ)—ব্রহ্মানন্দ গিরি ৪৫৩
'তারিখ-ই-দাউদী' ২৭১
'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' ২৫১
'তারিখ-ই-শেরশাহী' ২ ১
তারুণ্য, তারুণ্যামৃত ১০৭, ৩৯২, ৩৯৭
তালশিক্ষার পুঁথি ১৩১
তালৈঙ ১৫৮
তাহেরপুর ২৬৮
তিনদিনে তিনরতি ৪১৫
তিনদিনের তিনরসের ভিয়ান (মিলন) ৪০১
তিন ধারা ৪০২
তিনবাঞ্ছা ৩৬৬
তিন রস ৪০২
তিনরস-তিনরতি ৪০০, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪
তিনরসের সাধন ৩৬২
তিব্বত ২১০, ২৩৭, ২৪০, ২৪১, ২৫৩, ৪২৯
তিল্লোপাদ (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৩৮, ৩২২
তুর্কী ১৩১
তেঙ্গুর-তালিকা ২৪০, ২৪১
তেজের পঞ্চগুণ ৩৩১
তেজোবীজ 'রং' ৪৪৭
তেলেগু ১৬০
তেসুপ-হেপিট (Tesup-Hepit) ১৬৫
তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১৪৭, ১৭০
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১৪৬
তৈত্তিরীয় শাখা (যজুর্বেদ) ১৯৫
তৈত্তিরীয় সংহিতা ১৭০
তৈলপাদ, তন্ত্রাচার্য ২৪২
তৈলিকপাদ ২৪৪
তৌহীদ (ভগবানের সহিত একাত্মতা) ৫১
ত্রি-অগ্নি (রাগ-দ্বেষ-মোহ) ২২৪
ত্রিকায় (ধর্ম, সম্ভোগ ও নির্মাণ-কায়) ১০১, ২৩৩
ত্রিকায়বাদ ২২৭
ত্রিকাল ১০১, ২৩৪
ত্রিকূট (ত্রিবেণী, মল-মূত্র-শুক্র) ৪২৮
ত্রিকোণ ৩৩৩, ৪৩৯, ৪৭৪
ত্রিকোণ-মণ্ডল ৪৪০
ত্রিকোণ-যন্ত্র ৪৩৯, ৪৫৮
ত্রি-গায়ত্রী-ক্রিয়া ৪২৭
ত্রিগুণ-ধারিণী প্রকৃতি শক্তি ৪৩৪
ত্রিদণ্ডী ২৯৯
ত্রিধারা-বিশিষ্ট ত্রিবেণীর ঘাট ৪১১
ত্রিনেত্রা (শক্তি)
'ত্রিপিনী'র (ত্রিবেণীর) ঘাট
ত্রিপুটি
ত্রিপুরা (জেলা) ১০৮, ১৮৯, ১৯৭, ২০৩, ২১৫, ২৬৯,
ত্রিপুরা তাম্রশাসন ১৯৫, ১৯

'ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়তন্ত্র' ৪৬১
ত্রিবেণী (যমুনা-গঙ্গা-সরস্বতী : মল-মূত্র-শুক্র) ৪২৭
ত্রিবেণী (প্রয়াগ, ঘাট বা আজ্ঞাচক্র) ৯৯, ৩৪৫, ৩৭৩, ৪০২, ৪১৩, ৪১৪, ৪৪৪, ৫১৫
ত্রিবেণীর ত্রিধারা ৩৭৩, ৩৭৪, ৪০০, ৪০২, ৪১৩
ত্রিবেণীর ঘাট ৪০১, ৪৫২, ৫১২, ৫১৫
ত্রিবেণীর ঘাট (নদীয়া) ৬৩
ত্রিবেণী-সাধন ৪২৭
ত্রিরত্ন ২২০, ৩১৯
ত্রৈকূটক বিহার ২৪১
ত্রৈপুর (ত্রিকোণ-যন্ত্র) ৪৩৯
ত্রৈলঙ্গ স্বামী ৪৮১
ত্রৈলোক্যচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ১৮৮

থ

থগণ (বৌদ্ধাচার্য) ২৪৪
থ্রেশিয়া ১৫৭

দ

দক্ষিণবঙ্গ ১৮৮, ১৮৯, ২০২, ২১৮, ২৫৪
দক্ষিণভারত ১৫৯, ১৬০, ১৮৯
দক্ষিণাচার ৪৫৩
দক্ষিণাপথ ১৪৯
দক্ষিণাবর্ত ৪৩৮
দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ী ৪৬৪
দণ্ডী ২০৬
দত্তাত্রেয় ৪১৭
দনুজমর্দনদেব ২৬৬
দন্তুরা (চামুণ্ডা) ২১৬
'দবীর খাস' (সনাতন গোস্বামী) ২৬৯
দম ৪০৯, ৪৩০, ৪৩১
দমের কাজ ৪০৯, ৪৬৯
দমের মানুষ ৪৭৫
দরবেশ ৫৬, ৬০, ২৮১, ৪৭৬
দর্ভপাণি (দেবপালের মন্ত্রী) ২১৭
'দশকুমারচরিত' ৩৭
দশবিধ ধারণা ৪১৭
দশভুজা মহিষমর্দিনী ২১৫
দশমদল (মণিপুর) ৩৪৪, ৩৪৫, ৪৩১, ৪৩৬, ৪৫২
দশমহাবিদ্যা ৪৫৫
দশমী দুয়ার, দশমী দ্বার, দশম দ্বার ৩৩, ৩৪৫, ৪২৬
দশরথ ১৫০
দশরথদেব ১৮৯, ২৪৬
দশানন (দন্ত : সাংকেতিক শব্দ) ৪২৬
দাক্ষিণাত্য ২০, ১৫৮, ২৭৮
দাদূ ৭৩, ৮৮, ১৩৭, ৩০০, ৩১৪, ৫১৮
দাদূ-পন্থী ৪২৭, ৪২৮
দানখণ্ড ১২, ১৩
দান-পারমিতা ২২০
'দানসাগর' ২৪৯
দামোদরদেব ১৮৯, ২৪৬
দামোদরপুর তাম্রশাসন ১৯৭, ১৯৯
'দায়ভাগ' (স্মৃতিগ্রন্থ) ২৪৭
দায়ুদ (দাউদ) ২৮১
দারা শিকো ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৩
দারিক (বৌদ্ধাচার্য) ২৪৩
দাশরথি রায় ৭৭
দাসীখব্বড়িয় ১৯১
দাসী-খর্বট, দাসী-খর্বটক ১৯১
দাস্য ২৯৩
'দি আইডিয়া অব্ পার্সন্যালিটি ইন্ সুফিজ্ম্' ('The Idea of Personality in Sufism'—Dr. R. A. Nicholson) ৫৩, ২৮৪, ৩০৫,
'দি আর্কিওলজি অব্ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স্' ('The Archaeology of World Religions'—Jack Finegan) ১৬৪

'দি আর্লি হিস্ট্রি অব্‌ দি বৈষ্ণব সেক্ট' ('The Early History of the Vaishnava Sect'—Dr. H.C. Roy Choudhury) ১৩৩, ১৩৬, ১৫১, ১৯৫

'দি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্‌ ইসলাম' ('The Encyclopedia of Islam') ৫২

'দি ওয়ে অব্‌ এ মহমেডান মিস্টিক' ('The Way of a Mahomedan Mystic'—W. H. T. Gairdiner)

'দি কর্ণাটক হিস্টরিক্যাল্‌ রিভিউ' ('The Karnatak Historical Review')

দিগম্বর নির্গ্রন্থ ১৯২

দিনাজপুর (জেলা) ২১৫, : , ২৪১

'দি নির্গুণ স্কুল অব্‌ দি হিন্দি পোইট্রি' ('The Nirguna School of Hindi Poetry'—Dr. Barthwal)

'দিবাভিসারিকা' ২৩

দিব্যজ্ঞান ৪৬৭

দিব্যদর্শন ৩৬৮

দিব্যসত্তা ২৬২, ৩৬৭

দিব্যাচার ৪৫২, ৪৬৪

'দিব্যাবদান' ১৯০, ১৯১

'দি ব্রাহ্মণ্‌স্‌ অব্‌ দি বেদাস্‌' ('The Brahmans of the Vedas'—K. S. Macdonald) ১৭৯

দিয়োদোরস্‌ ১৫২

'দি রিলিজিয়ন অব্‌ দি বেদা' ('The Religion of the Veda'—Bloomfield)

'দি রেহালা অব্‌ দি ইবন্‌ বতুতা' ('The Rehala of Ibn Battta'—Dr. M. Husain) ২৫২

দিল্লী

'দীওয়ান', 'দীওয়ান-ই-সামসী-তাব্রিজ'—রূমী ৪৮৩, ৪৯০

দীক্ষামন্ত্র ৪০৬

দীক্ষিত, কে. এন. (K. N. Dikshit) ২৪০

দীন ইলাহী ১৭৮

দীন গোপাল (বাউল) ২৯৪

দীন চণ্ডীদাস ৬, ১১, ১৩, ১৪, ২৯

'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' ১৩, ৩৫

দীন বাউল ১০১

দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর

'দীপকোজ্জ্বল' (পুঁথি)

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান

'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-ধর্ম-গীতিকা' (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান)

দুদ্দু (বাউল : লালন-শিষ্য) ১০৭, ৩২৮

দুর্গা দুর্গাপূজা ২১৭, ২৭১

দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (দুঃ সাঃ) ১৭৩, ১৭৫

দুর্গোত্তারা দেবী ৩৪, ২৪২

দুলালচাঁদ ('লালশশী') ৬২, ৬৪, ৬৭, ৬৮

দেউলবাদী গ্রাম (ত্রিপুরা জেলা) ২১৫

দেওড়া গ্রাম (বগুড়া) ২০১

দেওপাড়া প্রশস্তিলিপি ২৪৬, ২৪৭

দেদ্দদেবী (গোপালদেব-মহিষী) ২১৪, ২১৬

দেবক্রী (চর্যাপদের রাগিণীবিশেষ) ১৭০

দেবখড়্গ (খড়্গবংশীয় নৃপতি) ১৮৪, ২১৭

দেবপাল ২১৩, ২১৪, ২১৭, ২২৯, ২৩১

দেবরাজবংশ ১৮৯

দেবা (সুষুম্না, প্রজ্ঞা, নৈরাত্মা, যোগিনী বা সহজসুন্দরী নাড়ী) ৪৫২

দেবীকোট বিহার ২৪১

দেবীপুরাণ ২০৮

দেহ-চক্র ৩৭৩

১০৮, ৩২৫, ৩২৯, ৪৭৭

'দেহতত্ত্বকথনং' ৬২
দেহতত্ত্বের পদ ১১২
দেহনির্ণয়' বা 'বৃহৎ দেহনির্ণয়' (পুঁথি) ৩৭৬, ৩৭৯
দেহ-ব্রহ্মাণ্ড ৪৩৩, ৪৭৬
দেহ-ভাণ্ড ৩৭১
দেহ-রতি ৩৬৫
দেহ-শোধন ৪২৫
দেহ-সাধনা ২৫৭
দেহ-সিদ্ধি ২৬০
দোষা ২৮৪
ও শাস্ত্রী-টীকা ২৩৯, ২ ৩২২, ৩৩৫, ৩৩৬
'দোহাকোষগীতি' (সরহপাদ) ১৩০
'দোহাকোষ ও চর্যাগীতি' (সরহপাদ) ১৩০
দ্রাবিড় দেশ ১৬১
দ্রাবিড় ভাষা ১৫৯, ১৬১
দ্বাদশদল পদ্ম, দ্বাদশদল কমল ৩১৭, ৪৪০
দ্বাদশাদিত্য (বৈন্যগুপ্ত) ২০৩
দ্বিজ চণ্ডীদাস ৫, ৬, ১১, ১৩, ১৫, ২৮, ২৯, ৩৫
দ্বিতীয়চন্দ্রভেদ ৮৫
দ্বিদল, দ্বিদল পদ্ম ৮৫, ৩২৪, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৬৫, ৩৭৩, ৪২২, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৪১, ৪৪৮, ৪৫২, ৪৭৫, ৪৮১, ৫০৫
দ্বশাখ ১৩০
দ্বৈতধারা ৪৭১, ৪৭২
ধনপতি-কাহিনী ২৭৪
ধনসী (চর্যাপদের রাগিণী বিশেষ) ১৩০
ধমতা (ধর্মদত্তা) ১৯২
ধমন (ইড়া, চন্দ্র বা ললনা নাড়ী) ৪৫১
'ধম্মপদ' ২২৩
৫৮
ধরাচক্র ৩৫০, ৪১৯, ৪৪২
ধরা-বীজ 'লং' ৪৩৮, ৪৪৭
ধর্মকায় ২২৭, ৪৪৯, ৪৬৯
ধর্মচক্র মুদ্রা ২১৭
ধর্মচক্র ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৬৯
ধর্মঠাকুর ১৮৩
ধর্মদত্তা (ধমতা) ১৯২
ধর্মপাল (পালবংশীয় নৃপতি) ২১৬, ২১৭, ২২৯, ২৪০, ২৪১
ধর্মপাল (বৌদ্ধদেবতা : হিন্দুদের যমরাজ) ২৩০
ধর্মপ্রভু জগন্নাথ ১২২
ধর্মমুদ্রা ৪৫১, ৪৬৯
ধর্মরাজিক বিহার ১৫৭
ধর্মশ্রীমিত্র ২৪৪
ধর্মাদিত্য ১৮৪
ধামপাদ (গুণ্ডরীপাদ : বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৪২-২৪৩
ধারণী (বৌদ্ধধর্মসূত্র) ১৮৭, ২২০, ২২১, ৩৩৫
ধারা-উল্টানো ১০১
ধিক্‌র ৫০২
ধিক্‌রখাফী ৫০২
ধিক্‌র জালী ৫০২
ধীর ২৫
২৫
ধীরা ২৫
ধীরোদাত্ত ২৫
ধু-ল্-নুন মিশরী ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯০
ধোয়ী ২০৬
ধৌত, ধৌতাঙ্গ ৪২
ধৌতানুষ্ঠান ৪২
ধ্যানী বুদ্ধ ২১৮, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ৪৬৬
'ধ্বন্যালোক' ২১
নওগাঁ
নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

নটরাজ (শিব) ১৯৮
নদীয়া ১৮৮, ৩৭০
নদীয়া-বিজয় ২৫৩
নন্দী-বৃষ ১৯৯
নন্দ-নারায়ণ (নন্দনারায়ণ) ২১৪
নবগ্রহ (দেহ-মধ্যে কল্পিত) ৩৩৭
নবদুর্গা ২১৫
নবদ্বীপ ১০৭, ১৮৮, ১৭০, ১৮০,
৩৮৬, ৪০৬, ৪২৫, ৪৮১
নবদ্বীপ-সম্প্রদায়ের বাউল ৩১০, ৩৯৪,
৩৯৭, ৪০৫, ৪১৪
নবদ্বীপ দাস (বাউল) ৩২৬
নবী ৫৫, ৩০৫, ৪৮২, ৪৮৬, ৫০৯
নবীনচন্দ্র (সেন) ৭৭
নব্যন্যায় ২৭৫
নভোমণ্ডল ৪৪১
নমাজ ৫২
নয়নন্দ গ্রাম (ঢাকা) ২২৯
নয়পাল, কম্বোজরাজ ২১৩
নরসিংদি (ঢাকা) ৫৮, ১০৭, ৩৯০
নরহরি (নরহরি দাস, বৈষ্ণব কবি) ৩৬১
নরহরি (বাউল) ৩০৮
নরোত্তম (নরোত্তম দাস, বৈষ্ণব কবি) ৩৫৬, ৩৬১
নর্ডিক ১৫৭
নর্মদার কূল ৩৪৫, ৪৩১
নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডক্টর ৬, ৮, ২৬৬
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ৩০, ৩১, ২২৮, ২৪৩, ২৪৪
'নস্টিসিজম্' (Gnosticism) ১৪৭, ৪৮৬
নাথবন্দী (সুফী-সম্প্রদায়ের শাখা) ১৩৯
নাগবোধি (বৌদ্ধাচার্য) ২৪৪
নাগসেন, আচার্য (বৌদ্ধভিক্ষু) ১৩৬, ২২৩
নাগার্জুন ১০০, ২১০, ২২৪
নাগার্জুনী কোণ্ডা ১৯২
নাছুত ৫৫, ৯২, ১৪০, ২৮৩,
৪৮৯, ৪৯৮, ৫০৩, ৫০?
নাড়পাদ (বৌদ্ধ তান্ত্রিক) ২৪২
নাড়ী ৩৩৯
নাড়ী-চক্র ৪৪৬
নাড়ীমণ্ডলী ৪৪৩
নাড়ী-মার্গ ৪৪৬
নাথদর্শন ২৫৯
নাথধর্ম ২৫৭, ২৫৮, ২৯০, ৩১০
নাথপন্থ, নাথপন্থা ২৫৯, ৩২৯, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৫
নাথপন্থী ৪৭, ১০০, ২৫৮, ২৬০, ৩২১
নাথ-মার্গ ২৫৮, ৩০৩
নাথ-যোগী ২৫৯, ৩২৯
নাথ-সম্প্রদায় ২৫৯
'নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী' —ডাঃ কল্যাণী মল্লিক ২৫৯
নাথ-সিদ্ধাচার্য ২৬১
নাথ-হঠযোগ ২৫৮
নানক ৭৩, ১৩৭
নান্নুর (বীরভূম) ২৯, ৩১
নাভিপদ্মনির্ণয় ৩৭৯
নামাশ্রয় ৪০৫, ৪০৮
"নায়কে মানিনীবচনম্‌" ২৭
নারায়ণ ১৯৫
নারায়ণ পাল ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭
নারায়ণ বর্মা, মহাসামন্তাধিপতি ২১৬
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ২০৯
নাহার-সংগ্রহ ২০৭
"নারী হিজড়ে, পুরুষ খোজা" (কর্তাভজা) ৬৯
নাস্তিক দর্শন ১৪৫
নাস্তিক ধর্ম ১৪৫
'নিউ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকোয়্যারি' ('New Indian Antiquary')
'নিওপ্লেটোনিজ্‌ম্‌' (Neoplatonism)

নিকলসন, ডক্টর আর. এ. (Dr. R.A. Nicholson) ৫৩, ২৮৩
নিকায়, চতুর্বিধ ৪৫১
নিকোবর ১৫৮
নিগম (দেহের নিগূঢ় স্থান) ৯২, ৩৪৪
নিগমতন্ত্র ১২২
'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী' ৫৪
নিগ্রোবটু ১৫৪, ১৫৫
নিতাই (নিতা) ক্ষ্যাপা (বাউল) ১২৪
নিত্যবস্তু ৩১২
নিত্যবৃন্দাবন ৩৫৫, ৩৫৯, ৪৩১
নিত্যস্থান ৩৭২
নিত্যরস-লীলা ৩৮৫
নিত্যানন্দ (প্রভু) ৪২, ৪৩, ৪৪ ৪৫, ৫১, ৬৯, ২৮৪, ৩২০, ৩৫৬, ৫৭৮
নিত্যানন্দ (পরম শিব) ৪৪৩
নিত্যানন্দ দাস ('প্রেমবিলাস'-রচয়িতা) ১২
নিত্যানন্দ-স্বরূপ ৩১২
নিত্যা প্রকৃতি ৪৬২
নিধনপুর তাম্রশাসন ১৯৪, ১৯৯
নিবৃত্তি ৬৯
নিবোধিকা অগ্নি ৪৪৩
নিমাত ৪২৪
নিম্বার্ক ২৮৫
নিয়ামতপুর (রাজশাহী) ২০১, ২১৫
নিরঞ্জন, নিরঞ্জন-পদ ৩০৫, ৩১০, ৩২১
নিরগ্রগমন ৪৬৭
নিরাভাস ৪৭০, ৪৭১
'নিরুত্তরতন্ত্র' ৪৫৩, ৭৫৫
নির্গ্রন্থ, নির্গ্রন্থপুত্র ১৯০, ১৯১
'নির্ণাদতন্ত্র' ২৩২
নির্বাণ ৮৬, ১০০, ২২৩
নির্বাণ-কলা ৪৪৩
'নির্বাণতন্ত্র' ৩১৭, ৩৫০, ৪৫৭
নির্বাণ-পদ ২৩৯, ২৬১
নির্বাণ-মুক্তি ২৯৪
নির্বাণ-শক্তি ৪৪৩
নির্মাণকায় ২২৭, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫২, ৪৬৫, ৪৬৯, ৪৭২
নির্মাণ-চক্র ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫২, ৪৬৯, ৪৭২
নিহারা ৮৭
নীর (রজঃ) ৩৭৪, ৩৯৮
নীর-ক্ষীর (রজঃ-বীজ) ৯২, ৯৩, ৩৪৪, ৩৭৪, ৩৯৮
নীর-নদী বা ক্ষীর-নদী ৩৭৪
নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী (মাদ্রাজ) ১৬৩
নীলরতন মুখোপাধ্যায় ১৪
নীলাচল ৬৭
নীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর ৪২, ১৫৩, ১৫৬, ১৮০
নুর, নূর ৫৫, ৪৮২, ৫০১, ৫০৮, ৫১২
নূরের মোকাম ৪৮২
নেংটা বাবা ৪৮১
নেগ্রিটো ১৫৪
নেড়া ৫১, ৫৬, ৫৯, ৬৯, ২৭৬, ২৮৩, ২৮৪
নেড়ার ফকির ৫০, ৫১, ৫৯
নেপাল ১৫৮, ২৩৮, ২৪০, ২৫৩, ২৫৬
নেপাল দরবার লাইব্রেরি ২৯৭
নেহার ৯০, ৪১৭, ৫১৫, ৫১৬
নৈরাত্মা (প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি) ২৩৩
নৈরাত্মা (ডোম্বী, শবরী) ৪৭৪
নৈরাত্মা (সুষুম্না, দেবী, প্রজ্ঞা, যোগিনী বা সহজসুন্দরী নাড়ী) ৪৫২
নৈহাটী তাম্রশাসন ২৪৬
নোয়াখালী ১৮৯
নৌকাখণ্ড ১২, ১৩
ন্যায়-দর্শন ২৭৫
'ন্যায়-মঞ্জরী'—জয়ন্ত ১৪৫, ২৭৫

পঙ্কদেহ ৫৭, ১১৬
পগ সম জন জঙ্গ ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৪৪
পঞ্চকাম ৪৫৮, ৪৬৬
পঞ্চকোষবিবেক (অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ) ৩৪০
পঞ্চখণ্ড গ্রাম (শ্রীহট্ট) ১৯৪
পঞ্চতত্ত্ব ২৭৪, ২৯৩, ৪৬৭
পঞ্চতথাগত (বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য) ২২৮
পঞ্চদশকলাত্মক 'হ' বর্ণ ৪৫০
পঞ্চদেবতা ২২০
পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ ২২৭
পঞ্চনাম ৪০৭
২৯৩
পঞ্চবাণ (মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, সম্মোহন) ৪১০
পঞ্চবায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) ২৩৫
পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (সামবেদ-সংশ্লিষ্ট) , ১৭৮
পঞ্চবুদ্ধাত্মক বায়ু ৪৬৬
পঞ্চবোধিসত্ত্ব (সমন্তভদ্র বা চক্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি, বিশ্বপাণি ও বজ্রপাণি) ২২৮
পঞ্চভূত ৩৪৫, ৩৭৫, ৪২৪, ৪৬৬
পঞ্চ ম-কার ১৮২, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৮, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩
পঞ্চমত ২৯৩
পঞ্চমহাযজ্ঞ ১৯৪
পঞ্চরাত্র (বৈষ্ণবতন্ত্র) ২৯৬
পঞ্চরাত্র-মত ১৯৫
পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) ২২৭, ২৬১, ৪৬৬, ৪৭০, ৪৭৩
পঞ্চানন দাস ২৯০, ৩৫৫, ৩৯৪, ৩৯৭, ৪০৯, ৪১০, ৪২০, ৪২২
পঞ্চানন্দ ঠাকুর ১৮৩
পঞ্চামৃত ৪২৮
পঞ্চাশ অক্ষর, অ-ক্ষারাদি ৪৪২
পটমঞ্জরী (চর্যাপদের রাগিণীবিশেষ) ১১০
পট্টিকেরক বিহার ২৪১, ২৪২
পট্টিকেরক-রাজ ৩৩, ২৫০
পট্টিকেরা নগর ৩৪, ২৪২
পট্টিকেরা রাজ্য (ত্রিপুরা জেলা) ১৮৮
পণ্ডিত বিহার ২৪১, ২৪২
পণ্ডিত হাড়ে গোঁসাই (বাউল-ধর্মগুরু) ৩৯৬, ৪৩৪, ৪৩৬
পত্রপুট
'পদকল্পতরু'
'পদচন্দ্রিকা'
'পদাবলী' (পুঁথি) ৫৪
পদাবলী সাহিত্য ২২৮
'পদার্থতত্ত্বনিরূপণ' (রঘুনাথ শিরোমণি) ২৭৫
পদ্ম ৩৩৬, ৩৩৯, ৩৯৪, ৪৩৩
পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর ২২০, ২২৮
পদ্মপাণি (বোধিসত্ত্ব) ২২৮
'পদ্মপুরাণ' ১৮, ১৯, ৩৯৪
পদ্মলোচন (পোদো) ১০৫, ১০৬, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ২৯৫, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৯২, ৪৩১
'পদ্যাবলী'—রূপ গোস্বামী ২৬
'পদ্যাবলী', Introduction to—Dr. S. K. Dey ২৭৯
পয়স্বিনী (নাড়ী) ৪৪৪
পরকীয়া ২৫, ৯৭, ২৮৮
পরকীয়া-তত্ত্ব ৫৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ২৮৮
পরকীয়া-নায়িকা ২৮৭
পরকীয়া-প্রেম , ২৮৮
পরকীয়া-বল্লভা ২৮৭

পরকীয়াবাদ ২৮৭, ২৮৮
পরকীয়া-ভাব ৩৪, ৫৪, ২৮৭
পরবিন্দু (শিব-শক্তির মিলিত সত্তা) ৪৪৩
পরম-এক ৩৭২
পরম গুরু ৩১০, ৩১১, ৩১৭, ৩২৫, ৩২৭
পরমতত্ত্ব ২৮৩, ২৮৪, ২৮৮, ২৯৩, ৩০৪, ৩১০, ৩১২, ৩১৭, ৩২৯, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৯, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৭. ৩৫৮, ৩৬৬ ৩৬৭, ৩৬৮ ৩৭১, ৪৭১
পরমপদ ১০০, ২৬০
পরমপুরুষ ৩১, ২৮৬, ৩০০, ৩৪৮, ৩৫০,৩৫১
পরমপুরুষার্থ-সাধন ৪২৬
পরমবস্তু ৪০০
পরমবৈষ্ণব ১৯৪
পরমব্রহ্ম ৩২১, ৩৮৪, ৪২৮
পরম ব্যোম ৪৪২
পরম ভাগবত ১৯৩
পরমমানুষ ১২৪
পরমলীলাকারী সত্তা ৪৭২
পরমশিব ৩১৭, ৩২৯, ৩৪৯, ৩৫০, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৮, ৪৬২, ৪৬৩
পরমসত্তা ৪২৯
পরম সত্য ২৮৮
পরম সুখ (নির্বাণ) ২২৪, ৩৩৫
পরম সৌগত (মহাসুখ) ১৮৫, ২০৯, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২৫০
পরমহংস ২৯৯
পরমাত্মা ২৯৩, ৩২৯, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭২, ৪০৫, ৪২২, ৪৩৩, ৪৪২
পরমানন্দ ৪৫১, ৪৬৯
পরমানন্দময় অদ্বয়-সত্তা ৩৫৭
পরমার্থ (মহাসুখ, নির্বাণ) ৮৬
পরমার্থ-বোধিচিত্ত (মহাসুখ, নির্বাণ) ২৬১
পরমার্থ-রূপ ৮৬
পরমার্থ-সাধনা ৪২৮
পরমেষ্ঠি-গুরু ৩১৭
পরশিব ৪৪২ ৪৪৮, ৪৭১
পরাগল্ খাঁ ২৭১
পরাৎপর গুরু ৩১৭
পরমেশ্বর, পরমেশ্বরী ৪৫০
পরিপক্ক দেহ ৪২৫, ৪২৬
পরিশিষ্ট পর্ব ১৫২
পরীক্ষিৎ (রাজা) ২৮৭
পর্ণশবরী ১৮৩, ২২৯
পল্টুদাসী (-পন্থী,-সম্প্রদায়) ৪২৬, ৪২৮
পশুপতি শিব ১৬৪, ১৭৮
পশ্চিমবঙ্গ ১৯: ২৫৩, ২৭৪
পশ্বাচার ৪৫৩
পহ্লব ১৩৩
পাক-সিদ্ধ ৪১৩
পাঁচলখি গ্রাম (বর্ধমান) ১০৬
পাঁচু (বাউল) ১০৭
পাঞ্চরাত্র ২৯৮
'পাঞ্চরাত্র প্রামাণ্য' ২৯৭
পাঞ্জু শাহ্., ফকির (বাউল) ১০৬, ১০৭, ১১২, ৩০৯, ৩২৫ ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫৬, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৯৬, ৪০১ ৪০৩, ৪৩১
পাঞ্জু-সম্প্রদায় ৪০১, ৪২৪
পাঞ্জাব ১৫৬, ১৫৭
পাটলীপুত্র ১৯০
পাঠান ১৫৭ ১৫৮, ১৬০
পাঠান-যুগ ২৫২ ২৬৮, ২৮২
পাঠান-রাজগণ ২৬৭
পাণিনি ১৫০
পাণ্ডুয়া ২২৮, ৪৫১, ৪৬৯
পাণ্ডুয়া ১০

পাণ্ডুয়ার দরবার ১০
পাতঞ্জল-মত ৩৪০, ৪৬৬
পাতঞ্জল-যোগদর্শন ৩৪০, ৪৬৭
পাতাল ৩৩২, ৪৩৪
পাত্রসায়ের (বাঁকুড়া) ৭৪
'পাদুকাপঞ্চকম্' ৩১৭
পান-ক্রিয়া ৪১২
পাবনা ১০৩
পামীর মালভূমি ১৫৬
পারশিক, পারশীক ১৩৩, ১৩৬, ১৪৩
পারশিক স্থাপত্য-রীতি ১৩৬
পারস্য, পারস্যদেশ ১৩৭, ১৫৭, ২০০, ২৮১
পার্বত্যত্রিপুরা ১৫৮
পাল-যুগ ১৮৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৯২, ১৯৯, ২০৫, ২০৮, ২০৯, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২২৩, ২২৮, ২২৯, ২৪৪, ২৪৯, ২৫৫, ২৫৬, ২৬৩, ২৯০
পাল-রাজগণ ৫১, ১৮৫, ২০৯, ২১১, ২১৩, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২৪৫
পাল-রাজবংশ ১২৭, ১৮৫, ২১৬, ২১৭
'পালস্ অব্ বেঙ্গল' ('Palas of Bengal' —R. D. Banerjee). ১৯১
পালিগ্রন্থ ১৩৬
পাশুপত ২৯৭, ২৯৮
পাশুপাত-আচার্য ২১৪, ২১৭, ২৯৮
পাহাড়পুর ১৯১, ১৯২, ১৯৯, ২০০, ২২৮, ২৪০
পাহাড়পুর তাম্রশাসন ২০২
পাহাড়পুর মন্দির ১৯৮
পিঙ্গলা (নাড়ী) ৩৩, ২৬০, ২৬১, ২৬২,, ৩৪৫, ৪১১, ৪৩২, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৫১, ৪৭৩
পিঙ্গলা ('যমুনা') ৯৯, ৩৩৮
পিঙ্গলা ('রসনা') ২৫৯
পিণাকী ১৯০
পিণ্ড (ভাণ্ড) ৪৪৬
পিণ্ডতত্ত্ব ৩৩৮
পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ (ভাণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ) ৩২৯
পিতৃশক্তি (শুক্র) ৩৭৪
পিপলাই (বিপ্রদাস) ২৭০
পীততারা (বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী) ২২৮
পীর ২৫৫
পীরালি ২৭৮
পীরের পীর ('অচিন জন') ৩২২
পুড়নগল ১৪৯, ১৫২, ১৯৩
পুণ্যধ্বজ (তিব্বতী শ্রমণ) ২৪২
পুণ্ড্র ১৪৮, ১৪৯, ১৫২
পুণ্ড্র (দেশ) ১৫০, ১৫১, ১৫৯
পুণ্ড্রনগর ১৪৯, ১৫২
পুণ্ড্রবর্ধন (বগুড়া) ১৯০, ১৯১, ১৯২, ২০০, ২০৩
পুণ্ড্রবর্ধন-বাসী ১৯২
পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ২০১
পুণ্ড্রবর্ধনীয় ১৯১
পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) ২৬৯
পুরাণ ১৫৫, ১৮৪, ৩১২
পুরী ৪৫, ১৮৮
পুরুষ ৬০, ২৮৮, ৩৫৯, ৪১২, ৪৮০
পুরুষতত্ত্ব ৩১২
পুরুষ-দেবতা ১৬২, ১৬৪
পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) ১৩৫
পুরুষ-প্রকৃতি ৩১, ১৬৪, ২৬১, ৩২৪, ৩৬৪, ৩৮৫, ৪১০
পুরুষ-প্রকৃতিবাদ ১৬৯, ১৭০
পুরুষ-প্রকৃতি-মিলন ৩৫৮
পুরুষ-শক্তি ৩১০
পুরুষ-সত্তা (বীজ) ৩৭২, ৪২২
পুরুষোত্তম ১৯৭

পুরুষোত্তমদেব ১৮৯
পুলায়ন ১৫৪
পুলিন বাউল ১০৭
পুলিন্দ ১৩৪, ১৪৮
পুষ্করণরাজ (চন্দ্রবর্মা) ১৯৭
পূরক ৪০৯, ৪৬৭, ৫১৪, ৫১৫
পূর্ণ-ঈশ্বর ৩৯৬
পূর্ণচন্দ্র (চন্দ্র-বংশীয় নৃপতি) ১৮৮
পূর্ণচন্দ্র (সহজ-মানুষ) ৩৯১
পূর্ণব্রহ্ম ৩৪২, ৪৩৪
পূর্ণমানব (অল-ইন-সান-উল-কামেল) ৫৫, ২৮৩, ৩০৫, ৩৩৯, ৪৯৮
পূর্ণমানববাদ ৪৯৩
পূর্ণানন্দ স্বামী ৭২, ৩৩৯, ৪৪৩, ৪৬৩
পূর্ণিমা (অনেক ক্ষেত্রে প্রেম-অর্থে) ৩৯১
পূর্ণিমার যোগ (প্রকৃতির কারণ-প্রবৃত্তির সময়) ৩৯১, ৩৯২
পূর্বী প্রাকৃত ১৪৯
পূর্ববঙ্গ ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৯, ২০২, ২১৮, ২৪৭, ২৫০, ২৫৪, ২৯৪, ৩০৮
২১০
পূষা (নাড়ী) ৪৪৪
পৃথিবী-তত্ত্ব ৩৬৫
পৃথিবীর পঞ্চগুণ ৩৩১
পৃথ্বীতত্ত্ব ৪২০
পৃথ্বীবীজ 'লং' ৪৪৭
পেরাম্বুকুলম্‌ ১৫৪
পোকর্ণ গ্রাম ১৯৭
পোংড়বর্ধনীয়া (পুণ্ড্রবর্ধনীয়) ১৯১
পোদো (পদ্মলোচন) ১০৫, ১০৬, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ২৯৫, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৯২, ৪৩১
পোরষা গ্রাম (দিনাজপুর) ২১৫
পো-লো-হো (বরাহ) বিহার ২০৪
পো-সি-পো বিহার
'পোস্ট-চৈতন্য সহজিয়া কাল্ট' ('Post-Caitanya Sahajia Cult'—M. M. Basu). ৫৪, ৫৭
পৌণ্ড্রক ১৫১
পৌরাণিক তান্ত্রিক ধর্ম ২০৫, ২২১
পৌরাণিক ধর্ম ৩২, ১৯৬
পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ২১২
প্রকৃতি , ২৮৮, ২৮৯, ৩৭২, ৩৮৫, ৩৯৬, ০, ৪১২, ৪১৩, ৪২১, ৪৬৩, ৪৮০
৩১২
প্রকৃতি-পুরুষ ৩৪, ৮৭, ১২৭, ২৩১, ২৪৮, ২৫৭, ২৬৩, ২৮৪, ২৮৬, ৩৭২, ৩৭৬, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৯৬, ৪০৫, ৪১০, ৪২১, ৪৩১, ৪৮০
প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব ৪০, ২৫৭, ২৮৫, ৩৫৮, ৩৬৫, ৩৮১
প্রকৃতি-পুরুষবাদ ২৫৬, ২৬৩, ২৮৮
প্রকৃতি-পুরুষ-মিথুন ৩৭৩
প্রকৃতি-পুরুষ-মিলন ৪৪, ৪৫, ৮২, ৯৪, ২৬১, ৩৭৫, ৩৭৬, ৪৭৩, ৪৭৪
প্রকৃতি-পুরুষের 'রূপ'-মিলন ৩৬৫
প্রকৃতি-পুরুষের শৃঙ্গার ৩৮৫
প্রকৃতি-বর্জিত যোগ-সাধনা ২৯০, ৪৭৪, ৪৮১
প্রকৃতি-ভজন ৮৫
প্রকৃতি-মিলন ৪৫৫
প্রকৃতি-শক্তি ৪১০
প্রকৃতি-সংস্রব,-সংযোগ ৪১৮, ৪৬৯
প্রকৃতি-সঙ্গ ৬০, ৮৫, ২৯৩, ৪৫৬
প্রকৃতি-সত্তা (রজঃ) ৩৭২, ৩৮৮, ৪২২
প্রকৃতি-সাধন,-সাধনা ৮১, ৪০৭, ৪০৮, ৪৫৪, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭৭
প্রকৃতি-সেবা ৮৪, ৮৫
প্রকৃতি-স্বরূপ ৯৭
প্রগলভা ২৫
প্রজ্ঞা ২৩১, ২৩৩, ৪৫২, ৪৬৪, ৪৭৩

প্রজ্ঞা (সুষুম্না, দেবী, নৈরাত্মা, যোগিনী বা সহজসুন্দরী নাড়ী) ৪৫২
প্রজ্ঞা-উপায় (শূন্যতা ও করুণা) ৮৬, ২৩১, ২৩২, ২৩৪, ২৬৩, ২৭৬, ২৮৫
প্রজ্ঞা-উপায়বাদ ৩১, ১২৭
প্রজ্ঞা-উপায়-মিলন ২৫৮, ২৮৮, ৩৫৩, ৪৬৪, ৪৬৭, ৪৭৩
প্রজ্ঞাপারমিতা (দেবী) ২২১, ২৩১, ২৩২, ২৩৩
প্রজ্ঞাপারমিতা, অষ্টসাহস্রিক (বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ) ২২১
প্রজ্ঞাপারমিতা-ধারণী,-মন্ত্র ২২১
'প্রজ্ঞা-পারমিতা-হৃদয়সূত্র' ২২১
প্রজ্ঞা-রূপিণী ললনা নাড়ী ৪৫০
'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' ৩২, ২৩১, ৩১৮, ৩১৯
প্রণব ২১৯
প্রতিদপ ৪০১
প্রতিলোম-গতি ৩৪০
প্রতিষ্ঠানপুর ২০
প্রতীক-তৃষ্ণা ২৫৬
প্রদ্যুম্নেশ্বর ১৯৭, ২০৩, ২৪৬
প্রবর্ত ৬৯, ৯১, ১১১, ৪০৫, ৪৭৯
'প্রবাসী' (মাসিক পত্র) ১০, ২৯, ৭০
প্রবৃত্তি, অন্তর্মুখী (ইড়া বা গঙ্গা) ৯৮
প্রবৃত্তি, বহির্মুখী (পিঙ্গলা বা যমুনা) ৯৯
প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর ৩৪, ৪২, ২০৮, ২২৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৫৭, ২৫৯
প্রভাকরবর্ধন ২০১
প্রভাবতী (দেবখড়্গ-মহিষী) ২১৭
প্রয়াগ ১৮৮
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অধ্যাপক ১৫৩
'প্রসিডিংস অব্ দি ইণ্ডিয়ান সায়েন্সকংগ্রেস, ১৯৩৬' ('Proceedings of the Indian Science Congress, 1936') ১৫৫
প্রশ্ন-উপনিষদ ১৪০
প্রাকৃত (ভাষা) ১০৮, ১১০
প্রাকৃত দেহ ৩৫৫
প্রাণবায়ু, প্রাণাপানবায়ু ৪৭১, ৪৭৫
প্রাণায়াম ৪০৯, ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৭৪
'প্রাকৃতপ্রকাশ' ৪১
প্রাচ্যরাষ্ট্র ১৫১, ১৫২
'প্রাণতোষিণী' ৩৩৩
প্রাণবহা নাড়ী ৪৬৬
'প্রাসিয়ই' : Prasioi (প্রাচ্য) ১২১
'প্রি-এরিয়ান অ্যাণ্ড প্রি-ড্রাভিডিয়ান ইন ইণ্ডিয়া' ('Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India'—Sylvan Levy) ১৯০
প্রেমচাঁদ বাউল (শ্রীকাঙ্গাল) ৪২, ৬০
প্রেমতত্ত্ব ৯৭
প্রেমতলীর মেলা ৬২
প্রেমধর্ম ২৮৯
প্রেমনগর ৩৪৭
'প্রেমবিলাস' (সহজিয়া-পুঁথি) ১২, ৩৫৯, ৪১০
প্রেমরস (বাউল-সাধনার অঙ্গবিশেষ) ১১৮
প্রেমাচার ৪২২
'প্রেমানন্দ লহরী' (সহজিয়া-পুঁথি) ৭০, ৪১০
প্রেমাশ্রয় (প্রকৃতি-সাধনের পর্যায়বিশেষ) ৮১
প্রোষিতভর্তৃকা ২৫, ৩৯

ফকির আউলচাঁদ
ফকির ঠাকুর ৬২
ফতেপুর সিক্রী ১৩৮, ১৪৩
ফতেয়াবাদ মুলুক (সরকার) ২৭০
ফরিদপুর (জেলা) ১০৭, ৩০৭, ৪৩৩
ফরিদুদ্দিন আৎতার ৪৮৮, ৪৯০
ফসেট ১০৩
ফাদার হেরাস (Father Heras) ১৬৩, ১৬৪

ফানা (সমাধি) ৫৫, ৪৮২, ৪৯৬, ৪৯৭, ৫০৩
ফানা-অবস্থা ১০২, ৪৮২
ফারসী ২৬৮
'ফাসাস্-উল-হিকম'—আরবী ৪৯৪
ফা-হিয়েন ১৮৭, ২০২
ফুলের সাধন ৩৬৫
ফুল্লশ্রী গ্রাম (ফতেয়াবাদ সরকার) ২৭০
ফুল্লহরি বিহার ২৪২
'ফ্যালিক ওয়ারশিপ' ('Phallic Worship'—George Ryley) ১৬৭
ফ্লীট (Fleet) ২০০

ব

'বক্রোক্তিজীবিত' (অলংকারগ্রন্থ— কুন্তক) ২১
বঙ্কনাল (বাঁকানল) ৩৪৫
বখ্ত্-ইয়ার খিলিজী (বক্তিয়ার) ১৮৮, ২৫৪
বগুড়া জেলা ১৪৯, ১৯৩, ১৯৭, ২০১
বঙ্গ ১৯০
'বঙ্গবীণা' ৪৭, ৮১
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'— ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ২৭০, ২৭১
বঙ্গমগধাঃ ১৪৯, ২৪১
বঙ্গরাজ ১৫০
'বঙ্গশ্রী' (মাসিক পত্র) ২৯
'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়'—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ৫৪
বঙ্গাবগধাঃ ১৪৯
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ৯, ২৯
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্-গ্রন্থাগার ৬০, ২৮৯
বঙ্গে সুফীপ্রভাব ১২৮
ভূমি ১৫০
২৯
বজ্র (বৌদ্ধতন্ত্রের উপায়রূপী পুরুষ) ২৩২, ৪৭৪
বজ্র (বজ্রযানীদের শূন্যতা) ২২৪, ৪৭৪
বজ্র-কমল-সংযোগ (প্রজ্ঞা- ২৩২, ৪৭২
বজ্রকায় (বজ্রযানে বজ্রকায়, পরে সহজযানে সহজকায়-রূপে পরিণত মহাযানের ত্রিকায়বাদের ধর্মকায় ২২৮
বজ্রকায়া (বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞা-রূপিণী প্রজ্ঞাপারমিতা-স্বরূপা নারী) ২৩২
৪৭৩
২৩০
বজ্রধর (সিদ্ধগুরু) ২৬২
বজ্রধাত্বীশ্বরী (বজ্রযানে বজ্রসত্ত্বের বা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ বা পঞ্চতথাগতের অন্যতম রূপ বৈরোচনের শক্তি) ৩০, ২২৮, ২৩১, ২৩৩
বজ্র-নাড়ী ৪৪৪
বজ্রপথ ২৬২
২৬০
বজ্রপাণি (বোধিসত্ত্ব) ২২০ ২২৮
বজ্রবারাহী (বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধরের শক্তি) ২৩১, ২৩৩
বজ্রযান ১৭০, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২৩০, ২৩৩, ২৩৮, ২৯০, ৪৭৪
বজ্রযানতন্ত্রাবলী ২২৫ ২২৬
বজ্রযান-বৌদ্ধধর্ম ২৫৫, ২৫৬, ২৬০, ২৮৩ ৩৫২
বজ্রযানী (বৌদ্ধ) ২২৪, ২২৫, ২৫৫, ৩৫২
২২৬
বজ্রযোগিনী (ঢাকা) ২২৯
৩০, ৩১, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩৪, ২৬২, ২৭৬, ২৮৩, ৩১৯, ৩৫২, ৪৬৯
বজ্রসত্ত্ব-রূপী বোধিচিত্ত ২৩৪
২৩১, ২৩৩
২৪২
১৩০
বজ্রেশ্বরী (বজ্রসত্ত্বের প্রকৃতি) ২৯, ৩০, ৩১
বজ্রোলী মুদ্রা ৪১১, ৪১৮, ৪১৯

বজ্রোলী সিদ্ধি ৪১৯
বটগোহালী (পাহাড়পুর-সংলগ্ন স্থান) ১৯১
বটুকভৈরব (শিব) ১৯৮
বড়াই ৩১
বড়ু চণ্ডীদাস ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৫
বত্রিশ কোঠা ৮৭
বত্রিশদল পদ্ম ৩৫১
বদায়ুনী ১৩৮, ১৩৯
বনদুর্গা ২৬৪
বনদুর্গা, শাখোটবাসিনী ২৭৪
বনমালী বাউল ১০৭
বরাড়ী (চর্যাপদের রাগিণী বিশেষ) ১৩০
'বরাহপুরাণ' ১৯
বরিশাল জেলা ১৯৮, ২২৯
বরুণ ১৪৮
বরুণচক্র ৪৩৯
বরুণ-বীজ 'বং' ৪৩৯
বরুণের মণ্ডল ৪৩৯
বরুণাস্থি ভাবা ১৫৮
বরেন্দ্র ২০৮
বরেন্দ্রভূমি ২৭৮
'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিস্ মনোগ্রাফ্স্' ('Varendra Research Society's Monographs') ২৩০
বর্জক, বর্জোক ৫১৫, ৫১৬
বর্ত্তমান ৮২, ১২২, ৩২৩, ৪৭৬, ৪৭৯, ৫১২
বর্ধমান (জেলা) ৭৩, ৭৪, ১০৬, ২১৬, ৩২৬, ৩৭০, ৩৭১, ৩৮০
বর্মন-রাজবংশ ১৮৮, ২৪৮
বলধারণরাত্ত ১৮৪
বলবন ২৫৪
বলাইধাপ স্তূপ ৩০
বলিরাজা ২১৪
বল্লভাচার্য ২৮৫
বল্লাল সেন ১৮৮, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৯, ২৫৫
বশিষ্ঠ মুনি ৪৬৫
বশীকরণ ২৯৮
বশীরহাট (বসিরহাট) ৫৮
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পণ্ডিত ৫, ৬, ৭, ৮, ২৯, ৩৫
বস্থ (তান্ত্রিক ব্যাখ্যা-সম্মত) ৩৭৮
বসু, এন. (N. Basu) ২৩৬
বসুধা (নিত্যানন্দ-পত্নী) ৪৭৮
বসুবন্ধু ২২৪, ২২৫
বস্তুলিঙ্গ ১৯৯
'বহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' ২৫২
বহির্জীবন ৫০
বহ্নিবীজ ৪৪০
বাইসরী ২১
বাউরা ৪৭
বাউল উপাসক-সম্প্রদায় ৫৬, ৬৯
বাউল-উপাসনা ৮৪
বাউলধর্ম ১২৬, ১৪৪, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৯, ২৯০, ২৯৬, ৩০৩, ৩১২, ৩২২, ৩২৫, ৩২৭, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৮, ৩৭১, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৮২, ৪৮৩, ৫১৭
বাউলধর্ম-সাধন ৭১
বাউল-পন্থ ৪২৬
বাউল-পন্থী ২৮২
বাউল-ভজন ৪৪, ৮৫, ৩৭৬
বাউল-মতবাদ ৭০
বাউল-মার্গ ২৬০
'বাউল'-শব্দের অর্থ ৪, ৪০, ৪৬, ৪৭
বাউল-সাধনা ৩৫৭, ৩৬৮, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৮৮, ৪০৯, ৪১৭, ৪১৮, ৪৩৮, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭৪

বাউল-সাধনতত্ত্ব ৩০১
বাউল-সাধনা ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২
বাউল-সাহিত্য ৩৭৭
বাক্ ১৭১
বাঁকানল ৩৪৫, ৩৪৬
বাঁকুড়া ৬, ২৯, ৭৩, ৭৪, ১০৬, ১২৬, ২১৫, ৩৭০
বাকা (ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ) ৪৯৬, ৫০০
বাখরগঞ্জ ২২৯
বাগড়ি ১৮৮
বাগদাদ ৪৮৫
বাগম্ভৃণী ১৭১
২১, ৩০, ৩১
'বাঙালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'— ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৬১
'বাঙালীর ইতিহাস'— ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ৪৩, ১৫৩, ১৫৭, ১৮০
বাঙ্গক (বঙ্গদেশীয় ক্ষৌমবস্ত্র) ১৫১
বাঙ্গালাদেশ (অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়জাতি-অধ্যুষিত) ১৬০
'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' —ডাঃ সুকুমার সেন ১২, ১৪, ২৭০
'বাঙ্গালার ইতিহাস'—রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৬, ২৬৯
'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম'— শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত ৩০, ৩১, ২২৮, ২৪৩, ২৪৪
বাজপেয় যাগ ১৭৬
বাজসনেয়ী শাখা (যজুর্বেদ) ১২৫
বাজসরী ২৯
বাজসলী ২৯
বাণগড় তাম্রশাসন ২১৩
বাণ (শিবলিঙ্গ) ৪৪০
বাণ ৪১০, ৪৮০
বাণ-ক্রিয়া ৪১০
বাণভট্ট ২০, ২৯৬
বাণ-লিঙ্গ ৪৪৮
বাণ-শিক্ষা ৩৯৯, ৪১৫, ৪১৮
বাণ-সাধনা ৪১১, ৪২৩
বাৎসল্য ২৯৩, ৩৭৭
বাতিন, বাতন ৪৯১, ৫১২
বাতুল ৪৬, ৪৭
বাদাল গরুড়স্তম্ভ-লিপি ২১৩, ২১৭
বাবিল (জাতি) ১৫৭
বাবুবাগান (ঢাকুরিয়া) ৪৮১
বামদেব্যসাম ১৭৬
বামদেব্যসামোপাসনা ১৭৬
বামা ক্ষেপা ৪৬৪
বামাচার ২০৮, ৪৫৩
বামাচারী ২৯৮
বায়াজিদ্-অল্-বিস্তামী, সুফী ৩৫২, ৪৮৮, ৪৯৯
বায়ু-ক্রিয়া ৪৪৩
বায়ুপুরাণ ১৯
বায়ু-বীজ 'যং' ৪৪০, ৪৪৮
বায়ুর দশগুণ ৩৩২
৩৩১
বায়ু-রূপ হংস ৪৭৫
বারলক্ষ (মধ্যবঙ্গ) ২৬৮
বারাকপুর ৬১
বারাকপুর তাম্রশাসন ২৪৬
বারাণসী ১৮৮
বারাম ৪৩৪, ৫০৫
বারামখানা ৪২২
বারাসত ৫৮
বারাহী (মাতৃকামূর্তি) ২১৫
বারাহী দেবী ৩৫২
২৫৯, ৪৪৪, ৪৬৫
বাঁশফোঁড় ১৫৫
বাশুলী ৩০
বাসকসজ্জা

বাসরী ২৯
বাসলী ৯, ১৩, ১৪, ২৮, ২৯, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭
বাসলী-মূর্তি ২৯
বাসিরী ৩০
বাসুলী ২৯, ২৭২
বাসুদেব (কৃষ্ণ) ১৩৫
বসুদেব, পুণ্ড্র রাজ ১৫০
বাসুদেব (পূর্ববঙ্গের দেব-রাজবংশ) ১৮৯
বাহ্বৃচ্য শাখা (ঋগ্বেদ) ১৯৪
বিকল্পজাল ৮৬
বিক্রমপুর ১৮৯, ২৪২
বিক্রমপুরী বিহার ২৪১, ২৪২
বিক্রমশীল দেব ২৪১
বিক্রমশীল বিহার বা বিক্রমশীল দেব মহাবিহার (মগধ) ১২৮, ২৪০, ২৪১
বিক্রমাদিত্য ২১৪
বিগ্রহপাল, ১ম ২১৬, ২১৭
বিগ্রহপাল, ৩য় ২১৩, ২১৬, ২১৭
বিচিত্র (মুহূর্ত) ৪৫১, ৪৬৯
বিজয়গুপ্ত ১৩৭, ২৭০
'বিজয়তন্ত্র' ৪৬১
বিজয়সেন ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭
বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা ২২৪
বিজ্ঞান ৪৫০
বিজ্ঞানবাদ ২০৯, ২২৪, ২২৫, ২৩৩
বিজ্ঞানবাদী ৩৫৩
বিতল ৩৩২
বিদ্‌-আৎ (বেদাতী) ৫৩
'বিদগ্ধ মাধব' ২৮৭
বিদিশা ১৩৫
'বিদ্যাধর পিটক' ১৮৭
বিদ্যানিধি মহাশয় (যোগেশচন্দ্র রায়) ১০
বিদ্যাপতি ১২, ১৩, ১৫, ৩৫৬, ৩৬১, ৪৭৮, ৪৭৯
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর ৩১, ২২১, ২২২, ২২৯
বিন্দু ৮৮, ৩০৭, ৩৯৪, ৩৯৮, ৪১০, ৪১২, ৪১৫, ৪১৯, ৪৩৫, ৪৫২, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭৪
বিন্দু-গ্রহণ ৩৯৬, ৩৯৭
বিন্দু-রূপী ব্রহ্ম ৩৪৩
বিন্দুরূপী 'ম'-কার ৪৪১
বিন্দু-সিদ্ধি ২৬১, ২৬২
বিন্দু-স্থান ২৫৮, ৪৩৮
বিন্দু-স্থৈর্য ৮৬, ২৬১, ৪০৯, ৪৬৪, ৪৬৯
বিন্ধ্যপর্বত ১৪৯, ১৬০
বিপাক (মুহূর্ত) ৪৫১, ৪৬৯
বিপরীত বিহার ৪২২
বিপরীতরতাতুরাং ৮৫
বিপ্রলব্ধা ২৫
'বিবর্তবিলাস' ৭০, ২৮৯, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৭০, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮২, ৩৮৭, ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৫, ৪২১, ৪২৩, ৪৭৭
বিবর্ত-লীলা ৪৩৭
বিমর্দ (মুহূর্ত) ৪৫১, ৪৬৯
'বিমলপ্রভা' ১০১, ২৩৪, ২৩৫
বিমানবিহারী মজুমদার ৬
বিরজাশঙ্কর গুহ, ডক্টর ১৫৫
বিরমানন্দ ২৬১, ৪৫১, ৪৬৯
বিরহিণী ২৫
বিরূপ (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ১৩০, ২৪৩
'বিরূপ-গীতিকা'—বিরূপ ১৩০
'বিরূপবজ্র-গীতিকা'—বিরূপ ১৩০
বিরূপাক্ষ (শিব) ১৯৮
বিলক্ষণ (মুহূর্ত) ৪৫১, ৪৬৯
বিলাস ৪৩৭
বিলাস দেবী ২৪৬
বিল্বমঙ্গল ২৬২

বিশা ভুঁইমালী ১০১
বিশালাক্ষী ২৮
বিশুদ্ধচক্র (ষোড়শ দল), বিশুদ্ধপদ্ম ৩৪৪, ৪৩১, ৪৪১, ৪৪৮
বিশ্বকোষ ৪৩
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৭
বিশ্বপদ্ম ৪৫০
বিশ্বপাণি (বোধিসত্ত্ব) ২২৮
'বিশ্বভারতী পত্রিকা' ৬, ৭২, ৭৩
বিশ্বরূপ সেন ২৫০
বিশ্বলীনতা ৪৮৮
'বিশ্বসারতন্ত্র' ৩১৬
বিশ্বাত্মবাদ ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৭
বিশ্বাত্মবাদী ৩৫৩, ৪৯৩, ৪৯৭, ৫০০
বিশ্বানুভূতি ৪৯১
বিশ্বামিত্র ১৪৮
বিশ্বোদরী নাড়ী ৪৪৪
"বিষ ত্যজি' সুধা খাওয়া" ৬৯
বিষহরি (বিষধারিকা) ২৭২
বিষের নদী ৪৩২
বিষ্ণু ১৮, ১৯৬, ১৯৭, ৩৫১, ৪০০
বিষ্ণুগ্রন্থি ৪৪৮
বিষ্ণুচক্র ১৯৬
বিষ্ণুপুর ৭৩, ৭৪, ১০৬
বিষ্ণুপুরাণ ৮, ১৭, ২৪৯, ৩৩৩
বিষ্ণু-পূজা ১৯৬
বিষ্ণু-বুদ্ধ-কল্পনা ২২৯
বিষ্ণু-মন্দির ২০৩
বিষ্ণু-মূর্তি ১৯৮ ২২৯
বিষ্ণু-লক্ষ্মী ৩১, ২০৮, ২১৪
বিসর্গ-শক্তি ৪৪২
বিসা-মারণ ৪২৮
বীণপাদ ২৪৩
বীজ ১৮৫, ৩৬৭, ৪১৩, ৪১৯, ৪২২, ৪২৯, ৪৭২
বীজক ৫১৮
বীজমন্ত্র ২২১, ৪০৮, ৪২৫, ৪২৬
বীজ-মার্গী ৪২৮
বীজরূপী ঈশ্বর (কৃষ্ণ) ৩৮৮, ৪০৯
বীজ-সত্তা ৩৮৮
বীভৎস রস ৩৭৭
বীরবল, রাজা ১৩৮
বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র (নিত্যানন্দ-পুত্র) ৪৪, ৫১, ৩৫৬, ৩৭৬
বীরভূম ৬, ২৯, ৬২, ১৫৩, ৩৭০
বীররস ৩৭৭
বীরশৈব ১৬৪
বীরাচার ৪৫৩
বীরাবধূত ৪৩
বীল, এস. (S. Beal) ২০৩
বুদ্ধগুপ্ত ১৯৪
বুদ্ধ-জ্ঞানপাদ ২৪৪
বুদ্ধত্ব ২৬২
বুদ্ধদেব, বুদ্ধ ১৩৬, ১৯০, ২১৬, ৩৩৫, ৪২৯
বুদ্ধমূর্তি ২২০
'বুদ্ধিস্ট আইকনোগ্রাফি' ('Buddhist Iconography' —Dr. B. Bhattacharya) ২২৯
'বুদ্ধিজ্‌ম্‌ ইন টিবেট' ('Buddhism in Tibet' —E. Schlaginweit) ২৩৭
'বুদ্ধিস্ট রেকর্ডস্‌ অব্‌ দি ওয়েস্টার্ণ ওয়ার্ল্ড' ('Buddhist Records of the Western World'—S. Beal) ২০৩
'বুদ্ধিস্ট সারভাইভ্যালস্‌ ইন্‌ বেঙ্গল' ('Buddhist Survivals in Bengal' —Dr. S. K. Chattejee) ২৬৫
বৃন্দাবন ৩৬, ২৮০, ৩৮১, ৪৭৬, ৪৭৭
বৃন্দাবন দাস ৩৭, ৪২, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ২৮০

বৃন্দাবন-ধাম ৩৪৬, ৩৮১
বৃন্দাবন-লীলা ৬০, ২৬২, ৩৪২
'বৃহৎ দেহনির্ণয়' (পুঁথি) ৩৭১, ৩৭৬
'বৃহৎনিগম' (পুঁথি) ৩৭১, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৫, ৪০৫, ৪১৩
'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী' ১২, ১৭
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১৪৭, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৮২ ৩৫৭
বে-কালমা ৫১০, ৫১১
'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার (নদীয়া)' : 'Bengal District Gazetteer (Nadia)' ৬৫
বেজখণ্ড গ্রাম (কুমিল্লা) ৩৪
বেণীমাধব বড়ুয়া, ডক্টর ১৯৩
'বেণীসংহার' ২৫
বেতনা গ্রাম (দিনাজপুর) ২১৫, ২১৬
বেতালবন গ্রাম (বর্ধমান) ৭৩, ১০৬, ১০৮, ৩৮০
বেদ ১৪৫, ১৪৭, ১৫৫, ১৮৪, ২৫৭, ৩১৩, ৩৪২, ৫২১
বেদ-বহির্ভূত ধর্ম ২৯১
বেদ-বিধি ২৯১
বেদ-বিধি-পার ৮৭
বেদ-বেদান্ত ৩৪১
বেদব্যাস ২১৭
বেদাতী ৫৩
বেদাতী ফকির ৫০, ৫৩
বেদান্ত ১৪১
বেদান্ত-দর্শন ২৩১, ২৩২, ৪৮৬
বেদের আচার ৪৯, ২৯১
বেদের ধর্ম ৩১৪
বেদোত্তম ('পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্য'-প্রণেতা) ২৯৭
বেদের পার ৩৪৬
বেলাব তাম্রশাসন ২৪৫
বেলাব-লিপি ২৪৬, ২৪৮
বেলুচিস্থান ১৬০
বেশরা ফকির ৫০, ২০৬, ২৮৩, ২৮৪
বেসনগর (প্রাচীন বিদিশা) ১৩৫, ১৯৫
বৈকুণ্ঠ ৩৭১
বৈগ্রাম তাম্রশাসন ১৯৭
বৈদিক দেব-দেবী ২১১
বৈদিক ধর্ম ২৯৬
বৈদ্য ১৫৬
বৈদ্যদেব (কুমারপালের মন্ত্রী) ২১৮
বৈধী জ্বালা ২৯৪
বৈধী ভক্তি ৩০০, ৪০৭
বৈন্য গুপ্ত ১৯৯, ২০২ ২০৩, ২০৫, ২৪৪
বৈভাষিকগণ ২২৪
বৈরহাট্টা (দিনাজপুর) ২১৬
বৈরোচন ২২৭, ২২৮, ২২৯
বৈরোচন-বজ্রধাত্বীশ্বরী বা তারা (পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম বুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি) ২২৭ ২২৮
বৈষ্ণব গোস্বামিগণ ১২৯, ২৬২, ২৮০, ২৮৭, ২৮৮
বৈষ্ণবতোষণী টীকা ১৭
বৈষ্ণবধর্ম ১২৭, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮
বৈষ্ণব পদাবলী-কীর্তন ১৩১
বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য ২৪
বৈষ্ণব বাউল (রসিক বৈষ্ণব) ৪০৫
বৈষ্ণব যুগল-সাধনা ২৭৪
বৈষ্ণব সহজ-সাধনা ১২৭. ৩০২
বৈষ্ণব সহজিয়া ১২৭, ২৬৩, ২৭৬, ৩০৫, ৩৫৮, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৭১
বৈষ্ণব সহজিয়া-তত্ত্ব ৪, ১২৬
বৈষ্ণব সহজিয়াধর্ম ৩৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৯০, ৩৫৬, ৩৭৯
বৈষ্ণব সহজিয়া-মতবাদ ৩৭১
বৈষ্ণব সহজিয়া-সম্প্রদায় ২৮৪, ২৮৮, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩৩৬

বৈষ্ণব সহজিয়া-সাধনা ৩৫৭
বৈষ্ণব সহজিয়া-সাধনাঙ্গ ৩৫৬
বৈষ্ণব সহজিয়া-সাহিত্য ২৯০, ৩৩৬, ৩৭৭
বৈষ্ণব সাহিত্য ১২, ২৬৮
'বৈষ্ণবিজ্‌ম্‌, শৈবিজ্‌ম্‌ অ্যাণ্ড মাইনর রিলিজিয়াস্‌ সিস্টেম্‌স্‌' ('Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems'—R. G. Bhandarkar) ১৭১, ১৯৫, ২০০
বৈষ্ণবী (মাতৃকামূর্তি) ২১৫
বোখাজ-কুই (পশ্চিম এশিয়া) ১৪৮
বোধায়ন ধর্মসূত্র ১৪৯, ১৭৭, ১৭৯
'বোধিচর্যাবতার' ৮
বোধিচিত্ত ৮৬, ২২৬, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫ ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৮৩, ৩৫২, ৪২৯, ৪৫০, ৪৫২, ৪৬৫, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৩
বোধিচিত্ত-স্বভাব ৩৫১
বোধিদেব, 'তত্ত্ববোধভূ' (রামপালের মন্ত্রী) ২১৮
বোধিমণ্ডল ৩৫১
বোধিমণ্ডল-স্বভাব ৩৫১
বোধিসত্ত্ব ৩০, ১৩৬, ২০৫, ২১৯, ২২১, ২২৮, ২৫৬
বোধিসত্ত্ববাদ ২১৯
'বৌদ্ধগান ও দোহা'—মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৪০, ২৩৮, ২৩৯, ১৯০, ২৫৭, ৪৬৫
বৌদ্ধতন্ত্র ৩১, ১৩০. ১৮৭, ২২০, ২২৮, ২৩১, ২৩২, ২৩৬, ২৪০, ২৪২, ৩১৩, ৩১৮, ৩২৯, ৩৩৬. ৩৩৯. ৩৪৮, ৩৫১, ৪২৯, ৪৩৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২. ৪৬০ ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭২, ৫১৭
বৌদ্ধতন্ত্র-সাধক ৪৭
বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনা ৩৫৭, ৩৫৮, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৪
বৌদ্ধ তান্ত্রিক ১৭৪, ২১১, ২১২, ২৫৯, ২৬৩, ৩৫৮, ৪২৯, ৪৬৭, ৪৮২
বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা ২১০, ২৫৬
বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম ২৬৩, ২৬৫, ৩০৩
বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া ২৯৬, ২৯৯, ৩৩৬
বৌদ্ধ দর্শন ২২২, ৪৭০
বৌদ্ধ দেব-দেবী ২৪৫, ২৩৯
বৌদ্ধধর্ম ১২৭, ১৭০, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ২০৫, ২১০, ২১২, ২১৬, ২১৮ ২১৯, ২২০, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২৪০, ২৪৪, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৭, ২৭৬
'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য'—ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ২২৪, ২৩৫, ২৩৮
'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস'-তারনাথ ('History of Buddhism in India'—Taranath.) ২৪১
বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক রূপান্তর ২২৩
বৌদ্ধ বিহার ১৯৪, ২৫৫
বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায় ২৬০
বৌদ্ধ যোগমার্গী ৪১
বৌদ্ধ শ্রমণ ৫০, ২৪৯
বৌদ্ধ সংগীতি ১৩৬
বৌদ্ধ সংঘারাম ৩৩, ২০২
বৌদ্ধ সরস্বতী ৩১
বৌদ্ধ সহজ-সাধনা ২৭৪, ৩০২
বৌদ্ধ সহজিয়া ৮৬, ৮৭, ৮৯, ১২৭, ১৩০, ২৫৮, ২৫৯, ২৬২, ২৭৬, ২৭৭, ৩০০, ৩২২, ৩৭১, ৪৮২, ৫১৭
বৌদ্ধ সহজিয়া-গ্রন্থ
বৌদ্ধ সহজিয়া-ধর্ম ৩৭৯
বৌদ্ধ সহজিয়া-মত ৩৭, ৫১, ১২৯
বৌদ্ধ সহজিয়া-সম্প্রদায় ২৮৮, ৩০০, ৩১৯

বৌদ্ধ সহজিয়া-সাধনা ২৫৮, ২৮২, ২৮৯, ৩৫৭, ৪৬৫

বৌদ্ধ সাধনা ২৫৮, ৪৬৯

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ৪৩, ৪৪, ২৩৫, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৯

বৌদ্ধাচার্য (তান্ত্রিক) ৪২, ২০৯, ২২১, ২৪২, ২৪৪

'ব্যাখ্যা বৃহস্পতি'—বৃহস্পতি মিশ্র ২৬৭

ব্যাধ ১৩৪

ব্যাবিলনীয় ১৬০

ব্যোমতত্ত্ব ৪৪৮

ব্যোম-বীজ 'হং' ৪৪১

২৫

'ব্রজ-উপাসনা' ২৮৯

'ব্রজ-উপাসনা ও পৌর্ণমাসীর গুপ্তকথা'—শ্রীকাঙাল প্রেমচাঁদ বাউল কর্তৃক প্রকাশিত ৪৫, ৬০

ব্রজ-গোপী ২৮৭

ব্রজপুর ৩৬৬

ব্রজবুলি ১১

ব্রজ-লীলা ১৬

ব্রহ্ম ২৫৩, ৩৪২, ৫১৯

ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় ১৮৮

ব্রহ্মগ্রন্থি ৪৪৭, ৪৪৮

ব্রহ্মজ্ঞান ৩১৪

ব্রহ্মদেশ ১৫৮

ব্রহ্মনাড়ী (সুষুম্না : মধ্যপথ) ২৬১, ২৬২, ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৪৬

ব্রহ্মপথ ৪৪৪, ৪৪৬

ব্রহ্মপুর ৩৪৯

ব্রহ্মবিদ্যা ৩১৪

ব্রহ্ম-বিবর ৪৪৪

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' ১৮

ব্রহ্মশ্রুতি (বেদ) ২৯৭

ব্রহ্মসংকোচ ১০১

ব্রহ্ম-সাযুজ্য ৪১৭

ব্রহ্ম-স্থিতি ৫

ব্রহ্মা ৬৯, ২৯৯, ৩৯৪, ৫

ব্রহ্মানন্দ গিরি ৫

ব্রহ্মাবধূত

ব্রাউন, ই. জি. (E. G. Browne: 'The Literary History of Persia') ২৮৩, ৪৮৩, ৪৮৭

ব্রাত্য (পতিত) ৯৫

ব্রাত্য (অথর্ববেদোক্ত সম্প্রদায় বিশেষ) ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০

ব্রাত্যখণ্ড ১৭৮

ব্রাত্যস্তোম ১৭৮

ব্রাহুই জাতি (বেলুচিস্থান) ১৬০

ব্রাহ্মণ ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৬ ২৭২

'ব্রাহ্মণসর্বস্ব'—হলায়ুধ ২৪৬, ২৭৩

ব্রাহ্মণী (মাতৃকামূর্তি) ২১৫

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ১৮৫, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৮, ২৪৪, ২৪৮, ২৫৭, ২৫৯

ব্রাহ্মসমাজ ৯৪, ২৯৬, ২৯৯

ব্রাহ্মী অক্ষর ১৪৯

ব্রাহ্মী স্থিতি ৩২৯

ব্লুমফিল্ড (Bloomfield : 'The Religion of the Vedas') ১৪৫

ভক্তিবাদ ১৯৫, ৪৭৯

ভগবতী ২৩২, ২৩৪

২৩৪

দীক্ষিত ('তন্ত্রাধিকার-নির্ণয়'-প্রণেতা) ২৯৭

ভট্ট নারায়ণ ২০, ২১

ভট্ট ভবদেব ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৬৭

ভদ্রবাহু ১৯১

ভন্ নোয়ার (Von Noer) ১৩৯

ভবদেব ভট্ট ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৬৭
ভবনাথ, মহাসামন্ত ১৮৪
ভবভূতি ৩৮
ভবা (বাউল) ৪৩৬
ভয়ানক রস ৩৭৭
ভাগবতকার ১৭, ১৮
ভাগবত-ধর্ম ১৯৫
ভাগবত-পুরাণ ১৬, ২৬২, ২৭০, ২৭১
ভাগবত-মত ২৭৪
ভাগলপুর তাম্রশাসন ২১৪
ভাগ্যদেবী (রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যা) ২১৬, ২১৭
ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ ১০১, ২৯১, ৩২৩, ৩২৯
ভাণ্ডারকর (R. G. Bhandarkar) ১৭১, ১৯৫, ২০৫
'ভাণ্ডারকর ভল্যুম' ('D. R. Bhandarkar Valume') ১৬৫
ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ৩৫৭, ৪৬৩
ভাদেপাদ (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৪৩
ভাব-দেহ ৩৭৭
ভাবযোগ্য ৪২৫
ভাব-রস ১১৮
ভাব-সাধনা ৪২৫
ভাবাশ্রয় ৪০৭, ৪০৮
'ভাবের গীত'—লালশশী ৬৯
ভাবের মানুষ ৪৮, ৯১, ৩৪০, ৩৫৫, ৪২২
ভাবোন্মাদ (বাউল) ১০২
ভারতচন্দ্র ৭৭
'ভারতবর্ষ' (মাসিক পত্র) ১৯৭, ২১১
'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'—অক্ষয়কুমার দত্ত ৫৬, ৪২৮
ভারতবর্ষের ইতিহাস' (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ১৩৫
'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা' —ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৪৫, ২২০, ২২৪, ২২৫
ভার্গব ২১৪
ভাস্কর বর্মা (বর্মণ-রাজবংশীয় নৃপতি) ১৯৪, ১৯৯
ভাস্কর রায় (হিন্দু তান্ত্রিকাচার্য) ২৯৭
ভিক্টোরিয়া ১০৩
ভিক্ষুসঙ্ঘ ২০৩
ভিনসেণ্ট স্মিথ (V. A. Smith) ১৩৩, ১৩৫
ভীমের দিগ্বিজয় ১৫০
ভীল ১৫৫, ১৫৮
ভুবনেশ্বর-লিপি ২৪৫
ভুবনেশ্বরী ২১৫
ভুবর্লোক ৩৩৩
ভুরসুট ২৬৮
ভূতিবর্মা (বর্মণ-রাজবংশীয় নৃপতি) ১৯৪
ভূমিজ (জনগোষ্ঠী) ১৫৫, ১৫৮
ভূর্লোক ৩৩৩
ভুসুকু, ভুসুকুপাদ (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৩৮, ২৪২, ৪৭৩
ভেক-ভোজন ১২৫
ভেডডা (সিংহলের জনগোষ্ঠী) ১৫৫
ভেদ ২৯৫
ভেদ-পদ্ধতি ২৯৫
ভৈরবী ১৩০
ভোগ-মোক্ষ-সাধনা ৪৬৩
ভোজবর্মা (বর্মন-রাজবংশীয় নৃপতি) ১৮৮, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮
ভোট-চীনা জাতি ১৬০
ভোট-চীনা ভাষা ১৫৮, ১৬০
ভোটদেশ ২০৮
ভোটান ১৫৮

ম

মকাম (মোকাম) ৩৩৯, ৫০১
মক্কা ৫২, ৩২৫, ৩৬৭, ৪৮৯, ৫০৮
মগধ ১৪৯ ২৪০, ২৫৩
মগী ২০০
মঙ্গলচণ্ডী ২৭২, ২৭৪

মঙ্গলবাড়ী গ্রাম (দিনাজপুর) ২১৫
মঙ্গোলীয় জাতি ১৫৭
'মজমা-উল-বহরেন'-দারা শিকো ১৪০, ১৪১, ১৪২
মজুমদার, এন. জি. (N. G. Mazumdar) ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭
মঞ্জুঘোষ ভৈরব ২৩০
মঞ্জুশ্রী ৩০, ২২০, ২৩০
'মডার্ণ বুদ্ধিজ্‌ম্ অ্যাণ্ড ইট্‌স্ ফলোয়ার্স ইন্ ওড়িষ্যা' (Modern Buddhism and its Followers in Orissa—N. Basu) ২৩৬
মণিপীঠ (হংসপীঠ) ৩১৩
মণিপুরচক্র (দশম দল) ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৬৫, ৪৩১, ৪৪০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫২, ৪৬৫, ৪৭২
মণীন্দ্রমোহন বসু ৪, ৩৫, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৭০. ৩০১, ৩৭৭
'মৎস্যপুরাণ' ১৮, ১৯, ৩৩৩
মৎস্যেন্দ্র (নাথ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক) ২৫৯
মথুরা ১৯১, ১৯৫
মথুরা ভট্টাচার্য (নব্যন্যায়) ২৭৬
মথুরা-স্তম্ভলিপি ১৯৮
মদন ২৯২
মদন (পঞ্চবাণের অন্যতম বাণ) ৪১০
মদন ক্ষ্যাপা ৯৩
মদন (বাউল) ৭৫, ৭৬
মদনগোপাল ৫১, ১৮৫, ২১৩, ২১৭
মদনগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ ৯৭
মদনমোহন স্বামী ৮৫, ৪৮১
মদনানন্দ ৪২১
মদনের পঞ্চবাণ ২৯২
মাদন (পঞ্চবাণের অন্যতম বাণ) ৪১০
মধুর (রস, মতান্তরে পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব) ২৯৩
মধুসূদন দেব (দেববংশীয় নৃপতি) ১৮৯
মধু সেন (সেন-বংশীয় নৃপতি) ২৫০
মধ্যনাড়ী (মধ্যপথ, ডোম্বী, সুষুম্না বা ব্রহ্মনাড়ী)
মধ্যপথ (ঐ) ২৫৯, ২৬১
মধ্যপ্রগল্‌ভা ২৫
মধ্যবঙ্গ ২৬৮, ৩০৯
মধ্যভারত ১৫৮
'মধ্যমক রত্নপ্রদীপ' ২৪০
'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী'—ডাঃ সুকুমার সেন ২৭৪, ২৭৯
'মধ্যযুগের বাঙ্গালা'—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮, ২৭৪
মধ্যা ২৫
মন-পবন ৬১
মনসা ১৮৩, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭
'মনসাবিজয়'—বিপ্রদাস ২৭০
'মনসামঙ্গল'—বিজয় গুপ্ত ১৩৭, ২৭০
মনসুরউদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ ৭১
মনসুর হল্লাজ, সুফী ২৮৪, ৪৮৩, ৪৮৯, ৪৯৯
মনহলি তাম্রশাসন ২১৩, ২১৭
মনুসংহিতা ১৭৯, ২৯৭
মনের মানুষ ৫৫, ৮৫, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ১২৩, ২৯২, ২৯৪, ৩২৩, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৬৭, ৩৭৫ ৪৩১, ৪৩২
মনের মানুষের পদ ১১২
মনোবহা নাড়ী ৪৪৬
মন্ত্র ১৮৬, ২১৮, ২২০, ২৫৬
মন্ত্রযান ১৮৭, ২২১
মন্ত্রাচার্য ২৪২
মন্ত্রাশ্রয় ৪০৫, ৪০৮

মন্ত্রকর্ম ১৭৫
মন্দসৌর শিলালিপি ২০১
ময়নামতী তাম্রশাসন ৩৩
ময়নামতী পাহাড় ৩৪, ২৪২
ময়মনসিংহ ১৫৪
মরমিয়া (মরমীয়া) ৫৩, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯৯
মরমিয়া-পন্থী ১২৮
মলকুত (মালকুত) ১৪০, ৪৮২, ৫০৩, ৫১২
'মসনবী'-জালালুদ্দীন রূমী ৪৮৩, ৪৮৮, ৪৯০
মহত্তারা ১৪২
মহম্মদ, হজরত ১৩৯, ৩০৫, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০৫, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১৩, ৫১৪
মহর্লোক ৩৩৩
মহাকরুণা ২১৯
মহাকাল ৪৪০
মহাকুলকুণ্ডলিনী ৪৪৩
মহাগুরু ৫৫
'মহাচীনাচারক্রম' ৪৫৬
মহাজন-পদ ১০৪, ৩৬৯, ২৭০
মহাজ্ঞান ২৫৯
মহাদেব ১৭৮
মহাদেবী ২৯৭
মহানির্বাণতন্ত্র ৪২, ৪৫৪
মহানীল সরস্বতী (উগ্রনীল পদ্ম) ২১৫
মহাপদ্ম নন্দ ১৫২
'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' ২০৪
মহাপ্রভু ১২, ২৫, ২৬, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮১
মহাবজ্র ৪৪৭
মহাবাউল ৩৬, ৩৯
মহাবিন্দু ২৫৮, ২৬১, ৪৪২
মহাবিষ্ণু ৪৪৭
মহাবীর ১৫০ ১৯০
মহাভাব ৮৭, ৯৭, ১০০, ২৮৮, ৩০০, ৩৫৮, ৩৫৯, ৪০৩, ৪১২, ৪৭০
মহাভারত ১৫০, ১৫১, ১৭৯, ২০৭, ২১৭, ২৬৮, ২৭০, ২৯৬, ২৯৭
মহামুদ্রা ২৩২, ২৫৮, ৪৫১, ৪৬৯, ৪৭৪
'মহামুদ্রাবজ্রগীতি'—শবর ১৯০
মহামুদ্রাসাক্ষাৎকার ৮৬
মহাযান ৩০, ১৩৫, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২০৯, ২১৯, ২২০, ২২৪, ২৩৩, ২৩৭, ২৬০
মহাযান-বৌদ্ধধর্ম ২২০, ২২১, ৩৬৮
মহাযানী বৌদ্ধ ২১৬
মহাযানী বৌদ্ধসংঘ ১৮৫
মহাযোগ ৩৭৩, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৬
মহাযোনি (সহস্রার) ৩৩৩
মহারাগ ৮৬
মহারাগ-শক্তি ৩৬৫, ৪৭৫
মহারাষ্ট্র ২৫৬
মহালক্ষ্মী ২১৫
মহালিঙ্গ ১৯৭
মহাসাংঘিকবাদ ২০৯
মহাসাধনা (সাধনাঙ্গ) ৪৫১
মহাসুখ ৮৬, ১০০, ২২৮, ২৩৭, ২৫৭, ২৫৮, ৩০৪, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৮, ৪৬৯, ৪৭০
মহাসুখ-কমল ৩৫১, ৪৪৯
মহাসুখ-কায় ৪৫০
মহাসুখ-চক্র ৩৫১, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৬৯
মহাসুখবাদ ২০৭, ২৩৮, ২৭৭
মহাসুখ-রাগাগ্নি ৪৭৩
মহাসৌখ্য ৩৫২
মহাস্থানগড় ৩০, ১৪৯, ১৫২
মহিন্তা গাঁই ২৬৭
মহীপাল, ১ম ২১৩, ২১৭, ২৪১
মহেন-জো-দড়ো ১৫৫, ১৫৬, ১৬০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫

'মহেন-জো-দড়ো অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ সিভিলিজেশন' ('Mohenjo Daro and Indus Civilisation' —Sir John Marshall) ১৬৩
মহেশ্বর ৪০০
মহেশ্বরী ২১৬
মা-অথিস (Ma-Athis) ১৬৫
মাইকেল ৭৭
মাকাল (মৎস্য-দেবতা) ১১৭
মাকাল-পূজার মন্ত্র ১১৭
'মাটি' (বিষ্ঠা) ৪২৪, ৪২৯
মাণ্ডূক্য-উপনিষৎ ১৪৭
মাৎস্যন্যায় ১৮৩
মাতৃকামূর্তি ২১৫
মাতৃদেবী ১৬২
মাতৃশক্তি ৩৭৪, ৪৩৩
মাদন (পঞ্চবাণের অন্যতম বাণ) ৪১০
মাদন-সাধনা ৪১১
মাধব ৩৮, ২৮৫
মাধব বিবি ৩৫৬, ৩৭৬
'মাধব বিবির কড়চা' ৩৫৬, ৩৭৬
মাধবাচার্য ১৪৫
মাধবেন্দ্র পুরী ২৭৯
মাধুর্য-ভজন ৩২৩
মাধুর্য-লীলা ৪০৭
মানব-গুরু ৩০৪
'মানব-সত্য' (প্রবন্ধ)—রবীন্দ্রনাথ ৯৫
মানিনী ২৫
'মানিনীব্রজ্যা' ২৭
মানুষ ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৪০৪, ৪২১, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৪, ৫১০
মানুষ-তত্ত্ব ৩০২
মানুষ-ধরা ৩৭২ ৩৭৩, ৩৮৮, ৩৯১
মানুষ-বিগ্রহ ৩০৮
মানুষ-ভজন ৬২, ৬৯, ৩০১, ৩৫৪
মানুষের করণ ২৯৪, ৪০৪
'মানুষের ধর্ম (বক্তৃতা)—রবীন্দ্রনাথ ৯৫
মান্দৈল গ্রাম (রাজশাহী) ২১৫
মামকী (পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের অন্যতম রত্নসম্ভবের শক্তি) ২২৮, ৪১১, ৪৬৯
মারফত ৫২, ৫৩, ৫১১
মারফতী ফকির ৫০, ৫৩
মারিফ (অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) ৪৮৮
মারীচি দেবী ২২৯
মারীচি-মূর্তি ২২৯
মালকুত (মলকুত) ৫০, ৯২, ১৪০, ৪৮২, ৫০৩, ৫১২
মালদহ ১৯৮
'মালতী-মাধব' (নাটক)—ভবভূতি ৩৮
মালপাহাড়ী (জনগোষ্ঠী) ১৫৫
মালয় ১৫৮
মালাক্কা ১৫৮
মালাধর বসু, 'গুণরাজ খাঁ' ৩, ১৩৭, ২৬১, ২৭৯
মালায়লাম ভাষা ১৬০
'মালিনীবিজয় তন্ত্র' ৩০
মাসিডন ১৫৭
মাহ্‌দি হোসেন, ডক্টর ২৫২
মাহেশ্বরপাসা গ্রাম (খুলনা) ২১৫
মিঞা মীর (দারার গুরু মুল্লা শাহের গুরু) ১৩৯
মিঞাসাহেব (স্বয়ং খোদা) ৩২৬
মিত্র ১৪৮
মিথিলা ১৮৮, ২৭৫
মিথুন-রূপ ৪১
মিথুনাকার-রূপ ৮৬
মিথুনাত্মক ধর্ম-সাধনা ২৫৭
মিথুনাত্মক মিলন ২৬৩
মিথুনাত্মক যোগ-সাধনা ২৯০, ৪৭৪

মিথুনানন্দ ৩৫৭, ৩৮৮, ৪২২, ৪৭৩, ৪৭৬, ৪৭৯

মিন্‌হাজ (মুসলমান ঐতিহাসিক, 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'-প্রণেতা) ২৫১

মিনাণ্ডার (মিলিন্দ), গ্রীকরাজ ১৩৬

মিলন-ক্রিয়া ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৭, ৪২২

মিলনানন্দ ৪১৩, ৪৭৬

মিলিন্দ (মিনাণ্ডার) ১৩৬, ২২৩

'মিলিন্দ-পঞ্হ', 'মিলিন্দ-পঞ্হো' ১৩৬, ২২৩

মিশর ৪৮৭, ৫০২

'মিস্টিকস্ অব্ ইসলাম, স্টাডিজ্ ইন্ ইসলামিক মিস্টিসিজ্‌ম্' ('Mystics of Islam, Studies in Islamic Mysticism'—R.A. Nicholson ২৮৩

মীন (-রূপ অধর মানুষ) ৩৭৩

মীরাবাঈ ৩৮১

মুকুন্দ দাস ২৬৯

মুক্তত্রিবেণী (মূলাধার) ৪৪৪

মুখলিঙ্গ ১৯৯

মুগ্ধা ২৫

মুঙ্গের তাম্রশাসন ২১৩, ২১৪

মুণ্ডা (জনগোষ্ঠী) ১৫৫, ১৫৮, ১৬৯, ১৪৭, ৩১৪

মুদ্রা ১৮৫, ২১৯, ২২০, ২৩২, ২৫৬, ৩০৪, ৪১৭

মুরশিদ [illegible]২, ৩০৪, ৩০৯, ৩৬৭, ৫০১, ৫০৬, ৫০৯, ৫১৫, ৫১৬

মুরশিদজান ৩৯৭, ৪০৮

মুরশিদ-ভগবান ৩০৯

মুরাক্কা (খিরূপা) ৫০২

মুরিদ ৫২, ৫০১

মুর্শিদাবাদ ২০৭, ৩৭০

মুল্লা শাহ্ (দারা শিকোর গুরু) ১৩৯, ১৪০

মুসলমান কাজী ২৭২

মুসলমান ধর্ম ৫১, ৫২, ১২৮, ২৫৩, ২৬৪, ২৭৬, ২৭৮

মুসলমান ধর্ম-প্রচারকগণ ২৫৪

মুসলমান বাউল (ফকির) ৩৭০, ৪০৩

মুসলমান-রাজত্ব (যুগ) ১২৮, ১৯৪, ২৫০, ২৫১, ২৫২

মুসলমান-সহজিয়া ১২৯

মুসলমান সুফীধর্ম ১৪৪

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর ৬, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ৩৩, ৫৩, ২৫৭, ২৫৮

মুহূর্ত, চতুর্বিধ (বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ, বিলক্ষণ)

মূলকমল ৩৩

মূলতত্ত্ব ৫৩, ৫৫, ৬০, ২৮৬, ৩৫২, [illegible], ৪৮৩

মূলপরমতত্ত্ব ২৮৫

মূলবন্ধ ৪১৫, [illegible], ৪৪৭

মূলাধার (চতুর্দল) ৩৪৪, ৩৬৫, ৩[illegible], ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮৭, ৩৯৬, ৪[illegible], ৪১৩, ৪১৬, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৫২, ৪৬৩, ৪৭২, ৪৭৪

মূলাধার-মুখ ৪১৬

মৃত্তিকা-সাধন ৪২৫

মেখলা (বৌদ্ধ ভিক্ষুণী) ২৪১

'মেটিরিয়্যাল্‌স্ ফর দি স্টাডি অব্ দি আর্লি বৈষ্ণব সেক্ট' (Materials for the Study of the Early Vaishnava Sect'—Dr. H. C. RoyChowdhury.)

'মেদিনীকোষ' (অভিধান)

'মেময়েরস্ অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' ('Memoirs of Asiatic Society of Bengal, I.

মেরু-পর্বত ৪৪৯

মেরু-মণ্ডল ৪৪৫
মেরু-শৃঙ্গ ৪৪৫
মেসিগনন এল. (N. Massignon) ৪৮৩, ৪৮৯, ৪৯৩
মেসোপটেমিয়া ১৫৭
মেহার (ত্রিপুরা)
মৈত্রেয় (ভাবী বুদ্ধ) ২২০
মৈথুন ১৭৫, ৪১৯
মোকাম (মকাম) ৩৩৯, ৪৮২, ৪৮৩, ৫০৩
মোক্ষশাস্ত্র ১৪৫
মোগল ১৩৩
মোগল-অধিকার ২৮১
মোগল-বিজয় ২৮১
মোগল-যুগ ১৪৪, ২৬৮, ২৭২
মোগল-সাম্রাজ্য ২৮১
মোঙ্গল ১৬১
মোনাজাত ২৮৪, ৪৮৬
মৌর্য-যুগ , ১৫২, ১৬০
মৌর্য-যুগের লিপি ১৪৯
ম্যাকডোনাল্ড, কে. এস. (K. S. Macdonald) ১৭৯, ৪৮৬
ম্যাক্সমুলার ২২৫

য

যক্ষপূজা ২৭২
যজুর্বেদ ১৪৬, ১৭৭, ১৮২, ১৯৪
যজুঃসংহিতা ১৪৬
যদুনাথ সরকার ২৫১, ২৬৬
যন্ত্র ১৮৫, ২১৯, ৪৭৪
যম (বৌদ্ধ দেবতা ধর্মপাল) ২৩০
যমুনা (নদী) ১৪৯
যমুনা (পিঙ্গলা নাড়ী) ৯৯, ৩৩৮
যমুনাচার্য ('তন্ত্রপ্রমাণ্য'-প্রণেতা) ২৯৭
যমুনা-পানের মন্ত্র ৪২৭
যশস্বিনী নাড়ী ৪৪৪
যশোহর ২১৫, ৩৭০
'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা' ৩৮, ২৯৮
যাদুবিন্দু (বাউল) ৮৭, ১০৬, ১১৬, ১১৮, ২৯৬, ৩২৮
যাভা (জাভা) ২২৯
যামল ২০৭, ২১৯, ২৫৬
যুক্তত্রিবেণী (আজ্ঞাচক্র) ৪৪৪
যুগনদ্ধ ৫৩, ২৩৩
যুগনদ্ধ রূপ ৮৬
৪১
৮৪, ৮৫, ৩০০, ৩০১, ৩২৪
যুগল-মিলন ৩৩, ৮২, ১০০, ২৮৮, ৩০০, ৪৮২
যুগল-মূর্তি ৮৪
যুগল-রূপ ৮৬
যুগল-লীলাতত্ত্ব ২৪৮
যুগল-সাধনা ২৬৩
য়েরুব (দক্ষিণ-ভারতের জনগোষ্ঠী) ১৫৫
যোগ ১৮৪, ২৯৬, ২৯৮
যোগক্রিয়া ৩৩, ৬৯, ১২৭, ৪৬২
যোগদেব, 'শান্তিবিত্তম' (তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী) ২১৭
যোগ-দেহ (সিদ্ধদেহ) ২৬১
যোগ-ধর্ম ৩২১
যোগ-নিদ্রা ৪৩৫
যোগ-প্রক্রিয়া ২৮৩
যোগবাদী ৮৭
যোগ-মার্গ ৯৯
যোগমায়া ২৮০, ৪০৪
যোগমায়া প্রকৃতি ৪০৪
যোগমিলন ৪৩০, ৪৫২
যোগ-মিলন-ক্রিয়া ৪০৪, ৪০৫, ৪০৮, ৪০৯, ৪২৫, ৪৩৫, ৪৩৬
যোগ-মিলন-ক্রিয়ার পদ্ধতি ৪০৮

'যোগশিখোপনিষৎ' ৩৬৫
যোগ-সাধনা ২৫৭, ২৭৭, ৫১৩
যোগাচার ২২৪
যোগাচার-দর্শন ২০৯, ২২২
যোগিনী (নাড়ী) ৩৫১, ৪৫২
'যোগিনীতন্ত্র' ৩১৬
যোগিনী-সাধন ২৭৪
'যোগিযাজ্ঞবল্ক্য' ৪৬৭, ৪৬৮
যোগেশ্বরী ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৪
যোগেশ্বরী শক্তি ৩৪৫
যোনিমুদ্রা ৪১৮
যৌন মিলন ১৮২, ২৫৬
যৌন যোগ-সাধনা ২৭৭
যৌবনশ্রী (হৈহয়-রাজকন্যা) ২১৬

র

রক্তচন্দ্র-সাধন ৪২৫
রক্তমৃত্তিকা (লো-টো-মো-চি) বিহার ২০৪
রঘুনন্দন, স্মার্ত ২৬৭
রঘুনাথ দাস ৪৭৯
রঘুনাথ শিরোমণি (নব্যন্যায়ের পণ্ডিত) ২৭৫
'রঘুবংশ' ২৬৭
রজুল ৫০৫
রঙ্ক-ভিখারী ২৮
রজকিনী-প্রেম ৮৪, ৪৭৮
রজকিনী রামী ২৮, ৩২
রজঃ, রজোগুণ ৪০০, ৪৭৫
রজঃ ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৮৭, ৩৮৮, ৪১৯, ৪৫২, ৪৬৪
রজঃ-বীজ, রজোবীজ ৮৯, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪২১, ৪২৯
রজোরূপ ৩৮৮, ৪০০
রজ্জব (মধ্যযুগের মরমিয়া-সাধক-কবি) ৭৩, ৮৮
[illegible]
রত্নাধিপতি (সূর্য) ৪৭৪
রতি ১০৭, ৩৫৯, ৩৬৩, ৩৭৪, ৩৭৮, ৪০২, ৪১২
রতি (রাধাতত্ত্ব) ৩৫৯
রতিনিষ্ঠা ৮৯
'রতিবজ্র' ৪৬৫
রত্নত্রয় ২০১, ২২৬
রত্নপানি (বোধিসত্ত্ব) ২২৮
রত্নসম্ভব (পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম) ২২৮
রত্নসম্ভব-মামকী ২২৮
'রত্নসার' (পুঁথি) ৫৪, ৩৩৬, ৪১০, ৪১১
রবিদাস (মধ্যযুগের মরমিয়া-সাধক) ৮৮
রবীন্দ্রনাথ ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৯৪, ৯৫, ১০৪, ১৩৪
রবীন্দ্র-সাহিত্য ২০৬
রমণ ৩৭২
রমণদাস (বাউল-গুরু) ৪৩৬
রমা চৌধুরী, ডক্টর ৪৮৪
রমাপ্রসাদ চন্দ ১৫৩
রমৈনী ৫১৮
রস ৩৭৬, ৩৭৮, ৪০১, ৪০২, ৪০৪, ৪১২
রস (কৃষ্ণতত্ত্ব, কাম) ৩৫৯
রস (মূত্র বা শুক্র) ৪২৪, ৪২৯
রসতত্ত্ব ৪৪৭
রসতন্মাত্র ৪৪৭
রসনা (পিঙ্গলা) ২৫৯
রসনা (নাড়ী) ৩৩৬, ৩৫১, ৪৫০, ৪৫১, ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৭৩
রসবতী যুবতী ৩৬৫
রস ভিয়ান করা ৩৭৬, ৩৭৮
রসময় পরমতত্ত্ব ৩৬৬
রসময় ভজন-পদ্ধতি ৩০১
রস-রক্তবহা নাড়ী ৪৪৫
রস-রতি ৯১, ৩৬৮, ৩৯৮
রস-রতির মিলন ৫৭, ৩৯৭

রসরাজ-মহাভাব ৩৮৫
রসরাজ-লীলা ৩৮৫
রস লীলা ৩৭৩
রস-সাধন ৪২৫
'রসসার' (সহজিয়া-গ্রন্থ) ৭০
রস-স্বরূপের বিচার ৬৯
রসাতল ৩৩২
রসাশ্রয় ৮১
রসিক ৫৩, ৮১
রসিক পন্থী ৫৩
রসিক বাউল ১০৭, ২৯৪
রসিক বুলবুল ৫১০, ৫১১
রসিক বৈষ্ণব ৫৩, ১০৫, ১৮৪, ৩৭৮, ৫১১
রসিক ভক্ত ৩৭৯
রসিক ময়রা ৩৯৮
রসিক হংস ৯৩
রসের পাক ৩৯৮
রসের ভজন ৬৯
রসের ভিয়ান ৩৯৯
রসের মানুষ ৯১, ১১৬, ৩৪০
রাকিণীশক্তি ৪৩৯, ৪৪৭
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭, ৮, ২৫১, ২৬৬, ২৬৯
রাগ ৩৬৩, ৩৭৪, ৩৯৬
'রাগময়ী কণা' (সহজিয়া-গ্রন্থ) ৭০
রাগমার্গ ৪০৫
রাগমার্গে ভজন ৩৪, ৫৪
রাগাত্মিকা ৫৩
রাগাত্মিকা পদ ৪, ৫, ৭, ২৮, ৪৬, ৫৩, ৭০, ২৮৯, ৩২৪, ৩৫৬, ৩৭৭, ৩৭৮
রাগাত্মিকা পদের ব্যাখ্যা ৩৬২
রাগাত্মিকা ভক্তি ৩০০
রাগানুগা পন্থী ৫৩
রাগানুগা ভক্তি ৩০০
রাগানুগা ভজন ৪০৭
রাগের আচার ৪৯, ২৯১
রাগের করণ ৫৪, ১১৫, ৩০০, ৩৭৫
রাগের ঘর ২৯৪
রাগের পথ ৩৬৬
রাগের ভজন ৫৪, ২৯৩, ৩০০, ৩০১, ৩৭৫
রাগের মানুষ ৩৭৫
রাঘব ভট্ট (তান্ত্রিকাচার্য) ২৯৫
'রাজতরঙ্গিনী' ২০০
রাজপুতানা ১৫৭
রাজবিহার ২০৩
রাজভট (বৌদ্ধরাজা) ২০৪
রাজমহল পাহাড় ১৫৪
রাজযোগ ৩৩৯
রাজরাজ ভট্ট (খড়্গবংশীয় বৌদ্ধ রাজা) ২০৪
রাজশাহী জেলা ৬২, ২০১, ২১৫, ২৪০
রাজশাহী চিত্রশালা ৩০, ২১৫, ২২৮, ২২৯, ২৩০
রাজ্যপাল (পালবংশীয় নৃপতি) ২১৬, ২১৭
রাজ্যবর্ধন ২০১
রাঢ় ৪৭, ১২৪, ১৪৯, ১৫৯, ১৮৮, ১৯০, ২০৮, ২৯৫, ৩৯৮
রাতবংশ ১৯৭
রাধা ১৮, ২৮৮, ৩৫৫, ৪০৭
রাধা-কৃষ্ণ ১০০, ১২৭, ২৭৫, ২৮৬, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৮১, ৪৭৬, ৪৭৭
রাধাকৃষ্ণ, ১৩৪, ২২৫, ২২৬
রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব ৪০, ৫৪, ৩০৮
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম ২৩, ২৪
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা ১৬, ১৮, ২৩, ২৮, ৩১, ৩৩
রাধা-কৃষ্ণবাদ ৩২, ১২৬, ২৪৭, ২৬২, ২৬৩, ২৯০, ৩৫৬
রাধা-কৃষ্ণ-মিলন ২৮৮
রাধা-কৃষ্ণ-লীলা ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ১২৭, ২৪৮, ২৬২, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৮

রাধা-কৃষ্ণ-লীলাবাদ ২৫৭
রাধাগোবিন্দ নাথ ৪০, ৯৭
রাধাগোবিন্দ বসাক, ডক্টর ৮, ২০
রাধাতত্ত্ব ১৮, ২৮৮, ৩৫৮, ৩৫৯
রাধা-পদ্ম ৩৭৪, ৪০৫
রাধা-প্রেম ২২
রাধারসকারিকা' ('বঙ্গসাহিত্য পরিচয়') ৩৫৯
রাধা-রাণী স্বরূপ ৯৭
রাধাশ্যাম বাউল ৩৪৩
রাধা-স্বরূপ ৯৭
রাধা-স্বরূপিণী ৩০০, ৩১২
রাধিকার গায়ত্রী ৪০৮
রাধিকার বীজমন্ত্র ৪০৮
রাবীয়া, সুফী ৪৮৬
রাম ৬৯
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৪৬৪
রামক্রী (চর্যাপদের রাগিণী বিশেষ) ১৩০
'রামচরিত'—সন্ধ্যাকর নন্দী ২০৬, ২১৭
রামদাস, মুচি ১২২, ১৩৭
রামদেব শর্মা ২৪৬
রামপাল ২১৫, ২৩৫, ২৪২
রামপ্রসাদ ৪৬৪
রামশরণ পাল (কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 'কর্তাবাবা') ৬১, ৬৩, ৭
রামসুন্দর (উইলসন সাহেব-উল্লিখিত রামশরণ পালের নাম) ৭
রামাত ৪২৪
রামানন্দ, রায় ১২, ৩৬, ৪৩, ১৩৭, ৪৭৭, ৪৮১
রামানুজ ২৮৫
রামাবতী (রামপালের রাজধানী) ২১৫, ২১৭, ২৪২
রামায়ণ ১৫০, ১৮৪, ১৯৬, ২০৭, ২৬৮
রায়মুকুট (সুলতান জালালুদ্দীন-প্রদত্ত বৃহস্পতি মিশ্রের উপাধি) ২৬৭
রায় রামানন্দ ১২, ৩৬, ৪৩, ১৩৭, ৪৭৭, ৪৭৯
রায় রামানন্দ-প্রদ্যুম্ন মিশ্র-সংবাদ ৪৭৭
রারা (জনপদ) ১৯১
রাশিয়া, দক্ষিণ ১৫৭
রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যা ২১৬
রাসলীলা ১৭, ২৮৭
রাহুল সংকৃত্যায়ন ১১১, ২৪৩
'রিয়াজ-উস্‌-সলাতিন'—গোলাম হোসেন ২৫১
'রিসালা-ই-হক-নামা'—দারা শিকো ১৪০
রুদ্র ১৭৮, ২১৫
রুদ্রগ্রন্থি ৪৪৮
রুদ্রদত্ত (বৈন্য গুপ্তের সামন্ত রাজা) ২০২, ২০৩
রুদ্রযামল ২৯৭
'রুদ্রযামলতন্ত্র' ৪৫৩
রূপ ১০২, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৭৮, ৪১২
রূপ (রজঃ) ৪২৪
রূপ গোস্বামী ১৬, ১৮, ১৯, ২৫, ২৬, ৩৮১
রূপচাঁদ, বাউল ২৬৯, ২৮৭, ৩৬৪
রূপতন্মাত্র ৪৪৭, ৪৪৮
রূপনগর ৩৪৬
রূপবহা নাড়ী ৪৪৫
রূপবিদ্যা ২১৫
রূপ-মিলন ৩৬৫
রূপ-রতি-রস ৮৭, ৪১২
রূপ-সনাতন (গোস্বামী) ৪৭৯
রূপ-সাগর ৩৬৩, ৪৩০
রূপ-সায়রের তিন ধারা ৩৯৩
রূপ-স্বরূপ ৩৫৭, ৩৬০
রূপ-স্বরূপ-তত্ত্ব ১০২, ২৯১, ৩৪০, ৩৫৭, ৩৬২, ৩৬৮
রূপ-স্বরূপের বিচার ৬৯
রূপের ঘর ৯১
রূপের ঝলক (দ্বিদলে) ৩২৪
রূম (এশিয়া মাইনর) ৪৯০

রূমী, জালালুদ্দীন ৪৮৩, ৪৮৮, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৪, ৪৯৬, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০

'রূমী (পোয়েট অ্যাণ্ড মিস্টিক'): 'Rumi (Poet and Mystis')-নিকলসন ৪৮৩, ৪৯৯, ৫০১

রূহ্ ৫০৬

'রেকর্ডস অব্ বুদ্ধিস্ট কিংডম্স্' ('Records of Buddhist Kingdoms'-James Legge.) ২০২

রেচক ৪০৯, ৪২১, ৪৩৬, ৪৬৭, ৫১৪, ৫১৫

রেজো ক্ষ্যাপা (বাউল) ১০৮, ৩৬৬

রেবন্ত (সূর্যপুত্র) ২১৬

রেবা নদী ২৫

রোমান ১৩৬, ১৫১, ১৫২

রৌদ্ররস ৩৭৭

লক্ষ্মণকাঠি (বরিশাল) ১৯৮, ২২৯

লক্ষ্মণ দেশিকেন্দ্র (তন্ত্রগ্রন্থ-প্রণেতা) ৩১৬

লক্ষ্মণ সেন ১৬৮, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৭৬

লক্ষ্মণা ৩৪১

লক্ষ্মণাবতী ২৫৪

লক্ষ্মীঙ্করা (ইন্দ্রভূতি-কন্যা) ২৪২, ৪৫৩

লক্ষ্মী-নারায়ণ ২৪৭, ২৬২

লজ্জা (হৈহয়-রাজকন্যা) ২১৬

লয়যোগ ৩৩৯

ললনা (ইড়া) ২৫৯, ৩৩৬, ৩৫১, ৪৫০, ৪৫১, ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৭৩

'ললিতমাধব' (নাটক)-রূপ গোস্বামী ২৮৭

লহয়চন্দ্র (চন্দ্রবংশীয় নৃপতি) ১৮৮

লাকিনী শক্তি ৪৪০, ৪৪৭

লাট্যায়ন ('শ্রৌতসূত্র'-প্রণেতা) ১৭৮

লাবণ্য, লাবণ্যামৃত ১০৭, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৭

লামা বু-তোন ২৪০

লালশশী (দুলালচাঁদ) ৬৯

লালন শাহ্, ফকির ৮২, ৮৩, ৯১, ৯২, ৯৫, ১০৫, ১০৭, ১১৪, ১২১, ১২২, ১২৩, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৮, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৪১৩, ৪২৯, ৪৩৫, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১২

লালন শাহী ফকিরগণ ৫৭, ৪২৪, ৫১০

লালন-সম্প্রদায় ৫৮, ৩৯৪

লাহুত (বাউল-মতানুযায়ী আধ্যাত্মিক স্তরবিশেষ) ৫৫, ৯২, ১৪০, ২৮৩, ৪০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫১২

লিঙ্গপূজা ৮৫, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯

লীলাবজ্র (লক্ষ্মীঙ্করা-শিষ্য) ২৪২

লীলাবাদ ৭৮

লীলাময় সহজ-মানুষ ৩৭২

লীলা-রস ৩৬০

লীলা-রূপ ২৯১

'লীলা-শুক'—জয়দেব ৩৬২

লোকনাথ, মহাসামন্ত ১৮৪, ১৯৫, ১৯

লোচন দাস (বৈষ্ণব কবি) ২৭২, ২৭৩, ৩৫

লোচন দাস ('বৃহৎ-নিগম'-প্রণেতা) ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৫, ৩৮৬, ৪০৫, ৪১

লোচনা ৪৫১, ৪৭

লো-টো-মো-চি (রক্তমৃত্তিকা) বিহার ২

শ

শক ১৩৩, ২০০, ২

শঙ্কর, শঙ্করাচার্য ২২৫, ২

শঙ্কর ভট্টারক (শিব) ২

'শক্তি অ্যাণ্ড শাক্তস্'—উড্রোফ ('Shakti and Shaktas'—Woodroffe) ৪

শক্তি ৬২, ১৬৪, ১৭০, ২৭৭, ৩ ৩৫৭, ৪৫৮, ৪৭২, ৫

শক্তিতত্ত্ব ৩১, ২৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮
শক্তিপূজা ২৬৪, ২৭১, ২৭৮
শক্তিবাদ ৩১, ২৮৬
শক্তি-শিব ২৩২
শক্তি-শোধন ৪৫৮
'শক্তিসঙ্গমতন্ত্র' ৩১, ৩১৬, ৪৫৪, ৪৫৫
শক্তিস্থান ৩৫১
শক্তিস্বরূপ (রজঃ) ৩৩০
শখের বাউল ১০২
শঙ্খিনী নাড়ী ৪৪২, ৪৪৪
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ৭২
'শতপথ ব্রাহ্মণ' ১৪৬, ১৭৭, ১৯৬
শবর ১৩৪
শবরী (নৈরাত্মা) ৪৭৪
শবিস্তরি তব্রিজী, সাদুদ্দীন মাহ্‌মুদ ৪৮৩, ৪৯১, ৪৯৭
শব্দ (কবীরের পদ-বিভাগ বিশেষ) ৫১৮
শব্দতন্মাত্র ৪৪৮
শব্দবহা নাড়ী ৪৪৫
শরণাগতি ১০৭
শরণাগতির পদ ১১২
শরীয়ত ৫১, ৫২, ২৯৬, ৪৮৬, ৫১০
শরীয়তধর্ম ২৯১
শরীয়তবাদী ৫২, ৫৮, ১৩২
শরীয়ত-মত ৫৩
শরীয়া ৫২
শলদা-ময়নাপুর (বাঁকুড়া) ১০৬
শশাঙ্ক ১৮৪, ১৯৯
শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডক্টর ২৩, ২৪, ৫৭, ২২৭, ২২৮, ২৫৮
শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ ১০, ১১, ১৩, ১৪, ৩৩, ৫২, ২৫৭ ২৫৮-৫৯
শাকিনী শক্তি ৪৪১, ৪৪৮
শাক্ত ১৭০, ১৭৪, ১৯৬, ২২১, ২৩১, ২৯৩, ৪২৮, ৪৫৪
শাক্তগ্রাম (ঢাকা) ২১৫
শাক্ত তান্ত্রিক ২৭৪, ২৭৫, ২৭৮
শাক্ত দেব-দেবী ২৪৭
'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৪২৫
শাঁখহাটী গ্রাম (যশোহর) ২১৫
শাখোটবাসিনী বনদুর্গা ২৭৪
শাঙ্কর ভাষ্য ৩৪৯
শান্ত (লালন শাহের মতানুযায়া দ্বিতীয়প্রকার পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব) ২৯৩
শান্ত রক্ষিত (তান্ত্রিক বৌদ্ধ পণ্ডিত) ২৪৪
শান্তরস ৩৭৭
শান্তি (অন্যতম বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৪৩
শান্তিদেব (মহাযান-পন্থী ভিক্ষু) ২০২, ২৪৪
শান্তিনিকেতন ৭২
'শান্তিবিত্তম' যোগদেব (তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী) ২১৭
শান্তরস ৪০১, ৪০২
শাবাশী (পীরালির তুল্য অপবাদযুক্ত হিন্দু) ২৭৮
'শারদাতিলক' ৩১৬, ৩৩২
শারদীয় দুর্গোৎসব ২৭৪
'শান্তিয়াৎ'- দারা শিকো ১৪০
শাহ্‌জাহান (সাজাহান) ১৩৯, ২৮১
শিব ৬৯, ১৬২, ১৬৪, ১৭০, ১৯৭, ২১৬, ২১৭, ২৪৭, ৩৪৯, ৩৫৭, ৩৫৮, ৪৫৮, ৪৭১, ৪৭৪
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ২৮৬
শিবতত্ত্ব ৩৫৭, ৩৫৮
শিব-দুর্গা ৩১
শিবনাথ, মহাসামন্ত ১৮৪
শিবপুরাণ ২৪৯
শিবপ্রিয়া ২১৬
শিব-বুদ্ধ-কল্পনা ২২৯

শিবভট্টারক ২১৭
শিব-মন্দির (এক সহস্র) ২১৬
শিব-মূর্তি ১৬৩, ১৯৮, ২২৯
শিব-লিঙ্গ ১৯৯
শিব লোকেশ্বর ২২৯
শিব-শক্তি ৪১, ১৬৩, ১৬৫, ২৪৮, ২৬০, ২৮৬, ২৮৮, ৩৫০, ৪৫৯, ৪৬৩, ৪৭৪
শিব-শক্তি-তত্ত্ব ২৮৫, ৩৫৮
শিব-শক্তি-পূজা ১৬৫
শিব-শক্তিবাদ ৩২, ১২৬, ১২৭, ১৬৯, ১৭০, ২৫৬
শিবশ্রুতি ২৯৭
'শিবসংহিতা' ৩৩০, ৩৫০, ৪১৬, ৪১৮, ৪৪৪, ৪৪৫
শিব-সর্বাণী ২১৪
শিবস্থান ৩৫১
শিবস্বরূপ (বিন্দু) ৩৩০
শিবস্বরূপ (শ্রীগুরু) ৩১৬, ৩১৭
'শিবাগম' ৪৫৮
শিবাবস্থা ৪৭১
শিলাইদহ ৯৫, ৩৯২
শিশুপাল-বধ ২৬৭
শিশুব্রহ্মা ৪৩৮
১৮৩, ২৬৪
২০৯
শীলা ভট্টারিকা (মহিলা-কবি) ২৭
শুকদেব ২৮৭, ২৮৮
শুক্র (ক্ষীর) ৩৭৪, ৩৭৫, ৪১৯
শুক্রপানের মন্ত্র ৪২৭
শুক্র-রূপী বুদ্ধ ২৩৪
শুক্ররূপী মনের মানুষ বা সহজ-মানুষ ৩৭৫
শুক্র-সাধন ৪২৮
শুক্লচন্দ্র-সাধন ৪২৫
শুদ্ধ ঈশ্বরবাদ (Theism) ৪৮৭
শুদ্ধ প্রেম-রাগ ৯০
শুদ্ধ বাউল ৮৫
শুনঃশেফ-উপাখ্যান ১৪৮
শুশুনিয়া পাহাড় ১৯৫
শূন্য ১০০, ৪৭০
শূন্যচক্র ১০০
শূন্যতা ২৫৬, ২৬১, ৪৭৪
শূন্য-পদবী (ব্রহ্মনাড়ী : সুষুম্না-পথ) ২৬১
'শূন্যপুরাণের ভূমিকা'— ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ } ৫১, ১৫৮
শূন্যবাদ ২১০, ২২৪, ৪৭৭
শূন্য-রূপ ১০০
শূন্যসত্ত্ব ২২৬
শূন্যাবস্থা ১০০
শূন্যাশূন্যাবস্থা ১০০
শৃঙ্গার ৩৭২, ৩৮৫, ৩৯৮, ৪৮০
শৃঙ্গার বা আদিরস ২৮৬, ৩৭২, ৩৭৭, ৪৮০, ৪৮১
শৃঙ্গারবিলাস ৩৭২
শৃঙ্গার-রসমূর্তি ৩৬৫, ৪৩১
শৃঙ্গাররস-লীলাময় (পরমাত্মা) ৪২২
শৃঙ্গার-লীলা ৩৭৩
শেখ ৫২, ৫০১
শেখ মুহম্মদ ইকবাল, ডক্টর ৪৮৩, ৪৯২
শৈব ১৭০, ১৭৪, ১৯৪, ১৯৬, ২২১, ২৩১, ২৯৩, ৪২৮
শৈব আগম ১২৭, ২০৭, ২৪৭, ২৫৬, ২৫৭
শৈব তন্ত্র ৩৭
শৈবধর্ম ১৯৮, ১৯৯, ২৯০, ২৯১
শৈব পুরাণ ১৬৬
শৈবাবধূত ৪৩
শোষণ বাণ ২৯২, ৪১০, ৪১১
শ্মশান-কালী ১৮৩
শ্মশানেশ্বর শিব ১৮৩
শ্যামবাজার ৬১
শ্যামল বর্মা (বর্মণ-বংশীয় নৃপতি) ১৮৮

শ্যামা তারা বা আর্যতারা (বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী) ২২৮
'শ্যামারহস্য' (কৌলতন্ত্র) ৪৫৭
শ্যামাসঙ্গী ১০৩
শ্রমণ-শ্রমণী ২২৩
শ্রাবক ২০৫
শ্রাবকযান ২০৫
শ্রাবন্তী ২২২
শ্রীকরণ নন্দী (মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের অনুবাদক) ২৭১
শ্রীকাঙাল (প্রেমচাঁদ বাউল) ৪৫, ৬০
শ্রীকৃষ্ণ ১২, ১৬, ১৭, ২৫, ২৬২, ২৮০, ৩১৫, ৩৪২, ৩৫৩, ৩৬০, ৩৭১
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ১২৭, ১৩১, ৩৮৬
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (নবাবিষ্কৃত পুঁথি) ১৩১
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ৩৮৬
'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'— মালাধর বসু ৩, ৩৫, ৪৭, ২৭৯
শ্রীকৃষ্ণলালা ৩৮
শ্রীক্ষেত্র ২৫
শ্রীগুরু (শিবস্বরূপ) ৩১৭
শ্রীচন্দ্র, শ্রীচন্দ্রদেব (চন্দ্রবংশীয় নৃপতি) ১০৮, ২১৭
শ্রীচৈতন্য, শ্রীচৈতন্যদেব ১৪, ১৫
শ্রীজাবধারণ রাত (রাত-বংশীয় নৃপতি) ১০৪
শ্রীধবি-এব (পট্টিকেরক-রাজ রণবঙ্কমল্লের প্রধানমন্ত্রী) ৩৩
শ্রীধরদাস ('সদুক্তিকর্ণামৃত'-সঙ্কলয়িতা) ২২
শ্রীধর স্বামী (শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যাকার) ২৭৯
শ্রীধারণ রাত (রাত-বংশীয় নৃপতি) ১৮৪, ১৯৭, ২০৩
শ্রীনাথ, মহাসামন্ত ১৮৪
শ্রীপীতবাস গুপ্তশর্মা, শান্তিবারিক ২১৭
শ্রীবজ্রসত্ত্ব ৩৫২
শ্রীবাস ২৭৪
শ্রীবৃন্দাবন ৩৮১
শ্রীমদ্‌ভাগবত ২৭৯, ২৮৫, ২৮৭, ২৯৭, ৩২৪
শ্রীমত্তাসুথনাথ ৩৫২
শ্রীরাধা ৬০
'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে'—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২৪
শ্রীরূপ ৯২, ৩৬০, ৩৬৩
শ্রীরূপ-নদী ৩৭৩
শ্রীশ্রীগদাধর দাস ৩৮১
'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ ১২, ২৭
'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ৪০, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮
শ্রীশ্রীনরহরি অবধূত ৪৮১
শ্রীশ্রীনরহরি অবধূত-সম্প্রদায় ৪৮১
'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' ১২, ১৩, ১৪, ৩৫
শ্রীহট্ট ১৯৪, ৫১৬
শ্রীহেবজ্র ৩৫২
শ্রীহেরুকবজ্র ৩৫২
শ্রুতি ১৪৫
'শ্রৌতসূত্র'—কাত্যায়ন ও লাট্যায়ন ১৭৮
শ্লাগিনওয়েট (E. Schlaginweit) ২৩৭
শ্বাসের ক্রিয়া (প্রাণায়াম) ৪০৮
শ্বেততারা (বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী) ২২৮
শ্বেতবরাহস্বামী (বিষ্ণুর বরাহ-অবতার-রূপী দেবতা) ১৯৭
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ১৪৭

ষ

ষট্‌কোণ ৪৭৪
ষট্‌চক্র ৩১৭, ৩২৯, ৪৩৫, ৪০১, ৫০৮
'ষট্‌চক্রনিরূপণ' (আগমানুসন্ধান সমিতি) ৩১৮, ৩৫০, ৩৫১, ৪৪৪
'ষট্‌চক্রনিরূপণ' ('কর্তাভজন ধর্মের আদিবৃত্তান্ত বা সহজতত্ত্ব-প্রকাশ') ৬২

'ষট্‌চক্রনিরূপণ' —পূর্ণানন্দ স্বামী ৭২, ৩৪৯, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫
ষট্‌চক্রভেদ ৫৭, ৭২, ৪৬২, ৪৭০
ষড়্‌গোস্বামী ২৭৯
ষড়ঙ্গযোগ ৪৬৫, ৪৬৭
ষড়্‌দল, ষড়্‌দলপদ্ম ৩৪৮, ৩৬৫, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৫২, ৪৭৫
ষড়্‌বর্গীয় ১৯৩
ষড়্‌রস ৩৭৭
ষষ্ঠী ১৮৩
ষাঠী (পুরীর সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কন্যা) ৪৫
ষোড়শদল (বিশুদ্ধচক্র) ৩৪৪

স

সওয়াল-জবাব ১০৪
'সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ' ৪৬
সংবৃতিবোধিচিত্ত ২৬১, ৪৬৫
সংস্কার (বৈষ্ণব-মতে মানুষের প্রকারবিশেষ) ৩৫৫
সংস্কার-মানুষ ৩৫৫
সংস্কৃত ১৫৮, ১৬০
সংহিতা ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮
সখী-অনুগত হওয়া ১০৭
সখ্য ১৯৩
সচৈতন্য মানুষ ৩৪৩
সচ্চিদানন্দতত্ত্ব ২২৫
সৎনামী ফকির ৪২৭
সতী মা (কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামশরণ পালের পত্নী) ৬২, ৬৩
সতীশচন্দ্র রায়, পণ্ডিত ৬, ১২, ১৩
সত্ত্বগুণ ৪০০, ৪৭৫
সত্যপীর ১৩৭
সত্যলোক ৩৩৩
সদগুরু ৪৯, ৩২১
সদাশিব (শিব) ১৯৮, ৪৪১, [illegible]
'সদুক্তিকর্ণামৃত'— শ্রীধরদাস-সংগৃহীত ২২, ২৭, ২০৬
সনাতন গোস্বামী (ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষিণী'-টীকাকার) ১২, ১৬, ১৭, [illegible]
সন্দেহবাদ (Secpticism) [illegible]
সন্ধ্যাকর নন্দী ('রামচরিত'-প্রণেতা) ২০৬
সন্নগর বিহার ২৪২
সন্ন্যাসবাদ (Asceticism) ৪৮৫, ৪৮৬
সপ্তকুলাচলম্‌ ৩৩১
সপ্তগ্রাম ২৫৯
সপ্ততালা ৩৪৫, ৫০০
সপ্তদ্বীপ ৩২৫, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১
সপ্তপাতাল ৩২৫, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪
সপ্তভূমি ৩৭১
সপ্তম দ্বার ৪৮১
সপ্তলোক ৩২৫, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৮
সপ্তসাগর ৩২৫, ৩২৯, ৩৩০
সফ্‌ ৪৮৪
সফা ৪৮৬
'সফীনাত-উল-আউলিয়া'—দারা শিকো ১৩৯
সবরপাদ (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৪৩
সমঞ্জসা (মধ্যম প্রকারের রতি বা বাউলদের সাধন-সঙ্গিনী) ১০৭, ৪০২, ৪০৩
সমঞ্জসা-রতি ৪০২, ৪০৩
সমতট ১৫৯, ১৯২, ২০৩, ২০৪, ২০৫
সমন্তভদ্র (বোধিসত্ত্ব) ২২৮
সমন্বয়-প্রচেষ্টা ১৪৩
সময়মুদ্রা ৪৫১, ৪৬৯
সময়াচার ৪৫৩
সমরা ৪৫৯
সমর্থা (শ্রেষ্ঠ প্রকারের রতি বা বাউলদের সাধন-সঙ্গিনী) ৮৮, ১০৭, ৪০২, ৪০৩

সমর্থা-রতি ৪০২, ৪০৩
সমাচারদেব ১৮৪, ১৯৯
সমাজ-গৃহ ৪২৮
সমান (বায়ুর দশগুণের অন্ততম) ৩৩২
সমুদ্রগড় ২৬৮
সমুদ্রগুপ্ত (গুপ্তবংশীয় সম্রাট) ১৯৭
সম্ভোগ-কায় ২২৭, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৬৯
সম্ভোগ-চক্র ৪৫০, ৪৫১, ৪৬৯
সম্ভোগ-লীলা ২৮৬
সম্মিতীয়বাদ ২০৯
সম্মিতীয় সম্প্রদায় ২৪৩
সম্মোহন বা মোহনবাণ ২৯২, ৩১০, ৪১২
'সরস্বতী' (গ্রন্থ)—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৩০
সরস্বতী (দেবী) ২৯, ৩০, ১৭১, ২৩০
সরস্বতী (শুক্র) ৪২৭
সরস্বতী (সুষুম্না) ৯৯, ৩৩৮, ৩৭৩, ৪৪৪
সরহপাদ বা সরোরুহ-বজ্র (বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য) ২৩৮, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৯, ২৫৭, ৩৩৫
সরোবর ৩৩৬
'সরোবরের ঘাট-কথন' ৩৭৯
সর্দার ইক্‌বাল আলি শাহ্ ৫০২
সর্ব (শিব) ১৭৮
'সর্বদর্শনসংগ্রহ'—মাধবাচার্য ১৪৫
সর্বমঙ্গলা ২১৫
সর্বাণী-মূর্তি ২১৭
সর্বাস্তিবাদ ২০৯
'সর্বোল্লাসতন্ত্র' ৪৬২
সলিক (সুফীধর্ম-নির্দিষ্ট সাধন-পথের যাত্রী) ৫০১
সলোমন (সোলায়মান)
সহজ (দেহের মূল স্বাভাবিক সত্তা) ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ২৬০, ৩৮৮, ৩৯৪
সহজ (বৈষ্ণব-মতে মানুষের প্রকারবিশেষ) ৩১৫
সহজ (বৈষ্ণব-মতে চরম আনন্দানুভূতি) ৩৫৯
সহজ-অবস্থা ৮৬, ৮৭, ৩৫৮
'সহজ-উপাসনা-তত্ত্ব'—তরুণীরমণ ৩৫৯
সহজ-কায় ২৩৯, ৪৪৯, ৪৬৯
'সহজ-গীতি'—ভুসুক ১৩০
সহজধর্ম ৮৬
সহজধর্মী ৩৩
সহজ-পথ, সহজ-পন্থা ৮৮, ১০২, ২৩৯
সহজপুর (গুপ্তচন্দ্রপুর) ৩০২
সহজ-বিন্দু ৮৮
সহজ-ভজন ১৪, ২৮, ৩২
সহজ-ভজন-প্রণালী ২৮
সহজ-মানুষ ২, ৫৫, ৯১, ৩০০, ৩০২, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৮৮, ৩৯২, ৪০৪, ৪১০, ৪১১, ৪৩৪, ৪৮২, ৫০৫, ৫১০, ৫১১
সহজ-মানুষরূপী মাছ ৩৮৯
সহজ-মানুষ ধরা ৩৮৮
সহজ-মানুষের আবির্ভাব ৪০৪
সহজ-মানুষের স্বরূপ ৩৭৪
সহজযান ২২৬, ২৩৩, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৪, ২৫০, ২৫৭, ২৯০
সহজযানী (বৌদ্ধ) ২৪৯, ২৫৭, ২৮৪
সহজ-রূপ ৩৪০, ৩৪৪, ৩৫৫, ৩৮৮, ৩৯১, ৩৯২, ৪১৪, ৪২১, ৪৩১, ৪৩৩
সহজ-লীলা ৩৫৯
সহজ-শূন্য ১০০
সহজ-সত্তা ৩৮৪
সহজ-সমাধি ১০০
সহজ-সাধক ১৪০
সহজ-সাধন, সহজ-সাধনা ৩৩, ৮৬, ১০১, ২৮৪, ২৮৮, ৫১৭
সহজ-সিদ্ধি ২৮৯
সহজ-সুন্দরী (সুষুম্না) ৪৫২
সহজানন্দ ৮৭, ২৬১, ৩৫১, ৩৮৮, ৪৫১, ৪৫২, ৪৬৯

সারওয়ার্দি (সুফীদের অন্যতম শাখা) ১৩৯
সারণ (সংস্কৃত-কবি) ২০৬
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ৪৫
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (সংক্ষেপে সা. প. প.) ৭, ১০, ১১, ১৪, ১৩১
সাহোর ২৪৪
সিংহবর্মা (পুষ্করণ-রাজ চন্দ্রবর্মার পিতা) ১৯৭
সিংহল ১৫৫
সিকন্দর লোদী, সুলতান ২৬৯
সিকন্দর শাহ্‌ ১০
সিদ্ধ ৬৯, ৮১, ১০৮, ৪০৫
সিদ্ধকালী ৩৫০, ৪৪২
সিদ্ধগুরু ('বজ্রধর') ২৬২, ৩২০, ৩৭১, ৪৯৫
সিদ্ধ দেহ ৫৭, ২৫৯, ২৬১, ২৬২, ৩৬০
সিদ্ধপুরুষ ১০৬, ৩২১, ৩৩৯, ৪৮২, ৪৯৫
সিদ্ধমার্গ ২৬১, ৩২০, ৩২৯
সিদ্ধযোগেশ্বরী ২১৬
'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি' ৪৭১
'সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ' ৩২১, ৩২৮, ৩৩৮, ৪৭১
সিদ্ধাচার্য ৪২, ৪৩, ২৩৮, ২৪২, ২৫১, ২৫৪, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ৩০১, ৩০৯, ৩২০, ৩২২
সিদ্ধাবস্থা ৮২, ৩২১
সিন্ধু (ত্রিবেণী-প্রবাহ) ৩৭১
সিন্ধু-উপত্যকা ১৪৭, ১৬২, ১৬৩
সিন্ধুদেশ ১৪৯, ১৬৪
সিন্ধু-সভ্যতা ১৬২, ১৬৯, ১৮০
সিমলা গ্রাম (রাজশাহী) ২১৫
'সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন' 'Siyar-Ul-Mutakhkhirin)' ১৪১
সিরাজ সাঁই (লালন শাহ্‌ ফকিরের গুরু) ২৯২, ৫০৬
'সিরী আকবর' (উপনিষদের অনুবাদ) ১৪২
সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvan Levy) ১৯০
সীতা ১৫০
সুকুমার সেন, ডক্টর ১৪, ১৫, ২৭১, ২৭৭
সুখরাজ (সহজ-অবস্থা-লাভ) ৮৬
সুখ-সাগর ৪০০
সুগ্রীব ১৫০
সুটল ৪২২, ৪৯৬
সুতল ৩৭২
সুধা-বিন্দু ৪০০
সুন্দরদাস (মধ্যযুগের মরমিয়া ভক্ত সাধক) ৮৮
সুন্দরবন ১৫৪, ২০১, ২৩০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর ৬, ৯, ১০, ১২, ১৫৮, ১৬০, ১৭১, ১৬২, ২৬৫
সুন্নী মুসলমান ১৩৮
সুফ ৭৮৪
সুফিজ্‌ম্‌ ১৪৭
'সুফিজ্‌ম্‌ অ্যাণ্ড বেদান্ত' ('Sufism and Vedanta') ৪৮৪
সুফী ৫৫, ১২৮, ১৩৯, ২৮২, ৩২৭, ৪৮২, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৭, ৪৮৯, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৪, ৪৯৯, ৫০০, ৫১৩
সুফীতত্ত্ব ১২৬, ৪৮৩, ৪৯১
সুফী-দর্শন ১২৬, ৩৭৮
সুফী দার্শনিক ২৮১
সুফী ধর্ম ৫৫, ১০২, ১২৯, ১৩৭, ১৩৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ৩০৩, ৩৩৯, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৯১, ৪৯৪, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০৭, ৫১৩
সুফী-প্রভাব ৫৩, ১০২, ১০৬, ১২৯, ৪৮২, ৪৮৩, ৫০৩ ৫১৩, ৫১৬, ৫১৮
সুফী-মত ১৩১, ১৪১, ৩৩৯, ৪৮৩, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৯, ৫০০
সুফী-মরমিয়া-পন্থ ৪৮৭
সুফী-শাস্ত্র ১৩৯
সুফী-সম্প্রদায় ১০২, ৩৩০, ৫০২

সুফী-সাধক ১৩৭, ১৩৯, ৪৮৩
সুব্ভভূমি ১৫০
সুবর্ণগ্রাম ২৫৪
সুবর্ণচন্দ্র (চন্দ্র-বংশীয় নৃপতি) ১৮৮
সুবুদ্ধি রায় (বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত গৌড়াধিপতি) ২৬৮
সুম্প খন্-পো-যেশে-পল-জোর ২৪০, ২৪৩
সুমেরীয় (ভূমধ্যসাগরীয় জন-গোষ্ঠী) ১৬০
'সুরঙ্গমসূত্র' ১৮৭
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডক্টর ১৯, ২১, ১৪৫, ১৭৩, ২২০, ২২৫
সুলতান নাসিরুদ্দীন ২৫১
সুলতান সিকন্দর শাহ্ ৯, ১০
সুশীলকুমার দে, ডক্টর ২১, ২৫৮, ২৭৯
সুষুম্না ৩৩, ২৫৯, ৩২৯, ৩৩৬, ৩৪৫, ৩৭৩, ৩৯৬, ৪০৯, ৪১৭, ৪২১, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৪৪, ৪৪৬
সুষুম্না (সরস্বতী-রূপ নাড়ী) ৯৯, ৩৩৮
সুহ্মাধিপতি ১৫০
সুক্ত ১৪৬
'সূত্রালংকারবৃত্তি' ২১
সূর্য (রত্নাধিপতি) ৪৭৪
সূর্য-দেউল ২১৫
সূর্যনাড়ী (পিঙ্গলা) ৪১১, ৪৫১
সূর্য-পূজা ২০০
সূর্য-মণ্ডল ৪৪০
সূর্য-মূর্তি ২০১, ২১৬
সেং চি (চৈনিক পরিব্রাজক) ২০৪
'সেক্স্যুয়াল লাইফ ইন এনসেন্ট রোম' ('Sexual Life in Ancient Rome'- Otto Kiefer) ১৬৮
সেকোদ্দেশ টীকা ৪৫১, ৪৬৭
সেজদা (প্রণাম) ৫১৫
সেন-বংশ ১২৭, ১৮৮, ১৮৯
সেন-যুগ ১৮৩, ১৮৪, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৯, ২৪৪, ২৪৭, ২৫৫, ২৫৬, ২৬১, ২৬৩, ২৬৭, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৮
সেন-রাজগণ ২৪৫
সেন-লিপি ২০২
সেবা (সাধনাঙ্গ) ৪৫১
সোনামুখী (বাঁকুড়া) ৭০
সোনারঙ (ঢাকা) ৩০
সোনার মানুষ ৯১, ৩৪০
সোম-কলা ৪৫৮
সোম-চক্র ৪৭২
সোমপুরী মহাবিহার ২৪০, ২৪২, ২৫১
সোঁথা ৩৭৭
সৌত্রান্তিকগণ ১২৭
সৌত্রামণি যাগ-প্রকরণ (যজুর্বেদ) ১৮২
'সৌন্দর্যলহরী' ৪৫১
সৌর ১৯৪, ১৯৬, ২০০, ২২১, ২৯০
সৌরাষ্ট্র ১৪৯
সৌরী নাড়ী ৪৫৮
স্কন্দগুপ্ত (গুপ্ত-বংশীয় সম্রাট) ২০১
স্কন্দ-দেউল ২১৫
স্কন্ধবিজ্ঞান ৮৬, ২৬১
'স্টাডিজ্ ইন্ ইসলামিক মিস্টিসিজ্ম্' ('Studies in Islamic Mysticism'— Dr. R. A. Nicholson) ৫০, ৩১৯, ৪৯৩
'স্টাডিজ্ ইন্ দি তন্ত্রজ্' ('Studies in the Tantras' —Dr. P. C. Bagchi.) ২০৮, ৪৫২
স্টুয়ার্ট সাহেব ১৫২
স্তম্ভন (বাণ) ২৯২, ৪১০, ৪১২, ৪৩০, ৪৬৪
স্থবিরবাদ ২০৯
স্থবিরবাদী বৌদ্ধ ১৯৩
স্থবিরবাদী শ্রমণ ২০৪

স্ত্রী-সত্তা ১৭৩
স্নান ১০৭
স্পর্শ তন্মাত্র ৪৪৮
'স্মৃতিরত্নহার' ২৬৭
স্মৃতিশাস্ত্র ২৪৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৯৮, ৩০১
'স্যানস্ক্রিট ড্রামা' ('Sanskrit Drama'—Dr. Keith) ২১,
'স্যানস্ক্রিট লিটারেচার' ('Sanskrit Litarature'—Dr. S. K. Dey) ২৫৮
স্বকীয়া ২৫, ২৮৭, ৫১৪
স্বভাব ৩৬১
স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ৪৩৯, ৪৪৮
স্বরূপ ৩৫৭, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৬, ৩৬৮
স্বরূপ গোস্বামী ১২, ১৬, ৩৬, ৪৮১
স্বরূপ-ভজন ৩৬১
স্বরূপ-রূপ ৩৬৫, ৩৭১
স্বরূপ-শক্তি ৩০০
স্বরূপ-সত্তা ৩৬০, ৩৬৭
স্বরূপ-সাধন ৩৬১, ৩৬৬
স্বর্লোক ৩৩৩
স্বস্তিক চিহ্ন ৪৪০
স্বাধিষ্ঠান-চক্র, স্বাধিষ্ঠান পদ্ম ৩৪৮, ৩৬৫, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৭, ৪৪৯

হং (বর্ণ), আজ্ঞাচক্র-স্থিত ৪৪১
হংসপীঠ (মণিপীঠ) ৩১৭
হংসবীজ ৩৫০, ৪৪২
হকাইক ৫৩
'হ'কার ৩৫১
হকিক ৫৩
হকিকত ৫২
হজরত মহম্মদ ১৩৯, ৪৮৫, ৪৯৫, ৫০১, ৫০৬, ৫১৪
হজ্ব ৫২, ৩২৫
হঠযোগ ৯৯, ১২৭, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ৩০৯, ৪৬৭, ৪৬৮
'হঠযোগপ্রদীপিকা' ৩২১, ৪১৬, ৪১৯
হঠযোগমূলক পদ ৩৩, ৩৪
হঠযোগী ৪৭
হঠাচার্য ২৬১
হদিস ৩৭০, ৪৮৫
হরপ্পা ১৫৫, ১৬০, ১৬২
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়, ডক্টর ৬, ৮, ১১০, ২১৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪২, ২৫৭, ২৬৭
হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা ৩১
হরি ৮৩, ২৭৯
হরি (বাউল) ২৯৫
হরিকালদেব, রাজা রণবঙ্কমল্ল ১৮৮, ২৪২
হরিকেল ১৫৯
হরিকেলরাজ (কান্তিদেব) ২১৬
'হরিক্রীড়া' ২১
হরিদাস, ছোট ৪৭৭
হরিনাথ মজুমদার ('কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ') ১০১
'হরিবংশ', 'খিলহরিবংশ' ৯, ১৭
হরিবর্মা (বর্মণবংশীয় নৃপতি) ১৮৮, ২৪৮
'হরিব্রজ্যা' ২২
হরিভদ্র ('অভিসময়ালংকার'-এর টীকাকার) ২৪১
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন ৬, ৯, ১২
হর্ষ, হর্ষবর্ধন ২০, ২০১, ২২২
'হর্ষচরিত' ২০
হল্লাজ, মনসুর; হল্লাজ (সুফী) ৪৮৩, ৪৮৫, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯৯, ৫০৪
হলায়ুধ ('ব্রাহ্মণসর্বস্ব'-প্রণেতা) ২৪৬, ২৬৭
হস্তিজিহ্বা নাড়ী ৪৪৪
'হাউবুদ্ধ' ('আমি বুদ্ধ') ৪৮২
হাউড়ে গোঁসাই (বাউল-গুরু) ৭৭, ৯৯, ১০৫,

হাউত (মোকাম) ৫৫, ১৪০, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫১২
হাওয়া (বাইবেলের ঈভ : Eve) ৫১৩
হাওয়া ধরা ৩৪৩
হাঁকরাইল গ্রাম (মালদহ) ১৯৮
হাকিনী শক্তি ৪৪১, ৪৪৮
হানিফা (দেহমধ্যস্থ ইমাম) ৫০৮
হাফিজ (সুফী কবি) ৪৯১, ৪৯৪, ৫১৩
হামীর উত্তর (ছাতনার রাজা) ৯, ১০
হারাণচন্দ্র চাকলাদার, অধ্যাপক ১৫৩
'হারামণি'—মনসুরউদ্দীন ৭০, ৭১
হারীত, মহর্ষি ২৯৭
হাল (রাজা, 'গাথা-সপ্তশতী'-প্রণেতা ২০
হাল (অবস্থা) ৩৩৯, ৫০৩
'হাসনাত-অল্-আরিফিন'—দারা শিকো ১৪০
হাস্যরস ৩৭৭
হিউ-এন্-থ্-সাঙ (হিউ-এন্-চাঙ বা হিউ-এন্-সাঙ) ১৬১, ১৮৭, ১৯০, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৯, ২২২
'হিন্দুইজ্ম্ অ্যাণ্ড বুদ্ধিজ্ম্' ('Hinduism and Buddhism—Eliot) ২২৯
হিন্দুকুশ পর্বত ১৫৭
হিন্দুতন্ত্র ৩১, ২৩১, ২৩২, ২৫৬, ২৫৮, ৩১৩, ৩১৫, ৩২৯, ৩৩৬, ৩৩৯, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫৮, ৩৬০, ৪৩৮, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৫৭, ৪৬০, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৩, ৫০৭
হিন্দু-তন্ত্রধর্ম, হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম ২১৯, ২৫৭, ২৬৪, ২৯০, ৩০৩
হিন্দু-তন্ত্র-সাধক ৪৭
হিন্দু-তন্ত্র-সাধনা ৩৫৭, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৭০
হিন্দু-তান্ত্রিক ২১১, ২১২, ৪৮২
হিন্দু দেব-দেবী ২১১
হিন্দুধর্ম ২১৬, ২২১, ২৫৬, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৬, ২৭৮
হিন্দু বাউল ২৮৪
'হিন্দু রিলিজিয়ন্স্ অর অ্যান্ একাউণ্ট অব্ দি ভেরিয়াস্ রিলিজিয়াস্ সেক্ট্স্ অব্ ইণ্ডিয়া'—এইচ্. এইচ্. উইলসন ('Hindu Religions or An Account of the Various Religious Sects of India'—H.H.Wilson.) ৫৬, ৬৪, ৬৫
হিন্দু শক্তিবাদ ২৮৫
হিমসাগর (ঘোরপুরস্থিত পুষ্করিণী : কর্তা-ভজা-মতে পবিত্র) ৬৯
হিরণ্য (সপ্তগ্রামের জমিদার, বারলক্ষের অধিপতি) ২৬৮
হিলি (বগুড়া) ১৯৭
হিল্লোল (রতিক্রিয়া) ৪১১, ৪১৩
'হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি'—শিক্ষামন্ত্রণালয়, ভারত সরকার ('History of Indian Philosophy'—Education Ministry, Govt. of India.) ৪, ১৪৮
'হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার'—উইন্টারনিজ্ ('History of Indian Literature'—Winternitz.) ১৪৫, ১৪৮
'হিস্ট্রি অব্ ফিলসফি, ইস্টার্ণ অ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ণ'—শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার ('History of Philosophy, Easterr and Western'—Education Ministry, Govt. of India.) ১৭২
'হিস্ট্রি অব্ বুদ্ধিজ্ম্ ইন্ ইণ্ডিয়া'—তারনাথ ('History of Buddhism in India' —Taranath.) ২৪১

'হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল'-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ('History of Bengal'—Dacca University. ২১, ৩৪, ১৫২, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৬, ২৮২

হীনযান ২০৩, ২০৫

হীরু শাহ্, ফকির ৫১০, ৫১১

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

হুং (বর্ণ), ধর্মচক্রে অধোমুখে বিরাজিত

হুইট্‌নি, ডব্লু. ডি. (অথর্ব-সংহিতা—W. D. Whitney.)

হুইনফিল্ড, ই. এইচ্. (E. H. Whinfietd) ৪৮৩, ৪৮ , ৪৯৭

হুজিয়িরি (সুফী-সাধক ও তত্ত্ব-রচয়িতা ৪৮৮, ৪৯০, ৪৯৬, ৫০২

হুন

হুন্‌জা-নাগির (উত্তর কাশ্মীরের নরগোষ্ঠী

হেবজ্র ২৩১, ২৩৩, ৩৫২

হেবজ্রতন্ত্র ২৩৩, ২৩৪, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৫২. ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৬৫,

হেমচন্দ্র (জৈন গ্রন্থকার)

হেমচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়)

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডক্টর ১৬, ১৩৩, ১৬৪, ১৯৭

হেমাশ্বদান-যজ্ঞ ২৪৬

হেমাশ্ব-রথ-দান

হেরুক ২৩১, ২৩৩,

হেরুকতন্ত্র ৩৫১, ৩৫২,

'হেস্টিংস এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকস্' ('Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics'

হৈহয়-বংশ ২১৬

হৈহয়-রাজ ২১৬

হো (আদিম নরগোষ্ঠী) ১৫৮

হোসেন শাহ্, আলাউদ্দীন ১৩৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭১

হ্যাডল্যাণ্ড ডেভিস, এফ. (F. Hadland Davis) ৪৮৪

হ্লাদিনী শক্তি ৩০০

দ্বিতীয় খণ্ড

অ

অখণ্ড দেশ ৮৩
অখণ্ড পীরিতি ১৩৬
অগ্নিপুরী ২৮২
অচিন জন ১০৭
অচিন দল ৪৬, ৪৮, ৭০, ৮৫
অচিন দেশ ৫৮, ১৯৯
অচিন পাখী ৭২
অচেনা ৬৯
অচেনারে চেনা
অজান খবর ১০৬
অজান মানুষ ৬৫, ১০৭
অটল ১০৫ ১১৬, ৩২৯
অটল গোঁসাই, অটলচাঁদ গোঁসাই ২৮০, ৩২৪
অটলচাঁদ ২৮৯
অটল-চিন্তা ৩৪২
অটল-নিধি ১০৯
অটল-পীরিতি ৪০৮
অটল-প্রাপ্তি ৮০
অটল-বিহারী ২২১
অটল-মানুষ ১৯৩, ২৪৪, ৩৬৪
অটল-রতি ৭৮
অটল-রূপ ৫০, ৮৩, ১৯৩
অটল শিব ১০৪
অটলে টল ৩৬৪
অটলের ঘর ৮৭, ২৫২
অটলের বরাতি মানুষ ১৯৩
অদ্বৈত গোঁসাই ৩০
অধর ৫১, ৬৭, ৭৯, ৮৩, ৯১, ১ ১,
১৪৫, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৬, ১৯১,
১৯৯, ২০২, ২০৩, ২০৭, ২০৮,
২০৯, ২২১, ২৪৯, ৩১৯, ৪০৭
অধর কালা ১২, ১৯২
অধর কৃষ্ণ (কৃষ্ণ অধর) ২৯১, ২৯২, ৩৪০
অধরচাঁদ ১৮, ৫৪, ৭০, ৯২, ১১৮, ২০০,
২০৩, ২১১, ২১৭, ২৪৫, ২৮৯
অধরা ধরা ৪৯, ৭০, ৭৪, ৯১,
১১১, ২৫১, ২৫২
অধর-নিধি ১৫০
অধর-স্বরূপ ২০৪
অধরা ১০১, ১৯১, ২৭৪, ৩৮০
অধরের গোরা ২৫২
অনন্ত গোঁসাই ১২৭, ২৬০, ২৬১,
২৬৩, ২৬৪, ২৬৫
অনন্ত রূপ
অনাদির আদি ১০৬, ২১০
অনুকূলচাঁদ গোঁসাই ২১৯
অনুমান ১৭৯, ৩৪৪, ৩৮৭, ৪২৮
অনুরাগ ৫৩, ৯৫, ১৩৩, ১৫৭, ২৩৪, ২৫২,
৩০১, ৩১৪, ৪০২, ৪২৭, ৪২৮
অনুরাগী ৩১৬, ৩৭০
অনুরাগী (গোঁসাই, বাউল) ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭,
৩৭৮, ৩৭৯, ৪২২, ৪৫০,
৪৫১, ৪৫২, ৪৫৫, ৪৫৬
অনুরাগের ধর্ম ২৩৬
অনুরাগের মানুষ ১৩১

অপরূপ নদীর পানি ১০৯
অমর্ত ৮০
অমর্তের এক ব্যাধ ৮০
অমাবস্যা ৪৬, ৪৮, ৬০, ৮৪, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২১২, ৪১২
অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ ২৪৬, ৩৯৯
অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র ২৪৬
অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ ১৩৬
অমাবস্যার চাঁদ ৩৫৮
অমিয়বালা দাসী ২৬৬
অমৃত নদী ২৮৭
অমৃত মেঘ ১১৬, ২২০
অমৃত-রস ২০৩, ২০৬
অম্বিকা (বাউল) ২৩৮
অযোগ ১৫৮, ২০১
অযোধ্যা ১৮১
অযোনি যজ্ঞেশ্বর ১১৩
অরসিক ৭০
অরূপের রূপ ৩৩৪
অল ইনসানুল কামেল (অল ইনসান-উল কামেল)
অলখ বনে রক্তকুমুদ ৩৪৬
অলগ্ন ৩০৯
অলি (ওয়ালি) ১০৭
অলিয়ম মরশেদা ৫৯
অলোকসম্ভব ১০৫
অষ্টদল ২৪৮
অষ্টম ইন্দুকাল ২০৫
অষ্টসিদ্ধি ৪১২, ৪৪২
অহল্যা ২০, ১৮৮
অহিতুণ্ড ৬৯

আ

আউল-বাউল-নেড়া ২৭৮
আউল-বাউলের ধর্ম ১২
আউলিয়া-মতবাদ ১৭২
আউলিয়া-সম্প্রদায় ১৭২
আউলে-খানা ১৯
আউয়াল ১৯৪
আকবর শাহ্‌ ফকির (বাউল) ১২৭, ২৬৬
আখের ২৮, ৪৮, ৫৭, ৯৮, ১৬৬, ১৯৪
আখোর ১৩১
আগম ৬০
আগুন-পারা ৩৭৩, ৩৯৩
আগুনের ঘর ৯৫
আজগুবি আওয়াজ ৪১
আজব কল ২৫৮, ২৫৯
আজব কুদরতি কল ১১৪
আজব লহর ২৫৮
আজব লীলা ২৫২
আজব-সম্ভব-সম্ভোগ ৮৪
আজরাইল ৩০৮
আজ্ঞাচক্র ৩১০, ৪৪৮
আট কুঠরি ৭১, ১৬৫, ২৫৮, ২৮৯
আট কোটারা ২০৮
আঠার কোঠা ১৮১
আঠারো চিজ ১৭৮
আঠারো মোকাম ৪১, ৯৩, ১০৬
আতসপুরী ২১৮
আতি উল্লাহ্‌, আতিয়ার রসুল ১৯৪
আত্মজ্ঞান ৩১১
আত্মতত্ত্ব ৪৮, ৭২, ৭৮, ১১১, ২৯২, ৩৭৫, ৩৮৭
আত্মতীর্থ ৩৩৭
আত্মসারা করণ ২৯০
আত্মা-রূপ ৫১
আদম ২১, ৩১, ৫৯, ২০৬, ২০৯
আদম-কাবা ১৫৪
আদমী ২০৬
আদি ইমাম ৪৩

"আদি ইমাম সেই মিঞে" ৪৩
আদি মক্কা ৪২
আদ্যপার ২২৩
আদ্যমানুষ ২০৩
আদ্যানদী ৪৩০
আদ্যাশক্তি ৩৫৯
"আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি" ৯০
আধরতি প্রেম ২৯৭
আধরতি 'মা' ২৪৭
আধলীলা ৪৭
আনন্দ গোঁসাই ৩৪৯
আনন্দবাজার ১৩৬, ৪৫০, ৩২০, ৩৯২, ৪৫০
'আনন্দবাজার পত্রিকা' ৩
আনমেল ১০
আন্দাজী সাধন ১০৩
আপ-গরজী ভাব ৪৩২
আপন খবর ৬৯, ৯৩
আপন ঘর ৫৩, ৯১, ১১৪
আপালসিদ্ধি ডিরেট গ্রাম (বারাসত, ২৪ পরগণা) ২৪৮
আপ্তরস ১৮৫
আপ্তসার ২৮১
আপ্তসারা ৪৫৪
আপ্তসারা মন্ত্র ১৪৮
আপ্তমুখ ৭৫
আফসার উদ্দীন ১৭২
আফসার ফকির (বাউল) ২৫৯
আবে আতস মিশান ৩৩০
আব-হায়াত ৮৫
আয়না-মহল ৭৩, ৩৪৬
আয়েত ৫৯
আরশীনগর ৪১
আরোপ-ধিয়ান ২০৫
আরোপের ঘর ২৪৪
আলমপানা ১৮
"আলাকুল্লে সাইন কাদিরো" ৫৯
"আলা কুল্লে সাইন মোহিত" ২০১
আলামিন ১৮
আলেক, আলেখ ৪৭, ৪৮, ১০২, ১৫৯, ৪১২
আলেক দম ৩৮৬
আলেক দুনিয়ার বীজ ৩৫০
আলেক মানুষ / আলেকের মানুষ ৪৭, ১৭৬, ২৪৬, ৩৭০
আলেকলতা ২৯৬, ৩৪৯
আলেক সাঁই ৩০৪, ৩৫০
আলেকের প্রেম ৩৪৯
আলেখ নূরী ১০২
"আলেফের জের মিমের জবর" ৬৫
আল্লা, আল্লাতালা ১২, ১৮, ১৫৭, ১৬৬, ১৯২, ১৯৪, ২০৭, ২০৯, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ৪৪০
আল্লাজীর নাম ১৬৬
আল্লার নূর ১৯৭
আশক ১৫৩
আশমানী কারবার ১০৩
আশুতোষ ১৪৮
আসমান ৮৮
আসমানে গাছের মূল ৩৫৮
আসাম ১৬০, ১৮৪
আহমদ ৩৭
আহম্মদপুর রেল স্টেশন (বীরভূম) ১৭৬
"আহম্মদে আহাদ মিলে" ১৯৪
"আহাদ মানে ছোব্বাহান" ১৯৪
আহামদী রূপ ৩৩
আহ্লাদিনী ৪৪৯

ই

ইঙ্গিল ২০৬
ইঙ্গিলির ঘর ২০৬

ইটালি (কলিকাতা) ২২২
ইড়া নাড়ী ৩১১, ৪০৬
ইন্দ্রডাঙা ১১৪
ইন্দ্রবারি ১৮৮
ইল্লিন ছিজ্জিন ৮০
ইল্লিন মঞ্জিল ৮০
'ইস্কি ছাদেকী গহর'- তেরাজতুল্যা খোন্দকার ১৮৪

ঈ

ঈশান কোণ ৩৯, ৪৯, ১০৭
ঈশান (বাউল) ২৬৫, ২৩৭

উ

উজন (উজান) ফেরা ১১৫
উজন বাঁক ১৯৬
উজান গুণ ১৭১
উজান তরী বাওয়া ১৯০, ১৯৭
উজান ধরা ২৩৫
উড়িষ্যা ৮২
উত্তমা (বাউল-সাধিকা) ৪৩২, ৪৩৩, ৪৪৮
উদয়চাঁদ (বাউল) ৩৮৮
উমেশচন্দ্র গোঁসাই (বাউল) ৩৬৯
উলট কমল ১৩৩
উলট কল ৩০৫
উলট মন্ত্র ১১১
উল-হায়াত ১৭৪
উল্টা কল, উল্টো কল ২৩৩, ২৬৮, ২৮৩
উল্টা খেলা ২০৩
উল্টো কথা ২৮২
উল্টো পথ ২৭০
উল্টো লতা ৩০, ৩৫৮

ঊ

ঊর্ধ্ব চাঁদ ১৫২
ঊর্ধ্বতালা ৬৯
ঊর্ধ্বনল (ঊর্ধ্বনাল) ৪৫৭
ঊর্ধ্ব রতি ১৫৭, ২৩৪

এ

"এক নালেতে হয় রতি" ৪৪৬
"একটা সাপের দুটি ফণী" (ফণা) ৭০
"এক মানুষে তিন" ২৫১
একলব্য ৩৭৭
একাদশ কলি ২০৫
এরফান শাহ্ (বাউল) ২৪৮, ২৪৯
এলাহি ১৮
এলেমা ১৭৩
এন্দের পুতুল ৩০৮

ক

কবিগান ২, ৩
'কবিতীর্থের পাঁচালী'— শ্রীশচন্দ্রনাথ অধিকারী ৪
কবীর ৮০, ৮২, ৯৬, ৩৭৭
কমলচাঁদ (বাউল-গুরু) ২৯৪
কমলের স্বভাব ১২৮
করিম ২৯, ৭৪
কর্তাভজা-সম্প্রদায় ৩৫৭
কর্ণ ৫৬, ৩৭৬
কলমা ১৫৩, ২০৯
কলমাদাতা ১০৭
কলিকাতা ১২৭
কলের বাতি ৩৩৩
কল্লোলের একবিন্দু ৩৭৪, ৪২৩
কাঙাল হরিনাথ (হরিনাথ মজুমদার) ৭

কাজল কোঠা ২০২
কানাই ১৬৬
কানাইলাল, দীন (বাউল) ২৯৫
কান্ত (বাউল) ১৮০
কাবা ১৫৪, ১৭২
কাম-গায়ত্রী ২৫৩
কাম-গুরু ৬৮
কামতত্ত্ব-বীজ ২২৩
কাম-নদী ৬৭, ৮১
কাম-বিন্দু ৩৭৪
কাম-ব্রহ্ম ২৬৮
কাম-রতি ৬৮
কামরূপ ১৩৬
কামারডাঙ্গা (২৪ পরগণা) ২২২
কামারহাটি (যশোহর) ২৫০
কারণ-বারি ৪৬, ৭০, ১০০
কারণ-সমুদ্র ১১৮
কারুণ্য, কারুণ্যামৃত ৯৪, ২০৭, ৩৯৭
কালনাগিনী ১১১
কালা ২৯, ৫৫, ৬৬, ৭৪, ৮২
কালাচাঁদ (বাউল-গুরু) ২৮৫, ৩৯৭, ৪০০, ৪০৬
কালাচাঁদ পাগল (ক্ষ্যাপা) ২৭৬, ২৭৭, ৩২৪, ৩২৬
কালা মোল্লা ২১৮
কালা, কালা শাহ্ (বাউল) ৩০৮
কালীগঙ্গা ১২৪
কালুখালি (ফরিদপুর) ৯
কাশী ৩৭, ৮১, ১২১, ১৩৬, ১৫৯, ১৮৯, ২১৪, ৩৯৮
কিশোর-কিশোরী ৮১, ১১৯
কুণ্ডলিনী ২৫৯, ৪৩৯
কুদরতি কাজ ৪৩
কুদরতি নূর ৪৩
কুবীর, কুবীর গোঁসাই, কুবীরচাদ গোঁসাই (যাদুবিন্দুর গুরু) ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ২৮১, ৩০৬, ৩৫১, ৩৮১
কুমারখালি (নদীয়া, বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলা) ৬, ৯
কুমিল্লা জেলা ১১০
কুম্ভক ১৬০
কুযোগ ১৫৮
কুরস ৫২
কুলকুণ্ডলিনী ২৬৮, ২৯৮, ৩১৫, ৩৮৬, ৪৪০
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ৩১১
'কুল্লে সাইন মোহিত' ২৮, ২৯
কুষ্টিয়া ২, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১. ১৪, ১৭২, ২৪১
কৃষ্ণ ৫৬, ৭৪, ৯০, ৯৭, ১০৪, ১০৭, ১৬৬, ২১৪, ৩১৯, ৩৫২, ৩৬২
কৃষ্ণ অধর ২৯১, ২৯২, ৩৬০
কৃষ্ণচাঁদ গোঁসাই ৪১৩
কৃষ্ণদাস (বাউল) ৪১৪
কৃষ্ণপক্ষ ৪৯
কৃষ্ণপ্রেম ১০৯, ৩১৫
কৃষ্ণভক্ত ১০৮
কৃষ্ণযাত্রা ২
স্বখকৃষ্ণ ৩১৫, ৩১৬
কৃষ্ণসুখের সুখী ১০৯
কেঁদুলী (বীরভূম) ৩৬৮
কেঁদুলীর মেলা (বীরভূম) ৩৬৮
কেদার (বাউল) ২৯৪
কেলে সোনা ২০১
কেশীঘাটা ১৭০
কোট ১০৮
কোট-সাধন ৯১
কোটালিপাড়া (ফরিদপুর) ১৬৭
কোটালের জল ২২৬

কোরাণ ১২, ৩৩, ৫৯, ২০৬
ক্ষীর ২২৫, ৪৪৮
ক্ষীর-নদী ১৯৮
ক্ষীরোদ-মথন ৭০
ক্ষীরোদ-শশী ১১৮
ক্ষেপাচাঁদ গোঁসাই (বাউল) ৩৫৩
ক্ষ্যাপা ৩৮১
ক্ষ্যাপা গৌরচাঁদ (বাউল) ৪০৭
ক্ষ্যাপা নিত্য (নিতাই), বাউল ৩৯১, ৪০৫
ক্ষ্যাপা মদন, ক্ষ্যাপা মদনচাঁদ (বাউল) ৩৫১
ক্ষ্যাপা সনাতন (বাউল) ৩৮০

খ

খলিলুল্লা ১৫৪
খলিলুল্লার কাবা ১৫৪
"খাঁচার ভিতর অচিনপাখী" ৭৩
খাদেমালী খোন্দকার ১৮৩
খুলনা জেলা ১৩৮, ১৬৭, ১৮৪,
খেলাফত (বৈরাগ্যতন্ত্র) ১৮৪
খোদ ছুরাত ২৬, ৩৩
খোদা ৫৯, ১০৭, ১৫৪
খোদাবক্স, খোদাবক্স শাহ্ ফকির (লালন-শিষ্য) ৬, ১১
খোদার খোদা ১৫১
"খোদার ছোট নবীর বড়" ১০৭
খোন্দকার রফিউদ্দীন ১৮৩, ১৮৫

গ

গউর, গউরচাঁদ ৩০, ২০৪, ২১৪, ৩১৫
গঙ্গা ৫৩, ৬০, ৮২, ৮৫, ১০৫, ১৫৯, ১৮১
"গঙ্গা ডাঙা বেয়ে যায়" ৮৫
গঙ্গাধর (বাউল) ৪১৫
"গঙ্গার উপর নৌকা বোঝাই" ৮৫
গণেশমতি ১৬১
গজমোতি ১৩৪
গদাধর ২৭০
গয়া ১৫৯, ১৮১, ২১৪
গরল-রস ২০১, ২০৩, ২০৫, ২০৬
গরল হইতে সুধা নেওয়া ১২১
গাজীর গীত ২
গিরিলাল গোঁসাই ৪২৭
গীতা ৩৮৩
গুণের মানুষ ৪৫০
গুপে (গুপী, গোপী), বাউল ৪১৪
গুপ্ত মক্কা ৪৩
গুরু কৃষ্ণ ৩৩১, ৩৭৮
গুরুচাঁদ ৯৩
গুরুচাঁদ গোস্বামী (বাউল-গুরু) ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯
গুরুতত্ত্ব ১৭১, ২৪৩, ২৭৩, ৩৭৮,
গুরুবর্ত ১৭৮, ২৯৪
গুরুবস্তু, গুরু-বস্তু-ধন ৩১, ১৫৫, ১৫৮, ২৪৩, ২৬৮, ৩১২, ৩৭৮, ৩৭৯
গুরুবাদ ১২৫
গুরুবীজ ৩০৪, ৩৬১
গুরুর করণ ৩৭৯, ৪৪৩
গুরুর করণ-সাধন ৪৪৩
গুরু-রত্নধন ২৯০
গুরু-রূপ ১৪৩
গুরু-রূপের ঝলক ৬৪
গুহ্যাতিগুহ্য রস-মাধুর্য ৩০২
গোঁসাই ৩৮, ৫১, ১২৮, ১৩২, ৩০৪, ৩১৩
গোঁসাই অটল, অটলচাঁদ ২৮০, ৩৩৪
গোঁসাই অনুকূলচান্দ ২৩৪
গোঁসাই আনন্দ ৩৪৯
গোঁসাই কালা (কালাচাঁদ) ২৮৫, ৩৯৭, ৪০০, ৪০৬
গোঁসাই ক্ষেপাচাঁদ ৩৫৩

গোঁসাই গিরিলাল ৪২৭
গোঁসাই গুরুচাঁদ ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ২৪৪, ২৬৬
গোঁসাই গোপাল, গোপাললাল (রাম-গোপাল জোয়ারদার) ২, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ৪২৬, ৪২৮, ৪৪৫
গোঁসাই গোবিন ২৮২, ২৮৪, ৪১৩
গোঁসাই চরণ ৩০৪, ৩০৬
গোঁসাই চণ্ডী ১৬৭, ১৭০, ১৭১
গোঁসাই চাঁদ ২৬৮, ৩১২, ৩৩১
গোঁসাই নরহরি ৩৭১, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৪২২, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৫, ৪৫৬
গোঁসাই-পদ ৬৫
গোঁসাই পরমানন্দ ৩১৪, ৩৬৩
গোঁসাই পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণচাঁদ ৩৩১
গোঁসাই প্রসন্ন, গোঁসাই প্রসন্নকুমার ২৭০, ২৭১, ২৭২, ৩১৫, ৩২০, ৩৫৪
গোঁসাই প্রহ্লাদচাঁদ ৩০১, ৩৯৬
গোঁসাই প্রেমচাঁদ ৪০২
গোঁসাই বনমালী ২২৯
গোঁসাই মতিচাঁদ ৩০৩
গোঁসাই মদন, মদনচাঁদ ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ৪১৪
গোঁসাই রমানাথ ৪৩৪
গোঁসাই রামকৃষ্ণ ৪২৪
গোঁসাই রামলাল (রাম-লাল জোয়ারদার) ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ৩২৪, ৩৩৪, ৪৪৫
গোঁসাই হরি, গোঁসাই হরিচাঁদ (বাউল-গুরু) ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ৩৬৩, ৩৭০, ৩৮৬, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৫, ৪০৮ ৪১০, ৪১২, ৪১৭, ৪২৫, ৪৪৪
গোঁসাই হীরুচাঁদ ১৮৫, ১৯৩, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৮, ১৯৯, ২১১, ২১৩, ২১৮, ২২১
গোকুল ১৫৯, ১৮১
গোণা (গুণাহ্) ৮০
গোপ ১৬৬
গোপ-গোপী ১৯[illegible]
গোপাল (কালাচাঁদ-শিষ্য) [illegible]
গোপাল (বাউল) ৩০৫, ৩০৭, ৩৯[illegible], ৪০৬, ৪১[illegible]
গোপাল (বাউল, উত্তরবঙ্গ) ১৫[illegible]
গোপাল (বাউল, গোঁসাই গোবিন্দ-শিষ্য) ২৮২, [illegible]
গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর) ১৩[illegible]
গোপাল গোঁসাই (রামগোপাল জোয়ারদার) ২, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ৪২৬, ৪২৮, ৪৪[illegible]
গোপালচাঁদ দরবেশ ৩৪৭
গোপিকা-ভাব [illegible]
গোপিনী ১৬[illegible]
গোপী ৯০, ৯৭, ১০৩, ১০[illegible], ২২০, ৩১১, ৩১৫, ৩[illegible]
গোপী-অনুগত ৯০, ১০[illegible]
গোপী-কৃপা ২১০
গোপীনাথ (বাউল) ২[illegible]
গোপী-প্রেম ১০৪, ৩১৭, ৪৪[illegible]
গোপী-ভাব ১৯৭, ২৬৫, ৩১৫, ৩১[illegible], ৩১৯, ৩৬২, ৪১৮, ৪[illegible]
গোপীর ভাবনা ৯০
গোবিন (বাউল) ৩৬৭
গোবিনচাঁদ (বাউল-গুরু) ২৮২, ২৮৪
গোবিন্দ (কৃষ্ণ) ৩৫[illegible]
গোবিন্দ (বাউল) [illegible]
গোবিন্দ গোঁসাই ৪১৩, ৪৩১
গোবিন্দ দাস (বাউল) ৪৪১, ৪৪[illegible]
গোবিন্দ-ভজনের ক্রম ৩১৮
গোরা, গোরাচাঁদ, গোরা রায় ৬৫, ২১৪, ৪৫[illegible]
গোরাই নদী ৬, ১০
গোরোচনা ১৩৪, ১৬৪
গোলোক (বাউল) ৪৪[illegible]

গোলোক ১৩৯, ১৯৯, ২০০, ২০৪, ৩৬৬
গোলোককর্তা ২৭০
গোলোকনগর ২০০
গোলোকনাথ ৩৮৯, ৪০৪
গোলোকপতি ২৮৪
গোলোকপুরী ২৭৯
গোর, গৌরচাঁদ ২১, ৩০, ৬৪, ২০৪, ২১৪, ২৭০, ২৭২, ৩১৫, ৩১৯, ৩২০, ৩২৯, ৩৭০, ৩৭৮, ৪২০, ৪৫৩
গৌরহরি ৩২৯
গ্রহণযোগ ৯০

ঘ

ঘরের খবর ৪৯, ১৮১, ২৬১
ঘরের তালা ১৮৯
"ঘরের মধ্যে ঘর" ২৫১
ঘাট বেঁধে মৎস্য ধরা ১০৯
ঘাট-সারা ৬৭
ঘেণো পাক ২১৩
ঘাষপাড়া (২৪ পরগণা) ১২৭, ২৬৬
ঘোষপাড়ার মেলা (২৪ পরগণা) ১২৭, ২৬৬

চ

চট্টগ্রাম ১২৪
চণ্ডী গোঁসাই ১৬৭, ১৭০, ১৭১
চণ্ডীদাস ২২৯, ২৮০, ৩০৫, ৩৪১, ৩৮১, ৪০১
চণ্ডীদাস গোঁসাই ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬
চণ্ডীদাস-রজকিনী-আশ্রম ২৫০
চতুর্দল ১৯৭, ২৪৯, ৩৮৬, ৪১২, ৪৪৬, ৪৫৮
চতুর্দশ স্থলমঞ্জরী কমল ২০৫
চন্দ্র ৪৬, ৫৮, ৮৪, ৮৫
চন্দ্র-উদয় ৪৬ ৮৪
চন্দ্রগ্রহণ ৯৯
চন্দ্রভুবন ৪৮
চন্দ্রভেদী ২৭৮
চন্দ্রমূল ২৪৯
চব্বিশ তত্ত্ব ১৭৮
চব্বিশ পরগণা (জেলা) ২৪৮, ২৬৬
চব্বিশ পুর ৩৪৬
চব্বিশ ফুল ১০৩
চমক-জ্বরা ৩৫
চাকুরে, চাকরা (গোঁসাই, বাউল) ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮
চাতক-স্বভাব ১২০
চাঁদ ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৪, ৭৩, ৭৪, ৮২, ৯২, ৯৩, ৯৯, ১০৩, ১২১, ১৩৮, ১৫২, ২১২, ২৭২, ৩৪৬, ৩৬৫
চাঁদ-চকোর ৭০, ১০৩
চাঁদ-ধরা ফাঁদ ২৭৭
চাঁদ-ধরার বিধি ৯৩
চাঁদপুর গ্রাম (বীরভূম) ১৭৬
চাঁদ সুদীন (বাউল) ৪৩০
চাঁদের অমাবস্যা ১০৩
চাঁদের সাধন ৯২
চাম-কাটুয়া ৮২
চাম-কেটো, চাম-কেঠো ৫৩, ৭৭
চারচন্দ্রের নিরূপণ ২৪৬
চারিচাঁদ ৯২
চিত্ত দেব (শান্তিনিকেতনের কর্মচারী) ১৮০
চিত্রগুপ্ত ৪৪, ৭৫
চিদানন্দ-রূপ পূর্ণব্রহ্ম ১০৬
চিন সহর ১৫৬
চিন্তামণি (বাউল-গুরু) ১৮০, ১৮১
চিন্তামণি-দাস (কান্ত বাউল) ১৮১
চেতন গুরু ৪৬, ১৪২, ৩৬৭, ৪৩০
চেতন মানুষ ১৬৫, ২০৯
চৈতন্য গুণীন ১১১

ঝিটকা গ্রাম (ঢাকা) ১৭২
ঝিনাইদহ (পূর্বের যশোহর জেলা) ৯

ট

টল ৭২, ৭৮, ৩২৯
টল-অটল ৭২, ৩২৯
টল-রতি ৭৮
টলাটল ৩০২
টলাটল-করণ ১১৫
টলে অটল ৩৬৪
টলে জীব ১০৪
টলের ঘর ৩৬৪
টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ)

ড

"ডাল-ছাড়া আছে পাতা"

ঢাকা ৬৯
ঢাকা জেলা ১৬০, ১৭২, ১৮৪, ২২৯
ঢাকা সহর ১৫৬
ঢাকা সহর (দেহ-অর্থে) ৪২৯, ৪৩৭

ত

'তত্ত্বসাধন-গীতাবলী'—হাউড়ে গোঁসাই ২২২
তমঃ (তমোগুণ) ১৩২, ৩১১
তরিক, তরীক ১৫৩, ১৯৪, ২৭৮
তসবী ১২৩
তাচাওফ ১৮৪
তারকচন্দ্র (বাউল) ১৮২
তারণ (বাউল) ২৯০, ৩৩৬, ৩৪১
তারুণ্য, তারুণ্যামৃত ৯৪, ২০৭, ৩৯৭
তিনকূল ৩৫৬
তিনতত্ত্ব ১৭৮
তিনতার (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) ৮৮, ৩৩৫
তিনথানা ১৭৫
তিনদিন বারুণী ২২৬
তিনদিনের তিন মর্ম ১১৬
তিনদ্বার ১৩৫
তিনধারা ৯২, ১৩৮, ১৫৬, ১৭০, ২০৭, ২৮১, ৪৪৯
তিননদী ২০৩
তিননাল ৪৪৬
তিনপ্রভু ১৩৬
তিনপ্রভুর মর্ম ৩১৫
তিনমানুষ ২৯২, ২৯৩
তিনমানুষের খেলা ২৪৬
তিনমানুষের তিনরূপ করণ ২৪৬
তিনমোজা ১৯৯
তিনরতি ১৯০, ২০৩, ২০৪, ২৪৭
তিনরস ৫৮, ১৯০, ২০১, ২০৩, ২০৪
তিনরূপ ২০৩, ৩১০
তিনশ' ষাট রসের নদী ১৫৩
তিরপিনি (ত্রিবেণী) ৪৯
তীর-ধারা ১০৫
তুলসীদাস ৩৭৭
তোড়ানি ৯৬
ত্রিকল ২২৯
ত্রিকোণ-যন্ত্র ২৮১
ত্রিকোণ-রূপ মহাযন্ত্র ১১৮
ত্রিখণ্ড ১০৯
ত্রিগুণের পার ৩৭২
ত্রিধারা ৯২, ১৬৭, ১৭০
ত্রিপাণি (ত্রিবেণী) ২৮৩, ২৮৬, ২৮৭
ত্রিপিন (ত্রিবেণী) ২১৮
ত্রিপিনাল (ত্রিবেণী) ১০৯
ত্রিবেণী (তীর্থ) ১৮১
৪৬, ৯৪, ১১৯, ১৩৮, ১৪৬, ১৫৬, ১৬৭, ১৭০, ২০৮, ২১৫, ২১৯, ২৩৩, ২৪৫, ৩৪৯, ৪৩০, ৪৩২, ৪৫৮

ত্রিবেণীর ঘাট ৬৭, ১৭৩, ২১৫
ত্রিবেণীর তিনধারা ৪৩৫
ত্রিবেণীর তীর-ধার ১৯৯, ২০২
"ত্রিবেণীর জল উজন চলে" ৩৪৯
ত্রিবেণীর রূপ ১৯৯

দবীর খাস ৬৫
দম-মাদার ২৮৯
৩৭৬
দম-সাধন ২৮৯
দমের ঘর ৩০৪, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৯
দমের মানুষ ২৪৬
দয়ালচাঁদ ২১, ৩৮, ১২১
দরবেশ ৭৪, ৭৫, ১০১, ১০৬
দরবেশ সিরাজ সাঁই ১০৮, ১১০
দল-আরফিন ১০৭
দল-নিরূপণ ৩৪৭
দশদুয়ারী মানুষ-মক্কা ৪৩
দশপদ্ম ৩৪৭
দশম দল ১০৫, ২২৮, ২৪৪, ২৮২, ৩৮৬, ৪৪৫
দায়মাল ১৯
দাস গোবিন্দ, গোবনে (বাউল গুরু) ৪৪১, ৪৪৩
দাস্যভাব ২৯৯
"দিন দুপুরে চাঁদের উদয়" ১৩৬
দিবাকর ৮৪, ১৩২
দিব্যজ্ঞান ৮৭, ১১৯
দিব্যজ্ঞানী ১১৩
দিল-দরিয়া ৪১, ১০৬
দিল্লী ৩৫, ৬৯
দীন কানাইলাল ২৯৪
দীন দয়াল (বাউল) ৪২৯
দীনরাম (বাউল) ৪৫৮
দীনু ক্ষ্যাপা (বাউল) ৩৭৯, ৩৮৮

দুই মানুষ ১৬৯
দুদ্দ মল্লিক শাহ্ (লালন-শিষ্য) ১০৪
দুদ্দু (বাউল, লালন-শিষ্য) ১৫২, ১৫৩, ১৫৪
দুলালচাঁদ (রামদুলাল, লালশশী) [illegible]
দেওয়ানা ৭৬
দেদার ১১৮
দেল-দরিয়া ১০০
দেল-হুজুর ১০৬
দেহ-চন্দ্র ৪৯
দেহতত্ত্ব ১৬১
দেহ-রতি ১০৩
দেহের খবর ৩১২
দেহের নির্ণয় ১২০
দেহের সাধন ১০৩
দো-খোদা ২৯
দোজক, দোজাক ১৯, ২০৪
দ্বাদশ দল ২৪৮
দ্বারকা ২৭৩
দ্বিজ আশুতোষ (বাউল-গুরু) ৪৪১
দ্বিজ কৈলাসচন্দ্র (ঐ) ৪৫৭
দ্বিজ গদাধর (ঐ) ৩৭১
দ্বিতীয়া ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০
দ্বিতীয়ার চাঁদ ২০৩
দ্বিদল ৩৯, ৪৮, ১০২, ১০৫, ১৮০, ১৯২, ২০৯, ২১২, ২২৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৮৪, ৩৮৫, ৩৯৭, ৪০৯, ৪১২, ৪৪৫, ৪৭৮
দ্বিদল পদ্ম ৪৮, ৩৯৮

ধ

ধরণী (বাউল-গুরু) ৪০২

ন

নদীয়া ১, ২, ৬, ৯, ২১, ৩০, ৬৫ ১৮৪, ২২২, ২৬৬, ৩২৯, ৪০

নদীর কূল ২৫২, ২৯০
নপ্‌ছ রাজার সৈন্য ৩০৭
নবঅঙ্গ-সাধন ৩৫৯
নবঘাট ১১২
নবঘেটেলা ১১২
নবদ্বার ১৭৫, ২৪৪
নবদ্বীপ ১৩৮, ২১৪, ২৫০, ৩১৫
নবদ্বীপ দাস (বাউল) ৩৮৪, ৪৪৯
নবধা ভক্তি ৩৫৯
নববিধি ১১২
নবরসিক ১৩৬, ৪২৩
নবরসিকের করণ ৩৬৮
নবরসিকের কর্ম ৩১৫
নবী ১৮, ১৯, ১০০, ১০৭, ১৫৩, ১৯৪, ২০৮, ২০৯, ২০৮, ৩০৯
নবীর সুর ১৯৭
নয়দরজা ২৯৩
নয়দুয়ার ১৭৫
নয়নচাঁদ ৯৩
নরনারায়ণ ৪০৪
নরবলি ১৪০, ১৭০
নরসিংদি (ঢাকা) ১৬০, ১৬২
নরহরি গোঁসাই ৩৭১, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৪২২, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৫, ৪৫৬
নরহরি দাস (বাউল) ৪৩৯
নরেকার ১৯
নর্মদার কূল ৩৮৬
নলিন ২১
নাগরদোল ১১৩
নাগরদোলা ৩৭
নাছুত ১৫৬, ১৭৪, ২৩৮, ২৪৯, ৩০৮
নাছুত-তত্ত্ব ১৫৬
নাড়ার ফকির ১৮৫
নাদবিন্দু গোস্বামী ২২২
নাভি-পদ্ম ১৫০
নাম-ব্রহ্ম ৭৪, ১২২
নাম-মন্ত্র ৫০
নামাজ (নমাজ) ১৭২
নারদ ৩৭৮
নারাণ (বাউল) ২৮০, ২৮৯, ৩২৪, ৩৪২
নারায়ণ ৮০, ২৯৭, ৪০৪
নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) ২২৯
না-শরিকালা ৩৪
"নিঃশব্দে শব্দেরে খাবে" ৮৯
নিঃশব্দের কুঁড়ে ৭৫
নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য-সম্মেলন ২, ৩
নিগম, নিগুম ৬১, ২৫২, ৩১৩, ৩৪২, ৩৫৯, ৩৯০
নিগম ঠাঁই ৪৬
নিগম মানুষ ২৭৬
নিগমে উদয় ২৯৩
নিগুম ঘর ১৭৫
নিগুম সহর ১৯৬
নিগূঢ় তত্ত্ব ৭২, ৯০
নিগূঢ় ভেদ ৪৭
নিগূঢ় লীলা ২১৮
নিগূঢ় সন্ধান ৭৪
নিতাই (নিত্যানন্দ প্রভু) ১৪, ২৫
নিতাই দাস (বাউল) ৩৩৭
নিত্য (নিতাই) ক্ষ্যাপা ৩৯১, ৪০৫
নিত্যকমল ২২১
নিত্যগোলোক ১০৫
নিত্যধন ১২৮, ২৮৫, ৩৫২
নিত্যধাম - ২১৮
নিত্যপ্রেম ২১১
নিত্যবৃন্দাবন ২১৮, ৩৪৬, ৪২৬
নিত্যমানুষ ২৭৯, ৩০৪
নিত্যলীলা ৮৩, ১৩৫, ১৯২, ৩৬৫
নিত্যস্থান ২১৬, ৩৭৮

নিত্যানন্দ ২৭০
নিমাই-রূপী ২১৯
নিরঞ্জন ১৫, ৫৯, ১৯৬, ২০০, ২০১, ৪০২
নিরঞ্জন আল্লা ১৬৬
নিরহেতু সাধক ১১৭
নিরহেতু সাধন ১১৭
নিরাকার ব্রহ্ম ৫৮
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন ৫৯
নিরিখ ৭৬, ৭৭, ১২০
নিরূপ মানুষ ৬৪
নিশাকর ৮৪
নিশিতে নরবলি ১৭০
নিষ্ঠারতি ১৯০, ৩০৫
নিষ্ঠাসাধন ১৩২
নিহার (নেহার) ২০৪, ২১৭, ২২০
নিহারা ১৯০
নিহেতু নিহার ২০৪, ২২১
নিহেতু প্রেম ৩৪৯
নীর ৪১, ২২৫, ২৪৮, ২৭২, ৪৪৮
নীর-ক্ষীর ৪২, ৭২, ৮৯, ১১৪, ১৯৫, ২০২, ২০৩, ২২৫, ৩১৪, ৩৫১
নীরদ-বিন্দু-বরিষণ ১১৪
নীরভাণ্ড-পোরা ব্রহ্মাণ্ড ১১৪
নীল পদ্ম ২৯৮
নুর, নূর ৩৩, ৪৩, ১১৮, ১৭৪, ১৯৪, ২০৮, ২০৯, ২৪৮
নুরের ইমাম ৪৩
নুরের মানে ৩৩
নুহু ১৮
নেজাম ১৯
নেড়ার ফকির ১১, ১৩, ১৮৩
নেত্রকোণা মহকুমা (ময়মনসিংহ জেলা) ২৫৭
নেহার ২৯, ৫০, ৬৯, ৮৪, ১১৮, ১৪৩, ১৫২, ১৫৮, ১৭১, ১৭৪, ১৭৬, ২২৭, ২৪৪, ২৭৭, ৩২৭, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৫৫, ৪১৪, ৪৩৯, ৪৪৪
নৈরাকার ১০৭, ৪৪৬
"নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই" ৮০

প

পঁচিশতত্ত্ব ৪৪৮
পঞ্চগুণ ১০৫
পঞ্চতত্ত্ব ৭১, ১৮১, ৩১২, ৩৭৫, ৪৪৮
পঞ্চদল ৩২৭
পঞ্চপথ ১২২
পঞ্চবাণ ২৭৯
পঞ্চবাণের ছিলে ৭১, ৭২, ১৯১
পঞ্চবিধ মুক্তি ১৯৭
পঞ্চভাব ২৯৬
পঞ্চভূত ২৮১
পঞ্চমত ১১১
পঞ্চরস ২৩৩, ২৯১, ৩৪৬, ৪৫৭
পঞ্চানন, দীন (বাউল) ২৭৪
পঞ্চুচাঁদ (বাউল) ৩৩৯
পড়শী ৪১
পদু (পদ্মলোচন, পোদো) ৪২১
পদ্মলোচন, পোদো (প্রাচীন বাউল-কবি) ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ৩৬৬, ৩৭০, ৩৮৬, ৩৯৫, ৩৯৯, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২৫, ৪৪৪
পদ্মা ২০৩
পরওয়ার ৩৩
পরওয়ারদিগার ১৫৩
পরকীয়া-ভাব-তাৎপর্য ৩৬৬
পরতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব ২৮৭, ২৯২

পরব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম ১৬৭, ৩০৬
পরমগুরু ৬৮, ১৭৯
পরমপুরুষ ৩০৬
পরমাত্মা ৩০৫
পরশমণি ১৩৪
"পর্বতের চূড়ায় গঙ্গা" ৪১
'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' —শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ৩, ৪
পাগলা কানাই (বাউল) ৩১০
পাঁচকুঠুরি ১৬৫
"পাঁচ-পাঁচা পঁচিশের ঘর" ৩৪৬
পাঁচভূত ১৪২
পাঁচলোকি, গ্রাম (বর্ধমান) ১৪০
পাঁচলোকির পাট ১৪২
পাঁচু (বাউল, লালন-শিষ্য) ১৫২, ১৫৪, ১৫৫
পাঁচু ক্ষেপা (বাউল-সাধক, গোঁসাই গোপালের শিষ্য) ২৪২
পাঞ্জু শাহ্, ফকির ২, ৯, ১৮৩—২২১
পাঞ্জাতন ২১২
পাতঞ্জল ৩৮৩
পাতাল ৯১, ১৯২, ২০২
পাপ-পুণ্যের জ্ঞান ১০১
পাবনা ২, ১১
পারের ঘাট ১৫৭
পার্থ ৩৭৬
পার্থসারথি গুপ্ত ১৬০
পাহাড় শাহ্, ফকির ২৪৮
পিঙ্গলা ৩১১, ৪০৬
"পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর" ৮১
পিজিরুদ্দীন শাহ্ (সুফী ফকির) ১৮৪
পীর ১০৭, ১৭৩
পীরের পীর ১০৭
পুণ্য (বাউল) ২৮১, ২৯৯, ৩৩৩
পুরন্দর ৭৯
পুরীধাম ৮
পুরুষ-প্রকৃতি ২৮৫
পুরুষ-প্রবৃত্তি-ঘটে ১৯৫
পুরুষ-প্রকৃতি-রীতি ২২৪
পুরুষ-প্রকৃতি-সত্তা ৯৯
পুলিন (বাউল) ২৩২, ২৩৩
পূরক ১৬৭, ২২৭, ৩২৪
পূর্ণচন্দ্র ৬০
পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ ১০৬
পূর্ণমাসী ৮৫
পূর্ণশশী ("অমাবস্যায় পূর্ণশশী") ৮৪, ১৩৯
পূর্ণিমা ("পূর্ণিমাতে অন্ধকার") ৮৪, ২৩২, ৪০৮
পূর্ণিমার চাঁদ ১৩১, ২৩২, ২৯৩, ৩৪৮, ৩৫৮, ৩৬৫
পূর্ণিমার যোগ ৯৪
পূর্ববঙ্গ ১৬০, ১৭২
পোদো, পদ্মলোচন (প্রাচীন বাউল-কবি) ১২৭, ১২৮, ১২৯ ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ৩৬৬, ৩৭০, ৩৮৬, ৩৯৫, ৩৯৯, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২৫, ৪৪৪
পৌর্ণমাসী ১৩৯
প্রকৃতি ২৫৩, ৩২৪, ৩৯৮, ৪৪৬
প্রকৃতি-সাধন ৩১৫
প্রতিপদ ৮৪, ১৯৮, ১৯৯
'প্রতিভা' (মাসিক পত্র) ১৬২
প্রবর্ত ১১২, ১১০, ২৩০
'প্রবাসী' (মাসিক পত্র) ১, ৫
প্রবোধচন্দ্র সেন ৪
প্রসন্ন গোঁসাই, প্রসন্নকুমার গোঁসাই ২১০, ২১১, ২১২, ৩১৬, ৩২০, ৩৫৪
প্রহ্লাদ ৫৬
প্রহ্লাদচাঁদ গোস্বামী বা প্রহ্লাদানন্দ গোস্বামী ২২২

প্রেমচাঁদ গোঁসাই ৪০২
প্রেম-পীরিতি ৬৮, ৭৫, ১৩৯
প্রেম-বাণ ৭০
প্রেম-রতন ৬৭
প্রেম-রতি ১৩১
প্রেম-রস ৭৫
প্রেম-রসিক ৪৭
প্রেম-রাগ ৬৯
প্রেম-শৃঙ্গার ৭০
প্রেমের লক্ষণ ৬৯
প্রেমের লতা ৬৮
প্রেমের সন্ধি ১০০
"প্রেমের হাটের বুলবুলা" ১০৪

ফ

ফকির মহম্মদ বিশ্বাস ১৮৩
ফকির মিএাজান ২৫৭, ২৫৮
ফকিরী ধর্ম ৮, ১২
ফটিক, ফটিক চাঁদ গোঁসাই ১৩৮, ১৩৯, ১৪০
ফটিক রস ১৪৪
"ফণীর মাথার মণি ধরা" ১৩৯
ফরিদপুর (জেলা) ২, ৯, ১১, ১৩৮, ১৬৭, ১৮৪, ২৬৬
ফাণা (সমাধি) ১০১, ১৫৩
ফাণার করণ ১০২
ফাণার ফিকির ১০১
ফাতেমা ২০৮
ফিকির ৬৭
ফিকির-ফাকার ৬৭

ব

বত্রিশ কোঠা ৩৭৪
বদরিকা ২৭৩
বনচারী বাগান (নবদ্বীপ) ২৫০
বনমালী গোঁসাই ২২৯
বরিশাল ১৮৪
বর্জক, বর্জোক ১১৮, ২১৮, ৩০৮
বর্ত ২০০, ২০১, ২০৪, ২১১, ২১৫, ২২৮, ৩৭১, ৩৭৫
বর্তমান ১৭৯, ১৯৪, ২০৪, ২১৬, ২৫০, ২৯৪, ৩০১, ৩৪৪, ৩৮৪
বর্ধমান (জেলা) ১২৭, ১৪০, ২২২, ২৬৬, ৩৬৮
বলাইচাঁদ গোঁসাই (বাউল-গুরু) ৩৮৪, ৪৪৯
বলি (রাজা) ৫৫
বশিষ্ঠানন্দ স্বামী ২২১
বশীরহাট (বসিরহাট, ২৪ পরগণা) ২৪৮
বসুমতী, মাসিক (মাসিক পত্র) ৭
বস্তুজ্ঞান ৭৪
বাইশ মোকাম ১৭৮
বাউল-উপনিবেশ ১৬২
বাউলচাঁদ (বাউল-গুরু) ৪৩৬
বাউল ঠাকুর (রামদাস, 'ধর্মাবতার') ১৬১
'বাউল ঠাকুর রামদাস' (প্রবন্ধ) ১৬২
বাউল-দরবেশ ১৬৫
বাউল-পন্থী ১২
'বাংলার সাময়িক পত্র' ৭
বাঁকা নদী ২৮৩
বাঁকা নল ২৮২, ৩৪৯, ৪০৯
বাঁকুড়া (জেলা) ২৬৬, ৩৬৮
বাঁশকাপুর ১৬৫
বাখরগঞ্জ ১৩৮
বাখের শা ফকির (বাউল) ১৫৬
বাৎসল্য ২৯৯
বাতন ১৯৪
বান্দা ৫৬, ৯৫
বাবু মশায় (রবীন্দ্রনাথ) ১
বামন (অবতার) ৫৫
বামাচরণ ভট্টাচার্য ৫

বারতিথির বারুণী ২২০
বারাণসী ১৭৯, ২১৪
বারাম ৪৮, ১০৫, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০৩, ২৪৯, ২৫২, ৩৪৮, ৭৪৫
বারামখানা ৩৯, ৭২, ৮৮, ৯১, ১১৩, ২৪৮, ২৫৯,
বারাসত মহকুমা (২৪ পরগণা)
বারুণী ২২৬,
বারুণী-যোগ
বাসুদেব
বিংশতি-চার চন্দ্র
বিধি
বিন্দু ৭১, ১০২,
বিন্দু (যাদুবিন্দুর সহ-সাধিকা)
বিন্দু-কোণ
বিন্দু-গতি
বিন্দু-ধার, বিন্দু-ধারা ২৪
বিদ্যাপতি ৩৪১
বিদ্যুৎ-আকৃতি ১০৫
বিবর্ত-লীলা ৩৯৬
বিশ্বাস্তর ২২৩
বিরজা-পার ২০, ১২৫, ১৪৫, ২৬৮
বিরজার পূর্বপার ৩৩১
বিরজার প্রেম-নদী ২৪৫
বিষামৃতে মিলন ১১৫, ১১৯
বিষের নদী ২৮৭
বিষ্ণু ৫৮, ৭৯, ৮০, ১৪৬, ১৪৮, ১৬৬, ৩৭২, ৪২৭, ৪৪৫
বিসমোল্লা ১৬৬
বীজ ৮২
বীজ-ধর্ম ১৬৪, ৩৭৫, ৩৮৭
বীরভূম (জেলা) ২৬৬, ৩৬৬, ৩৬৮
বৃষকেতু ৩৭৬
বে-কালমা (বে-কলমা) ১০৭
বেণী (বাউল) ৩৬৯
বেদ ৩০, ৭১, ৭৫, ৯০
বেদ-আগম ১০৬
বেদ-বিধি, বেদের বিধি ৯০
বেদ-বেদান্ত ৬৯, ২১০, ৩৩৯
বেদাতীত রস ১৫৭
বেদের অগোচর ৮৯
বেদের পার ১৩৭
বেদের বিচার ৭১
বেশরা ফকির ১১
বেহুলা ৩৭৬
বৈদিক বাণ ৭১
বৈদিক ভোল ১১৪
বৈদিক মেঘ ২২
বৈদিক রাগ ৭১
বৈধী জ্বালা ২৩৬
বৈধী রাগ ২৬১
বৈরাগ্য-ভাব ৯০
বৈষ্ণব ১২৫
বৈষ্ণবতত্ত্ব ১৮৪
ব্যাসদেব ৩১৭, ৩৭৬
ব্রজ, ব্রজধাম, ব্রজপুর, ব্রজপুরী ৮২, ১৩৯, ১৮৬, ২৭৯, ৩১০, ৩১৮, ৩১৯, ৩২৯, ৩৬০, ৩৬৯, ৩৭৮, ৪২৭
ব্রজ-গোপী ২২০, ৩০৫, ৩১৮
ব্রজ-গোপীর ভাব ১৯৭
ব্রজ-নায়িকা ৩৯১
ব্রজ-প্রাপ্তি ২৫৩
ব্রজ-ভাবাশ্রয় ২৯২
ব্রজ-রসের সাধন ১৩৯
ব্রজ-লীলা ৩৮৬
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭
ব্রজের কালা ৮২

ব্রজের ভাব ১০৪, ১৭৯, ২৬৫
ব্রহ্ম-আলাপ ১০৪
ব্রহ্ম-কারা ২২৮
ব্রহ্ম-ক্ষেত্র ২২৮
ব্রহ্ম-জ্ঞানী ৭৪
ব্রহ্ম-ডাঙ্গা ৩২৬
ব্রহ্ম-দ্বার ২২৩
ব্রহ্ম-নাল ২২৮
ব্রহ্ম-পুরী ২২৮
ব্রহ্ম-রূপ ২২৭
ব্রহ্ম-লোক ১০৫
ব্রহ্মা ২৬, ৫৮, ৮০, ১৪৬, ১৪৮, ২১০, ২১৯, ৩৩১, ৩৬৬, ৩৭২, ৪২৭, ৪৪৫, ৪৫২
ব্রহ্মা-বিষ্ণু ৫৮, ১৩২, ২৮৬

ভ

ভগবান ৪৪০
ভবা (বাউল) ২৯৬, ৩৬৪
ভবানী (বাউল) ৩০০
ভরত ৩৬৬
ভাগবত ২০৬, ৩১৭, ৩৮৩
ভাগীরথী ২০৩
ভাটির সোঁত ১১৫
ভাঁড়রা গ্রাম (নদীয়া) ৮
ভাণ্ড-বেভাণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) ৭৪
ভাব-নগর ১০০, ২৯৮
ভাবের খেলা ৮৯
'ভাবের গীত'—লালশশী ৩৫৭
ভাবের গোরা ৩৩০
ভাবের ঘর ১১৪, ২৫৪, ২৯৯
ভাবের চুরি ২৬
ভাবের ভাবী ৫২
ভাবের মানুষ ১৫৮, ২৪৫, ৩৬৪
ভাবের মুকুল ১২৯
ভাবের লীলা ২৯
ভাবের সাগর ৫১
ভাবের স্বভাব ২৯৯
'ভারত' ('মহাভারত') ৩৭৬
ভুবন, দীন (বাউল) ৩৩৮
ভূত-পূজা ১৭১
ভেক-ভোজন ১৩০
ভেক-ভ্রমর ১২৮
ভেস্ত (বেহেশ্‌ত্‌) ৭৮, ২০৯
ভোলাই শা ফকির (লালন-শিষ্য) ২, ১২৪, ১৫৭
ভোলানাথ মজুমদার ৯, ১১

ম

মওলা ৩৭
মক্কা ৮, ১৯২, ২১৪
মঞ্জরীগণ ৩৯৬
মণিকোঠা ৯২, ২৬০, ২৮৩, ৩৭৪, ৪৩০
মণিপুর ১৫৪, ২১৮, ২৮৪, ৩০৮
মতি (বাউল) ৩১৪, ৩৬৪
মতিচাঁদ গোঁসাই ৩০১
মতিলাল দাস, মতিলালবাবু কুষ্টিয়ার পূর্বতন (মুন্সেফ) ২, ৫
মতিলাল সান্যাল (হাউড়ে গোঁসাই) ২২২
মথন, মথন-দণ্ড ৫২
মথনের সুতার ৫১, ৫২, ১১৫
মদন ৫৭, ৩২১, ৩৩৬
মদন (বাউল) ২৪০, ২৭৮, ২৯৩, ৩৬৫
মদনচাঁদ ক্ষেপা (বাউল) ২৮৭, ৩৫১
মদন-জ্বালা ৬৯
মদনদাস গোস্বামী ১৮৪
মদনপুর (২৪ পরগণা) ১২৭, ২৬৬
মদন ফকির (বাউল) ২৮৮
মদন-রস ৪৪, ১০৫, ১৫৫

মদিনা ২১৪
মধুর রসের আশ্রয় ৩১৮
মধুর রসের ভিয়ান ৩১৮
মধুসূদন রায় ২২২
মন-মানুষ ২৯৪
মন-রসনা ৫৩
মনসা ৩০৬
মনসার ভাসান গান ২, ৩
মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ } ৩, ৯, ১০, ১২
মনসুর উদ্দীন, অধ্যাপক }
মনুরায় ২৩, ১১৯, ১৯০, ১৯১, ২১৩
মনের ঘোর ৭৮
মনের মানুষ ৫২, ১৩৯, ১৫৪, ১৭৫, ২০৮, ২৫২, ২৫৭, ২৬৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩৩৫, ৩৫১, ৩৭৯, ৩৮৫, ৪১০ ৪১২
মনোমোহিনী দেবী (গোঁসাই গোপাল-জননী) ২৪১
মনোহর (বাউল) ২৯১, ২৯২
মন্দোদরী ৩৪০
মমিন (মোমিন) ৭৮
ময়মনসিংহ (জেলা) ১৮৪, ২৫৭
মরার সঙ্গে মরা ৫১
মলয় পর্বত ২২
মসরেক, মোশরেক ১৭৩, ২৭৮
মহম্মদ ১২
মহম্মদ বিশ্বাস, ফকির ১৮৩
মহরালী বিশ্বাস ১৮৩
মহল ৭৯
মহাপ্রভু ৩১৯
মহাভাব ২২০, ২৯২, ২৯৬ ৩৪৮, ৩৭৪, ৪০০, ৪০৬
'মহাভারত' ৮, ৩৭৬
মহাযোগ ৪৯, ৯৯, ১৯৩, ১৯৫, ২২০, ২২১
মহাযোগাযোগ ১১৬
মহারতি ৪১
মহারস ৭০, ৯৩, ১০২, ১১২
মহারাগের করণ ২৭৯
মহাসংকর্ষণ ১০৬
মাকড়সার আঁশে হস্তী বাঁধা ৪২
মাকাল (মৎস্যের দেবতা) ১০৩
মাকাল-পূজা ১৪২
মাখাল (মাকাল) ফল ২৬
মাচকান্দী (ফরিদপুর) ১৭৮
মাড়ুয়াবাদী ২৬
মাণিকচাঁদ (বাউল) ১২৬
মাণিকতলা আখড়া ১২৭
মাতৃফল ৭৯
মাধব-নিশিযোগ ৩৬০
মাধবানন্দ, স্বামী (বাউল-গুরু) ৩০০
মাধাই ২০, ৬১
মাধুর্য-ভজন ১১
"মান আবফা নাফছাহু ফাকাদ আরফা" ১৫৩
মানব অবতার ৬১
মানব-দরিয়ার কূল ১০৯
মানুষ ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৬১, ৬৮, ১১১, ১১৪, ১১৯, ১২৮, ১৩৪, ১৫১, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৭৫, ১৭৬, ১৮৬, ১৯৫, ১৯৯, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯, ২৫১, ২৫২, ২৫৫, ২৫৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭৯, ২৮০, ২৮২, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ৩০০, ৩০১, ৩০৫, ৩০৬, ৩১৮, ৩৪৩; ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫১, ৩৫২, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৯, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৯, ৪১০, ৪১৮, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৯
"মানুষ উজান চলে" ৩৮৬

মানুষ-গুরু ৬২
মানুষ-চাঁদ ২৮৬
মানুষ-তত্ত্ব ৪৫, ৭১, ৩৪৫
মানুষ-দর্শন ২৮৯
মানুষ-বিগ্রহ ১৮১
মানুষ-ভগবান ৩৮৪
মানুষ-মক্কা ৪৩
মানুষ-রতন ৪৫, ১৫৭, ১৭৬, ২৩১, ২৩৮, ২৪৫, ২৮৪, ২৮৯
মানুষ-রসের রসিক ৪১০
মানুষ-রূপ গুরু ৩৮৪
মানুষ-লীলা ৪৪
মানুষের করণ ৭২, ১১৪, ১১৫, ২০৫
মানুষের খবর ৬৫
মানুষের খেলা ৩৫১
"মায়েতে পুত্র ধরে খায়" ৭১
মারফত ৬৫
মারফতী ফকির ১১
"মারে মৎস্য, না ছোঁয় পানি" ১১৮
মালকুত ১৫৬, ১৭৪, ২০৮, ২৪৯
মালকুত-তত্ত্ব ১৫৬
মাশুক (প্রেমিক) ১৫৩
মিঞাজান ফকির (বাউল) ২৫৭, ২৫৮
মি-মুন ২৭
মিলাপ (মিলন) ২২০
মীন ৪৯, ৮৫, ৯৪, ১৩০, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৬, ২১৮, ২৪৩, ২৭১, ২৭২
মীন-অবতার ৪৯
মীর মশাররফ হোসেন ৭
মীরা ৩৪১
"মুক্তালতার বন" ৩৯১
"মুখ আছে তার খাইতে বারণ" ৮১
মুদিত কমল ৭০
মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) ২২৯
মুরশিদ ৫৯, ৬৩, ৬৫, ৯১, ১১৮, ১৩৮, ১৫৯, ১৮৭, ১৮৯, ২০৯, ২১০, ২৫৯, ৩০৮, ৩১১
মুরশিদ-রূপ ১০২
মুর্শিদাবাদ (জেলা) ২৬৬, ৩৬৮
মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, মনসুর উদ্দীন, অধ্যাপক ৩, ৯, ১০, ১২
"মূল ছাড়া আজগবি ফুল" ৬৮
"মূল ছাড়া ফুলের লতা" ১০০
মূলাধার ৭৯, ৮৮, ১৬৭, ১৯৩, ১৯৫, ২০৪, ২০৫, ২৬৮, ২৮২, ৩১২, ৩৪১, ৪০৬, ৪৪২, ৪৪৮
"মূলাধারে জগৎ-মাতা" ১৬৭
মূলের সাধন ২০২
মৃগমদ কস্তুরী ১৩৮
মৃণাল ২৮৪, ৩৮৬, ৪১২
মৃণাল-গতি ১০৫, ১১১
মৃণাল-পথ ২২৪
মৃত্তিকাহীন নদী ৯৪
মেঘনা নদী ১৬১
মেটে ভূত ১৭১
মেদিনীপুর (জেলা) ২৬৬, ৩৬৮
মৈথুন ১৯৩
মোকাম ৪৭, ৭৯, ১৫৩, ২০৮
মোমিন বংশ ৬৫
মোমিন মুসলমান ১১, ৩৪০

য

যদুনাথ সরকার (বৈষ্ণব ও বাউল-তত্ত্ববিদ) ১৮৪
যমুনা ১৩৯, ২০৩
যশোহর (জেলা) ২, ৯, ১১, ১২৫, ১৬৭, ১৮৩, ১৮৫, ২৫০, ২৬৬
যাদব (যাদুবিন্দু, বাউল) ১৪০
যাদু (যাদুবিন্দু, বাউল) ১৪১

বিশিষ্ট বাউল) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ৩৭৪, ৪৩৮
যীশুখৃষ্ট ৪৪০
যুগল ১৫৪, ১৬৭, ২৪৮
যুগল-কল ২৪৯
যুগল-তত্ত্ব ৩৫১
যুগল-নাম ২১৫
যুগল-নামের করণ ২১৫
যুগল-মন্ত্র ৩৮৪
যুগল-রীতি ৩৫৪
যোগ ১৩৯
যোগ-নিদ্রা ২২৭
যোগমায়া ১৩৯, ২০৬, ৪৩২
যোগমোহিনী যোগিনী ৪৩১
যোগরূপিণী ৩৮৬
যোগাযোগ ১১৬, ২২৪, ২২৫
যোগীন্দ্র ৩০৯
যোগের ঘাট ২৫২
যোগেশ্বরী ১১৬, ১৯৫, ২২০, ২২১, ৩৮৬

র

রংপুর ১২৪, ১৫২, ১৮৪
রং-বেমুখা ৮৪
রংমহল, রঙমহল ৯১, ১৯৫, ২১২, ২১৯, ২২০, ২৫৯, ২৯৩
রক্তধাতু (মাতৃস্বরূপ) ২৬৮
রজঃ (রজোগুণ) ২৫১, ৩১১
রজঃ ১৩২
রজঃ-বীজ ২১০
রজকিনী ৩০৫, ৩৪১
রতি ৪৭, ৭৮, ৮৯, ১০৫, ২৮৮, ৩০৫, ৩৭৪
রতি-নিষ্ঠ রাগ ৪১২
"রতির ঘরে পতি বাঁধা" ২৮৮
রফিউদ্দীন খোন্দকার ১৮৩, ১৮৫
রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ) ১
রবি-শশী ("রবি-শশী রং-বেমুখা") ৮৪
রবীন্দ্রনাথ ১, ৪, ৫
রবীন্দ্র-ভবন ৪
রবীন্দ্র-সাহিত্য ১
রমণ ২৯১
রমণদাস (বাউল-গুরু) ৩৬৪
রমানাথ বাউল, গোঁসাই ৪৩৪
রশীদ (আউলিয়া) ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫
রস ৪৫, ৪৭, ১০৩, ১০৫, ১৭০, ১৮৭, ২০৭, ২৭৯, ৩০২, ৩০৪, ৩৭৪, ৪৪৭, ৪৫২
রস-আবর্তন ১৭৭
রস-নিরূপণ ১৫১
রস-নির্যাস ৩৭৮
রস-পন্থা ২২২
রস-পন্থী ৪৫
রস-বৃন্দাবন ৩২৫
রস-ভিয়ান, রসের ভিয়ান ১৭৭, ২০৪, ২০৫, ২২০, ৩১৮, ৩২৯
রসময় ২২৩, ২৬৯
রস-মৈথোন (মৈথুন) ২৪৮
রস-রতি ৪৭, ২০৪, ২১৫, ২১৯, ২২০, ২২৩, ২২৫, ২৯১, ৩৬৩, ৩৯৭
রস-রতিজ্ঞ ১০৩, ১০৫, ১৯০, ২০৪, ২০৫
রসরাজ ৩৯৯
রস-সাধন ২৯১
রসামৃত ২১৭
রসিক ৫১, ৭৫, ৮৭, ৯০, ৯৯, ১০৩, ১১৬, ১১৯, ১৯৮, ২০১, ২০৩, ২০৫, ২১০, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২৩০, ২৩৪, ২৩৭, ২৫২, ২৫৬, ২৬৬, ২৬৭, ২৭১, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৫, ২৯১, ২৯৩, ৩০২, ৩০৫, ৩১১, ৩১৫, ৩১৬, ৩২৯, ৩৫১, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৯২, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪৩৫, ৪৪৯

রসিক (বাউল) ২৩৪
রসিক দাসী ২১০
রসিক নাগর ১০৪
রসিক বুলবুল ৬৫
রসিক বৈষ্ণব ২৯, ৩৫, ১৬৬, ২৪১
রসিক ভক্ত ১১৯
রসিক ময়রা ২০৩, ৩৫১
রসিক-শেখর ১০৬
রসিক সাধক ৪৫০
রসিক হংস ৩৫১
রসিকের করণ ২৪১
রসের আশ্রয় ৩১৮
রসের করণ ৬৮
রসের কল ১৩১
রসের খেলা ১১২, ২১১
রসের গোরা ৩২৮
রসের ঘর ১৩৬
রসের নদী ৪৬, ১৫৪, ২০৭, ৩৬০
রসের নিধি ৩৭১
রসের ভাব ২০১
রসের মানুষ ১৩৪, ১৩৫, ২৯৩, ৩৬০, ৪৫১
রসের সাধন ২০১
রসের স্বরূপ ৩৭৪
রসুল ২০৯
রহিম ২৯, ৩৫, ১৬৬
রাই, রাই কিশোরী ১৬৬, ৩৩২, ৪০৬
রাকা ৩৬৯
রাগ ১১২, ১৩৩, ২১১, ৩০২, ৩০৩, ৩৬৩, ৪২৬
রাগ-নিরূপণ ১১২
রাগ-নেহারা ৮৩
রাগ-রূপাশ্রিত ৪২৬
রাগের অন্বেষণ ১৯৮
রাগের আশ্রয় ৫৭
রাগের করণ ৮৩, ১১০, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৫৫, ২৫১, ৪৪৫
রাগের ঘর ১১৪, ২৪৪, ৩০৩, ৩৬৩, ৪৪৪
রাগের তালা
রাগের পথ ৩৬৫
রাগের মানুষ ১৩:
রাগের রস ৩৭১
রাজকৃষ্ণ (বাউল) ৩০'
রাজকুমার জোয়ারদার (গোঁসাই গোপালের পুত্র) ২৪১
রাজসাহী, রাজশাহী ৭, ১১, ১৫২, ১৮
রাজ্যেশ্বর (বাউল) ৩০২
রাঢ, রাঢ়দেশ ১২৭, ১৪০
রাণী দেবী ৩৭০
রাধা ২১৩, ২১৪, ২৮৭, ২৯০, ৩২৯, ৩৪১, ৩৬৬, ৪৪৫
রাধা-কৃষ্ণ ২১০, ৩০৫, ৩১১ ৩২৯, ৩৬২, ৩৭৮, ৪৪৪, ৪৪৭
রাধা-কৃষ্ণলীলা ১৪'
রাধা-কৃষ্ণের নিগূঢ়তত্ত্ব ৩১:
রাধাপদ গোঁসাই ৩৮৭
রাধা-প্রেম ৩১৫
রাধারাণী ২৯২, ৩২৭, ৩৮৩
রাধা-শ্যাম ৪৫৮
রাধাশ্যাম (বাউল) ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯
রাবণ ৩২৪
রাম ২৯, ৩৫, ৫৩, ১৪৬, ১৬৬, ১৮৯, ৩২৪, ৩৭০
রাম-অবতার ১৮৯, ৩২৪
রামকৃষ্ণ (বাউল) ২৭৩
রামকৃষ্ণ গোঁসাই ৪২৪
রামগোপাল জোয়ারদার (গোঁসাই গোপাল) ২৪১
রাম (রামরস) গোঁসাই ৪৪৮

রামচন্দ্র ৫৬, ৩২৪
রামচন্দ্র (রামগোপাল) ৩২৪, ৩৩৪
'রামচরিত' ('রামচরিত-মানস'—তুলসীদাস) ১৭৭
রামদাস, বাউল ঠাকুর ১৬২
রামদাস (মুচি) ৫৩, ৮২
রামদুলাল (দুলালচাঁদ বা 'লালশশী') ১৫৭
রামরস (বাউল-গুরু) ৪৩২
রাম-রূপ ১৭৭
রামলাল জোয়ারদার (গোঁসাই রামলাল) ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ৩২৪, ৩৩৪, ৪৪৫
'রামায়ণ' ৮
রামানন্দ ১৭৭
রামা ৪০১
রামা-চণ্ডীদাস ৩১৫
রায়রাঞা ৩৫
রায় রামানন্দ ২৯১, ৩১৯, ১৬৮
রাসবিহারী ১৮০
রাসমণ্ডল ১৩৯
রুণপুর (নদীয়া) ২২২
রুদ্রভাব ২২৮
রুচ ২৬
রূপ ৪৬, ৫০, ৫৮, ১০২, ১১৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ১৮৭, ২০৭, ২১৬, ২৬৯, ২৭৩, ৩০১, ৩৪১, ৩৪৪, ১৭৪, ৪৫২
রূপ (বাউল) ৪৩৬
রূপ-ধিয়ান ২১৬
রূপনগর ২৮৪, ৩৬০, ৪০২
রূপ-নিহার ৩৪৯
রূপ-নেহার ২৯, ২৩৪, ৩০৫, ৪৩৫
রূপ-রতি ২৪৪, ৩৬০
রূপ-রতি-রস ১৭৪
রূপ-রস ২৮৬, ৩০২, ৩৭৪, ৪৫০, ৪৫৪
রূপ-রসান (রসায়ণ) ৯১
রূপ-সনাতন ৩০৫, ৩০৬, ৪৪৬
রূপ-সাগর ২১২
রূপ-সায়র ৩৭৯, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১
রূপ-স্বরূপ ৩০২
রূপ-স্বরূপের তত্ত্ব ৫৮
রূপহারা ১০২
রূপাশ্রিত ১০২
রূপের কিরণ ২২১, ২৭৯
রূপের ঘর ৮৩, ২৮৯, ৩০৩
রূপের ঝলক ১০২
রূপের তত্ত্ব ২৬৬
রূপের তালা-ছোড়ান ৮৩
রূপের দেশ ২০৪
রূপের বাতি ৪২
রূপের ভোল ১১৭
রূপের মুরারি ৭৫
রূপের সাগর ৩৯১
রূপে রূপ মিলন করা ১০২
রেচক ১৬৭, ১২৪
রেজো ক্ষ্যাপা (বাউল) ৩৫৮
রেবা নদার তট ৩১৫
রোজা-পূজা ৭৫
রোহিত (রোহিতাশ্ব) ১৭৬
রোহিণী-সংযোগ ২২৪

ল

লক্ষণা ৬৯
লক্ষ্মণ ৫৬
লক্ষ্মী-নারায়ণ ৪৫৭
লগ্নযোগ ১০৯
লছিমা ৩৪১
লছিমা-বিদ্যাপতি ৩১৫
লাবণ্য, লাবণ্যামৃত ৯৪, ২০৭, ৩৯৭
লা-মোকাম ২০৮

লালন, লালন শাহ, ১, ২, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ৩, ১৫, ১৬—১২৬, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৮৩, ১৮৮, ১৪১
লালন-পন্থী ফকির ১, ৮, ১৩
লালনশাহী ফকির ২ ৬
লালনশাহী মত ১
লালন-সম্প্রদায় ১১
লালমোতি ৮৯
লালশশী (দুলালচাঁদ) ৩৫৬, ৩৫৭
লাহুত ১৫৬, ১৭৪, ২০৮, ২৪৯, ৩০৮
লাহুত-তত্ত্ব ১৫৬
লাহোর ৩৫
লীলা ৪০ ৯৯
লীলা-রূপ ৮৩

শ

শক্তি ১৬৭, ২২৫, ২৭৪, ৩১১, ৩৪১
শক্তি-গুরু ২২৩
শক্তিতত্ত্ব ৭৪, ২২৪
শক্তি-ধাম ২২৩
শক্তিশেল ৫৬
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ৪, ৫, ৪১
শচী-সুত ১৮৬
শব্দ-সন্ধি ৮৩
শব্দের ঘর ৭৫
শম্ভুচাঁদ (বাউল) ৩৪৪, ৩৪৫
শরিফ ৩৪
শরীয়ত ৬৫
শরীয়তবাদী ১১
শলদা (বর্ধমান) ৪১২
শশধর ৩০৯
শাক্ত ২৭৪
শাক্ত-মতবাদ ২২২
শান্ত-মধুর ভাব ৩১৮
শান্তিনিকেতন ৪, ১৭৯
শান্তরস ২০১, ২০৩, ২০ ২০৬
শিঙ্গার (শৃঙ্গার) ৩৮০
শিব ৩৭২, ৩৭৮, ৪২৭,
শিব-শক্তিবাদ ২২২
শিবের আসন ২২৮
শিলাইদহ (পূর্বের নদীয়া ও বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা) ১, ২, ৩, ৪, ৫, ২৪১
শিলারি ২০৪
শীতল (বাউল, লালন-শিষ্য) ১২৪
শীতলক্ষা ২৩০
শুক ৩৭৮
শুক্রধাতু (পিতৃস্বরূপ) ২৬৮
শুদ্ধ অনুরাগ ১১৯
শুদ্ধ প্রেম-রস ২৭৭
শুদ্ধপ্রেম-রাগ ৬৯, ১৪৯
শুদ্ধপ্রেম-সাধন ৬০
শুদ্ধভক্তি ২১৯
শুদ্ধভাব ১৪১
শুদ্ধমতি ২৬৪
শুদ্ধরতি ২৬৪, ২৬৫ ৩৪৯
শুদ্ধরাগ ২৮২
শুদ্ধ-সহজ-প্রেম-সাধন
শুদ্ধ সাধন
শুভযুগ (শুভযোগ) ১৮০
শুভযোগ ৯৪, ১৯০, ১৯৮, ২ ০, ২২১, ২৭২
শুভাশুভযোগ ৩৮৬
শূন্য ২৭৫
শৃঙ্গার ২২৪
শৃঙ্গার-রস ২২৩
শৃঙ্গার-রসরাজ ২২৩
শৃঙ্গার-সাধন ২২৩
শৈব্যা ৩৭৬
শৈলকূপা গ্রাম (যশোহর) ১৮৩

শোণিত-শ্বেত সরোবর (রজঃ-বীজের মিলন) ২৮২
শ্যাম ১০৩
শ্যামবাজার ১২৮
শ্যামানন্দ (বাউল-গুরু) ৩৮৯
শ্যামসুন্দর ৩৬৯
শ্যামাসুন্দরী দেবী ২২২
শ্রীঅঙ্গ ৩৭৪
শ্রীঅধর ৪৪৯
, ৩৭৪
১০৬
শ্রীক্ষেত্র ৮, ২১৪, ২৮১, ৩৩৫, ৩৫৩, ৩৫৯
শ্রীগুরু ১৮০, ১৯৫, ২০৫, ২১৯, ২৩০, ২৩৪, ২৫২, ২৬৪, ৩২০, ৩২১, ৩৭০, ৪৩০
শ্রীচৈতন্য ২৭০, ৩৯৭
শ্রীদাম (বাউল) ৩৬৩, ৩৯৩
শ্রীনন্দ-নন্দন ৩৭৮
শ্রীনাম ৫১
শ্রীনাম-সাধনা ৫৬
শ্রীনিবাস ২৮৭
শ্রীবাস ২৭০
শ্রীভাগবত ৩১৭
শ্রীমহাপ্রভু ৩১৯
শ্রীরাধা ৩৬৬
শ্রীরাধা-গোবিন্দ ৪৫৭
শ্রীরূপ ৩০, ৮৩, ২০৪, ২১৯, ২২০, ২২৬, ২৩২, ২৮৩, ৩৬৬, ৪৫১, ৪৫৫
শ্রীরূপ-সনাতন , ৩২৭
. ৩০৮

ষ

ষট্চক্রভেদী
ষড়তত্ত্ব (ষট্তত্ত্ব) ১০৫
ষড়্দল ১০৫, ২০২, ৩৯৭ ৪৪৫
ষড়্পদ্ম (ষট্পদ্ম) ২৯৮
ষড়্রিপু ২৯২
ষড়ৈশ্বর্য ৩৮৩
ষোড়শ দল ৩৮৬
ষোড়শ শৃঙ্গার ৩৫৯
ষোলজন বোম্বেটে ৫৪, ১০১
ষোল দরজা ১৬৫
ষোল দল ২৪৮

স

সখী-অনুগত ২০৩
সখাভাব ২৯৯
সচেতন ৪৪৮
সচৈতন্য ৪০৬, ৪৪৯
সচৈতন্য মানুষ ১৩৬, ১৭৬
সৎসত্তা ৩৬৬
"সতীর গর্ভে আছে পতি" ৩৮২
সতীশ (বাউল) ১১৮
সত্ত্ব (গুণ) ১৩২, ২৫১
সত্যবাণ ১৭৬
সত্যযুগ
সদগুরু
সদর কোঠা
"সদর ঘরের সদর মানুষ"
সনক (ঋষি)
সনকানন্দ স্বামী (হাউড়ে গোঁসাই)
সনাতন, ক্ষ্যাপা (বাউল) ৩৮০
সনাতন গোস্বামী ৩১৭, ৩৬৬
সনাতন দাস ১৫০
সন্ধানী ৪৯
সপ্ততল ৯১
সপ্ততালা ২০২ ২৮১, ৪৩৯
সপ্তপাতাল ১৭৮
সপ্তরথী ৩৮৫
সপ্তস্বর্গ ১৭৮
সবুরের দেশ ৫৫

সমঞ্জসা ২০৪, ২০৬, ২৪৫, ২৯৭, ৪০১, ৪১১, ৪২৩
সমর্থা ২০৪, ২৪৫, ২৯৭, ৩৭৪, ৪০১
সরস্বতী ৪৫৭
সহজ ৪৪, ১১৪, ১৩৩, ২০৫, ৩৫৬, ৩৭৩, ৩৭৪, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৫
সহজ-গোপন প্রেম ৪০৮
সহজ-ধারা ১১৪
সহজ-নগর ২০৫
সহজ-পথ, সহজের পথ ১৫১, ১৫৯, ২৫৮
সহজ-প্রেম ২৩০, ২৫৪
সহজ-প্রেম-সাধন ৬৭
সহজ বস্তু ৩৪৩
সহজ-বিন্দু ৩৭৪
সহজ-ভাব ২৪০, ৩৩৫, ৪০৮
সহজ-মানুষ ১৫৯, ১৯৫, ১৯৮ ২১১, ২৩২, ২৪৯, ২৫০, ৩৩৬, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৬৫, ৩৮৫, ৪৩৫
'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' —শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
সহজ-রূপ ১৯৫, ২১১
সহজ-লোক ৩৫৫
সহজ-শুদ্ধরাগ ৩২৯
সহজ-সংস্কার ৪৪
সহজ-সাধনা ২২২
সহজ-সুরসিক জন ১০০
সহজ-স্বভাব ২৯৯
সহজের করণ-নিহারা ৩৭৩
সহজের ঘর ৩৭৩
সহজের দেশ ৩৫৪, ৩৫৫
সহমরণ ৩৩৮
সহস্র দল ৩৯, ১০৫, ১৫০, ২৬৮, ৩৯৭, ৪৪৫
সহস্রার ১৬৭, ১৭৯, ২২৮, ৩০২
সহস্রারে জগৎ-পিতা ১৬৭
সাঁই, সাঁইজী ১, ১৫, ২২, ৩২, ৩৪, ৪৩, ৪৪, [illegible], ৪৯, ৫৬, ৬৯, ৭২, ৭৩. ৭৪, ৭৫, ৮২, ৯৪, ১০১, ১০৭, ১১১, ১১৩, ১১৭, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২০১, ২০৬, [illegible], ২১২, ২১৫, ২১৮, ২১৯, ৩১৫
সাঁই-গুরু ১৬৫
'সাঁইজীর আসল খাতা' (লালনের গানের মুলখাতা) ৩, ৪, ৫
সাঁইজীর লীলা ২০০
সাঁই-পরিচয় ৪৭
সাঁই-সেবন ২১৯
সাংখ্য-পাতঞ্জল ৩৮৩
সাঞ্রী (সাঁই, স্বামী) ১২৫
সাকার বিন্দু ৩৭৪
সাড়ে চব্বিশ গুরু ২৯৮
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র ২০৫, ৩১২
সাড়ে চব্বিশ রতি ২৯৮
সাড়ে তিন রতির খেলা ২৯৬
সাধক (বাউল-সাধনার দ্বিতীয় স্তর) ১১১, ১৩০, ২৩০
সাধন-সিদ্ধ প্রেম ৩৮৪
সাধনের করণ ২৮০
সাধারণী ২০৪, ২৪৫, ২৯৭, ৪০১, ৪১১, ৪২৩
সাধুগঞ্জ (যশোহর) ১৮৫
সাধু-বৈষ্ণব ২১৪
সাধু-শাস্ত্র ৫১
সাধু সঙ্গ ৬০, ১৩৩ ১৩৪
সাধু-সেবা ১২, ১২৪
সাধুর পদ
সাধুর রাজার
সাধুর মেল ১৯
সাধুর হাট ১০৪

সাধা-সাধন ২৪৩
সান্নিপাত ৪২৩
সাবিত্রী ৩৭৬
সাযুজ্য ১০৯
সিংহের দুগ্ধ ২৫১, ৩০৪, ৪০৮, ৪২৯
"সিংহের দুগ্ধ মাইটা ভাণ্ডে টিকে না" ১৬৫
সিদ্ধি (বাউল-সাধনার শেষ স্তর) ১১২, ১৩০, ২৩০
সিন্ধু-বারি ৪৮
সিরাজ, সিরাজ সাঁই ৮, ৯, ১০, ১২, ২৪, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৮, ৪৯, ৬০, ৭১, ৭৫, ৭৮, ১০৮, ১১০, ১১৩, ১১৪
সীতা ৩২৪
সীতাকুণ্ড ২১৪
সীতানাথ ২৭০, ৩২৪
সুখনাল ২২৭
সুখ-রূপী কৃষ্ণ ২২৩
সুগুম মোকাম ১৫৩
সুজন ২৩৬, ২৯৫, ৩৭১, ৪১৯, ৪৩৫
সুজন কাণ্ডারী ২৩৫
সুজন বৈদ্য ৪১৩
সুটল ৩০২, ৩২৮
সুদীনচাঁদ (বাউল) ৪৩০
"সুধা আছে চন্দ্র-মূলে" ২৪৯
সুধীর (বাউল) ৪৩৭
সুফী-তত্ত্ব ১৮৪
সুফী-মতবাদ ১৮৪
সুরধুনী-গঙ্গা ২০০, ২৩৭, ৪৫৭
সুরস ৫২
সুরসিক হংস ৩৯২
সুরসিকা ১৩৯
সুষুম্না ২৮৪, ৩১১, ৪০৫
সেঁউড়িয়া (পূর্বের নদীয়া, বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা) ১, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১২৪
সেঁউড়িয়া আখড়া ১
সেজদা, ছেজদা (প্রণাম) ১১৮, ১৫৪ ১৭২
সেতুবন্ধ ২৭৩
সেবাদাসী ২১৮
সোনার পদ্ম
সোনার মানুষ ৪৫, ১৫৬, ৩৪৬,
সোহং (সোঽহং)-তত্ত্ব ২২৮
"সোহং (সোঽহং) নন্দলালা" ১০৬
স্বভাব ২২১, ২৯৯, ৩১৪
স্বভাবের ভাব ২৯৯
স্বভাবের সাধন ৩৮৪
স্বরতি-সঞ্চার ২২৪
স্বরূপ ৫৮, ৯৯, ১৭৪, ১৯২, ১৯৩, ১৯৮, ১৯৯, ২০৭, ২২৭, ২৪৪, ২৬৯, ২৭৩, ৩৪৩, ৩৬০, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭৫, ৪১৫, ৪৫১, ৪৫৫
স্বরূপ (বাউল) ২৬৯
স্বরূপ-দেশ ১৯২
স্বরূপ-দ্বার ১১৪, ১৯৩, ২১০ ২৭৯
স্বরূপ-নিষ্ঠা ২১৭, ২২০
স্বরূপ-রস ১৪৩
স্বরূপ-রূপ ৫০, ১৩৫, ২০২, ২২৫, ২৬৯, ৩৬০,
স্বরূপ-শক্তি ২০৪
স্বরূপের বাজার ৩২৮
স্বরূপের-ভাব ১৯২
স্বরূপের রূপ ৩৬০
স্বরূপের হাট ৭১
স্বরূপে রূপ মিশান ১৩৯
স্বর্গ-চন্দ্র ৪৯
স্ব-সিন্ধুপার ২২৩
স্ব-সুখধাম ২২৩
স্বাতী নক্ষত্র ১৬৫ ২৮৫
স্বাতি-বিন্দু ১৩৪
স্বামী মাধবানন্দ (বাউল গুরু)

হ

হংস ১৫৮, ২৫৩, ২৬২, ৩১৪, ৩৯২, ৫১৪

হংস (চক্ররূপ) ৩৯৫

হংসতত্ত্ব ২২৮

হংস-হংসী ২৬২, ২৮৭, ৪৪৯

হজ্‌-জাকাত ১৫৩

হজরত নবী ২১৯

হরগঙ্গা কলেজ (মুন্সীগঞ্জ) ২২৯

হরগোবিন্দ (বাউল) ৩৫৯

হরণ-পূরণ-সাধন ২৯৬

হরি ২৫, ৬৯, ৯২, ১৫৫, ১৬৭, ৩২১, ৩২২, ৩৮৪, ৩৮৭, ৪৪১, ৪৪৭, ৪৫৪

হরি (বাউল) ৩১৯, ৩২০, ৩২২

হরি গোঁসাই, হরিচাঁদ গোঁসাই (বাউল-গুরু) ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ৩৬৩, ৩৭০, ৩৮৬, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৪১০, ৪১২, ৪১৭, ৭২৫, ৪৪৪

হরিণাকুণ্ড থানা (যশোহর) ১৮৩

হরিদাস (বাউল) ২৭১

হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) ৭

হরিনাম-কীর্তন ১২৫

হরিনারায়ণপুর (পূর্বের নদীয়া, বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা) ৯

হরিশপুর (হরিণাকুণ্ড থানা, ঝিনাইদহ মহকুমা, যশোহর) ৯, ১০, ১৮৭, ১৮৪

হলধর সান্যাল (হাউড়ে গোঁসাইয়ের পিতা) ২২২

হাদিচ (হদিস) ১৫৩

হামেস ঘড়ি ১০৭

হাউড়ে গোসাই ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ৩৯৬, ৩৯৭

হাউত্ত ২০৮

হাওয়া ৮৮, ২০৯

হাওয়াখানা ৩৭

হাওয়া ধরা ১৫২

হাওয়ার কল ২৫৮

হাওয়ার খেলা ৩৭

হাওয়ার ফাঁদ ৮৭

"হাঁটতে মানা আছে চরণ" ৮১

হারাণচন্দ্র কর্মকার ১৮৪

হারাম ১১৮

'হারামণি' ('প্রবাসী'র পূর্বতন লোক-সঙ্গীত-সংগ্রহ-বিভাগ) ১

'হারামণি'-অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ৩, ৯

হাল্লাজ ১৫৩

'হিতকরী' (পাক্ষিক পত্রিকা) ৬, ৭, ৮, ১২

হীরার হার ১৬৫

হীরা-লালমোতির দোকান ৫৩

হীরুচাঁদ গোঁসাই (বাউল-গুরু) ১৮৫, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৮, ১৯৯, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৮, ২২১

হীরু শাহ্ (লালন-শিষ্য) ১, ৬

হুগলী ৩১৩

হুদার গদী ১৪২

হৃষীকেশ (বাউল) ৪০২

হেরাজতুল্লা খোন্দকার (সুফী-তত্ত্ববিদ্) ১৮৪

শুদ্ধিপত্র

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠাসংখ্যা	পংক্তিসংখ্যা	অশুদ্ধরূপে মুদ্রিত	শুদ্ধরূপ
৩০, ২২৮	যথাক্রমে ৮ ও ১	বজ্রধাত্বশ্বরী	বজ্রধাত্বীশ্বরী
৩২, ৩১৯	ফুটনোট ৭৯ ও ৪০৪	প্রাজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধিঃ	প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি
৪২, ৪৩	যথাক্রমে ১৩, ১৫ ও ২	অবধৃতি	অবধূতী
৪৬	ফুটনোট ১১০	তৃতীয়য়ো	তৃতীয়য়োঃ
৫৩	ফুটনোট ১১৫	Gardiner	Gairdiner
"	ফুটনোট ১১৬	Suffism	Sufism
৫৪, ৫৭	ফুটনোট ১১৯ ও ১২৩	Post-Chaitanya Sahajia Cult of the Vaishnavas	Post-Caitanya Sahajia Cult
৫৬	২৬	মনীন্দ্রমোহন	মণীন্দ্রমোহন
"	ফুটনোট ১২২	সংরস্বণ	সংস্করণ
৭৫	২৯	বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ	বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ
"	"	আধুনিকা-গন্ধী	আধুনিক-গন্ধী
৮০	৮	ধর্মধত্ত্ব	ধর্মতত্ত্ব
৮৫	২৩	সাধনগণ	সাধকগণ
৯৯	১৫	নাধপন্থী	নাথপন্থা
১০১	২১	ভুঁইলালী	ভুঁইমালী
১২৭	২৮	প্রতিষ্টিল	প্রতিষ্ঠিত
১২৯	৫	মুসলমাম	মুসলমান
"	২০	গোড়ীর	গৌড়ীয়
১৩০	ফুটনোট ১৩৮	মধুবকোমল···	মধুরকোমল···
১৩১	ফুটনোট ১৩৯	নাবিষ্কৃত	নবাবিষ্কৃত
১৩৯	২৫, ২৮	সর্থানাত	সর্ফনাত্ত
১৪৭	১৫	মণ্ডূক	মুণ্ডক
১৪৮	১৮	অব্ধ	অব্ধ্
১৭২	২৪	ইংমেবাত্মানাং	ইমমেবাত্মানং
১৭৩, ১৭৫	যথাক্রমে ৬ ও ২	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

পৃষ্ঠাসংখ্যা	পংক্তিসংখ্যা	অশুদ্ধরূপে মুদ্রিত	শুদ্ধরূপ
১৭৫	২৩	হঃ সিঃ	দুঃ সাঃ
১৭৬	৯	এবমেতগ্গামদেব্য	এবমেতগ্গামদেব্যং
"	৬, ১৬	হঃ সিঃ	দুঃ সাঃ
"	১০	জোগ্ জীবতি	জ্যোগ্ জীবতি
১৭৯	১৩ ও ফুটনোট ২০৬	বৌধায়ন	বোধায়ন
২১৫	২৪	বরাহা	বারাহী
২২৪	১৪	বন্ধুবন্ধর	বন্ধুবন্ধুর
"	১৭	প্রাীতিতি	প্রতীতি
২২৯	ফুটনোট ২৯৭	Icnography	Iconography
২৩৭	ফুটনোট ৩১৪	Buddism	Buddhism
২৪৫	১৫	পুররবা	পুরূরবা
২৪৮	১৫	দ্বীপান্বিতা	দীপান্বিতা
২৪৯	১৪	লক্ষীপতি	লক্ষ্মীপতি
২৬১	১৫	পুর্ববিকাশ	পূর্ণবিকাশ
২৬২	৬	দেহাভ্যান্তর	দেহাভ্যন্তর
২৬৩	৩	বোধিত্তিত্তের	বোধিচিত্তের
২৮৭	২২	গোপীগণের	গোপীগণের
২৯৮	১৪ ও ফুটনোট ৩৮৪	যাজ্ঞবল্কসংহিতা	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
৩০০	৬	রাগানুগ	রাগানুগা
৩১৬	২৩	গুরুবের	গুরুরেব
৩৩০, ৩৩২ ও ৩৩৩	যথাক্রমে ২৬, ফুটনোট ৪১৮ ও ১৭	শাক্তানন্দতরঙ্গিনী	শাক্তানন্দতরঙ্গিণী
৩৩৮	ফুটনোট ৪৩৪	সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ ৪।৩	সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ ৩।৩
৩৪৩	১৭	স্বচৈতন্য মানুষ	সচৈতন্য মানুষ
৩৬৪	৭	(গান নং ৩১৩)	(গান নং ৩২৩)
৩৭৮	২৩	ব্যাখা	ব্যাখ্যা
৪১৩	১১	জ্বলের	জলের
৪২৫	১৭	গাঁসাই	গোঁসাই
৪২৯	২	বেধিচিত্ত	বোধিচিত্ত
৪৬২	৮	ম্যৎস	মৎস্য
৪৭৩	১৯	উন্মিলিত	উন্মীলিত
৪৮৪	৩	Sıkdar Ikbal Ali Shah	Sirdar Ikbal etc.

দ্বিতীয় খণ্ড

গান নং	পৃষ্ঠাসংখ্যা	পংক্তিসংখ্যা	অশুদ্ধরূপে মুদ্রিত	শুদ্ধরূপ
	১	১০	লালানশাহী	লালনশাহী
	৭	১৮	বিদ্রোৎদাহী	বিদ্রোৎসাহী
	১১	৪	আণিতেয়তা	আতিথেয়তা
	৫১২ (গ্রন্থপঞ্জী)	১৩	Sikdar Ikbal etc.	Sirdar Ikbal etc.
৬৭	...	১১	কি	কে
৯০	..	৫	মিঃশব্দের	নিঃশব্দের
৯১	...	৯	সাঁই	সাঁই
১২৬	...	৫	নিরুপণ	নিরূপণ
১৫২	...	৮	করণিই	করণই
১৭১, ২১১	...	যথাক্রমে ৪ ও ১০	স্বচৈতন্য মানুষ	সচৈতন্যমানুষ
১৭৫	...	১৩	লোভ ছিল	লোভ-চিলে
২১২	..	৯	জারণ-মরণ	জারণ-মারণ
২১৬	...	১৬	গুরুতুলা	গুরুতুলা
২৩৯	..	১৫	গোলকে	গোলোকে
২৪৪	..	৭	পরসিলে	পরশিলে
২৬১	..	২	আগের	আগে
২৭৫	..	১১	দেহান্দ্রিয়	দেহেন্দ্রিয়
২৮২	..	১৬	চালন	চালান
২৮৮	...	১৫	গুঁরা	গুরা
২৯৪	...	৫	রসি	রশি
৩২০	...	১১	খোঁসাই	গোঁসাই
৩৪২	..	১৫	ফিরছেল	ফিরছিল
৩৪৩	...	১৬	ফণি	ফণী
৩৪৬	.	১৬	দৈত্য	দ্বৈত
৩৬৩	...	৩	সন্ধ	সন্দ
৩৯৪	...	৭	হে-হুঁশিয়ারী	বে-হুঁশিয়ারী
৪৪২	...	২	পুথী	পুঁথি
৪৪৮	...	১২	একরার	একবার
৪৪৯	...	১০	বয়েছে	রয়েছে
৪৬০	...	৩৭	গোসাই	গোঁসাই
„	...	৩৯	মিলব	মিলবে
৪৯৯	...	২২	যাদবিন্দু	যাদুবিন্দু